৬৮

শ্রাবণ '৭৫

\ '

মাথাধরা ?

অ্যানাসিন

ব্যথা বেদনার উপশমে ঢের ভালো কারণ এটি ৪-ভাবে কাজ করে

67

অ্যানাসিন ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মত একাধিক ভেষজের অপূর্ব্ব সমবায়ে তৈরী বলেই খুব তাড়াতাড়ি ৪-ভাবে আপনাকে আরাম এনে দেবে :

১) অ্যানাসিন মাথাধরার যন্ত্রণা সারাবে—তাড়াতাড়ি।
২) অ্যানাসিন স্নায়ুর উত্তেজনা দূর করবে—যা মাথাধরার সাধারণ কারণ।
৩) অ্যানাসিন অবসাদ ঘোচাবে—যা সাধারণতঃ মাথাধরার সঙ্গী হ'য়ে আসে।
৪) অ্যানাসিন ক্লান্তি দূর ক'রে আবার আপনার স্বাভাবিক উৎসাহ ও আনন্দ ফিরিয়ে আনবে।

এছাড়া, অ্যানাসিনে সর্দ্দি আর ইনফ্লুয়েঞ্জা, বক্তশূল আর গায়ের ব্যথাও সারবে।

২টি অ্যানাসিন খেলেই খুব তাড়াতাড়ি আরাম

A-25

Regd. User: Geoffrey Manners & Co. Ltd.

পরিচয়

বর্ষ ৩৮ ॥ সংখ্যা ১

সূচিপত্র

১৩৭৫ শ্রাবণ/আগস্ট ১৯৬৮

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ

দেবব্রত মুখোপাধ্যায

উপদেষ্টামণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, হিরণকুমার সান্যাল, সুশোভন সরকার, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, গোপাল হালদার, বিষ্ণু দে, চিন্মোহন সেহানবীশ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ সান্যাল

পরিচয় (প্রা) লিঃ-র পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৩৮ ॥ সংখ্যা ১

কেন সমাজতন্ত্র

আলবার্ট আইনস্টাইন

আমার বিশ্বাস, অর্থনীতি ও সামাজিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন এমন ব্যক্তির পক্ষে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে যাওয়া নানাকারণেই ঠিক নয়।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা প্রথমে বিবেচনা করা যাক। মেথোডলজির (methodological) দিক থেকে, মনে হয়, জ্যোতির্বিদ্যা ও অর্থনীতির মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই, উভয় ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিকগণ সন্নিবিষ্ট ঘটনাবলীর মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র আবিষ্কারের জন্য সাধারণ-ভাবে গ্রহণযোগ্য এমন কতগুলো সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন, যাতে বিষয়টা যতদূর সম্ভব সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু পদ্ধতিগত পার্থক্য থেকেই যায়। পর্যবেক্ষিত অর্থনৈতিক ঘটনাবলী প্রায়শই এমন কতগুলো কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত, যেগুলোর পৃথক পৃথক মূল্যায়ণ প্রায় অসম্ভব। এমন ক্ষেত্রে অর্থনীতির সাধারণ সূত্রাবলীর আবিষ্কার কঠিন হয়ে পড়ে। অধিকন্তু, মানব-ইতিহাসের তথাকথিত সভ্যতার সূচনাপর্ব থেকে যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, তা একমাত্র অর্থনীতির দ্বারাই প্রভাবান্বিত এবং সীমিত নয়, বরং তার পিছনে নানাবিধ কারণই বহুল পরিমাণে বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ইতিহাসোক্ত প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলি, তাদের অস্তিত্বের জন্য বিজয়াভিযানের কাছেই ঋণী। বিজয়ীজাতিগুলো সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসেবে বিজিতদেশে আইন ও অর্থনীতিগতভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে-ছিল। গায়ের জোরেই তারা ভূমির উপর একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করে এবং স্ব-শ্রেণীর মধ্য থেকেই পুরোহিত নিযুক্ত করে। পুরোহিত সম্প্রদায়, শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের পথেই, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের একটা স্থায়ী রূপ দেন এবং তাঁরা কতগুলো মূল্যবোধ সৃষ্টি করেন; যার দ্বারা তৎকালীন সময় থেকেই সা

মানুষ নিজেদের অজ্ঞাতসারে সামাজিক আচার-আচরণ পরিচালনা করে আসছে।

কিন্তু, বিগত দিনের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যই বলে দেয় যে, Thorstein Veblen কথিত মানববিকাশের 'লুণ্ঠনজীবীস্তর'-কে আমরা কোথাও অতিক্রম করতে পারিনি। ঐ স্তরের পর্যবেক্ষণীয় অর্থনৈতিক ঘটনাবলী এবং তৎজাত সূত্রগুলো অন্যান্য স্তরে প্রযোগযোগ্য নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সমাজতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, মানববিকাশের লুণ্ঠনজীবীস্তরকে অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হওয়া। বর্তমান স্তরের অর্থনৈতিকজ্ঞান, ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে খুব কম-ই আলোকপাত করতে পারে।

দ্বিতীয়ত সমাজতন্ত্র সামাজিক-নৈতিক লক্ষ্যের অভিমুখী। বিজ্ঞান চরম-লক্ষ্য সৃষ্টি করতে পারে না, এমন কি, মানুষের মধ্যে এই লক্ষ্যবোধ আরো কম সৃষ্টি করতে পারে—খুব বেশি হলে যা পারে, তা হল মানুষকে পথের সন্ধান দান, যে পথে অগ্রসর হয়ে তারা মোটামুটি কতগুলো লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে। উচ্চনৈতিক আদর্শসম্পন্ন ব্যক্তিরাই এই লক্ষ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে পারেন। যদি লক্ষ্যসমূহ মৃতজাত না হয়ে জীবন্ত ও তেজোসম্পন্ন হয়, তাহলে যে-সমস্ত মানুষ সমাজের ক্রমবিবর্তনের ধারাকে নিজেদের প্রায় অজ্ঞাতসারেই নির্ধারণ ক'রে থাকে, তারা ঐ চরম লক্ষ্য-গ্রহণ ক'রে অগ্রসর হতে পারে।

এইসব কারণে, মানবিক সমস্যার প্রশ্নে, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অতিরিক্ত মূল্যায়ণে সদাসর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এবং একথাও মনে করবার কোনো হেতু নেই যে, সমাজ-সংগঠনের প্রশ্নাবলী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরাই একমাত্র মতামত প্রকাশের অধিকারী।

বেশ কিছুদিন ধরে অগণিত মানুষ জোরের সঙ্গেই ঘোষণা ক'রে চলেছেন যে, অধুনা মানবসমাজ এক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে এবং এর অস্তিত্ব গভীরভাবে বিপন্ন। এমতাবস্থার বৈশিষ্ট্য হল এই যে, ব্যক্তি-মানুষ, তা সে ছোট-বড় যে দলেরই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন, সেই দল সম্পর্কে উদাসীন, এমন কি বিরুদ্ধভাবাপন্ন। আমার বক্তব্যের সমর্থনে এখানে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ দেওয়া যাক। বুদ্ধিমান ও প্রসন্নচিত্তের অধিকারী জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে আর-একটা যুদ্ধের বিপদ নিয়ে অধুনা আমি আলোচনা করেছি। আমার মতে—সে-যুদ্ধ মানবজাতির

অস্তিত্বকে সাংঘাতিক ভাবে বিপন্ন ক'রে তুলবে এবং আমি এ-মন্তব্যও প্রকাশ করেছি যে, কোনো অধি-জাতীয় সংগঠনই (Supra-national organization) একমাত্র এ-বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে। এ-কথার পর আমার অতিথি অতি প্রসন্ন ও শান্তভাবে বললেন—"মানবজাতির অবলুপ্তির পথে আপনি গভীরভাবে প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়াচ্ছেন কেন?"

আমি নিশ্চিত যে, এক শতক আগে পর্যন্ত এ-ধরনের হালকা উক্তি কেউ করতেন না। এ-উক্তি করেছেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি নিজের জীবনে ভারসাম্য আনয়নে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন এবং সাফল্য সম্পর্কে কম-বেশি কোনো আশাই আর পোষণ করেন না। বর্তমানকালে অগণিত মানুষ যে বেদনাময় নিঃসঙ্গতা আর নির্জনতার কবলে পড়ে যন্ত্রণা পাচ্ছে—এ হল তারই অভিব্যক্তি। এর কারণ কি? পরিত্রাণের পথই বা কি?

এসব প্রশ্ন তোলা সহজ, কিন্তু নিশ্চিত কোনো উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। যতদূর সম্ভব উত্তর দিতে আমি চেষ্টা করব। তবে, এ-ব্যাপারে আমি খুবই সচেতন যে, আমাদের অনুভূতি ও প্রচেষ্টাগুলো পরস্পর-বিরোধী এবং অস্পষ্ট। সহজ-সরল ফরমুলার (formulas) মধ্যে ফেলে তাদের ব্যক্ত করা যায় না।

মানুষ একই সময়ে একক ও সামাজিক জীব। একক জীব হিসেবে মানুষ স্বীয় বাসনা পূরণে, সহজাত প্রবৃত্তির স্ফুরণে সক্রিয় এবং নিজের ও প্রিয়জনের অস্তিত্বরক্ষায় সচেষ্ট। আর, সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ স্ব-শ্রেণীর স্বীকৃতি ও ভালোবাসার প্রত্যাশী, তাই সে তাদের আনন্দ-বেদনার অংশীদার ও সমব্যথী হয়ে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আগ্রহশীল। বহুবিচিত্র এবং প্রায়শ ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ এই প্রচেষ্টাগুলো মানুষেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-জাত। এবং এদের মধ্যে বিশেষ ধরনের একটা ঐক্য গড়ে তোলার পথেই মানুষ তার সীমানির্ধারণে সমর্থ হয় এবং অন্তর্নিহিত ভারসাম্য অর্জনে ও মানব-সমাজের কল্যাণসাধনে সক্ষম হয়। এটা খুবই সম্ভব যে, উত্তরাধিকার সূত্রের দ্বারাই মূলত এই উভয় প্রচেষ্টার আপেক্ষিক শক্তি স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু পরিণামে মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়, তা প্রধানত গঠিত হয় পরিবেশ সমাজ-কাঠামো ও সামাজিক ঐতিহ্যের দ্বারা—যার মধ্যে সে জন্মের পর থেকেই বেড়ে ওঠে। বিশেষ ধরনের কতগুলো

আচার-আচরণের মূল্যায়নও এ-ব্যাপারে কম দায়ী নয়। 'সমাজ' শব্দটির বিমূর্ত ধারণা হচ্ছে এই—তা হল ব্যক্তির সঙ্গে তার সমসাময়িক ও পূর্ব-পুরুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্কের যোগফল।

কর্ম-চিন্তা-অনুভব ও প্রচেষ্টা—এ-সবগুলো ব্যক্তি নিজে নিজেই করতে সক্ষম, কিন্তু তার দৈহিক-মানসিক ও আবেগময় অস্তিত্বের জন্য—বহুল পরিমাণেই সে সমাজের উপর নির্ভরশীল। সমাজ-কাঠামোর বাইরে মানুষকে বোঝা বা তার অস্তিত্বের চিন্তা অসম্ভব। সমাজই তার খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করে, তার কাজের হাতিয়ার ও মুখের ভাষা জোগায়। এমন কি, তার চিন্তা-চেতনার রূপ ও বিষয়বস্তু যুগিয়ে থাকে সমাজ। 'সমাজ' এই ছোট্ট শব্দটার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে অতীত ও বর্তমানের শত-সহস্র বছরের কর্মোদ্যম ও অর্জিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং এর ফলেই মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে।

অতএব, একথা খুবই স্পষ্ট যে সমাজের উপর ব্যক্তির নির্ভরশীলতা একটা প্রাকৃতিক সত্য এবং এ-সত্যকে আমরা কিছুতেই মুছে ফেলতে পারব না—যেমন পারি না পিঁপড়ে ও মৌমাছিদের জীবনযাত্রার আলোচনায়। যাই হোক, আমরা যদি পিঁপড়ে বা মৌমাছিদের সামগ্রিক জীবনযাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করি, তা হলে দেখতে পাব, তাদের জীবনধারা অপরিবর্তনীয় বংশানুক্রমিক প্রবৃত্তির দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ। আর মানবজাতির সামাজিক কাঠামো ও সম্পর্কগুলো পরিবর্তনশীল এবং সহজেই রূপান্তরধর্মী। স্মরণশক্তি, নতুন নতুন সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতা ও ভাষার ব্যবহার—এগুলো জৈবিক প্রয়োজন-সাপেক্ষ নয়—অথচ এরাই মানবজাতির বিকাশকে সম্ভব ক'রে তুলেছে। এই বিকাশ, বিচিত্র ঐতিহ্য, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান এবং যন্ত্র-বিদ্যার মধ্যে স্ব-প্রকাশিত হচ্ছে। এর দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ তার নিজস্ব আচরণের দ্বারা তার জীবনকে প্রভাবান্বিত করে এবং এক্ষেত্রে তার সচেতন চিন্তা এবং আগ্রহও একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। বংশগত কারণে, জন্মলগ্নেই মানুষ জৈব-দেহ-বিন্যাসের অধিকারী। জৈব-দেহের বিন্যাস ও মানব-প্রজাতির প্রকৃতিগত এই বিশিষ্ট প্রবৃত্তিগুলোকে আমরা অপরিবর্তনীয় অমোঘ নিয়ম হিসেবেই বিচার করব। এছাড়া, জীবদ্দশাতে মানুষ সমাজকে অবলম্বন ক'রে পারস্পরিক যোগাযোগ ও নানাবিধ প্রভাবের মাধ্যমে তার সাংস্কৃতিকজীবন গড়ে তোলে। এই সাংস্কৃতিক

জীবন সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পরিবর্তিত হয় এবং ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কটি বহুল পরিমাণে নির্ণয় করে থাকে।

তথাকথিত আদিম-সংস্কৃতিগুলির তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের দ্বারা আধুনিক নৃতত্ত্ব-বিদ্যা আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, বিভিন্ন সমাজে সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ বিদ্যমান এবং ভিন্নভিন্ন সংগঠন প্রভাবশালী—এর ফলেই মানবজাতির আচরণে গভীর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই মানবভাগ্য উন্নয়নে যাঁরা সচেষ্ট, তাঁরা আশা রাখতে পারেন যে, জৈবিক গঠনের জন্যই মানুষ পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করবে না বা স্ব-আরোপিত নিষ্ঠুর নিয়তির করুণার মুখোপেক্ষী হবে না।

আমরা যদি নিজেদের প্রশ্ন করি, যথাসম্ভব সন্তোষজনক একটা মানব-জীবন গড়ে তোলার অনুকূলে কিভাবে আমরা সমাজের কাঠামো এবং মানুষের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তিত করব—তাহলে এ-ব্যাপারে একটা সত্য সম্পর্কে আমাদের সর্বদা সচেতন থাকতে হবে যে, কিছু কিছু অবস্থা আছে, যা আমরা পরিবর্তনে অক্ষম। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, মানুষের জৈব-প্রকৃতি কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন-সাপেক্ষ নয়। অধিকন্তু, বিগত কয়েক শতকের প্রযুক্তি বিদ্যা ও demographic অগ্রগতির ফলে পারিপার্শ্বিক যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তা এখনও স্থায়ী রয়েছে। অপেক্ষাকৃত ঘন বসতি-পূর্ণ অঞ্চলের অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নিরন্তর সরবরাহের জন্য চাই চরম শ্রম-বিভাজন সমন্বিত অতি-কেন্দ্রীভূত উৎপাদন-ব্যবস্থা। অতীতে ব্যক্তি-মানুষ বা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলোর পক্ষে পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকা সম্ভব ছিল। পেছনে চোখ ফেরালে, সে-অতীত যতই সহজ-সরল মনে হোক, আজ তা চিরতরে বিলুপ্ত। একথা বললে খুব একটা অতিশয়োক্তি হবে না যে, সমগ্র মানবজাতি এখনই গ্রহব্যাপী উৎপাদন ও ভোগভিত্তিক একটা সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

আমি এখন মূল বক্তব্যে পৌঁছে গিয়েছি, যেখানে দাঁড়িয়ে বর্তমান যুগ-সঙ্কটের মৌল কারণ বলে যা আমার মনে হয়েছে—তা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি। এগুলো হচ্ছে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ সম্পর্কিত।

সমাজ-নির্ভরতা সম্বন্ধে ব্যক্তি-মানস আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে। এই নির্ভরশীলতা মানুষের অভিজ্ঞতায় কিন্তু কোনো সদর্থক-সম্পদ, প্রাণময়-বন্ধন বা পালিকাশক্তি রূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠেনি—বরং তার

স্বাভাবিক অধিকাব, এমনকি তাব অর্থনৈতিক অস্তিত্বেব পক্ষে পর্যন্ত ভযেব কাবণ হযে দাঁড়িযেছে। অধিকন্তু, সমাজে তাব অবস্থানটা এমন যে, তাব স্বভাবেব অহংবাদী প্রচেষ্টা (egotistical drives) গুলোই অবিবত বলশালী হযে উঠছে। অন্যদিকে তাব সামাজিক-প্রচেষ্টাগুলো, যা স্বভাবতই দুর্বলতব, তা ক্রমদ্রুতহাবে অবনতিব পথে এগিযে চলেছে। সমাজেব প্রতিটি স্তবেব মানুষই আজ এই অবনতিব কবলে। নিজেদেব অজ্ঞাতসাবে নিজ নিজ অস্মিতায বন্দী-মানুষেবা নিঃসঙ্গতা ও নিবাপত্তাহীনতা-বোধে আক্রান্ত এবং সবল-অকপট ও অকৃত্রিম জীবনবসে বঞ্চিত। নিজেকে একমাত্র সমাজেব হাতে উৎসর্গ কবেই বিপদসঙ্কুল ও স্বল্পায়ু এই জীবনেব সার্থকতা মানুষ খুঁজে পেতে পাবে।

ধনতান্ত্রিক সমাজেব অর্থ নৈতিক নৈবাজ্যই যাবতীয অমঙ্গলেব প্রকৃত উৎস বলে আমাব ধাবণা। চোখেব সামনে দেখতে পাচ্ছি যে, এক বিশালকায উৎপাদক-সম্প্রদাযেব সদস্যবা যৌথশ্রমেব ফল থেকে পবস্পবকে বঞ্চিত কববাব জন্য নিবলসভাবে চেষ্টা ক'বে আসছে। তাবা এ-ব্যাপাবে যে শক্তি প্রযোগ কবছে তা নয, ববং আইনানুগ নিযমকানুনেব প্রতি বিশ্বস্তভাবে অনুগত থেকেই তাবা এ-সব কবছে। এ-সম্পর্কে এ-কথাটা বোঝা অত্যন্ত জরুবি যে, উৎপাদনেব উপকবণসমূহ—অর্থাৎ ভোগ্যপণ্য এবং অতিবিক্ত মূলধন উৎপাদনেব জন্য প্রযোজনীয সামগ্রিক উৎপাদিকাশক্তি—আইনেব চোখে ব্যক্তিগত মালিকানা-ভুক্ত হতে পাবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটেছেও তাই।

পববর্তী আলোচনা সহজবোধ্য কববাব জন্য, আমি উৎপাদন-উপকবণেব অংশীদাব নয এমন শ্রমজীবী মানুষকেই 'শ্রমিক' নামে অভিহিত কবব। যদিও শব্দটিব প্রচলিত অর্থেব সঙ্গে আমাব অর্থেব ঠিক ঠিক মিল হবে না। উৎপাদন-উপকবণেব মালিকেবা আজ শ্রমিকেব শ্রম-শক্তি ক্রযে সমর্থ। উৎপাদন-উপকবণ ব্যবহাবেব মাধ্যমে শ্রমিক যে নতুন পণ্য উৎপাদন কবছে, তা-ও ধনিকেব সম্পত্তিতে পবিণত হচ্ছে। শ্রমিকেব বাস্তব-উৎপাদন এবং তাব প্রকৃত আয, এদেব ভেতবকাব সম্পর্ক হল—এই উৎপাদন-প্রণালীব একটা অপবিহার্য বিষয। যে-পবিমাণে শ্রমচুক্তি স্বাধীন, তাতে শ্রমিক কি পাবে তা তাব দ্বাবা উৎপাদিত পণ্যেব প্রকৃত-মূল্যেব দ্বাবা নির্ণিত হয না, ববং শ্রমিকেব ন্যূনতম প্রযোজনীযতা, কর্মেব জন্য প্রতিযোগী শ্রমিকেব সংখ্যা এবং পুঁজিপতিব

শ্রমশক্তির চাহিদার উপর তা নির্ভরশীল। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা বুঝতে হবে যে, তত্ত্বের ক্ষেত্রে পর্যন্ত শ্রমের মজুরি শ্রমিকের উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত হয় না।

ব্যক্তিগত পুঁজি, মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ছে। এর কারণ হিসেবে আমরা পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতি এবং ক্রমবর্ধমান শ্রমবিভাগের উল্লেখ করতে পারি। ছোট ছোট উৎপাদন-সংস্থাগুলোকে গ্রাস করেই বিশালকায় উৎপাদন-সংস্থা গ'ড়ে উঠছে। এর ফলেই ঘটছে ফাইনান্সিয়াল-অলিগার্কির (financial-oligarchy) উৎপত্তি। যার সীমাহীন আধিপত্যকে গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা পর্যন্ত কার্যকরভাবে প্রতিহত করতে পারে না। একথা সত্য যে, আইন-পরিষদের সদস্যরা রাজনৈতিক দল থেকেই নির্বাচিত হন। এই রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পুঁজিপতিদের অর্থে পুষ্ট এবং তাদের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবান্বিত। পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থেই এইভাবে আইন-পরিষদ ও নির্বাচক মণ্ডলীর মধ্যে একটা ব্যবধান গ'ড়ে তোলে। যার ফলশ্রুতি হচ্ছে, জনগণের প্রতিনিধিরা বাস্তবে কিন্তু জনগণের কম-সুবিধাভোগী অংশের স্বার্থরক্ষায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে না।

অধিকন্তু, বর্তমান পরিস্থিতিতে, ব্যক্তিগত পুঁজির মালিকগোষ্ঠী অবশ্যম্ভাবী কারণেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তথ্য-সরবরাহের প্রধান উৎসগুলোকে (প্রেস, রেডিও, শিক্ষা) নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে, বাস্তবসিদ্ধান্তে (objective conclusions) পৌছনো বা তার রাজনৈতিক অধিকারের বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যবহার একান্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে, এমন কি অনেকক্ষেত্রে তা বাস্তবিকই অসম্ভব।

বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল দুটো চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। প্রথমত—উৎপাদন। উপকরণের (পুঁজি) ব্যক্তিগত মালিকানা এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী মূলধনের নিয়োগ। দ্বিতীয়ত—শ্রমিকের চুক্তিবদ্ধ হবার স্বাধীনতা। অবশ্য এ-অর্থে বর্তমানে খাঁটি ধনতান্ত্রিক সমাজ (pure capitalist society) বলতে কোনো বস্তু নেই। বিশেষ ক'রে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শ্রমিকশ্রেণী সুদীর্ঘ ও তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিশেষ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত

শ্রমজীবী মানুষের জন্য কিছুটা উন্নতমানের স্বাধীন শ্রম-চুক্তি ("free labor contract") অর্জনে সফল হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে যদি দেখা যায়, তাহলে বলতে হয় যে, বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে নির্ভেজাল ধনতান্ত্রিক ("Pure" capitalism) ব্যবস্থার বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

উৎপাদন চালানো হয় মুনাফার জন্য, প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে নয়। সক্ষম ও কর্মে ইচ্ছুক ব্যক্তিমাত্রই কর্মে নিযুক্ত হতে পারবে এমন কোনো সুযোগ নেই। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বরং প্রায় সব সময়ই সেখানে বেকারবাহিনী (army of unemployed) মজুত থাকে। শ্রমিকেরা কর্মচ্যুতির ভয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত থাকে। যেহেতু বেকার এবং স্বল্পবেতনভোগী দরিদ্র শ্রমিকেরা ভোগ্য পণ্যের ক্রেতা হিসেবে বাজার সৃষ্টি করতে পারে না, তাই তার উৎপাদন সীমাবদ্ধ। এবং এর ফলেই গভীর কষ্টের উদ্ভব হয়। শ্রমভার লাঘব অপেক্ষা, প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতি প্রায়শই আরো বেশি বেকারির সৃষ্টি করে। মুনাফা শিকারের প্রবণতা পুঁজিপতিদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে মিশে পুঁজিসংগ্রহ ও নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে এবং দ্রুতহারে গভীর মন্দার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে বিপুল শ্রমশক্তির অপচয় ঘটছে এবং ব্যক্তির সামাজিক-চৈতন্য পঙ্গু হয়ে পড়েছে—যা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি।

আমার বিবেচনায়, ব্যক্তি-মানসের পঙ্গুত্বই হচ্ছে ধনতন্ত্রের সব থেকে অমঙ্গলের দিক। আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাটাই এই অমঙ্গলের দ্বারা আক্রান্ত।

মাত্রাতিরিক্ত প্রতিযোগিতার মনোভাব ছাত্র-সমাজের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। ভবিষ্যৎ-জীবনে উন্নতি-বিধানের প্রস্তুতি হিসেবে, আহরণমূলক সাফল্যকে (acquisitive success) তারা পূজা করতে শিখছে।

আমি নিশ্চিত যে, এই গভীর অমঙ্গলকে বাতিল করবার একটাই মাত্র রাস্তা, তা হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক লক্ষ্যের অভিমুখী একটা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদন-উপকরণের মালিকানা থাকে সমাজের হাতে এবং তার ব্যবহারও হয় পরিকল্পিতভাবে। পরিকল্পিত অর্থনীতি সমাজের চাহিদার সঙ্গে উৎপাদনের সামঞ্জস্যবিধান করবে, কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে কর্মের সুষ্ঠু বণ্টন করবে এবং নর-নারী-শিশু প্রত্যেকের জন্য জীবনধারণের উপযোগী

নিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে। ব্যক্তিজীবনে শিক্ষা, তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সমাজে ক্ষমতা ও সাফল্যের যে-গৌরবগান করা হয় তার পরিবর্তে চারপাশের মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পর্কে ব্যক্তিকে সচেতন করে তুলবে।

সব সময় একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পরিকল্পিত অর্থনীতির অর্থ কিন্তু সমাজতন্ত্র নয়। তথাকথিত পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনেক সময় ব্যক্তিজীবনে পুরোপুরি দাসত্বের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। জটিল ও দুরূহ সব সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের পথেই সমাজতন্ত্রের সাফল্য সম্ভব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুদূরপ্রসারী কেন্দ্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে, আমলাতন্ত্রকে সর্বময় ক্ষমতা ও দাম্ভিকতার হাত থেকে রক্ষা করা কি সম্ভবপর? ব্যক্তি-মানুষের অধিকার রক্ষা ও সেই সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার উপর পাল্টা কোনো গণতান্ত্রিক সমভার চাপানো কি সম্ভবপর?

আমাদের এই পরিবর্তনশীল যুগে, সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য ও সমস্যা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করাই হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যেহেতু, বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি নির্বাধ আলোচনা কঠোর নিষেধের আওতায় এসে পড়েছে, তাই এ-ক্ষেত্রে আমি মনে করি, এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমাজসেবার একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রতিপালিত হবে।

অনুবাদ : চার্বাক সেন

সার্তের সাম্প্রতিক দর্শনচিন্তা

মৃণালকান্তি ভদ্র

১৯৬০এ প্রকাশিত Critique of Dialectical Reason-এ সার্ত ঘোষণা করলেন, বর্তমান যুগের একমাত্র দর্শন হল মার্কসবাদ। অস্তিবাদ তার উপর নির্ভরশীল একটি মতবাদ মাত্র, যা ভিতর থেকে মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ-বিকাশকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। এই মতবাদ মার্কসবাদের বিরোধিতা করলেও, তার মধ্যেই মিলিত হতে চাইছে। Critique of Dialectical Reason-এর প্রথমে সার্ত একটি আলাদা প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট করেছেন, যে-প্রবন্ধের নাম হল Question of method বা Problem of method। এই প্রবন্ধে সার্ত দেখাতে চেষ্টা করেছেন, অস্তিবাদ কিভাবে সুষ্ঠু পদ্ধতির সাহায্যে মার্কসবাদের আরও যথাযথ প্রয়োগ ক'রে ব্যক্তি-মানুষ, সমাজ এবং ইতিহাসের সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারে। পরের অংশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের কথা ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কিভাবে ইতিহাস গড়ে উঠছে, তা সার্ত আলোচনা করবেন Critique of Dialectical Reason-এর দ্বিতীয় পর্বে, যা এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত।

এই গ্রন্থে সার্ত কান্টের মতোই মানুষের যুক্তির প্রকৃতি, ক্ষমতা এবং সীমা নির্ধারণ করতে চান। তবে হেগেলের কাছেই তিনি বেশি ঋণী। তিনি বলতে চান মার্কসবাদের মধ্য দিয়ে অস্তিবাদ হেগেলের কাছ থেকে দুটি বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে: (১) সত্য বিকাশ লাভ করে এবং ঘটনার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। (২) সত্য হল সমগ্রীকরণ। হেগেলে যেমন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পর্বে সত্য গড়ে উঠছে এবং শেষ পর্যন্ত সার্বিক সত্তার সম্পর্কেই সত্য নির্ণীত হচ্ছে, সার্ত অবশ্য সেরকম সার্বিক সত্তা মানেন না। তবে তিনি বলেন, ইতিহাসে প্রত্যেক পর্বে এই সমগ্রীকরণ চলেছে এবং সত্যকে বিচার করতে হবে ইতিহাসের সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে। সার্তও মনে করেন, ইতিহাসের ঘটনার দ্বন্দ্বে সমাজ বিকশিত হচ্ছে এবং পরের যুগের সমন্বয় দ্বন্দ্বকে অতিক্রম ক'রে

যাচ্ছে। এই ইতিহাসের বিকাশ এবং সত্যের গঠন সার্ত পরের পর্বে আলোচনা করবেন বলে, সে সম্বন্ধে কিছু বলেননি। তবে তাঁর ধারণা, বর্তমান বিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞানের পদ্ধতি দিয়ে ইতিহাসের এই বিকাশকে বোঝা যায় না। তা বুঝতে পারা যাবে এক নতুন ধরনের যুক্তি দিয়ে, যা বাস্তব অবস্থা এবং জ্ঞানের দ্বন্দ্বের উপর নির্ভর করে। বাস্তব ইতিহাসে যে সমগ্র রূপ গড়ে উঠছে, তাই চেতনার মাধ্যমে সত্যকে সৃষ্টি করছে। তাই, বাস্তব অবস্থা এবং চেতনার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দ্বন্দ্বের উপলব্ধি যার দ্বারা হয়, তাই দ্বান্দ্বিক যুক্তি। সার্ত মনে করেন, মার্কসবাদকে যথাযথ প্রয়োগে বাধ্য ক'রে অস্তিবাদ এই যুক্তির স্বরূপকে ব্যখ্যা করতে পারবে। দ্বান্দ্বিক যুক্তি তাই অস্তিবাদ দ্বারা সংস্কৃত মার্কসবাদের প্রয়োগ। Problem of method-এর প্রথম অধ্যায়ে সার্ত মার্কসবাদ এবং অস্তিবাদের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক যুগেই বিশেষ কোনো দর্শন সে-যুগের ইতিহাসের ধারাকে প্রকাশ করতে চায়। এরই মধ্য দিয়ে সেই যুগে আবির্ভূত শ্রেণী নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়। ধনতন্ত্রের গোড়ার যুগে ধনিক ব্যবসায়ীরা দেকার্তের দর্শনের মধ্যে নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিল। এক শতাব্দী পরে শিল্পায়ণের প্রথম দিকে শিল্পপতি, যন্ত্রবিদ এবং বৈজ্ঞানিকরা কাণ্টের সার্বজনীন মানুষের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু দর্শনের ভিতর দিয়ে যুগের সমস্ত জ্ঞানকে প্রতিফলিত হতে হয় বলে, দর্শন এমন কতগুলি নির্দেশক কাঠামো গ'ড়ে তোলে, যার দ্বারা যুগের নব-উত্থিত শ্রেণীর সমস্ত ধারণা রূপায়িত করা যায়। সামাজিক আন্দোলনে জন্ম নিয়ে দর্শন তার ঐক্যের প্রয়াসকে বহুদূর নিয়ে যায়। যে-উদ্দেশ্য দর্শনকে গ'ড়ে তোলে, তা যতদিন সজীব থাকে, ততদিনই দর্শনের কার্যকারিতা থাকে। প্রত্যেক যুগের দর্শন যে-ইতিহাসকে ব্যক্ত করে, তাকে অতিক্রম করা যায় না বলে, যুগের দর্শনকেও অতিক্রম করা যায় না। আজকের দিনে মার্কসবাদ হচ্ছে যুগের দর্শন, কারণ তা বর্তমানের যুগের উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করছে। কিন্তু দর্শনে যখন কোনো সঙ্কট দেখা যায়, তা সামাজিক সঙ্কটের প্রকাশ। ইতিহাসের গতি সকল পর্যায়ের মানুষের সংগ্রামবন্দী চিন্তাকে মুক্ত ক'রে এই সঙ্কট দূর করতে পারে। সার্ত মনে করেন, মার্কসবাদের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ায় যে-সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তা এই জাতীয় সঙ্কট। প্রত্যেক বিরাট দর্শনের পর্বে এমন কোনো কোনো মতবাদ দেখা যায়, যা মূল দর্শনকে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে। অস্তিবাদ এমনি একটি

মতবাদ, যা মার্কসবাদের সমালোচনা করলেও তার মধ্যেই সন্নিবিষ্ট হতে চায়।

হেগেল এবং কিয়েরকেগার্ডের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সার্ত বলেছেন, হেগেল ব্যক্তিকে বাস্তব এবং জ্ঞানের দ্বন্দ্বের মধ্যে বিকশিত করতে চাইলেও, তাকে সার্বিক সত্তার প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন। ফলে, ব্যক্তির সুখ-দুঃখ, একাকিত্ব, মানব-অস্তিত্ব প্রাধান্য পায় নি এবং তাই কিয়েরকেগার্ড বোঝাতে চেয়েছেন। ব্যক্তি-অস্তিত্বকে যুক্তির কাঠামোয় নিঃশেষিত করা যায় না। মানুষের অস্তিত্বকে যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞান দিয়ে বোঝা যায় না। আমাদের যুগে মানুষ যখন উৎপাদন-সম্পর্ক এবং উৎপাদন-যন্ত্রের দ্বন্দ্বে তার উৎপাদিত পণ্য থেকে বিযুক্ত, তখন তাকে বুঝতে গেলে এই দ্বন্দ্ব সে কিভাবে জীবনে উপলব্ধি করছে, তা জানতে হবে। হেগেলের যে-ধারণায় মানুষ বাস্তব জগতে নিজেকে পরিবর্তিত করতে চায়, সেখানে ভুলটা হল এই যে, বাস্তব জগত এবং ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বটা তিনি বুঝতে পারেন নি। মার্কস হেগেলের এই ভুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মার্কসের ধারণায়ও, ব্যক্তি-জীবনকে জ্ঞানে পরিণত করা যায় না। ব্যক্তির প্রতিটি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবন গড়ে উঠছে এবং তার প্রত্যেক পর্বই বাস্তব। অস্তিবাদও যখন ব্যক্তির মূর্ত জীবন-দর্শনের কথা বলতে চায় এবং মার্কসও যখন ব্যক্তির জীবনকে তার উদ্দেশ্য ও সংগ্রাম দিয়ে বুঝতে চান, তখন অস্তিবাদের পৃথকভাবে টিঁকে থাকবার দরকার কি ?

হাঙ্গেরির মার্কসবাদী দার্শনিক লুকাকস্ মনে করেন, বুর্জোয়াশ্রেণী ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ভাববাদকে বর্জন ক রে তার ফলগুলিকে আঁকড়ে থাকছে একটি 'তৃতীয় পথ' খুঁজে পাবার জন্য। সার্ত মনে করেন, আগে থেকে গড়ে নেওয়া এই ধারণা মার্কসবাদের ক্ষতি করছে। কিন্তু আজকের দিনে বহু দার্শনিক যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে মেনেও অস্তিবাদকে প্রয়োগ করতে চাইছেন, তার কারণ একটি সামাজিক দ্বিমুখী আকর্ষণ, যা লুকাকস্ ধরতে পারেন নি। বুর্জোয়া চিন্তাধারাকে বিনষ্ট করলেও, যে-পরিবেশে আজকের মানুষ অবস্থিত, তাকে মার্কসবাদ ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে পারছে না, কারণ তার গতি আজ অবরুদ্ধ। সোভিয়েত ইউনিয়নের গঠনের পর্যায়ে, প্রয়োগের প্রাধান্যে তত্ত্ব থেকে তার বিচ্যুতি ঘটে, ফলে তত্ত্ব-বিহীন অভিজ্ঞতার সমষ্টি এবং প্রয়োগ-বিহীন তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। আজকের মার্কসবাদীদের কাছে, সার্তের অভিযোগ, তাঁরা বাস্তব সমগ্রকে বর্জন করেন। কিন্তু সজীব মার্কসবাদ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তত্ত্বের মিলন ঘটায়, প্রত্যেকটি বিশেষের সঙ্গে

সমগ্রেব যোগ কোথায ধবতে চেষ্টা কবে। কিন্তু আজকেব মার্কসবাদ বিশেষ বাস্তব ঘটনাকে অগ্রাহ্য ক'বে একটি তত্ত্বেব বা ধাবণাব কাঠামোয ছোট-খাট ঘটনাকে বিবেচনা কবতে চায যা মার্কস কখনও কবেন নি। মার্কস নেপোলিযনেব অভ্যুত্থানেব সময মধ্যবিত্তশ্রেণীব ভূমিকাব যে-আলোচনা কবেছেন, তা থেকেই একথা স্পষ্ট হয। কিন্তু হাঙ্গেবিব ঘটনাব বেলায আধুনিক মার্কসবাদীবা 'সোভিযেত আমলাতন্ত্র' 'শ্রমিক সঙ্ঘ' এই সব শব্দেব উপব এত জোব দিযেছেন যে মনে হয তাঁবা যেন আকাব-গত ব্যাখ্যাব উপব নির্ভব কবছেন। মার্কসবাদেব মুক্ত ধাবণাগুলিকে আজকেব দিনে চবম জ্ঞানে পবিণত মনে কবা হচ্ছে। বিশেষেব মধ্যে সমগ্রকে না খুঁজে বিশেষকে বর্জন কবা হচ্ছে।

মার্কসবাদেব একটি তত্ত্বগত রূপ আছে, যা মানুষেব সমস্ত কর্মজীবনকে বোঝাবাব চেষ্টা কবতে পাবে। কিন্তু তা না ক'বে তত্ত্বগত ধাবণাগুলি ঘটনাকে যেন পবিকল্পিত ধাবণা অনুযাযী একটি বিশেষ রূপ নিতে আদেশ কবছে। আমেবিকান সমাজতত্ত্বে অভিনব ঘটনাসংগ্রহ থাকলেও তত্ত্বগত নিশ্চযতা নেই, মনঃসমীক্ষণেও তত্ত্বগত প্রতিষ্ঠা নেই। এই অবস্থায অস্তিবাদ নতুন কিছু কবতে চাইছে। মার্কসবাদ মানুষকে ধাবণায সীমাবদ্ধ বেখেছে কিন্তু অস্তি-বাদ সব জাযগায—বাস্তায, বাডিতে, তাব কাজেব মধ্যে—তাকে খুঁজছে। কিন্তু মার্কসেব মূল বক্তব্য তা নয। মার্কসবাদ আজ ইতিহাসকে অন্ধকাবে পাঠিযে, পবিবর্তনকে যুক্তিগত অচলতায পবিণত কবেছে। কিন্তু এব অর্থ এই নয, মার্কসবাদ স্থবিব হযে পডেছে, ববং তাব তারুণ্য এখনও অক্ষুণ্ণ। যে-পবিস্থিতিতে এই দর্শনেব জন্ম, তা এখনও অতিক্রান্ত হযনি। অস্তিবাদও মার্কসবাদেব মতো দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাব মধ্যে বাস্তব সমন্বযকে পেতে চায, যাব মধ্য দিযে সত্য গডে ওঠে। বিশেষ ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে অর্থহীন, আংশিক সমগ্রতাব মাধ্যমে তা সমগ্রতাব গতিশীল ইতিহাসেব সঙ্গে যুক্ত। সার্ত বলেন, মার্কসবাদেব মতো তিনিও মনে কবেন "অস্তিত্ব চেতনাব পূর্বে"। আজকেব দিনেব যথার্থ জ্ঞানতত্ত্ব বলতে চায, বৈজ্ঞানিক তাব পবীক্ষা-বীতিব অংশ। এ-থেকে বোঝা যায, মানুষ জগতেব মধ্যে অবস্থিত এবং বিশেষ কোনো পবিস্থিতিব সঠিক উপলব্ধিব জন্য যে উদ্দেশ্য তাকে পবিবর্তিত কবছে, তা জানা দবকাব। তাব অর্থ এই নয, চেতনাই কাজেব উৎস, কিন্তু কাজেব রূপাযণে তাব একটি অনিবার্য ভূমিকা আছে। সার্তেব ধাবণা, জ্ঞানতত্ত্ব মার্কসবাদেব দুর্বল অংশ। কাবণ মার্কস

যখন বলেন, জডবাদে প্রকৃতি যেমন, অন্য কোনো উপাদান ব্যতীত, তেমনভাবে জানাই ঠিক জ্ঞান, তখন প্রকৃতি থেকে মানুষ বাদ চলে যাচ্ছে, যদিও বাস্তব জগতে মানুষ বয়েছে। লেনিন অবশ্য বলেছেন, "চেতনা বাস্তবেব প্রতিফলন, সবচেযে ভালো জাযগায যতটা সম্ভব যথার্থ প্রতিফলন।" সার্ত মনে কবছেন, একদিকে মার্কসবাদ জগতে যৌক্তিকতাব তত্ত্ব বিশ্বাস ক'বে গঠনকাবী চেতনায বিশ্বাস কবছে, অন্যদিকে, চেতনাকে প্রতিফলন বলে মনে কবছে। প্রথমটি যদি ভাববাদ হয, দ্বিতীযটি সংশযবাদ। এতে মানুষ ও ইতিহাসেব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। চেতনা ও বাস্তবকে পাবস্পবিক সম্পর্কে ঠিকমতো বজায বাখতে হলে মনে বাখতে হবে, চেতনা বাস্তব ইতিহাসেব একটি পর্যায, যেখানে বহির্জগতকে অন্তবীকবণ কবা হচ্ছে। অর্থাৎ বাস্তব ঘটনা চেতনাব বিশেষ গ্রহণে যে-রূপ পাচ্ছে, তাই বাস্তব। 'শ্রেণীচেতনা' শুধু যে-দ্বন্দ্ব শ্রেণীকে বিশিষ্ট করছে, তাব বাস্তব-জীবন রূপাযণ নয, যে-উদ্দেশ্য এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম কবতে চাইছে, তাও, তাই সেখানে শ্রেণীদ্বন্দ্বও আছে, তাব অস্বীকৃতিও আছে। মার্কস যখন বলেন, 'বাস্তব জীবনে উৎপাদন-পদ্ধতি সামাজিক, বাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনেব উপব সাধাবণত প্রাধান্য বিস্তাব কবে', তখন বাস্তব ও চেতনাব দ্বন্দ্বেব পাবস্পবিক সম্পর্কেব কথাই বলেন। সার্তেব মতে, এই হল মার্কসীয জডবাদ। মার্কস বলেছেন, "প্রযোজন এবং বাস্তব কাবণেব দ্বাবা নিযন্ত্রিত কাজ যতদিন চলবে, ততদিন স্বাধীনতাব যুগ আসবে না, অতএব, তা বাস্তব উৎপাদনেব গণ্ডীব বাইবে।" সার্তও মনে কবেন, এখনও মানুষ অভাবেব দাসত্ব থেকে মুক্তি পাযনি।

মার্কসেব 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে জডবাদেব যে সংজ্ঞা আছে, সার্ত তা গ্রহণ কবলেও তিনি মার্কসবাদী নন, কাবণ এঙ্গেলস ও ফবাসী মার্কসবাদী গাবোদি জডবাদেব মূল সূত্রগুলিকে নির্দেশক নিযম হিসেবে ব্যবহাব কবেছেন, অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কবেন নি। এবই ফলে, লুকাকস্ হাইডেগাবেব দর্শনকে নাৎসিবাদেব প্রেবণায কর্মবাদ বলে বিচাব কবেন, অথচ ফবাসী অস্তিবাদেব মধ্যে জার্মান বিবোধেব সময মধ্যবিত্তেব বিদ্রোহকে তিনি দেখতে পান নি, কিন্তু ইযাসপার্সেব অস্তিবাদ তো নাৎসিবাদেব সঙ্গে আপোষ কবে নি। সার্ত যখন তাঁব বই লিখছিলেন, তখনও জার্মানদেব বিরুদ্ধে সংগ্রাম আবম্ভ হযনি। সার্ত মনে কবেন, ব্রেনটানো থেকে হুসার্ল ও হাইডেগাব পর্যন্ত একটি বিশেষ "দেশ ও কালগত ইতিহাস" আছে, যাব অন্তর্দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা কবা যায না।

হুসার্লের প্রদত্ত বস্তু-বিজ্ঞান পদ্ধতি হাইডেগারের মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েও কিভাবে টিঁকে আছে, তার জটিলতাকে বুঝতে হবে। মার্কসবাদীরা একটি উদ্দেশ্যগত ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে ইতিহাসের স্বরূপ বুঝতে পারছে না। বিশেষ ঘটনাকে বিমূর্ত সামান্যের মধ্যে নিঃশেষিত করা হচ্ছে। আধুনিক মার্কস-বাদীরা বুর্জোয়া চিন্তার মূর্ত রূপকে না বুঝে তাকে একটি ভাববাদে পর্যবসিত করছেন।

তবে অন্তত একজন মার্কসবাদীকে সার্ত্র পেয়েছেন, যিনি ইতিহাস ও সমাজবিদ্যাকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে বুঝতে পেরেছেন, তিনি হচ্ছেন আঁরি লেফেব্র্। তিনি দুই ধরনের জটিলতার কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হল সমতলীয় জটিলতা—যার মধ্যে একটি মানব-গোষ্ঠীর কৃষি-উৎপাদন-পদ্ধতি, তার সঙ্গে সম্বন্ধ এবং তারা যে-সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলে—সবই আছে। গোষ্ঠী যে সামাজিক কাঠামোর দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাও বাদ যায়নি। এর সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর যোগ আছে। আর একটি জটিলতা ঊর্ধ্বমুখী, তার মধ্যে গ্রাম-জীবনে বিভিন্ন যুগের এবং বিভিন্ন স্থায়িত্বের গঠনের সহাবস্থান রয়েছে। এই দুই জটিলতা একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই সমগ্র জটিলতাকে বুঝতে হলে ত্রি-স্তরীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। প্রথমে, অভিজ্ঞতায় যা পাওয়া যায়, তার বর্ণনা দিতে হবে এবং তা করতে যে-সব সাধারণ নিয়ম আছে, তা মানা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, পশ্চাদমুখী বিশ্লেষণে বিষয়ের ইতিহাস আলোচনা করতে হবে পূর্বের পর্যায়গুলিকে বুঝে তার একটি যথাযথ সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য। তৃতীয়ত, সংশ্লেষক প্রগতিমুখী পদ্ধতিতে অতীত থেকে বর্তমানের ধারা আলোচনা ক'রে বর্তমানকে পুনরাবিষ্কার করতে হবে, যাতে পশ্চাদ্মুখী এবং প্রগতিমুখী বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের পদ্ধতিতে বিষয়ের পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। সার্ত্রের মতে, নৃতত্ত্ববিদ্যার সমগ্র বিভাগে এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির মূর্ত সম্পর্কে এই পদ্ধতির সম্পূর্ণ প্রয়োগ করা যেতে পারে, যা প্রয়োজনমতো মাঝে মাঝে সংশোধন করা যায়।

গত শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী মধ্যবিত্তের একটি বাস্তব গোষ্ঠী থেকে কিভাবে ভ্যালেরির উদ্ভব হল, তা অর্থনৈতিক কাঠামো এবং মধ্যবিত্তের ধনিকের সঙ্গে দোলায়মান সম্পর্ক দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না। সমসাময়িক সমাজের সাধারণ ব্যাখ্যা হিসেবে এই তত্ত্ব সত্য হতে পারে, কিন্তু আমরা ব্যক্তি-ভ্যালেরিকে বুঝতে চাই।

ভ্যালেরির মতাদর্শকে ভাববাদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে নিজেকে বিশিষ্ট করে তুলছে এমন একজন ব্যক্তির মূর্ত ও একক সৃষ্টি হিসেবে দেখতে হবে, কিন্তু তার বিশেষ-ব্যক্তিত্বকে যে-মূর্ত-গোষ্ঠী থেকে তার উদ্ভব, তার সম্পর্কে বুঝতে হবে। ভ্যালেরি একজন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী নিশ্চয়ই, কিন্তু যে কোনো মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীই তো ভ্যালেরি নয়। মার্কসবাদে যা অনুপস্থিত, তা হল মাধ্যমগুলির স্তরবিন্যাস, যা কী প্রক্রিয়াতে একজন ব্যক্তি ও তার সৃষ্টি ইতিহাসের বিশেষ কালে একটি বিশেষ সমাজে উদ্ভূত হয়, তা বুঝবার জন্য দরকার। কিন্তু এই বিশেষ ব্যক্তির উদ্ভবের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী বলবেন, বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থায় ও-রকম ব্যক্তি যে কেউই হতে পারে। ঐ ব্যক্তি যে ভ্যালেরি হয়েছেন, সেটা আকস্মিক। যেমন এঙ্গেলস বলেন, নেপোলিয়ঁর স্থান আর যে কেউ নিতে পারত। কিন্তু অস্তিবাদ বিশেষ ব্যক্তির ভূমিকাকে বোঝবার জন্য বিভিন্ন স্তরগুলিকে উপলব্ধি করতে চায়। আধুনিক মার্কসবাদীরা দেখান, ফ্লবেয়েরের বাস্তবতায় মধ্যবিত্তের সামাজিক এবং রাজনৈতিক চেতনার একটি দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি কি ক'রে হল, তা তাঁরা ব্যাখ্যা করেন না। ফ্লবেয়র যে বুর্জোয়া ভাবপ্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন, তার কারণ শৈশব থেকেই না জেনেই তাঁকে বুর্জোয়ার ভূমিকা নিতে হয়েছে। কিন্তু সব পরিবারের মতো তাঁর পরিবারেও অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল, যা তাঁকে বুর্জোয়া আদর্শে শিক্ষানবিশি করিয়েছিল। তাঁর পরিবারের বিশিষ্টতা ছিল, রাজতন্ত্রের পুনরভ্যুত্থানের ধর্মীয় জাঁকজমকের সঙ্গে তাঁর পিতার ধর্মে অবিশ্বাস—তিনি ছিলেন বিপ্লবের মধ্যবিত্ত সন্তান।

সার্ত্রের মতে, মনঃসমীক্ষণই শিশু কি ক'রে তার উপরে ন্যস্ত মাতা-পিতার ভূমিকাকে গ্রহণ করে, তা ব্যাখ্যা করতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে পুরো ইতিহাসটা খুঁজে পাওয়া এভাবেই সম্ভব হয় এবং এর সঙ্গে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিরোধ নেই। মধ্যবর্তী স্তরগুলিকে বুঝতে পারলেই জানা যাবে, কি ক'রে সামান্য বিমূর্ত সূত্র থেকে একক ব্যক্তিতে উপনীত হওয়া যায়। মনঃসমীক্ষণ একটি মানুষ তার শ্রেণীতে কোন অংশে অবস্থিত, তা আবিষ্কার করতে পারে, কারণ যে-পরিবারে শিশু বড় হয়, তা শ্রেণী ও ব্যক্তির মধ্যবর্তী। মানুষ নিজের আত্মবোধ কি ক'রে হারিয়েছে, আজকের দিনে তা অস্তিবাদ ও মনঃসমীক্ষণের সাহায্যেই মার্কসবাদ বুঝতে পারে। শৈশবের প্রথম দিকে বাস্তব অবস্থার যে অন্তরীকরণ হয়, তাতে একদিকে বাস্তব পরিবেশ ও অন্যদিকে শৈশব যা গ'ড়ে

তোলে তার প্রভাবের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব চলে। মনঃসমীক্ষণ দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিকে অন্বেষণ করে, তাই ফ্লবেয়ার-এর রচনাকে তাঁর শৈশবের বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে বুঝতে হবে।

সমাজ-বিদ্যায় সমগ্রীকরণের কথা বলা হয়, কিন্তু সেখানে শুধু বাস্তব-অবস্থার যোগফলকেই গণ্য করা হয়, যা থেকে সমাজতাত্ত্বিক বহিষ্কৃত। সমাজ-বিদ্যায় গোষ্ঠীকে একটি স্বতন্ত্র ঐক্য মনে করা হয়, সমগ্রকে সমাপ্ত ভাবা হয়, দ্বান্দ্বিক সংঘাতকে বাদ দেওয়া হয় এবং সমাজতাত্ত্বিক ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক বর্জন করা হয়। আসলে কিন্তু, সমাজতাত্ত্বিক ও তার বিষয় একটি যুগ্ম এবং একটিকে বুঝতে হলে ইতিহাসের বিশেষ কালে অপরটিকেও বুঝতে হবে। সার্ত্রের কাছে গোষ্ঠীর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, মার্কসবাদের মতো তিনি মনে করেন, গোষ্ঠী বিভিন্ন সম্পর্কের সমবায় এবং বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যবর্তী সম্পর্ক। গোষ্ঠীজীবনের আলোচনায় দেখা যায়, পূর্ণ সমগ্রতা কখনও পাওয়া যাচ্ছে না, যতটুকু সমগ্রতা পাওয়া যাচ্ছে, আবার তা অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। সার্ত্র মার্কসবাদে নতুন কোনো পদ্ধতি আনতে চাইছেন না, বরং তাঁর ধারণা একটি সমন্বয়েই সমতলীয় ও ঊর্ধ্বমুখী সমগ্রতা পাওয়া দ্বান্দ্বিক দর্শনের লক্ষ্য। মার্কসবাদ যেদিন সমাজ-গবেষণায় এই বিশেষ ব্যক্তির ভূমিকাকে স্বীকার ক'রে মানবিক রূপ লাভ করবে, সেদিন অস্তিবাদের আর থাকবার দরকার হবে না।

সার্ত্র এঙ্গেলসের বক্তব্য "মানুষ একটি পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে" মোটামুটি গ্রহণ করেন। এই বক্তব্যের অনেক রকম ব্যাখ্যা হয়। যান্ত্রিক মার্কসবাদের ধারণা মানুষ পরিবেশের নিষ্ক্রিয় সৃষ্টি এবং যে-সমস্ত ঘটনা তাকে নিয়ন্ত্রিত করে, তা শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক। যেভাবে জড়বস্তুর পরিবর্তন ঘটে, প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে, মানুষ সেইভাবে সমাজকে পরিবর্তিত করে। সার্ত্রের মতে, যথার্থ মার্কসবাদ বলতে চায়, ইতিহাসের বিশেষ পর্বে মানুষ পরিবেশের সৃষ্টি, কিন্তু সে-পরিবেশ মানুষের সৃষ্টি। মানুষ প্রাক্ অবস্থার ভিত্তিতে (যার মধ্যে অর্জিত বৈশিষ্ট্য, কর্মপদ্ধতি, আত্মবোধশূন্যতা ইত্যাদি আছে) ইতিহাস রচনা করে, কিন্তু ইতিহাসের স্রষ্টা মানুষ, প্রাক্ অবস্থা নয়। পূর্ববর্তী অবস্থা অবশ্য একটি বিশেষ দিক এবং বাস্তব অবস্থা নির্দেশ করে, যার উপর নির্ভর ক'রে পরিবর্তন হয়। কিন্তু সমাজে পরিবর্তনকে চালিত করে যে মানবিক উদ্দেশ্য, তা এই সমস্ত বাস্তব অবস্থাকে গ্রহণ ক'রেও তাতে নিঃশেষিত

হয় না। অবশ্য সব সময় মানুষ তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে না, কিন্তু তার অর্থ এই নয়, আমি ইতিহাসে কোনো ভূমিকা নিচ্ছি না। মার্কসের চিন্তায়, বহির্নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে প্রগতিমুখী সমন্বয়ের ঐক্যের সংযোগ ঘটেছে এবং এই ঐক্যই মানবিক উদ্দেশ্য। বহির্নিয়ন্ত্রণ এবং উদ্দেশ্য যা বহির্পরিবেশকে অন্তরীকৃত করছে, তাকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। মানুষ যে ইতিহাস সৃষ্টি করে, তা সকল মানুষের কর্ম-সমষ্টি, কিন্তু এই সামগ্রিক বাস্তব সৃষ্টির সঙ্গে নিজেদের সঙ্কল্পের যোগ সাধিত না হলে, তাকে অপরিচিত শক্তি মনে হয়। শ্রেণীসচেতন হয়েই শ্রমিকশ্রেণী ইতিহাসের স্রষ্টা হয় এবং শোষিতশ্রেণীর ঐক্যের ভিতর দিয়েই শ্রেণী-দ্বন্দ্ব কমে আসবে। আজ বিভিন্ন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাকে বড় ক'রে দেখে তাদের ঐক্যকে তুচ্ছ করা ভুল হবে। আমাদের কালে সব জায়গায় হয়তো ইতিহাস-সচেতনতা নেই, কিন্তু ইতিহাস বা বাস্তব অবস্থা আমাদের বিরোধী শক্তি নয়। ভবিষ্যতের সমগ্রতার লক্ষ্যেই ইতিহাসকে পুনরাবিষ্কার করা যেতে পারে এবং তা হল ইতিহাসের বিভিন্ন অর্থকে এক সমগ্রের দিকে নিয়ে যাওয়া, যেখানে বাস্তব মানুষ একযোগে ইতিহাস রচনা করবে, আর ইতিহাস বলতে বাস্তব মানুষের সমবেত কাজকে বোঝাবে।

মানুষ বাস্তব পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বাস্তব অবস্থার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সে জড় বস্তু নয়, তার বিশেষ কাজ সমাজের দেহে প্রবিষ্ট হয়ে প্রদত্ত অবস্থার ভিত্তিতে পরিবর্তন আনে। সে পরিবেশকে অতিক্রম করতে পারে, যদিও যে-পরিবেশ সে গড়ে তুলেছে, তা তার নিজের বলে মনে না হতে পারে। এই অতিক্রান্তির মূলে রয়েছে মানুষের প্রয়োজন। মার্কেসান আদিম-জাতিদের মধ্যে রমণীর সংখ্যা কম হওয়ায়, সেখানে এক রমণীর সঙ্গে বহু পুরুষের বিবাহ হয়। কিন্তু এই যে অভাব, এটাও একটি সামাজিক অবস্থা, যার সমাধান মানুষ করতে চায়। প্রত্যেক কাজকে বুঝতে হবে যে বর্তমান অবস্থা তা নিয়ন্ত্রণ করছে তার এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের দ্বারা। এইটেই হল উদ্দেশ্য। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে উদ্দেশ্য নঙর্থক, কিন্তু বাস্তব অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে লক্ষ্যে পৌছনো যায় বলে তা নঙর্থকের অস্বীকৃতি। তাই উদ্দেশ্য একই সঙ্গে অপ্রাপ্তি এবং প্রাপ্তি। অতএব মানুষকে বুঝতে হলে বাস্তব অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে সে যে সম্ভাবনার দিকে যাচ্ছে, তার সঙ্গে তাকে যুক্ত ক'রে বুঝতে হবে। তবে বাস্তব অবস্থায় সম্ভাবনার গণ্ডিকে নির্দিষ্ট ক'রে দেয়। তার সম্ভাবনা

সীমাবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু তা সব সময়ই আছে। বর্তমান অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে অনেক সম্ভাবনার মধ্যে একটিকে সাধিত ক'রে মানুষ ইতিহাস-গঠনে অংশ নেয়। এই উদ্দেশ্য ব্যক্তি না জানতে পারে, কিন্তু তা থেকে যে সংঘাত গ'ড়ে ওঠে, তাই ঘটনাপ্রবাহকে গতি দেয়। সম্ভাবনার দুটি দিক আছে, একদিকে তা অজানা লক্ষ্য, যা এখনও সাধিত হয়নি, আর একদিকে তা বাস্তব ভবিষ্যৎ বলে গোষ্ঠীকে আকর্ষণ করে। আবার, কিছু সম্ভাবনা আছে যা মানুষের কাছে রুদ্ধ। সামাজিক সম্ভাবনাগুলি ব্যক্তির ভবিষ্যতের মূলসূত্র এবং তাকে অন্তরীকৃত ক'রেই ব্যক্তি ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলে। কি ক'রে বাস্তব এবং ব্যক্তির এই দ্বন্দ্ব চলে, তা সার্ত্র আলোচনা করছেন না। তার জন্য বহিঃপরিবেশের অন্তরীকরণ এবং অন্তঃপরিবেশের বহির্করণের যুক্ত প্রয়োজনীয়তা দেখানো দরকার। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল বাস্তব অবস্থা থেকে অন্তরীকরণের মধ্য দিয়ে আবার বাস্তবে যাত্রা। বাস্তব অবস্থা অতিক্রম ক'রে বাস্তবে যাওয়ার মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্য পরিবেশের বাস্তব অবস্থা এবং সম্ভাবনাসমূহের বাস্তব কাঠামোর মধ্যে ধৃত। বাস্তব প্রক্রিয়াতে ব্যক্তি একটি আবশ্যিক ক্ষণ, আবার ব্যক্তি-চেতনায় বাস্তবও একটি অবশ্যম্ভাবী ক্ষণ।

বাস্তব ঘটনা সব সময়ই অভিজ্ঞতা-লব্ধ বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত। দ্রব্য-মূল্যের বৃদ্ধিতেই শ্রমিকরা প্রতিবাদ জানায় না, তাদের দৈনন্দিন জীবনে অসুবিধা হলেই তবে জানায়। কিন্তু অভিজ্ঞতা হওয়া মাত্রই বাস্তব পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথা ওঠে। জীবন-অভিজ্ঞতায় শুদ্ধ ব্যক্তিত্ব থাকে না, বাস্তব পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই হতাশা থেকে বাঁচা যায়। তাই ব্যক্তিচেতনায় যে-বাস্তব থাকে, তাকে অস্বীকার ক'রে নতুন বাস্তব গড়া হয়, যার মধ্যে উদ্দেশ্যের অন্তরীকৃত সত্তা বহিঃপ্রকাশিত হয়ে বাস্তব ব্যক্তিচেতনায় রূপ পায়। দুটি বাস্তব অবস্থার মধ্যে যে মানবিক উদ্দেশ্য থাকে, তাই ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করে। মার্কসবাদ প্রকৃতি ও মানুষের এই দ্বন্দ্বকে বুঝতে চেষ্টা না ক'রে মানুষ ও পরিবেশকে এক সরলরেখায় একই প্রকৃতিতে অবস্থিত বলে ধরে নিয়েছে। এই দ্বন্দ্বই Critique-এর বিচার্য বিষয়, কিন্তু তা করবার আগে সার্ত্র তিনটি কথা বলতে চান যা আমাদের অস্তিবাদের সমস্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবে।

১। যে-বাস্তব অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে আমরা প্রতি মুহূর্তে বাঁচি, সার্ত্র মনে করেন তাকে আমাদের অস্তিত্বের বাস্তব উপাদান দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ তার মধ্যে আমাদের শৈশবের পারিবারিক অভিজ্ঞতা আছে,

এবং সেই স্তবেই আমাদেব সামাজিক ভূমিকাগুলি আমবা শিখে নিই।
শৈশবেব বিদ্রোহ এবং যে-পবিবেশ আমাদেব জীবনকে অবরুদ্ধ কবতে চায়, তা থেকে বেবিয়ে আসবাব প্রচেষ্টায় আমাদেব চবিত্র অঙ্কিত হয়। এই স্তব থেকে মুক্ত হতে চাইলেও তা মানস-জীবনে থেকে যায় এবং অস্তিত্বেব সম্ভাবনাকে রূপ দিতে গিয়ে পুবাতন দ্বন্দ্বগুলি প্রকাশ হয়ে পড়ে। আমবা নতুন কোনো সম্ভাবনা গ'ড়ে তুলতে গিয়ে শ্রেণী-চবিত্রকে অতিক্রম কবতে চাই, কিন্তু আমাদেব আচবণেব মধ্যে শ্রেণী-চবিত্র রূপ পায়। যে সামাজিক ব্যবস্থাব স্তবে আমাদেব এই দ্বন্দ্ব, তাব মধ্যে আমাদেব আত্মবোধশূন্যতা প্রকাশিত। মার্কস-বাদীবা মানুষেব আত্মবোধশূন্যতাকে জড় বস্তুব নামান্তব ভেবেছেন। কিন্তু মার্কস যা বলতে চান, তা হল অস্তিত্বেব বাস্তব উপাদানগুলিকে মানব-জীবনেব ভিত্তিতেই আমবা গ্রহণ কবতে বাধ্য। কৃপণতাকে ম্যালথুসীয় অর্থ-নীতিব ফল হিসেবে বিচাব না ক'বে এটাও দেখা উচিত কৃপণভাবেব মধ্য দিয়ে জগতে ব্যক্তি নিজেব পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা কবছে। অর্থনৈতিক ঘটনাব পবি-প্রেক্ষিতে বিশেষ আচবণগুলিব বাস্তব প্রকাশকে ভুললে চলবে না। শৈশবে ভবিষ্যতকেও আমবা জীবনে নিয়ে থাকি, কাবণ আমবা যা কবি, তাব ব্যাখ্যা হতে পাবে কি হবে তাব ভিত্তিতে। উদ্দেশ্যে তাই "কেন" এবং "যে-বিশেষ আচবণে তা রূপ পাচ্ছে",—তা-ই উপাদান হিসেবে যুক্ত হচ্ছে। ব্যক্তিব জীবনে যে-অবস্থা অতিক্রান্ত হচ্ছে, তা পববর্তী স্তবে একীকৃত হচ্ছে। তাই তাব জীবন ঘোবানো সিঁড়িব মতো উপব দিকে চলেছে। ফ্লবেয়েব-এব জীবনে দেখা যায়, বড় ভাই পিতাব স্নেহ পাওয়ায় তাঁব ব্যর্থতাবোধ জেগেছে। পিতাব স্নেহ পেতে ফ্লবেয়েব বড় ভাইকে অনুকবণ কবেছেন, যদিও তা কবেছেন অনিচ্ছায় ও ক্রোধে। বড় ভাই চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ভালো কবেছেন, ফ্লবেয়েব নিজেব স্বাতন্ত্র্য বজায় বাখতে খাবাপ কবেছেন এবং শৈশবেব সঙ্কট কাটাতে এক-একটা স্তবে পূর্বেব অবস্থাকে অতিক্রম ক'বে সাহিত্যব্রত গ্রহণ কবেছেন। তাই সার্ত বলতে চান, আমবা ভবিষ্যতে যা চাই, তা-ই অতীতকে অতিক্রম ক'বে আমাদেব কাজেব ভিতব দিয়ে রূপ পেতে চায়। যে-কোনো সামাজিক সমগ্রতাব ব্যাখ্যায় এই বহুধা-বিস্তৃত আচবণ সমূহেব ব্যাখ্যা ক'বে তাদেব ঐক্যকে খুঁজে বাব কবতে হবে। কিন্তু এই সমগ্রতা ব্যাখ্যায় নতুন যুক্তিবাদ দবকাব।

২। ফ্লবেয়েব অনেক সময় বলেছেন, "মাদাম বোভ্যাবি, আমিই।" তাঁব জীবনীতে পাওয়া যায়, তিনি মেয়েদেব মতোই অস্থিবচিত্ত ও ভীতু ছিলেন।

কিন্তু এই যে নিজেকে বমণী-অভিজ্ঞতাব সঙ্গে অভেদীকবণ, তা শুধু তাঁব জীবনী আলোচনা ক'বে বোঝা যাবে না। ববং তাঁব সাহিত্যকীর্তি ও জীবনীব উপাদানেব মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সমন্বযেব মধ্যে তা খুঁজে পাওযা যাবে। জীবনেব ঘটনাসমূহ তাব সাহিত্যকে নিশ্চযই ব্যাখ্যা কবে, কিন্তু সাহিত্যও জীবনেব দ্বাবা ব্যাখ্যাত হয। জীব ও সাহিত্যেব মধ্যে ব্যবধান আছে। ফ্লবেযব-এব সাহিত্যে তাঁব যে-আত্মবতি পাওযা যায, তা আমাদেব কাছে যে-প্রশ্ন তোলে—তাব উত্তব খুঁজতে হলে যে-পাবিবাবিক জীবন তিনি অতিবাহিত কবেছিলেন, তা পবীক্ষা কবতে হবে। কিন্তু সেখানেও তাঁব ব্যক্তিগত বিচাবকে না উপলব্ধি কবলে তাঁব জীবনকে বুঝব না। আবাব জীবনকে বুঝতে তাঁব সাহিত্যেব দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, যদিও সাহিত্যে জীবনেব প্রতিরূপ পাওযা যায না, কতকগুলি সূত্র পাওযা যায, যা দিযে জীবনেব বহস্যকে উদ্ঘাটনেব চেষ্টা কবা যায। কিন্তু এই বিশ্লেষণেব দিক ছাড়া আব-একটি সংশ্লেষক দিক আছে, যা ভবিষ্যদ্গামী। ফ্লবেযব শৈশবেব অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে নিজেকে সাহিত্য-বচনায নিমগ্ন কবেন এবং বাস্তব অবস্থা থেকে তাঁব বিচ্ছিন্ন সত্তা মাদাম বোভাবিতে প্রকাশিত হযেছে। তাঁব লেখাব উদ্দেশ্য নিজেকে বাস্তব জগতে প্রকাশ কবা এবং বাস্তব ও সামাজিক অবস্থাব স্তবেব ভিতব দিযে যে-সাহিত্য শেষ পর্যন্ত তিনি বচনা কবেছেন, তাব মধ্যে বহুবিধ গঠনেব সমন্বয হযেছে। এই অতীতমুখী ও ভবিষ্যদমুখী বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক পদ্ধতি দ্বাবা অস্তিবাদ বস্তু ও যুগেব সম্পর্ক নির্ধাবণ কবতে চাইছে, যে-সম্পর্ক শুধু পাশাপাশি অবস্থানেব নয, সজীব দ্বন্দ্বেব সম্পর্ক।

৩। প্রত্যেক মানুষ উদ্দেশ্য দ্বাবা নিজেব স্বরূপকে প্রকাশ কবে। যাকে আমবা অস্তিত্ব বলি, তা হল বাস্তব জগতে উদ্দেশ্যকে রূপাযিত কবা। কিন্তু উদ্দেশ্যকে নানাভাবে রূপাযিত কবা যেতে পাবে, কাবণ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পথ বেছে নেয। আব সেখানেই বযেছে স্বাধীনতা। যে-দর্শনে এই স্বাধীনতাকে স্বীকাব কবা হয না, তা মানুষেব সকল কর্ম-প্রচেষ্টাকে বাস্তব অবস্থায রূপান্তবিত কবতে চায। কিন্তু তাতে মানুষেব জীবনেব জটিলতাকে অগ্রাহ্য কবা হয, পবিবর্তনশীলতাকে অচলতায দাঁড কবানো হয। মানুষ প্রত্যেক অবস্থাকে অতিক্রম ক'বে সম্ভাবনাব দিকে এগুচ্ছে। এইভাবে অবস্থা ও সম্ভাবনাব মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে, তা পববর্তী স্তবে সমন্বিত হচ্ছে। অতএব, মানুষেব সাংস্কৃতিক সত্তাকে বাস্তব অবস্থাব সঙ্গে এক কবা যায না, কাবণ বাস্তব অবস্থাকে কাজে

লাগিয়ে নতুন স্তরের সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের আচরণকে বুঝতে হলে বাস্তব অবস্থা থেকে অতিক্রান্ত হয়ে চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের সাহায্যেই তা বুঝতে হবে।

আচরণ-উপলব্ধির একটি উদাহরণ সার্ত দিয়েছেন। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ এই বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে আমার বন্ধুর জানালা খোলাটা বুঝতে পারি তখনই, যখন গরম লাগার অভিজ্ঞতা তার সঙ্গে যুক্ত হয়। দরজা-জানালার একটি বিশেষ উপকরণগত অর্থ আছে, সেগুলি শুধু জড় পদার্থ নয়। বন্ধুর আচরণে যে-ব্যবহারিক জগত প্রকাশিত হচ্ছে—তার দেশ-গত আকার, অভিজ্ঞতা-লব্ধ দেশ এবং জড় বস্তুতে যে উপকরণগত অর্থ সন্নিবিষ্ট হয়েছে—তাই দিয়ে বন্ধুর উদ্দেশ্য বোঝা যায়। বন্ধুর আচরণ ঘরের অভ্যন্তরকে এবং ঘর বন্ধুর আচরণকে বুঝতে সাহায্য করে। আচরণ-উপলব্ধি আমার বাস্তব জীবনের সমগ্রীকরণ যাতে আমি নিজেকে, প্রতিবেশীকে ও পরিবেশকে একটি সমন্বিত ঐক্যে ধরবার চেষ্টা করি। বাস্তব পদার্থের অর্থ আছে, কারণ আমরা অর্থপ্রদান-কারী সত্তা। যে-কোনো সামাজিক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, লক্ষ্যের প্রতি সম্পর্ক মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যার ভিত্তিতে তার আচরণ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝা যায়। আর, লক্ষ্য হল বাস্তব অবস্থা অতিক্রম ক'রে ভবিষ্যতের দিকে যাওয়া।

Problem of method-এর শেষে Critique of Dialectical Reason-এর মূল গ্রন্থ শুরু হচ্ছে। প্রথমে সার্ত একটি ভূমিকাতে গোঁড়া দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ও বিচারমূলক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির তুলনা করেছেন। তাঁর মতে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে কিভাবে ইতিহাস গ'ড়ে ওঠে, তাই দেখাতে চায় এবং এই তত্ত্বে প্রতিটি মুহূর্তের এমন একটি স্বকীয়তা আছে যাকে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করা চলে না। তাই এর নীতিগুলির মধ্যে কোনো যান্ত্রিকতা নেই। সার্ত চান; বস্তুর বিকাশের মধ্যেই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে হবে এবং তার জন্য শুধু বিশ্লেষক যুক্তি বা দ্বান্দ্বিক যুক্তির যে-কোনো একটি গ্রহণ করলে চলবে না। সমস্যা হল, মানুষের জগতকে বুঝতে হলে কিভাবে বুঝতে হবে কিংবা জগত যখন আমাদের কাছে বোধ্য, তখন আমরা কিভাবে চিন্তা করছি? মার্কসবাদ এই উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ইদানীং অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মার্কসবাদের গতি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। দ্বান্দ্বিক যুক্তিতে বস্তুকে জানা যায়, কিন্তু বস্তুর গতিও দ্বান্দ্বিক। তাই আমাদের জানার পদ্ধতি এবং বাস্তবের গঠন নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। দ্বান্দ্বিক যুক্তি একটি স্তরকে অতিক্রম ক'রে সমগ্রতার দিকে এগিয়ে যায়। দ্বান্দ্বিক যুক্তিকে বুঝতে

হলে তার বিচার করা দরকার, তার সীমা ও ক্ষমতা নির্ধারণ করা দরকার, কিন্তু আজ পর্যন্ত তা হয় নি। কিন্তু এই বিচার সম্ভব হয় নি গোঁড়া মার্কস্-বাদের জন্য। মার্কস বলেছেন, মানুষের বাস্তব অস্তিত্বকে যুক্তি-জ্ঞানে নিঃশেষিত করা যায় না। কিন্তু যুক্তি একই সঙ্গে বাস্তব এবং বাস্তবের জ্ঞান; যুক্তি দ্বান্দ্বিক নিয়মে চলে, যেভাবে ইতিহাস চলে। বাস্তবের জ্ঞান এবং জ্ঞানের বাস্তবের মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব আছে, তা দূর হতে পারে যদি একথা মানা যায় যে যুক্তি বাস্তবের দ্বারা গঠিত হচ্ছে এবং বাস্তবকে গঠন করছে। মার্কস্ তত্ত্বগত একবাদ বিশ্বাসে এবং বাস্তবকে যুক্তিতে পর্যবসিত করতে না চেয়ে যুক্তিকে বাস্তবে পর্যবসিত করেছেন। একবাদী জড়বাদ বাস্তব ও চিন্তার দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করে। মার্কসবাদ চিন্তার ক্ষেত্রে এই দ্বান্দ্বিকতা অস্বীকার ক'রে মানুষকে জাগতিক বস্তুতে পরিণত করেছে। মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে মানুষ বর্জিত।

কিন্তু জ্ঞানের অর্থ বাস্তবের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা দেখাতে গিয়ে শুধু বস্তুর সমাবেশের কথা বলেছে। কিন্তু যে-জগত কোনো মানুষের কাছে প্রকাশিত হচ্ছে না, তার কথা বলা এক ধরনের প্রাক্-জ্ঞানীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। এতে মানুষকে প্রকৃতির মাঝখানে অন্য বস্তুর মতো দ্বান্দ্বিক নিয়মের অধীন বলে মনে করা হয়েছে। প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা এতে প্রাক্-জ্ঞানীয় হয়ে পড়ছে এবং মানুষ প্রকৃতির বাইরে অবস্থিত। এর ফলে চিন্তার উদ্দেশ্যগত রূপকে বোঝা যায় না। চিন্তা বস্তুর অপটু নিষ্ক্রিয় প্রতিচ্ছবি হয়ে পড়ে, কিন্তু বাস্তবচিন্তা ইতিহাসের গতিতে অংশ গ্রহণ ক'রে বাস্তব অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে যায়। যাকে চিন্তার অধিকারী বলা হয়, সে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র একটি বস্তুতে পরিণত হলে চিন্তার আসল বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু প্রকৃতি যে দ্বান্দ্বিক নিয়মে চলছে, তার সত্যতাকে বিশ্বাস করতে হয় এবং তার ফলেই সার্বিক চেতনায় বিশ্বাস করতে হয় এবং তার ফলেই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ গোঁড়া ভাববাদে পরিণত হয়।

'প্রকৃতি দ্বান্দ্বিক'-এর কোনো পরীক্ষাগত প্রমাণ নেই, কারণ বস্তুর দ্বন্দ্ব বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে, কিন্তু প্রকৃতির সব অবস্থায় তো বৈজ্ঞানিকের উপস্থিতি নেই। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে দ্বান্দ্বিকতা সম্বন্ধে দ্বান্দ্বিক যুক্তির কিছু করবার নেই। তবে ইতিহাসে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক যুক্তির প্রয়োগ বোঝা যায়। যে-বস্তুবাদ বস্তুর প্রকৃত সম্পর্ক

বিচার করে না, তা বস্তুগত ভাববাদ। চিন্তা ব্যক্তি-মানুষের চিন্তা এবং বাস্তব জগত বিশেষ পরিবেশে মানুষের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে প্রকাশিত। এঙ্গেলস হেগেলের মতোই বস্তুর উপর চিন্তার নিয়ম চাপিয়েছেন। দ্বান্দ্বিক যুক্তির প্রকৃত বিচরণক্ষেত্র হল ইতিহাস এবং সমাজ। যে প্রকৃতি থেকে বৈজ্ঞানিক নির্বাসিত, তার উপরে দ্বান্দ্বিকতা চাপানো যুক্তিহীন। কারণ দ্বান্দ্বিকতা মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্বেই গ'ড়ে ওঠে।

অবশ্য, সার্ত বলতে চান না, জড় জগতে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নেই। তাঁর মত হল দ্বান্দ্বিক যুক্তি দিয়ে প্রকৃতিকে আমরা পরিচালিত করতে চেষ্টা করি, কিন্তু তা জড় প্রকৃতির সাংগঠনিক রূপ নয়। মানুষের উদ্দেশ্য এবং বাস্তব অবস্থার দ্বন্দ্বে দ্বান্দ্বিক যুক্তি জন্ম নেয়। অতএব, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলে যদি কিছু থাকে তা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এই বস্তুবাদ সামাজিক শ্রেণীবিন্যস্ত জগতে রূপ পেতে পারে, কিন্ত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ একটি তত্ত্বগত প্রকল্প, কারণ ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবেশে উদ্দেশ্যের দ্বান্দ্বিক যৌক্তিকতা আবিষ্কার ক'রে তাকে শর্তহীনভাবে জড় জগতে আরোপ করা হয় এবং সেখান থেকে তাকে সমাজে প্রেরণ করা হয় এই ধারণায় যে প্রাকৃতিক নিয়মই অযৌক্তিকভাবে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃত দ্বান্দ্বিকতা বুঝতে হলে আমাদের একথা জানতে হবে যে মানুষ অন্যান্য বাস্তব পদার্থের মতোই কোনো বিশেষ অধিকার ভোগ করে না এবং প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা একদিন হয়তো আবিষ্কৃত হবে। কিন্তু দ্বান্দ্বিক যুক্তি মিলবে ইতিহাসের বাস্তব উপাদানে। দ্বান্দ্বিক যুক্তিকে বুঝতে হবে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি দিয়ে এবং বাস্তব ও জ্ঞানের যে-পার্থক্য, তাতে এক অন্যে পরিণত হয় না। দ্বান্দ্বিকতার ক্ষেত্রে বাস্তব জ্ঞানের অস্বীকৃতি এবং জ্ঞান বাস্তবের অস্বীকৃতি, দ্বান্দ্বিকতার জ্ঞান দ্বান্দ্বিক গতির মধ্যে মেলে। "মানুষ প্রাক্-অবস্থার ভিত্তিতে ইতিহাস সৃষ্টি করে।" প্রথম স্তরে মানুষ দ্বান্দ্বিকতার অধীন, কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে সে দ্বান্দ্বিকতা সৃষ্টি করে। এই দ্বান্দ্বিকতাকে জীবনে ভোগ করাই আমাদের নিয়তি। দ্বান্দ্বিকতা সমগ্রীকরণের নীতি। গোষ্ঠী, সমাজ, ইতিহাস ব্যক্তির উপর আধিপত্য করে, কিন্তু এ-সবই তো ব্যক্তিদের সৃষ্টি। সমাজের অভাব এবং প্রয়োজনেই মানুষের জীবনযাত্রা দ্বান্দ্বিক নিয়মে বোঝা যায়। বহু একক সমগ্রীকরণ যে বাস্তব সমগ্রীকরণ রচনা করে, তার ভিত্তিতে দ্বান্দ্বিকতা বোঝা যায়। দ্বান্দ্বিক যুক্তি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়, কারণ দ্বান্দ্বিকতা

কর্মের সজীব যুক্তি। উদ্দেশ্য, সমগ্রীকরণ এবং সামাজিক অগ্রগতি দ্বান্দ্বিকতা দ্বারা বোঝা যাবে। তাই দ্বান্দ্বিকতার অভিজ্ঞতা উদ্দেশ্যের দ্বান্দ্বিকতা। সার্ত আলোচনা করতে চাইছেন : ইতিহাসের জ্ঞানকে বুঝতে হলে কি কি শর্ত জানা দরকার? দ্বান্দ্বিক যুক্তির ভিত্তি ও সীমা কি?

এমন একটি চিন্তার কাঠামো দরকার যা উদ্দেশ্য এবং সমগ্রীকরণের জটিল সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করবে। তা হল, দ্বান্দ্বিক যুক্তি এবং তা জীবনের অভিজ্ঞতাতেই পাওয়া যায়, কারণ তা স্বচ্ছ। দ্বান্দ্বিক যুক্তিতে বিভিন্নকে একটি সমগ্রে সন্নিহিত করা হয় এবং জ্ঞানের বেলায় সমগ্র জানার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়। আমাদের দেখতে হবে, বাস্তবের কোথায় কোথায় এই সমগ্রীকরণ হচ্ছে। সমগ্রীকরণের বৈশিষ্ট্য হল সমস্ত অংশে তা প্রতিফলিত এবং জ্ঞাত ও জ্ঞাত বিষয়ের দ্বান্দ্বিক অভিজ্ঞতা। মানুষের ইতিহাসেই সমগ্রীকরণ ঘটছে। এর ভিতর দিয়ে সাধারণ বৈশিষ্ট্য একক রূপ পাচ্ছে। ব্যক্তি সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, আবার সমগ্রকে অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে। ইতিহাস ব্যক্তিকে সমগ্রের সঙ্গে যেভাবে যুক্ত করছে, তার ভিত্তিতে ব্যক্তি স্বীয় উদ্দেশ্যের দ্বারা সেই সমগ্রতাকে নিজের ক'রে ইতিহাসকে গ'ড়ে তুলছে। তাই, বাস্তব পরিবেশকে স্বচ্ছভাবে বুঝতে হলে যে উদ্দেশ্যগুলি তাকে সংগঠিত করছে তা জানা দরকার। ইতিহাস যদি বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্যের সমষ্টি থেকে সমগ্রীকরণের দিকে যাত্রা করে, তবে প্রশ্ন হতে পারে বিভিন্ন সমগ্রীকরণের মাধ্যমে এক ধরনের উদ্দেশ্য কি-ভাবে সৃষ্ট হয়। আমাদের দেখতে হবে, পারস্পরিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-মানুষ, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী কিভাবে ইতিহাসকে গ'ড়ে তোলে। আমাদের পদ্ধতি হল সংশ্লেষক প্রগতিক্রম যা সম্ভব করতে বিভিন্ন ব্যবহারিক সংঘাতের গঠনকে দ্বান্দ্বিক যুক্তি দিয়ে বুঝতে হবে। সার্তের গ্রন্থের দুটি ভাগ একত্রে দেখাতে চেষ্টা করবে, বহির্জগতকে জানাবার বেলায় বাস্তবকে অন্তরীকরণের একটি স্তর আছে, যা অনতিক্রম্য, আবার পুরোপুরি সব বাস্তবকে অন্তরীকৃত করা যায়না, কিছু অনতিক্রম্য বাস্তব থেকে যায়। উদ্দেশ্যকে যেখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়, তা-ই বোধ্য। কিন্তু এমন কোনো কোনো কাজও আছে, যেখানে উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাদের যুক্ত করা যাচ্ছে না।

দ্বান্দ্বিকতা বাস্তব হতে হলে চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। (ক) আবশ্যিকতা এবং স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা হিসেবে উদ্দেশ্যের প্রকৃতি কি? (খ) সমগ্রসমূহ কিভাবে সাধিত হয়? (গ) ঐতিহাসিক ভবিষ্যত কি? (ঘ) উদ্দেশ্য এবং

অন্যসব বাস্তবতাব বাস্তব ভিত্তি কি? মানুষ এবং বাস্তব অবস্থা পবস্পবেব দ্বাবা যুক্ত। যখন বিভিন্নতা মিলে সমগ্র হয়, কে তা কবে থাকে? প্রাথমিক সমগ্রীকবণেব সম্পর্ক হল মানুষ প্রযোজনেব তাগিদে বাস্তব জগতেব সঙ্গে আবদ্ধ, বাস্তবে যা নেই, তা মানুষেব দ্বাবা অন্তবীকৃত হযে প্রযোজন হিসেবে অনুভূত হয। প্রযোজন সমগ্র বাস্তবতায একটি শূন্যতাব সৃষ্টি কবে এবং যে বাস্তব জড, তা উদ্দেশ্যেব পটভূমিকায সম্ভাবনাব যন্ত্র হযে ওঠে। উদ্দেশ্যই জড ও অজড সমন্বিত হয। উদ্দেশ্য ও বাস্তবতাব প্রতি স্তবেব সংঘাত দ্বান্দ্বিক যুক্তি দিয়ে বোঝা যায। একা মানুষ প্রযোজনেব দ্বাবা জড পবিবেশেব সঙ্গে যুক্ত, এ-বকম হযনা। যে-কোনো বাস্তবেব সঙ্গে বহু মানুষেব সম্পর্ক যুক্ত, যাব ফলে বাস্তব বহু-অর্থ-যুক্ত। বাস্তবতা উদ্দেশ্যেব শর্ত, কিন্তু উদ্দেশ্য বাস্তবতাকে নতুন অর্থ দেয, কিন্তু ঠিক তাব অর্থ কি আমি ধবতে পাবিনা, কাবণ অনেকেই তো বাস্তবকে অর্থ দেয। আমি বাস্তব নিযে যে-সমগ্র গডতে চাই, অন্যেব উদ্দেশ্যেব কাছে আমি-সহ তা তাব সমগ্রীকবণেব অংশ। আবাব দুজন মানুষ একটি বাস্তবকে কেন্দ্র ক'বে কিছু গডতে চাইলে, তাদেব ঐক্য কোথায তা তাবা বুঝতে পাবে না। তৃতীয কোনো ব্যক্তি তা বুঝতে পাবে। পাবস্পবিক সম্পর্কেব মধ্যে পূর্ণ ঐক্য আদর্শ বাষ্ট্রে হতে পাবে, কিন্তু বাস্তব জগত তো আদর্শ বাষ্ট্র নয। পাবস্পবিক সম্পর্ক ভাবাত্মক বা অভাবাত্মক হতে পাবে। প্রথমটিতে একজন আব-একজনেব উদ্দেশ্যেব জন্য কাজ কবতে পাবে কিংবা দুজনে কোনো যুগ্ম উদ্দেশ্যে একজোটে কাজ কবতে পাবে। কিন্তু দ্বিতীযটিতে একজন আব-একজনকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহাব কবতে পাবে এবং তাতেই সংঘর্ষেব সৃষ্টি হয। এই সংঘর্ষেব ভিত্তি হল অভাব এবং লক্ষ্য হল অপবেব উপব জয। সাধাবণ কর্মপ্রচেষ্টা, পাবস্পবিক স্বার্থ—সবই সত্য, কিন্তু যে-বস্তু তাদেব প্রযোজনে লাগে, তাবই জন্য পাবস্পবিক ঐক্য নষ্ট হতে পাবে, কাবণ উদ্দেশ্য যাই হোক, দুইযেব প্রযোজন একই বস্তু। কিন্তু পাবস্পবিক দ্বন্দ্বেব অবসান হযে দুই ব্যক্তিব মধ্যে ঐক্য সাধিত হতে পাবে তৃতীয কোনো সমগ্রতায, যেখানে তাদেব ঐক্য নেহাতই জড বস্তুব ঐক্য। সাধাবণ কাজেব মাধ্যমেও দ্বন্দ্ব আবৃত থাকতে পাবে, যেমন একসঙ্গে দাঁড টানায, কিন্তু সেখানে ব্যক্তিদেব স্বাতন্ত্র্য অনুপস্থিত।

ইতিহাস মৃত অতীতেব নয, ববং ভবিষ্যত উদ্দেশ্যেব পবিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে তাব সমগ্রীকবণ হয। জড বস্তু মানুষেব বিবোধী, কিন্তু তাই ইতিহাসেব

ঐক্যের ভিত্তি এবং মানুষ মানুষের সঙ্গে বিরোধের মাধ্যমে মিলিত হয়। বাস্তব পরিবেশ মানুষের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ শক্তি হয়ে লক্ষ্যকে বানচাল ক'রে দেয়। মানুষের উদ্দেশ্যই যেন উদ্দেশ্যহীনতায় পরিণত হয়। বাস্তব থেকে এই বিচ্ছিন্নতা আরও অনেক বিচ্ছিন্নতায় প্রকাশিত হয়। ইতিহাসে আসল সম্বন্ধ হল প্রয়োজন ও অভাবের। বাস্তব জগতে অভাব গঠিত হচ্ছে প্রয়োজনের ভিত্তিতে। আমাদের ইতিহাসের ভিত্তি হল অভাব, এবং সমাজের সর্বস্তরে সাম্যের অভাব থেকেই ইতিহাস গঠিত হচ্ছে। অভাব থেকে বোঝা যায়, সমস্ত পৃথিবীই সব মানুষের ভোগ্যবস্তু এবং যথেষ্ট পরিমাণে মানুষের প্রয়োজন জগত মেটাতে পারে না বলেই, সেদিক দিয়ে সমস্ত মানুষের মধ্যে একটি অভাবব্যঞ্জক ঐক্য আছে, যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি অপর মানুষের চোখে ভীতিপ্রদ। পারস্পরিক সম্পর্ক অভাব দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই অপর ব্যক্তি আমার কাছে অ-মানুষ যার, একমাত্র লক্ষ্য অন্য মানুষের ধ্বংস। আমি যদি অপর ব্যক্তির অ-মানবিকতা ধ্বংস করতে চাই, তার মানবিকতাও আমাকে ধ্বংস করতে হবে, আমার লক্ষ্য হবে তার স্বাধীনতা বিনষ্ট করা। যতদিন অভাব আছে, অশুভকে দূর করা যাবে না। অভাব অন্তরীকৃত হয়ে যে-অভাবাত্মক ঐক্য সৃষ্ট হয়েছে, তা পারস্পরিকতার মানবিকতাকে নষ্ট ক'রে পুনরায় মানুষের মধ্যে বিরোধের রূপে বাস্তব জগতের একই ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। অভাব মানুষকে মানুষের বিরোধী ক'রে তোলে। বাস্তব জগতে মানুষ দুভাবে বিচ্ছিন্ন—বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের কাজের ছাপ পড়ে, তা হল মানুষের বাস্তবীকরণ, কিন্তু বাস্তব পরিবেশ কাজটিকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষ অন্য মানুষের মাধ্যমে উৎপাদন দ্বারা শাসিত, কারণ তার উৎপাদনই গণ্য, সে নয়, আবার মানুষ বাস্তবকেও নিয়ন্ত্রিত করছে।

বাস্তবকে উদ্দেশ্যের দ্বারা মানুষের কাজে লাগানো এবং কিভাবে কাজে লাগানো হয়—তার উপর সমাজের ভালোমন্দ নির্ভর করে। দুরকমের মানবিক উদ্দেশ্য দেখা যায়—একটি সাধারণ পরিকল্পিত লক্ষ্য থাকতে পারে, যাতে সাধারণ শ্রেণীগত ঐক্য আসে, আর একটি সারিগত ঐক্য: যাতে পারস্পরিক সংঘাতই প্রধান। উদ্দেশ্য জড় বস্তুর বিভিন্নতায় ঐক্য এনে একটা ব্যবহারিক ঐক্য গ'ড়ে তোলে। শুধু অভাবই মানুষকে কাজ করায় না, জড় বস্তু তার প্রয়োজনে যে

অনুভূতি সৃষ্টি করে, তাই কাজের সূচনা করে। মানুষের উদ্দেশ্য বাস্তব থেকে কতখানি ভ্রষ্ট হয় এবং অন্য মানুষের উদ্দেশ্য তা কতখানি নষ্ট করে, তারই ভিত্তিতে শ্রেণী স্বার্থ গড়ে ওঠে, কারণ মানুষ নিজেকে স্বাধীন উদ্দেশ্য-প্রণেতা হিসেবে আবিষ্কার করতে চায়।

ইতিহাসের দ্বন্দ্বের ভিত্তি হল ব্যক্তিদের কর্মপ্রচেষ্টার দ্বান্দ্বিক ভিত্তি। আবশ্যিকতা এবং বাধার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং কাজ এক হতে পারে না। ব্যক্তিভেদে কাজের পরিবর্তন হয়, তাকে বলা হয় পরি-বর্তায়ন, যে-বাস্তব ক্ষেত্রে কর্ম ঘটছে, তা উদ্দেশ্যকে জড়ীভূত করে, কর্মফলকে পরিবর্তিত করে দেয়। মানুষের দলগত কর্ম-প্রচেষ্টায়—যথা দলে, ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠীতে, সঙ্কল্পবদ্ধ গোষ্ঠীতে, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে মানুষ যে বিচ্ছিন্ন হয়, তার কারণ বাইরের বাধা নয়। প্রত্যেক মানুষ বস্তু এবং অপর মানুষের উপর নিজের মূর্তি অঙ্কিত ক'রে দেয়, তা সত্ত্বেও সে যা করতে চায়, তা হয় না। এইটেই জীবনের প্রাথমিক বিচ্ছিন্নতা।

মানুষের উদ্দেশ্য জড়ের অধীনে তার শক্তি হারিয়ে ফেলে। সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মানুষের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়। গোষ্ঠীর ভিতর দিয়ে বিভিন্ন মানুষের উদ্দেশ্য ঐক্য পেতে চায়, কিন্তু গোষ্ঠীর মধ্যে কেমন একটা জড়ত্ব আছে, যা ব্যক্তির উদ্দেশ্যকে গ্রাস করে। গোষ্ঠির মধ্যে একটা পারস্পরিক অন্তরীকরণ চলে, যার ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন গ'ড়ে ওঠে, তেমনি সংঘাতও দেখা দেয়। এ-ধরনের সম্বন্ধকে বলা যায় সারিগত ঐক্য, যেমন বাসের জন্য অপেক্ষমান এক সারি মানুষ, তারা নির্জন ব্যক্তিদের সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়! পারস্পরিক অন্তর্জগতের মধ্যে কোনো ঐক্য নেই। নির্জনতা ছাড়া সারিগত ঐক্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল একজন অপরজনের স্থান গ্রহণ করতে পারে। যে-বস্তুটি এই ঐক্য নির্ধারণ করছে, তাতে সকলের পক্ষে স্থান না হতে পারে, তাই প্রত্যেকেই প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। সারিগত ঐক্যের মধ্যে একটি ব্যবহারিক জড়ত্ব আছে, কারণ সকলেই সারি অনুযায়ী আচরণ করছে। যেসব ঐক্য সারিগত নয়, তাতেও এই জড়ত্ব আছে, সার্ত্র মনে করেন। সারির ঐক্যের কারণ অন্য স্থানে অন্য ব্যক্তিও এর কারণ হতে পারে, যেমন ইহুদীদের সারিগত ঐক্যের কারণ, যারা ইহুদী নয় তারা। সারিগত ঐক্যে কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সম্ভব নয়। এর ঐক্য একটি নেতিবাচক সমগ্রতা। মার্কস দেখিয়েছেন,

ব্যক্তিদের সমষ্টিগত কাজ সারিগত ঐক্যে রূপ পেতে পারে না, কারণ সারির বৈশিষ্ট্যে একটা ব্যবহারিক জড়ত্ব আছে, যা অতিক্রম করতে পারলে দ্বান্দ্বিক অভিজ্ঞতা শুরু হবে।

ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং গোষ্ঠী উদ্দেশ্যের মাঝে আছে ব্যবহারিক জড় পরিবেশ, যা দুটি উদ্দেশ্যেরই বিরোধী। নিম্ন প্রদর্শিত উপায়ে এদের সম্পর্ক বুঝতে হবে।

(১) স্বাধীন উদ্দেশ্যের পরিবেশকে একীকৃত করার চেষ্টা (২) বিভিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টায় এক অন্যের স্বাধীনতা নষ্ট করে (৩) স্বাধীন উদ্দেশ্য অচলতায় পর্যবসিত হয় (৪) জড় অবস্থায় অন্য ব্যক্তির প্রচেষ্টায় নিষ্ক্রিয়তার সৃষ্টি করে (৫) প্রত্যেকে বস্তুর নিষ্ক্রিয় প্রভাবে নিষ্ক্রিয় কর্মে পরিণত হয়।

গোষ্ঠীতে যে জড়তার সৃষ্টি হয়, তাই মানুষের অ-মানবিকতা। কিন্তু এই জড়ত্বকে দ্বান্দ্বিক জীবনের মাধ্যমে মানুষ অতিক্রম করে।

সারির মধ্যে যে বিরোধ আছে, তা-ই গোষ্ঠীগত ঐক্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সারিতে যে-পারস্পরিকতা নষ্ট হয়, তা পুনরুদ্ধার ক'রে গোষ্ঠীর ঐক্য গ'ড়ে ওঠে। প্রথম পর্যায়ে তা হল মিলিত হবার গোষ্ঠী। প্রত্যেক গোষ্ঠীতেই সার্ত একজন তৃতীয় ব্যক্তির কথা বলছেন, যে অপর দু-ব্যক্তিকে তার সমগ্রতায় অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিজে অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা সমগ্রীকৃত হতে পারে। মিলিত হবার গোষ্ঠীতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের উদ্দেশ্য আমার বলে মনে করে। গোষ্ঠীর সর্বত্রই ঐক্য দেখা দেয়। এই ঐক্য উদ্দেশ্যগত কর্মের ঐক্য এবং যে-সর্বব্যাপক ঐক্য গ'ড়ে ওঠে, তা সর্বব্যাপক স্বাধীনতা এবং তার মধ্যে আমার একাকীত্ব এবং সর্বব্যাপকত্ব আছে। কিন্তু সারি থেকে গোষ্ঠীতে পরিবর্তন আশা, ভয়, স্বাধীনতা এবং অত্যাচারকে নিয়ে আসে। গোষ্ঠী একটি সমগ্র উদ্দেশ্যকে সাধিত করবার প্রচেষ্টায় ব্যবহারিক জড় পরিবেশকে দূর ক'রে সাধারণ কাজের ক্ষেত্রে একটা সমষ্টি গ'ড়ে তোলে। কিন্তু গোষ্ঠী গ'ড়ে ওঠার পর দুটি সম্ভাবনা দেখা যায়, ঐক্য অথবা অনৈক্য, স্থায়িত্ব অথবা বিনষ্টি। গোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রত্যেকের মধ্যে সাধারণ ঐক্যের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করা দরকার। তা করা যেতে পারে শপথের মাধ্যমে। এই সঙ্কল্পের ভিতর দিয়ে আমি অন্য সকলের কাছে গোষ্ঠীর স্থায়িত্বের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি। কিন্তু এইভাবে যে গোষ্ঠী সৃষ্টি হচ্ছে, তার দ্বান্দ্বিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হচ্ছে। সঙ্কল্পে সব সময় একটা উৎকণ্ঠা থাকে যে গোষ্ঠী ভেঙ্গে যাবে। ব্যক্তির মনে ভয়

থাকে যে সঙ্কল্প ঠিকমতো পালিত না হলে তার স্বাধীনতা বিনষ্ট হবে। আমার শপথ অন্যকে যেমন নিরাপত্তা দেয়, তেমনি আমি কর্তব্যচ্যুত হলে তারা যে শাস্তি দেবে, সেই ভয়ও আছে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ গোষ্ঠীর ভিত্তি তাই ভয় এবং অত্যাচার। আবার গোষ্ঠীতে একই অধিকার, দায়িত্ব-সচেতনতাও আছে। গোষ্ঠী যখন সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তখন বিভিন্ন পারস্পরিক কর্মক্ষেত্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে সজীব হয়ে ওঠে। কিন্তু গোষ্ঠীর যে কাঠামো, তার মধ্যেই মূর্ত উদ্দেশ্য কর্ম-প্রচেষ্টায় বাস্তব রূপ পায়।

প্রত্যেক ব্যক্তিই সঙ্কল্পবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে জন্মে দেখে, আগে থেকেই কিছু সঙ্কল্প তার উপর ন্যস্ত রয়েছে। সামাজিক যে-সমস্ত প্রথা, অঙ্গীকার, শপথ রয়েছে, তাই ব্যক্তির স্বাধীনতার ভিত্তি, যার উপর দাঁড়িয়ে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্যকে প্রয়োগ করার কথা ভাবে। সামাজিক কাঠামোয় একটা জড়তা আছে, তা উদ্দেশ্যগত ঐক্যের দ্বারা দূর করা যেতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি সমাজের অংশ বলে এই জড়তারও সে অংশীদার। সামাজিক কাঠামোর দুটো দিক আছে ঃ জড়ত্বের দিক এবং সমষ্টিগত গতিশীলতার দিক। এখানেই প্রশ্ন ওঠে ঃ সামাজিক কাঠামোর দ্বান্দ্বিকতা কি ? সমাজগত ব্যক্তি হিসেবে গোষ্ঠীর সমস্ত পারস্পরিক সম্বন্ধ, অধিকার, শক্তি ও অত্যাচার এবং ত্রাস সবই ব্যক্তি গ্রহণ করেছে। নিজের উদ্দেশ্যকে সুগঠিত করার মধ্য দিয়ে সে গোষ্ঠীকে গ'ড়ে তোলে। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ব্যক্তির থেকে অনেক বৃহৎ। যে উদ্দেশ্য গোষ্ঠীর সাধারণ উদ্দেশ্য—তাকে সাধিত করতে বাস্তব অবস্থাকে অতিক্রম করতে হয়। ব্যক্তিও গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি ক'রে তার প্রয়োগের ভিতর দিয়ে গোষ্ঠীকে অতিক্রম করতে পারে।

ব্যক্তি গোষ্ঠী থেকে আলাদা হয়েও একযোগে যে-কাজ করে, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আদেশ-বশ্যতার শাসনের যন্ত্রে। একটা চুক্তির ভিত্তিতে শাসন চলে, যার দ্বারা বিভিন্নতাকে একের পর্যায়ে দাঁড় করানো হয়। চুক্তিটা আমরা করি, যে-আমরা সমগ্রতার পারস্পরিকতায় নিবদ্ধ। গোষ্ঠী-ব্যক্তি নিজেকে রূপায়িত করতে এমন একটা হিংসার পরিবেশে নিজেকে গ'ড়ে তুলছে, যা সে আগে থেকে বুঝতে পারে না। কিন্তু এই হিংসার পরিবেশ, সমগ্র গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যের শক্তি। সেই শক্তিতে ব্যক্তির উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা হারিয়ে যায়। এ-রকম কি ক'রে ঘটে ? গোষ্ঠীর সঙ্কল্পে আমরা আমাদের বিভিন্নতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে ঐক্য আনতে চাই। যে-অধিকার এবং দায়িত্ব সৃষ্টি হয়, তা আমাদের স্বাধীনতা

দ্বারা সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতা। এর ফলে আবার বিভিন্নতা আসতে পারে এবং তা দূর করা যেতে পারলে গোষ্ঠীর হিংসা-ত্রাস এবং ভ্রাতৃত্বকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। এইভাবে যে গোষ্ঠী গ'ড়ে ওঠে, তা যন্ত্র বিশেষ এবং তা উদ্দেশ্যকে গঠিত করতে পারে না। গোষ্ঠীর জড়ত্ব ব্যক্তিদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, কিন্তু তারাই তা গ'ড়ে তুলেছে। সার্ত্র উদ্দেশ্য এবং প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা পার্থক্য ক'রে দেখিয়েছেন, সামাজিক উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত একটা নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়, যা ব্যক্তিদের স্বাধীন উদ্দেশ্যের বিপরীতে যায়। গোষ্ঠীর মিলিত উদ্দেশ্য গোষ্ঠীর সঙ্ঘ-জীবনকে গড়ে তুললেও গোষ্ঠীর জীবন এবং ব্যক্তির জীবনে একটি অপ্রতিরোধ্য বৈপরীত্য আছে। গোষ্ঠীবদ্ধতায় দুরকমের ব্যর্থতা আছে—যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সম্মতি দিয়েছে, ব্যক্তি গোষ্ঠীকে ছাড়তে পারছে না, আবার গোষ্ঠীর সঙ্গে এক হতে পারছে না। গোষ্ঠী জীবনে যখন আরও জড়ত্ব আসে, তখন সঙ্ঘবদ্ধতা বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যায় এবং যে পারস্পরিকতা সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীতে ছিল, তার পরিবর্তে আবার প্রতিষ্ঠানগত সারিবদ্ধতা দেখা দেয়। সঙ্ঘ সার্বভৌম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ায় ব্যক্তি যে শক্তি হারায়, তা একটি কেন্দ্রীয় শক্তিতে ন্যস্ত হয়। যে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, তা স্থায়িত্ব বজায় রাখতে আইনের আশ্রয় নেয়। প্রতিষ্ঠান সারিবদ্ধ ব্যক্তি-বিভিন্নতার ঐক্য। সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তি নিজের উদ্দেশ্যের মধ্যে মিলিত-গোষ্ঠীর শক্তিকে সঞ্চিত করে। প্রতিষ্ঠান নিষ্ক্রিয় মানুষের মধ্যবর্তী স্তর হিসেবে কাজ করে। সার্বভৌম শক্তি মৃত উদ্দেশ্যসমূহের সমষ্টি। অক্ষম সারির উপর তার শক্তি আরোপিত হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, সার্বভৌম শক্তি এবং সারিগত জনতার মধ্য দিয়ে আমাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকতর বিচ্ছিন্নতা প্রকাশিত হয়।

গোষ্ঠী যে উদ্দেশ্য সাধিত করতে চায়, তার প্রয়োগে তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

(১) গোষ্ঠীকে নিজের বাইরে কাজ করতে হয় বলে, নতুন ব্যবহারিক ক্ষেত্র গড়ে ওঠে। অন্য গোষ্ঠীর ঐক্য এর কাছে ভয়ের বস্তু। (২) অন্য গোষ্ঠীর কর্ম-প্রচেষ্টায় বিচ্ছিন্নতা আসে। তার কর্ম-প্রণালীর বহু অর্থ-সম্ভাবনা থাকতে পারে। একমাত্র ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি সমন্বিত হতে পারে। গোষ্ঠী যে জড়ত্বকে দমন করতে চায়, তা বাইরের জগতে চাপিয়ে দেয় এবং এই ভাবে আবার জড়ত্বকে গ্রহণ করে। গোষ্ঠীর

বাইরের কাউকে প্রভাবিত করতে গিয়ে ব্যক্তি ভুলে যায়, গোষ্ঠী-বহির্ভূত ব্যক্তিও তাকে প্রভাবিত করছে।

গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির বিভিন্ন সম্পর্ক আলোচনা ক'রে সার্ত শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করছেন, মানুষ অভাবের পরিবেশে তার সদৃশ অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে বাস করে। পরিবেশগত অভাব নেতিবাচক ভাবে প্রত্যেক মানুষকে, মানবিক বিভিন্নতা এবং অমানবিক বাস্তবতাকে রূপ দেয়। প্রত্যেক মানুষই আমার প্রয়োজনের সামগ্রীতে অংশীদার এবং সেই হিসেবে সে আমার বিরোধী। মানুষ হিসেবে বাস করতে তাই মানুষকে অমানুষ হতে হয়। পারস্পরিকতা এবং অন্তর্পরিবর্তনের মাধ্যমে আমি অন্যদের দ্বারা অ-মানবিক বাস্তবতায় পরিণত হতে পারি। অন্যের উদ্দেশ্য আমার কাছে ত্রাসের সঞ্চার করে এবং তার স্বাধীন কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে যে উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়, তা ধ্বংস করেই আমি বাঁচতে পারি। মানুষের মধ্যে এইটেই হল আদি বন্ধন, যা পরিবেশের দ্বারা তার কাছে ন্যস্ত। যে-হিংসা মানুষের মধ্যে দেখা দেয়, তা একদিকে যেমন স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করে, তেমনি স্বাধীনতাকে স্বীকারও করে। শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রে সার্ত তিন পর্যায়ের মানবিক কর্মপ্রচেষ্টার কথা বলেছেন—তা হল—ব্যক্তি, গোষ্ঠী, উদ্দেশ্য গত প্রয়োগ-পদ্ধতি। তাই শ্রেণী-দ্বন্দ্বে উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতির সংঘর্ষ চলে। ব্যক্তিদের মধ্যে যে উদ্দেশ্যগত প্রয়োগ ও প্রক্রিয়ার বিরোধ আছে, শ্রেণীর বেলায়ও তাই। উদ্দেশ্যের লক্ষ্য এবং উপায়ের চেতনা যখন অদৃশ্য হয়, তখন তা অপর শ্রেণীর লক্ষ্য এবং উপায়কে সূচিত করে এবং সেই শ্রেণীর কর্ম-প্রচেষ্টার অন্ধ সহায়ক হয়ে শ্রেণী-স্বার্থকে বিরোধী শক্তি হিসেবে আঘাত করে। উদ্দেশ্যের যে-সংঘর্ষ শ্রেণীতে শ্রেণীতে এবং ব্যক্তিতে রয়েছে, তাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে যে অন্যের উদ্দেশ্যের কাছে তার সত্তা বস্তুর মতো। এই অবস্থাটা না বুঝলে, সে অন্যের দ্বারা চালিত হবে। বাস্তব সংগ্রামে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বস্তু-সত্তা অতিক্রম ক'রে অন্যকে আত্মসাৎ ক'রে নিজের বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করে এবং এইটেই তার নেতির নেতি। এটা অস্তিত্বের কলঙ্ক, কিন্তু এর কারণ হল প্রত্যেক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বাস্তব জগতের অভাবের ক্ষেত্রে বড় বেশি মনে করায় যে হিংসা অনুভূত হচ্ছে, তাই। অভাব-বোধকে অন্তরীকরণ করার ফলেই এই হিংসার উৎপত্তি। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে-ভাবাত্মক পারস্পরিকতা আছে, তা কি তৃতীয় কোনো পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে?

এ-প্রশ্নের উত্তর হতে পারে : তা সম্ভব ইতিহাসের সমগ্রতায়, কারণ ইতিহাসই সকল প্রকার প্রয়োগগত বিভিন্নতা এবং তাদের সংঘর্ষের সমগ্রীকরণ। ইতিহাসকে যতটা বোঝা যেতে পারে, তা-ই বিভিন্ন প্রয়োগগত কাঠামোর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির এবং যে-সমস্ত বিভিন্ন সক্রিয় প্রচেষ্টা সেখানে বর্তমান, তাদের দ্বান্দ্বিকতার সীমা।

[লেখকের বক্তব্য : Critique of Dialectical Reason-এর দেড় শতাধিক পৃষ্ঠার প্রথম প্রবন্ধটি Problem of method ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। বাকি বৃহৎ অংশের পরিচয় বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া গেছে। সেগুলির মধ্যে যে-বই থেকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পাওয়া গেছে, তা হল Laing ও Cooper রচিত Reason and violence A decade of Sartre's Philosophy 1950—1960 এই গ্রন্থের গোড়ায় সার্ত্রের একটি ভূমিকা আছে, যেখানে তিনি বলছেন তিনি খুবই আনন্দিত যে লেখকরা তাঁর চিন্তার একটি স্বচ্ছ এবং বিশ্বস্ত বিবরণ দিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু আমার প্রবন্ধের বহু বক্তব্য স্পষ্টতর করবার সুযোগ মেলে নি, কারণ একটি বৃহৎ পুস্তকের পরিচয় একটি রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে হয়েছে, যার ফলে বহু স্থানেই হয়তো সার্ত্রের বক্তব্যের প্রতি যথার্থ বিচার করা হয় নি। সার্ত্রের চিন্তার নব রূপায়ণের বিশদ বিচার করার সময় তাঁর বক্তব্যগুলিকে আরও স্পষ্ট করার চেষ্টা করা যেতে পারে।]

এই বিতর্কমূলক রচনাটি সম্পর্কে আমরা পাঠকদের আলোচনা আহ্বান করছি

—সম্পাদক

যে কোনও লোকের গল্প

কার্তিক লাহিড়ী

অ এসে আ-কে বলল, 'কি ভাই, কাজের কদ্দুর?' কিছু লেখায় মগ্ন ছিল বলে আ অ-র কথা বুঝতে পারল না, তাই লেখা থামিয়ে কলম পেন-স্ট্যাণ্ডে গুঁজে অ-র দিকে তাকাল। সহজ হওয়ার জন্য মুখটা হাসি হাসি করতে আ-র সমগ্র মুখমণ্ডল ঋজু রেখাঙ্কিত লক্ষ্য ক'রে অ প্রায়-চেনা মানুষটার কাছে কোনোমতে প্রশ্ন ছুঁড়ে অচেনা লোকের মতো দূরত্ব রাখতে বাধ্য হল। গভীর ঘুম থেকে উঠে ধীরে সম্বিত ফিরে পাওয়ার সময় কণ্ঠস্বরে জড়তা যেমন স্বাভাবিক, তেমন জড়িয়ে যাওয়া ধরা গলায় আ কিছু বলতে অ মুহূর্তমাত্র ক্ষয় না ক'রে আবার প্রশ্নটা পেশ করল। 'হ্যাঁ কেন', বলতে সমস্ত গলা যথেষ্ট সাফ হলে আ 'আমি তো ই-কে ব'লে দিয়েছি' ব'লে কাজের সমুদ্রে ডুব দিতে দিতে 'নিশ্চিন্তে থাকো, কাজ হয়ে যাবে' ব'লে অ-র কানে প্রতিধ্বনি তুলে তালা লাগবার উপক্রম করল এবং আ-কে প্রায় ঘুমিয়ে পড়তে দেখে অ আ-নির্দেশিত ই-র সন্ধানে যেতে উচাটন হল। তবু বেরুবার সময় 'ই-র কাছে যেতে স্লিপ লাগবে কিনা' জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আ-র ঘুমন্ত অবস্থা ও সেই অবস্থায় লেখার কাজ চলছে দেখে সে কি করবে ঠিক করতে না করতেই সটান হাজির হল ই-র ঘরে। ই তখন একটা কাগজের উপর হুমড়ি খেয়ে লাল-নীল পেন্সিল মধ্যে মধ্যে কাগজে ঠেকিয়ে ও তুলে কখনো দাঁতের ফাঁকে চালিয়ে গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট, বলা-কওয়া ছাড়া হঠাৎ ঢুকে পড়া অনধিকার প্রবেশের সামিল, ফলে নিজেকে অপরাধী মনে হতে অ পিছিয়ে আসতে 'কে' প্রশ্ন শুনে সঙ্গে সঙ্গে 'আমি অ, আমি অ' বলতে বলতে হাঁফিয়ে উঠল, ততক্ষণে তার হৃদপিণ্ড দুম-দাম শব্দ ক'রে চলেছে। ই কাগজ থেকে চোখ তুলে ও নামিয়ে কাগজে দৃষ্টি রেখে 'কি চাই?' জিজ্ঞেস করলে 'আমাকে আ পাঠিয়েছে' ব'লে অ যখন ই-র শুভ প্রতিক্রিয়া (যেমন হাসি, আগ্রহ ইত্যাদি) দেখার জন্য উদগ্রীব, তখন সেই সময় ই-র প্রশ্ন 'কেন? আমার

কাছে কেন ?' অ-কে প্রায হতচেতন কবে দিল। 'আপনি নাকি ঐ বিষযেব ইনচার্জ, তাই' বাক্য শেষ না হতে 'কি নাম' প্রশ্ন শুনে 'আমাব নাম জিজ্ঞেস কবছেন ?' বলতে 'তবে কাব'—এমন একটা প্রচণ্ড ধমক খেলো। প্রথমে থতমত খেযে পবে সামলে নিযে 'আমাব নাম অ' বলাব পব ই-ব দিকে তাকাতে দেখল ই-ব ঠোঁঠ দুটি ঈষৎ বিস্ফাবিত, 'আমি ঈ-কে পাঠিযে দিযেছি।' কথা শুনে অ কিছু অবাক, 'ঈ-ব কাছে ?' প্রশ্নটা মুখ থেকে ফসকে গেলে 'অবাক হচ্ছেন ? সটান ঈ-ব কাছে যান।' যেন আদেশ প্রচাবেব ভঙ্গিতে ই সেই মুহূর্তে অ-কে ঘব থেকে চলে যাবাব ইঙ্গিত কবল। অ অসহাযেব মতো ই-ব দিকে তাকাতে ই-কে আবাব কাগজ ও লাল-নীল পেন্সিলেব কারুকার্যে ডুবে যেতে দেখে 'এখানে আব সুবিধে হবে না' বুঝতে পেবে হতাশায ও কথঞ্চিত ক্লান্তিতে ঈ-ব ঘবে প্রবেশ কবতে গিযে বাধা পেতে 'আমি ই-ব কাছ থেকে আসছি' বললে বাধা অপসাবিত হওযায সে ঈ-ব ঘবে ঢুকে পড়ল।

ঈ-ব ঘব পবিপাটি সাজানো, তাব সাজ-সজ্জায আভিজাত্যেব ছাপ। চোখে মোটা কালো ফ্রেমেব চশমা, চশমাব কাঁচেব বং ঈষৎ নীলাভ হওযায ঈ-ব সমস্ত মুখ কেমন অস্বাভাবিক দেখায, ফ্রেমেব ছাযা চোখেব নিচে নীল, তাব উপব ডান দিকেব চিবুকে বিবাট আঁচিল থাকায ঈ-ব চবিত্র কি ধবনেব বলা মুস্কিল। মুখ মনেব মুকুব হলে ঈ নিশ্চযই নিষ্ঠুব নির্মম, কিন্তু মুখে লম্বা চুরুটেব অস্থিব স্থিতি ও মধ্যে মধ্যে প্রায নার্ভাস হযে ধোঁযা ছাড়াব মধ্যে অ ঈ-কে সাধাবণ গোছেব ভেবে কিছু এগিযে এলে ঈ-ব মুখে মৃদু হাসিব বেখা লক্ষ্য ক'বে সে সেই অবস্থায জবুথবু, ঈ-ব মুখে বাশিকৃত ধোঁযাব কুণ্ডলীব মধ্যে হাবিযে গেলে 'আমি, আমি অ' ব'লে কোনোক্রমে নিজেকে সহজ কবতে চাইলে 'তাতে আমাব কি' জবাব শুনে অ-ব হৃদপিণ্ডেব দুলুনি থেমে যাওযাব উপক্রম। অ এবাব ঈ-ব শাবীবিক ভাব বোধ কবতে সক্ষম, যদিও ঈ তখন চেযাবে উপবিষ্ট। এই ভাবই এবাব অ-কে সচেতন ক'বে দিল যে এমন ভ্যাবলাব মতো দাঁড়িযে থাকাব কোনো মানে হয না,। ঈ-কে ব্যাপাবটা বললে একটা সুবাহা হতে পাবে মনে হতে সে সমস্ত দুর্বলতা মোচন ক'বে বলতে চাইল যে সে ই-ব কাছ থেকে এসেছে, অথচ বলাব সময বাক্‌ভঙ্গ হল না, শুধু একটা অর্থহীন শব্দ, ততক্ষণে ঈ-ব বকিং চেযাবে ক্যাঁচকোঁচ প্রভৃতি নানাবকম শব্দ। 'মানে ই বললেন কিনা, তাই' অ-ব কথা শেষ না হতেই 'তাই সটান আমাব কাছে' ঈ-ব এহেন বাক্যে সমস্ত ঘব-জানালা-দবজা কেঁপে উঠতে অ সামান্য নড়ে

পাথবেব মূর্তিব মতো নিশ্চল অনড। ঈ চুরুটে টান দিযে বাশি বাশি ধোঁযা উগবে চুরুট এ্যাশট্রেব উপব নামিযে একবাব অ-কে আদ্যন্ত দেখে স্বব যথাসম্ভব খাদে নামিযে এনে বললেন, 'ওই ঘবে যান।' শব্দগুলো দূবাগত ব'লে ক্ষীণ, সেজন্য অ দাঁড়িযেই থাকল। ঈ আবাব 'ওই ঘবে যান' বলতে এবং শব্দটা তাব কানে পৌছতে অ তড়াক ক'বে লাফ দিযে ঘব থেকে বেবিযে দে ছুট। সেই ছোটাব সময একজনেব ঘাড়েব উপব পড়তে 'আস্তে' কানে যেতে সে থেমে পড়ল। 'এত ভয কিসেব, আসুন'—ভদ্রলোকেব ডাকে অ ধাতস্থ হ্যে খামকা হেসে আগন্তুককে অনুসবণ কবতে চাইল। 'কাজে এসেছেন?' প্রশ্ন শুনে অ খুশিতে ডগমগ এবং ভদ্রলোকটি বেশ ভালো মনে ক'বে সেই ভদ্রলোকেব পিছু পিছু যে-ঘবে ঢুকল, সে-ঘবে তিনজন তখন দাবাব ছকে প্রায আকণ্ঠ নিমগ্ন। তাই 'ত্যাখো তো ভদ্রলোক কি জন্যে এসেছেন' তিনজন খেলোযাড় বা দর্শকেব শ্রুতিগ্রাহ্য হল না দেখে আগন্তুকই তাকে প্রশ্ন কবলেন, 'আপনাব নাম?' অ বিগলিত হযে 'আমাব নাম অ, আমাকে ঈ পাঠিযেছেন' বলতে দেখল তিনজন চমকে তাব দিকে তাকিযে থ হযে গেল। ব্যাপাবটা বুঝতে অ-ব মুহূর্তখানেক ব্যয হলে আবাব বলল, 'হ্যাঁ, আমাব নাম অ, আমাকে ঈ পাঠিযেছেন। আমাব কাজেব কদ্দুব।'

'ঈ পাঠিযেছেন।' একসঙ্গে চাবজন।

'হ্যাঁ,' গর্বে বুক ফুলল অ-ব। তখন যাব সহানুভূতিতে অ বিগলিত হযে বেশি কথা বলেছিল, এবাব তিনি বললেন, 'উ, তোমাব কাছে নাকি?' উ-ব জবাব তৎক্ষণাৎ, 'না, আমাব কাছে নেই উ।' উ মানে সেই ভদ্রলোক হেসে নম্র কণ্ঠে বললেন, 'দেখো না, যদি ভদ্রলোকেব একটু উপকাব হয।' উ ব্যাপাবটা গুরুত্ব দিচ্ছে না দেখে উ এবাব গম্ভীব হলেন, 'ঈ-ব লোক।' এবাব উ-ব কানে যেন জল গেল, সে তৎক্ষণাৎ উঠে নিজেব টেবিলে এসে কাগজপত্র এলোমেলোভাবে নাড়াচাড়া শুরু কবল। 'আপনি একটু বসুন।' উ-ব মুখ হাসি-হাসি, 'বুঝতেই পাবছেন আমাদেব কাণ্ড, সতেবো বছব।' উ-ব মতো লোক থাকলে ভাবনা ছিল না, এমন লোকই একমাত্র উপযুক্ত লোক . ইত্যাদি চিন্তায যখন ভবপুব, সেই সময একটা ফ্যাক ফ্যাক হাসি শুনে অ দেখল জনৈক বোগা পাতলা হ্যালহেলে ছোকবা মাতব্ববি চালে একটিপ নস্যি টেনে চোখ পিটপিটচ্ছে, 'দেখি আমাব কাছে আছে কিনা?'

'তোমাব কাছে থাকবে কেন ৯?' উ-ব প্রশ্নে ৯ বিন্দুমাত্র বিচলিত না

হযে 'আপনাদেব কাণ্ডকাবখানা, হযতো দেখবেন আমাব কাছেই আছে' ব'লে কাগজ দেখতে তৎপব হলে উ আবাব আদেশেব স্থবে ব'লে উঠলেন, 'ঊ, একটু হাত চালিযে। ঋ, তোমাব টেবিলও দেখো।'

ব'সে ব'সে কাণ্ডকাবখানা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হতে হতে প্রায ঘুমিযে পডবে পডবে এমন সময অ শুনল সম্মিলিত কণ্ঠস্বব, 'না নেই।'

'নেই।' উ-ব চোখে বিস্ময, 'তবে গেল কোথায' ব'লে নিজেব কাগজপত্র দেখতে যাবাব মুহূর্তে 'আপনাব নাম যেন কি বললেন, অ' প্রশ্ন এবং উত্তবেব জন্য অপেক্ষা না ক'বে হাঁটতে শুরু ক'বে বললেন, 'ওহো, এই দেখেছেন, আপনাকে মিছিমিছি এতক্ষণ কষ্ট দিলাম।' থেমে একটু দম নিলেন, 'আপনাব নাম যেন'—

'অ।'

'হযে গেছে, হযে গেছে' উ-ব কথা কানে যেতে অ আনন্দে ডগমগ অবস্থায শুনল, 'আমি সেটা এ-ব কাছে পাঠিযে দিযেছি।' সঙ্গে সঙ্গে অ-ব ফানুস চুপসে এতটুকু। 'চিন্তা কববেন না, আমি আপনাকে এ-ব ঘব দেখিযে দিচ্ছি। বুঝতেই পাবছেন, সদিচ্ছা থাকলেই হয না, যে অবস্থায মানে—' উ হঠাৎ থেমে অ-কে একবাব ভালো ক'বে দেখে 'আস্থন' বলে বাইবে এসে আঙুল দিযে একটা স্থইং ডোব দেখিযে দিল, 'ওই ঘব। ভয নেই, স্লিপ লাগবে না, বলবেন উ পাঠিযে দিযেছেন।'

অগত্যা অ এসে এ-ব ঘবেব সামনে কিঞ্চিৎ ইতস্তত ক'বে গলা খাঁকবি দিযে নিজেকে উদ্দীপ্ত ক'বে এ-ব ঘবে ঢুকতেই হঠাৎ আপন অজান্তে কাঁপতে থাকল, তখন এ একটা কাগজ সই ক'বে পবেবটায কলম ছোঁযাচ্ছেন। বোগা পাতলা গডন, সমস্ত মুখ থেকে তাবৎ হাসি কে যেন ব্লটিং দিযে শুষে নিযেছে, অ অবাক হল চেহাবা দেখে। এ একপলক অ-কে দেখে একটা বিবাট খাতা টেনে সেই খাতাব একটা বিবাট পাতায ডুবে গিযে কযেকটা অদ্ভুত শব্দ কবতে থাকলেন। অ শব্দগুলিব অর্থ অনুধাবন না কবতে পেবে আপন মনে বলে চলল, 'আমাব নাম অ। আ আমাকে ই-ব কাছে পাঠিযেছিল, ই ঈ-ব কাছে, সেখান থেকে উ হযে আমি আপনাব কাছে এসেছি। উ আমাকে আপনাব কাছে পাঠিযেছেন।' কোনও উত্তব নেই, নিস্তব্ধ ঘব, নিশ্চুপ এ। অ এবাব ঘাডটা লম্বা ক'বে অতি নিঃশব্দে এ সত্যি সত্যি পাতাব ভিতব ঘুমিযে পডল কিনা পবখ কবতে চাইল, এবং নিঃসংশয হযে খানিক কেশে গলা ঝেডে ব'লে উঠল, 'আমাব নাম অ,

আমাব কাজটা—', বলা শেষ না হতেই 'বিবক্ত কববেন না, ঔ-ব ঘবে যান', এ-ব কণ্ঠে যেন আদেশ, তাবপব 'ঐ আব ও সাইফাব, ওদেব দিয়ে কিছু হবে না' এমন কথায় অ সাহস সঞ্চয় ক'বে বলতে চাইল, 'ঔ-ব কাছে গেলে হবে কি ?' তখন এ কোনো বাক্য ব্যয় না ক'বে একটা কাগজ হাতে তুলে দিয়ে 'ঔ-কে দেবেন' ব'লে পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হলেন।

অতএব অ এবাব দুটি ঘব পেবিয়ে ঔ-ব ঘবেব সামনে হাজিব হল। বাইবে ভিজিটিং আওয়ার্স থ্রি,—ফাইভ এবং বাই এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট কথাগুলো লেখা, সেই লেখাব নিচে একটা ছোট পেবেকে কয়েকটি কাগজ ঝুলতে দেখে এগিয়ে গিয়ে একটা কাগজ তুলে এগুলো স্লিপপেপাব জেনে উপবেব কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে অ ঝট ক'বে নাম লিখে ফিবে চাবধাবে তাকিয়ে দেখল, কেউ নেই। 'নিশ্চয় বেয়াবা আছে।' অতএব ঘবেব বাইবে অনেকক্ষণ অপেক্ষা কবতে কবতে যখন পায় ব্যথা অনুভব কবল, তখন বুঝতে পাবল, এখানে কোনও বেয়াবা নেই বা থাকে না। কিন্তু স্লিপ নিয়ে ঘবে ঢুকতে যাওয়াব মুহূর্তে একটা হাত হঠাৎ কোথা থেকে উঠে এসে বাধা দিল। অ প্রথমে চমকে এবং পবে স্বাভাবিক হতে দেখল, হাতটিব মালিক স্বয়ং আ এবং সে-হাত-অর্থ প্রত্যাশী। আ-ব এমন আচবণে অবাক বনতে আ-ব মুখে হাসি এবং 'সব জায়গাব বীতি, তাই—' শুনতে পেয়ে তাডাতাডি পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা নোট বেব কবতে 'এ-টাকায় কি হবে ? সবাইকে দিয়ে থুয়ে—' শুনে অ দেখল, নোটটা পাঁচ টাকাব। অগত্যা আব-একটা নোট বেব ক'বে আ-ব হাতে নোট দুটো গুঁজে দিয়ে স্লিপ হাতেই ঢুকে পডল ঔ-ব ঘবে। আশ্চর্য, ঔ হাত বাডিয়ে স্লিপ টেনে নিলেন।

ঘবটা দারুণ সাজানো। ঘবেব পর্দা থেকে শুরু ক'বে টেবিল-চেয়াব এমনকি বিদ্যুৎ-আলোব মধ্যে একটা স্বপ্নেব পবিমণ্ডল, অথচ এই পবিমণ্ডলেব যিনি মধ্যমণি, তাঁব চোখ মুখ দেহ সবকিছু অ-ব সম্পূর্ণ চেনা—মোটা গোঁফ ও পুরু ফ্রেমেব চশমাব সঙ্গে ছোট্ট কপাল ও পুরু ঠোঁট, এবং সেই ঠোঁটেব নিচে একটা গভীব ক্ষতেব চিহ্ন ঔ-কে অস্বাভাবিক ক'বে তুলেছে। 'হু আব ইউ ?' ঔ-ব কণ্ঠস্ববে সমস্ত ঘব কেঁপে উঠলেও সেই স্বব স্পষ্ট নয়, কথাগুলো জডানো ও অস্পষ্ট, তাই 'হু আব'-এব পব 'ইউ' বোঝা যে কোনো লোকেব পক্ষে অসাধ্য। অ ঔ-ব কথা বুঝতে চেষ্টা না ক'বে শুধু দেখতে থাকল।

'হু আব ইউ', ও কণ্ঠ নামিয়ে নিলেন, 'কে পাঠিয়েছে।'

এতক্ষণে সম্বিৎ ফিবে পেযে অ এ-লিখিত চিবকুটটা টুক ক'বে ঔ-ব দিকে বাডিযে দিযে অবাক হযে ঔ-ব মৌখিক বেখাগুলোব সঙ্কোচন ও প্রসাবণ দেখতে দেখতে আনমনা হযে গেছে, এমন সময ঔ-ব 'ও, আই সি' কানে যেতে সটান খাডা হযে উঠল।

'আপনি ঐ এবং ও-ব সঙ্গে দেখা কবেন নি?' ঔ অ-ব উত্তবেব অপেক্ষা না ক'বে 'ছাটস ইমপ্রপাব, মাস্ট কাম থ্‌রু প্রপাব চ্যানেল, তাছাডা—' বাক্য শেষ না ক'বে ফোন তুলে 'ঐ' ব'লে ফোন নামিযে বেখে আবাব ফোন তুলে 'ও' ব'লে অ-ব দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকালেন। পলক পডতে না পড়তে ঐ এবং ও ঘবে হাজিব। অ ভেবে কুল পেল না কি ক'বে এত তাডাতাড়ি ঐ এবং ও ঔ-ব ঘবে হাজিব হল। 'একে চেনেন?' ঔ-ব আঙুল অ-ব প্রতি উত্তোলিত।

ঐ এবং ও একসঙ্গে অ-ব অপাঙ্গে দৃষ্টি বুলিযে একসঙ্গে বলে উঠল, 'না তো।' তাবপব একটু সবে এসে উভযে প্রশ্ন ছুঁডল, 'বেফাবেন্স নাম্বাব কত?'

'দেন হোযাই হি হ্যাজ কাম হিযাব।' ঔ-ব কথা বোঝা গেল না, তিনি সেই অবস্থায ফোন তুলে বললেন, 'এ।' তৎক্ষণাৎ এ ঔ-ব ঘবে উপস্থিত।

'আপনি একে চেনেন?' জিজ্ঞেস কবাব সঙ্গে সঙ্গে 'উইথ বেফাবেন্স টু ইওব লেটাব নাম্বাব ডাব্লু বি টোযেনটি থ্রি ডেটেড সেভেন-টেন-সিক্সটি-ওযান আই হ্যাভ বেকম্যানডেড হিজ কেস ফব—'

কথা শেষ না ক'বে কিছু দম নিযে আবাব আবম্ভ কবতে যাবাব মুখে বাধা পেলেন, ঔ ফোন তুললেন, 'আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ।'

সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজিব মতো টক-টক ক'বে সকলে বঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে সাব বেঁধে দাঁডিযে ঔ-ব আদেশেব প্রতীক্ষায অধীব। ঔ সকলকে একবাব দেখে নিযে কি চিন্তা ক'বে বললেন, 'কাজ কদ্দুব?'

সকলেব দৃষ্টি তখন আনতভূমি।

'আই সে, আই অ্যাম কলিং এক্সপ্ল্যানেশন ফ্রম অল অব ইউ। বলুন, কে পাঠিযেছিলেন?'

এ দৃষ্টি তুলে ঐ এবং ঔ বাদে সকলেব দিকে তাকিযে হঠাৎ দিশেহাবা ও ক্ষিপ্ত হযে চীৎকাব কবে উঠলেন, 'কে ফবওযার্ড কবেছিল?'

সকলে নিরুত্তব, ঔ ততক্ষণ একটা ফাইল টেনে দেখতে থাকলেন বলে ঈ সাহস সঞ্চয ক'বে বলল, 'বাই লেটাব নাম্বাব সিক্স অবলিক ডি আই, ফবওযার্ডেড

দি সেম টু ইউ ফব ইওব কাইণ্ড কনসিডাবেশন।'

এ কিছু বলাব আগে ও বলে উঠলেন, 'কিসেব কনসিডাবেশন।'

সকলেব পুনবায নত দৃষ্টি।

ঔ এবাব ফাইল থেকে চোখ তুলে ঈ-ব দিকে তাকিযে বিড বিড ক'বে বললেন, কেউ বুঝল না, ততক্ষণে ই ব'লে উঠল, 'আ আমাব কাছে কেস-টা বেফাব কবেছিল।'

'আ কবেছিল?'

আ কাঁপতে কাঁপতে এগিযে এসে একটা ফাইল খুলে দেখাল, 'আণ্ডাব দিস সাবকামসটানসেস হিজ কেস মে বি—'

'স্টপ!' ঔ ফাইলটা প্রায ছিনিযে পূর্বেব খোলা ফাইলেব সঙ্গে মিলিযে দেখতে দেখতে বলে উঠলেন, 'ইযেস ইযেস।' ঔ-ব চোখ জ্বলজ্বলালে সবাব চোখ জ্বলজ্বল কবতে থাকল। 'হাঁ, এই তো,' ব'লে ঔ একটা কাগজ টেনে নিযে এসে টেবিলেব উপব বেখে একবাব কাগজ দেখে চোখ তুলে প্রশ্ন ছুঁডলেন, 'বাট ওযাট ইজ দি কেস। এখানে শুধু বেফাবেন্স নাম্বাব আছে, কিন্তু অবি-জিন্যাল অ্যাপলিকেশানে কি ছিল তাব কিছুই—' বলতে বলতে তিনি আ-কে কাছে ডাকতে আ সামান্য একটু ন'ডে ওই অবস্থায জবাব দিল, 'স্যাব ওব নিচেব কাগজেই বোধ হয—'

'এক মিনিট প্লিজ,' ঔ ফাইল পডতে শুরু কবলেন। ঔ পাতাব পব পাতা পডে চললেন প্রায একখানা মহাভাবত, ততক্ষণ সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষমান, এখুনি একটা কিছু হওযাব সম্ভাবনা, সকলেব নিঃশ্বাসেব শব্দ সামান্যতম ধ্বনি তুলতে ভুলেছে, শুধু একটা টিকটিকি টিক টিক ক'বে উঠে এবা সকলে জীবন্ত তা মনে কবিযে দিযে আবাব সকলকে ঘুমেব বাজ্যে নিযে গেল। অ তখন নানাবকম চিন্তায আক্রান্ত হযে 'সফল হব, নিশ্চয এবাব—' এমন আশাব্যঞ্জক সিদ্ধান্তে নিশ্চিত মন হযে ঔ কখন পডা থামিযে সিদ্ধান্ত ঘোষণা কববে সেই মুহূর্তেব জন্য উন্মুখ হযে বইল।

সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে মিনিট, মিনিটে মিনিটে ঘণ্টা। সকলেব প্রতীক্ষা তখন বিবক্তিতে পবিণত, 'এখন ছেডে দিলে বাঁচি' অ-ব মনে যখন এমন অবস্থা তখন ঔ-ব দীর্ঘশ্বাস মোচনেব শব্দ সকলকে হঠাৎ চাঙ্গা ক'বে তুলল। ঔ কোনো কথা না ব'লে ইশাবায এ, ঐ এবং ও-কে ফাইলেব একটা জাযগা দেখতে নির্দেশ দিযে সকলকে একবাব ভালোভাবে দেখে এ, ঐ, ও-ব দিকে দৃষ্টি ফেবাতে তিনজনেব

সামান্য সম্মতিসূচক মাথা নাড়া লক্ষ্য ক'বে সম্পূর্ণ অচেনা মানুষেব মতো প্রায় জালেব আড়ালে বাজাব মতো দূবাগত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, 'আপনি মৃত।'

সঙ্গে সঙ্গে 'আপনি মৃত' কথাটি ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হযে ভীষণ শব্দ তুলে অ-কে ভাসিযে ভেঙে চুবে একাকাব কবতে উপক্রম হলে সে হাত তুলে বোঝাতে চাইল যে সে জীবিত। কিন্তু নিজেব সমস্ত প্রাণশক্তি থাকা সত্ত্বেও অ জোব দিযে উচ্চকণ্ঠে বলতে পাবল না, 'আমি জীবিত।' সে অবাক হযে প্রথমে ঔ-ব দিকে পবে সকলেব দিকে তাকিযে নিজেব সজীবত্ব ঘোষণা কবতে চাইল, তখন একটাব পব একটা ফাইল টেবিলেব উপব পাহাড়েব মতো জমতে থাকল, আব সেই ফাইলেব আড়াল থেকে প্রায অদৃশ্য হযেই ও গম্ভীবস্ববে ঘোষণা কবলেন, 'সি বাই থ্রি ফাইল বলছে যে আপনি অ ১৯১৮ সালে মৃত।'

'কি বলছেন। আমাব জন্মই হযেছে ১৯৩০ সালে। আমি কেন ১৯১৮ সালে মবতে যাব?' কিন্তু বলতে গিযে আপন মনে হোঁচট খেযে 'সত্যি আমি কি মৃত' ভাবতে কেমন দিশেহাবা হযে 'আপনি এখন যেতে পাবেন' শুনতে পেযে কিছু চিন্তা কবাব আগেই দেখতে পেল, সকলে তাকে জোব ক'বে ধ'বে টেনে হিঁচড়ে কামড়ে আঁচড়ে বাইবে বেব ক'বে দিচ্ছে। অ নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা কবতে গিযে বুঝল, বৃথা, অতএব হাল ছেড়ে দিযে চোখ বুজে শিকাবেব কিল্ হযে গেল।

আবাব সে চেষ্টা কবতে চাইল, কিন্তু তাব দেহ এদেব কবল থেকে মুক্ত হযেই সশব্দে মেঝেয পড়ে গেল।

চাল-চিত্র

চিত্ত ভট্টাচার্য

নতুন পালকে ভব ক'বে পাখি যেদিন প্রথম আকাশে ওড়ে সীতানাথ বোধহয় তেমনি এক হাল্কা আনন্দ সেদিন বিকেলে অনুভব কবল মাসেব তখনও সাতদিন বাকি। তেইশে জানুয়াবি—আগেব দিন ছুটি ছিল অফিসে। সীতানাথ ধ'বে নিয়েছিল ওব অফিসেব যখন ছুটি তখন অন্যান্য সব অফিসেই ছুটি থাকবে। কিন্তু পোস্টাফিস বন্ধ ছিল না। আব ছিল না বলেই বক্ষে, নইলে একদিনেব ব্যবধানেই চাব বস্তা চালে একশ কুড়ি টাকা বেশি লেগে যেত।

এই একশ কুড়ি টাকাটা যে বেশি লাগল না, সেটাই নানান দিক থেকে হিসেব কষে মল্লিকাকে বোঝাবাব চেষ্টা ক'বে সে একপ্রকাব পুলক অনুভব কবছিল। মল্লিকা কতটা পুলকিত হচ্ছিল, হাবে-ভাবে খুব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। সীতানাথ সেই অস্পষ্ট হাবভাবটিকে স্পষ্ট খুশি হওয়াব উচ্ছাসে পবিণত কবাব প্রযাসে নিজেব মনেই বলে যাচ্ছিল—বুঝলে, চাব বস্তা চাল, মানে তিনশ কেজি। প্রতি কেজি আমি পেলাম একশ চল্লিশ দবে। তাতে পড়ল চাবশ কুড়ি। আসলে পড়ত কত জানো? চাবশ তেইশ। কিন্তু ববি, বলবাম পালেব ছেলে, আমাকে খাতিব ক'বে একশ একচল্লিশেব জাযগায একশ চল্লিশ কবে দিল। এক পযসা ছাড়া মানে বোঝ—সলিড তিন টাকা প্রফিট।

মল্লিকা হাসি হাসি মুখে বলল—তুমি কিন্তু এখনও অফিস থেকে এসে হাত পা ধোওনি। পাযেব ধুলোগুলো অন্তত ধুযে এসে বসো। আমি চা আনি।

—প্লিজ্ মল্লিকা, আমাকে আব দুমিনিট সময দাও। আজ একটু পবেই খাব। তুমি ব্যাপাবটাব গুরুত্ব বোঝবাব চেষ্টা কবো। একটু স্থিব হযে বসো।

মল্লিকা বসল না। মিটসেফেব ওপব থেকে কেটলি নামিযে চা চাপাবাব জন্যে 'জনতা' ধবাতে গেল। সীতানাথ অসহায বোধ কবল। খানিকটা বাগও

হল। রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। অফিস, অফিস-ক্যানটিন, সর্বত্র চালের দর নিয়ে আজ সারাদিন যে-আলোচনা হয়েছে, তার পটভূমিকায় সে নিজেকে স্থাপন করেছে। সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব সকলেই তার প্রশংসা করেছে। মোট কথা যেখানেই সে গেছে, চালের দরের কথা উঠেছে, সেখানেই সীতানাথ বেশ কায়দা ক'রে কখনও বা নাটকীয় ভঙ্গিতে কখনও সহজ অনায়াসে নিজের চাল কেনার কথাটি সবিস্তারে বলে গেছে। বিশেষ ক'রে যারা চাল কিনে খায়, যাদের সংখ্যা বেশি, সপ্রশংস দৃষ্টিতে তারা সীতানাথের দিকে তাকিয়ে বলেছে: খুব ভালো করেছ। সীতানাথের চাল কেনার ব্যাপারটিকে তারিফ করতে যাওয়ার সময় তারা যেন নিজেরাই নিজেদের পিঠ চাপড়েছে। তাদের যে এখনও কেনা হয় নি, একথা ভুলে গিয়ে সীতানাথের কার্যকলাপের সঙ্গে এক-প্রকার আত্মীয়তা বোধ ক'রে তারা উল্লসিত হয়ে উঠেছে। সীতানাথের দূরদর্শিতার কথা স্মরণ ক'রে একবাক্যে স্বীকার করেছে—সীতানাথ খুব বাহাদুর ব্যাটাছেলে। কারণ গতকাল তেইশে জানুয়ারি চালের দর ছিল একশ একচল্লিশ, আজ একশ আশি।

দুপুরে ক্যানটিন থেকে চা খেয়ে আসতেই পাশের সিটের পরমেশ জানাল—বড়বাবু তোমার খোঁজ করছিলেন দাদা।

সীতানাথ চিন্তিত হল। অনুচ্চ স্বরে বিড বিড ক'রে উঠল—হঠাৎ আবার বড়বাবুর তলব কেন?

অবস্থাটা বোধহয় বুঝল পরমেশ। বলল—দাদা, তোমাদের ওই এক দোষ। বড়বাবু শুনলে তোমরা একেবারে কেঁচোর মতো হয়ে পড়ো।

সীতানাথ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গেল। কারণ ও জানে এরপর অফিস ইউনিয়নের সেক্রেটারি পরমেশ ওকে স্বাধিকার, স্পষ্টবাদিতা, নির্ভীকতার বিষয়ে অন্তত ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা শোনাবে।

পাশের দুটো ঘর পেরিয়ে সীতানাথ বড়বাবুর ঘরের দিকে পা বাড়াল। বড়বাবু রমণীকান্ত ঘোষ ভালোও নন খারাপও নন, কেমন একটা হিজড়ে মার্কা ব্যক্তিত্বহীন হাবা-গোবা টাইপের ভদ্রলোক। ওঁর হাসিটা অদ্ভুত ধরনের। যে কোনো কথা বলার আগে—তা সিরিয়াস হোক বা নর্মালই হোক—উনি হাসেন। হাসেন মানে ওপর নিচের ঠোঁট দুটো ক্রমশ কানের কাছে গিয়ে নিঃশব্দে ঠেকে, আর ওপরের বাঁধানো দাঁতের

পাটিটা বের হয়ে পড়ে। চোখ দুটি এমনিতেই ছোট। নিঃশব্দ ওই আকর্ণ বিস্তৃত হাসির প্রাক্কালে চোখ দুটি সম্পূর্ণ বুজে যায়। এই অবস্থাটি থাকে প্রায় মিনিট খানেক।

সীতানাথ পুরনো লোক, তাই। নতুন কেউ যখন বড়বাবুর কাছে আসে কোনো কাজে, তখন দেখা যায় তারা ঐ হাসি দেখে অজ্ঞাতসারে নিজেরাই হঠাৎ সশব্দে হেসে ফেলেছে। হেসেই অবশ্য সামলে নেয়। কারণ, অফিসের খোদ কর্তার সামনে হেসে ফেলা গর্হিত একটা অপরাধ।

সীতানাথ বড়বাবুর ঘরের পর্দার একপাশে টুলে ব'সে থাকা আর্দালি হরিপদকে জিজ্ঞেস করল নিচু গলায়—স্যার রয়েছেন? বুড়ো হরিপদ উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম দিয়ে পর্দাটা তুলে ধরল। সীতানাথ প্রবেশ করল।

—স্যার আমাকে ডেকেছেন?

সীতানাথের স্যার রমণীকান্ত ঘোষ, পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী মিনিট খানেক হেসে চোখ বুজে রইলেন। পরে চোখ খুলে সীতানাথকে বসতে বললেন—বসুন, বসুন। সীতানাথের তর সইছিল না—স্যর কিছু বলছিলেন?

—শুনলাম আপনি চার বস্তা চাল কিনেছেন একশ চল্লিশ দরে? আপাদমস্তক শিহরিত হয়ে বলল সীতানাথ—হ্যাঁ স্যার। গত বছরের শেষের কয়েক মাস প্রায় ভিখিরীর দশা হয়েছিল। ঠোঙায় ক'রে কখনও তিন, কখনও সাড়ে-তিন টাকা দরে প্রতিদিন এক-আধ কেজি যোগাড় করতে করতে মারা যাবার উপক্রম। তাই গত বছরেই স্যার ঠিক ক'রে রেখেছিলাম, নতুন চাল উঠলেই ।

—শুনুন সীতানাথবাবু, আমাকেও চাল কিনে খেতে হয়। আমারও মতলব ছিল দর পড়লে বস্তা কয়েক চাল কিনে ফেলব।

—তাহলে আর দেরি করবেন না স্যার। এই বেলা যোগাড় করে ফেলুন। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আজকের দর একশ আশি। কাল যে দুই হবে না, কে বলতে পারে। তাই বলছিলাম যা দিন কাল পড়েছে, টাকা ফেললেও হয়তো ।

—সে-কথা একশ বার। আপনি কিন্তু ঠিক মওকা বুঝে একশ চল্লিশে পেয়ে গেছেন। কোন দোকান থেকে কিনলেন?

—সে আপনি চিনবেন না স্যার। বলরাম পালের ছেলেকে বলে রেখেছিলাম। সন্ধে বেলায় ওদের বাড়িতে দুটো ছেলেকে পড়াতে যাই। ও-ই

আমাকে সব ঠিকঠাক ক'রে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

—ওকেই একটু বলুন না সীতানাথবাবু। যদি বস্তা দশেক চাল পাইকারি দরে একটু সুবিধা ক'রে দিতে পারে। দামটা হঠাৎ যে একেবারে আগুন হয়ে উঠল। সীতানাথ প্রচণ্ড অস্বস্তি অনুভব করল। পাইকারিই হোক, খুচরোই হোক, চালের দাম এখন সোনার দরের মতোই একেবারে বাঁধা। দিনকের দিন দর পাল্টিয়ে উর্ধ্বমুখী। মুখে বলল—বলব স্যার, নিশ্চয়ই বলব।

শুনে বড়বাবু আর-একবার হাসলেন। চোখ দুটি বুজে গেল। সীতানাথ তারই মাঝখানে বের হয়ে আসবার অনুমতি চাইল। বড়বাবু হাসির নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয় নি বলে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি দিলেন। সীতানাথ গুটি গুটি বের হয়ে এল।

হরিপদ টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সীতানাথের পায়ের ধুলো নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে জিভে ঠেকাতে গেল। সীতানাথ স্তম্ভিত।

হরিপদ সেলাম যে মাঝে মাঝে করে না তা নয়, তবে একেবারে পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে বুকে ঠেকানোটা সম্পূর্ণ নতুন মনে হল। এবং ভালো লাগল না। ওর কাঁধে এক হাতের চাপ দিয়ে বলল—ধুলো-টুলো জিভে ঠেকানো ভালো নয়। ওতে অনেক রোগের জীবাণু থাকে। জীবাণু কথাটা বলবার আগে ব্যাকটিরিয়া শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে ঢোঁক গিলে সে শব্দটাকে খেয়ে নিল। এবং এই আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার জন্য তার সামান্য হাসি পেল। ভাবল হরিপদকে বিতরিত এই বৈজ্ঞানিক উপদেশটি বৃথাই ব্যয়িত হলো। কারণ হরিপদরা জন্মাবধি ধুলো খেয়ে খেয়ে ইমিউনড হয়ে গেছে।

চলে আসতে গিয়ে থেমে গেল সীতানাথ। জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার চাল কেনার টাটকা সংবাদটি বড়বাবু জানল কি ক'রে। তবে কি হরিপদ এই পর্যন্ত ভাবতেই হরিপদর কথা মনে এসে গেল বলেই সীতানাথ হরিপদকে ইশারায় ডাকল।

সামান্য একটু গম্ভীর হবার কায়দা নিয়ে সীতানাথ প্রশ্ন করল—আমি চাল কিনলাম বড়বাবু জানলেন কি করে? তুমিই বোধহয় বলেছ?

হরিপদ ঘাবড়ে গিয়ে অপরাধীর ও নতুন বৌয়ের লজ্জা নিয়ে ঘাড় হেলিয়ে হাত জোড় করল।

—হ্যাঁ হুজুর, বলে ফেলেছি। আপনারা যখন ক্যান্টিনে । ওর গলাটা

ধ'রে আসছিল দেখে সীতানাথ মৃদু শব্দে হাসল। কারণ পুনরায় গম্ভীর স্বরে কিছু বললে হরিপদ ওই একই পোজে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, অন্তত সীতানাথ যতক্ষণ না স্থান পরিত্যাগ করে। তাই বলল—বেশ করেছ হরিপদ। তাতে আর খারাপ কি ?

হরিপদ সেই দশা থেকে মুক্তি পেয়ে ফের প্রবল খুশিতে সীতানাথের পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে ঠেকাতে যেতেই সীতানাথ ওর হাতটা খপ ক'রে ধরে ফেলল—ছিঃ, ধুলো খেওনা।

হরিপদ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে হাতটা আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে মাথায় ঠেকাল। সীতনাথ পা বাড়াল।

চার বস্তা চাল কেনার ব্যাপার নিয়ে এই ধরনের অনেকগুলো ছোট-বড় ঘটনা ও আলোচনার আবর্তে হাবুডুবু খেয়ে সীতানাথ তাই যখন বাড়ি ফিরল, তখন ও নিজেকে সামলাতে পারছিল না। মাঝে মাঝে একটা উজ্জ্বল আরাম ও আনন্দের আমেজ আসছিল যে সারা বছরটায় আর তাকে 'চাল' 'চাল' ক'রে হন্যে হয়ে ঘুরতে হবে না।

গতকাল চাল কেনার সময় সীতানাথ এতটা গুরুত্ব অনুভব করে নি, যতটা আজ করছে। আজকের সারাদিনের ঘটনাপুঞ্জকেই এর জন্য দায়ী বলা চলে। উত্তেজনার আবেগে তাই সীতানাথ অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মল্লিকার উল্লাসহীন আচরণে ও খানিকটা স্তিমিত হয়ে পড়ল। তবে হাল ছাড়ল না। পুরুষের গলায় যতটা কোমলতা আসে সেই রকম ভাব নিয়ে করুণকণ্ঠে ডাকল—মলি শোনো। তোমার চা হল ?

—ছাঁকছি।

—আদা দিয়েছ ?

—না, আজ খেজুর গুড়ের।

—ফাইন, তা তুমি এতক্ষণ বলোনি যে।

সীতানাথের মোলায়েম কণ্ঠস্বর শুনে মল্লিকা বুঝল তার আজ নিস্তার নেই। চালের ব্যাপার নিয়ে সারাদিন যা যা হয়েছে সবকিছু শুনতে হবে—বক বক মানুষটা করবেই। হাসতে হাসতে চায়ের কাপ নিয়ে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল—সারাদিন বুঝি হৈ চৈ হল তোমার চাল কেনা নিয়ে ?

ব্যাস, আর যায় কোথায়। শুধু এইটুকু শুনেই আহ্লাদে মূর্ছিত হবার উপক্রম। হাতে চা না থাকলে হয়তো সীতানাথ । যাই হোক, সেই আদিম

আবেগেব প্রাথমিক বেগ সামলিযে সে আপ্লুত স্ববে বলল—জানতাম, মহাবাণী না শুনে থাকতেই পাববেন না। শোনো, তাহলে প্রথম থেকেই বলি।

—শুনছি। কিন্তু আমি বলছিলাম, চাল কেনাব ফুর্তিতেই তো আছো। এদিকে বস্তাগুলো যে ডাং হযে পড়ে বইল দালানেব মেজেয। ওগুলো বাখাব ব্যবস্থা কিছু ভেবেছ ?

—ভাবাভাবিব কি আছে ? খানকযেক ইঁটেব ওপব পাটা বেখে তাব ওপব বস্তা কখানা চাপিযে দিলেই ল্যাটা চুকে যাবে।

মল্লিকা চোখ গোল গোল ক'বে বলল—শোনো কথা, অত সহজ নয মশাই। দুপুবে বোসগিন্নী বেড়াতে এসেছিলেন। ওঁদেব তো আব চাল কিনে খেতে হয না। চাষেব চাল—চালেব কাববাব।

—তাতে কি ?

—উনিই বলছিলেন। চাল তে কিনেছ বৌমা। বাখতে জানো তো ? আমিও তোমাব মতো বলেছিলাম। শুনে উনি হেসে খুন। ও হবি, তোমায বলা হযনি। বোসগিন্নী একজোড়া এমন ফাইন বাউটি গড়িযেছে।

সীতানাথেব তব সইছিল না।

—বাউটি-মাউটিব কথা বাখো। চালেব কথা কি বলছিলে বলো।

—বলছিলেন যে চালকাল থেকে এক বস্তা কুঁড়ো কিনে এনে চালেব সঙ্গে মিশিযে বস্তায বাখতে হবে। নইলে সুরুই লেগে সব নষ্ট হযে যাবে।

—এক বস্তা কুঁড়ো। সীতানাথ অসহায দৃষ্টিতে তাকাল।

—শুধু কুঁড়োব কথা শুনেই তো ঘাবড়ে গেলে। এত সকাল সকাল চাল কেনা হল। নতুন চাল। এখনো বস মবেনি। মাঝে মাঝে ছাদে নিযে গিযে বোদ লাগাতে হবে। আব সেই সময মাসে যেটা লাগবে, কুঁড়ো খুদ পাছড়ে নিতে হবে। হবিমতীকে বলেছি। জলতোলা বাসনমাজাব জন্যে তো দশ টাকা দিই। এব জন্যে বাড়তি আবো একটা টাকা দেবো। ও বাজি হযেছে।

—কিন্তু ছাদে তোলা, নামানো—এসব, প্রতি মাসে এত ঝঞ্ঝাট। মল্লিকা আমি মাবা যাব।

—আহ্হা, তুমি একলা কববে কেন ? আমিও যতটা পাবি সাহায্য কবব।

—পাগল হযেচ।

—না, না মল্লিকা. তুমি বিশ্বাস কবো , এমন জানলে কোন শালা চাল কিনত।

—অনর্থক বাগ না ক'বে তুমি ববং তোমাদেব আড্ডা থেকে একটু ঘুবে এসো।

—দূব তোয আড্ডাব নিকুচি কবেছে। মেজাজটাই যদি । সীতানাথ আব একবাব পূর্বোক্ত অশ্লীল শব্দটা উচ্চাবণ কবতে গিযে সামলে নিয়ে উঠে দাঁডাল। মল্লিকা হাসল।

—ঘুবে এসো না। তোমাকে তো এ মাসেই কিছু কবতে হচ্ছে না। ঘবে মা-লক্ষ্মী বযেছেন। দেখবে, মেজাজ এমনিতেই কত নবম হযে গেছে। কত উগ্যম আসবে।

মুখ ভাব ক'বে সীতানাথ দবদালান ছাডিযে উঠোনে নামল।

তখন ঘবে বেডিযো খোলা ছিল। কডা নাডাব শব্দ শুনে মল্লিকা তাডাতাডি দবজা খুলে দিযে এল। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সবেমাত্র 'সংবাদ-পবিক্রমা' শেষ কবলেন। সীতানাথ ঘবে ঢুকে অনুশোচনাসূচক একটি শিশধ্বনি প্রযোগ ক'বে বলল—ভীষণ দেবি হযে গেল।

—তাতে কি হযেছে। মল্লিকাব গলায অন্তবঙ্গতাব সুব। আড চোখে দেখল। দেখে স্বস্তি পেল।

সীতানাথেব মেজাজ সত্যিই পাল্টিযে গেছে। মল্লিকাকে কাছে ডাকল—ভাগ্যিস তুমি বেডিযে আসতে বললে। তবে আজ আব আড্ডা জমেনি। সাবাক্ষণ ওই চাল-সংবক্ষণ-প্রণালী সংক্রান্ত বিবিধ আলোচনা হল। এবং বক্তাবা প্রত্যেকেই বোঝাবাব চেষ্টা কবলেন যে তাঁব যুক্তিটি বিজ্ঞানসম্মত।

—আমি একটা কথা বলব ?

—বলো।

—বলছিলাম, আমাব বান্না হযে গেছে। খাওযাব পাট চুকিযে তাডাতাডি বিছানায গেলে হতো না ? ওখানে মশাবি খাটিযে শুযে শুযে তোমাদেব আলোচনাব কথা শুনতাম। সেই কখন থেকে একলাটি বসে থেকে থেকে মশাব কামডে পা চুলকে চুলকে মাবা গেলাম।

—বেশ তা বাজি আছি। তবে এক শর্তে। নতুন কিছু নয, কিন্তু শর্ত পালনে তুমি-প্রাযই গাফিলতি কবো।

—বিশ্বাস করো, আজ অনেকক্ষণ জেগে থাকব।

মশারির চালের উপরে বেডল্যাম্পের মায়াবী আলোয় পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে শুয়ে শুয়ে ওরা গল্প করছিল—সীতানাথ আর মল্লিকা। সীতানাথ ভাবছিল আর বলছিল—ছাখো, পৃথিবীতে কত সমস্যা। ভিয়েতনামে যুদ্ধ চলছে তো চলছেই। উ থানট বলেছেন—এই যুদ্ধে আমেরিকার যেখানে হারজিতের কোনো প্রশ্ন নেই, তখন কেন এই মানুষ-মারার বিশাল আয়োজন। ওদিকে সুয়েজ ক্যানেল বন্ধ থাকার দরুন নাকি গমের জাহাজকে ঘুরে আসতে হচ্ছে। আমরা নাজেহাল। কচ্ছ ট্রাইবুনালের রায় নিয়ে সংসদে হৈচৈ। প্রত্যেকটাই সমস্যা, বিশাল সমস্যা।

মল্লিকা ছোট্ট একটা হাই তুলে অনেকটা ঘন হয়ে সীতানাথের বুকে মুখ ঘষল। ওর বড়ো বড়ো চোখের পাতায় তখন অন্য একটি আকুতি। বলল—তুমি অনেকটা দূর থেকে আরম্ভ করেছ লক্ষ্মীটি। আমাদের চাল রাখার কথাগুলো চটপট ব'লে ফেলো, নইলে রাত কাবার হয়ে যাবে।

সীতানাথ সাগ্রহে বলল—সেই কথাতেই তো আসছি মলি। বলছিলাম এই সব হাজারো চরম সমস্যার মধ্যে আমাদের এই ছোট্ট দুজনের সংসারে ঠিকমতো চাল রাখার সমস্যাও একটি সমস্যা। এবং গুরুত্বের দিক থেকে বিশ্ব-সমস্যার চেয়ে কোনো অংশে কমতি নয়। এইটি ভেবেই আমি অবাক হচ্ছি। যাক গে, আমাদের আলোচনার কথায় আসি। জানো মল্লিকা, চাল রাখার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পেট্রোলের বা সরষের তেলের খালি বড়ো ড্রামে ভর্তি করে রাখা। এতে সুরুই পোকা ধরবে না বা ইঁদুর টিঁদুরে চাল নষ্ট করতে পারবে না। অবিনাশদাবা এইভাবেই গত বছর রেখেছিলেন।

মল্লিকাকে উৎফুল্ল দেখাল—বেশ তো, তাহলে গোটা কয়েক ড্রাম নিয়ে এলেই তো ভালো হয়।

সীতানাথ মল্লিকার মুখের ওপর থেকে আলগোছে একগুছি চুল সরিয়ে দিয়ে বলল—হ্যাঁ, ভালো নিশ্চয় হয়। কিন্তু ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে। এক-একটা ড্রামের দাম জানো। বলো তো কত?

মল্লিকা ঘাড় নাড়ল।

—জানো না, আন্দাজমাফিক বলো।

—কতো আর, গোটা দশেক।

—ষাট। একটায় ধরবে না, অর্থাৎ দুটো ড্রামে হানড্রেড টোয়েন্টি।

মল্লিকা আর-একবার-হাই তুলবার জন্যে হাঁ করেছিল। হাই উঠল না বটে, তবে সেই হাঁ-করা অবস্থাতেই বিস্ফারিত দৃষ্টি দিয়ে সীতানাথের মুখাবয়বে এমনভাবে তাকাল যেন ও আর কোনোদিনই চোখের পাতা বা ঠোঁট দুটো বুজতে পারবে না।

দেখে সীতনাথ খুক খুক ক'রে হাসতে গিয়ে ঘর কাঁপিয়ে নিস্তব্ধতাকে ছাপিয়ে হো হো ক'রে হেসে উঠল। ফলে সীতানাথের বুকের ওপর রাখা মল্লিকার মাথাটা দোল খেয়ে ওর বাঁ হাতের বাহুর ওপর গড়িয়ে পড়ল।

—এ্যাই, কি অসভ্যতা হচ্ছে। আমার ভয় করছে, চুপ করো। মল্লিকা সীতানাথের মুখ চাপা দিল।

—অত জোরে বুঝি এত রাত্রে হাসে। আশেপাশের কেউ যদি জেগে থাকে, কী ভাববে বলো তো ?

—সত্যি মিথ্যে কিছু একটা বললেই হবে। অবশ্য তারা যা ভাববার আগেই ভেবে নেবে। বললেও রেহাই নেই। যাই হোক, ড্রামের সাজেশান তা-হলে নাকচ হয়ে যাচ্ছে আলোচনার আগেই। ড্রামটা থাকলে সুবিধা হতো কি জানো,—অই কুঁড়ো মেশানো, রোদে দেওয়া, পাছড়ানো, ছাদে তোলা, নামানো—এসব কিছু করতে হতো না। শুধু খানিক শুকনো নিমপাতা চালের মধ্যে রেখে দিলেই ল্যাটা চুকে যেত।

—ড্রাম যখন হচ্ছে না তখন, ও নিয়ে ভেবে লাভ কি।

—ঠিক, কিন্তু নিমপাতার ব্যাপারটা।

—মনে পড়েছে বটে। কোথাও যেন আমিও কথাটা শুনেছি। একটা আবিষ্কারের উল্লাসে মল্লিকাকে খুশী দেখাল।

ঠিক হল নিমপাতা আসবে। তারো আগে মল্লিকা সীতানাথকে এক প্যাকেট গ্যামাক্সিন ও দু-প্যাকেট র‍্যাটফো আনবার কথা মনে পড়াল।

ঘরে ইঁদুরের উৎপাত এমনিতেই বেশি। চালের বস্তা থাকলে তো কথাই নেই। মচ্ছব লেগে যাবে। আর পাটার তলায় দেওয়ালের ধারে ধারে গ্যামাক্সিন ছড়িয়ে দিতে হবে, নইলে পোকা-টোকা লেগে যাবে।

সীতানাথ মনোযোগ দিয়ে মল্লিকার কথাগুলো শুনছিল। শেষ হলে শুধাল—আর কি ?

—উঁহু, এখনো আছে। দবদালানেব কড়িবরগাব ফাঁকে ফাঁকে ওঁবা যে স্বামী-স্ত্রী বযেছেন, ওঁদেব কথা তো একবাবও ভাবলে না। বোর্ডিং ফ্রি, কিন্তু এই দুর্মূল্যেব বাজাবে । ঠুকবে ঠুকবে চাল খাবে এবং ছড়াবে। কাজেই এব প্রতিকাবেব উপায হিসেবে ঠিক হল যে সীতানাথেব বাতিল হওযা ধুতি-গুলো ভাঁজ ক'বে চালেব বস্তাব ঢাকা দেওযা হবে।

সব মিলিযে ওবা ঠিক কবল—চাল এক দানাও নষ্ট হতে দেবে না। মল্লিকাও ঘোষণা কবল যে এমনভাবে বান্নাব সময চাল নেবে যাতে এক মুঠো ববং কম হয, কিন্তু কোনোক্রমে ফেলা না যায।

আলোচনা শেষ হতে ওবা নিশ্চিন্তে ঘুমোবাব চেষ্টা কবল। মল্লিকা আব না হেসে থাকতে পাবল না। বলল—আজ কিন্তু আমি আমাব প্রতিশ্রুতি ঠিক মতো পালন কবছি। সে নিযে বাবু একটি বাবও কোনো উচ্চবাচ্য কবলেন না।

—তোমাব সঙ্গে কথাবার্তা বলাব সময আমি একবাবও যে ভাবিনি তা নয।

—বাহবা, মিথ্যে কথা জিভেব ডগায সব সময তৈবি থাকে, না? শুনে শবীব জুড়িযে গেল। আমি কিন্তু এখন ঘুমোব না।

—মানে।

—মানে ঘুম আসছে না। ভাতঘুম চটিযে ।

সীতানাথ মল্লিকাকে একটু ঠেলা দিল—তুমি একবাব উঠবে?

—হঠাৎ?

—তেষ্টা পেযেছে।

—আমি এমনিতেই উঠতাম। কানেব পাশে একটা মশা ভোঁ ভোঁ কবছে।

—মেবো না যেন।

—কেন?

—জানো মলি, একটা জাপানি, কিংবা ঠিক মনে পড়ছেনা, মোট কথা বিদেশী কবিতায পড়েছিলাম—বন্দনা কবি ওই মশকীকে, যে তোমাব আমাব মধ্যে দংশনেব মাধ্যমে বক্তপান ক'বে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন কবছে অনন্ত উল্লাসে।

—হবি, হবি। আমি তোমায জল এনে দিযে ওটিকে মাবব। নির্বিকাব

গলায় কথা কটি ব'লে মল্লিকা বিছানা থেকে নেমে নিয়নের সুইচ নামাতেই উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে গেল। সীতানাথ উঠে বসল এবং নেমে পড়ল।

—তুমি নামলে যে?

—একটা সিগারেট খাব, অবশ্য তুমি পারমিশন দিলে।

—রাতদুপুরে সিগারেট পাবে কোথায়? আজকাল বুঝি আমায় লুকিয়ে লুকিয়ে প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট কেনা হয়?

—দাঁড়াও কথাটা বলি। নইলে সিগারেটের নাম শুনলে তোমার আবার যে এলার্জি আছে, শেষে একটা রাগারাগি ক'রে বিছানায় উঠবে।

—মোটেই আমার কোনো এলার্জি নেই। যাই হোক, এতক্ষণে নিশ্চয়ই সিগারেট পাওয়ার গপ্পটা বানানো হয়ে গেছে।

—বানানো নয় মল্লিকা। তুমি চিনবে না। একজন ও বেলায় একটা গোল্ড ফ্লেক অফার করেছিল। ভুলেই গিয়েছিলাম।

সীতানাথ কেমন অবোধ বালকের মতো মল্লিকার দিকে তাকাল। দেখে শুনে মল্লিকা রাগ করতে গিয়েও পারল না। হেসে ফেলল—ভুলেই গিয়েছিলে? ড্রেসিং টেবিল থেকে দেশলাই ও পকেট থেকে সিগারেটটা এনে সীতানাথের হাতে দিল—নাও, ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করো। আমার আর কি। কাগজে পড়ি ক্যানসারের কথা, তাই।

—মাঝে মাঝে এক-আধটা খেলে কিস্যু হয় না মলি। বরং মন প্রফুল্ল থাকে। মল্লিকা কথা বাড়াল না। জল এনে দিয়ে বলল—তুমি এসো, আমি উঠছি।

খানিক পর সীতানাথ আলো নিভিয়ে এল।

—একটা কথা বলব? অবশ্য তোমার চোখে ঘুম নেই দেখেই বলতে ইচ্ছে জাগছে।

—একটা কেন, জেগে যখন রয়েছি তখন যা মনে আসছে বলে ফেলো।

—দ্যাখো, আমার সিগারেট খাওয়া নিয়ে মনে কোনো রাগ-রোষ নেই তো? কারণ কথাটা সিগারেট খেতে খেতে মাথায় এল। ঠিক কথা নয়—একটা প্ল্যান।

—ভণ্ডামি রেখে বলো।

—না, তুমি রেগে রয়েছ।

—বলছি রাগি নি।

—তবে একটু হাসো । গুড, এইবার শোনো। বলছিলাম যে, আর দু-চার বস্তা চাল কিনলে হয় না ?

—কি হবে ? সারা বছরের চাল তো হিসেব করে কেনা হল।

—ব্যবসা করব।

এইবার মল্লিকা শরীর দুলিয়ে হেসে উঠল—তুমি প্রলাপ বকছ। এত রাত জেগে থাকলে এমনি আবোল-তাবোল চিন্তা মাথায় আসে।

—মলি শোনো।

—ঘুমিয়ে পড়ো লক্ষ্মীটি। নাও, আমি পাশ ফিরছি।

সীতানাথ আশা ছাড়ল না। ওকে বলল—আহ্‌া, প্রলাপটাই শোনো না। চার বস্তায় দেখলে তো তিন শো কেজি ধরে। একশ আশি ক'রেও যদি কিনে এখন স্টক করি তো চার-পাঁচ মাস পর সাড়ে তিনশো থেকে চারশো টাকা লাভ।

—সব বুঝলাম। কিন্তু অত টাকা পাবে কোথায় ? এ-চাল কিনতেই তো সেদিন পোস্টাফিসের টাকা প্রায় সব শেষ হল। শ খানেক পড়ে থাকল মাত্র।

—সে-কথাও ভাবা হয়ে গেছে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে ম্যাক্সিমাম লোন নেব। আর তুমি যদি রাজি থাক, চার বস্তার জায়গায় আট-দশ বস্তা কিনে ফেলতে পারলে তো কথাই নেই। হাজার টাকার একখানি কড়কড়ে নোট তোমার পার্সোন্যাল ফাণ্ডে বাড়তি জমবে। ইচ্ছে করলে পুজোয় দীঘা অথবা দার্জিলিং। কত লোকই তো যায়, কত লোকই তো যাচ্ছে। আমাদেরও কি মন যায় না ? তোমারও কি সাধ যায় না ? চলো না একবার ঘুরে আসি। আর যদি কোথাও যেতে মন না যায়, বলো, বোসগিন্নীর মতো রাউটির অর্ডার দিয়ে আসি স্যাকরা বাড়ীতে।

বলতে বলতে সীতানাথ কাঁপছিল আবেগে। মল্লিকা নিথর পাথর হয়ে শুনছিল। যেন চারিধারে অনেক লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, তাই তাদের কানে যাতে না যায়, সেইভাবে ফিসফিসিয়ে বলল মল্লিকা—এতে যে পাপ হবে।

—পাপ। কিসের পাপ মলি ?

—এত এত বাড়তি চাল কিনে রাখা। দেশের লোক যখন খেতে পাচ্ছে না, তখন আমরা অনর্থক এত বাড়তি চাল কিনে

—আমি ভেবেছি মলি। এ-চিন্তা আমারও এসেছিল। কিন্তু তুমি ছাখো। আমরা যদি কয়েক বস্তা চাল বাড়তি কিনে স্টক না করি, তাহলেই কি দেশের লোকের অন্নাভাব দূর হবে? অথচ কিনে রাখলে প্রায় হাজার টাকা লাভ।

—ঠিকই। তবে আমি অন্য কথাও ভাবছি। ঘরে যেদিন আড্ডা বসে—পরমেশ ঠাকুরপো, গোকুলবাবু, শীতলদাবা আসেন—ব'সে যে মুনাফাখোরদের শ্রাদ্ধ করো, হাজার গাল পাড়ো, তখন তোমার কোনো মেণ্টাল স্ট্রেন হবে না? তাছাড়া অত চাল দর-দালানে পাহাড় হয়ে বস্তাবন্দী পড়ে থাকলে ওঁরাও তো শুধোতে পারেন। কী বলবে?

সীতানাথ অকূল দরিয়ায় যেন খড়-কুটো ধ'রে ভাসবার চেষ্টা করছে। বলল—বলব আমাদের এক আত্মীয় কিনে এখানে রেখে গেছেন। তাঁদের ঘরে রাখবার জায়গা নেই। হোয়্যার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে। এখন বলো রাজি কিনা?

—আমার বাপু ভয় লাগছে। এ ধরনের কথা, আগে কই কখনও বলে নি তো।

—বলছি কি সাধে। চারদিকে তো দেখছি, শুনছি। দুমাস পর যদি কোনো রাস্তা দিয়ে যাই তো চোখে পড়ে আপ-টু-ডেট প্যাটার্নের বাড়ি ছবির মতো ভুঁই ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। খোঁজ নাও, দেখবে কালোবাজারের পয়সা। একটু চোখ মেলে তাকাও। ছাখো। পৃথিবীর প্রাক্তন মূল্যবোধ সব তছনছ হয়ে গেছে। মরালিটি ইজ নাথিং বাট ওয়াণ্ট অব অপারচ্যুনিটি। আমরা যারা মধ্যবিত্ত, সাধারণ, তারাই শুধু আঁকড়ে ধরে রয়েছি মূর্খের মতো। তুমি অস্বীকার করতে পারো?

—সব বুঝছি। কিন্তু ভেবে ছাখো, এর মধ্যেই তোমার মানসিক প্রতিক্রিয়া কি রকম আরম্ভ হয়েছে। এসব ভালো নয়, একদম ভালো নয়।

—ভালো, আলবৎ ভালো। তুমি শুনবে? আমাদের হেডক্লার্ক সেদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন—এবছর আর দেশ থেকে ধান ভানিয়ে চাল করে আনব না। এখন দর শস্তা। কিনে খাব। পরে দর উঠলে ধানগুলো বেচে দিয়ে আসব। গত বছর চল্লিশ দরে বিক্রি ক'রে প্রতি বস্তায় সত্তর টাকা ক'রে মার খেয়েছি। এবার তার শোধ তুলব।

—এবার নেমেও তো যেতে পারে। গতবার খরা ছিল।

—শোনো কথা, এগারো-হাত কাপড়েও যারা কাছা দিতে পারে না, তাদেরকেই না মেয়েছেলে বলে! দশগুণ ফসল ফললেও কোনো লাভ নেই। একবার রক্তের স্বাদ পেলে বাঘের বাচ্চার অন্য রক্তে তৃপ্তি আসে না, শোনোনি?

—শুনেছি। কিন্তু তাহলে আমরাও যে এক হয়ে যাব। কোনো তফাৎ থাকবে না। হাজারো সমস্যার মাঝে এই যে বেঁচে রয়েছি, এর মধ্যে একটা গর্ব আছে।

—ঐ ভুয়ো গর্বটি আপাতত কয়েক বছর শিকেয় তুলে রাখলে ধরণী রসাতলে যাবে না মল্লিকা। তবে যদি ঘোরতর আপত্তি না থাকে, তাহলে অন্ত তএ-বছরটা কিছু বাড়তি কামিয়ে নিতে পারো।

সীতানাথ হাসতে হাসতে বলল—আর কয়েক মাস পরেই বেবিফুড কিনতে হবে ব্ল্যাকে। ব্ল্যাকের জিনিস ব্ল্যাকের টাকায় কিনব। এই ডামাডোলের বাজারে কোনো পাপ নেই মল্লিকা। বরং আমরা ভালোভাবে বেঁচে, যে আসছে তাকে ভালোভাবে বাঁচাব—এতেই চরম পুণ্য।

মল্লিকা শিউরে উঠে সীতানাথকে জড়িয়ে ধরল—বলতে নেই, আর বলে না এসব কথা।

অজানা আশঙ্কায় মল্লিকার দু-চোখের কোল ছাপিয়ে তখন ঘন অশ্রুর বন্যা।

রোরুদ্যমানা মল্লিকার চুলে বিলি কাটতে কাটতে সীতানাথ মল্লিকার এই ভাবান্তরে সহসা বিব্রত হয়ে পড়ল। এবং ওকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দেখল কোনো কথাই গলা থেকে বের হচ্ছে না। তাই কেমন একটা বোবা যন্ত্রণার অস্থির ঘোরে মল্লিকার পাশে ক্রমশই ক্লান্ত হতে হতে অবশেষে নিঃসঙ্গ সীতানাথ ঘুমিয়ে পড়ল।

দরজা ছেড়ে দাঁড়াও

প্রভাকর মাঝি

দরজা ছেড়ে দাও : হাওয়া আসুক।
এক ঝলক দক্ষিণের তাজা হাওয়া।
ও তোমার বয়স্ক-অলিন্দে মালতী ফুলের গন্ধ এনেছে।
ওকে খোলা মন নিয়ে স্বাগত জানাও।
সময় স'রে দাঁড়াক,
নতুন ক'রে বাঁচো।

একরাশ প্রথম বসন্তের রঙ মাখানো
দুরন্ত হাওয়ার হিল্লোল
উদ্দাম উতরোল।
তোমার পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো এলোমেলো হয়ে যাক।
ওখানে বড়ো বেশি তত্ত্ব আর পণ্ডিতি প্রলাপ,
মানুষকে-ভালোবাসবার ভান,
এবং সেই সঙ্গে দেব্‌তা বানাবার।

আমরা দেব্‌তা হতে চাই নে,
জীবনের জটিলতা আর কুটিলতা নিয়ে
মানুষ হয়েই বেঁচে থাকতে চাই।
তুমি দরজা থেকে স'রে দাঁড়াও।
ভেজা মাটির গন্ধ মাখা দুঃসাহসী হাওয়ার সওয়ার হয়ে
আমরা দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়ি।

সময় এবং আলোকবর্তিকা বিষয়ক কবিতা

মুকুল গুহ

সমস্ত সময়ই সুসময়, এখনই নির্দিষ্ট ক্ষণ সুসময় ,
অশ্বত্থায় প্রহব খুঁজলে
ক্রমাগত সদব দরোজায প্রভু তুমি নেই, চুম্বকেব মতন মৃত্যুটান—

বাসস্ট্যাণ্ডে নাবীব হাওযায প্রশ্ন ওড়ে—তুমি কি পুরুষ
ওহে তুমি কি পুরুষ,
তবে কেন প্রত্যহেব দান ক্লান্ত বিছানায
তবে কেন ভালোবাসা নেই
আপন ইচ্ছায প্রত্যহের জন্ম দিতে পাবো না

পা বাড়িযে দেখ জল খুব শীতল নয হিম নয
ভয় নেই,
পৃথিবীব শস্যক্ষেত্রে এখনই সময হল আমাদেব
শস্য বলো ভালোবাসা বলো অপেক্ষা কবলে কিছু নেই

সমস্ত সময়ই সুসময
তাকিযে দেখ
ক্রমাগত সদব দবোজায প্রভু দাঁড়িযে বযেছ কৃপাপাত্র।

কয়েকটা অনিবার্য কারণে

তুলসী মুখোপাধ্যায়

কয়েকটা অনিবার্য কারণে পৃথিবীর সঙ্গে আমার
বনিবনা হচ্ছে না মোটে
দিনরাত খিটিমিটি লেগেই আছে
একেকদিন ইচ্ছে হয়—একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক
কিন্তু বাবার মুখের দিকে তাকালেই
কারফিউ ঘোষণা হয় সকল চৈতন্যে
সোনারিল ট্যাবলেটের মতো
ইচ্ছেগুলি শরীরে শয্যা পেতে শোয়
কয়েকটা অনিবার্য কারণে পৃথিবীকে আমি সইতে পারছি না ঃ

এদিকে সকাল থেকেই আমাকে দেখতে হচ্ছে—
ভিয়েৎনামের মাটিতে রক্তের হোলিখেলা
মার্টিন লুথার কিং-এর শবাধারে জনসনের মুখ
প্রকাশ্য রাজপথে চোর-পুলিশের প্রবল দোস্তি'
কলকাতার ফুটপাতে পাঁচ লক্ষ ন্যাংটো বিছানা'
এবং নেপথ্যে
পোকায় কেটে ঝাঁঝরা ক'রে দিচ্ছে বাল্যের চিত্রশালা'
বাল্যের আকাশে ফৎফৎ করছে বাদুড়! বাদুড়!

এইসব অনিবার্য কারণে পৃথিবীর সঙ্গে আমার
　　মোটেই বনিবনা হচ্ছে না
একেকদিন মনে হয় দুম্ ক'রে ফেটে যাই
এসপার-ওসপার যাহোক একটা হয়ে যাক
　　কিন্তু বাবার চোখে চোখ পড়লেই
চুরমার হয়ে আমি শরীরে বিছানা পেতে বসি
ভয় হয়—কেবল ভয় হয়—কোনোদিন আমিও হয়তো
　　বাবার মতন হয়ে যাব
বাবার মতোই সহাবস্থানে হিম হয়ে যাব।
কয়েকটা অনিবার্য কারণে পৃথিবীর সঙ্গে আমার
　　　　　　　　মোটেই বনিবনা হচ্ছে না!

বীজের চিন্তা

সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কোথায় পড়ব আমি, কোথাকার মাটি ঠেলে
উঠতে হবে জানি না এখনো
শরীরে কেমন তেজ আছে ? কে জিতবে কে মাটি
না কি আমি ?

মাটি সহায়ক হবে ? না কি তার অনুর্বরতা
ধঞ্চের বীজের মতো আমাকেই ভাঙতে হবে আপন প্রকাশ ভেঙেচুরে
কান্নাহীন শরীরের অননুভূতির মরা ত্বকে
স্পর্শকাতরতা আনতে হবে
জানিনা,
কার ফুলে জন্ম হয়েছিল ?
কেন সে ফুলের শিরা এখনো স্মরণে ফুলে ওঠে
একান্তে নিভৃতে
আমার আদিম ভূমি সে ফুলের, সবুজের
দিগন্তবিসারী ঘণ্টা বাজে

থেকে থেকে ফিরে চোখ ফেলি
আমি কোন হাতে হাতে ঘুরি
বাজার সে এড়াতে পারি নি
নিজের সুচেনা মাটি, তাতে যদি পড়া হ'ত
আমি তো নিশ্চিন্ত হয়ে তার বুকে আশ্রয় নিতাম
এখন কোথায় যাব কোন বা পাথরে লিপ্ত হব
জন্ম হবে অথবা হবে না
এখন মরার ভয় জন্ম-আকুলতা
মাটিতে পড়ার আগে মন শুধু উৎপীড়িত করে।

ট্রেন

অনন্ত দাশ

সবুজ ট্রেনের শঙ্খে সন্ধ্যা নামে স্টেশনে স্টেশনে
দূরে যাচ্ছি—তবু
স্মৃতিহীন মণিবন্ধ, জন্মান্ধের জটিল বাতাস
অন্ধকারে পাখা মেলে—ঐ ট্রেন দূরে চলে যায়।

রেখেছিলে বহুদিন রক্তের গভীর নিচে, ছায়া
তবু মন্দিরের কাছে যেতে ভয়
আজও কোনো বাদুড়-আঁধার প্রাচীন অশ্বত্থে
মরণ দেখেছি আমি, মৃত্যু তবু কেমন জানি না।

এক-একটি জন্ম ঘিরে সহস্র আলোকবর্ষ নাচে
চড়াই-উৎরাইয়ে ছোটে ট্রেন
যদিও জেনেছি সন্ধ্যা—সকাল—বিকেল
বয়সের মধ্যাহ্ন জটিল, অস্থির।

ধমনীর দ্রুততালে সোঁদামাটি, বিচ্ছুরিত ক্লেদ
হে সময় সবুজ পতাকা
প্রান্তরে হঠাৎ ট্রেন থেমে যায় যদি
দুহাতে বাজাও শঙ্খ নতুন জন্মের।

অবিশ্বাস্য তেলকুচো লতা

বাসুদেব দেব

লক্ষ লক্ষ এরোপ্লেন আকাশ ছেয়ে ফেলে
যেন জটায়ুর পাখার তলায়
সীতা চুরি যাচ্ছে
লক্ষ লক্ষ বিমান-বিধ্বংসী কামান পাতা হয়
বাংকারের গা বেয়ে অবিশ্বাস্য সবুজ তেলকুচো লতা
তেলকুচো লতার মতো তোমার স্পর্শ
বারুদভরা বুকে
অতীত ঐতিহ্যের মেঘচ্ছায়া
মেঘের বদলে এরোপ্লেন
এ্যান্টি-এয়ারক্রাফটগান তালীবনের বদলে
প্রতীকের বদলে দুঃখিত সত্য
একমাত্র প্রার্থনা আজ বর্মের আড়ালে নরম বুক

আমার দুঃখের পথে দীর্ঘজীবী বিশ্বাস এসো
এরোপ্লেন নিলামে উঠছে
হাজার হাজার ঠাণ্ডা কামানের ওপর শিশুদের খেলা
সৌখিন ক্যামেরাম্যানের মতো বিকেলের সূর্য
আর সেই পাখি সবুজ তেলকুচো লতা
তোমার অব্যর্থ স্পর্শ
কোনো প্রতীক ছাড়াই বেঁচে থাকে

ছুঁতে হবে মধ্যরাত্রে সূর্য

প্রভাত চৌধুরী

এর থেকে অনিশ্চয়তা নিয়ে জেগে ওঠা ঢের ভালো
ঝুঁকি নেওয়া মধ্যরাত্রে সূর্যের শরীর ছুঁতে যাওয়া
পরিচ্ছেদহীন এ-রকম নীরবতা চাইনা এখন
এখন কার্টিজ দিয়ে ভেঙে দাও সব নিস্তব্ধতা
আর কোনো স্বপ্ন নয়
স্বপ্নের ডুবুরি হয়ে সম্ভাবনা তুলে আনা নয়

ভুঁইখালে ঢোকা চাঁদের জ্যোৎস্না হারাবার কথা
ভুলে যেতে হবে
ছুঁতে হবে মধ্যরাত্রে সূর্য
চাঁদের শরীরে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই
ঘুমস্বপ্নে মধ্যরাত্র তুমি নক্ষত্র সরিয়ে নাও

আমি অনিশ্চয়তা নিয়ে জাগ্রত হয়েছি
চন্দ্রনীলিমার অন্ধকার ধুয়ে দেবো সূর্য জেলে দিয়ে

সীমানা খুঁজি

কাননকুমার ভৌমিক

আমি বন্ধুর পথে প্রত্যয় নামে
কত কি বীজ রোপণ করেছি
আমি উপকণ্ঠ ধ'রে অনাবাদী অঞ্চলে
সীমানা চিহ্নিত করেছি,
আমি কৃপাণের হ'য়ে পাথরের গা-য়ে
অস্ত্র খোদিত করেছি, যখন
অশোক অথবা মহাভীক্ষু
সমগোত্র হ'য়ে মসৃণ হরিৎ পঙ্কে
রৌদ্ররেখার বার্তা বহন করে, [illegible]
প্লাবিত খর-রৌদ্রে ভরিতব্যেরা
গুণ গুণ স্বরে মাঝদরিয়ার গান গায়, আর
জলের শব্দে বিস্ফোরণের চিহ্ন ধ্বনিত ক'রে মহাকোলাহল তুলে,
যখন সোনালী রোদের চড়া গন্ধে
ক্রূর আত্মারা পুড়ে থাক
উধাও জলের গভীরে
আমি চিহ্নিত ভূমিতে চরণ ছিন্ন ক'রে
পরমতম সীমানা খুঁজি—
ধ্বংসাবশেষ দাবি-দাওয়া আমার কোথায় আছে ?
সে কখন কোথায়
কোন তীক্ষ্ণনখ মহাতান্ত্রিকের কাছে কাছে

প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গে

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

[বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি দীর্ঘ দিন বিচরণ করেছি, মাতব্বরী করেছি বেশ কিছু দিন, বর্তমানে বাণপ্রস্থ গ্রহণ করে নিষ্ক্রিয় ভাবে সব দেখে যাচ্ছি, যতি-অবস্থা আগতপ্রায়।

সাহিত্যের এই চতুরাশ্রমে প্রবেশ করেছিলাম যাঁর আচার্যত্বে, তিনি ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি আবার আমার তীর্থগুরুও, তাঁকে পাওয়া ধরেই রবীন্দ্র-সংযোগ ও ঠাকুরবাড়িতে অবাধ বিচরণের অধিকার লাভ করেছিলাম। আর তাঁর গৃহে অবস্থানের সুবাদেই বাঙলার বিস্তৃত বিদগ্ধ সমাজে পরিচিত হয়েছিলাম।

বর্ণাশ্রম ধর্মমতে আচার্যের মৃত্যুতে অশৌচ পালন ও শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্তব্য। অনেক বর্ণাশ্রমী কর্তব্যের মধ্যে এ-ক্ষেত্রেও আমার প্রত্যবায় ঘটেছে।

অগত্যা তাঁর জন্মশতবর্ষে কর্তব্যহানির গ্লানিটা বড় বেশি বোধ হতে লাগল। অতএব আচার্য সম্পর্কে শ্রদ্ধা নিবেদনের এই সুযোগ গ্রহণে বিশেষ আগ্রহ বোধ করেও বয়সাধিক্য জনিত কর্মে অনীহা ও স্মৃতি-বিভ্রম বাধা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু 'পরিচয়' সম্পাদক আমার অবস্থা বিবেচনা করে আমাকে সুযোগ করে দিলেন, বছর কয়েক আগে বাঙলার বাইরে জামশেদপুর 'চলন্তিকা সাহিত্য পরিষদ'-এর কোনো অনুষ্ঠানে পঠিত ও তাঁদেরই রিপোর্টে প্রকাশিত চৌধুরী মহাশয় সম্পর্কিত রচনাটি প্রকাশের জন্য গ্রহণ করে।

রচনাটি এ-পর্যন্ত মুষ্টিমেয় লোকেরই দৃষ্টিগোচর হয়েছে, 'পরিচয়' পত্রিকার মাধ্যমে বৃহত্তর সুধীসমাজে তার প্রচার-ব্যবস্থা করে দিয়ে আমাকে পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী আচার্যের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনে সাহায্য করলেন। তার জন্য আমি বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করছি।]

প্রমথ চৌধুবীব মুখে যে-কথাটা সবচেয়ে বেশিবাব শুনেছি, তা হল : cultivate youı garden, আব এই গার্ডেন বলতে তিনি শাক-শব্জি, আনাজ-তবকাবি, ফল-মূল, পাম-ক্রোটন-ইউকেলিপটাস-এব বাগান বুঝতেন না ; বাগান মানেই তাঁব কাছে ফুলেব বাগান। ফলেব উপযোগিতা যথেষ্ট বেশি এবং উপযোগিতাকে অস্বীকাবও তিনি কোনোমতেই কবতেন না। কিন্তু ফুল সৌন্দর্য ও আনন্দেব প্রকাশ। অথচ সেই ফুলেবও পবিণতি ফলে। তাই ফুলই তাঁব কাছে ছিল সাহিত্য-সাধনা ও জীবন-সাধনাব প্রতীক। আমাব মনে হয়, "ফুলেব চাষ কবো"—এই একটি উক্তিব মধ্যেই প্রমথ চৌধুবীব জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শ নিহিত আছে।

জন্ম, শিক্ষা ও বৈবাহিক সূত্রে তিনি পবিপূর্ণ বনেদি ও বিদগ্ধ সমাজেব অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ জীবনকে নানা ফুলে সমৃদ্ধ ও বর্ণাঢ্য কবে দেখবাব যেমন তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁব মানসিক প্রবণতাও তেমনি সেদিকে ধাবিত হয়েছিল। তাঁব প্রথম জীবন কেটেছিল কৃষ্ণনগবে, প্রাক্-কলকাতা-যুগেব সংস্কৃতি-কেন্দ্র হিসেবে যাব ঐতিহ্য তখনো মবে যায়নি। সে যুগেই কৃষ্ণনগব আধা-শহব আধা-পাডাগাঁ, কিন্তু বাঙলাব নাগবী সভ্যতা যে সেখানেই জন্মগ্রহণ কবেছিল সে সম্বন্ধে সে নগবেব অন্যান্য বাসিন্দাদেব মতো প্রমথ চৌধুবীও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

প্রমথ চৌধুবী যখন বড হয়ে উঠলেন, অর্থাৎ বয়সে বড, শিক্ষায় দীক্ষায় রুচিতে সম্পূর্ণ বড, যখন বাজধানী নগব কলকাতায় পুবোপুবি নাগবিকতাবোধ নিয়ে সাহিত্য-জীবন সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তখন আমবা তাঁকে দেখতে পাই মেহনতী সমাজ থেকে অনেক দূবে। কিন্তু সেখানেও তিনি পুবো-পুবি নাগবিক, তাঁব চোখে বা মনে পল্লীবাঙলাব সবুজেব ছোঁয়া নয়, রাজপথেব আলোব মিছিলই ঝলমল কবছে।

কলকাতা তখন নতুন চিন্তা ভাব ও কর্মধাবাব উৎস, নাগবিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি পবিমিত হলেও তা-ই তখন দেশেব জীবনকে টেনে নিয়ে যাওয়াব প্রধান শক্তি। প্রমথ চৌধুবী এই নাগবিকতাকেই জীবনেব সিংহদ্বাব বলে মেনে নিলেন। যে বহুনিন্দিত নাগবিকতা সমাজ-বিবর্তনেব অনিবার্য গতিতে গ্রামীণ-সভ্যতা-পুষ্ট বাঙলাব উপব এসে চেপে বসেছে, প্রমথ চৌধুবী হলেন সেই নাগবিকতাব ভাষ্যকাব।

ভাষ্যকাব, কিন্তু চিত্রকাব নন। তাই নাগবিক মানুষেব বহু বিচিত্র আলেখ্য

সজীব হয়ে তাঁর লেখনীতে ফুটে ওঠে নি। ধনীর বিলাস-কক্ষের বহু নিচে কানাগলির মধ্যে কুলি-মজুরের ডেরায় যে দুর্নীতি ও ব্যাভিচার, নীচতা ও দীনতা জমে থাকে, প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে তা চিত্রিত হয়নি। তিনি নিজেই বলেছেন, লেখাপড়া তাঁর পেশা, নেশা, কাজ আর খেলা। তাই লেখা-পড়ার পরিবেশেই তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে গৃহকোণে, পথে পথে তিনি ঘুরে বেড়ান নি। নানা শ্রেণীর মানুষকে জানবার যে সুযোগ তিনি বাল্যে লাভ করেছিলেন, যৌবনে তা থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। সমজাতের এক শ্রেণীর মানুষের সঙ্গেই মেলামেশা করেছেন।

পাষাণকারা বিরাট রাজধানীর মধ্যে হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায় না, হৃদয়বৃত্তিকে আমল দেওয়ার মতো অবসর সেখানে কারো নেই, বুদ্ধির নিকষ পাথরে যাচাই করেই ভালোমন্দ ন্যায়ান্যায় যোগ্য-অযোগ্য বিচার হয়ে থাকে।

বুদ্ধির নিকষ পাথরে সব কিছু যাচাই করার এই যে নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি, এইটেই প্রমথ চৌধুরীর জীবন ও সাহিত্যকে বিশিষ্ট রূপ দিয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী যে জীবন নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন, তাতে তিনি দেখেছেন বুদ্ধির নিরিখে মস্তিষ্কের দর্পণেই তা রূপায়িত হয়েছে, মননের দীপ্তি-প্রাচুর্যে তা ঝলমল করে উঠেছে। তাই সেখানে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এক শ্রেণীর মানুষের জীবনের এক ভগ্নাংশই সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছে। কিন্তু সে সাহিত্য গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে শিক্ষিত সংস্কারশূন্য সুরুচিসম্পন্ন ও বুদ্ধি-দীপ্ত। মজলিশী প্রমথ চৌধুরী সাধারণ জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সামান্যই অর্জন করেছিলেন। তাই তাঁর বুদ্ধির মুকুরে বৃহত্তর জীবন ধরা দেয় নি, কিন্তু যেটুকু দেখেছিলেন তার অন্তস্থল পর্যন্ত তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অন্যের জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাব পুরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি নিজের জীবন সম্বন্ধে গূঢ় অনুভূতি দিয়ে। একথা সত্য যে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য এবং জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডিত, কিন্তু যেটুকু তিনি দেখেছেন তার মধ্যে ফাঁকির কোনো অবকাশ ছিল না এবং কোনো কিছুর প্রতি সমীহা রক্ষা করে বা কারো মুখ চেয়ে নিজের সত্যানুভূতিকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা তাঁর সাহিত্যে বা জীবনে—কোথাও দেখা যায় নি। এই কারণেই আমি প্রমথ চৌধুরীকে জীবনবাদী সাহিত্যিক বলতে কুণ্ঠিত নই।

প্রমথ চৌধুরীর কাছে সবচেয়ে বড় ছিল ছিল তাঁর নিজের জীবনের আদর্শ। তাঁর সবচেয়ে বড় শিল্পসৃষ্টি ছিল তাঁর স্বকীয় মনন ও রুচি। সাহিত্যের মধ্যেও

তিনি সেই নিজস্ব জীবন-শিল্পকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর ব্যক্তি-পুরুষ ও শিল্পী-পুরুষ ছিল সমধর্মী। প্রমথ চৌধুরীর জীবনে হৃদয়ের স্পন্দন বেশি দোলা দেয় নি, মস্তিস্কের দাবিকে কোনোদিন ছাপিয়ে ওঠে নি এবং তাঁর সাহিত্যেও স্বভাবত মননধর্মের নিচে হৃদয়ধর্ম চাপা পড়েছে। যে নাগরিক সভ্যতা ও যন্ত্র-শিল্পের যুগ মানুষের হৃদয়বৃত্তির এতটুকু দাম দেয় না, প্রতিটি মানুষকে প্রতিটি সমাজকে বিচার করে সাফল্যের মূল্য দিয়ে, সেই যুগের চারণ ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তাই তাঁর কাছে মনের মূল্য নয়, মননের মূল্যই ছিল প্রধান সত্য।

জীবনের সেই বিশিষ্ট সহানুভূতির ফলেই প্রমথ চৌধুরীর জীবনধর্ম যুগধর্মের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। যুগটা বিজ্ঞানের, বিজ্ঞান বুদ্ধিপ্রসূত, তাই যুগধর্মই হৃদয়ধর্মবর্জিত ও বুদ্ধিহত। বস্তুত যুগধর্মের সঙ্গে মননকে সমান কদমে চালিত করা—এইটেই ছিল প্রমথ চৌধুরীর সচল মনের হৃদয়ধর্ম। শাশ্বত সনাতনের প্রতি তাঁর কোনো দুর্বলতা ছিল না, কারণ পরিবর্তনকেই তিনি জীবন ও জগতের প্রধান সত্য বলে উপলব্ধি করেছিলেন। আমাদের দৃষ্টি থাকবে ভবিষ্যতে, কর্মক্ষেত্র হবে বর্তমানে, আর অতীতের স্থান হল মিউ-জিয়ামে ও আরকাইব্‌সে—এক কথায় বলতে গেলে এই ছিল প্রমথ চৌধুরীর চলমান মনের দৃষ্টিভঙ্গি। কোনো শাশ্বত সত্যে তাঁর বিশ্বাস ছিল কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়। নতুন ও পুরাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "সমাজের উন্নতি দেশ-কাল-পাত্র সাপেক্ষ, সুতরাং দেশ-কালের অতীত, কিংবা সর্বদেশে সর্বকালে সমান বলবৎ কোন সত্যের দ্বারা সে উন্নতি সাধন করবার চেষ্টা বৃথা।"

যুগধর্মকে তিনি এতখানি মূল্য দিয়েছেন যে, নতুন সৃষ্ট সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি নতুন আইডিয়ালের প্রয়োজন স্বীকার করেছেন। বলেছেন—"সকল দেশেরই সকল যুগের একটি বিশিষ্ট ধর্ম আছে। সেই যুগধর্ম অনুসারে চলতে পারলেই মানুষ সার্থকতা লাভ করে।" "দেশের সঙ্গে দেশের অবশ্য স্পষ্ট প্রভেদ আছে, কিন্তু কালের চাইতে কালের প্রভেদ তার চাইতেও স্পষ্ট।"

যুগধর্মের পূজারী প্রমথ চৌধুরী স্বভাবতই নবীনতারও পূজা করেছেন। তাই তিনি যখন 'সবুজপত্র' প্রকাশ করলেন, তা শুধু নামে এবং মলাটের রঙেই সবুজ হল না, রসে এবং প্রাণের অভিব্যক্তিতে নবীন পত্রের বর্ণকে সার্থক করে তুলল। তিনি নিজে বলেছেন: "সবুজ হচ্ছে বর্ণমালার মধ্যমণি এবং নিজগুণেই সে বর্ণরাজ্যের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে থাকে। বেগুনী কিশলয়ের রং—জীবনের পূর্বরাগের রং। নীল আকাশের রং—অনন্তের রং। পীত শুষ্ক-

পত্রের রং—মৃত্যুর রং। কিন্তু সবুজ হচ্ছে নবীন পত্রের রং—রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যাপ্তি। তার দক্ষিণে নীল আর বামে পীত, তার পূর্ব্ব সীমায় বেগুনী আর পশ্চিম সীমায় লাল। অন্ত ও অনন্তের মধ্যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবুজের অর্থাৎ সরস প্রাণের স্বধর্ম।"

রস ও প্রাণের প্রতীক সবুজ আর তার পূর্ণ অভিব্যক্তি যৌবন, তাই হেঁয়ালি বর্জিত প্রমথ চৌধুরী তাঁর সচল মনকে সবুজের উপাসনায় পর্যবসিত করেন নি, যৌবনকে রাজটিকা পরিয়েছেন এবং ব্যক্তি-যৌবনের চেয়ে সমাজ-যৌবনকে অধিকতর মূল্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "দেহের যৌবনের অন্তে বার্দ্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের অধিকার বিস্তার করবার শক্তি আমরা সমাজ থেকেই সংগ্রহ করতে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে গেলে আবার ফিরে আসে না, কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে। সমাজের নূতন প্রাণ নূতন মন নিত্য জন্মলাভ করছে। অর্থাৎ নূতন সুখ-দুঃখ নূতন আশা নূতন ভালবাসা নূতন কর্ত্তব্য নূতন চিন্তা নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবন প্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশা নেই এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।"

যৌবনের পূজারী বলেই তিনি ছিলেন শক্তির পূজারী এবং সে শক্তি দৈহিক শক্তিতে সীমাবদ্ধ নয়। মনের এবং চরিত্রের যে শক্তি, কর্ম শক্তি ও মনন শক্তি, জীবনকে যা জড়তা থেকে মুক্তি দিয়ে গতিশীল করতে পারে—সেই শক্তিই ছিল তাঁর উপাস্য এবং সেই শক্তি সঞ্চার করাই তাঁর মতে সাহিত্যের প্রধান কর্তব্য। "আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য্য বলে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলে, আলস্যকে ঔদাস্য বলে, শ্মশান-বৈরাগ্যকে ভূমানন্দ বলে, নিষ্কর্ম্মাকে নিষ্ক্রিয় বলে প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। ছল দুর্ব্বলের বল, যে দুর্ব্বল সে অপরকে প্রতারিত করে আত্ম-রক্ষার জন্য আর নিজেকে প্রতারিত করে আত্মপ্রসাদের জন্য। আত্ম-প্রবঞ্চনার মত আত্মঘাতী জিনিস আর নেই। সাহিত্য জাতির খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না, কিন্তু আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।" "সাহিত্য হাতে হাতে মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোন কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু কোন কোন কথায় মন ভেজে এবং সেই জাতির

কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য।" এখানে "মন ভেজা" কথাটাকে অবশ্য বিশিষ্ট অর্থে ধরতে হবে।

কারণ কি সাহিত্যে কি জীবনে চিরকাল তিনি বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করেছেন, সর্বদা হৃদয়কে বিদ্রূপ করতে ইতস্তত করেন নি। লিখেছেন, "করুণরসে ভারতবর্ষ স্যাঁতসেতে হয়ে উঠেছে।" হৃদয়বৃত্তিকে তিনি অনেক সময় আমলের মধ্যেই আনেন নি। এক জায়গায় বলেছেন, "হৃদয়ের দোহাই দিলে এ-দেশে নির্ব্বুদ্ধিতার সাত খুন মাপ। হৃদয়টা আমাদের এত্তোবড় জিনিস। যার মাথা নেই তার মাথা ব্যথার কথা শুনলে আমরা অবশ্য হাসি, কিন্তু যার বুক নেই তার বুকের ব্যথার কথা শুনলে আমরা কাঁদি। এই আমাদের স্বভাব, আর এই জন্তেই তো এদেশে কোন কাজের কথা বলা কঠিন। হৃদয় পদার্থটা অবশ্য খুব ভাল জিনিস এবং উদরের চাইতে ঢের উঁচুদরের জিনিস এবং উদর যে অনেক ক্ষেত্রে নিজেকে মস্তক বলে পরিচয় দিতে চায়, তাও অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। মানুষের চোখে দুটো চোখ আছে, বুকে একটাও নেই। হৃদয় অন্ধ, অতএব যে যত অন্ধ সে তত হৃদয়বান—এই হচ্ছে লোকমত।" প্রমথ চৌধুরীর হৃদয়-ধর্ম-বর্জিত বৈজ্ঞানিক-সুলভ নির্লিপ্ততা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জ্জিত আভিজাত্য। সেটা উজ্জল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়—এই মনন-ধর্ম মনের সঙ্গে সেই তুঙ্গ শিখরেই অনাবৃত থাকে, যেটা ভাবালুতার বাষ্প-স্পর্শহীন।" কাজেই "মন ভেজে' বলতে প্রমথ চৌধুরী যা বলতে চেয়েছেন আমার মতে, তা মননকে ধাক্কা মারার কথা।

দেশবাসীর জড়তা তাঁকে সবচেয়ে বিব্রত করেছিল এবং সেইজন্তেই তিনি ইউরোপীয় সভ্যতাকে সর্বান্তঃকরণে বরণ করে নিয়েছিলেন। "ইউরোপ আমাদের মনকে নিত্য যে ঝাঁকুনি দিচ্ছে, তাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। ইউরোপের সাহিত্য, ইউরোপের দর্শন মনের গায়ে হাত বুলায় না, কিন্তু ধাক্কা মারে। ইউরোপের সভ্যতা অমৃতই হোক, মদিরাই হোক, আর হলাহলই হোক, তার ধর্ম্মই হচ্ছে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির থাকতে দেওয়া নয়। এই ইংরেজী শিক্ষার প্রসাদে, এই ইংরেজী সভ্যতার সংস্পর্শে আমরা দেশশুদ্ধ লোক যেদিকে হোক কোন একটা দিকে চলবার জন্য এবং অন্যকে চালাবার জন্য আকুবাকু করছি। কেউ পশ্চিমের

দিকে এগোতে চান, কেউ পূর্ব্বের দিকে পিছু হটতে চান, কেউ আকাশের উপরে দেবতার আত্মা'র অনুসন্ধান করছেন, কেউ মাটির নীচে দেবতার মূর্ত্তির অনুসন্ধান করছেন। এক কথায়, আমরা উন্নতিশীলই হই আর অবনতিশীল হই, আমরা সকলেই গতিশীল,—কেউ স্থিতিশীল নই। ইউরোপের স্পর্শে আমরা আর কিছু না হোক, গতিলাভ করেছি, অর্থাৎ—মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করেছি।"

তা বলে একথা মনে করবার কারণ নেই যে, ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তিনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবার পক্ষপাতী ছিলেন। 'সবুজপত্র' প্রকাশের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলেছেন: "ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্ত্তমানের চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত মনোভাব সকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে নিতে পারি, তবেই তা পরে সাহিত্যদর্পণে প্রতিফলিত হবে।" অর্থাৎ "একটা নতুন কিছু করবার জন্য নয়, বাঙালীর জীবনে যে নতুনত্ব এসে পড়েছে, তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করবার জন্য" 'সবুজপত্র'-র প্রতিষ্ঠা।

তাঁর বাইরের খোলসকে অনেক সময়েই তিনি প্রশ্ন করেছেন। কারো কারো মতে প্রমথ চৌধুরী রাজনীতি-নিরপেক্ষ ছিলেন। নিজেই এক জায়গায় বলেছেন যে, পলিটিকাল পরমহংস হবার শক্তি বা ইচ্ছা, কিছুই তাঁর নেই। কিন্তু পলিটিক্স যেখানে ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের প্রধান চালক-শক্তি, সেখানে আধুনিক জীবন-সচেতন প্রমথ চৌধুরী তাঁর চিন্তায় পলিটিক্সকে এড়িয়ে চলেন নি, বলেছেন, "আমরা কল্পনারাজ্যে সংসার পাততে পারিনে, আর পলিটিক্সের বিষয় হচ্ছে জাতীয় ঘর-করণার বিষয়, সুতরাং পলিটিক্স সম্বন্ধে আমরা মুখে মৌন থাকলেও মনে আল্‌গা থাকতে পারিনে　শুধু একালে নয়, কোন কালেই সাহিত্যিকেরা পলিটিক্স এড়িয়ে যেতে পারেন নি।"

এই পলিটিক্স প্রসঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তা সবচাইতে বেশি পরিস্ফুট হয়েছে। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী পলিটিক্স, যুদ্ধোন্মত্ততা, শক্তির দম্ভ তাঁকে শুধু পীড়িত করেছে তাই নয়, ইউরোপীয় সভ্যতার এই লোভপরায়ণতাকে তিনি ধিক্কৃত করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী ভাঙাগড়া তাঁকে রীতিমতো পীড়িত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছিল। যুদ্ধ প্রসঙ্গে একদিন আমার সঙ্গে

যে আলোচনা হয়েছিল তা থেকেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্যক উপলব্ধি করা যায়। যুদ্ধের সময় ইংরেজরা আমাদের অনেক আশ্বাস দিয়েছিল, কিন্তু তার কিছুই হল না—এই কথা বলেছিলাম আমি। প্রচুর নৈরাশ্যের সঙ্গে তিনি একটানা যা বলে গেলেন তাতে তাঁর মনের নৈরাশ্য এবং বিক্ষোভ উদ্‌গীরিত হল।

"সারা দুনিয়ায় যুদ্ধের উপসংহার দেখে নিরাশ হয়েছি। এই কুরুক্ষেত্রে জয়যুক্ত পঞ্চপাণ্ডবের হাড়-গড়া সন্ধিপত্রে যা আছে, সে শুধু দেনা-পাওনা, হিসেব-নিকেশ, আর পৃথিবীর জমির ভাগ-বাঁটোয়ারা—এক কথায়, শুধু জ্যামিতি আর পাটিগণিত। কবিতার বদলে মিলল অঙ্ক। আমরা দেখতে চেয়েছিলাম সভ্যতার একটি নূতন প্রাণচিত্র, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর একখানি নূতন মানচিত্র। মুশকিল কি জানো, মাটিকে আমরা যেমন ইচ্ছে ভাগ করতে পারি। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ-বিয়োগ করা নিয়েই তো যত মুশকিল। যুদ্ধ মাটি নিয়েই হয়, শান্তি কিন্তু মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেখছ না জার্মান বলছে, তোমাদের যা সন্ধি হল তা তো আসলে বিচ্ছেদ। ওদিকে ইতালি বলছে সন্ধি হল কিন্তু সমাস কই।"

"কিন্তু মুখে তো ওরা প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতার দাবি মেনে নেয়," আমি বললাম।

"কিন্তু সেখানেও গোলমাল আছে যে। কারণ জাতির ইংরেজী প্রতিশব্দ নেশন আর ন্যাশন্যালিটিতে রয়েছে বিরোধ। একটা জমি-গত আর একটা রক্তের সম্পর্ক। এ দুটো বিরোধী অর্থের সমন্বয় করতে গিয়েই হয় বিরোধ। এক চৌহদ্দির ভিতর যেমন নানা জাত বাস করে, তেমনি এক জাতের লোকও নানা দেশে বাস করে।"

"কিন্তু সে তো ইউরোপের সমস্যা, ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রাখার সে যুক্তি খাটে না।"

"খাটালেই খাটে। শান্তির দরবারে তো ঠিক হয়ে গিয়েছে যে, সমগ্র আফ্রিকা এবং এশিয়ার বেশির ভাগ জাতিই নাবালক। যত দিন তারা সাবালক না হয়, তত দিন তাদের শাসন-সংরক্ষণ করবে কয়েকজন অছি। আর জানোই তো ইউরোপের মত—নাবালকদের শিক্ষার একটা মোটা কথা—Spare the rod and spoil the child আমাদের অবস্থাটা আর একটু বেশি গোলমেলে। আমরাই হচ্ছি মানব-সমাজে একমাত্র living contradiction একসঙ্গে সাবালক ও নাবালক। লীগ অফ নেশন্স-এর

হিসেবে আমরা হলাম সাবালক আর নেশন হিসেবে আমরা থেকে গেলাম নাবালক।"

"তারা বললেই তো আমরা মেনে নেবো না যে আমরা নাবালক।"

"সেইখানেই তো আমাদের গোল। আমরা যারা নাবালকত্ব স্বীকার করি না, সাবালকত্বের স্বপ্ন দেখি, তারাই রাজনীতিতে extremist। আর যাঁরা হিসেব-নিকেশ করে সাবধানে পা ফেলতে চান, তাঁরা মডারেট ।"

"আপনি এঁদের কোন দলের ?" আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম।

চৌধুরী মহাশয় জবাব করলেন, "তুমি তো জানো, আমার কলমের মুখ দিয়ে যা বেরোয় তা রেখাও নয়, সংখ্যাও নয়, সে সেরেফ্ অক্ষর। কাজেই গোল পৃথিবীকে চৌকোশ করার চেষ্টায় আমি কি করতে পারি ?"

কিছু করতে পারেন না বলে যে নৈরাশ্য প্রকাশ করেছিলেন, তা সাময়িক, অন্তত উদাসীনতা তাকে কোনোমতেই বলা চলে না। কারণ, সাহিত্যের ভিতর দিয়ে নতুন সমাজ এবং রাষ্ট্রগঠনের গুরুত্বের ইঙ্গিত তাঁর বহু লেখায় বহু কথায় বহু গল্পে বহু সময়ে পাওয়া গেছে।

অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না, নিজেকে বলতেন 'ism-নাস্তিক', কিন্তু অর্থের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক না থাকলেও অর্থনীতির সঙ্গে সাহিত্যিকদের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ, এ কথা তিনি স্বীকার করেছেন, যদিও 'সাহিত্য বনাম পলিটিক্স'-এর আলোচনায় সাহিত্যের ও পলিটিক্সের ধর্মের পার্থক্য তিনি খুব জোরের সঙ্গেই প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাছে পলিটিক্সের দাম ছিল জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। কিন্তু যেহেতু সামগ্রিক জীবনকে তিনি পলিটিক্সের চেয়ে বড় করে দেখেছেন, মনকে মতের চেয়ে উচ্চস্তরের বলে গণ্য করেছেন, সেইজন্যই পলিটিক্সের কোনো বিশিষ্ট প্রচলিত মতবাদ তাঁর মধ্যে কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যায় নি।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য মুখ্যত আলোচনা, তর্ক ও বক্তৃতার ঝড়। এমন কি, তাঁর গল্পও আলোচনা-বাহুল্যে প্রবন্ধ-ধর্মী। সে ক্ষেত্রে জীবনের প্রকাশ যে তাঁর সাহিত্যেমুখ্য উপজীব্য হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি আছে। সেইজন্যই ism-নাস্তিক হয়েও তিনি ছিলেন individualism ও liberation-এ ঘোরতর বিশ্বাসী। এক কথায়, পাঁড় গণতান্ত্রিক। গণতন্ত্র তাঁর কাছে রাজনৈতিক সংজ্ঞা নয়, শাসনব্যবস্থার বিশিষ্ট রূপও নয়, ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যেই তিনি গণতন্ত্রকে খুঁজে পেয়েছেন। সে গণতন্ত্রকে শুধু দেশের মধ্যেই দেখতে চান নি,

দেখতে চেয়েছেন সাহিত্যের মধ্যে। তিনি বলেছেন, "নব সাহিত্য রাজধর্ম্ম ত্যাগ করে গণধর্ম্ম অবলম্বন করছে। অতীতে অন্য দেশের ন্যায় এ দেশের সাহিত্য-জগৎ যখন দু-চারজন লোকের দখলে ছিল, যখন লেখা দূরে থাক, পড়বার অধিকারও সকলের ছিল না, তখন সাহিত্য-রাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ করতেন এবং তাঁরা কাব্য দর্শন ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে অট্টালিকা স্তূপ স্তম্ভ গুহা প্রভৃতির আকারে বহু চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রেখে গেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আমাদের দ্বারা কোন রূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড করে তোলা অসম্ভব, এই জ্ঞানটুকু জন্মালে আমাদের কারো আর সাহিত্য-রাজা হবার লোভ থাকবে না এবং শব্দের কীর্ত্তিস্তম্ভ গড়বার বৃথা চেষ্টায় আমরা দিন ও শরীর পাত করব না। এর জন্য আমাদের কোনরূপ দুঃখ করবার আবশ্যক নেই। বস্তু জগতের ন্যায়, সাহিত্য জগতেরও প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি দূর থেকে দেখতে ভাল কিন্তু নিত্য ব্যবহার্য্য নয়। নবযুগের ধর্ম্ম হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা,—কাউকেও ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওয়া নয়। এ পৃথিবীতে বৃহৎ না হলে কোন জিনিস মহৎ হয় না— এরূপ ধারণা আমাদের নেই, সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের কীর্ত্তিগুলি আকারে ছোট হয়ে আসবে কিন্তু প্রকারে বেড়ে যাবে, আকাশ আক্রমণ না করে মাটির উপর অধিকার বিস্তার করবে। এক কথায়, বহু শক্তিশালী স্বল্প সংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে স্বল্পশক্তিশালী বহু সংখ্যক লেখকের দিন আসছে। আমাদের মনোজগতে যে নবসূর্য্য উদয়োন্মুখ, তার সহস্র রশ্মি অবলম্বন করে অন্তত ষষ্টি সহস্র বালখিল্য লেখক এই ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন।"

উপরের উদ্ধৃতি থেকে প্রমথ চৌধুরীর গণতান্ত্রিকতাই শুধু নয়, সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর মত ও সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবি তিনি আরো জোরের সঙ্গে ধ্বনিত করেছেন, যখন বলেছেন, "এযুগে মানুষের উপরমানুষের কোন অধিকার নেই। প্রতি লোকেই নিজের ইচ্ছা, রুচি ও চরিত্র অনুসারে নিজের জীবন গঠন করতে পারে। প্রাচীন প্রথার বন্ধন থেকে সবাই মুক্ত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে, চিন্তা সম্বন্ধে, মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে সকলেরই সমান স্বাধীনতা আছে। একথা নির্ভয়েই বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই হচ্ছে ডিমোক্রাসির গোড়ার কথা, আর তার শেষ কথা। এবং ঐ স্বাধীনতাই হচ্ছে ডিমোক্রাসির ভিত্তি ও চূড়া।"

ব্যক্তিস্বাধীনতা যে উচ্ছৃঙ্খলতায় গিয়ে পৌছতে পারে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ

সচেতন ছিলেন তিনি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ধারক হয়েও সমাজ-কল্যাণের প্রয়োজনে তার কিছু সীমারেখা টেনে দেওয়া তিনি ক্ষেত্রবিশেষে সমর্থন করেছেন। প্রবৃত্তির স্বাধীনতা আর ইচ্ছার স্বাধীনতা যে এক নয়, একথা বলেছেন। স্পষ্ট-ভাবে, যেমন "drunk-স্বাধীনতার উপর যদি হস্তক্ষেপ করা না যায় তো তা sober-স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করবে।"

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন দর্শনের ছাত্র, তাই মনের জড়তা ও সঙ্কটমুক্তির ভিতর দিয়ে তিনি জীবনের মুক্তির সন্ধান করেছেন, বাস্তব সমস্যাগুলির মূল কারণ হিসেবে মনের সমস্যাই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই বাস্তব সঙ্কট নিয়ে আলোচনা করতে বসেও তিনি অনেক সময় সমাধানের সন্ধানে মনোজগৎ পরিক্রমা করেছেন, দৈনন্দিন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সমস্যাও সোজাসুজি না দেখে তার মূলের সন্ধান করেছেন, বিশ্বাস করেছেন, "সাময়িক ব্যাপারকে কেবলমাত্র সাময়িকভাবে দেখলে তার স্বরূপ আমাদের চোখে পড়ে না।"

বাস্তবধর্মী যেসব সমস্যার আশু সমাধানের নির্দেশ-প্রত্যাশায় সাধারণের মন উন্মুখ ও অধীর, প্রমথ চৌধুরীর দার্শনিকমানস তার তত্ত্ব আলোচনা করে মূল সন্ধানের প্রয়াসে। বোধহয় এই কারণে প্রমথ চৌধুরী জনপ্রিয় লেখকের পর্যায়ে পৌঁছন নি।

কিন্তু দার্শনিকতা কেবলমাত্র সবকিছু তলিয়ে দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বাস্তব সমস্যা প্রণালী পেরিয়ে জীবনের ধারা ও বিকাশ সম্বন্ধে তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যাকে বার্গসঁ-র Creative Evolution বা সৃজনধর্মী বিবর্তনবাদের সগোত্র বলা যেতে পারে এবং এ বিষয়ে তিনি বোধহয় বার্ণাড শ-রও সমধর্মী। অনুজপ্রতিম অধ্যাপক জীবেন্দ্র সিংহরায় প্রমথ চৌধুরীর এই দিকটায় প্রভূত আলোকসম্পাত করেছেন বলে দেশবাসী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

তিনি বলেছেন, "প্রবাহই হচ্ছে পবিত্রতা, স্রোত মানেই শক্তি," "জগৎ গতির লীলা" "জীবন ও মনের সহজ গতিরোধ করে সমাজকে অটল করলেই তা অচল হয়ে পড়ে।" তাঁর মতে evolution ক্রমবিকাশও নয়, ক্রমোন্নতিও নয়— "কোন পদার্থকে প্রকাশ করবার শক্তি জড়প্রকৃতির নেই এবং তার প্রধান কাজই হচ্ছে সকল উন্নতির পথে বাধা দেওয়া। Evolution জড়জগতের নিয়ম নয়, জীবজগতের ধর্ম্ম। Evolution-এর মধ্যে শুধু ইচ্ছা-শক্তিরই বিকাশ পরিস্ফুট।

Evolution অর্থে দৈব নয়, পুরুষকার।" আর-এক জায়গায় বলেছেন, "এমন কোন জাগতিক নিয়ম নেই যে, মানুষের চেষ্টা ব্যতিরেকেও তার উন্নতি হবে। হ্রাস বৃদ্ধি ও বিপর্যয়— এ তিনই জীবনের ধর্ম্ম , সুতরাং জীবনের উন্নতি ও অবনতি মানুষের দ্বারাই সাধিত হয়। মানবের ইচ্ছাশক্তি, মানবের উন্নতির মূল কারণ। তাঁর সব কথার শেষ কথা, "cultivate" মানুষ যখন লাঙলের সাহায্যে ঘাস তুলে ফেলে ধান বোনে, তখন সে পৃথিবীর সংস্কার করে। মানুষের জীবনে এক কৃষি ব্যতীত অন্য কোন কাজ নেই। এই দুনিয়ার জমিতে সোনা ফলাবার চেষ্টাতেই মানুষ তার মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। চাষির্ কাজও কৃষিকাজ, শুধু সে কৃষির ক্ষেত্র ইদং নয়, অহং।" বিংশ শতাব্দীর বিদগ্ধ নাগরিকতার প্রধান ধারক প্রমথ চৌধুরীর মুখে নতুন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে বাঙলার রামপ্রসাদী সুর, যখন তিনি বলেছেন, "আমাদের দেশে যা দেদার জমি পড়ে রয়েছে, সে হচ্ছে মানব জমিন। আর আমরা যদি স্বদেশে সোনা ফলাতে চাই, তাহলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য হবে এই মানব জমিনের আবাদ করা।"

ঊনবিংশ শতকের বাঙলায় যে স্বাধীন চিন্তাশক্তির প্রথম প্রকাশ ও ব্যাপ্তি, সেই শতকের সীমানা অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ তাকে এনে ফেলেছেন বর্তমান শতাব্দীতে। রবীন্দ্রনাথের মার্তণ্ড প্রতিভার দীপ্তিতে কথঞ্চিৎ ম্লান বলে প্রতিভাত হলেও, জীবনদর্শনে ও জীবনবোধে প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে যে স্বকীয়তা দেখা গিয়েছে, তাকে বোধহয় অনন্য বললেও অত্যুক্তি হবে না।

দুই

প্রমথ চৌধুরীর জয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "যখন থেকে তিনি সাহিত্যপথে যাত্রা আরম্ভ করেছেন, আমি পেয়েছি তাঁর সাহচর্য্য এবং উপলব্ধি করেছি তাঁর বুদ্ধিপ্রদীপ্ত প্রতিভা। আমি যখন সাময়িক পত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বানমাত্র 'সবুজপত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য-সাধনায় একটি নতুন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোন পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনও

কুণ্ঠিত হইনি।”

এই কথাগুলিকে রবীন্দ্রনাথের পিঠ-চাপড়ানি বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। কারণ, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে তা বিচার ও আলোচনার বিষয়। যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রমথ-প্রতিভা আগাগোড়া সমুজ্জ্বল, সেখানে প্রত্যক্ষ রবীন্দ্র-প্রভাব খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। পক্ষান্তরে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব যে রবীন্দ্রনাথে পড়েছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনারীতি। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির রচনারীতিতে পুষ্ট রবীন্দ্র-মানস সাধু এবং সংস্কৃত ঘেঁষা গুরুগম্ভীর তথাকথিত লেখ্য ভাষাকেই গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছিল। ‘কাব্যে উপেক্ষিতা’র রবীন্দ্রনাথ একদিন যে ‘শেষের কবিতা’র রবীন্দ্রনাথে রূপান্তরিত হলেন, এই পরিবর্তনের প্রথম প্রেরণা এসেছিল প্রমথ চৌধুরীর ভাষাদর্শ থেকে।

বস্তুত, বাঙালীর জড়জীবনে চিন্তার প্রবহমানতা প্রবর্তন করার চেয়েও ভাষাকে লেখ্যতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েই প্রমথ চৌধুরী বাঙলা সাহিত্যে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন। এবং আজ যে শান্তিপুর, কৃষ্ণনগরের মুখের ভাষা পূর্ব পাকিস্তানে পর্যন্ত বাঙলা গদ্যসাহিত্যের ভাষা বলে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে, তার পথিকৃৎ প্রমথ চৌধুরী। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় প্রমথ চৌধুরীর এই অসামান্য দান আজও যথাযথ স্বীকৃতি পায় নি—এটা কম দুঃখের নয়।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, প্রমথ চৌধুরীরও অনেক আগে আলাল ও হুতোম কথ্যভাষাকে সাহিত্যে বাহন করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, পণ্ডিতী ভাষার প্রতিক্রিয়ারূপে টেকচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন যে মৌখিক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন—তার মধ্যে প্রাণস্পন্দন থাকলেও রূপের অভাব ছিল। কাজেই সে ভাষা সাহিত্যের স্বাভাবিক ভাষা হয়ে উঠতে পারে নি। কারণ শুদ্ধ সংযত শ্রী, গভীর গম্ভীর ধ্বনি, মার্জিত শিল্প-সৌন্দর্যের অভাবে, সারল্য ও সরসতা, প্রাণধর্ম ও সজীবতা সত্ত্বেও তা সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে নি। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার তুচ্ছ কথাগুলিকে রূপায়িত করার যোগ্যতা সে ভাষার ছিল। কিন্তু উচ্চস্তরের অনুভূতি, গভীর চিন্তা, নিগূঢ় তত্ত্ব ও জটিল সমস্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাকে অনুপযুক্তই মনে হয়েছে। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র যখন নানা

গভীব বিষযে তত্ত্ব আলোচনা শুরু কবলেন, তখন তাকে সর্বজনগ্রাহী কববাব জন্য বিদ্যাসাগবীয ও আলালী ভাষাব মধ্যে একটা সামঞ্জস্য কবতে হল, বিশেষ কবে, ক্রিযাপদেব ব্যবহাবে তিনি মানুষেব মৌখিক প্রকাশ থেকে দূবেই থেকে গেলেন, ববীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বঙ্কিমী ঢং-যেই তাঁব গদ্যসাহিত্যকে পবিচালিত কবেছিলেন।

কিন্তু ঐতিহাসিক প্রযোজনে ভাষাকে যখন ভাষাবেগেব তবঙ্গোচ্ছ্বাস ছেডে বুদ্ধিগত আলোচনাব নতুন খাতে প্রবেশ কবতে হল, নতুন চিন্তা নতুন ভাবধাবা প্রকাশেব জন্য যখন নতুন ভাষাদর্শ ও বচনাবীতি অনিবার্য হযে উঠল, সেই যুগসন্ধিক্ষণেব শুভলগ্নে প্রমথ চৌধুবীব আবির্ভাব।

যে অবস্থায সর্বগ্রাসী ববীন্দ্রপ্রতিভাব তাঁকে গ্রাস কবাব কথা, তাবই মধ্যে ববীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রমথ চৌধুবীব ভাষাদর্শে উদ্বুদ্ধ ও দীক্ষিত হলেন। বস্তুত, ববীন্দ্রনাথেব কলমে বাঙলা গদ্যেব যে নব নব রূপাযণ বাঙলা ভাষাকে এক যুগে বহু যুগান্তব পাব কবে এগিযে দিযেছে, তাব মূল প্রেবণা প্রমথ চৌধুবীব কাছ থেকেই এসেছিল। একথা অস্বীকা'ব কবাব উপায নেই যে, ভাষাব নতুন পথে পদক্ষেপ কবতে প্রমথ চৌধুবী ববীন্দ্রনাথেব আশীর্বাদ ও অনুমোদন এবং সমর্থনকেই প্রধান পাথেয কবেছিলেন। কিন্তু সর্বত্র জযকামী ববীন্দ্র-প্রতিভা শিষ্যেব কাছে শিক্ষা গ্রহণ কবতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ কবে নি। ববং তাতেই ব্যক্তি ববীন্দ্রনাথেব মহত্ত্ব অধিকতব পবিস্ফুট হযেছে। ববীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুবীব ভাষাবীতি অবলম্বন কবেছেন—এমন কথা বলছি না, কাবণ তাঁব অনন্যসাধাবণ স্বকীযতা তাঁকে নিজেব পথে চালিত কবেছিল এবং অজস্র পবীক্ষা-নিবীক্ষায তিনি ভাষাকে বলিষ্ঠ ও পুষ্ট কবেছিলেন, কিন্তু বদ্ধদুযাব খুলে দেবাব কৃতিত্ব প্রমথ চৌধুবীব। আগল তিনি ভেঙে দিযেছিলেন, তাবপব ববীন্দ্রনাথেব ভাষা "কেশ এলাইযা, ফুল কুডাইযা, বামধনু আঁকা, পাখা উডাইযা, ববিব কিবণে হাসি ছডাইযা" শিখব থেকে শিখবে ছুটেছে, ভূধব থেকে ভূধবে লুটেছে। কিন্তু চাবিধাবেব কাবাগাব যে ভেঙেছিল, তাব প্রথম আঘাত এসেছিল প্রমথ চৌধুবীব কলম থেকে।

প্রমথ চৌধুবীব লেখাব ভাষা ঠিক যে বাঙালীব মুখেব ভাষা, এমন কথা বলা যায না, বিশেষ কবে যে যুগে প্রমথ চৌধুবী ভাষা নিযে পবীক্ষা কবেছেন, সে যুগে তো বটেই, এ যুগে পর্যন্ত বাঙলাব মুখেব ভাষা অনেকগুলি আঞ্চলিক রূপে বিভক্ত। কাজেই প্রমথ চৌধুবীকে সাহিত্যেব প্রযোজনে একটা সর্বজনীন

কথ্য বাঙলা তৈরি করে নিতে হয়েছে।

এই ভাষা তৈরি করবার ব্যাপারে প্রধান অভাব ছিল তাঁর কৈশোরের পরিবেশ। প্রমথ চৌধুরী মানুষ হয়েছেন কৃষ্ণনগরে। সে কালের নদে-শান্তিপুরের ভাষা ছিল অন্যান্য অনেক অঞ্চল থেকে উন্নত। বাঙালী সংস্কৃতির এক পীঠস্থান নবদ্বীপ, আর তারই সংলগ্ন কৃষ্ণনগর মার্জিত নাগরিক সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। কাজেই কৃষ্ণনগরের কথ্যভাষার মধ্যে মানুষ হয়ে তিনি সর্বজনীন কথ্যভাষার বনিয়াদ হিসেবে তাকেই গ্রহণ করেছিলেন।

মৌখিক ভাষার শব্দ-সম্পদ সাহিত্যের উপযুক্ত, মার্জিত ও রুচিসঙ্গত কিনা—এ-প্রশ্নও তিনি আলোচনা করেছেন। বলেছেন, "আমরা মৌখিক ভাষা ব্যবহার করতে চাই, সুতরাং যা ভদ্রলোকের মুখে চলে না, এমন কোন শব্দ সাহিত্যে স্থান দেবার পক্ষপাতী" আমরা কখনই হতে পারি না।" ভাষার শুদ্ধতা কাকে বলে, অলঙ্কার শাস্ত্র থেকেই বচন উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, "সেই সেই দেশে কথিত ভাষা সেই সেই দেশের বিশুদ্ধ অপভ্রংশ" এবং এই বচনের জোরেই বিশুদ্ধ অপভ্রংশ নিয়ে গঠিত মৌখিক ভাষাকে বাঙলা সাহিত্যে ব্যবহার করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি।

ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে, গতানুগতিক ভাবের বাহন ভাষাকে চলমান বিশ্বজীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলার যোগ্য করতে হলে, তাকে যেমনটি আছে তেমনটি রেখে দেওয়া যায় না—এ বোধ না থাকলে ভাষাসম্পদ বাড়ানো কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, "এ কথা আমি অবশ্য মানি যে, আমাদের ভাষায় কতক পরিমাণে নূতন কথা আনার দরকার আছে। যার-জীবন আছে, তারই প্রতিদিনের খোরাক যোগাতে হবে, আর আমাদের ভাষার দেহপুষ্টি করতে হলে প্রধানতঃ অমরকোষ থেকেই নূতন কথা টেনে আনতে হবে। কিন্তু যিনি নূতন সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবেন তাঁর এইটি মনে রাখা উচিত যে, তাঁর আবার নূতন করে প্রতি কথাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা যদি না পারেন তাহলে বঙ্গ সরস্বতীর কানে শুধু পরের সোনা পরানো হবে। ভাষার এখন শানিয়ে ধার বের করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়। যে কথাটি নিতান্ত না হলে নয়, সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এস, যদি নিজের ভাষার মধ্যে তাকে খাপ খাওয়াতে পার। ভগবান পবননন্দন বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে আস্ত গন্ধমাদন যে সমূলে উৎপাটন করে এনেছিলেন, তাতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেননি।"

ভাষাকে মৌখিকতাব রূপ দিতে প্রমথ চৌধুবী সবচেযে নিষ্ঠাব সঙ্গে যে বীতি পালন কবেছেন, সে হল "বাঙালীব মুখে মুখে প্রচলিত শব্দেব আকাব এবং বিভক্তিব যে পবিবর্ত্তন ঘটেছে সেটা মেনে নিযে যথাসম্ভব তাদেব বর্ত্তমান আকাবে ব্যবহাব কবা এবং ক্রিযাপদেব প্রযোগে 'ইট্' প্রত্যয বর্জ্জন এবং তাব ফলে ক্রিযাব আকাব হ্রস্ব" কবা।

কেউ কেউ অবশ্য এ প্রসঙ্গে মন্তব্য কবেছেন যে, শুধু ক্রিযাব পবিবর্তনেই ভাষা মৌখিক হযে ওঠে না। ওঠে না তা সত্য। বিশিষ্ট উদাহবণ দিযে ববীন্দ্রনাথ তা প্রতিষ্ঠিত কবেছেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুবীব ভাষায পবিবর্তিত ক্রিযা ও সর্বনাম একটি অংশ মাত্র। কৃষ্ণনগরেব মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে ব্যবহাবেব উপযুক্ত কবে দেওযাব জন্য তাকে যে শিল্পোচিত রূপ দেওযাব প্রযোজন ছিল, প্রমথ চৌধুবী তাব বেশি কিছু সংস্কাব কবেন নি। অন্য সব দেশেই লেখাব ভাষা ও মুখেব ভাষাব মধ্যে পার্থক্য নগণ্য। তবুও সাহিত্যিক ভাষা মৌখিক ভাষা থেকে কিছুটা পৃথক। তা অনেকটা সাহিত্যিকেব নিজস্ব দৃষ্টি এবং সেই অর্থে কিছুটা কৃত্রিমও। কিন্তু ইচ্ছা বা চেষ্টা কবলেই প্রমথ চৌধুবী তাঁব ভাষাব বা বচনাবীতিব পবিবর্তন কবতে পাবতেন। কাবণ, এই দুটিই তাঁব দেহমনেব চিবসঙ্গী এবং তাঁব মননশক্তিবই মতো তা প্রদীপ্ত। সে যুগে যাবা তাঁব ভাষাকে 'কিষ্কিন্ধ্যাব ভাষা' 'পেতনী ভাষা' 'চণ্ডালী ভাষা' 'ইঙ্গবঙ্গ ভাষা' ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করেছে, তাবা নিজেদেব কুরুচিবই পবিচয দিযেছে।

প্রমথ চৌধুবীব পক্ষে যে তাঁব বচনানীতি অন্য ধবনেব কবা সম্ভব ছিল না, তাব কাবণ চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গীব এতখানি স্বকীযতা বাঙলা সাহিত্যে তো দুর্লভ বটেই, বিশ্ব সাহিত্যেও তা ঝুডি ঝুডি পাওযা যায না। আমার সামান্য জ্ঞান নিযেও একথা বলাব স্পর্ধা আমি বাখি। Style is the man —একথা প্রমথ চৌধুবীব সম্বন্ধে যতটা খাটে তা আব কাৰু সম্বন্ধে খাটে কিনা সন্দেহ। এমন কি, ববীন্দ্রনাথ তাঁব অবিবত বিকাশশীল ব্যক্তিসত্তাকে প্রকাশ কববাব জন্য তাঁব style-কেও রূপ থেকে রূপান্তবিত কবেছেন সাবা জীবন ধবে। প্রমথ চৌধুবী তাঁব স্বকীযতায অটল, যদিও অচল ছিলেন না। চলব, চলতে হবে—তাঁব এই স্বকীযতাব উপব নির্ভব কবেই তাঁব ব্যক্তিত্ব একই বীতিতে পবিস্ফুট হযেছে।

মননশীল মানুষ, মনেব তলোযাব খেলাব জন্য যাদেব ডেকে এনেছেন,

তাঁরাও তাতে আনন্দ পেয়েছেন এবং সেই এলোপাথাড়ি তলোয়ার ঘোরানোয় শুধু যে উপস্থিত খেলোয়াড়দের মনন ও বুদ্ধির বাঁধ কেটেছে তা-ই নয়, সেই তলোয়ারের আঘাত বালিগঞ্জ 'কমলালয়'-এর শান্ত গৃহকোণ থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে বাঙলার সমগ্র শিক্ষিত সমাজে এবং রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতার ফলে তিনি সমগ্র জাতির মনের বাঁধন কেটে দিতে সমর্থ হয়েছেন। পরবর্তী যুগে আর একটিমাত্র সাহিত্য-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, যা আজ 'কল্লোল'-গোষ্ঠী নামে পরিচিত। সেখানকার সংস্কারমুক্তি অন্য ধরনের হলেও তার মূল প্রেরণা এসেছিল 'সবুজপত্র' ও 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠী থেকে এবং আশীর্বাদ এসেছিল প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে। এক বিষয়ে আমি নিজেকে বাঙলাদেশের সবচেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ বলে মনে করি, কারণ বাঙালী সংস্কৃতির এই দুটি ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল।

বৈঠকী কথার তলোয়ার খেলা যখন লিখিত রচনার রূপ নিত, তখন প্রমথ চৌধুরীর ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গি ঘূর্ণায়মান শাণিত তলোয়ারেরই মতো ঝকঝক করত প্রমথ চৌধুরীর মননশীলতার রৌদ্রদীপ্তিতে। নতুন কিছু বলেই তিনি ক্ষান্ত হতে পারেন নি, বক্তব্যের নতুনত্বকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বলার ঢং-এও এমন এক নতুনত্ব দিয়েছেন যে, সেই ঢং আজো বীরবলী ঢং বলে চিহ্নিত হয়ে আছে।

এই 'বীরবলী' ঢং শুধু লিপিস্বাতন্ত্র্য-নির্ভর ছিল না, চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের উপর সমান নির্ভরশীল ছিল। "ই স্বকীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি বলেছেন, 'অহং'-বর্জিত সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, আর ইংরেজীতে তাকেই বলে— Style is the man

একটি উদাহরণেই তাঁর কবিতারীতি বোঝা যাবে: "জরিতে জড়িত বেণী রুমালে তাম্বুল—বাদশার ছিলে তুমি খেলার পুতুল" কবিতাটি তাজমহল শীর্ষক। রচনারীতির এই স্বকীয়তা তাঁর প্রবন্ধে, গল্পে, কবিতায় সমান পরিস্ফুট। এই রচনারীতিকে যতই বিদগ্ধজনবোধ্য বলে শ্লেষ করা হোক না কেন, প্রমথ চৌধুরী অলঙ্কার সংগ্রহ করেছেন শুধু বিদগ্ধ জীবন থেকে নয়, মালো-মাঝিদের জীবন থেকে, শহরে নিম্নশ্রেণীর ছেলেদের ঘুড়ি ওড়ানো ও রসজীবনের অন্য ক্ষেত্র থেকে, ফুটবল ক্রিকেট টেনিস খেলার মাঠ থেকে, যদিচ খেলার মাঠ থেকে দূরেই থেকেছেন তিনি সারাজীবন।

সাহিত্য কি, আর তার উদ্দেশ্যই বা কি, এ-নিয়ে প্রমথ চৌধুরী যে মত

ব্যক্ত করেছেন, তাঁর সাহিত্যের রসগ্রহণ করতে হলে সেই মত সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার বলে তারই কিছু উদ্ধৃতি করে আজকের বক্তব্য শেষ করছি ঃ

"সাহিত্য কস্মিনকালেও স্কুল মাষ্টারির ভার নেয়নি। এতে দুঃখ করবার কোন কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, স্কুল মাষ্টাররা এ যুগে সাহিত্যের ভার নিয়েছেন। সাহিত্য শিক্ষার ভার নেয় না, কেন না, মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কবির কাজের ঠিক উলটো। কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা, আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা, তারপর তার শবচ্ছেদ করা এবং ওই উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা ও প্রচার করা। কারো মনোরঞ্জন করা সাহিত্যের কাজ নয়, কাউকে শিক্ষা দেওয়া নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়।"

তবে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি? এর জবাবে তিনি বলেছেন, "সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারো মনোরঞ্জন করা নয়। এ দু'য়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরী করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে ধর্ম্মচ্যুত হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বাংলা দেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের নেকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্ম্মের জয়ঢাক—এই সব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যের রাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গ'ড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না। কারণ, পাঠক-সমাজ যে খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে ভেঙে ফেলে। সে প্রাচ্যই হোক, আর পাশ্চাত্যই হোক, কাশীরই হোক আর জার্ম্মেনীরই হোক, দুদিন ধরে তা কারুরই মনোরঞ্জন করতে পারে না।"

এই আনন্দ ও মনোরঞ্জনের পার্থক্যের মধ্যেই প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল নিহিত আছে। "আনন্দ খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই বিশ্বসৃষ্টির মূল আনন্দ আর তার আধারও আনন্দ এবং সেই কারণেই তা কল্যাণধর্মী। মনোরঞ্জন কল্যাণ অকল্যাণের ধার ধারে না। সাহিত্যের মূল কথা যে কল্যাণ, প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যসৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ডোরাকাটার অভিসারে

শেব জঙ্গ

[গত সংখ্যাব পব]

দুঃসাহসের বলি

আগে ছিল পল্টনে, ঘোড়সওয়াব সেপাই। বেশ লম্বাচওড়া, জাতে জাঠ। টায়েটুয়ে চলা সংসাবেব একমাত্র সংস্থান ছোট এক টুকবো জমি, হলে হবে কি, বেজায় দিলদবাজ, বাড়িতে অতিথি এলে খাওযানোব ধুম পড়ে যাবে।

সে ছিল এমন এক বসেব বসিক, আফিম ব'লে লোকেব কাছে যাব অখ্যাতি। নাম তাব সদাবাম, সই কবতে গিযে তাব এই নামেব আগে সব সমযই সে যোগ কবত 'নম্ববদাব' (গাঁযেব মোড়ল) কথাটা।

যমুনা নদীব খাঁড়ি থেকে বড় একটা জলা সৃষ্টি হযে যেখানে থিক থিক কবছে নলখাগড়াব বন আব বালিহাঁস আব কুমিব, সেখানে সদাবামেব গ্রাম। আমি একবাব তাব কাছেই শিকাবেব জন্যে তাঁবু খাটিযে ছিলাম। বেশ কিছুদিন সেবাব আমাদেব একসঙ্গে খুব আনন্দে কেটেছিল।

সদাবাম আমাব সঙ্গে বড় একটা শিকাবে যেত না। ভোববেলায শিশিবে ভেজা ঘাসেব ওপব দিযে চললে তাব লাল টুকটুকে জুতো আব ধবধবে সাদা পোশাক মাটি হযে যাবে এই তাব ভয। কিন্তু আমাদেব তাঁবুতে বোজ তাব হাজিবা ছিল বাঁধা, লোকটা ছিল মজাব। এমন কি যখন ওকে নিযে আমবা হাসিঠাট্টা কবতাম, তখনও সদাবামেব মুখে লেগে থাকত একগাল হাসি। তাছাড়া চোখ-জুলজুল-কবা সদাবামেব আফিমেব কৌটোটা সব সময সামনে ধবাই থাকত, যাব খুশি তা থেকে নিতে পাবে।

সে শুধু আমারই বিলক্ষণ বন্ধু ছিল না, যেই তার সংস্পর্শে এসেছে—বেড়াল কুকুর গরু ঘোড়া ইস্তক—সকলের সঙ্গেই গলায় গলায় ভাব। তার ওপর সদারাম ছিল একাধারে দার্শনিক, কবিরাজ এবং পথপ্রদর্শক।

এক গ্রাম্য মেলায় সদারামের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। মেলা হয়ে আমরা যাচ্ছিলাম শুয়োর শিকারে। গাঁয়ে বউঝিদের মনহরণের জন্যে দোকানীরা রকমারি মনোহারি জিনিস সাজিয়ে রেখেছিল, তার চারপাশে মেয়ের দল ঘুর ঘুর করছিল আর গাঁয়ের নওজোয়ানরা তৃষিত হৃদয়ে দল বেঁধে এ-দোকান সে-দোকান করছিল—ছেলেদের দিকে আড়চোখে চেয়ে চোখ দেখছিল সেই বুকভরা মধু গাঁয়ের বধূরা।

আমার কাথিয়াবাড়ি নওজোয়ান ঘোড়া মোতি নিজের অপরূপ সৌন্দর্যে ডগমগ হয়ে দুল্‌কি চালে নেচে কুঁদে চলেছে—সে বেশ বুঝে নিয়েছিল উৎসবের আনন্দে সারা গ্রাম মাতোয়ারা।

রোগা ডিগডিগে একটা লোক, তার সদ্য মাড়-দেওয়া সাদা ধবধবে পাগড়ির গায়ে ঝিকমিক করছে আবীর, ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে আদর-মাখা চোখে আমার ঘোড়াটার দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। ঘোড়া বলতে যে সে অজ্ঞান তা তার দেখবার ধরন থেকেই বোঝা যায়। ঘোড়াটা কোন্ জাতের, সে সম্বন্ধে লোকটা আমাকে কয়েকটা প্রশ্নও করল। আমি নেমে প'ড়ে ওর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। নাম ওর সদারাম। মোতির সূত্রে আলাপ। সদারাম সেই থেকে আমার চিরদিনের বন্ধু হয়ে গেল।

একবার সদারামকে আমি আমাদের গ্রামে ধরে নিয়ে এসেছিলাম। ঠিক করলাম দুজনে মিলে বড়সড় গোছের জানোয়ার শিকারে যাব। বাঘ বা চিতার মহড়া নেওয়ার প্রস্তাবে দেখলাম সদারাম নারাজ। আমাকে দিয়ে সে হলফ করিয়ে নিল যে বাঘ শিকারে আমি যেন কখনই তাকে সঙ্গে না নিই। তার কাছে ভারী গোছের শিকার বলতে হরিণ, শিঙ্গেল এবং, খুব বেশি হলে, বনশুয়োর মারা।

শিবলিকের পাহাড়তলীতে সেকালে ছিল এক দেশীয় রাজ্য। তার একাংশে রেলওয়ালী ফরেস্ট। সেখানে বিনা অনুমতিতে বাইরের লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমরা সেই জঙ্গলে শিকার ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছিলাম। পুবদিকটাতে জঙ্গলটির দুটি ভাগ। একটা ভাগ সোজা সামনে গিয়ে রোগা রোগা টিলা আর

টানা টানা দূর ভিড়ভারাক্রান্ত ক'রে তারপর হঠাৎ ডানদিকে বেঁকে যমুনা নদীর এই দিককার পাড়ে গিয়ে নেমেছে। বনের যে জায়গায় আমরা ছিলাম, তার বিশ মাইল দূর দিয়ে গেছে যমুনা নদী। জঙ্গলের আরেকটা ভাগ পাশের পাহাড় বেয়ে উঠে বেঁকে একফালি মালভূমির ওপর দিয়ে ছুটে ওপাশে ছত্রাকার হয়ে নেমে পাহাড়তলীর চষা ভুঁইতে গিয়ে পড়েছে।

আমরা তাঁবু ফেলেছিলাম এই মালভূমিতে। বনটা ছিল সংরক্ষিত, এর মধ্যে গুলি ছোঁড়ার একমাত্র অধিকার মহারাজার এবং তাঁর ইংরেজ লাট-বেলাট অতিথিকুলের। অন্য হেঁজিপেঁজিদের এ বনে ঢোকাও বারণ। অনধিকার প্রবেশের শাস্তিও খুব গুরুতর—অপরাধীর প্রচুর টাকা জরিমানা, প্রচুর দিনের কারাবাস এবং অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত হবে।

আমরা শিকার করছিলাম লুকিয়ে চুরিয়ে। নিষিদ্ধ ফল ব'লে শিকারে মজাটাও তাই ঢের বেশি।

ও জায়গা থেকে বনপুলিশের ফাঁড়ি কম ক'রে মাইল চারেক দূরে। তাছাড়া সশস্ত্র শিকারীকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঘাঁটাতে যে সে যাবে, তাতে কী এমন তার ফায়দা? তলব তাদের এতই যৎসামান্য যে, এক টুকরো বাং কিংবা টাকাটাক দক্ষিণা দিলেই শিকারীর সাত খুন মাপ হয়ে যাবে—এমন কি যদি হাতেনাতে ধরা পড়ে তাহলেও। শিকার জিনিসটা আমাদের যাদের রক্তে, আমরা যারা বনচণ্ডীর উপাসক—জঙ্গলে চুরি ক'রে শিকার করাটা ছিল আমাদের কাছে নিয়মভঙ্গ নয়, নিয়মসিদ্ধ ব্যাপার।

সদারামের আরও বেশি মন খুঁত খুঁত করছিল ব্যাপারটা আপত্তিকর ব'লে। কিন্তু জায়গাটাতে গিয়ে সে এত রকমের এবং এত অঢেল জংলী জানোয়ার প্রাণ ভ'রে দেখতে পেল যে, তার মনে আর কোন ক্ষোভ রইল না।

২

বেলা প'ড়ে আসতে আমি ফিরে এলাম। আমাদের গাঁয়ের ডাকাবুকো যে ছোকরা আমার খিদ্‌মত করত, তার ছিল পেটে পেটে শয়তানি। সে একদিন বেশ রসিয়ে রসিয়ে আমাদের ধনুর্ধরটির মৃগয়াভিযানের বর্ণনা দিচ্ছিল:

'লক্ষ্যবস্তু' হল নট্-নড়নচড়ন-নট্-কিচ্ছু এক ধাড়ি হরিণ, তাও—কী বলব—মাত্র হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে। অত কাছ থেকে টিপ ফস্‌কানো

মোটেই সোজা ব্যাপার নয়। এই নয়কে হয় করতে সদারামের কম কেরামতির দরকার হয় নি। আপনি তো বলেন, 'গুলি ক'রে মারো'—ও তাতে বিশ্বাসই করে না। ওর নীতি হল, 'গুলি ক'রে বাঁচাও'।"

আমরা দুজনে হাসছিলাম। সদারামও সে হাসিতে যোগ দিল।

ছোকরা ব'লে চলল: "সদারামের হাতে রাইফেল—ওঃ, সে এক দেব-দুর্লভ দৃশ্য। আফিমের কৌটোটা নিয়ে যেভাবে সে সমস্তক্ষণ খসর মসর করে, রাইফেল হাতে নিয়েও তার হুবহু সেই একই ব্যবহার। তফাৎ একেবারে নেই তা নয়: কৌটোর আফিম মুখে পুরবার পর তবে সদারাম চোখ বুঁজে বোম হয়, কিন্তু রাইফেলের বেলায় অন্য—ভেতরের জিনিস নলের মুখ দিয়ে বেরোবার আগে, এমন কি ঘোড়া টেপবারও আগে সদারামের চোখ বন্ধ হয়ে যায়। সদারামের বন্দুকও ফুটল আর হরিণটিও মৌমাছির হুল-খাওয়া ঘোড়ার মত একলাফে হাওয়া হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সদারাম হাওয়া চোপ্‌সানো বেলুনের মত মাটিতে চিৎপটাং। হরিণ আর সদারাম—এ ওঠে তো ও পড়ে।"

"বলিস্ কী? হুল-খাওয়া ঘোড়ার মত হরিণটা ঠিক্‌রে পড়ল? তাহলে গুলি লেগেছে, বল্।"

"উহুঁ, সে ভয় নেই। হরিণের গায়ে সদারাম কোনরকম আঁচড় কেটেছে বলতে চান? আজ্ঞে, না—সদারাম অত বোকা নয়। একবার দেওয়ানী আদালতে তার দস্তুরমত শিক্ষা হয়ে গেছে। এক বন্ধকীপত্রে তার সই থাকায় মহাজনের কাছে মামলায় সে হেরে যায়। সেই থেকে সদারামের নীতি হল—শতং বদ, মা লিখ। কোন্ আঁচড়ে কখন কী হয় কে বলতে পারে?"

বললাম, "পেজোমি ছাড়্। বল্ তো, মাটিতে দাগ দেখেছিলি?"

"দেখেছি বৈকি। তার ধারে বাতাসে রক্তের ছিটেফোঁটাও ছিল না।" জিভে চুক্ চুক্ শব্দ তুলে ছোকরা বলল, "চোখ বুঁজে বলা যায়, স্রেফ ফস্কেছে। যেমন চোখ বুঁজেই বলা যায়, সদারামের পাগড়ির নীচে আছে স্রেফ টাক।"

আমি কিন্তু ঠিক নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না। হরিণের ব্যবহার থেকে আঁচ করা যায় যে ওর গায়ে গুলি লেগেছে। গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারদের সটান ওপরের দিকে লাফিয়ে উঠতে আমি দেখেছি—লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পেটে গুলি লাগলে এই রকমটা হয়ে থাকে।

জানোয়ারদের পঙ্গু করা এবং তিলে তিলে যন্ত্রণাকর মৃত্যুর দিকে ঠেলে

দেওয়া—এ আমার কখনই ধাতে সয় না। সদারামকে গালাগাল দিয়ে ওকে ওর কৃতকর্মের কথা বললাম। সদারাম কিছুতেই মানতে চাইল না, আমার চাকরটির ঠাট্টাবিদ্রূপে আরও জোর পেয়ে ও আমাকে বোঝাতে চাইল যে, নেশায় অমন বুঁদ-হয়ে-থাকা অবস্থায় তার পক্ষে হরিণটার গায়ে কোনরকম আঁচড় দেওয়া সম্ভবই নয়।

হয়ত অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল ক'রে হরিণটার গায়ে ওর গুলি লেগে গেছে—এ কথা হাজার যুক্তি দিয়েও আমি ওকে বোঝাতে পারলাম না। যাই হোক, গাঁই গুঁই ক'রে সদারাম শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে সরজমিন তদন্তে বেরোতে রাজী হল।

অকুস্থল খুব বেশি হলে হাত চল্লিশ দূরে। হরিণ যেখানটাতে চরছিল সেটা একটা বাধাবন্ধহীন ফাঁকা জায়গা। আমরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মাটিতে দাগ দেখার চেষ্টা করছিলাম। হরিণ যে জায়গাটায় পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে থাকবার সময় সদারাম গুলি ছুড়েছিল, সেই জায়গাটা আমরা খুঁজে পেলাম। হরিণ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে গুলি খেয়েছে এবং যে ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে গেছে, কোথাও রক্তের কোনো দাগ নেই। ঘাস আর শুকনো পাতা মাড়িয়ে যে পথ দিয়ে সে পালিয়েছে, সেই পথটি পরিষ্কার চেনা যাচ্ছিল।

সেই পথ ধ'রে আন্দাজ একশো হাত যাওয়ার পর প্রমাণ হল আমার অনুমান ঠিক—হরিণের পেটে লেগেছে সদারামের গুলি। যে পথ দিয়ে হরিণ গেছে, সেখানে ঘাসের উঁচু ডগার গায়ে লাল্‌চে প্যাচপেচে কি সব লেগে রয়েছে। পেট ফুটো না হয়ে থাকলে ও জিনিস চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরোতে পারে না। খুব সম্ভবত হরিণের ফুসফুস নিশানা ক'রে সদারাম গুলি করেছিল, হাত ফস্‌কে গুলিটা আসলে লেগেছে প্রায় চার পাঁচ ইঞ্চি পেছনে। সেকেণ্ডে ১,২০০ ফুট গতিবেগসম্পন্ন ১২০ গ্রেনের বুলেট হরিণকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করতে পারে নি—রাস্তার শুধু একটা দিকেই ঘাস প্যাচপেচে হয়ে থাকায় সেটা বোঝা যায়।

আমাদের তাঁবু থেকে আধ মাইলটাক দূরে একটা শুকনো নালা বেয়ে দাগে দাগে এগিয়ে দেখি ঝাঁকড়া বনকুলের ঝোপে ঢাকা একটা ফোকরের পাশে দাগটা ছেত্‌রে গেছে। বেশ ক্লান্ত লাগছিল, খুব ক্ষিধেও পেয়েছে—পাকা পাকা টোপাকুল দেখে জিভে আমার জল এসে গিয়েছিল। আমার

·৪০৫ উইঞ্চেস্টার ম্যাগাজিন রাইফেলটা একটা গাছের গায়ে রেখে টপাটপ কুল পাড়তে লেগে গেলাম। আমি যখন টকটক-মিষ্টিমিষ্টি কুলগুলো উদরস্থ করতে ব্যস্ত, সদারাম সেই ফাঁকে আমার রাইফেলটা হস্তগত ক'রে মাটিতে দাগ দেখে দেখে খানিকটা রাস্তা এগিয়ে গিয়েছিল (আফিমখোর মাত্রই টক্ জিনিসে অনাসক্ত)। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে, তার হাত বিশেক দূরে আরও একটু ঘন ঝোপঝাড়। সদারাম সেখানে গিয়ে একপাশে ব'সে পড়েছিল। মাটিতে ব'সতে না ব'সতে ঝোপের নীচে ঝটপট শব্দ আর তৎক্ষণাৎ ঝুলন্ত জিভ বের ক'রে ল্যাজ উচিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল সেই হরিণ।

কী এমন ব্যাপার, হেসে উড়িয়ে দিলেই হয়। তা নয়, সদারাম হাউমাউ ক'রে ব'লে উঠল—হরিণ না হয়ে বাঘও তো হতে পারত এবং কী দরকার ছিল ওকে এই অজলে অস্থলে আমার টেনে আনবার ?

খানিকটা ছুটে ছোট একটা গড়ানে জায়গার ধারে গিয়ে আমি S-আকারের একটা ঢালের মাথায় থমকে দাঁড়ালাম। ওপাশে কিসের একটা গোলমাল। ঘাসের ওপর দিয়ে হুড়মুড় ক'রে নেমে আমি ওপরে ঠেলে উঠলাম। সরু গিরিপথের তলদেশ থেকে তখনও গোলমালের আওয়াজ ভেসে আসছিল। তবে আওয়াজটা তখন আর তত জোরালো নয়। S-আকারের গ্রন্থির কেন্দ্রস্থলটি এমন বিরক্তিকরভাবে দীর্ঘায়িত হয়ে ছিল যে সামনের দিকে পুরোটাই আমার দৃষ্টির অন্তরালে। ওখানে দাঁড়িয়ে আমি কিছুই ঠাহর করতে পারছিলাম না।

ঠাণ্ডার প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে। আমার পেছনে উঁচু পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবে যাবার পর গোটা তল্লাট জুড়ে লাল-নীলের ছোঁয়াচলাগা দীর্ঘসঞ্চরমান ছায়া।

ঢালের গা বরাবর নেমে কাছের উঁচু জায়গাটাতে মোচড় দিয়ে আবার উঠে এলাম।

আলো যত প'ড়ে আসছে, সান্ধ্য হাওয়ার বেগ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাও তত বাড়ছে। আমি সেই কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘেমে যেন নেয়ে উঠছি। পিঠের সঙ্গে শার্ট সেঁটে গেছে, তার ওপর ভিজে জামাকাপড়ের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকায় আমার অস্বস্তির মাত্রা আরও বেড়ে যাচ্ছে। উত্তেজনায় টান টান হয়ে দীর্ঘ পথ গুঁড়ি মেরে চলতে হওয়ায় আমার শরীরে কাঁপুনি ধরেছিল। একটু দম নেবার জন্যে এক জায়গায় ব'সে আমি এদিক

ওদিকে তাকিয়ে সদারামের খোঁজ করতে লাগলাম। দেখলাম সদারাম আধশোয়া হয়ে ব'সে আফিমের কৌটোটা আঙুল দিয়ে খুঁড়ছে। ক্ষোভ, অনুযোগ, ধন্ধ আর হতভম্বের ভাব—একাকারে সব তালগোল পাকিয়ে সদারামকে দেখাচ্ছিল সুররিয়ালিস্ট ছবির মতন।

একটা জায়গা ছিল যেখান থেকে দেখবার সুবিধে হয়। খুব কষ্টে গুঁড়ি মেরে মেরে নিজেকে কোনরকমে সাম্‌লে সুম্‌লে আমি সেখানটাতে গেলাম। কিন্তু অমন ঘাড় নীচু-করা অবস্থায় তখনও আমি ঠাহর করতে পারছিলাম না ঠিক কোথা থেকে শব্দটা ভেসে আসছিল। ছোট একগোছা ঘাস আমার দৃষ্টি আড়াল ক'রে রেখেছিল। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে মাথা তুলে দেখবার চেষ্টা করলাম, তাতেও ঘাসের আড়াল পড়ল। এবার আমি চেষ্টা করলাম পায়ে ভর দিয়ে সটান উঠে দাঁড়াতে। একটা শুক্‌নো পাতা মাড়িয়ে ফেলায় মড়মড় ক'রে শব্দ হল। ফলে, এতক্ষণের লুকোচুরি, পা টিপে টিপে সন্তর্পণে হাঁটা—সব মাঠে মারা গেল।

অনধিক ছ'ফুট দূরে ঘাসের যে ঝোপটাতে আমি চোখ রেখেছিলাম, সেখান থেকে বেরিয়ে এল আমি যার পিছু নিয়েছিলাম সেই হরিণ নয়—তাজা রক্ত মাখা ভয়ঙ্কর বিকৃত মুখে এক ক্রুদ্ধ বাঘ। কুকুরের তাড়া খেয়ে বেড়াল যেভাবে ঘাড়ে কান চেপে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে থাকে, বাঘটা সেই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। কখন যে বাঘের বরাবর বন্দুকটা তুলে ঘোড়া টিপেছি আমি নিজেই জানি না। বন্দুকে গুড়ুম ক'রে একটা আওয়াজ আর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফাটানো মর্মভেদী এক গর্জন আমাকে প্রকম্পিত ক'রে তুলল। ঝট্‌ ক'রে ফোটা গুলিটা বার ক'রে দিয়ে সে জায়গায় একটা নতুন তাজা কার্তুজ মুহূর্তে আমি ভ'রে নিলাম। কিন্তু তার আগেই সেই বাঘটা লাফ দিয়ে মাঝখানের ঢালের আড়ালে গা ঢাকা দিল।

আমার গায়ের মধ্যে পাক দিচ্ছিল এবং শরীরও আর বইছিল না। শত চেষ্টা ক'রেও পা দুটো আমি খাড়া রাখতে পারছিলাম না। মাটিতে ব'সে প'ড়ে আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

বাঘ বোধহয় সারাটা দিন সরু গিরিপথটাতে ঘাপ্‌টি মেরে পড়ে ছিল। ভয় পেয়ে হরিণ বেচারা লাফ দিয়ে ঢুম ক'রে পড়বি তো পড় অজান্তে একেবারে সেই বাঘের মুখে। হরিণ পালাতে চাইছে, ক্ষুধার্ত বাঘই বা ছাড়বে কেন—একটু আগে সেইজন্যেই ওখানে অত হুড়যুদ্ধ ঝটাপটি।

ভ্যালা মুস্কিলে পড়া গেছে। ঘা-খাওয়া বাঘকে এখন খুঁজে বাব কবতে হবে। একেই আমাব তখন নাকেব জলে চোখেব জলে অবস্থা, তাব ওপব পেটেব ভেতব কেবলি পাক দিচ্ছে। সন্ধ্যে এদিকে ইতিমধ্যেই বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। ঘনায়মান এই অন্ধকাবে আমাব কিছুই কববাব নেই।

পাহাড়েব সর্বোচ্চ চূড়াগুলো থেকেও সূর্যাস্তেব শেষ আলোটুকু লম্বা লম্বা আঙুলে মুছে নিযেছে ঘনকালো ছাযা। সেই ছাযাই আমাব আচ্ছন্নতা ভেঙে ঠেলে তুলে দিল। হঠাৎ সদাবামেব কথা আমাব মনে পড়ে গেল। কী হল তাব? গেল কোথায় সে?

শেষ যে জাযগায় সদাবামকে মাটিতে আধশোয়া হযে বসে থাকতে দেখেছিলাম সেই জাযগায় এলাম। সদাবামেব কোন পাত্তা নেই। মাটিতে পড়ে আছে শুধু ওব পাগড়িটা। মনে মনে খুবই ভয় হল। যত সব অলক্ষুণে চিন্তা মাথাব মধ্যে ভিড় কবতে লাগল।

গোড়ায় আস্তে তাবপব খুব জোবে শিস্ দিযে সদাবামকে ডাকতে লাগলাম। কোন সাড়া নেই। কাছেপিঠে জখম-হওয়া বাঘ, এ অবস্থায় ন'ড়ে চ'ড়ে শব্দ ক'বে বা দর্শন দিযে নিজেব উপস্থিতি জানিযে দেওয়া মানে বিপদ ডেকে আনা—এসব জেনেও শেষটায় নিরুপায় হযে সদারামের নাম ধ'বে আমাকে চেঁচিযে ডাকতে হল। বাব কযেক ডাকবাব পব দূবে একটা উঁচু গাছেব মগডাল থেকে চিঁ চিঁ-কবা তাব কণ্ঠস্বব কানে এল। গাছেব খুব কাছে এসে তবে সদাবামকে দেখতে পেলাম। একেবাবে মগডালেব ওপব খুব বিপজ্জনক অবস্থায় সে ব'সে। জীবনে এর আগে কদাচ সে গাছে চড়ে নি।

ওকে নিবাপদে বহালতবিযতে থাকতে দেখে আমাবও ধড়ে প্রাণ এল। ওব এই অসামান্য কেবামতিব জন্যে তখন আমি বাহবা না দিযে পাবলাম না। দুঃখেব বিষয়, সদাবামেব কাছে সেটা কাটা ঘাযে নুনেব ছিটে ব'লে বোধ হল। আমি, শিকাবপর্ব বাঘ, বাঘেব পূর্বপুরুষ, বিশেষ ক'বে তাব মাতৃকুল—সবাইকে জড়িযে এমন সব বাছাই-কবা বিশেষণ সে ছাড়ল যে সেসব কহতব্য নয়। আব কক্ষনো সে আমাব সঙ্গে বাব হবে না, এই ব'লে সে নাকে কানে খৎ দিল। মানুষেব কানে বাঘ শিকাবেব কুমন্ত্র দেবাব অপবাধে দেবতাদেব চোদ্দ পুরুষ উদ্ধাব ক'বে ছাড়ল। তাব ওপব, গাছ থেকে নেমে আসবাব প্রস্তাবেও সে বাজী হল না। আমি তাহলে তাঁবুতে ফিবে যাচ্ছি, কাল সকালে এসে

তোমাকে নিয়ে যাব—এই ব'লে যখন ভয় দেখালাম তখন সে নামতে রাজী হল। নামতে গিয়ে পড়ল মুশকিলে। ওঠবার সময় দিব্যি উঠে গিয়েছিল, কী ক'রে তা সে জানে না। এখন নামবার সময় বুঝতে পারছে কাজটা তার অসাধ্য। অকপটেই সে বলল। প্রথম মহাযুদ্ধে সে লড়েছে, লড়াইতে তার বীরত্বের কত গল্পই না সে আমাদের শুনিয়েছে। ভয় কী জিনিস তা সে জানে না। তবে তার এই গাছ থেকে এখন নামার ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা—ঘা-খাওয়া বাঘটা যে কাছেপিঠেই আছে। অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে, অনেক রকম অভয় দিয়ে তবে তাকে আমি গাছের মগডাল থেকে নেমে আসবার প্রচেষ্টায় রাজী করাতে পারলাম। সদারাম প্রথমে তার গা থেকে কোট খুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর একটি একটি ক'রে পা থেকে জুতো খুলল, তারপর মোজা। এইবার ঝাড়াহাতপা হয়ে গাছের গুঁড়িটা দুহাতে জড়িয়ে গড় গড় ক'রে সে নেমে আসতে লাগল। ফলে, তার বুক আর পেটের চামড়া ছেঁচে গেল। মাটি ছোঁবার আগেই তার কামিজ আর কুর্তার হল দফারফা। সামনের দিকটা তখন হয় নেই, নয় নিশানের মত শুধু লেগে থেকে তাকে দেখাচ্ছে আফ্রিকী লড়াকুর মতন। মাধ্যাকর্ষণের গতিপথে এই অবতরণের ফলে দুর্ভাগ্যক্রমে সদারামের হাঁটু গেল মচ্‌কে। মাটিতে নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই সে চেয়ে বসল তার আফিমের কৌটো। ওর কোটের পকেট হাতড়ে আমি তক্ষুনি কৌটোটা বার ক'রে দিলাম। মন্ত্রপূত দ্রব্যটি ডবল ডোজে ঠেসে নিয়ে সদারাম খালিপায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে টেকো মাথাটা নিয়ে দূর পাল্লায় ক্যাম্পের দিকে রওনা হল। জুতো, মোজা, পাগড়ি—কোনোটাই অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া গেল না। একশো হাত দূর থেকে তাঁবুর সামনে যখন অগ্নিকুণ্ড জ্বলতে দেখা গেল, একমাত্র তখনই সদারামের গলায় স্বর ফুটল। ওর গলা শুনে বোঝা গেল ও খুব ধাঁধায় পড়েছে। আমাকে জিজ্ঞেস করল, যে প্রাণীটাকে ঝোপের তলা থেকে সে ধাঁ ক'রে বেরিয়ে আসতে দেখেছে সেটা কি সেই বাঘ, যার গায়ে আমি গুলি ছুঁড়েছি?

এতক্ষণ যে স্নায়বিক উত্তেজনায় টান টান হয়ে ছিলাম, সদারামের একটা প্রশ্নে আমি ঢের সহজ হলাম। হো-হো ক'রে আমি হাসতে লাগলাম।

জিগ্যেস করলাম, "ছুটন্ত জানোয়ারটার মাথায় শিং দেখেছিলে?"

"হ্যাঁ, তা, দেখেছি ব'লেই মনে হয়। দেখ কাণ্ড, শিঙের কথাটা বেমালুম

ভুলেই গিয়েছিলাম। হুঁ, এইবার মনে পড়েছে—শিং ছিল বটে। কিন্তু যে জায়গা, বলা যায় না—বাঘও তো স্বচ্ছন্দে হতে পারত।"

"হতে তো পারতই। তবে একটা জিনিস তোমাকে ব'লে দিই। আমাদের এদিকে বাঘের মাথায় শিং গজায় না, শিঙের কোনো দরকার নেই ব'লে।"

হাসতে হাসতে পরস্পরের পিছনে লেগে আমরা আমাদের তাঁবুতে পৌঁছে গেলাম। সদারাম এবার তার কৌটো খুলে সর্বার্থসাধক আরও একটা ডবল ডোজ সেঁটে নিল।

৩

চোট-খাওয়া বাঘের খোঁজে আমাকে যেতে হবে—এই ভাবনায় রাত্রে প্রহরের পর প্রহর আমাকে ঠায় জেগে কাটাতে হল। যখনই একটু তন্দ্রা মতন এসেছে, আমার আর বাঘের মধ্যিখানে নেতিয়ে থাকা কালো অজগরের মত জংলী রাতের অন্ধকার আমার মগজের মধ্যে অমনি রাগে ফুঁসে উঠে আমাকে আচমকা জাগিয়ে দিয়েছে। আর বাঘের স্মৃতিপুরাণগুলো কালনাগের জট খোলার মত ক'রে একে একে আমার মনে প'ড়ে গেছে।

বহুদিন আগের দেখা একটি দৃশ্য আমার মানসপটে উদয় হল। আমার কাছ থেকে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে দাঁড়ানো একটি লোককে আহত বাঘ এসে ঘাড় মটকে দিয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল আমার শৈশবে, কিন্তু সেই ব্যথার দাগ আজও আমার মন থেকে মেলায় নি। চল্লিশোর্ধ্ব বছর পরেও সে কথা মনে পড়লে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

১৯১৮ সাল। শীতের মরশুম। আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় মড়ি খেতে এসে একটা বাঘ আমার বাবার হাতে জখম হয়েছিল। বাবার হাতে ছিল ৫০০ বোরের এক্সপ্রেস রাইফেল, ৫৭০ গ্রেনের ছুঁচলোমুখ গুলিটা বাঘের পাঁজর যে ভেদ ক'রে গিয়েছিল এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। বুলেটের ৫,৮৫০ ফুট-পাউণ্ড ওজনের প্রচণ্ড ধাক্কায় বাঘ একেবারে পপাত ধরণীতলে। মাটিতে প'ড়ে খানিকক্ষণ আছাড়ি পিছাড়ি খাওয়ার পর হুঙ্কার ছেড়ে বাঘ ঠিক্‌রে উঠে রাত্রের ঘনায়মান অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছিল।

বাবার স্থির বিশ্বাস ছিল বাঘটাকে কোথাও মরা অবস্থায় পাওয়া যাবে। পরদিন ভোর হতে না হতেই তিনি বাঘের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। বাবার সঙ্গে

গেলাম আমি এবং তাঁর বন্দুকবরদার আর নিহত মোষের মালিকসহ তাঁবুর আরও তিনজন লোক।

সকাল সাতটা নাগাদ আমরা গন্তব্যস্থলে পৌছে গেলাম। পাহাড়তলীতে কুয়াশার পুরু গদিতে তখনও আরামে গা এলিয়ে আছে শীতের সকাল। সারা রাত হিম প'ড়ে গাছগুলো ভারী হয়ে আছে।

একটি সরু উপত্যকা নল্কা। তার পুবধারের পাহাড়ে জলবিভাজিকার এপারে সেই মাঝবরাবর জায়গাটা পাওয়া গেল যেখানে আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় বাঘটাকে গুলি করা হয়েছিল।

সরাসরি না গিয়ে আমরা গেলাম একটু ঘুরপথে। জলবিভাজিকার ওপারে গিয়ে আমরা পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠলাম যাতে সটান ওপর থেকে নেমে ঘটনাস্থলে যেতে পারি। আহত জন্তুর পিছু নেবার সময়—বিশেষত জন্তুটি যদি বিপজ্জনক হয়—এই রকমের সাবধানতা সব সময় বিধেয়। চোট-খাওয়া জানোয়ার সাধারণত চড়াই ভেঙে পাহাড়ের ওপরে ওঠে না। যাতে ব্যথার কষ্ট বাড়ে এমন জিনিস তারা পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে।

ঘুরে উল্টোদিক থেকে আমরা পাহাড়ের চুড়োয় উঠলাম। একে অনেকটা পথ, তার ওপর চড়াই ভাঙার কষ্ট, ফলে, আমরা এমন লবেজান হয়েছিলাম যে জায়গামত সব সময় সজাগ থাকার কথাটা আর আমাদের মনে থাকে নি। আমরা ধ'রে নিয়েছিলাম ৫০০ এক্সপ্রেস বুলেটের চোট বাঘ কিছুতেই সামলাতে পারবে না, সুতরাং সে না মরে পারে না। আমাদের অসাবধান হওয়ার এও একটা কারণ ছিল। এতে প্রমাণ হয়, বাঘের শক্তিসামর্থ্য আমরা কমিয়ে দেখেছিলাম। আসলে যদি মোক্ষম জায়গায় না লাগে, তাহলে অমন ডজন ডজন ৫০০ এক্সপ্রেস বুলেটও বাঘ হজম ক'রে ফেলতে পারে। একবার একটি প্রচণ্ড গুলিতে হৃদ্‌যন্ত্র উড়ে যাওয়ার পরেও আহত বাঘের শরীরে এমন তাকত ছিল যে, সে হাতির পিঠে চড়াও হয়ে তার আততায়ীকে মেরে তবে নিজে মরেছিল—এ ঘটনার লিখিত প্রমাণ আছে।

শৈলশিরায় পৌছে আঁকাবাঁকা রাস্তায় আমরা পাহাড়ের মাঝবরাবর নেমে এলাম। বাবা ছিলেন সকলের আগে, তাঁর ঠিক পেছনেই ছিল বেচারা তেলু—আগের দিন বাঘ যার মোষটাকে মেরেছিল। হাত বিশেক তফাতে আমরা বাকি সবাই পরের পর সার বেঁধে আসছিলাম—আমি ছিলাম সকলের আগে।

প্রায় চল্লিশ হাত বেড়যুক্ত মালসা-আকারের একটা ঢালু জায়গায় এসে পৌছুনো গেল। গড়ানে জায়গাটার ঠিক ধারে একটা শাল গাছ। খুব ঝাঁকড়া এবং খুব লম্বা। তার আওতায় একপাশে একটা বাঁশঝাড়। বাবা যখন গাছটার কাছে পৌচেছেন—কী ভাগ্যিস, এগোবার জন্যে তখনও তিনি গাছটাকে বেড় দেন নি—গাঁক্ ক'রে একটা ছোট্ট তীক্ষ্ণ হুঙ্কারে বাঁশঝাড়টা কেঁপে উঠল।

আমার বাবা ছিলেন শালগাছটার পেছনে। বাকি আমরা সবাই ঘাসের জঙ্গলের আড়ালে। পরক্ষণেই একটা লোক আমার পাশ দিয়ে ছুটে গেল —আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার পেছন থেকে দ্রুত ধাবমান একটা হলুদ রেখা ঝিলিক দিয়ে উঠে লোকটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। তখন একটা গুলির তীক্ষ্ণ আওয়াজ পেলাম, তার ঠিক পর পরই আরেকটা আওয়াজ। পোড়া বারুদের ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে এসে লাগল আর ধোঁয়ায় চোখে অন্ধকার দেখলাম।

বাবা কী একটা কথা বললেন আমার বোধগম্য হল না, তাঁর গলার আওয়াজে আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। বাবার কাছাকাছি যাবার জন্যে আমি আমার জায়গা ছেড়ে নড়তেই বাবা চিৎকার ক'রে আবার আমাকে হুঁশিয়ার ক'রে দিলেন—যে যার জায়গা ছেড়ে আমরা যেন কেউ না নড়ি। আমরা যে যেখানে ছিলাম একেবারে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিনিট দশেক পরে বাবা একটু একটু ক'রে এগিয়ে এলেন—যেখানে সেই লোকটা আমার খুব কাছে মাটিতে সাষ্টাঙ্গে পড়ে ছিল। আমার জায়গাটায় এসে জন্তুজানোয়ারদের একটা সরু পায়ে-চলা-পথের দিকে বাবা পা বাড়ালেন। যাতায়াতী পথটা গেছে একটা অগভীর খোয়াইয়ের ভেতর দিয়ে। না জানিয়ে আমি তাঁর পিছু নিলাম। আমার দাঁড়াবার জায়গাটা খুব বেশি হলে পাঁচ-ছ'ফুট দূরে—ইস্, তেলুর ক্ষতবিক্ষত দেহটা প'ড়ে। আর তার ঠিক পাশেই বাঘটা ম'রে প'ড়ে রয়েছে।

লোকটার মাথা দু ফাঁক হয়ে আছে। বাঘের থাবার প্রত্যেকটা নখ লোকটার মাথার খুলি ভেদ ক'রে গেছে। ভুরু থেকে কপাল পেরিয়ে পেছনদিকের ঘাড় পর্যন্ত পরিষ্কার ফালা ফালা ক'রে কাটা। কেউ যেন ধ'রে ধ'রে ছুরি দিয়ে চিরেছে। কাঁধের কাছে এমনভাবে কামড়েছে যে, লোকটার বুক আর পিঠ একাকার হয়ে গেছে। দাঁত ফোটানোর জায়গাগুলো হাঁ হয়ে গিয়ে সেখান থেকে ফুসফুসের ভগ্নাংশগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসছে আর রক্তের

স্রোতে গাঁজলা উঠছে।

দেখে আমার গায়ের ভেতর এমন গুলিয়ে উঠল যে, হুড় হুড় ক'রে আমি বমি ক'রে ফেললাম। ফলে, বাবা কট মট ক'রে আমার দিকে তাকালেন।

আট বছর বয়সে বনের রাজার তাকতের সঙ্গে সেই আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। প্রথম পরিচয়টা মোটেই সুখের হয় নি।

৪

সঙ্গী দুজন ওঠবার আগেই আমি খুব ভোর-ভোর উঠে পড়লাম। উঠে রাইফেলটা আদ্যোপান্ত সাফ ক'রে নিলাম। আমি জানতাম একটা কঠিন শ্রমসাধ্য কাজে হাত দিতে চলেছি। অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে না দিয়ে যতদূর সম্ভব নিজের দখল রাখব।

চোট-খাওয়া বাঘের মত ভয়ঙ্কর জিনিস দুনিয়ায় দুটি নেই। এদেশের বনেজঙ্গলে আরও দুটি ভয়ঙ্কর প্রাণী আছে—হাতি আর মোষ। তারা একবার চোট খেলে আর রক্ষা নেই, তাদের মাথায় এমন ভাবে খুন চেপে যাবে যে, ছলেবলেকৌশলে যে ভাবেই হোক তারা শোধ তুলে ছাড়বে। কিন্তু যত যাই হোক, মারণ ক্ষমতার দিক দিয়ে এরা কেউই বাঘের নখের যুগ্যিও নয়। এদের দৈহিক স্থূলত্ব আর আক্রমণের পদ্ধতি এমন যে, শিকারী তুখোড় হলে হয়ত আত্মরক্ষার সুযোগ এবং চূড়ান্ত মার দেবার মওকাও মিলে যেতে পারে। কিন্তু চোট-খাওয়া বাঘের বেলায় কোনো জারিজুরি খাটবে না—সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেবার মতন তার তখনও রাগ।

আহত বাঘের সন্ধান করবার সাধারণত চারটি পৃথক পদ্ধতি আছে।

এক, শিক্ষিত হাতির পিঠে চড়ে যাওয়া। উপায় হিসেবে এটাই সবচেয়ে নিরাপদ। যেখানে বাঘের সন্ধান করা হবে সেই এলাকাটি কত বড় এবং কি রকম, তার ওপর নির্ভর করবে এ কাজে ক'টা হাতি ব্যবহার করা হবে। সব সময় একটির বেশি হাতি ব্যবহার করা ভালো, কারণ, একা একটি হাতি হলে চরম মুহূর্তে তার ঘাবড়ে যাবার ভয় থেকে যায়।

দুই, জায়গাটাতে এক পাল গরু খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া। ওদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর হওয়ায় বাঘের আস্তানা খুঁজে বার করা সহজ হবে। তাছাড়া বাঘ যদি বিরক্ত হয়ে আক্রমণও ক'রে বসে, তাহলে গরু বেচারাদের ওপরই সে গায়ের ঝাল ঝাড়বে। সেই ফাঁকে গুলিবন্দুকবাজ শিকারী, আসল যে

দোষী—সে পাব পেযে যাবে। তবে এ পন্থায় দুটো মুশকিল আছে। প্রথমত, যে জাযগায বাঘ আছে সে জাযগায গরু তাডিযে নিযে যাওযা শক্ত কাজ। হাওযা উজানে বইলে বহু দূব থেকে—কখনও কখনও এমন কি আধ মাইল দূব থেকেও—গরুব পাল বাঘেব গাযেব গন্ধ পেযে যাবে। সে অবস্থায এক সঙ্গে অনেক লোক মিলে জোবসে তাডা না দিলে ওদেব ওমুখো একচুলও নডানো যাবে না।

এবং দ্বিতীযত, বাঘেব ডেবাব দিকে কেউ যদি ওদেব তাডিয়ে নিযে যেতে-পাবেও, বাঘেব এক হুমকিতেই ওবা হুডমুড ক'বে এমন ভাবে পালাবে যে তাব ফলে বেশ কিছু লোক হয ওদেব পাযেব খুবেব নীচে বিশ্রী ভাবে থেঁৎলে যাবে, নয ওদেব শিঙেব গুঁতোয অক্কা পাবে।

তিন নম্বব পদ্ধতি হল, বাঘেব পেছনে কুকুব লেলিযে দেওযা। মাইলেব পব মাইল দূব থেকে কুকুবেবা যদি ঘুণাক্ষবেও বাঘেব গন্ধ পায, ল্যাজ গুটিয়ে চোঁ চা দৌড দেবে। একমাত্র তালিম-দেওযা সাহসী কুকুবদেবই এ কাজে লাগানো যেতে পাবে।

চতুর্থ পদ্ধতি হল, আহত বাঘকে খোঁজাব জন্যে সটান তাব ডেবায গিয়ে হানা দেওযা। এই উপাযটি প্রযোগ কবাব সময় যেতে হবে নির্ঝঞ্ঝাট হযে এবং যথাসম্ভব কম লোক সঙ্গে নিযে। সঙ্গী হিসেবে থাকবে বড জোব দুজন কি তিন জন লোক, নিতে হবে ভালোভাবে যাচাই ক'বে, যাবা একটুতে ঘাবডাবে না। এ বিষযে হুঁশিযাব কববাব জন্যে আবাব বলছি, এ কাজে সঙ্গে লোক বেশি থাকলে তাতে সাহায্য তো হযই-না—ববং ঘাডেব ওপব বোঝা হযে দাঁডায, এ ব্যাপাবে যত বেশি খুঁতখুঁতে হওযা যায, শিকারে বিপদেব সম্ভাবনাও তত কমে।

লুকিযে চুবিযে শিকাব কববাব অনেক হ্যাপা। তাই শেষেব পদ্ধতিটি বেছে নেওযা ছাডা আমাব আব গত্যন্তব ছিল না। অবশ্য ববাবব এই পদ্ধতিই আমাব পছন্দ।

সদাবামকে আমি তাঁবুতে বেখে গেলাম—ওব মচ্‌কানো হাঁটুব যাতে শুশ্রূষা হয এবং ও যাতে ওব সর্বার্থসাধক আফিম সেবন ক'বে শবীবমনে বল ভবসা পায। চাকবটাকে সঙ্গে নিলাম, এ জাতীয কাজে মোটেই সে আনাডি নয। চোট-খাওযা বাঘেব পিছু নেওযা আমাবও এই প্রথম নয। মোটামুটি একই বকমেব অবস্থাব মধ্যে আগেও আমি এ কাজ কবেছি। কিন্তু যত বাবই

এ কাজ হাতে নিয়েছি গলা শুকিয়ে গিয়ে আমাব ভয়-ভয় কবেছে। আমাব অথবা আব কাবো গুলি ছোঁড়াব দোষ হয়ে থাকলে সব সময় গালমন্দ কবেছি—কেননা তাব ফলেই তো আমাকে এমন ফ্যাসাদে পড়তে হয়েছে।

আগেব দিন সন্ধ্যেবেলায বাঘ আমাকে তাব ল্যাজে খেলাবাব বিলক্ষণ স্থবিধে পেয়েছে, স্থস্থিব হয়ে তাক কববাব বিন্দুমাত্র স্থযোগ দেয নি। আমি ক্ষণিক উত্তেজনাবশে বন্দুকেব ঘোড়া টিপে দিয়েছি মাত্র—কী কবছি না কবছি সে সম্বন্ধে ভাববাব অবকাশ পাই নি। আমাব ক্রিয়াকলাপ হয়েছে আত্মবক্ষাব সহজাত প্রবৃত্তিবশে। অথবা আমাব সেই অর্থহীন মূঢ় আচবণেব পিছনে ছিল হয়ত ভয়েব তাড়না। সহজাত যে তাড়নাই হোক, কাজটা যে অর্থহীন মূঢ় হয়েছে—এ বিষয়ে এখন আব আমাব সন্দেহ নেই।

ঠাকুমা-ঠান্‌দিদিবা বাঘকে নিয়ে হাঁউ-মাউ-খাঁউ গোছেব যে গল্পই বলুন, স্থস্থ স্বাভাবিক অবস্থায বাঘ কিন্তু আদতে মহাশয প্রাণী। আমাব তিবিশ বছবেব আবণ্যক জীবনে এমন একটি দৃষ্টান্তও আমি দেখি নি যেখানে বাঘ অকাবণে মানুষেব ওপব চড়াও হয়েছে। উলুবনে যেই সব্ সব্ আওয়াজ হয অমনি বাঘ শুধু যে খোঁজ নিতে যায তাই নয, শিকাব ধববাব মতলবেও যায। আওয়াজ উৎপাদনকাবী জীবটি যদি ঘাসেব আড়ালে গা ঢাকা দেওয়া মানুষ হয, বাঘ সঙ্গে সঙ্গে তাব ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে এবং তাকে মেবে ফেলবাব পব হয়ত টেব পাবে—সে যেটা মেবেছে সেটা তাব স্বাভাবিক শিকাব নয। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঘটি যদি মানুষখেকো না হয—মবা মানুষটাকে ফেলে বেখে ভয়ে চোঁ চা দৌড় দেবে।

আমাব এই বাঘটা আচমকা ধবা পড়ে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এমন নয যে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। জঙ্গলেব ভেতব পালিয়ে যাবাব তাব যথেষ্ট স্থযোগ ছিল। আমাব দৃঢ় ধাবণা মুখবিকৃত ক'বে চাইলেও আসলে সে আমাব কোনো ক্ষতি কবতে চায নি। তুজনেই তুজনকে দেখে আমবা চমকে গিয়েছিলাম এবং তাব মুখবিকৃতিটা ছিল, যত দূব মনে হয, তাব সেই চমকানো ভাবেবই লক্ষণ। আমি নিছক ভয পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে বন্দুকেব গুলি ছুঁড়লাম—তাও ভালোমত তাক্ পর্যন্ত না ক'বে।

আগেব দিন সন্ধ্যেবেলায সদাবাম যে জায়গায বনকুলেব ঝোপেব নীচে হবিণ দেখতে পেয়েছিল, সেই জায়গায এসে আমাব চাকবটাকে বললাম পাথবেব টুকবো আব নুড়িতে পকেট আব কাঁধেব ঝোলা ভর্তি ক'বে নিতে।

আমাদের সামনে তিরিশ গজ এলাকার মধ্যে যত ঝোপঝাড় আছে, ওকে ব'লে দিলাম প্রত্যেকটা ঝোপে ঝাড়ে ইঁট ছুঁড়ে মারতে। বাঘ যদি এই এলাকাটুকুর মধ্যে থাকে তাহলে ঢিল পড়তে দেখলে চটে মটে সে বেরিয়ে আসবে এবং আমি তখন তাকে গুলি করবার আরেকটা সুযোগ পাব—এই ভেবে বন্দুক নিয়ে আমি তৈরি হয়ে থাকলাম। বাঘ এতে অতিষ্ঠ হবে, কিন্তু কে তাকে কোথা থেকে জ্বালাতন করছে জানতে না পেরে তেড়ে আসতে পারবে না। রাগে গরগর করতে করতে বাঘ তখন আস্তানা বদলাতে গিয়ে হয় আমার বন্দুকের নিশানার মধ্যে এসে যাবে,-নয় আমি তার হদিশ পেয়ে যাব।

কিন্তু ঢিল ছুঁড়ে বাঘের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আমরা তখন গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে সামনে আরও তিরিশ গজ এলাকা জুড়ে ঢিল ছুঁড়তে লাগলাম। তাতেও কোনো ফলোদয় হল না। ক্রমশ সাবধানে গোটা উপত্যকাটা আমরা চষে ফেললাম। তারপর এসে পড়লাম একেবারে সেই গড়ানে জায়গাটায়—যেখানে আগের দিন সাক্ষাৎ বাঘের সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়েছিল।

খোয়াইয়ের পাড় থেকে বিশ হাত তফাতে একটা গাছ গড়ানে জায়গাটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। আমার লোকটাকে তার ওপর চড়ে বসতে বললাম। যখন দেখলাম গাছের মগডালের ওপর নির্বিঘ্নে ও বেশ যুৎ ক'রে বসেছে, তখন আমি বুকে হেঁটে খোয়াইয়ের পাড়ে চলে গিয়ে ওকে বললাম—এইবার ঢিল ছুঁড়তে থাকো। ছ'টা আটটা ঢিল ছুঁড়তে না ছুঁড়তেই ওপাশের গড়ানে জায়গাটার নীচে থেকে চাপা গলায় গর্‌র্ গর্‌র্ আওয়াজ ভেসে এল। আমি আমার জায়গা থেকে পরিষ্কার ঠাহর করতে পারছিলাম বাঘ ঠিক কোথায় ব'সে গাঁইগুঁই করছে। কিন্তু খোদ্ মালিককে দেখতে পাচ্ছিলাম না।

যে জায়গা থেকে আমি প্রথম গুলিটা চালিয়েছিলাম, সেখান থেকে বাঘের ডেরা হাত চল্লিশেক দূরে। আমার গুলিতে বাঘ যে গুরুতরভাবে জখম হয়েছে, সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয় হলাম, কেননা তা নাহলে এতক্ষণে সে বহু দূরে চলে যেত—অন্তত প্রায় সিকি মাইল দূরে সবচেয়ে কাছের জলের জায়গায় তো যেতই।

আমার লোকটিও বাঘের ডাক শুনতে পেয়ে কেল্লা মার দিয়ার ভঙ্গিতে

হাসি হাসি মুখ ক'বে ইশাবায জাযগাটা দেখিযে দিল। যখন দেখল আমি একেবাবে চোখকান খাড়া ক'বে তৈবি হযে আছি, তখন বেশ টিপ ক'বে ক'বে, ঘাসেব যে ঝোপে বাঘ গা ঢাকা দিযে ছিল, সেখানে টপাটপ কযেকটা ঢিল ছুঁড়ল। গোটা কযেক ঢিল বাঘেব গাযে লেগে থাকবে—এবাব শোনা গেল তাব ভযঙ্কব হুঙ্কাব। আমাব মনে হল, তাব আওযাজে আমাব বুকেব নীচেকাব মাটি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

যাবা বাঘ দেখেছে শুধু চিডিযাখানায আব সার্কাসে, যাবা কখনও ক্রুদ্ধ বাঘ বাজাব বাজখাঁই গর্জন শোনে নি—তাবা কখনই ধাবণা কবতে পাববে না সে একটা কী হৃদ্‌কম্পজাগানো ভযাবহ ব্যাপাব।

খোযাইযেব পাডে একটা শিবালেব আডালে বাঘ তখনও লুকিযে থেকে ক্রমাগত গজবাচ্ছে আব চাবদিকেব ঘাসেব ওপব ল্যাজেব বাডি মাবছে।

একেকটি মুহূর্ত যাচ্ছে আব আমাব পক্ষে ধৈর্য ধাবণ কবা ক্রমেই কঠিন হযে পডছে। আমি ঠিক কবেছিলাম বাঘেব মুণ্ডু কিংবা কলিজাব দিকটা স্পষ্টাস্পষ্টি যতক্ষণ না দেখতে পাচ্ছি, ততক্ষণ কিছুতেই গুলি ছুঁডব না। কিন্তু দেখে মনে হল ওদিকে বাঘও যেন আমাব অভিকচি অনুযাযী তাব গুপ্তস্থান ছেডে আসতে এবং তাব শবীবেব মোক্ষম জাযগাগুলো মেলে ধ'বে আমাকে আমাব মনস্কামনা সিদ্ধ কবতে দিতে বাজী নয। এদিকে আমাব চাকবটিও যেন বাঘেব ইচ্ছেমত নিজেব মন বেঁধে নিযেছে। কেননা সেও ওদিকে ঢিল ছোঁডা বন্ধ কবেছে। আমি এখন কী কবি।

এদিক ওদিক তাকালাম—কোথাও পাথবেব টুকবো প'ডে আছে কিনা। কোথাও কিছু নেই। মাটিব একটা ঢেলা পর্যন্ত নয। আমাব লোকটিকে ইশাবা কবব ব'লে গাছেব দিকে মুখ তুলে তাকালাম। কিন্তু গজবানো বাঘেব দিকে তাকিযে লোকটা এমন সম্মোহিত হযে আছে যে, আমাব পক্ষে তাব দৃষ্টি আকর্ষণ কবা সম্ভব হল না।

বাঘেব মুহুর্মুহু গর্জনে এমন অতিষ্ঠ হযে উঠেছিলাম যে, ধৈর্যেব বাঁধ ভেঙে গেল। আমাব পক্ষে আব কিছুতেই চুপ ক'বে ব'সে থাকা সম্ভব হল না। পকেট থেকে একটা ফালতু কার্তুজ বাব ক'বে নিজেকে পুবোপুবি গোপন বেখে আমি আধা-গোপন বাঘটাব দিকে ছুঁডে মাবলাম। কার্তুজটা শক্ত জাযগায প'ডে খট্‌ ক'বে আওযাজ হল। বাঘটা ক্ষেপে গিযে তক্ষুনি তাব ওপব ঝাঁপিযে প'ডে নিজেব অর্ধপঙ্গু শবীবটা ঘাসবনেব ভেতব থেকে টেনে

হেঁচ্‌ড়ে বার ক'রে আনল। আমি তার মুণ্ডুটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। হাত তিরিশেক দূর থেকে আমার হাতের বন্দুক গর্জে উঠল। সাহস হারিয়ে যাকে আমি জখম করেছিলাম, কষ্টের হাত থেকে এতক্ষণে সে মুক্তি পেল।

আমার আগের গুলিটা—তামার পাতে মোড়া ৩০০ গ্রেনের ধাতুপিণ্ড—বাঘের বুকের সামান্য নীচে ইঞ্চি দুই ডাইনে বিঁধেছিল। গুলিটা তার কাঁধের হাড় সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দিয়ে সটান তার অন্ত্রে গিয়ে ঘা দিয়েছিল। তার জন্যে বেচারা উঠে দাঁড়াতে এবং খানিকটা পথও হাঁটতে অপারগ হয়ে পড়েছিল।

সদ্য যৌবনে-পা-দেওয়া বাঘটা বড় সুন্দর দেখতে ছিল। তার গায়ে ছিল পুরু পশমের ওপর ফ্যাকাশে কালোয় আর ম্যাড়মেড়ে সোনার জলে ছাপানো ভাঙা ভাঙা ডোরাকাটা দাগ।

বয়সের তুলনায় বেশ বড় সড়। মেপে দেখা গেল, আপাদমস্তক দৈর্ঘ্যে সে ন' ফুট আট ইঞ্চি।

['ডোরাকাটার অভিসারে' বই আকারে ছাপা হচ্ছে। 'পরিচয়'-এ ধারাবাহিক প্রকাশ তাই এ-সংখ্যায় সমাপ্ত হল।]

অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববিশ্রুত পদার্থ-বিজ্ঞানী ল্যান্দাউ

বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থ-বিজ্ঞানী অ্যাকাডেমিশিয়ান লেভ ল্যান্দাউ এ-বছরের পয়লা এপ্রিল মস্কোতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিজ্ঞানজগতে ল্যান্দাউ এমন একটি নাম, যা প্রতিটি বিজ্ঞানকর্মীর মনে এক গভীর আবেগকে জাগিয়ে তোলে।

ছ-বছর আগে ল্যান্দাউ এক মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। তাঁর বাঁচবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। মৃত্যুর হাত থেকে এই মানুষটিকে ছিনিয়ে আনবার জন্যে প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে সেদিন এক অসাধারণ সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। গোটা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পৃথিবীর বহু দেশের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মস্কোতে সমবেত হয়েছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা ধরনের বিচিত্র ওষুধপত্র এসে জড় হয়েছিল মস্কোর সেই হাসপাতালটিতে, যেখানে ল্যান্দাউর অচৈতন্য দেহটা মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। তারপর শুরু হল চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। পরপর চারবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন ল্যান্দাউ। চারবারই চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মৃত্যুকে জয় করলেন। ল্যান্দাউকে মরতে তাঁরা দেন নি।

ল্যান্দাউকে বাঁচাবার জন্যে সেদিন এই যে একটি অসাধারণ ঘটনা শুরু হয়েছিল, তার প্রধান কারণটা ছিল এই, তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তখন ল্যান্দাউ ছিলেন বোধহয় সবচেয়ে প্রতিভাবান মানুষ। অকালমৃত্যুর ফলে বিজ্ঞানজগত ল্যান্দাউর প্রতিভার অবদান থেকে বঞ্চিত হবে, এটা পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহল কোনোমতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই পৃথিবীর মানুষ নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে একটি মানুষকে বাঁচানোর মহৎ মানবিক ঘটনাকে সেদিন প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল।

ছ-বছর আগের গুরুতর দুর্ঘটনার হাত থেকে ল্যান্দাউ বেঁচে উঠলেও, তাঁর স্বাস্থ্যটা পুরোপুরি সেরে উঠতে পারে নি। যদিও তাঁর আহত মস্তিষ্কের সমগ্র প্রতিভাকে তিনি আবার কাজে নিয়োগ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁর দুর্বল শরীরটার ওপরে ছ-বছর বাদে মৃত্যুর অভিযানকে আর বাধা দেয়া গেল না।

১৯০৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাকুতে লেভ ল্যান্দাউর জন্ম হয়। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়। মাত্র তের বছর বয়েসে তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেন। চোদ্দ বছর বয়েসে তিনি বাকু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং একসঙ্গে পদার্থবিদ্যা, গণিত ও রসায়ন এই তিনটি বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে বেরিয়ে আসবার আগেই মাত্র আঠের বছর বয়েসে ল্যান্দাউ তাঁর কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কিত প্রথম গবেষণা-নিবন্ধ 'দি অ্যানালিসিস অফ স্পেকট্রা অফ ডাইঅ্যাটমিক মলিকিউলস' প্রকাশ করেন। এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত বিজ্ঞানী মহলে ল্যান্দাউকে নিয়ে সাড়া পড়ে যায় এবং তাঁকে ঘিরে এক নতুন বিজ্ঞানীগোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

উনিশ বছর বয়েসে ল্যান্দাউ উচ্চতর গবেষণার জন্যে ইওরোপ গমন করেন এবং সে সময়কার প্রখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ, পাউলি, ব্লক প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন এবং কোপেনহ্যাগেনে অধ্যাপক নীলস বোরের গবেষণাগারেও কাজ করেন। ১৯৩২ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে আসেন এবং খারকভ টেকনিকাল ইনস্টিটিউটের তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার স্বীকৃতিতে ১৯৩৪ সালে তাঁকে ডকটরেট ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

খারকভেই ল্যান্দাউ তরুণ তত্ত্বীয় পদার্থবিদদের জন্যে তাঁর বিখ্যাত স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলের খ্যাতি সোভিয়েত ইউনিয়নের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং যে কোনো তরুণ পদার্থবিদ এই ইনস্টিটিউটে কাজ করবার সুযোগ পাওয়াকে তাঁদের জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন বলে গণ্য করতেন।

১৯৩৭ সালে ল্যান্দাউ খারকভ থেকে মস্কোয় চলে আসেন এবং সেখানকার ইনস্টিটিউট অফ ফিজিকাল প্রব্লেমস-এর তত্ত্বীয় বিভাগের প্রধান রূপে নিযুক্ত হন।

প্রখ্যাতনামা বিজ্ঞানী পিওতর কাপিত্‌জা ছিলেন তখন সেই ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ। কাপিত্‌জা ও ল্যান্দাউ ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

১৯৩৮ সালে বিজ্ঞানী রুমার-এর সঙ্গে যৌথভাবে 'ইলেকট্রন কণিকার ধারাবর্ষণ' সম্পর্কে ল্যান্দাউর গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে পদার্থ-বিজ্ঞানে জটিল বিষয়বস্তু ইলেকট্রনিক গ্যাসের আচরণ সম্পর্কে তাঁর আবিষ্কৃত তথ্য বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সুপারফ্লুয়িডিটি সম্পর্কিত গবেষণা বিজ্ঞানজগতে ল্যান্দাউর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। হিলিয়াম হলো একটি অদাহ্য, অতি লঘু ও রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণের অনুপাত হলো দু-লক্ষভাগের একভাগ মাত্র। হিলিয়ামকে যখন প্রায় পরম শূন্য ডিগ্রী তাপমাত্রায়(—৪৫৯.৬৯° ফারেনহিট) নামিয়ে আনা হয়, তখনই সুপারফ্লুয়িডিটি রূপ ব্যাপারটি দেখা দেয়। এই অবস্থায় তরল হিলিয়ামকে একটি পাত্রে রেখে দিলে হিলিয়াম সেই পাত্রটির গা বেয়ে ওপরে উঠে আসতে আরম্ভ করে। বহুদিন পর্যন্ত এই ধারণাটাই প্রচলিত ছিল যে, পরম শূন্য ডিগ্রীতে পদার্থের সমগ্র আণবিক ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে আসে। যে কয়েকজন সর্বপ্রথম এই ধারণাটি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করেন, ল্যান্দাউ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

ল্যান্দাউ হিলিয়াম-দুই নামে বিস্ময়কর তরল পদার্থটি সম্পর্কে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর আগে কেউ এই পদার্থটির বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে উদ্‌ঘাটন করতে পারেন নি। তরল হিলিয়াম সংক্রান্ত তাঁর অনন্যসাধারণ গবেষণার জন্যে ১৯৬২ সালে ল্যান্দাউকে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। কিন্তু তখন তিনি গুরুতর মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন। নোবেল কমিটি হাসপাতালে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সেখানেই তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেন।

আধুনিক তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানে ল্যান্দাউর অবদান অবিস্মরণীয়, এর স্বীকৃতিতে তিনি দেশ-বিদেশ থেকে অজস্র সম্মান ও উপাধি পেয়েছেন। এ-বছরের গত ২২শে জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'অর্ডার অফ লেনিন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ল্যান্দাউ তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় একাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থের রচয়িতা। ইয়েভ্‌গেনি লিফ্‌শিত্‌জের সঙ্গে ল্যান্দাউ তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার ওপর

ছয় খণ্ডে যে সুবৃহৎ রচনাটি লেখেন, তা বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে এক ক্লাসিকসের সম্মান লাভ করেছে। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর একটি মনোজ্ঞ লোকরঞ্জক পুস্তিকা রয়েছে।

ল্যান্দাউ ছিলেন অত্যন্ত পরিহাসপ্রিয় ও আমুদে মানুষ। ছাত্র ও সহকর্মীদের সম্বন্ধে তাঁর অজস্র ঠাট্টার গল্প প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। ল্যান্দাউ আরো দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে বিজ্ঞানজগতকে সমৃদ্ধ করবেন, পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের এই আশা আর পূরণ হয়ে উঠল না।

অটো হান

পারমাণবিক গবেষণার জগতে অটো হান একটি অবিস্মরণীয় নাম। গত ২৮এ জুলাই ৮৯ বছর বয়েসে দীর্ঘ রোগভোগের পর এই মানুষটির মৃত্যু ঘটেছে।

১৯৩৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর হান এবং তাঁর সহকর্মী ফ্রিত্‌জ্‌ স্ট্র্যাসমান প্রমাণ করেছিলেন যে ইউরেনিয়াম পরমাণুকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করে পারমাণবিক বিভাজন (ফিসন) ঘটানো সম্ভব। তাঁদের এই গবেষণার ফলাফল পারমাণবিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিপ্লবকে সূচিত করে তুলেছিল।

অটো হানের এই আবিষ্কারের পেছনে একটু ইতিহাস রয়েছে। ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস শহরে সলভে কংগ্রেস উপলক্ষে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা সমবেত হয়েছিলেন। আইরিন জোলিও কুরি, তাঁর স্বামী জোলিও কুরির সাহায্যে প্যারিসে তাঁর গবেষণাগারে বিভিন্ন পদার্থের, বিশেষ করে থোরিয়ামকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করে তা থেকে আলফা রশ্মি নির্গমনের যে-ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তারই এক বর্ণনা কংগ্রেসে উপস্থিত সদস্যদের কাছে রাখলেন। কিন্তু কংগ্রেসে উপস্থিত বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই ঘটনাটা বিশ্বাস করে উঠতে পারলেন না। বার্লিনে কাইজার উইলহেলম ইনস্টিটিউটে অটো হানের সহকর্মিণী লিজা মাইটনার আইরিন কুরির পরীক্ষার সমালোচনা করে বললেন যে তিনিও একই ধরনের পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু ঐ ধরনের কোনো ফলাফল পান নি।

আইরিন ও জোলিও কুরি প্যারিসে ফিরে এসে তাঁদের পরীক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং এই পরীক্ষাই তাঁদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার—কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার ভিতস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

বার্লিনে অটো হানের গবেষণাগারে কুরিদম্পতির গবেষণার খবর এসে পৌঁছয়, কিন্তু তাঁদের পরীক্ষার বৈজ্ঞানিক-যাথার্থ সম্বন্ধে হানের গোড়া থেকেই সন্দেহ থাকায় তিনি গবেষণাপত্রগুলো পড়েও দেখেন না।

সময়টা ১৯৩৮ সাল। জার্মানিতে তখন হিটলারী নাজিদের তাণ্ডব চলেছে। অটো হানের গবেষণার কাজে সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের সহকর্মিণী লিজা মাইটনার ছিলেন অস্ট্রিয়ার মানুষ। বিশুদ্ধ আর্য না হওয়ার ফলে তিনি জার্মানি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অটো হান ও ম্যাক্স প্ল্যাংক এ-ব্যাপারে হিটলারের কাছে দরবার করেও কিছু করতে পারেন নি। লিজা মাইটনারের জায়গায় স্ট্র্যাসমান হলেন হানের প্রধান সহকর্মী।

ঐ বছরই শরৎকালে আইরিন কুরি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত তাঁর আগেকার সমগ্র কাজের বর্ণনাসহ একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। স্ট্র্যাসমান লেখাটার ওপর চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলেন যে, কুরি-গবেষণাগারের পরীক্ষায় কোথাও কোনো ভুল নেই এবং তাঁর মনে হলো, সমস্যাটিকে বিচার করবার এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পথই যেন খুলে যাচ্ছে।

স্ট্র্যাসমান উত্তেজিতভাবে হানের ঘরে গিয়ে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তাঁকে বললেন যে আইরিন কুরির লেখাটি তাঁকে পড়ে দেখতেই হবে। হান টলবার পাত্র নন। তিনি জবাব দিলেন যে তাঁদের মহিলা বান্ধবীর সর্বাধুনিক কাজ সম্বন্ধে তাঁর আদৌ কোনো আগ্রহ নেই। স্ট্র্যাসমানও ছাড়বার পাত্র নন। হান অন্য কোনো কথা বলবার আগেই তিনি আইরিন কুরির গবেষণাপত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে তাঁকে বলে ফেললেন। হান পরে বলেছেন যে কথাগুলো যেন ঠিক বজ্রের মতো তাঁর ওপরে এসে পড়ল। তিনি তাঁর সিগারটাকে শেষও করতে পারলেন না। তিনি সোজা স্ট্র্যাসমানের সঙ্গে নিচে ল্যাবরেটরিতে দৌড়ে এলেন।

হান বুঝতে পারলেন, সারা পৃথিবী জুড়ে আরো বহু বিজ্ঞানীর মতোই তিনি এতদিন একটা ভুল পথে চলছিলেন। নিজের তরফ থেকে এতগুলো ভুল স্বীকার করবার কাজটা খুব সহজ ছিল না। কিন্তু সেই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়েই তিনি কিছুকাল পরে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্যকে অর্জন করতে পেরেছিলেন।

কয়েক সপ্তাহ ধরে হান ও স্ট্র্যাসমান রেডিয়াম রসায়নের সবচেয়ে সূক্ষ্ম পদ্ধতির দ্বারা কুরি-গবেষণাগারের পরীক্ষাগুলো যাচাই করে চললেন। এভাবে

দেখা গেল, প্যারিসে ইউরেনিয়াম পরমাণুকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করে তাঁরা যেমন ল্যানথেনামের কাছাকাছি একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুকে পাচ্ছিলেন, ঠিক সেরকম একটা ঘটনাই ঘটছে। হান ও স্ট্র্যাসমানের আরো সূক্ষ্ম পদ্ধতির মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে ইউরেনিয়াম পরমাণুটি নিউট্রনের আঘাতে ভেঙ্গে গিয়ে যে দুটি টুকরোয় পরিণত হচ্ছে, তাদের মধ্যে একটি কুরি-গবেষণাগারের অনুমানমতো ল্যানথেনাম নয়—বেরিয়াম এবং অপরটি হলো ক্রিপটন।

ইউরেনিয়ামের মতো একটি ভারী পরমাণুকে নিউট্রনের আঘাতে যে সমান ভারী দুটো অংশে ভেঙ্গে ফেলা যাচ্ছে, এই ঘটনাটি যে একটি অসাধারণ আবিষ্কার—তা হান ও স্ট্র্যাসমান দুজনেই বুঝতে পেরেছিলেন।

পরমাণুবিজ্ঞানে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্যে অটো হান ১৯৪৪ সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতির জন্যে এই পুরস্কার তাঁকে দেয়া হয় ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে। অটো হান তখন ইংরেজদের হাতে যুদ্ধবন্দীরূপে রয়েছেন। খবরের কাগজে তিনি তাঁর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির খবরটা পান। এই পুরস্কার তিনি তাঁর ছাড়া পাবার পর ১৯৪৬ সালে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

অটো হান বরাবর হিটলারের বিরোধী ছিলেন। হিটলার এ-কথা জেনেও কিছু করতে পারে নি, যেহেতু মানুষটা ছিলেন অটো হান। অটো হান তাঁর সহকর্মী বন্ধুদের বলেছিলেন যে, তাঁর আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে যে পরমাণুবোমা তৈরির প্রচেষ্টা জার্মানিতে চলেছে, তার ফলে যদি কোনোদিন হিটলার পারমাণবিক বোমাকে লাভ করে বসে তাহলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। অটো হান বহু ইহুদী বিজ্ঞানীকে হিটলারের রোষানল থেকে বাঁচিয়ে জার্মানির বাইরে যেতে সাহায্য করেছেন।

শুধু একজন মহান বিজ্ঞানীরূপে নয়, একজন মহান মানুষরূপেও অটো হানকে আমরা চিরদিন স্মরণ করব।

শঙ্কর চক্রবর্তী

চলচ্চিত্র-প্রসঙ্গ

বাঙলা চলচ্চিত্রের সামাজিক-অর্থনৈতিক সঙ্কট

হালফিল কলকাতা শহরে দেখা যাচ্ছে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। রূপালী পর্দার ছায়া-মানুষেরা—বাঙলা সিনেমার পরিবেশক-প্রযোজক, কলাকুশলী, অভিনেতৃবর্গ—এসে দাঁড়িয়েছেন কলকাতার লক্ষ মানুষের ভিড়ে, কায়ার জগতে, রাস্তায় রাস্তায়, ফুটপাতে ফুটপাতে।

ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে যতই অভিনব মনে হোক না কেন, একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এটাই তো স্বাভাবিক। সামাজিক-অর্থনৈতিক অধঃপতনের যে-বাঁধ-ভাঙা বন্যায় সমস্ত বাঙলাদেশ ভেসে চলেছে এক সর্বনাশা ভবিষ্যতের দিকে, বাঙলা সিনেমাই বা তা থেকে বাদ যাবে কোন দৈব বলে? বাদ যায় নি।

কিন্তু বাঙলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির আর পাঁচটা ব্যাপারের মতোই, ভেতরে ভেতরে ফাঁপা হয়ে গিয়েও, একটা সংস্কারের কাঠামো খাড়া করে রেখে বাঙলা সিনেমার মানুষেরাও যেন নিজেদের মনকে চোখ ঠেরে এসেছেন এতদিন। কিন্তু আজ সেই সংস্কার কাটতে শুরু করেছে। এখন "রাস্তাই একমাত্র রাস্তা।"

গত দশ বছরের বাঙলা সিনেমার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় এ দশ বছরে কী ব্যবসায়িক কী নন্দনতাত্ত্বিক দু-দিক থেকেই বাঙলা ছবি ক্রমশ অবনতির দিকেই নেমে এসেছে। বলা বাহুল্য অর্থনৈতিক সঙ্কটই এসেছে প্রথম, তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে উন্নত শিল্পমানের ছবিকে হটিয়ে স্থূলরুচির বিকট চলচ্চিত্র-পণ্য।

১৯৬৮-তে বাঙলা ছবির যে সঙ্কট প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে—একদিকে তা যেমন দুশ্চিন্তার কারণ, অন্যদিকে তা-ই আবার এক সুযোগও এনে দিয়েছে। সুযোগ এই কারণে যে, এই প্রথম বাঙলা ছবির সঙ্কটকে

বাঙলাদেশের মানুষ এত স্পষ্টভাবে জানতে পারল। এবং এই সঙ্কটে বাঙলাদেশের সমস্ত মানুষেরই যে কিছু করণীয় আছে, এই সত্যও তাদের কাছে ধরা পড়ল। আমি বলতে চাইছি, এই প্রথম বাঙলা ছবির সঙ্কটকে একটি বিচ্ছিন্ন সঙ্কট হিসেবে বিচার না করে, বাঙলাদেশের সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক সঙ্কটের দৃষ্টিকোণ থেকেও ভেবে দেখবার সুযোগ ঘটল। এবং এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া বাঙলাদেশের কোনো সঙ্কটের সমাধানই আজ আর সম্ভব নয়।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে গণতন্ত্রের যে বিকাশ ছিল কাম্য, সংবিধানে ছিল যার স্বীকৃতি, বাস্তবে তার প্রতিরূপ খুঁজে পাওয়া গেল না। কী উৎপাদন-পদ্ধতিতে, কী বণ্টন-ব্যবস্থায়, একটাই ঝোঁক দিন দিন প্রবল হয়ে উঠল—কে না জানে সেই ঝোঁকটি একচেটিয়া পুঁজির। মানুষের মুখের ভাত পরনের কাপড় থেকে চলচ্চিত্র পর্যন্ত একই মারাত্মক অতিমুনাফার ঘোড়দৌড়, মানুষের বেঁচে থাকার নিম্নতম প্রয়োজনকেও উপেক্ষা করে, মানুষের সুকুমার বৃত্তির গলা টিপে, মানবজীবনের একটা 'আদর্শ'-কেই উচ্চে তুলে ধরা হল—টাকা, আরো টাকা।

এই সামগ্রিক সত্যটিকে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে বাঙলা ছবির আজকের সঙ্কট-বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে।

বাঙলা ছবির জগতেও টাকার খেলা চলছে। অবশ্য সে খেলার খেলোয়াড় মাত্র গুটিকয়েক লোক। এতদিন যে সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছিল অস্পষ্ট ভাবে, অন্তরালে—যেখানে সঙ্কটের প্রধান উৎস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না—আজ সেই উৎস খুঁজে পাওয়া গেছে। বাঙলা ছবির জগতের সর্বস্তরের কর্মীরা এক বাক্যে বলছেন, প্রদর্শকেরাই বাঙলা ছবির সঙ্কট সৃষ্টির জন্য প্রধানত দায়ী।

এই প্রসঙ্গে বাঙলা ছবির প্রচলিত উৎপাদন ও প্রদর্শন-পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার।

বাঙলা ছবি তৈরি করেন প্রযোজক ও প্রদর্শক মিলে। প্রথমে টাকা খরচ করেন প্রযোজক, পরে পরিবেশক তাঁকে টাকা ধার দেন। অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলা-কুশলী, স্টুডিও-ল্যাবরেটরি ও আনুষঙ্গিক যাবতীয় খরচ তো বটেই, তা ছাড়াও ছবির বিজ্ঞাপন এবং একাধিক প্রিণ্টের খরচও বহন করতে হয় পরিবেশককে। এইভাবে প্রযোজক ও পরিবেশক ছবি তৈরি

করে হাজির হন প্রদর্শকের দরজায়। প্রদর্শক, যিনি ছবি তৈরির জন্য একটি পয়সাও খরচ করেন না, শুধু সিনেমা-হাউসের মালিক হয়ে সেই ছবি দেখিয়ে মোট বিক্রির শতকরা ৭০।৭৫ ভাগই (পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র-শিল্প-সংরক্ষণ সমিতির হিসেবে) নিয়ে নেন। বাকি টাকা প্রথমে পরিবেশক, পরে প্রযোজক ফেরত পান। ছবি 'হিট' না করলে কোনো বাঙলা ছবি থেকে পরিবেশক সামান্য কিছু টাকা ফেরত পেলেও, প্রযোজক এক পয়সাও পান না। এবং 'হিট' বাঙলা ছবির সংখ্যা গত কয়েক বছরে খুবই কম। এই কারণে বছর-বছর পুরনো প্রযোজক-পরিবেশকরা ছবি তৈরির সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছেন, নতুন প্রযোজক ছবি তৈরি করতে এগিয়ে আসছেন না।

এর পরেও আছে, তৈরি ছবির মুক্তির সমস্যা। গত পাঁচ বছরে প্রায় ৮০টি বাঙলা ছবি তৈরি হয়ে পড়ে আছে, মুক্তির আশা প্রায় নেই। কারণ, বৃহৎ তারকাচিহ্নিত ছবি ছাড়া প্রদর্শকেরা ছবি দেখাতে উৎসাহী হন না, দ্বিতীয়ত, ছবি 'রিলিজ'-এর কোনো নিয়ম মানা হয় না বলে 'গোপন ব্যবস্থা'য় পরে-তৈরি-ছবি আগে রিলিজ হয়ে যায়। তা ছাড়াও আছে হিন্দি ছবির দাপট।

হিন্দি ছবির বাজার ভারতজোড়া। তাই বাঙলাদেশে তারা অপেক্ষাকৃত কম লাভেও অসম প্রতিযোগিতায় বাঙলা ছবিকে হারিয়ে দিচ্ছে। এবং নিশ্চিত মুনাফার লোভে বাঙলার প্রদর্শকরাও 'হিন্দি ছবি' নামক বিকৃতরুচির পণ্যে বাজার ছেয়ে ফেলছেন। সমাজের মধ্যে এই ছবিগুলি সৃষ্টি করছে আর-এক নৈতিক সঙ্কট। বিশেষত তরুণদের ওপর এই সব ছবির বিষক্রিয়া কী ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে, তা চোখকান খোলা রাখলেই বোঝা যায়। এখানে কেউ প্রাদেশিকতার প্রশ্ন তুললে ভুল করবেন। কারণ প্রশ্নটা ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে—ভাষা নিয়ে বা শিল্প নিয়ে নয়।

হিসেব-নিকেশের জটিলতার ভেতর প্রবেশ না করেও যে কোনো শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হবার নয় যে, বাঙলাদেশে ১৯৫৭য় ৫৭ টি ছবির জায়গায় যখন ১৯৬৭ তে ২৮ খানা ছবি তৈরি হয় এবং তৈরি ছবি মুক্তি না পেয়ে বছরের পর বছর পড়ে থাকে, তখন, সেই শিল্পের সঙ্কট কী ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

ভরসার কথা এই সঙ্কটের মোকাবেলা করতে এগিয়ে এসেছেন চলচ্চিত্র-জগতের লোকেরাই, পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র-শিল্প-সংরক্ষণ-সমিতির আহ্বানে

কলা-কুশলী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, প্রযোজক-পবিবেশক, স্টুডিও-ল্যাববেটবিব কর্মী সবাই এক হযে লডছেন কলকাতাব 'বিলিজ চেন'এব মালিকদেব বিরুদ্ধে। তাঁবা ১২ জুলাই ৬৮ থেকে কলকাতাব বাঙলা ছবিব 'বিলিজ চেন'গুলিব সামনে সত্যাগ্রহ শুরু কবেছেন এবং জনসাধাবণেব সহযোগিতায হলগুলি কার্যত অচল করে বেখেছেন। তাঁদেব দাবি—ছবি বিক্রিব মোট টাকাব সমবণ্টন, সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে বাঙলা ছবিব জনসংখ্যানুপাতে আবশ্যিক প্রদর্শন এবং বিলিজ কমিটি মাবফত বাঙলা ছবি মুক্তিব ব্যবস্থা কবা এবং কলা-কুশলী ও স্টুডিও ল্যাববেটবিব কর্মীদেব ন্যায্য পাওনা আদায।

শোনা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সবকাব নাকি অর্ডিনেন্স কবে প্রতিটি 'হল'-এ নির্দিষ্ট সপ্তাহেব জন্য বাঙলা ছবি প্রদর্শন আবশ্যিক কববেন। এই প্রসঙ্গে সবকাবেব দাযিত্বেব কথাও বলা দবকাব। সবকাব কব-বাবদ প্রায সাডে তিন কোটি টাকা বাঙলাদেশে চলচ্চিত্র-শিল্প থেকে নিযে থাকেন, অথচ এই শিল্পেব উন্নতিব জন্য তাঁবা কিছুই খবচ কবেন না। 'চলচ্চিত্র উন্নযন বোর্ড' গঠন কবে তাঁবা নানাভাবে বাঙলা ছবিব উন্নতিতে সাহায্য কবতে পাবেন। অথচ এ-ব্যাপাবে তাঁদেব কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

অধিকাংশ 'হল' মালিকই এখনো সমিতিব দাবি মেনে নেন নি। এমন কি, সমিতিকে স্বীকৃতি দিতেই তাঁবা নাবাজ। সংবক্ষণ সমিতিব আন্দোলনেব সবচেযে উল্লেখযোগ্য দিক, সর্বস্তবেব কর্মীদেব ঐক্য। সঙ্কটেব প্রধান শত্রুব বিরুদ্ধে তাঁবা এক হযে লডতে পাবছেন, এটাই আন্দোলনেব প্রথম সার্থকতা। অবশ্য কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন—এই আন্দোলনে সত্যিই বাঙলা ছবিব কলা-কুশলী ও কর্মীবা উপকৃত হবেন কিনা। এ-প্রশ্নেব উত্তবে সংবক্ষণ সমিতি বলছেন কলা-কুশলী ও কর্মীদেব ন্যায্য দাবিব জন্যও তাঁবা লডছেন। কিন্তু বর্তমানেব প্রধান কাজ বেশি বাঙলা ছবি উৎপাদনেব বাস্তা পবিষ্কাব কবা। ছবি বেশি হলে তবেই অন্যান্য দাবি আদাযেব প্রশ্ন বিবেচিত হতে পাববে। একথা ঠিকই যে বাঙলা ছবিব জগতে এই কলাকুশলী এবং কর্মীবাই সবচেযে বঞ্চিত। তাঁদেব বাঁচাব দাবিকে উপেক্ষা কবে কিছুতেই চলচ্চিত্র-শিল্পেব সত্যিকাব উন্নতি সম্ভব নয। তাছাডাও আছে সিনেমা-হাউসেব কর্মীদেব কথা। তাদেব সঙ্গে সংবক্ষণ সমিতিব আন্দোলনেবও কোনো বিবোধ থাকাব কথা নয। আন্দোলনেবও প্রথম কথাই হচ্ছে যত বেশি মানুষকে দাবিব সমর্থনে সামিল কবা যায তাব চেষ্টা কবা। এবং সেই

অধিকাংশ মানুষের দাবি-আদায়ের আন্দোলনই সঠিক আন্দোলন।

বাঙলা ছবির সঙ্কটের অতিসরলীকরণ করে লাভ নেই। বছরের পর বছর জট পাকাতে পাকাতে অবস্থা এমন জটিল হয়ে উঠেছে যা কাটাতে বহু সময় এবং পরিশ্রম লাগবে। কিন্তু সে পরের কথা। বাঙলা ছবিকে বাঁচতে হলে বেশি বাঙলা ছবি তৈরি হওয়া দরকার। প্রদর্শকের মনোপলি ভাঙতে পারলে তবেই সেই সম্ভাবনা দেখা দেবে। তাই সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়কে সমর্থন জানাতে কোনো বাধা নেই।

লেখা শেষ করবার আগে আমি বাঙলাদেশের জনসাধারণ—শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক—তথা শিক্ষিত মানুষের চোখ ফেরাতে চাই বাঙলা ছবির এই সঙ্কটের দিকে। ছবির লোকরা যেমন এগিয়ে এসেছেন জনসাধারণের কাছে, তেমনি বাঙলাদেশের মানুষেরও কর্তব্য তাঁদের প্রতি সমর্থন জানানো, সহযোগিতা করা। কারণ এই সঙ্কট একদিকে যেমন বাঙলা ছবির, অন্যদিকে সেটা বাঙলাদেশে সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক এমন কি নৈতিক সঙ্কটও বটে।

কয়েক বছর আগে যে কয়েকজন পরিচালক বাঙলা ছবিকে স্থূল রুচিবিকারের হাত থেকে বাঁচিয়ে উঁচু দরের শিল্পের পর্যায়ে তুলে এনেছিলেন, তাঁদের উত্তরাধিকার সৃষ্টির সম্ভাবনাও তখনই দেখা দেবে, যখন ছবি করার সুযোগ বাড়বে। বাঙলা ছবির সংখ্যাগত পরিবর্তন ধীরে ধীরে গুণগত পরিবর্তনে রূপ নেবে।

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্কট অনেক দিনের। তার সমাধানের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাবেই একাধিক মত থাকা সম্ভব। সুধী পাঠকবৃন্দ, বিশেষত চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুণীজন আলোচনায় যোগ দেবেন—এই আশায় আমরা বর্তমান নিবন্ধটি প্রকাশ করলাম। —সম্পাদক

নাট্য-প্রসঙ্গ

নাটক-বিষয়ে কয়েকটি কথা

নাটক যদি জীবনের দর্পণ হয়, তাহলে ইদানীংকালের অপেশাদার নাট্যকর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আপনাকে যুগপৎ দুটি সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে। এক, বাঙলাদেশে কোনো রাজনৈতিক সমস্যা নেই ; দুই, বাঙলাদেশে রাজনীতি ছাড়া কোনো সমস্যা নেই।

কিন্তু একই বিষয়ের উপর পরস্পর-বিরোধী দুটি সিদ্ধান্ত মাথায় নিয়ে সুস্থ মানুষের পক্ষে যেহেতু সুস্থভাবে বিচরণ করা অসম্ভব, তাই আর-একবার এই আলোচনার সূত্রপাত। অবশ্যই প্রসঙ্গটি পুরনো, তাত্ত্বিক আলোচনাও হাতে-কলমে করে দেখানোর প্রচেষ্টা বহুকাল আগে থেকেই শুরু হয়েছে, কিন্তু শেষ কথা এখনও বলা হয় নি— হয়তো কোনোদিনই বলা যাবে না। তবু মাঝে মাঝেই প্রসঙ্গটির অবতারণা প্রয়োজন, আত্মসমীক্ষার তাগিদে। অন্যথায় নাট্য-আন্দোলনের শরিকদের দিক্‌ভ্রষ্ট হওয়ার সমূহ আশঙ্কা এবং তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হব আমরা—অর্থাৎ দেশবাসী তথা দর্শককুল।

বাঙলাদেশে কোনো রাজনৈতিক সমস্যা নেই : বাঙলা নাট্যজগতে তত্ত্বে ও কর্মে এই মতের মূল প্রবক্তা যাঁরা, তাঁরা কিন্তু কেউ উটকো নন, হঠাৎ খেয়ালের বশে তাঁরা নাটক করতে আসেন নি। খোঁজ নিলে দেখা যাবে কেউ এসেছেন গণনাট্যের মঞ্চ থেকে, কেউ বা সরাসরি রাজনীতি অথবা রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত অন্য কোনো সংগঠন থেকে। চিন্তাগতভাবে রাজনীতি-বিবর্জিত তাঁরা কোনোদিনই ছিলেন না, আমার বিশ্বাস— আজও নেই। তবে কেন তাঁদের নাট্যকর্মের ফলশ্রুতি হিসেবে দর্শকের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে যে, বাঙলাদেশে কোনো রাজনৈতিক সমস্যা নেই ? অতীতের দিকে তাকালে মনে হয় এ-প্রশ্নের একটা উত্তর মিলতে পারে।

গণনাট্য আন্দোলনের একটা যুগে এটা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, শিল্প ও সমাজের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিষয়ে পূর্ণ সচেতনা নিয়ে যে-আন্দোলন শুরু

হয়েছিল, তা থেকে যেন আন্দোলনের বিচ্যুতি ঘটেছে। গণনাট্যকে মুখ্যত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে না দেখে, তাকে সরাসরি রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা হচ্ছে। প্রচারে আপত্তি ছিল না। 'নবান্ন' নাটকে প্রচার করা হয়নি? তেতাল্লিশের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোতে মানুষের করুণ কাহিনী বিবৃত করেই তো 'নবান্ন' থেমে থাকেনি, চিৎকার করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে: তোমরা ছাখো, চিনে রাখো—এদের লালসা, এদের শয়তানিই পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বাঙালীর অপমৃত্যুর কারণ। ঘৃণা জাগানো হয়েছে সমাজের পরগাছাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু বক্তৃতা দিয়ে নয়, দুঃখ-বেদনা-স্নেহ-ভালোবাসা-নীচতা-মহত্ত্ব—সব নিয়ে যে গোটা মানুষগুলো—তাদের কাহিনীর মধ্য দিয়ে। উদ্দেশ্য কি সফল হয়নি? কেউ অস্বীকার করবে? হাজারটা বক্তৃতায় যে-কাজ হয়নি, এক 'নবান্ন' সেই কাজে সফলতার গৌরব অর্জন করেছিল।

এমন প্রচারে সেদিন কারুরই আপত্তি ছিল না। আপত্তি হল, যখন ব্যক্তিমানুষের কথা বাদ দিয়ে বৃহত্তর সমাজের ধুয়া তুলে সংস্কৃতির নামে ছল-চাতুরি শুরু হল। রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন গণনাট্য-কর্মীদের একাংশের উৎসাহ উদ্দীপনা শ্রদ্ধার্হ, কিন্তু তাঁরা যখন নাটককে পিছনে সরিয়ে রাজনীতিকে বড় আসন দিতে চাইলেন, তখনই শুরু হল অপরাংশের প্রতিক্রিয়া। কেন হবে না? নাটক দুর্বল হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু বক্তব্য বলিষ্ঠ হওয়া চাই, শ্রমিক-চরিত্র হলেই তাকে প্রায় দেবতার আসনে বসাতে হবে, পাত্র-পাত্রীরা হবে এক-একটি রাজনৈতিক মতের প্রতিভূ, এবং বক্তব্য মানে কোনো একটি পজিটিভ চরিত্রের মুখ দিয়ে রাজনৈতিক প্রস্তাবের ভাষান্তর আবৃত্তি। তাহলে কাহিনীর কি হবে? অপ্রধান। চরিত্রের কি হবে? অপ্রধান। তথাকথিত রাজনীতির ভূত যখন একাংশের ঘাড়ে চেপে বসল, তখনই দেখলাম 'নবান্ন'র প্রধান সমাদ্দারেরা ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগলেন। এ বিষয়ে সময়ে হস্তক্ষেপ করে গণনাট্য আন্দোলনকে একটি সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারতেন যাঁরা, তাঁরাও তা করে উঠতে পারলেন না। গণনাট্য-মঞ্চে শুধুই রাজনীতির দাপাদাপির প্রতিক্রিয়ায় অন্য চিন্তা বাইরে এসে অন্য কর্মে লিপ্ত হল।

সে যুগে গণনাট্য-মঞ্চের বাইরে ভালো নাটক কম হয় নি। কিন্তু অচিরেই এটা লক্ষ্য করা গেল যে, নাটকে ব্যক্তিমানুষকে প্রতিষ্ঠিত করার নাম করে একদল নাট্যকর্মী একেবারে উল্টো মুখে যাত্রা শুরু করেছেন, এবং এমন

সময় এল, যখন—এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা গণনাট্য-মঞ্চের বাইরে এসে বাঙলা নাট্যকর্মে এক সুস্থ ধারার প্রবর্তন করতে চাইছিলেন—তাঁদের পিছনে ফেলে এ-ক্ষেত্রেও অক্ষমতার অগ্রগমন শুরু হয়েছে। এঁদের "ব্যক্তি" বর্তমানে প্রায় সমাজ-নিরপেক্ষ। নাটকে রাজনীতির গন্ধ পেলে তাঁদের মত—ওটা তাহলে নাটকই নয়। অতিরিক্ত রাজনীতির প্রতিক্রিয়া কি না, জানি না, কিন্তু এই অরাজনীতিকতার পিছনে অনেক সময় ব্যক্তিস্বার্থ গা ঢাকা দিয়ে থাকে।

সুতরাং সেদিন যাঁরা গণনাট্য তথা অপেশাদার নাট্যকর্মকে বদ্ধ জলা থেকে মুক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে বাইরের খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আজ তাঁরা পিছিয়ে পড়লে সকলেরই সমূহ ক্ষতি। আপনাদেরই দায়িত্ব সেদিনের সেই বক্তব্যকে জোরের সঙ্গে দর্শকের সামনে উপস্থিত করা। অন্যথায় নাট্যপ্রয়াস দিক্‌ভ্রষ্ট হতে পারে।

আর-এক কথা। বর্তমানের এ-অরাজনীতিকতার অতি-উৎসাহী সমর্থক কারা, তা চোখ মেললেই দেখা যায়। "রাজনীতির প্রতিক্রিয়ায়" নিজেদের প্রগতিশীল বলতে যাঁদের আপত্তি নেই, তাঁরা একটু তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে হয়তো লাভবান হবেন। দর্শকও অনেক দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবে।

বাঙলাদেশে রাজনীতি ছাড়া কোনো সমস্যা নেই—এও এক ধরণের প্রতিক্রিয়া। ক্রমশ এটা যখন স্পষ্ট হতে লাগল যে, নাটকে ব্যক্তি-সত্তাকে প্রকাশ করার নামে একটি অংশ নির্দিষ্টভাবে 'সমাজ-নিরপেক্ষতা'র দিকে যাত্রা শুরু করেছে, রাজনীতিই সব নয়, 'এই কথা বলতে বলতে—রাজনীতি কিছুই নয়, এই কথা বেরিয়ে আসছে, তখন সঙ্গত কারণেই এর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য একদল কর্মী সচেষ্ট হলেন। কিন্তু যেহেতু সমাজ ও ব্যক্তি, নাটক তথা শিল্প ও রাজনীতির পরস্পর-সম্পর্কটি এঁদের কাছেও অস্পষ্ট, সেহেতু এঁরাও বেতালে পা ফেলতে লাগলেন। এবং বর্তমান অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, যবনিকা পতনের পর দর্শক রীতিমতো ভাবিত হন—আমি কি নাটক দেখলাম, না, মিটিং শুনলাম। কর্মীদের মুখে সেদিনের সেইসব কথার পুনরাবৃত্তি হতে লাগল—নাটক কিছু না, বক্তব্যটাই আসল। বক্তব্য মানেই সেদিনকার মতো রাজনৈতিক প্রস্তাবের ভাষান্তর-আবৃত্তি।

অরাজনীতিকতার প্রতিক্রিয়া ঠিকই, কিন্তু এর পিছনে রাজনৈতিক দলের উস্কানি ও নির্বুদ্ধিতা যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। তবু এ-ও তো সত্যি, যাঁরা কোনো কিছুর প্রত্যাশা

না করে কোনো এক আদর্শের তাগিদে নাটকের জন্য প্রাণপাত করছেন, তাঁদেরও নিজস্বতা থাকা উচিত। উস্কানির মন-ভোলানো কথায় নিজেকে হারিয়ে বসব, দলের তথাকথিত শৃঙ্খলার কাছে আত্মসমর্পণ করে উল্টো-কীর্তন গাইতে থাকব, নিজে কিছু ভাবব না, সব ভাবনার দায় দল-নেতাদের হাতে তুলে দিয়ে পুতুলনাচের পুতুল হয়ে ঘুরে বেড়াবই—এ-বা কেমন কথা? 'নবান্ন'র কথা স্মরণ করুন না, অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

অবশ্য "সমস্যা নেই," এই যদি বক্তব্য হয়, তাহলে ভবিষ্যতটাও বলে দেওয়া যায়—আবার সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। তাহলে কি নাটক এগোবে না? একই বৃত্তে ঘুরপাক খেয়ে বেড়ানোই কি নাট্য-আন্দোলনের ভবিতব্য? দর্শক হিসাবে একথা মানতে মন চায় না, কারণ সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি যে। যাঁদের মতে সোজা কথা ধোঁয়াটে করে বলার মধ্যেই শিল্পের পরাকাষ্ঠা, দর্শকের কাছে তাঁদের নাট্য-প্রযোজনার কৃতিত্ব কিন্তু অনেক সময় ফেলনা নয়। আবার যাঁরা নাট্য-প্রযোজনাকে উপলক্ষ করে দর্শককে পার্টি-প্রোগ্রাম গিলিয়ে দেবার পবিত্র দায়িত্ব পালন করছেন, ধোঁয়াটে কথার প্রতিবাদে সোজা-কথা সোজা করে বলার চেষ্টায় শিল্পের সীমা ছাড়িয়ে ভাঁড়ামিরও আশ্রয় নিচ্ছেন—অনেক সময় তাঁদের উৎসাহ এবং সততাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তাই দর্শক হিসাবে আবেদন জানাই, উপরোক্ত দুটি ধারার মধ্যে শত্রুতা ও লড়াইয়ের সম্পর্কের কথা ভুলে দুপক্ষই নিজের নিজের জায়গা থেকে আর একটু সরে আসুন। আমাদের একটু বুঝতে দিন, আপনারা একটু কম বোঝান এবং নিজেরাও একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। সাম্রাজ্যবাদের দালাল, সি-আই-এর চর, মুচলেকা, কংগ্রেসের বি-টিম—পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত এইসব বিশেষণগুলি না-হয় কিছুদিন না-ই শুনলাম। দর্শকের মতে প্রায় কেউই আপনারা অসৎ নন, তাই ওতে আমাদের উৎসাহ নেই। আমরা যা চাই, তা হল—দুই ধারাতেই আত্মসমীক্ষা শুরু হোক। যা করছি, বেশ করছি, এর বাইরে কিছু করার নেই—যন্ত্রে বলবে একথা, মানুষ না। আপনারা শিল্পী, আমাদের মতো আর পাঁচজনের থেকে আপনারা জাতে আলাদা, দেশ ও মানুষের সেবা করার অঙ্গীকার করে মাঠে নেমেছেন, সেবা ঠিকমতো হচ্ছে কি না, যাচাই করতে পারবেন না? দর্শকের বিশ্বাস, নিশ্চয় পারবেন। এবং তাহলেই নাট্য-আন্দোলনে ভেদ-বিভেদের পালা-শেষে একটা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হবে। দর্শকও সেদিন একই বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী একাধিক সিদ্ধান্তের বোঝা মাথায় বয়ে বেড়ানোর বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাবে।

উমানাথ ভট্টাচার্য

রুচিগঠনের পক্ষে

একবার কল্পনা করুন তো—সকালে ঘুম ভেঙে উঠে দেখেন কোথাও সাড়াশব্দ নেই। রোজকার মতো জানলার ধারে এসে বসা চড়াইগুলোর কিচিমিচি, রাস্তা থেকে ভেসে আসা রিকশার ঠুংঠাং, মোটরগাড়ির গোঁ গোঁ শব্দ, ফিরিওয়ালাদের নানা বিচিত্র সুরেলা ডাক, পাশের বাড়ির বাচ্চা কুকুরটার ঘেউ ঘেউ, সদ্য জাগা শিশুর কান্না, রেডিয়ো-পরিবেশিত প্রভাতী রাগের কয়েকটি কলি, খাবার ঘর থেকে ভেসে আসা গৃহিণীর চুড়ির ঠুনঠুন শব্দ—আর পেয়ালা চামচের সুমধুর টুংটাং শব্দ—কোথাও কিছু নেই। চারদিক নিস্তব্ধ। ব্যাপারটা যে মোটেই সুখকর হবে না এ-কথা কাউকে বলে দিতে হবে না।

রোজকার জীবনে এই যে নানা বিচিত্র শব্দ ও স্বর আমাদের ঘিরে রেখেছে, কান এরই ভেতর থেকে সঙ্গতি খুঁজে বার করে এবং সব মিলিয়ে একটা হার্মনি, যাকে বাঙলায় বলা যেতে পারে সুস্বনতা, অজান্তেই আমাদের মর্মে গিয়ে পশে। সমস্ত ব্যাপারটা এত সহজ ও স্বাভাবিক যে এ-সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই। কিন্তু একবার এর ব্যতিক্রম হলেই জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ছন্দটাই যেন নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ তখন হাঁপিয়ে ওঠে। বাইরের কোলাহল থেকে হঠাৎ চারদিক-বন্ধ-করা এয়ারকণ্ডিশণ্ড ঘরে ঢুকলে প্রথমটা যেমন হয়। এই নিঃশব্দ, স্তব্ধ আবহাওয়ায় স্নায়ুগুলি যেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

আপাতবিরোধী অসংখ্য শব্দ ও স্বর থেকে সঙ্গতি খুঁজে বার করার কাজে কানের প্রধান শরিক হল মন। কান যদি হয় টেপরেকর্ডার—সবরকম শব্দ যেখানে ধরা পড়ছে, মন হল শিল্পী—ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকুই শুধু গ্রহণ করছে, তারপর তাই দিয়ে মালা গাঁথছে হার্মনির, সুরসঙ্গতির। মনের মণি-কোঠায় পলে পলে এই হার্মনি জমা হচ্ছে। কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটছে আমাদের অবচেতনে। এই যে শব্দের সঙ্গে শব্দ গেঁথে নিঃশব্দে সুরের মালা তৈরি হচ্ছে মনের গহনে, সঙ্গীত তারই প্রতিধ্বনি।

সঙ্গীতসৃষ্টি সকলের ক্ষমতায় কুলোয় না। কারুর কারুর মনে নানান সুরের

ও ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি করে, তখন তাকে সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে প্রকাশ না করে তাঁরা পারেন না। এঁরাই সুরকার, শিল্পী। মনের আবেগ এঁরা সুরের জাল বুনে হালকা করেন। কেউ গানের মাধ্যমে, কেউ বা যন্ত্রের সাহায্যে।

সঙ্গীত-রচনার ক্ষমতা স্বল্পসংখ্যক লোকের থাকলেও, সঙ্গীতের মাধুর্য উপভোগ করবার ক্ষমতা সকলেরই আছে, গান-বাজনা ভালো লাগাটাই সুস্থ মনের লক্ষণ। যদি কারুর তা না লাগে, তবে বুঝতে হবে কোথাও গলদ আছে। কথায় বলে, গান যে ভালো না বাসে সে অনায়াসে মানুষ খুন করতে পারে। কথাটা ভেবে দেখবার মতো। অতএব শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে একেবারে ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের সঙ্গীতে দীক্ষা দেওয়া দরকার। এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তারা সাড়া দেবে এবং তাদের মনে একটা স্থৈর্য আসবে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের রুচি ও সৌন্দর্য-বোধও উন্নত হবে। আগেই বলেছি সঙ্গীতসৃষ্টির প্রতিভা সকলের থাকে না। তেমনি থাকে না গাইবার বা বাজাবার ক্ষমতা। এতো হামেশাই দেখা যায় যে একই পরিবারের ৩।৪ টি ছেলেমেয়ের মধ্যে হয়তো একটি বা দুটি গাইতে বাজাতে পারে। কিন্তু তাই বলে বাকি ক-জনার যে সঙ্গীতে অনুরাগ নেই এমন নয়। শুধু তাই নয়, এদের গাইবার বা বাজাবার ইচ্ছেও হয়তো পুরোমাত্রায় থাকে, কিন্তু তুলনামূলক বিচারে ক্রমাগত বিরূপ সমালোচনা শুনে শুনে শেষটায় এরা পেছিয়ে পড়ে। নিজে গাইতে বা বাজাতে না পারলেই যে সঙ্গীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। গান-বাজনা শোনার এবং উপভোগ করবার ক্ষমতা সকলেরই অল্পবিস্তর আছে। মানুষের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে যদি সঙ্গীতের কোনো প্রভাব থেকে থাকে, তবে সেটা মুখ্যত সঙ্গীত উপভোগ করার উপরেই বেশি নির্ভর করে, গাইতে বা বাজাতে জানার উপর নয়। সুতরাং সঙ্গীতচর্চা শুধু গাইয়ে বাজিয়েদেরই একচেটিয়া নয়। সঙ্গীতরসিক শ্রোতার ভূমিকাও এ-ব্যাপারে সমান উল্লেখ-যোগ্য। আর দশটা জিনিসের মতো বিজ্ঞানের দৌলতে সঙ্গীতচর্চাও এখন সহজ ও অনায়াসসাধ্য হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে সঙ্গীতচর্চা বলতে অবশ্য শোনা এবং উপভোগ করার কথাই বলছি। রেডিয়ো মারফৎ লক্ষ লক্ষ লোক এখন সঙ্গীত উপভোগ করছে। এছাড়া আছে সিনেমা। বলতে গেলে আজকের দিনে সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা প্রধানত সিনেমার দৌলতেই। কিন্তু সর্বপ্রথম

যাব জন্য সঙ্গীত জনসাধাবণেব উপভোগেব সামগ্রী হতে পেবেছিল, সে হল গ্রামোফোন বেকর্ড। সে আমলে বলা হত কলেব গান। বেডিযো এবং সিনেমাব তখনো তেমন চল হয়নি। বেকর্ড বাজালে লোকেব ভিড লেগে যেত। নাম-কবা গাইযে বাজিযেদেব বেকর্ড সবাই শুনতে পাচ্ছে—এ কম কথা নয়। এমনিতে এইসব শিল্পীদেব গান বা বাজনা শোনাব ভাগ্য ক-জনেবই বা ছিল। তখনকাব দিনে, সেই চোঙাওযালা গ্রামোফোন (বা ফোনোগ্রাফ) আব ২।১ মিনিটমাত্র বাজাবাব মতো বেকর্ডই আসব মাৎ কবে বেখেছিল। তাবপব ধীবে ধীবে বেডিযো এবং সিনেমা এসে গ্রামোফোন বেকর্ডেব জনপ্রিযতাব অনেকখানি দখল কবে বসল। এব ফলে সাধাবণভাবে দেখতে গেলে সঙ্গীত জিনিসটা আবো বেশি জনপ্রিয হল বটে, কিন্তু লোকেব ভালোমন্দ বিচাবেব ক্ষমতা যে আগেব তুলনায অনেকটা ক্ষুণ্ণ হযেছে সে বিষযে সন্দেহ নেই।

এখন তো সবই 'বেডি-মেড'-এব যুগ। সুতবাং নিজেব পছন্দ-অপছন্দ, রুচি—এসবেব বিশেষ বালাই নেই। যখন যা পাওযা যাচ্ছে, সবাই সেটাকেই দুহাতে গ্রহণ কবছে। এতে ফল হচ্ছে এই যে ক্রমে লোকেব বিচাববোধটাই ভোঁতা হয়ে আসছে। হয়তো আজকেব ম্যাস্ প্রডাক্সান-এব যুগে এ-ছাড়া গত্যন্তব নেই। কিন্তু বসিক মন এটা মানতে চায না।

বেডিযো সিনেমাব জযজযকাব সত্ত্বেও বেকর্ডসঙ্গীতেব চাহিদা কিন্তু কমেনি। সৌভাগ্যেব বিষয এখনো এমন অনেকেই আছেন যাঁবা পবরুচিব স্রোতে গা ভাসিযে দেননি। এঁবা জানেন যে এইভাবে নিজেদেব রুচিকে জলাঞ্জলি দিলে অচিবেই দেশেব শিল্প-সংস্কৃতিব অপমৃত্যু অনিবার্য। এ-যুগেব ছেলে-মেযেদেব দিশেহারা রুচিই তাব প্রমাণ। অথচ বড বড শিল্পীব ভালো গান বা বাজনাব বেকর্ড সংগ্রহ কবে বাডিতে বসে সবাই শুনতে পাবেন, বাডিব ছেলেমেয়েদেব শোনাতে পাবেন। এইসব বেকর্ড শুনতে পেলে ছেলেমেযেদেব রুচি ধীবে ধীবে তৈবি হবে। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কোনটা খাঁটি কোনটা মেকি তাবা বুঝতে শিখবে। অন্ধেব মতো সৃষ্টিছাডা দেশী ও বিদেশী সিনেমা ও 'পপ্' সঙ্গীত নিযে মেতে থাকবে না। হযতো শাস্ত্রীয সঙ্গীতেব বসগ্রহণ কবতে তাদেব কিছুটা সময লাগবে। অনেকেব পক্ষে শাস্ত্রীয সঙ্গীতেব মর্মে প্রবেশ কবাই আদৌ সম্ভব না হতে পাবে। কিন্তু সহজ স্বতঃস্ফূর্ত লোকগীত, পল্লীগীতি, ভজন, কীর্তন, বাউল,

গজল, গীত বা রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান, নজরুলগীতি—এসবের রস সকলেই সহজে গ্রহণ করতে পারবে। আয়ত্তও করতে পারবে অল্প আয়াসেই। একবার যদি ছেলেমেয়েদের রুচি এদিকে মোড় নেয়, তবে আর তাদের রুচিবিকারের আশঙ্কা থাকবে না। তখন ধীরে ধীরে অনেকের পক্ষে শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের মাধুর্য উপভোগ করাও সহজ হবে।

শ্রোতাদের রুচি যত উন্নত হবে—সত্যিকার ভালো, শুদ্ধ সঙ্গীতের প্রসারও হবে সেই অনুপাতে। তখন জনপ্রিয়তার দোহাই দিয়ে যেসব উদ্ভট ও শস্তা গানের রেকর্ড বাজার ছেয়ে গেছে সেগুলো বন্ধ হবে।

কিন্তু নবীন-নবীনাদের রুচিবদলের এই দায়িত্ব কেবলমাত্র অভিভাবকদের উপর ছেড়ে দিলে অন্যায় করা হবে। স্কুলে এবং সম্ভব হলে কলেজেও সঙ্গীত অবশ্য পাঠ্য বিষয় হিসেবে থাকা উচিত। ছেলেমেয়েরা যাতে একেবারে প্রথম থেকেই ভালো, শুদ্ধ সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে তার জন্য স্কুল-কলেজে উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। সাহিত্যের প্রকৃত রস যেমন ক্লাসিকস না পড়ে পাওয়া যায় না, তেমনি ক্লাসিক্যাল বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় না হওয়া অবধি সঙ্গীতের রসাস্বাদন পূর্ণ হতে পারে না। গান বা যন্ত্রসঙ্গীত—যার যেটা বেশি ভালো লাগে, তারই মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মূল সুরটি ধরিয়ে দিতে হবে। এ জন্য একদিকে যেমন বাছাই করা রেকর্ডের সাহায্য নেওয়া চলবে, তেমনি ভালো সঙ্গীতশিক্ষকের তালিমেরও প্রয়োজন হবে।

সুভাষ সেন

পুস্তক-পরিচয়

নাট্যশাস্ত্র

The Natyaśastra A Treatise on ancient Indian Dramaturgy and Histrionics ascribed to Bharata-Muni, translated and edited by Dr Manomohan Ghosh.

Vol. 1 (Chapters 1-XXXVII) Manisha Granthalaya Calcutta 12 Price Rs 40 and Rs. 60.

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র বিষয়ে এই অতি মূল্যবান অবদানের জন্য সুধী-সমাজ ডঃ মনোমোহন ঘোষের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। তিনি যে রকম অসীম ধৈর্য ও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে 'নাট্যশাস্ত্র'র সটীক সংস্করণ সম্পাদনা ক'রে সুপাঠ্য ইংরেজি অনুবাদ বৃহত্তর পাঠকসমাজকে উপহার দিয়েছেন, তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড (২৮-৩৬শ অধ্যায়) ডঃ ঘোষের দ্বারা সম্পাদিত ও অনূদিত হয়ে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। মূলপাঠ প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে, অনুবাদ ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে।

বর্তমান সম্পাদকের আলোচনা অবশ্য শুধু প্রথম খণ্ডের পাঠ ও অনুবাদে সীমাবদ্ধ। অতীতে যেসব নিষ্ঠাবান গবেষক নাট্যশাস্ত্র-চর্চায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, ডঃ মনোমোহন ঘোষ সেই গৌরবময় ঐতিহ্যেরই উত্তরসাধক। নাট্যশাস্ত্রের প্রথম সম্পূর্ণ পাঠ প্রকাশ করেন পণ্ডিত শিবদত্ত এবং পণ্ডিত কাশীনাথ পাণ্ডুরং। এটি 'কাব্যমালা' সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পোল রেন্যু (Paul Regnaud)-এর ছাত্র জে গ্রসে (J Grosset) লির্যঁ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'নাট্যশাস্ত্র'র প্রথম চতুর্দশ অধ্যায়ের সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন। তারপর প্রকাশিত হয় এম. আর. কবি-র সম্পাদনায় বরদা সংস্করণ (১৯৩৬-৬৪ খ্রী)।

এছাড়া বারাণসী থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থমালায় আমরা 'নাট্যশাস্ত্র'র অল্প-বিস্তর পূর্ণাঙ্গ পাঠ পাই। এইসব প্রচলিত পাঠের

ভিত্তিতে এবং আরো অনেক পাণ্ডুলিপির সাহায্যে ডঃ ঘোষ এই নির্ভরযোগ্য সংস্করণটি সম্পাদনা করেছেন, যদিও তিনি কোথাও দাবি করেন নি যে এই পাঠই চূড়ান্ত।

মূল পাঠ এবং অনুবাদ, দুটি খণ্ডেই সম্পাদকের বিস্তৃত ভূমিকা আছে। বিষয় সমূহের সাযুজ্যের জন্য আমরা দুটি ভূমিকাকে এক সঙ্গে আলোচনা করব। ডঃ ঘোষ সংস্কৃত এবং গ্রীক নাটকের পার্থক্য বিষয়ে ঠিকই বলেছেন যে গ্রীক নাটক যেহেতু "জীবন এবং ঘটনার অনুকরণ", সেজন্য এর প্রধান লক্ষ্য প্লটের বিবর্তন। বাইরের অঙ্গসজ্জা ও প্রসাধনের ওপর স্বভাবতই এখানে গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। মুখোশ ব্যবহারের রীতি থেকে এটা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়ঃ আঙ্গিক-প্রসাধন এখানে অসুবিধাজনক। ভারতীয় নাটকে প্লটকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হলেও দৃশ্য উপস্থাপনার দিকে অধিকতর প্রবণতা দেখতে পাইঃ নৃত্য, সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধন, মুখভঙ্গি প্রভৃতি সব কিছুই নাট্য উপস্থাপনায় অপরিহার্য। গঠনশৈলির দিকেও বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক নাটক প্রথমত ও প্রধানত সাহিত্যসৃষ্টি—'কথা' এখানে অপরিহার্য উপকরণ। অন্যদিকে সংস্কৃত নাটকে সংলাপ ছাড়াও অঙ্গভঙ্গি, বাহু সঞ্চালন, নৃত্য এবং সঙ্গীত সব কিছুরই সমান উপযোগিতা আছে। এইসব নাটকীয় অভিব্যক্তির বিবিধ উপকরণ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় 'নাট্যশাস্ত্র'-এ, যাতে ক'রে দেবগণ-দেবযোনি অথবা মানুষের জীবনের ঘটনাবলীর নাটকীয় 'অনুকরণ' দর্শকের কাছে 'দৃশ্যকাব্য' হয়ে ওঠে। সেই কারণেই দেখতে পাই সব শিল্পকর্মের মতো এখানেও বাস্তবের রূপণে অনেক বেশি স্বাধীনতা—মঞ্চসজ্জার বহুবিধ রীতি-নীতি। কেননা বাস্তবের হুবহু অনুকরণ নয়, মূক বাস্তবের ব্যঞ্জনাময় রূপান্তরই তার লক্ষ্য। সামগ্রিক ভাবাবেশ (ইউনিটি অফ ইম্প্রেশন) ছাড়া সংস্কৃত নাটকে স্থান-কালের ঐক্যের কৃত্রিমতা নেই। এই সাহিত্যে নাটক সচ্ছন্দগতিতে এগিয়ে চলে—ঘটনা নাটকের ধারাকে অনুসরণ ক'রে কখনো ধীরভাবে কখনো দ্রুততালে অগ্রসর হয়।

সুতরাং সংস্কৃত নাটক কেবল শ্রব্য সংলাপ মাত্র নয়—তার অতিরিক্ত আরো কিছু। এটা দৃশ্যকাব্যও বটে। এই দৃশ্যকাব্যে জীবনের সব দিকেরই প্রকাশ ঘটে—কোনো কঠোর শ্রেণীবিভাগ এখানে সম্ভব নয়। দর্শকেরা এখানে সবই পানঃ আমোদ-প্রমোদ, হিতকথা, শোকে সান্ত্বনা, শিক্ষা এবং জ্ঞান। দর্শকের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যাঁরা শুধু নাটকের সফল অভিনয় দর্শনেই

সন্তুষ্ট নন—তাঁরা নাটকীয় উপভোগ্যতার ব্যাপারে মনস্তাত্ত্বিক আলোচনাতেও উৎসাহী। 'নাট্যশাস্ত্র'-এ নাটক উপভোগের মনস্তাত্ত্বিক রূপ সম্পর্কেও আলোচনা আছে। ফলে বহু ভাষ্যকার সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের জটিলতা নিয়ে পাণ্ডিত্য প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন।

দশ ধরনের নাটকের গঠন ও শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে সম্পাদকের ভূমিকাতে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা আছে। এখানে তার সারাংশ দেয়া নিষ্প্রয়োজন।

'নাট্যশাস্ত্র'র কালনির্ণয় প্রসঙ্গে ডঃ ঘোষ অনেকগুলি যুক্তি উপস্থিত করেছেন। তিনি অবশ্য নিজেই স্বীকার করেছেন যে, "taken individually the different data may not be considered strong enough to warrant any definite conclusion" আমাদের ধারণা সামগ্রিকভাবেও সেগুলি খুব গ্রহণযোগ্য নয়। অনেকের মনে হতে পারে সম্পাদকের সিদ্ধান্তও অজ্ঞাতসারে এই বিতর্কের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তাঁর সিদ্ধান্তকে সিদ্ধান্ত না ব'লে বরং বলা যায় প্রমাণসাপেক্ষ অনুমান। তার মানে এই নয় যে আরো যুক্তিগ্রাহ্য কোনো তারিখ আমাদের জানা আছে—তবে ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ তারিখটি হলেও হতে পারে। আমাদের বিনীত মত এই যে, 'নাট্যশাস্ত্র' জাতীয় কোষগ্রন্থ যখন পূর্বলিখিত রচনাবলীর ওপর অনেকটা নির্ভর এবং পরেও যখন এতে অনেক সংযোজন ও প্রক্ষেপ ঘটেছে, তখন নির্ভুলভাবে এর কালনির্ণয় অসম্ভব।

পরিশেষে বলব ডঃ মনোমোহন ঘোষের সম্পাদিত গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্রচর্চায় একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই অনুবাদ আমাদের মূল পাঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন করবে, আর সেই সঙ্গে আমরা পাই প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের নিদর্শন—যার সৃষ্টিশীলতার প্রমাণ 'নাট্যশাস্ত্র' জাতীয় গ্রন্থ।

আর আঁতোয়ান

বিবিধ প্রসঙ্গ

পাক-সোভিয়েত অস্ত্রবিক্রয় চুক্তি

সোভিয়েত সরকার পাকিস্তানকে কিছু অস্ত্রবিক্রয় করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তের পূর্ণ বয়ান বা প্রাসঙ্গিক বিস্তৃত বিবরণ এখনো এদেশে এসে পৌছয়নি। শুধু জানা গেছে—এই অস্ত্রবিক্রয়ের চুক্তি কোনো বৃহদাকার চুক্তি নয়। এই চুক্তিকে দীর্ঘস্থায়ী মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টাও এখনো পর্যন্ত করা হয়নি। তথাপি সঙ্গত কারণেই সোভিয়েতের এই সিদ্ধান্ত আমাদের উপমহাদেশে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে এবং অনেকের মনেই অস্বস্তির কারণও ঘটিয়েছে। কারুর কারুর ক্ষেত্রে এই অস্বস্তি আন্তরিক। কিন্তু বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই তা কৃত্রিম। কৃত্রিম বলছি এই কারণে যে—চুক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত না হয়ে, এর কার্যকারণ সম্পর্কে কিছুমাত্র চিন্তা না করে, অনেকেই তারপরে সোভিয়েত-বিরোধী স্লোগান দেওয়া শুরু করেছেন। স্বভাবতই এঁদের পুরোভাগে রয়েছেন জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি আর কংগ্রেসের ভেতর লুকিয়ে থাকা কিছু জনসংঘী বা স্বতন্ত্রী সদস্য। এঁদের দেশপ্রেম প্রবল সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৯৬৫ সালে যখন এঁদের পরম বন্ধু আমেরিকার প্যাটন ট্যাঙ্কের ঘায়ে ভারতীয় জওয়ানরা নিহত হচ্ছিলেন এবং যখন আমেরিকান সেবার জেট-বিমান ভারতীয় গ্রামে আগুন জ্বালছিল, তখন বোধহয় গভীর দেশপ্রেমেই এঁরা আমেরিকা সম্পর্কে চুপ করে ছিলেন। ফ্রান্স পাকিস্তানকে বিমান সাহায্য দিলো। একথা জেনেও কিন্তু দিল্লী বা কলকাতায় ফরাসী দূতাবাস কি কন্-সুলেটের সামনে এঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন নি। আর সোভিয়েত পাকিস্তানকে কিছু অস্ত্র বিক্রয় করবে শুনেই (তাও দান নয়) এঁরা দেশময় সোভিয়েত-বিরোধী বিক্ষোভের প্লাবন বইয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। বুঝতে কষ্ট হয় না এই চেঁচামেচি রীতিমতো উদ্দেশ্যমূলক। ভারত সোভিয়েত মৈত্রীর মূলে আঘাত করবার এবং তারও আড়ালে এদেশের প্রগতিশীল শক্তিকে বিধ্বস্ত করবার জন্য দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র দীর্ঘকাল ধরে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী—১৯৬৫ সালে পাক-ভারত

সংঘর্ষে ভাবতকে সোভিযেতের একনিষ্ঠ সমর্থন, কাশ্মীবেব ব্যাপারে পূর্বাপব একই বক্তব্য বজায় বাখা , ভাবতকে সামবিক ব্যাপাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করাব জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও সামবিক সাজসবঞ্জামেব সাহায্য এবং সর্বোপবি ভাবতকে অর্থ নৈতিক সঙ্কট থেকে বাঁচানোর জন্য সাম্প্রতিক কালে সোভিযেতেব বিপুল পবিমাণ সাহায্য —এই সমস্ত চক্রান্তকাবীদেব মুখ বন্ধ কবে বেখেছিল। পাকিস্তানকে সোভিযেতেব অস্ত্রবিক্রযেব সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত এই সমস্ত কেঁচোদেব তাই সাপের মতো ফণা তুলে ধবতে উৎসাহিত কবছে। এ-ব্যাপাবে ভাবতবর্ষেব দক্ষিণপন্থী জোট কতটা ঐক্যবদ্ধ, তাব প্রমাণ সম্প্রতি লোকসভাব বিতর্কে পাওয়া গেছে। স্বতন্ত্র সদস্য শ্রীপিলু মোদী এই সুযোগে ভাবত-সোভিযেত সম্পর্ক ছিন্ন করাব এবং জোট-নিবপেক্ষতাব নীতি বাতিল কবাব জন্য প্রস্তাব এনেছিলেন। এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা কবতে উঠে কংগ্রেসী সদস্য শ্রীআবিদ আলী ভাবতেব কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা কবতে বলেন। কেননা তাঁব মতে এই হবে নাকি সোভিযেতেব আচবণেব যোগ্য জবাব। এঁদেব চিনতে কোনো অসুবিধে নেই। কেননা, এই জোট সংঘবদ্ধ ভাবে দীর্ঘকাল ধবে তাঁদেব প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ চালিযে যাচ্ছেন। কিন্তু, সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী ও প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলকে এঁদেব সঙ্গে গলা মেলাতে দেখে বীতিমতো দুঃখ হয।

লোকসভায় কমিউনিস্ট নেতা এস এ ডাঙ্গে এই সম্পর্কিত বিতর্কে অংশ গ্রহণ কবতে গিযে একটি মূল্যবান মন্তব্য কবেছেন। ডাঙ্গে বলেছেন যে সোভিযেত ইউনিযন ভাবতবর্ষ সম্পর্কে তাব দৃষ্টিভঙ্গি পাণ্টায় নি, কিন্তু পাকিস্তান সম্পর্কে তাব দৃষ্টিভঙ্গি পবিবর্তিত হযেছে। কাবণ, পাকিস্তানেবও সোভিযেত বাষ্ট্র সম্পর্কে ধাবণা অনেকটা বদলেছে। বেশ কিছুদিন ধবেই পাকিস্তানেব এই পবিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিব পবিচয পাওয়া যাচ্ছিল। প্রথম ববফ গলে বোধহয ১৯৬০ সালে 'ইউ-টু'ব চাঞ্চল্যকব ঘটনাব পব। তখন থেকেই বাওয়ালপিণ্ডিতে একটা ধাবণা জন্মেছিল যে আমেবিকার নাগপাশে বোধহয বড্ডবেশি জডিযে পডা হচ্ছে। তাছাডা ক্রমেই সোভিয়েতেব আণবিক শক্তি ও বকেট শক্তি এতই বেড়ে গেল যে সম্ভবত তাঁবা ভাবলেন পেশোয়াবে আমেবিকান বিমান-ঘাঁটি বাখাব অনুমতি দেওযা আর নিজেব সর্বনাশ ডেকে আনা একই কথা। তাছাডা তখন থেকেই এশিযার অন্যত্র মার্কিনী-নীতি প্রচণ্ড মাব খেতে শুরু কবেছে। ভিযেতনামে

মার্কিনীদের নাকানিচোবানি খাওয়াটা পাকিস্তান লক্ষ্য করেছে আর ফরমোসাকে দিয়ে যে কমিউনিস্ট চীনকে ঘায়েল করা যায় না এ সত্যও সে বুঝে ফেলেছে। অতএব ন্যাটো এবং সিয়াটোর সদস্য হলেও নিজের স্বার্থেই পাকিস্তান আমেরিকা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। ন্যাটোর বিরুদ্ধে দ্যগলের প্রকাশ্য বিদ্রোহ, ভিয়েতকংদের ঠেকানোর ক্ষেত্রে সিয়াটোর হাস্যাস্পদ ব্যর্থতা, সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘাঁটি হতে জাপানের সরাসরি অস্বীকার—এ-সমস্তই আয়ুবকে ক্রমশ সাহসী করে তুলছিল। সর্বোপরি ভারত-সোভিয়েত ক্রমবর্ধমান মৈত্রী তাকে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করল।

প্রথম দিকটায় আয়ুব সহজ পথ হিসেবে পিকিং-এর সঙ্গে হাত মেলানোর চেষ্টা করলেন। এটাই তাঁর কাছে অত্যন্ত সহজ বলে তখন মনে হয়েছিল। প্রথমত বোধহয় তাঁর ধারণা ছিল মস্কোর সঙ্গে হাত মেলালে আমেরিকা যতখানি চটবে পিকিংয়ের সঙ্গে মেলালে ততখানি চটবে না। দ্বিতীয়ত ভারত-বিদ্বেষী আয়ুব চীনের ভারত-বিদ্বেষের মধ্যে নিজের মনোভঙ্গির চমৎকার মিল খুঁজে পেলেন। তার উপর তখনকার পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ভুট্টোর পিকিং-প্রীতিটাও একটু বেশি ছিল। কিন্তু এ গাঁটছড়াও বেশিদিন টিঁকল না। পাকিস্তান বোধহয় বুঝতে পারল যে চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতবর্ষকে নিকেশ করা সম্ভব নয়। আর, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে চীনা-নীতি ক্রমাগত বিধ্বস্ত হওয়ায় পাকিস্তান আর ভরসা পাচ্ছিল না। পাকিস্তান যে শিবির পাল্টাতে প্রস্তুত, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত সংঘর্ষের পর থেকে। রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের আমন্ত্রণে আয়ুবের তাসখন্দ গমন এবং ভারতের সঙ্গে শান্তিচুক্তি-স্বাক্ষর এই পরিবর্তিত মনোভাবেরই ফল। মনে রাখতে হবে তাসখন্দ চুক্তি সম্পর্কে চীনের প্রচণ্ড আপত্তি ছিল, তা সত্ত্বেও পাকিস্তান এই চুক্তিতে সই দিয়েছে। তাসখন্দ-সম্মেলন এশিয়ায় সোভিয়েত কূটনীতির বিরাট জয়লাভের প্রতীক এবং এরপর থেকেই পাক-সোভিয়েত সম্পর্ক উন্নততর হচ্ছে। এরই ভিত্তিতে পাকিস্তান সম্প্রতি পেশোয়ারে আমেরিকান বিমান ঘাঁটি তুলে দিতে চেয়েছে।

কিন্তু এর মানে এই নয় যে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। বরং আগের তুলনায় এই দুই দেশের মৈত্রী আরও দৃঢ় ও ব্যাপক হয়েছে। সোভিয়েত এই বন্ধুত্বকে কতখানি মূল্য দেয়, তার প্রমাণ এই অস্ত্রচুক্তিতে ভারতের উদ্বেগের খবরে প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের আশ্বাস। কোসিগিন

আশ্বাস দিয়েছেন যে এই অস্ত্র যাতে ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করা হয় সেদিকে তাঁরা তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন। এই আশ্বাস শূন্যগর্ভ নয়, কারণ সোভিয়েত আজ পর্যন্ত ভারতকে একটিও মিথ্যা আশ্বাস দেয় নি। পাকিস্তানের সঙ্গে অস্ত্রচুক্তি করার সময়ও কিন্তু সোভিয়েত ভারতকে প্রতিশ্রুত অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য করে আসছে। এই সাহায্যের বিস্তৃত তালিকা সম্প্রতি শ্রীভূপেশ গুপ্ত রাজ্যসভায় উপস্থিত করেছেন: তিন স্কোয়াড্রন মিগ বিমান, মিগ বিমান নির্মাণ করবার যন্ত্রপাতি, নাসিক, কোরাপুট এবং হায়দ্রাবাদে তিনটি মিগ-বিমান নির্মাণের কারখানা তৈরি, সীমান্ত অঞ্চলে ব্যবহারের জন্য এম. আই ৪ শ্রেণীর হেলিকপ্টার, সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সররবাহের জন্য এ এন টি শ্রেণীর ভারী বিমান, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘর্ষে যার দ্বারা অমৃতসর শহর রক্ষা করা হয়েছিল সেই জাতীয় অসংখ্য বিমান-বিধ্বংসী কামান। এ ছাড়া সারফেস টু এয়ার মিসাইল (স্যাম) তাঁরা আমাদের দিয়েছেন, আর চারটি সাবমেরিনের অর্ডার দেওয়া হয়েছে যার একটি এসে পৌঁছেচে। সীমান্ত অঞ্চলে সংযোগ রক্ষার জন্য ভারী জিপ গাড়ি পাঠিয়েছে সোভিয়েত রাশিয়াই। এছাড়া দেশরক্ষার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তেল এবং ইস্পাত শিল্পে অগ্রগতির ক্ষেত্রেও সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর কোনোটাই প্রমাণ করে না যে সোভিয়েতের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে।

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী অক্ষুণ্ণ আছে, পাক-সোভিয়েত মৈত্রী বাড়ছে। এখন প্রয়োজন ভারত-পাক মৈত্রীকে নিষ্কলুষ ও স্থায়ী করা। উভয় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে এইটিই অন্যতম প্রধান ও জরুরি কর্তব্য। আর সে কাজে শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সে-দায়িত্ব কতটা পালন করেছি বা করতে চাই—এ-সম্পর্কে আত্ম অনুসন্ধানের সময় আজ এসেছে।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

প্লাবিতের প্রতিবেদন

মেদিনীপুর পশ্চিম বাঙলার শস্যভাণ্ডার। দু-দশক আগে এই জেলায় প্রকৃতপক্ষে উদ্বৃত্ত খাদ্য থাকত। ঘরে ঘরে ক্ষুধার্ত নর-নারীর কঙ্কালশ্রী রূপ আজ নিত্য দৃশ্যময়। খরা আর বন্যা প্রতি বছরই কমবেশি কান্নার সৃষ্টি করেছে। এই বেদনাময় অবস্থার কী পরিবর্তন সম্ভব নয়?

পর পর দু-বছর জেলার সবচেয়ে সুফলা অংশ নিষ্ফলা হল। অষ্টাদশ, ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ এই অবস্থাকে প্রকৃতির দুষ্ট লীলা বা "ভগবানের মার দুনিয়ার বার" বলে নিজেদের সান্ত্বনা দিত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে এসে মানুষ কী ঐ কথা বলে কপালে করাঘাত করবে?

জেলার ৩৪টা থানার মধ্যে ২৭টায়ই লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকফাটা আর্ত কান্না কম-বেশি বর্ণিত হচ্ছে। ক্ষয়-ক্ষতির সামগ্রিক হিসাব এখনও হয়নি। ধান ও রবি ফসল নষ্ট হয়েছে প্রায় ৫০কোটি টাকার। যদিও কৃষকের অস্থাবর সম্পদ নগণ্য, তবুও তা ছিল তাদের অনেকের সাত পুরুষের তিল তিল সঞ্চয়। তার মূল্যও কম করে ৫০ কোটি টাকা হবে। আর যেসব বাড়ি পড়েছে, ভেঙেছে, ডুবেছে—তার মূল্য ২০০ কোটি টাকার কম নয়। অঙ্কটা আনুমানিক হলেও হিসেবটা খুববেশি অসত্য নয়। এই ক্ষয়-ক্ষতি অবশ্য অপূরণীয় নয়। কিন্তু যে শ্রমশক্তি ব্যয়িত ও রক্ত-ঘর্ম ক্ষরিত হয়েছে, তার মূল্য কী কেউ হিসেবে নেবে?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ-জেলার বন্যা-নিরোধ কী অসম্ভব? যুক্তফ্রণ্ট সরকার স্বল্পকালীন শাসনব্যবস্থা-পরিচালনা-কালে এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটা পরিকল্পনা করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এ-সম্পর্কে প্রাথমিক ব্যয় স্বরূপ ৬৩ লক্ষ টাকার অনুমোদনও তাঁরা পান। তাছাড়া চলতি বাজেট থেকে ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছিল। জেলার বিধানসভার কমিউনিস্ট সদস্যগণ এ-ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন।

বর্তমান যুগে নদী-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য চতুর্বিধ: ১। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ২। সেচ-প্রকল্প গঠন ৩ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন ৪। জল পরিবহন।

এই ধরনের প্রকল্প সংগঠন জন-জীবন পুনর্গঠনের বিশেষ সহায়ক শুধু নয়, অনেক পরিমাণে নিয়ামকও বটে। আজকের মানুষ ৫।৭ হাজার বছর আগেকার মতো অসহায় নয়। প্রকৃতির অজ্ঞেয় রূপ অনেকখানিই তার জ্ঞানের পরিধির

মধ্যে ধবা পডেছে। অপবাজেয প্রকৃতি মানুষেব বশ্যতা স্বীকাব কবে আজ দাস্যবৃত্তি কবছে। বিজ্ঞানেব অপবিমেয দানে স্রষ্টা মানুষ বিশ্বকে নিজেব মনেব মতো কবে ভাঙ্গছে গডছে। সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতিব ক্রম অগ্রগতি তাকে মন্ত্রমুগ্ধতা থেকে মুক্ত কবে জ্ঞান-বিজ্ঞানেব আলোকময পথে এগিযে নিযে চলেছে। মানুষ আজ 'বিশ্বকর্মা'। শ্রমশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিব মহিমময সাধনায বিশ্বেব রূপ-বহস্যেব অর্গল সে ক্রমাগত খুলে চলেছে। বিশেষ কবে বিংশ শতাব্দী এ-বিষযে প্রতিদিনই নব নব বিস্ময়কব আবিষ্কাবে যেন প্রমত্ত হযে উঠেছে। মহাকাশও সে বিজয কবেছে।

আব সেই যুগে আমবা অসহাযেব মতো বন্যাব তাণ্ডবে ডুবছি, ভাসছি, মবছি,, খবাব দাহনে তৃষ্ণাব জলটুকুও দুষ্প্রাপ্য। কংগ্রেস সবকাব পব পব তিনটি পঞ্চবার্ষিক পবিকল্পনা শেষ কবেছেন। ব্যযিত হযেছে প্রায ২২ হাজাব কোটি টাকা। সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্পে টাকাও খবচ হযেছে। বন্যা-নিযন্ত্রণ ও নিকাশী সমস্যা সম্পূর্ণ অবহেলিত হযে থেকেছে। কিন্তু কেন? জাতীয জীবন পুনর্গঠনেব মৌল সমস্যাগুলিব অন্যতম হওযা সত্ত্বেও কেন আমাদেব শাসকগোষ্ঠী মুখে সমাজতন্ত্রেব বাগাডম্বব কবে এ বিষযে উদাসীন থেকেছেন?

জাতীয জীবন পুর্গঠন সমস্যাব সমাধানকল্পে পুঁজিবাদেব নিজস্ব একটা পথ ও চিন্তা আছে। এ পথ কৃষি ও শিল্পেব অসমান বিকাশেব পথ। শিল্পোন্নযনেব মাধ্যমেই ধনতন্ত্রেব সমুন্নতি ও মুনাফা স্ফীত হয। কিন্তু কৃষিব সমুন্নতি না হলে তাব পণ্যেব বাজাব যে সীমাযিত থেকে যায এবং ফলে তা ধন-তন্ত্রেব সঙ্কট সৃষ্টিব অন্যতম কাবণ হয—এটা বুঝেও সে কৃষিব সমুন্নতি সম্পর্কে উদাসীন থাকে।

কিন্তু এ-কথাও ঠিক নয। সেও কৃষিব সমুন্নতি চায। কিন্তু সেটা তাব নিজস্ব পথে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিব মালিকানা নয, বৃহৎ বৃহৎ খামাবে যন্ত্রাযিত কৃষি-উৎপাদনই তাব কাম্য। কোটি কোটি কৃষক জমি থেকে উৎসাদিত হযে দিনমজুব রূপে প্রত্যহ তাব কাছে শ্রমশক্তি বিক্রয কববে—এ-ধবনেব ব্যবস্থায তাব উৎসাহ। কিন্তু ভাবতে মার্কিন মুলুকেব মতো এ-পথ অনুসবণ কবা প্রায অসম্ভব। তাই এই ব্যাপাবে তাব উদাসীনতা দৃশ্যমান হযে পডেছে।

যাক, এ-প্রশ্ন নিযে বিস্তৃত আলোচনা এ-নিবন্ধে সম্ভব নয। মূল আলোচনা বন্যা-নিযন্ত্রণ সম্ভব কিনা? অথবা "ভগবানেব মাব দুনিযাব বাব" বলে

শাসককুলের প্রচারণায় আমরা শুধু "হায় ভগবান বলে" কপালে করাঘাত করে দিন কাটাব ?

মেদিনীপুর জেলায় বন্যা প্রধানত তিনটি নদী থেকেই হয়—কংসাবতী, শীলাবতী ও কেলেঘাই। তার সঙ্গে সম্পর্কিত একদিকে রূপনারায়ণ ও অপর দিকে সুবর্ণরেখা। এই সঙ্গে কতকগুলো খাল ও বেসিন আছে—কপালেশ্বরী, চণ্ডীয়া, ভস্‌রা, কাকমতী, তমাল, কুবাই, পারাং, কাঠিয়া, বাগুই প্রভৃতি খাল ও দুবদা, খাগদা ও জগবা বেসিন আর বার-চৌকার জলা। তার সঙ্গে আরও একটা সমস্যা ময়না থানা। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার সামগ্রিক রূপটি এই প্রবন্ধে বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া নদী ও সেচ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের চিন্তা-সমন্বয়ে এই পরিকল্পনা নেওয়া উচিত। এই ব্যাপারে আমার নিজের মতামত সুধী সমাজের নিকট গ্রহণীয় হবে না। তবু লিখছি দীর্ঘ চার দশক ধরে রাজনৈতিক কর্মীরূপে সমগ্র জেলায় বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি বলে। অনেক দেখেছি, শুনেছিও অনেক কথা। এই দেখাশোনা ও সামান্য কিছু লেখাপড়ার ফলে আমার বক্তব্য বোধহয় বিশেষজ্ঞদের নিকট ভাবনার কিছুটা খোরাক দিতে পারবে।

প্রথমত, একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে গঙ্গা ও রূপনারায়ণ সংস্কার-জনিত সমস্যার সমাধান না করে, এ জেলার বন্যা-নিয়ন্ত্রণের মৌল সমাধান সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, নদীপ্রকল্প পরিকল্পনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ অত্যন্ত জরুরি। যে সকল জলাধার সৃষ্টি করে সেচপ্রকল্প সংগঠিত করা হয়েছে, তার সমুন্নতি ও বিস্তৃতি-সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ—এই দুই সমস্যার সমাধানের জন্য যদি একীভূত প্রকল্প না করা হয়, তাহলে সমস্যা সমাধান "দূর অস্ত্" হয়ে থাকবে।

যে নদীগুলি এ-জেলার বন্যার মূল কারণ, এখন সে-সম্পর্কে আলোচনায় আসা যাক।

কাঁসাই ও কংসাবতী

কাঁসাই প্রকল্প কয়েক বছর ধরে গড়ে উঠেছে। এবং আজও কাজ চলছে। এর পরিসমাপ্তির অনাগত দিন অপেক্ষমান। কাঁসাই ও কুমারী যমজ দু-বোন। একজন বন্দিনী হলেও অপরজন খরায় বিশুষ্কা, বর্ষণ সমাগমে ষোড়শী কন্যার উদ্দাম কামনায় চঞ্চল উচ্ছলা। সেই কুমারীকে যদি জলাধারে

ধরে রাখার ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে তার জলপ্রবাহের উচ্ছলতা নদীর দুকূলকে ভাসাবে। মানুষের আর্ত হাহাকারে দেশ ভরে উঠবে।

কাঁসাইয়ের বুক পুড়ে ধূ ধূ বালুচর। ক্রমাগত এই বালুর স্তূপ জমে উঠছে। অনেক স্থলে নদীর গর্ভ একূল ওকূল দুকূলের সমান হয়ে উঠেছে। এই বালু অপসারণের ব্যবস্থা জরুরি। কারণ বালুচরের আগ্রাসন নদীর বুককে কয়েক দশকের মধ্যেই গোবি মরুভূমি করে ফেলবে, এ-সম্ভাবনা আর অমূলক নয়। এই মূল সমস্যার সঙ্গে নিম্নোক্ত সমস্যাও আছে।

ডেবরা কেশপুর সীমান্তে কপালটিকরির কাছে কংসাবতী দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। একাংশ নাড়াজোল হয়ে দাসপুর থানার মধ্য দিয়ে রূপনারায়ণে পড়েছে। অপর অংশ ডেবরা থানার লোযাদার ধার দিয়ে পাঁশকুড়া বাজারের পাশ দিয়ে ময়না থানাকে, তমলুক ও মহিষাদল থানা থেকে বিভাজিত করে কেলেঘাই নদীতে সঙ্গমিত হয়ে সৃষ্টি করেছে হলদি নদী। এই নদী গঙ্গাসাগর সঙ্গমের অল্প উপরে হলদিয়াতে বন্দরের কিছু উপাদান গড়েছে।

আগেই বলেছি—কাঁসাই, শীলাই, কেলেঘাই সংস্কার শর্তসাপেক্ষ। গঙ্গা, রূপনারায়ণ ও নিম্নদামোদর সংস্কার-পরিকল্পনা ব্যতীত ঐ সংস্কার-পরিকল্পনা কার্যকরী করা অসম্ভব। আর গঙ্গা, রূপনারায়ণ, দামোদর ও কাঁসাই নদনদীর স্রোতধারার গতি যদি স্বচ্ছন্দ এবং বেগবতী না হয়, তাহলে কলকাতা বন্দরের অনুপযোগিতা হলদিয়াতেও সংক্রামিত হবে।

কাঁসাই নদীর যে স্রোতধারা নাড়াজোল হয়ে গোপীগঞ্জের নিকট রূপনারায়ণে মিলছে, সেইটিই মূল ধারা। কারণ পাঁশকুড়া বাজারের নিকট নির্মিত পুল কাঁসাই নদীর বর্ষণকালীন স্রোতধারা বহনে বাধাসৃষ্টি করছে। তা সত্ত্বেও ঐ স্রোতধারা যাতে মজে না যায়, তা অবশ্যই দেখতে হবে। কারণ এই ধারাটা অব্যাহত না থাকলে সদর মহকুমার জলনিকাশী ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। এবং নারায়ণগড়ের দক্ষিণ অঞ্চল, সবং থানার বৃহত্তম অংশ, পটাশপুর, ভগবানপুর ও ময়না থানা চিরপ্লাবিত অঞ্চলে পরিণত হবে।

রূপনারায়ণ নদ

এ-সম্পর্কে কয়েক বছর আগে কলকাতার একটি সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন কংগ্রেস সরকারকে দেওয়া হয়েছিল। সরকারের সেচদপ্তরের কেতায় তা লাল ফিতের বন্দী হয়ে হয়তো মহাফেজখানায় চলে গিয়েছে।

তিন দশক আগেও রূপনারায়ণ, কোলাঘাট থেকে ঘাটাল পর্যন্ত স্টীমার চলাচল করত'। ঐ পথই ছিল ঘাটাল থেকে যাত্রীবহনের মুখ্য পথ। নদীর বুকে পলি জমে তার গতিপথ রুদ্ধ হয়েছে। এসেছিল লঞ্চ। সেও আর ডিসেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত চলার অবস্থায় নেই। এমন কি, বড় নৌকা চলাচলও অসম্ভব হয়ে গিয়েছে। এই নদের বাঁকাচোরা পথকে সরলীকরণ এবং নদীর বুকে জমে ওঠা চর ও পলির জমাটকে সরিয়ে না দিলে নদীর মজে যাওয়া রূপ আরও ক্ষতিকর হয়ে উঠবে।

শীলাই নদী

বগড়া কৃষ্ণনগরের উপর থেকে এই নদীর ভরাট বালুচর অপসারণ ও চন্দ্রকোনা থানার মধ্যে প্রবহমান অংশে ক্ষীরাপাইর নিকট থেকে একটি খাল খনন করে তা ঘাটালের নিচে বন্দরের নিকট রূপনারায়ণে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। এর ফলে চন্দ্রকোনা ও ঘাটাল থানার উত্তরাংশের সেচ-সমস্যার সমাধানও সম্ভবপর। এই সঙ্গে ক্ষীরাপাইয়ের দক্ষিণ দিক থেকে নদীকে সরল ও প্রশস্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া শীলাই কাঁসাই সঙ্গমস্থলকে রাজ-নগরের নিকট বিস্তৃতিকরণ সহ গাদীঘাটের নিকট মজে যাওয়া চন্দ্রেশ্বর খালকে পুনর্জীবিত করা একান্ত জরুরি। চন্দ্রেশ্বর খালকে উদ্ধার করলে দাসপুর থানার জলসেচ সমস্যারও সমাধান হবে। এই খালটি কুলটিকরির নিকট রূপনারায়ণের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এই খালের উভয়দিকে স্লুইস গেট না করলে সেচপ্রকল্প কার্যকরী হবে না। এই খালটি মজে যাওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তার স্মৃতিরেখা বেঁচে আছে। ঘাটাল থানার ১ ও ২ নং অঞ্চলে সাকরী খালের সংস্কার ঐ অঞ্চলের সমুন্নতির জন্য প্রয়োজনীয়।

কেলেঘাই

বর্ষান্তে কেলেঘাইয়ের জলে স্রোত নামমাত্র থাকে, কিন্তু মেঘের গুরু গুরু গর্জন ও বারিদবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই সে কালনাগিনীর মতো ফুঁসে ওঠে, প্রবল গর্জনে ছুটে চলে দুকূল প্লাবিত করে। হাহাকার, আর্তধ্বনি, মৃত্যুর কলরোলের সঙ্গে হাজার হাজার বাড়ি ভাঙ্গে, ডোবে, শ্যামলী ফসলের জমি কর্দমাক্ত জলে থৈ থৈ করে।

এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে প্রথম প্রয়োজন কেলেঘাইর মজে যাওয়া বুকের মাটি অপসারণ। সেই সঙ্গে নদীর বুকে বাঁধ বেঁধে বাঁশের আড়া বেড়া

দিযে মাছ ধবা্ব জন্য ইজাবা দেওযাব প্রথাও বন্ধ না কবলে নয।

এছাডা মঙ্গলামাডোব বাজাবেব পাশে যে জল-নিকাশী খালটি বযেছে, তাব বিস্তৃতি-সাধন কবে এটিকে কেলেঘাই থেকে বস্থলপুব পর্যন্ত জল-নিষ্কাশন খালে ৰূপাযিত কবতে হবে। এই খালটি প্রবহমান এলাকায শুধু নয, ভগবানপুব ও খেজুবি থানাবও সেচসমস্যা অনেকখানি সমাধান কববে। এই পবিকল্পনাব সঙ্গে বাবচৌকাব জল-নিষ্কাশন-ব্যবস্থাকেও সংযুক্ত কবতে হবে।

বাগুই খাল

দাঁতনেব উত্তব পশ্চিম কোণে স্থবর্ণবেখা নদী থেকে বেবিয়ে বাগুই খাল কেলেঘাইতে মিশেছে, বর্ষান্তে একেবাবে বিশুষ্কা বাবি-শূন্যা থাকে। কিন্তু বর্ষণ সমাগমে এব ভযঙ্কবী ধ্বংসাত্মক ৰূপাৰূপ পটাশপুব থানাব চিব বিপর্যযেব কাবণ হযে আছে। এই খালটিব বিস্তৃতিকবণ ও এব বাঁকাচোবা পথেব সবলীকবণ আশু প্রযোজন, স্থবর্ণবেখাব মুখে স্লুইস গেট বসালে ও স্থবর্ণবেখা এ্যানিকেট্ কবলে ঐ খাল আব ধ্বংসৰূপা না থেকে সৃষ্টিব সহাযিকা তথা দাঁতন পটাশপুব ও এগবা থানাব সেচপ্রকল্প ৰূপে শ্রীমযী শক্তিসম্পন্না হযে উঠবে।

কপালেশ্ববী

সত্যিই এটি "দুঃখেব নদী"। ক্যানেলেব উদ্বৃত্ত জলেব ও খড়্গপুব থানাব একাংশেব জল নিষ্কাশনী খাল ৰূপে যাব জন্ম, সে যে কত ভযঙ্কবী ও ধ্বংসাত্মিকা শক্তি ধবে সবং থানায না গেলে তা বোঝা যায না। এব বুক জুডে আগাছাব বন আব ভবাট মাটিব স্তূপ। তাবও প্রতিকাব কবতে হবে।

দুবদা বেসিন

প্রতি বছবই সে বন্যাব কান্না শুনিযে চলেছে। হাজাব হাজাব মানুষেব দাবিদ্র্য বজায বাখাই তাব কাজ। দুবদাব জলবাশি বর্ষণেব বাবিধাবা নিযে সবেগে ছুটে চলে উডিষ্যা কোস্ট ক্যানালেব দিকে। নিজেব বুকে তাব অথৈ সমুদ্র লহব। মনে হয যেন দিগন্তহীন দিশেহীন এব ৰূপ।

শবশংকাব পাশ থেকে দাঁতন থানাব বাবিপাত-জনিত জলবাশি এগ্রাব মধ্য দিযে ববদাখালে মিশে ওব বুকে ঝাঁপিযে পডেছে। ফলে দুবদা বেসিন একটি বর্ষাকালীন হ্রদ বলে প্রতীযমান হয।

এই বেসিন সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধবে অনেক গবেষণা ও হৈ চৈ চলেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতামত জানি না। আমার একটা অভিমত রয়েছে। প্রথমত উড়িষ্যা কোস্ট ক্যানালকে গভীরতর করা প্রয়োজন। এই সঙ্গে বারমাইল থেকে নিঃসৃত পিছাবনী খালটিকে প্রশস্ততর করলে, এর জল-নিষ্কাশন-সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে। দ্বিতীয়ত ওখান থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত জুখী থেকে আর-একটি ক্যানাল রামনগর থানার বালিসাইর নিকট মান্দার খালের সঙ্গে সংযোগ করলে বোধহয় সামগ্রিক নিকাশী সম্ভব হবে। এই সঙ্গে সেগুযার নিকট থেকে ররদা খালের যে জলধারা ডুবদা বেসিনে পড়ছে, সেই জলধারাকে আর-একটি ক্যানেলের সাহায্যে উড়িষ্যা কোস্ট ক্যানালে এনে ফেলতে হবে। মান্দার খালটিরও জল-নিষ্কাশন-শক্তি-বৃদ্ধির জন্য সংস্কার-সাধন প্রয়োজন। সুবর্ণরেখার প্লাবন-প্রতিরোধের জন্য বাঙলা এবং উড়িষ্যা সরকারের মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। রামনগর থানার পাচটি গ্রাম ও এগ্রা থানার তিনটি গ্রামেও ডোগরাই এবং জলেশ্বরের জলের ঢল নেমে প্লাবনের সৃষ্টি করে। এই জলপ্রবাহকে খালের সাহায্যে সমুদ্রমুখে ফেলতে হবে। এছাড়া ওই গ্রামগুলির প্লাবন-প্রতিরোধ সম্ভব হবে না।

অন্যান্য খাল সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে আপাতত এইটুকুই বলি যে তাদের সম্পর্কে পৃথক পৃথক পরিকল্পনা নিতে হবে।

কিন্তু সামগ্রিক পরিকল্পনাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে হলে (১) সমস্ত জমিদারী বাঁধের অবলুপ্তি, (২) গ্রাম-ঘেরা ভেড়ীবাঁধগুলির অপসারণ, (৩) পরিবহন সড়ক ও গ্রাম্য রাস্তাগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যক পুল ও স্লুইস নির্মাণ করে জল নিষ্কাশনকে অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

এরার মুখ্য কথা হল, নদীর তীরবর্তী বাঁধগুলি অন্তত দু-ফার্লং সরিয়ে বর্ধিত জলধারাকে কিছুটা ধরে রাখার শক্তিসম্পন্ন করতে হবে। বাঁধগুলি আরও চওড়া, মজবুত এবং উঁচু করা দরকার হবে। বাঁধের সীমানার দু-ফার্লংয়ের মধ্যে কোনো বাসগৃহ বা পুকুর খনন আদৌ উচিত হবে না।

বন্যার এই দানবীয় ধ্বংসলীলা বিগত ২০ বছরে বন্ধ করার কোনো সুপরিকল্পিত কর্মসূচী কেন করা হল না ? এ প্রশ্ন স্বতঃই আসে। প্রথম দিকে সে সম্পর্কে চিন্তার কিছুটা আভাস ছিলও। কিন্তু কংগ্রেসের শাসকগোষ্ঠী, যাঁদের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে এ-দেশে বিদেশী পুঁজি ফাঁপছে আর একচেটিয়াগোষ্ঠী বেড়ে উঠছে—তাঁদের শ্রেণীস্বার্থই এদেশে বন্যা-প্রতিরোধের প্রধান অন্তরায়। কারণ, পরিকল্পনার রচয়িতাও তো তাঁরাই।

কথায় আছে—"কারো সর্বনাশ কারো পৌষ মাস।" লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের জলে, আর্ত হাহাকারে, বুকের দাহনে চলে শাসককুলের ভোটের দাদন। সরকারী সাহায্যের গন্ধমাদন দলের কর্মীদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে এঁরা নির্বাচনের বিশল্যকরণী পকেটস্থ করেন। বন্যার আশীর্বাদ বিলি-বর্ষণে অনুগ্রহ-দানে এঁদের নিষ্কাম কর্মের মুখোশটুকুও খুলে দেয়। কমিশন-এজেন্সি এঁদের তখন সরগরম জমজমাট হয়ে ওঠে। অবিশ্রাম অবসর আর নয়, নিষ্ক্রিয় কর্মীরা সক্রিয় নিরলস কর্মপ্রমত্ত হয়ে ওঠে। জনসেবা ও আত্মসেবা তখন পাশাপাশি চলতে থাকে।

এই অবস্থার পরিবর্তন-সাধনের জন্য যুক্তফ্রণ্ট সরকার তার ৮ মাস পরমায়ুর মধ্যে নদীপ্রকল্প রচনা ও কার্যকরী করার কাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু ধনিক—বণিক শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ সাধারণ খেটেখাওয়া মজুর-কৃষক ও মেহনতী মধ্যবিত্ত স্বার্থের অনুগ নয়। পরভুক গোষ্ঠীর চক্রান্ত যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটালেও, জাতীয় সমুন্নতির পথ দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সম্মিলিত মোর্চার শক্তিকে দুর্বল করতে পারে নি। কারণ এই শক্তিই সমাজজীবনের নব অভ্যুদয়কে বাস্তব করবে, কৃষক ও কৃষির সমস্যাগুলি সমাধান করে জন-জীবনকে করবে সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী। "বন্যার কান্না" আর নয়। নদীপ্রকল্পকে কার্যকরী করার জন্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংগ্রামী সংহতি গড়ে সব সমস্যার সমাধান করতে হবে।

মেদিনীপুরের মানুষ তারই জন্য অপেক্ষা করছে।

দেবেন দাশ

শ্রীনগরের নির্দেশ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ

জাতীয় সংহতি পরিষদের প্রথম দিনের অধিবেশনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবনের মন্তব্য থেকে দেখা যায় যে ১৯৬৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংখ্যা ও ব্যাপকতা অতীতের সমস্ত সংখ্যাকে অতিক্রম করেছে। সম্ভবত সেই কারণেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে প্রধান আসামী হিসেবে শ্রীনগরের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল। এমন কি, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও দাঙ্গা-প্রশমনের জন্য সরকারের হাতে বিশেষ ক্ষমতা দিতে আপত্তি করেন নি। তাঁদের অধিকাংশ সাম্প্রদায়িকতাকে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রধান শত্রু হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সেই সঙ্গে আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক জীবন থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ নির্মূল করার দাবিও তাঁরা করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার কমিশনে কংগ্রেসের দু-জন শক্তিশালী প্রথমসারির নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী যে আগ্রহ উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতার উদাহরণ রেখেছিলেন— তাতে মনে হয়েছিল যেন তাঁরা সময় সময় কমিউনিস্ট নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্তকেই নিষ্প্রভ করে দিচ্ছেন। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী সুখাদিয়া ও কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পার ভাষণে সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি বিশেষ করে জনসংঘ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আর-এস-এস-কে বেআইনী করার দাবিও তোলা হয়েছিল—যা দুই কমিউনিস্ট পার্টির নেতারাও দাবি করেন নি।

এমন কি উপ-প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই পর্যন্ত সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন—"সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে ব্যর্থ হলে সেইসব মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে।" সভাস্থ সকল দলের লোক তাঁকে সাধুবাদ জানালেন। আশা হলো এইবার আমরা সবাই কংগ্রেসী রাজ্যে এই ঘোষণার সার্থক ও সাহসী পরীক্ষা দেখতে পাব। অন্তত আমাদের মতো সরল বিশ্বাসী নাগরিক এই আশা নিয়েই ফিরেছিলেন।

কিন্তু ছ-মাসের মধ্যে এই ঘোষণার প্রয়োগ অন্তত কংগ্রেসশাসিত রাজ্যে কি হলো দেখা যাক।

১। নাগপুরের গোলযোগ সম্পর্কে শ্রীনায়েক আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দুষ্কৃতিকারীদের অবিলম্বে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। কাউকে ক্ষমা করা হবে না। এই দাবির সঙ্গে আর-এস-এস-এর প্রশ্ন যুক্ত ছিল।

তাদেব সম্পর্কে তিনি নাকি কঠোব মনোভাবই পোষণ কবেন। বললেন, শিব-সেনাদেব এবাব শায়েস্তা কবা হবে। কিন্তু এইসব প্রতিশ্রুতিব কি হলো? নাগপুবেব দাঙ্গাব দুষ্কৃতিকাবীবা বহাল তবিয়তেই ঘুবে বেড়াচ্ছে। সাম্প্রদায়িক বাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘেব সংগঠন নাগপুবে ক্রমশই শক্তিশালী হচ্ছে। পুলিশ, উচ্চকর্মচাবী, বড ব্যবসায়ী, বেকাব যুবকদেব মধ্যে তাদেব শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে। 'অর্গানাইজাব' কাগজ নিয়মিত সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াচ্ছে।

২। মহাবাষ্ট্রেব কথা না হয় বাদ দিলাম। এবাব মহীশূব বাজ্যেব শ্রীবীবেন্দ্র প্যাটেলেব কথাই বলি। তাঁব কথা শুনে মনে হয়েছিল, তিনি নিশ্চয়ই সাহসেব সঙ্গে এগিয়ে যেতে পাববেন। তিনি আমাকে মৌখিক প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে ফিবে গিয়ে ম্যাঙ্গালোবেব দাঙ্গাব অপবাধীদেব কঠোব হাতে দমন কববেন। মনে হয়েছিল হায়দাব আলি, টিপু সুলতানেব মহীশূব বাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকাবীদেব তিনি দমন কবতে পাববেন। কিন্তু মহীশূবেব খববও আমবা জানি। ম্যাঙ্গালোবেব দাঙ্গাকাবীবা আজও নিরুদ্বেগে স্বাধীনভাবে বিচবণ কবছে। নবহত্যাব দায়ে কেউ তাদেব গ্রেপ্তাব কবছে না। কোনো বিচাব হচ্ছে না তাদেব অপবাধেব।

৩। কংগ্রেসেব অন্যতম গর্ব হচ্ছে অন্ধ্র বাজ্য ও তাব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ বেড্ডী। সাম্প্রদায়িকতা কমিশনে তাঁব ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল। স্বভাবতই তাঁব সাম্প্রদায়িকতা-বিবোধী মন্তব্য ও ভূমিকা অনেকেব মনেই আশা জাগিয়েছিল।

কিন্তু তিনি তাঁব বাজ্যে ফিবে গিয়ে কি কবলেন? বাজ্যে ফিবে গিয়েই একদিকে সাম্প্রদায়িকতা-বিবোধী অন্যদিকে জাতীয় সংহতিব অন্যতম প্রধান প্রচাবক দুটি ভাবতবিখ্যাত পত্রিকা দিল্লীব দৈনিক 'পেট্রিয়ট' ও সাপ্তাহিক 'লিঙ্ক'-এব বিরুদ্ধে তিনি নিপীড়নমূলক আইন প্রয়োগ কবলেন। অবাক কাণ্ড। যে-দুই পত্রিকা হবিজন বালকেব বিরুদ্ধে বর্ববোচিত নিপীড়নেব খবব ভাবতবাসীকে জানিয়ে গণতন্ত্র ও মানবতাব শত্রুব বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড আঘাত কবেছিলেন—তাঁদেব অভিনন্দন না জানিয়ে শ্রীনগবে গৃহীত প্রেস ও পত্রিকা সম্পর্কিত প্রস্তাবেব চবম অপ-ব্যবহাব কবা হলো। শ্রীব্রহ্মানন্দেব কাছ থেকে আমাবা একটি অপ্রত্যাশিত আঘাত পেলাম। যাঁবা এখনো কংগ্রেসেব মধ্যে একদল সত্যনিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতা-বিবোধী খোঁজেন, তাঁদেব কাছে এই আঘাত প্রচণ্ড। ভাবতে গণতন্ত্র ও

ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পক্ষে অন্ধ্র-মুখ্যমন্ত্রীর এই অন্যায় আদেশ অনেক লোককে নিরুৎসাহিত করবে।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বাঙলায় গত এক বছরে যুক্তফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে দৃঢ় কঠোর মনোভাব ও নিজেদের নিরাপত্তা বিপন্ন করেও অভূতপূর্ব তৎপরতার সঙ্গে দাঙ্গার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাছাড়া দাঙ্গা-দমনের কাজে পুলিশ বাহিনীকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করাও তাঁদের শাসন-নৈপুণ্যের পরিচায়িক। জনপ্রিয় মন্ত্রিসভার এই সাফল্য যুক্তফ্রণ্টের অতি বড় সমালোচকেরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। শিখ-বাঙালী দাঙ্গা বন্ধ হলো তিন ঘণ্টার মধ্যে। এণ্টালির হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা থামাতে মন্ত্রী জ্যোতি বসু ও সোমনাথ লাহিড়ী ছিলেন প্রথম সারিতে। হাওড়ায় দাঙ্গা থামাতে নিগৃহীত হলেন মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার আর অপূর্বলাল মজুমদার। মেটিয়াবুরুজে দু-দুবার সাম্প্রদায়িক উস্কানিকে স্তব্ধ করলেন মন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখার্জি ও হেমন্ত বসু। তাঁদের পেছনে ছিল মেটিয়াবুরুজের সূতাকলের বীর শ্রমিকেরা। মাত্র কয়েক মাস আগে হোলি উৎসবের সময় নারকেলডাঙ্গা ও কলাবাগানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রহৃত হয়েছিলেন যুক্তফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দ—অজয় মুখার্জি, বিশ্বনাথ মুখার্জি ও সুধীন কুমার এবং এই দাঙ্গার পেছনে যে কংগ্রেসের একাংশ ও আর-এস-এস-দের ষড়যন্ত্র ছিল—একথা তো সর্বজনবিদিত। আসানসোলে বাঙলি অবাঙালী দাঙ্গার সম্ভাবনাকে দৃঢ় হাতে দমন করলেন মন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখার্জি। অন্য রাজ্যের ঘটনা আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-প্রতিরোধের ব্যাপারে যুক্তফ্রণ্ট গৌরবের অধিকারী—একথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না।

জাতীয় সংহিতি, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘ-মেয়াদী প্রস্তাবগুলি কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে কাজে পরিণত করার মতো উদ্যোগ এখনো সরকারী মহল থেকে দেখা যাচ্ছে না। তাই এই উদ্যোগ সম্ভবত গণতান্ত্রিক জনসাধারণকেই নিতে হবে। সরকারপক্ষ থেকে যদি কোনো বাধা না আসে, তা হলেই আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ভারত-পাক সম্পর্ক ও বিপ্লবী ত্রৈলক্যনাথ

একথা অনস্বীকার্য যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারত-পাক সম্পর্ক। সম্প্রতি এই সম্পর্কের নিঃসন্দেহে আরও অবনতি ঘটেছে।

একদিকে উত্তব ভাবতেব বিভিন্ন বাজ্যে বাষ্ট্রীয স্বযংসেবক সংঘ, জনসংঘ, মুসাবত প্রভৃতি দল বা নযা ফ্যাসিস্ত সংস্থাব শক্তিবৃদ্ধি, 'অর্গানাইজাব' পত্রিকাব পাশাপাশি আবও বহু জনসংঘপ্রিয পত্র-পত্রিকাব ক্রমাগত সাম্প্রদাযিক বিদ্বেষ প্রচাব—অন্যদিকে সোভিযেত-পাক অস্ত্রচুক্তিকে ব্যবহাব কবে সোভিযেত-বিবোধী মনোভাবেব উস্কানি দেওযাব পবিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিবা গান্ধীব পাকিস্তানেব নিকট 'আব যুদ্ধ নয' প্রস্তাব। এ-সবই ভাবতবর্ষেব বাজনৈতিক জগতেব পক্ষে খুবই তাৎপর্য-পূর্ণ ঘটনা। পাকিস্তানেব ভেতবে বাইবে সাম্প্রদাযিকতাবাদীদেব প্রতিক্রিযাশীল প্রচাব এবং ভাবতেব বাইবে পাকিস্তানেব শাসকদলেব শত অপতত্ত্বপ্রচাব সত্ত্বেও এই প্রস্তাব পাকিস্তানেব গণতন্ত্রীকামী জনসাধাবণেব উপব প্রত্যক্ষ প্রভাব বাখতে বাধ্য। ভাবতেব বাইবে—বন্ধু বাষ্ট্রদেব কাছেও এই প্রস্তাবেব তাৎপর্য খুব বেশি। পাকিস্তানেব জনসাধাবণ ও ভাবতেব জনসাধাবণেব মধ্যে মৈত্রী ও শান্তিব আগ্রহ যে কতখানি গভীব, তাব অভিব্যক্তি আমবা অনেক সমযেই দেখতে পাই।

আমবা দেখেছি বিরূপ বাজনৈতিক আবহাওযা সত্ত্বেও দুই দেশেব তীর্থ-যাত্রীবা সম্প্রতি বিভিন্ন ধর্মীয ও সাংস্কৃতিক ক্রিযাকাণ্ডেব মধ্যে মিলিত হযেছিলেন। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তানেব চট্টগ্রাম শহবে চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহেব শহীদদেব স্মৃতিবক্ষাব মধ্য দিযেও দুই দেশেব আত্মিক সহযোগ ঘটেছে। এই পুণ্যধাবা যদি ভবিষ্যতে আবো প্রশস্ত হয, তবে তাব ফল সুদূবপ্রসাবী।

এই প্রসঙ্গে একজন প্রাচীন বিপ্লবীব কথা উল্লেখ কবা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'অনুশীলন' বিপ্লবী দলেব বিখ্যাত নেতা শ্রীত্রৈলক্য চক্রবর্তী চিকিৎসাব উদ্দেশ্যে ভাবতে আসবাব জন্যে বাববাব আবেদন কবেছেন। সাম্প্রতিক একটি পত্রে কমিউনিস্ট এম-পি শ্রীভূপেশ গুপ্তকে তিনি তাঁব অভিলাষেব কথা ব্যক্ত কবেছেন। ভাবতেব মুক্তি সংগ্রামেব অন্যতম নাযক এই মহৎপ্রাণ বিপ্লবীব ন্যাযসঙ্গত আবেদনে পাকিস্তান সবকাব যদি সাড়া দেন তবে তা ভাবতেব মুক্তি-আন্দোলনেব প্রতি পাকিস্তানী জনসাধাবণেব গভীব আন্তবিকতাব আবো একটি নিদর্শন হিসেবে প্রতিভাত হবে। তাছাড়া তিনি জীবনেব সাযাহ্নে প্রিয সাথীদেব সঙ্গে শেষবাবেব মতো সাক্ষাতেব জন্য ব্যাকুল। আমবা আশা কবব পাকিস্তানেব নেতৃবৃন্দ ভাবত-পাক সম্পর্ক উন্নত কবাব দিক থেকে ও বৃহত্তব মানবতাব তাগিদে বিপ্লবী ত্রৈলক্যনাথকে ভাবতে পাঠাবাব ব্যবস্থা কবে অগণিত ভাবতবাসীব ধন্যবাদ অর্জন কববেন।

শান্তিময় বায

সংবাদপত্রে ধর্মঘট

সারা ভারত সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশনের ডাকে গত ২৩শে জুলাই থেকে অসাংবাদিক কর্মচারী বন্ধুদের যে ধর্মঘট শুরু, এখনও তা অব্যাহত। তাঁরা এই দীর্ঘ একমাস রাজপথকে আশ্রয় করে ধ্বনি তুলছেন : "আমাদের বাঁচার মতো মজুরি দাও, কেন্দ্রীয় সরকার তুমি যে অসাংবাদিক বেতনবোর্ডের সুপারিশ গ্রহণ করেছ—তা কার্যকরী করো।"

সারা ভারতব্যাপী অসাংবাদিক কর্মচারী বন্ধুদের এই ধ্বনি দিল্লীর বাদশাহ্‌দের ঘুম এখনও ভাঙাতে পারেনি, টলাতে পারেনি সংবাদপত্রের একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীর সোনামোড়া কুৎসিত হৃদয়গুলো। বরং উল্টে দেখছি, ঐতিহাসিক এই ধর্মঘটকে ভাঙার জন্য সরকারী লাঠি উদ্যত হয়েছে। মালিকপক্ষও কর্মচারীদের হাতে না মেরে ভাতে মারার জন্য প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের দুয়ারে ইতিমধ্যেই লটকে দিয়েছেন ছোট্ট দুটি কথা : 'লক আউট'।

এই ছোট দুটি কথার মধ্য দিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীর আকাশ-ছোঁয়া স্পর্ধা যেমন প্রকাশিত, তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্লীব-বীরত্বের নমুনাও আমরা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করছি।

আমরা জানি, সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারীরা কোনো হঠকারিতার বশে হঠাৎ এ-পথে পা বাড়াননি। অসাংবাদিক কর্মচারীরা তাঁদের দাবি আদায়ের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছেন। আজ থেকে প্রায় একযুগ আগে কার্যনিরত সাংবাদিকদের চাপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে যখন প্রথম বেতনবোর্ড গঠিত হয়, তখন 'উদার' জওহরলালজীও এদের কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন বোধ করেননি। এতে অসাংবাদিক কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ হলেও ধৈর্য ধারণ করেছেন। কিন্তু ১৯৬৩ সালে কার্য-নিরত সাংবাদিকদের জন্য যখন দ্বিতীয় বেতনবোর্ড গঠিত হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে তখন অসাংবাদিক কর্মচারীদের দাবি উপেক্ষা করা সহজ ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা দেখলাম, কেন্দ্রীয় সরকার অসাংবাদিক কর্মচারীদের জন্য প্রথম বেতনবোর্ড গঠন করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সাংবাদিক এবং অসাংবাদিক কর্মীদের জন্য দুটি বেতন-

বোর্ড প্রায় একই সময়ে গঠিত হলেও—দুটিব জন্য দুই পৃথক নীতি নির্ধাবিত হল। সাংবাদিকদেব জন্য বেতনবোর্ডেব সুপাবিশকে কবা হল বাধ্যতামূলক আব অসাংবাদিকদেব জন্য বেতনবোর্ডেব বাযকে আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত বাখাই শ্রেয় মনে কবলেন কেন্দ্রীয সবকাব। তাবপব চাব বৎসব অতিক্রান্ত হল। এবি মধ্যে বেতনবোর্ড সর্ববাদী-সম্মতভাবে অন্তর্বর্তীকালীন যে বায দিযেছিলেন, সবকাবী চাপে তা অদল-বদল কবে তাঁদেব সর্বশেষ বাযটি। ১৯৬৭ সালে প্রকাশ কবলেন সবকাব বেতনবোর্ডেব এই বাযকে আবও সংশোধিত কবে গ্রহণ কবলেন এবং মালিকদেবও গ্রহণ কবতে অনুবোধ জানালেন।

পববর্তী কালে আবও অনেক আলাপ-আলোচনা চলেছে। মীমাংসাব আশায অসাংবাদিক কর্মচাবীদেব সংগঠন শেষপর্যন্ত চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীভুক্ত সংবাদপত্রগুলিব উপব তাদেব দাবিকে যথেষ্ট পবিমাণে শিথিল কবে শুধুমাত্র প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত সংবাদপত্রগুলিতে বেতন-বোর্ডেব বায কার্যকবী কবতে অনুবোধ জানান। এই দাবিও যখন এক-চেটিযা পুঁজিপতিবা প্রত্যাখ্যান কবেছেন, তখনি নিরুপায হযে ধর্মঘটে নেমেছেন অসাংবাদিক কর্মচাবী বন্ধুবা।

দেশী-বিদেশী মালিকানায পবিচালিত সংবাদপত্রগোষ্ঠীব একচেটিযা প্রভুত্বকে অস্বীকাব কবলে যাদেব মসনদ টলে উঠবে, সেই পঙ্গু কেন্দ্রীয সবকাবেব অসহাযতা আমবা স্পষ্ট উপলব্ধি কবি। কিন্তু দ্বিতীয মহাযুদ্ধেব ডামাডোলে বিদেশী সবকাবেব বিজ্ঞাপন-দাক্ষিণ্যে এবং নিউজ প্রিণ্টেব বিপুল কোটা কালোবাজাবে পাচাব কবে যেসব সংবাদপত্র মালিক বিপুল ধনসম্পদ অর্জন কবেছিলেন, স্বাধীনতাব পববর্তীকালে অবাধ মুনাফা শিকাবেব মাধ্যমে যাঁবা আবও স্ফীতকায হয়েছেন, তাঁদেব অনিচ্ছুক মুঠি থেকে শ্রমিক-কর্মচাবীব বাঁচাব মতো মজুবিটুকু ছিনিযে আনতে কি এখনও গর্জে উঠবে না আসমুদ্র-হিমাচলেব জাগ্রত মানুষ? তাবা কি এখনও জিজ্ঞাসা কববেনা ১৯৫৭ সালে যে কস্তুবী এণ্ড সন্স লিঃ (মাদ্রাজ), স্টেটসম্যান লিঃ, অমৃতবাজাব পত্রিকা, আনন্দবাজাব পত্রিকা, বেনেট কোলম্যান কম্পানি, হিন্দুস্থান টাইমস এবং ইণ্ডিযান এক্সপ্রেস-এব বার্ষিক আয ছিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকাব উর্ধ্বে, ১৯৬৪ স-লেব মধ্যে তাদেব প্রত্যেকেব আয কোন জাদুমন্ত্রে যথাক্রমে ২ কোটি ২৫ লক্ষ, ২ কোটি ৮৯ লক্ষ, ১ কোটি ১৬ লক্ষ, ১ কোটি ৮৩

লক্ষ, ৫ কোটি ৬১ লক্ষ, ২ কোটি ২১ লক্ষ এবং ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকায় গিয়ে পৌঁছল ?

আমাদেব দৃঢ বিশ্বাস, এই মুনাফাব পাহাড়েব পাদদেশে ক্লীব ভাবত সবকাব নতজানু হলেও পর্বতপ্রমাণ বিঘ্নবাধা অতিক্রম কবেও এব সদুত্তব খুঁজে নিতে সংগ্রামী অসাংবাদিক কর্মচাবী বন্ধুদেব পাশাপাশি ভাবতেব জাগ্রত জনমত নিশ্চিত অগ্রসব হবে।

ধনঞ্জয় দাশ

গত সংখ্যা 'পবিচয়'-এব প্রচ্ছদচিত্র এঁকেছিলেন শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

এই সংখ্যাব নাট্য-প্রসঙ্গ বিভাগে প্রকাশিত বিতর্কমূলক নিবন্ধটি সম্পর্কে আমবা পাঠকদেব, বিশেষত নাট্য-আন্দোলনেব সঙ্গে জড়িত গুণীজনেব মতামত প্রার্থনা কবছি

—সম্পাদক

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিসট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রক—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ভারতীয়, ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭

৪। প্রকাশক— ,, ,, ,, ,,

৫। সম্পাদক—সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ভারতীয়, ৫ বি, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯

৬। পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেডের যে সকল অংশীদার মূলধনের একশতাংশের অধিকারী, তাঁদের নাম ও ঠিকানা ঃ

১। গোপাল হালদার, ফ্ল্যাট ১৯, ব্লক এইচ, সি. আই টি বিল্‌ডিংস, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪ ॥ ২। সুনীলকুমার বসু, ৭৩ এল, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-৯ ॥ ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৪। হিরণ্‌কুমার সান্যাল, ৮, একডালিয়া রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭ ॥ ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৫বি, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১।৩, ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১, নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-১২ ॥ ১১। বিনয় ঘোষ, ৪৭।৪, যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ১২। সত্যজিৎ রায়, ৩, লেক টেম্পল রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায়, (মৃত), ৪২।৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯এ, কবির রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২বি, সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২৯ ॥ ১৬। শান্তিময় রায়, 'কুসুমিকা', গরফা মেন রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা ॥ ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, (মৃত), ৯।১, কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১৯। নবেদিতা দাশ, ৫৩বি, গরচা রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ৯০।১, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৯ ॥ ২১। দেবীপ্রসাদ

চট্টোপাধ্যায়, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলকাতা-২০ ।। ২২। শান্তা বসু, ১৩।১এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ ।। ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬২, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ।। ২৪। ধীরেন রায়, ১০।৬, নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া ।। ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট কলকাতা-১৩ ।। ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩ডি, ফিরোজ শাহ্ রোড, নয়াদিল্লী ॥ ২৭। সলিল-কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০, রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬ ।। ২৮। সুনীল সেন, ২৪, রসা রোড সাউথ (থার্ড লেন), কলকাতা-৩৩ ।। ২৯। দিলীপ বসু, ২০০ এল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬ ।। ৩০। সুনীল মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯ ।। ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২, পাম প্লেস, কলকাতা-১৯ ।। ৩২। হিমাদ্রিশেখর বসু, ৯এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯ ।। ৩৩। শিপ্রা সরকার, ২৩৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৪৭ ।। ৩৪। অচিন্ত্যেশ ঘোষ, ৩, যাদবপুর সাউথ রোড, কলকাতা-৩২ ।। ৩৫। চিন্মোহন সেহানবীশ, ১৯, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৩৬। রণজিৎ মুখার্জি, পি/২৬, গ্রেহামস লেন, কলকাতা-৪০ ।। ৩৭। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফ্ল্যাট ২/'সী গাল', কার্মিচেল রোড, বম্বে-২৬ ।। ৩৮। অমল দাশগুপ্ত, ৮৬, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫ ।। ৩৯। প্রদ্যোৎ গুহ, ১এ, মহীশূর রোড, কলকাতা-২৬ ।। ৪০। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭ ।। ৪১। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫বি হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯ ।। ৪২। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি ৭৬৫, পি ব্লক, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩ ।।

আমি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

(স্বাঃ) অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

১০. ৩. ৬৮

পরিচয়
শারদীয়/১৩৭৮

ছোটদের আজীবন খুশিপায়ে চলতে হবে—এই কথা মনে রেখে জুতো কিনবেন

ছোটরা বড়ো হবে পায়ের নিখুঁত গঠন বজায় রেখে—এই যদি আপনার কামনা—তা হলে এখন থেকেই তাদের জুতো কেনা বিষয়ে সাবধান হোন। অন্যথা, ছোট পায়ে বড়ো রকমের ক্ষতির সম্ভাবনা। ছোটদের বাটার জুতো বাড়ন্ত পায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি, নকশায় আর নির্মাণে আরামে হাঁটার নিশ্চিন্ত নির্ভরতা। সামনে আঙুল মেলার বাড়তি জায়গা, খাপ খাওয়ানো গোড়ালির গড়ন, আর এমন জুতোর তলি যা অবাধে পা সঞ্চালনের সহায়ক। তাই সুঠাম গঠনে তাদের পা বাড়ে, যার ফল আজীবন খুশিপায়ে চলা। টুকটুকে রঙ, বাহারে-নকশা, আর আরামে পয়লা নম্বর—এমন জুতোই এখন মজুত বাটার দোকানে। আজই নিয়ে আসুন আপনার বাচ্চাদের। এদের খুশিপায়েই শুরু হোক শরতের শোভাযাত্রা।

ফ্যান্সি ডার্বি ৩·৯৫-৪·৭৫

EXPORT QUALITY
এখন
আপনাদের জন্যও
পাওয়া যাচ্ছে!
সুলেখা
একসিকিউটিভ কালি
BLACK
EXECUTIVE INK
Sulekha
সুলেখা
ওয়ার্কস্ লিঃ
সুলেখা পার্ক
কলিকাতা-৩২
EXECUTIVE IN

সূতী তাঁতবস্ত্রের উপর
টাকা প্রতি
১০ পয়সা
বিশেষ পূজা রিবেট
॥ ২৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ॥
হ্যাণ্ডলুম
সার্ট ০ ষ্টোল
টাই ০ স্যুটিংস
শাড়ি
বেড কভার
গৃহসজ্জার
বস্ত্রাদি
ভারতের সকল প্রদেশের তাঁতবস্ত্র সম্ভার
শীততাপনিয়ন্ত্রিত
হ্যাণ্ডলুম
হাউস
২, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা
Progressive

কেন ঠকছেন !

কেনাকাটার ব্যাপারে আর একটু
সতর্ক হলে আপনি অনেক
টাকা বাঁচাতে পারবেন।

দাম সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
মান সম্পর্কেও সচেতন হতে হবে।

দেখে নিন ক্রীত বস্তুর গায়ে
পশ্চিমবঙ্গ কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্পাধিকারের
মানসূচক চিহ্ন আছে কিনা

এই চিহ্নের অর্থ জিনিষটি

- টেঁকসই
- সুন্দর
- নিখুঁত
- উচ্চমান সম্পন্ন

বিশদ বিবরণের জন্য
নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—
কোয়ালিটি মার্কিং ইউনিট
পশ্চিমবঙ্গ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকার
১৪, হেয়ার স্ট্রীট (ত্রিতল)
কলিকাতা-১ (টেলিফোন ঃ ২৩-৯৬৭৭)

পরিচয়

শারদীয় সংখ্যা

বর্ষ ৩৮ ॥ সংখ্যা ২

ভাদ্র ॥ ১৩৭৫

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

কবিতা

নাটক

গল্প

রেখাচিত্র : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। বাদল ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদপট : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হিরণকুমার সান্যাল। সুশোভন সরকার। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র।
গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত

শিল্পী : বাদল ভট্টাচার্য

শিল্পী : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
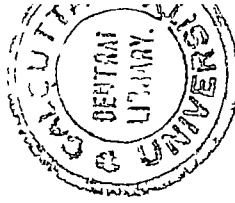
পরিচয়
বর্ষ ৩৮ ॥ সংখ্যা ২
শারদীয় ॥ ১৩৭৫

"দুর্গংপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চেকোশ্লোভাকিয়াকে উপলক্ষ করে সম্প্রতি যে সব ঘটনা সারা দুনিয়াকে সচকিত করে তুলেছে এবং যার জের মিটতে বেশ কিছু সময় লাগা অবশ্যম্ভাবী, তা প্রখরভাবে মনে পড়িয়ে দেয় লেনিনের এক উক্তি : "বিপ্লবের রাস্তা নিয়েভ্‌স্কি প্রস্‌পেক্‌টের মতো একটা সোজা সড়ক নয়।" এগিয়ে চলার পথ মাঝে মাঝে আঁকা-বাঁকা না হয়ে পারে না, থেকে থেকে চড়াই-উৎরাই এসে থাকে, আর নানা ধরনের বাধাবিঘ্নের সঙ্গে মোকাবিলা তো করতে হবে-ই। এগিয়ে না চলে উপায়ও নেই, কারণ বিপ্লব একটা স্থাণু বস্তু নয়। লক্ষ্যস্থলে হাজির হলাম আর-সকল সমস্যা সন্দেহ সংশয়ের অবসান ঘটে গেল, এমন ধারণা যে একেবারে ভুল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চলমান জীবনে এমন কোনো সিদ্ধির মুহূর্ত থাকতে পারে না, যেখানে পৌঁছালেই যেন নির্বাণ লাভ হয়ে যায়, সংসারের সব প্রশ্ন মিটে যায়। ব্যক্তি তার একক অনুধ্যান-বলে তুরীয় রাজ্যে উত্তরণ করতে পারে অবশ্য শোনা যায়। কিন্তু সমাজের বেলায় তা সম্ভব মনে হয় না।

তাই সমাজবাদী বিপ্লবের চলার পথে সম্প্রতি একাধিক ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন মূর্তিতে যে আলোড়ন দেখা দিয়েছে তাতে অতিরিক্ত বিচলিত হওয়ার হেতু নেই—সমাজবাদ সম্পর্কেই আস্থা হারাবার উপক্রম সমাজবাদী-বলে-পরিচিত যাঁরা অনেকে করছেন, তাঁদের আতিশয্যদুষ্ট বিক্ষোভ ও বিরূপতার বিন্দুমাত্র যুক্তি নেই। গতিশীল জীবনে আলোড়ন ঘটবে না, বিপদ আসবে না, গভীর প্রশ্ন (যার উত্তর সহজ নয়) উঠবে না, ভুলভ্রান্তি দেখা দেবে না, এ তো অস্বাভাবিক ব্যাপার। সমাজবাদ চলমান জীবনের কথাই সর্বদা বলেছে, অচলায়তন সৃষ্টি করতে চায়নি, সতত সঞ্চরমান এই বিশ্বে, আমাদের এই জঙ্গম জগতেই সুষ্ঠু, সবল, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ সমষ্টি-জীবনের পত্তন করতে চেয়েছে।

শত্রুপক্ষেব অবিবাম অভিযানকে পবাজিত কবাব জন্য সমাজবাদী শিবিবে ঐক্যেব গুরুত্ব যে বিবাট তাতে সন্দেহ নেই। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে বিভিন্ন দেশে সমাজবাদ বাষ্ট্রশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওযার ফলে দেশকালপাত্র অনুযাযী বিশিষ্ট নূতন সমস্যাবও উদ্ভব হচ্ছে, জাতিবোধ ও আন্তর্জাতিকতাব মধ্যে নূতন সামঞ্জস্য স্থাপনেব প্রযোজনও অনুভূত হচ্ছে। বিভিন্ন সমাজবাদী বাষ্ট্রেব পবস্পব সম্পর্ক নিযে সক্রিয চিন্তা ও কার্যক্রমেব কথাও আজ তাই কিছুকাল ধবে আমবা শুনছি। বৈচিত্র্যেব স্বীকৃতিব ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা বিষযে কম্যুনিস্ট তত্ত্বেব বিশ্লেষণ এবং প্রযোগ ব্যাপাবে নূতন অভিনিবেশেব প্রযোজনও বেশ কিছুকাল থেকে প্রকট হযে উঠেছে। সমাজবাদী অগ্রগতিব বিভিন্ন পর্যাযে প্রথম যুগেব অনিবার্য, অতি-সতর্ক নিষ্ঠাপবাযণতা যে সর্বদা সমীচীন নয, এই বোধ বর্তমানে বাস্তব অবস্থা পবিবর্তনেব ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে সমাজবাদী শৃংখলাব অর্ধ-সামবিক কঠোবতা প্রশমিত হতে পেবেছে। এই সব ধাবাব সুস্থ বিকাশ যত দ্রুত ঘটতে পাববে, ততই মানুষেব ভবিষ্যৎ হবে সমুজ্জ্বল। দুঃখেব কথা এই যে, সম্প্রতি চেকোশ্লোভাকিযা-সম্পর্কিত ঘটনাবলী এই সুস্থ বিকাশেব পথে কণ্টক সৃষ্টি কবেছে—সমাজবাদেব শত্রুবা যা চেযেছিল তা পাযনি বটে, কিন্তু তাদেব সযত্নবচিত চক্রান্তেব ফলে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগাতে পেবেছে, বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে অন্তত সামযিকভাবে কক্ষচ্যুত কবতে পেবেছে, প্রকৃত মানবমুক্তি সাধনে গবিষ্ঠ প্রকবণ যে সমাজবাদ, এ-বিশ্বাসে আঘাত দিতে পেবেছে।

তা সত্ত্বেও, এবং হযতো সেজন্যই, উচ্চৈঃস্ববে ঘোষণা কবতে হবে, মৃত্যুঞ্জযী ভিযেৎনামেব বণক্ষেত্রে যা সব চেযে স্পষ্ট হযে উঠেছে, বর্তমান ইতিহাসেব সেই জাজ্বল্যমান সত্য: 'সম্পদেব শিখবে আবোহণ কবেও ধনতন্ত্র আজ দেউলিযা, তাব চবম পবাজয অকাট্য।' আমবা বাস কবছি সমাজবিবর্তনেব এক জটিল অথচ চাঞ্চল্যময দুর্গে আব অপেক্ষা কবছি কবে মানুষেব নিবন্তব সংগ্রামেব ফলে জগৎ জুড়ে সংক্রান্তি আসবে, মনু বদলে যাবে, নূতন সংহিতা নিযে সমাজ চলতে থাকবে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে এই বিবর্তন ঘটবে "একটা গোটা ঐতিহাসিক অধ্যায" (লেনিন) জুড়ে সময নিযে। যাবা আজ চেকোশ্লোভাকিযা নিযে এত বেশি বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত যে সোভিযেট-সমেত সমাজবাদী দেশগুলিব ক্রিযাকলাপে নিন্দনীয ছাড়া আব কিছু দেখছেন না, তাঁবা আশা কবি বুঝবেন

যে উপরোক্ত "ঐতিহাসিক অধ্যায"-এর পঞ্চম অঙ্ক থেকে আমরা তো এখনও বেশ দূরে আছি। এমন তো মনে করার কথা নয় যে, সমাজবাদের পথে বিঘ্নবিপদ বড একটা নেই, আর ইতিমধ্যেই এত সব অদলবদল ঘটেছে যে এক অনতিদূর পুণ্য দিনে সবাই আমরা ঘুম ভাঙ্গার পর দেখব যে শোষণের অবসান জগৎ জুড়ে ঘটে গেছে। এজন্যই তো' 'আকাশচারী' (ইউটোপিযন') এবং নৈরাজ্যবাদীরা অমূলক আশার যে কুহক বিস্তার করতেন, তার একান্ত বিরোধিতা করেছিলেন কার্ল মার্কস। এজন্যই স্টালিন একবার বলেছিলেন: "জয কখনও আপনা থেকে এসে হাজির হয না, তাকে হাতে ধরে টেনে আনতে হয।" মার্কসবাদ তো একথাই বলে যে সমাজবাদে উত্তরণ ঘটবে এক সুদীর্ঘ ও জটিল অধ্যায অতিক্রম করার ফলে, আর সে-অধ্যাযে উত্থান-পতন দেখা যাবে, হযতো বা কযেক দশক কেটে যাবে প্রকৃত যুগান্তর সংসাধন প্রচেষ্টায। আমরা কি স্মরণ করব না ১৮৫১ সালে লেখা মার্কস-এর সাবধান-বাণী: "শ্রমিকদের আমরা বলি: আপনাদের পনেরো, কুডি কি পঞ্চাশ বৎসর ধরে অন্তর্যুদ্ধ ও দেশে দেশে যুদ্ধের মধ্য দিযে এগোতে হবে, কারণ আপনাদের কাজ শুধু সমাজে পরস্পর-সম্পর্ক বদলে দেওযা নয। কাজ হল নিজেদেরও-সঙ্গে সঙ্গে বদলে ফেলা, যাতে নূতন সমাজ যথাযথভাবে পরিচালনা করার শক্তি সংগ্রহ সম্ভব হয।" এই যে প্রচণ্ড ঐতিহাসিক অগ্নিপরীক্ষা, তার অবসান ঘটতে এখনও বিলম্ব আছে বলেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন একদিকে যেমন চেকোশ্লোভাকিযার মতো দেশে তার স্বকীয সমাজবাদী বিকাশকে অভ্যর্থনা জানাবে তেমনই সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত সতর্ক থাকবে যাতে স্বকীযতার সুযুক্তিকে বিকৃত করে তারই ছদ্মবেশে এমন ব্যাপার কিছুতেই না ঘটে যাতে এখনও-অপরাজিত সমাজবাদবিরোধী শক্তিপুঞ্জ সুযোগ ও সহাযতা পেযে যায।

গণতন্ত্রের নামে যে বিরাট বুজ্‌রুকি চলে এসেছে, তাকে মার্কসবাদ জাহির করেছে বটে, কিন্তু মার্কসবাদ কখনও বলতে কুণ্ঠিত নয যে গণতন্ত্রের তত্ত্ব ও ধারণার মধ্যে রযেছে বহু কল্যাণকর উপাদান, এবং শোষণমুক্ত সমসমাজেই তার যথাযথ প্রযোগ ও বিকাশ সম্ভব। এজন্য বলা হয যে, গণতন্ত্রের প্রকৃত সার্থকতা সমাজবাদে, উভযের মধ্যে মূলগতভাবে আছে গভীর সামঞ্জস্য। এজন্যই চেকোশ্লোভাকিযার মতো সমাজবাদী বলে বিঘোষিত দেশে যদি সুচিন্তিত পদ্ধতিতে সমাজের মূলগত চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে, গণতন্ত্র প্রসারের ফলে মার্কসবাদের নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত হয তো তার চেযে- সুখের বিষয কি হতে

পাবে ? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হতে হয এজন্যই যে বিশেষ কবে চেকোশ্লোভাকিযাব মতো অবস্থিত দেশেই সমাজবাদেব যে ঘোব শত্রুবৃন্দ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুরূপী সেজে প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষ কৌশলে অনলস অভিযানে প্রবৃত্ত তাদেব গোচব ও অগোচব অনুপ্রবেশ বর্তমানে বেশ কিছু সময ধবে শুধু তো অনুমানেব বিষয নয, ববঞ্চ এই অপচেষ্টাব বহু স্পর্ধিত, অসংকোচ লক্ষণও স্পষ্ট। সতর্ক হতে হয এজন্যই যে, কোনো দেশেব কমিউনিস্ট আন্দোলন তাব নিজস্ব ও বিশিষ্ট পবিস্থিতি অনুযাযী কাজ কবতে থাকলেও কখনও আন্তর্জাতিক পবিপ্রেক্ষিত বিষযে উদাসীন হতে পাবে না। সতর্ক হতে হয এজন্যই যে সাম্রাজ্যবাদ জানে তাব বিশ্বব্যাপী শোষণ-শৃংখলেব দুর্বলতম গ্রন্থি ছিন্ন কবে ১৯১৭ সালেব নভেম্বব বিপ্লব সংঘটিত হযেছিল, আব তখন থেকে তাব লক্ষ্য কোথায কোন্ দুর্বল দোলাযমান প্রত্যঙ্গে সমাজবাদকে আঘাত কবে বন্ধ্র সৃষ্টি সম্ভব। এই বিপ্লবী সতর্কতাব প্রযোজনেই কিছুকাল পূর্বে ব্রাতিস্লাভা সম্মেলন বসেছিল, চেকোশ্লোভাকিযা, পূর্ব জার্মানী, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেবী, বুলগেবিযা এবং সোভিযেট ইউনিযনেব কমিউনিস্ট নেতাদেব একত্র আলোচনা ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণেব সংবাদে সমাজবাদেব শত্রুবা বিমর্ষ ও বন্ধুবা প্রফুল্ল হযেছিল। গত জানুযাবি এবং মে মাসে চেকোশ্লোভাকিযাব কমিউনিস্টবা গণতন্ত্রেব পথে অগ্রসব হওয়াব যে কার্যক্রম গ্রহণ কবেছিলেন, তাকে অভ্যর্থনা কবে, সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রেব ধুযা তুলে সমাজবাদকেই বিপন্ন কবে তোলাব এক গভীব কুটিল চক্রান্তকে সবাই মিলে, পবস্পবেব আশা আশংকা ভয ভাবনা সম্বন্ধে যুক্তি ও তথ্যেব বিচাব কবে পবাজিত কবাব খবব এসেছিল ব্রাতিস্লাভা থেকে।

পববর্তী ঘটনাব সবিস্তাব বিববণেব প্রযোজন নেই। কযেকদিন সোভিয়েট ইউনিযন, পোলাণ্ড, হাঙ্গেবী, পূর্ব জার্মানী, বুলগেবিযা, এই পাঁচ দেশেব ফৌজ চেকোশ্লোভাকিযায মোতাযেন বইল, তাবা বলল আমবা এসেছি বন্ধুভাবে, একই সামবিক চুক্তিব অংশীদাব হিসাবে, এবং সমাজবাদেব শত্রুবা সমূহ বিপদ ঘটাবাব জন্য প্রস্তুত এই সংবাদ এবং সাহায্যেব আবেদন চেকোশ্লোভাকিযাব সবকাব এবং কমিউনিস্ট পার্টিব একাংশেব কাছ থেকে পেযে। এবকম একটা অসাধাবণ ঘটনায সাবা পৃথিবীব লোক চমকে উঠল, চেকোশ্লোভাকিযাব অধিবাসীদেব মনোভাব সহজেই কল্পনীয। তবে এটাও লক্ষ কবাব বিষয যে, সোভিযেটেব এবং সমাজবাদেব ঘোবতম শত্রু যাবা তাবা সর্বদেশে দলমত নির্বিশেষে একত্র হয়ে উন্মত্তেব মতো বিষোদ্‌গাব কবতে লাগল, অথচ বিচলিত

হওযা সত্ত্বেও চেকোশ্লোভাকিযাব নেতাবা মস্কোতে আলোচনা কবলেন, সমঝোতা হল। পবিস্থিতি বিচাব নিযে পবস্পব মতপার্থক্য এবং হযতো বা কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য হলেও মিটমাট খুব কঠিন হয নি, প্রাগ শহবে বা অন্যত্র বহিবাগত সৈন্যদলেব বিপক্ষে অনাচাবেব অভিযোগ শোনা যায নি, ধবপাকড বিশেষ হয নি, হতাহতেব সংখ্যা যৎকিঞ্চিৎ কাবণ সংঘর্ষ প্রায ঘটেই নি। পবদেশী ফৌজেব প্রবেশ অবাঞ্ছিত ঘটনা সন্দেহ নেই কিন্তু প্রথম থেকেই বলা হযেছিল তাবা যত শীঘ্র সম্ভব ফিবে যাবে—একেবাবে অনিবার্য না হলে বন্ধু সমাজবাদী বাষ্ট্রেব পক্ষে এই অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা অবলম্বন ঘটত না জানানো হল।

আমাদেব দেশে প্রগতিবিবোধীবা এই ঘটনাসংঘাতে কিছুকাল ধবে উল্লাসে উল্লম্ফন কবে বেডিযেছে। হঠাৎ দেখা গেল চেকোশ্লোভাকিযাব সমাজব্যবস্থায "সংস্কাব" সম্বন্ধে প্রচণ্ড উৎসাহ দেখাচ্ছেন ইউনাইটেড্ নেশন্সেব নিবাপত্তা পবিষদে ব্রিটেন আব আমেবিকাব মুখপাত্র লর্ড ক্যাডোগান এবং জর্জ বল্—গুযাতেমালা, কিউবা, সান্তো দোমিনেঙ্গা, কঙ্গো, ভিযেৎনাম, মিশব এবং অন্যান্য বহু অঞ্চলে সামবিক হস্তক্ষেপেব পাণ্ডা যাবা ছিল এবং আছে, তাদেব কণ্ঠ মুখব হযে উঠল সোশালিস্ট চেকোশ্লোভাকিযাব প্রতি মমতায'। সেদেশে সমাজব্যবস্থা নিযে পবীক্ষানিবীক্ষায স্বাধীনতা সম্পর্কে আবেগে আপ্লুত বাণী শোনা গেল আমাদেব দেশে স্বতন্ত্র জনসংঘ পার্টিব নেতাদেব মুখ থেকে তো বটেই—সঙ্গে সঙ্গে সেই উত্তাল জগঝম্পে যোগ দিল নানা ছাপ আঁটা "সোশালিস্ট" পার্টিগুলি, যোগ দিল আবও অনেকে। দৈনিক "যুগান্তবে" (কলকাতা সংস্কবণ ৩০শে আগষ্ট ১৯৬৮) এক পাতায দেখা গেল পত্রিকাব বাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেব দিল্লী থেকে পাঠানো চিঠি—সমাজবাদেব প্রতি কোনো পক্ষপাত না থাকা সত্ত্বেও পার্লামেণ্টে আজব যে-সব দৃশ্য দেখা গিযেছিল তাব প্রকৃত নিবর্থকতাই তিনি লক্ষ কবেছিলেন। কিন্তু অপব এক পাতায দেখলাম কলকাতায প্রগতিশীল (এমনকি সাম্যবাদী দলেব সদস্যও তাঁবা কেউ কেউ) কযেকজন অধ্যাপকেব বিচলিত বিবৃতি—মস্কোতে সমঝোতা হওযাব পবও তাঁবা অত্যন্ত কষ্ট ও ক্ষুব্ধ মনে সোভিযেট এবং তাঁব সহযোগীদেব বিপক্ষে বায দিযে চলেছেন। লোকসভায দেখেছি কমিউনিস্ট পার্টিবই সদস্য দলেব শৃংখলাভঙ্গ কবে অযাচিত ভাবে ব্যক্তিগত ঘোষণা কবলেন সোভিযেটকে "গণতন্ত্রেব ঘাতক" বলে। দেখেছি কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ)-ব প্রধান প্রবক্তা বক্তৃতাব তোডে যেন মুক্তকচ্ছ হযে পডে সোভিযেটেব বিকদ্ধে এ ভাবে

বিষোদ্গাব কবলেন যে স্বতন্ত্র পার্টিব একজন প্রধান নেতা অভিনন্দন জানালেন এই বলেঃ "ওঁব মোদ্দা কথা হল এই যে গর্ভস্রাবটা (অর্থাৎ কিনা, সোভিয়েট) তাব নিজেব থুথুব মধ্যে ডুবতে থাকুক" ("Let the bastard stew in his own juice")। আশ্চর্য হতে হয়েছে এই দেখে যে শত্রুপক্ষেব প্রচাবযন্ত্র এখনও আমাদেবই মধ্যে এত বেশি বদ্‌মায়েসি চালিয়ে যেতে পাবে অথচ নিজেব অজ্ঞাতে আমবা সেই ফাঁদে পা দিয়ে ফেলি।

চেকোশ্লোভাকিয়াতে লেখক এবং বুদ্ধিজীবীদেব মধ্যে একাংশ সমাজবাদী ব্যবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট বীতবাগ হয়ে উঠেছিলেন, সন্দেহ নেই। সে-দেশেব সমাজবাদে গলদ অবশ্যই ছিল এবং চক্ষেব নিমিষে তা অন্তর্হিতও হবে না - আকাশেব চাঁদ সোশালিজম্ হাতে ধবিয়ে দেবে, এমন আশ্বাস ছিল বলে অবশ্য শুনি নি। কিন্তু সেজন্যই কি আমাদেব দেশে বিশেষ কবে বুদ্ধিজীবী মহলে (কমিউনিস্ট পার্টিব মধ্যেও) এই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল? আমাদেব দেশেব বুদ্ধিজীবীবা কি গত এক বৎসবেব 'Communist Affairs (bi-monthly, University of Southern California), 'East Europe' (monthly, published by Free Europe, New York), 'Problems of Communism' (bi-monthly, জগতেব সর্বত্র U S. I S কর্তৃক বিনামূল্যে বিতবিত) প্রভৃতি পত্রিকা কখনও দেখেন না, যে-পত্রিকাগুলিতে মোটা-টাকায-বেঁধে-বাখা "স্বাধীন পৃথিবীব" পণ্ডিতেবা অক্লান্ত উদ্যমে লিখে যাচ্ছেন? প্রথমোক্ত পত্রিকাব ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সংখ্যায (জানুযাবি-ফেব্রুযাবি ১৯৬৮) প্রথম প্রবন্ধেব আখ্যা হল "Cutting the Moorings in Czechoslovakia"—প্রথমেই উদ্ধৃতি বহুলখ্যাত পত্রিকা 'Literarni Listy' থেকে, লেখকসংঘেব একজন পাণ্ডা বলেছেন: "এতদিন বাষ্ট্র নাগবিকদেব দেখাশোনা কবেছে—ফল তো দেখতেই পাচ্ছি, এবাব আমি বলি একে উল্‌টে দেওযা হোক।" সমাজবাদী আমলে যা কিছু ঘটেছে তাকে ছোট কবে দেখা এবং পশ্চিমেব তথাকথিত "বিত্তবান্" ("affluent") সমাজেব দিকে লালাযিত চোখে তাকিয়ে থাকাব ভূবি ভূবি দৃষ্টান্ত দেবাব সময নেই। 'Literarni Listy' ছাড়া 'Mlada Fronta' 'Student', 'Reporter', 'Plamena' ইত্যাদি পত্রিকায সুপবিকল্পিত ভাবে চেকোশ্লোভাকিয়ায বিশ বৎসবেব গঠন কার্যকে মসীচিহ্নিত কবা হয়েছে, সোশালিস্ট দেশগুলি সম্বন্ধে বিষোদ্‌গাব চলেছে, ফ্যাশিস্ট অত্যাচাবেব স্মৃতি

যাতে ক্ষীণ হতে হতে মিলিযে যায তাব চেষ্টা হযেছে পশ্চিম জার্মানিব সঙ্গে সখ্যস্থাপনেব ভূমিকা হিসাবে। "গণতান্ত্রিক সোশালিজমেব" কথা বলতে থেকে ক্রমে কার্যত সমাজবাদী ব্যবস্থাব শত্রুতায নামতেও অনেকে কুণ্ঠিত হয নি। প্রেলিক্ নামে সেনাপতি ওযাবশ' সামবিক চুক্তিকে আক্রমণ কবেছেন এমন সময়ে যখন সাম্রাজ্যবাদীবা প্রকাশ্যে বলতে আবম্ভ কবেছিল চেকোশ্লোভাকিযায "সংস্কাবেব কথা বলা হচ্ছে সেখানে কমিউনিজমকে ধাপে ধাপে নামিযে ধ্বংস কবাব জন্য।" বেশ কিছু লেখক মিলে "ত্ব'হাজাব শব্দ" নামে যে বিবৃতি ছেডেছিলেন সেটি একটু মনোযোগ দিযে পডলেই বোঝা যায কত মাবাত্মক। অবশ্য যদি কেউ বলেন যে কমিউনিস্টদেব এত ভয কেন, স্বাধীন চিন্তায তাবা সন্ত্রস্ত কেন, ওদেশে ওখানকাব আবহাওযাব সঙ্গে মিলিযে কমিউনিজম্‌কে ঘষে মেজে "ভদ্রস্থ" কবা হোক না কেন, তাহলে সবিনযে কিন্তু দৃঢচিত্তে জবাব দিতে হবে যে ইতিহাসকে নিযে ছিনিমিনি খেলতে প্রস্তুত নই। বাংলাদেশে কযেকজন ইতিহাসেব অধ্যাপক বিক্ষুব্ধ বিবৃতি দিযেছেন—তাঁদেব স্মবণ কবতে হবে বিপ্লবেব মূল্য দিতে হয প্রচণ্ড, বিপ্লবকে টিকিযে বাখাব জন্যও মূল্য কম দিতে হয না, এবং বাব বাব বিপ্লব কিভাবে বিপন্ন হযেছে বিপথে গেছে তা জেনে আজ চেকোশ্লোভাকিযাব কিযৎসংখ্যক বিদগ্ধ জনেব মনোবঞ্জন কবতে গিযে সমগ্র সোশালিস্ট ব্যবস্থাকে নিদারুণ সংকটে ফেলে দেওযাব ঝক্কি নিতে বলা অনুচিত, অন্যায, প্রকৃত মনুষ্যত্বেব প্রতি অপবাধ।

ছ'টা দেশেব সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিযা লাগোযা হযে আছে—পশ্চিম জার্মানী, অষ্ট্রিযা, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেবী, পূর্ব জার্মানী, সোভিযেট ইউনিযন। মানচিত্রে দেখা যাবে দেশটা যেন ঢুকে বযেছে একটা কীলকেব মতো—মধ্য ইযোবোপে তাই বোহীমিযাব ভূগোলগত ও সামবিক গুরুত্ব এত বেশি। পশ্চিমী বণবিদেব মুখে তাই শোনা গেছে চেকোশ্লোভাকিযা হল ইযোবোপে সোশালিষ্ট সমাজ দেহেব "নবম তলপেট," যাকে ছিনিযে নিতে পাবলে মহা-লাভ। চেকোশ্লোভাকিযাকে ছিনিযে নিযে ইযোবোপে সোশালিষ্ট অগ্রগতিব গঙ্গা-যাত্রা ঘটানো, এবং তাবই ফলে সাবা পৃথিবীতে নযা-সাম্রাজ্যবাদ জেঁকে বসাব আযোজন—এজন্যই তো সোভিযেট এবং তাব সহযোগী পঞ্চ বাষ্ট্রেব এত বেশি ত্বশ্চিন্তা হযেছিল। বন্ধুদেশে সৈন্য বাহিনী পাঠানোব বিপদ কি তাদেব কাছে অজানা ছিল? তাবা কি জান্‌ত না যে শত্রুপক্ষ তো উদ্দাম দৌবাত্ম্যে নাম্‌বে।

আব সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদেব মধ্যেও অনেকে সমস্ত ব্যাপাবটা না বুঝে ,হযতো দোলাযমান অবস্থায কিম্বা দশচক্রে ভগবান ভূত হওযাব মতো সঙ্গদোষে কিছুকাল সমাজবাদেব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই অন্ধ হযে পড়বে ? তাবা কি জান্‌ত না যে নানা দেশে আবার কিছুকাল ধবে কমিউনিস্টদেব বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষ নূতন এক কুৎসাব জিগিব তুলে যথাসম্ভব ক্ষতি ঘটাবাব চেষ্টা কববে ? অবশ্যই তাবা জানত সঙ্গে সঙ্গে আবও জান্‌ত যে হযতো বা এব পবে পশ্চিমী শিবিবে প্রতিক্রিযা নূতন এক যুদ্ধ ইযোবোপে (এবং পবে দুনিযা জুড়ে) শুরু কবে দিতে পাবে। এ-সম্ভাবনা সম্বন্ধে ওযাকিবহাল হযেও তাবা সমাজবাদ বক্ষাব স্বার্থেই আপাতদৃষ্টিতে ক্লেশকব কর্তব্য পালন কবেছে। যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদেব অভিজ্ঞতাব কথা ভাবলেও তো শ্রদ্ধায মাথা নত কবতে হয—শুধুমাত্র চেকোশ্লো-ভাকিযাব মুক্তিব জন্য দেড়লক্ষ সোভিযেট সৈন্য প্রাণ দিযেছে। আব সমগ্র যুদ্ধে সোভিযেট দেশেব দু'কোটি লোককে জীবন বিসর্জন দিতে হযেছে। যে-সংখ্যা হল যুগোশ্লাভিযা বা রুমেনিযাব মতো দেশেব গোটা লোকসংখ্যাব সমান)। দূব থেকে যদি আমবা ভাবি যে দাযিত্বহীনেব মতো তাবা চেকো-শ্লোভাকিযায হস্তক্ষেপ কবেছে, "আগ্রাসন" দোষে তাবা দুষ্ট, তো বলব একটু মাত্রাজ্ঞান আমাদেব মনে ফিবে আসুক, পশ্চিমী প্রচাব যন্ত্র যেন এত সহজে আমাদেব পথভ্রষ্ট না কবতে পাবে।

দুঃখ এবং লজ্জা হয দেখে যে, বিলাতেব "New Statesman"-এব মতো 'অভিজাত' পত্রিকা স্বভাবসিদ্ধ অহমিকা নিযে লিখছে এবং তাবই যেন প্রতিধ্বনি আমাদেব অনেকেব মুখে শুনছি: "It is no longer worth hoping that any humanised Marxism can come out of Eastern Europe" (সম্পাদকীয ২৩।৮।৬৮)। পূর্ব ইযোবোপে মার্কস্‌বাদ নাকি অমানুষিক , তাকে "মানবিক" রূপ দিতে পাবে বুঝি শুধু পশ্চিম ইযো-বোপ। চেকোশ্লোভাকিযা নাকি এই অমানুষিকতাব বাঁধন ছিঁড়ে বেবিযে আসতে চেযেও পাবল না। এই অহঙ্কাব সাজে বটে ব্রিটেনেব—যে দেশ সম্বন্ধে কার্ল্‌ মার্ক্‌স্‌ স্বযং শেষ জীবনেও কত আশা পোষণ কবেছিলেন, অথচ যে-দেশে বিপ্লবেব বাবতা শোনা গেছে ম্যাক্‌ডনাল্‌ড্‌ অ্যাট্‌লি কোম্পানীব মুখ থেকে। এই অহঙ্কাব সাজে বটে বিপ্লবেব প্রাক্তন পীঠভূমি ফ্রান্সেব—যে-ফ্রান্সে কযেক মাস পূর্বে বিপ্লব যেন ববীন্দ্রনাথেব লেখা "বাজাব কুমাব"-এব মতো দ্বাব প্রান্তে এসেও চলে যেতে বাধ্য হল। এ-হেন নীচাশয অহঙ্কাব

যাদেব তাবা কেমন কবে বুঝবে পশ্চিম ইযোবোপ সম্বন্ধে মার্ক্‌স্‌ এব সাবধান বাণী—তাঁব ধাবণা ছিল যে সমাজবাদী বিপ্লব প্রথমে ঘটবে ইযোবোপে (এ জন্য তাঁকে দোষ দেওযা বাতুলতা। ফলিত জ্যোতিষেব কাববাব মার্ক্‌স্‌ কোনদিন খোলেননি)। কিন্তু তিনি জোব কবে বলেছিলেন বিপ্লব এশিযা এবং অন্যত্র পবিব্যাপ্ত না হলে "এই সংকীর্ণ প্রান্তে" ("in this little corner" that is Europe) তা সহজেই নিষ্পিষ্ট হবে। ফ্রান্স কিংবা ইতালীব বহু কমিউনিস্ট বোধ কবি স্বপ্ন দেখছেন যে নিছক ভোটেব জোবে সে সব দেশে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত কবা যাবে। সুতবাং চেকোশ্লোভাকিযা নিযে এই ঝামেলাটা এডানো খুবই উচিত ছিল। তাঁদেব হিসাবে কিছুটা গণ্ডগোল বযে গেছে। ভোটেব জোবে তাঁবা কতদূব প্রকৃত প্রস্তাবে যেতে পাবেন দেখা যাক্‌। কিন্তু ইতিমধ্যে জগৎজোডা নযা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তেব সাম্‌নে সোশালিষ্ট ব্যবস্থা দুর্বল হযে পডলে তাঁবা থাকবেন কোথায? এ-সব জিনিষ মনে থাকে না বলেই তো ফেব্রুযাবী মাসে বুদাপেস্ত কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনে রুমেনিযায পক্ষ থেকে বলা হল যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওযা হোক্‌ ইস্‌-বাযেলেব দল ভাঙা "কমিউনিস্ট পার্টি"-কে, যদিও তাবা নির্লজ্জভাবে আবব দেশেব বিপক্ষে নযা-সাম্রাজ্যবাদেব নগ্ন হাতিযাব রূপে ইস্‌বাযেলী আক্রমণেব পূর্ণ সমর্থক। বোধ কবি "পশ্চিমী" প্রভাবে রুমেনিযাব স্মৃতিভ্রংশ হযেছিল—মধ্যপ্রাচ্যে নযা-সাম্রাজ্যবাদীব নবখাদক ভূমিকা পর্যন্ত তখন বিস্মৃত!

আমাদেব মনে ভাবসাম্য ফিবে এলে সহজেই বোঝা যাবে যে চেকো-শ্লোভাকিযাব সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বহুলাংশে বিস্বাদ ও দুঃখকব হলেও তা অত্যন্ত জটিল এক পবিস্থিতিতে অনিবার্য হযে উঠেছিল। সোভিযেট এবং সর্বদেশেব কমিউনিস্ট আন্দোলন বহু স্থলে ভুল কবেছে। ভবিষ্যতেও অবশ্য কববে—ভুল না কবাটাই তো একবকম অমানুষিক ব্যাপাব—কিন্তু শত্রু পক্ষেব উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম যখন আমাদেব চোখেব সাম্‌নে এত জলন্ত হযে বযেছে, তখন বিপ্লব সংবক্ষণেব স্বার্থে-অপ্রিয কর্তব্য পালিত হযেছে বলে ম্রিযমান্‌ হযে পডাব কোন কাবণ নেই। আমবা কি জানি না, কত অগ্নি পবীক্ষাব মধ্যে দিযে মানুষকে এগিযে যেতে হবে—দুটো বিশ্বযুদ্ধ হযে গেছে আব পৃথিবীব এক-তৃতীযাংশ সোশালিষ্ট, সুতবাং কেল্লা তো প্রায ফতে, এখন ভাবতে বসি কেমন কবে? "গণতন্ত্র" আব "উদাবনীতিব" মুখোস্‌ পবে ইতিহাসেব চাকাকে পিছনে টেনে নেওযাব চেষ্টা কি কষ্ট কল্পনা? ভিযেৎনামেব বীব কাহিনী

থেকে শিক্ষা নেই? ইস্‌বায়েল আব পশ্চিম জার্মানীব বিশিষ্ট অস্তিত্ব কি একপ্রকাব মাযা? দক্ষিণ-আমেবিকাব সংগ্রাম আকুতি, ভাবতবর্ষেব মতো দেশেব খণ্ডিত স্বাধীনতাব অসার্থকতাব বেদনা, আফ্রিকাব অভ্যুদয এবং বঞ্চনা —সব মিলে আজকেব যে জগৎ, তাকে যেতে হবে বিপ্লবেব পথে, এ-কাজ কি স্বল্প, এ কি সহজ, এ কি জটিলতা-মুক্ত, এ কি বুদ্ধিজীবী আবেগ কর্তৃক নিযন্ত্রণ সাধ্য? সাধনাব কথা বলে গেছেন ঋষিবা কিন্তু বিপ্লবেব পথ কি তাব চেযে কম বন্ধুব, বেশি সুগম? তাই মনে পডছে কঠোপনিষদেব শ্লোক যা অবশ্যই বিপ্লব সম্বন্ধে প্রযোজ্য:

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য ববান্নিবোধত।
ক্ষুবস্য ধাবা নিশিতাদুবত্যযা, দুর্গংপথস্তৎ কবযো বদন্তি॥

On the one flank, there are sense of desire of unendurable vindication, and on the other flank an incomparably significant intrepidness or valour or chivalry of the Mewar clan or state finds expression or is visible

মার্কসবাদ ও যুক্তফ্রণ্টের শিক্ষা

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

আমাদের দেশের একটি অতি-বিপ্লবী মহল থেকে হামেশাই প্রচার করা হয় যে যুক্তফ্রন্ট বা বিভিন্ন বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্য গঠনের নীতি নাকি মার্কসবাদের শিক্ষার বিরোধী। তাঁদের মতে এর দ্বারা নাকি কমিউনিস্ট পার্টির তথা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকাকে নাচক করে দেওয়া হয়। অথচ বাস্তব সত্য হলো এই যে, যুক্তফ্রণ্টের নীতি ও শিক্ষা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতালব্ধ সম্পদগুলির মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করে রয়েছে।

মার্কস এবং এঙ্গেলসের শিক্ষা—মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের জীবনকালেই উক্ত নীতির প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেন। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তেই যুক্তফ্রণ্টের নীতি সম্বন্ধে মার্কসীয় শিক্ষার অঙ্কুরগুলি দেখতে পাওয়া যায়। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র চতুর্থ অধ্যায়টিতে তখনকার দিনের বিরোধীদলগুলির সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্কের কথা আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী কমিউনিস্টরা এই বিষয়ে কি ভূমিকা নেবে তারও একটা সংক্ষিপ্ত রূপ সেখানে পাওয়া যায়। যথা, ফ্রান্সে রক্ষণশীল ও র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা সোশাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করবে। অবশ্য সোশাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে প্রথম ফরাসী বিপ্লবের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যেসব বুলি ও ভ্রান্তধারণা প্রচলিত আছে সেগুলি সম্বন্ধে সমালোচনার অধিকার বজায় রেখেই তা করবে। পোলাণ্ডে যে দলটি—জাতীয় মুক্তির প্রাথমিক শর্ত হিসেবে কৃষি-বিপ্লবের কথা বলে তাদের সমর্থন করা হবে।

জার্মানিতে বুর্জোয়াশ্রেণী যে সব ক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্র সামন্তবাদ ও পাতি-বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক কায়দায় সংগ্রাম করবে সেক্ষেত্রে কমিউনিস্টরা বুর্জোয়াদের সঙ্গে একত্রে চলবে। তবে বুর্জোয়াদের সঙ্গে শ্রমিকদের শ্রেণীদ্বন্দ্বের সত্য সম্বন্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে সচেতন করে তোলার রূপটি—এক মুহূর্তের জন্যও উপেক্ষা করা চলবে না। প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী-গুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে

সঙ্গে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করবে (সর্বজনীন ভোটাধিকার, গণতান্ত্রিক সংবিধান ও সংসদীয় গণতন্ত্র—লেখক) সেগুলিকে যাতে শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে পারে সেজন্য আগে থেকেই প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।

উক্ত অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে মোটের উপর কমিউনিস্টরা সর্বত্র প্রচলিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি-বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সমর্থন করে। এই সমস্ত আন্দোলনেই তারা সম্পত্তির প্রশ্নটিকে সামনে তুলে ধরে।

১৮৫০ সালের মার্চ মাসে লণ্ডনে 'কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি সম্ভাষণ' প্রসঙ্গেও মার্কস তৎকালীন জার্মানীতে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধ কার্যকলাপের কৌশল এবং তার চরিত্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন।

বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে কৃষক এবং শহরের ক্ষুদে উৎপাদকদের নিজের দিকে টেনে আনার প্রয়োজনীয়তার কথা মার্কসের সুবিখ্যাত 'দি ক্লাস স্ট্রাগলস ইন ফ্রান্স' নামক বইটিতে এবং এঙ্গেলস লিখিত ভূমিকায় বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। সমাজের মধ্যবর্তী বা পাতি-বুর্জোয়া অংশ অর্থাৎ কৃষক এবং শহরের ক্ষুদে-উৎপাদকদের সঙ্গে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার কাজের যে দ্বৈত-চরিত্রের কথা অর্থাৎ, যুগপৎ ঐক্য ও সংগ্রাম সাধারণ শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্য এবং মিত্রদের দোদুল্যমানতা, তাদের উপর নানা কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণার প্রভাব ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। উত্তরকালে সংযুক্তফ্রণ্টের শিক্ষার পরিণত রূপ গ্রহণ করে তারও পূর্বাভাষ·পাওয়া যায় মার্কস লিখিত "এইটিনৃথ্ ব্রুমেয়ার অফ লুই বোনাপার্ট" নামক বইটিতে।

মার্কস সংযুক্তফ্রণ্টের শ্রেণী-ভিত্তির চরিত্রটিকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউনের পরাজয়ের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে। তিনি বলেন যে শ্রমিকশ্রেণী যখন একাকী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামে তখন তার পরাজয় অনিবার্য, কিন্তু সে যদি কৃষকদের মিত্ররূপে নিজের দিকে টেনে আনতে সমর্থ হয় তখন তার জয় কেউ ঠেকাতে পারে না। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর বৈপ্লবিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে এঙ্গেলসও বিশদ আলোচনা করেছেন, যথা—"পেজ্যাণ্ট ওয়ার ইন জার্মানী" নামক বইটির ভূমিকায়।

লেনিনেব শিক্ষা

মার্কস-এঙ্গেলসেব পব এই প্রশ্নটিকে আবো এগিযে নিযে যান লেনিন ১৯০৫ সালে লিখিত "টু ট্যাকটিকস অফ সোশাল ডেমোক্রাসি ইন ডেমোক্রাটিক বেভোলিউশন" নামক বইটিতে। এখানে তিনি বুর্জোযা গণতান্ত্রিক বিপ্লবেব পবিচালিকা শক্তি হিসাবে শ্রমিক ও কৃষক মৈত্রীব ভূমিকাকে বিশ্লেষণ কবে দেখান। ঐ বিপ্লবকে সাফল্যেব সঙ্গে সম্পূর্ণ কবাব হাতিযাব হিসাবে শ্রমিক ও কৃষকেব বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনাযকত্বেব তত্ত্বটিকেও তিনি রূপাযিত কবেন।

উক্ত বইটিতেই সংযুক্তফ্রণ্ট সম্বন্ধে আবো দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওযা যায। একটি হল বিপ্লবেব বিভিন্ন স্তবে শ্রেণী-মৈত্রীব চবিত্রেব পার্থক্য। অপবটি হল সাধাবণ শত্রুব বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যাপক শক্তি-সমাবেশ গড়ে তোলাব উদ্দেশ্যে, যে সব মিত্র অত্যন্ত অস্থাযী হওযাব সম্ভাবনা তাদেবও স্বপক্ষে টানাব চেষ্টা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রুশিযায উদাবনৈতিক বুর্জোযা শ্রেণী স্বৈবতন্ত্রেব বিবোধী হওযা সত্ত্বেও তাদেব চবিত্র ও ভূমিকা দুইই ছিল বিপ্লব-বিবোধী। এই শ্রেণীব প্রভাব থেকে কৃষকদেব মুক্ত কবা ছিল শ্রমিক-কৃষকমৈত্রী প্রতিষ্ঠাব পক্ষে অপবিহার্য। তবুও লেনিন স্বৈবতন্ত্রেব বিরুদ্ধে উদাবনৈতিক বুর্জোযাদেব সঙ্গে যৌথভাবে আঘাত হানাব আওযাজ দিযেছিলেন। তিনি জানতেন যে, যৌথভাবে আঘাত হানাব মেযাদ খুব বেশিদিন টিকবে না এবং সেই সময়েও অস্থাযী মিত্রদেব আচবণ সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি বাখা প্রযোজন হবে। তবু তিনি বলেন যে, ঐরূপ কৌশল গ্রহণ না কবা খুবই ভুল হত। তিনি আবও বলেন যে, বর্তমান মুহূর্তে যে কর্তব্যগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা যত স্বল্পকাল স্থাযী হোক না কেন, সে বিষযে অবহেলা কবা চলে না।

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী প্রতিষ্ঠা এবং সাধাবণ শত্রুব বিরুদ্ধে ব্যাপকতম শক্তি-সমাবেশেব কাজটি খুব জটিল ও কঠিন। সেই প্রসঙ্গেই বিভিন্ন বাজনৈতিক দলেব সঙ্গে সম্পর্কেব প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন কবে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবেব স্তবে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক ও শ্রমজীবী জনগণেব অন্যান্য অংশেব উপবে বিভিন্ন বাজনৈতিক দলেব প্রভাব থাকে। তাদেব দৃষ্টিকোণেব মধ্যেও পার্থক্য থাকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই। মার্কসীয শিক্ষাব সাধাবণ সূত্র অনুসাবে বলা হয যে, বিভিন্ন দল বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীব প্রতিনিধিত্ব কবে। এই বিষয়ে

বিচারের মাপকাঠি হল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কর্মসূচী ও কার্যকলাপ। কিন্তু বাস্তব জীবন ত কোনো বাঁধা ছক অনুসরণ করে না। কোন দল মূলত একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করলেও বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের উপরে তার রাজনৈতিক-সাংগঠনিক প্রভাব থাকতে পারে। শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন অংশের চেতনা-স্তরের পার্থক্য তথা অ-সম বিকাশের দরুণই এরকমটা ঘটে থাকে। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী অংশ অর্থাৎ তার বিপ্লবী পার্টিকে নিজ শ্রেণীর উপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং শ্রেণী-মৈত্রী রচনা এই উভয় কর্তব্য পূরণের জন্যই এক সুদীর্ঘ জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগোতে হয়। জনগণের বিভিন্ন অংশের উপর যে সব রাজনৈতিক দলের প্রভাব আছে তাদের অস্তিত্ব তথা গণ-প্রভাবকে অস্বীকার করার চেষ্টা নেহাৎ অ-বাস্তব এবং অ-দূরদর্শিতার পরিচয় হয়ে পড়ে। তেমনি, সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে যে সব দলের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব, সে কাজে উপেক্ষা সংগ্রামের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে।

"টু ট্যাকটিকস" নামক বইটিতে লেনিন শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী এবং শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি কোথাও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে ঐ মৈত্রীর পূর্বশর্তরূপে উপস্থিত করেন নি। তার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে, তিনি শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব চান নি বা তার ভূমিকাকে অবহেলা করেছেন। লেনিন জানতেন যে, সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন অংশের শ্রেণী-চেতনা যত পরিষ্কার হয়ে উঠবে সেই পরিমাণে তারা শ্রমিকশ্রেণী এবং তার পার্টির নেতৃত্ব মেনে নেবে। লেনিন জানতেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কারুর খেয়ালখুশি বা ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার উপরে নির্ভর করে না। সেজন্য প্রয়োজন হয় সহিষ্ণু ধৈর্যশীল, পরিশ্রমী প্রস্তুতির। তাই উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীকে উদ্যোগী হয়ে কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন ও সেই শক্তির সাহায্যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীকে সমগ্র জনগণের পুরোভাগে থেকে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করতে হবে এবং সমস্ত শোষিত ও শ্রমজীবী মানুষের পুরোভাগে থেকে এগিয়ে যেতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে।

সংযুক্তফ্রণ্ট নীতির ভিত্তিগুলিকে আরো বিকশিত হতে দেখা যায়

লেনিনের "লেফটউইং কমিউনিজম অ্যান-ইনফ্যাণ্টাইল ডিজঅর্ডার" নামক বইটিতে। এখানে সংযুক্তফ্রণ্ট কথাটি ব্যবহৃত হয় নি বটে, কিন্তু রুশবিপ্লবের শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য রাজনৈতিকদলের সঙ্গে কিরূপ সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বামপন্থী অংশ তখন সঙ্কীর্ণতাবাদী ব্যাধিতে ভুগছিল। তাদের ঐ সঙ্কীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম অভিব্যক্তি ছিল অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিকদল সম্বন্ধে ছুঁৎমার্গী মনোভাব। তারই কঠোর সমালোচনা প্রসঙ্গে লেনিন রুশিয়ার অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে দেখান যে, বলশেভিকদের পক্ষে নিজেদের মূলনীতিতে অবিচল থেকেও বিভিন্ন সময়ে কি ভাবে বিভিন্ন দলের সঙ্গে "আপোস" বা চুক্তি করতে হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, এই সব আপোসের দ্বারা বিপ্লবের অগ্রগতিতে সাহায্যই হয়েছে।

লেনিনের উপরোক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে কমিউনিস্টদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় যে, তাঁরা যেন সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে চলেন এবং সোশাল-ডেমোক্রাট নেতৃত্বের প্রভাবাধীন শ্রমিক-জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত ফ্রণ্ট গঠনে উদ্যোগী হন। অবশ্য তখনকার পরিস্থিতিতে জোর দেওয়া হয়েছিল প্রধানত নীচে থেকে সংযুক্তফ্রণ্ট গড়ে তোলার ওপর। সেই সংযুক্তফ্রণ্ট নীতির লক্ষ্য ছিল সোশাল-ডেমোক্রাটদের প্রভাবাধীন শ্রমিক জনগণকে সংস্কারবাদ ও পার্লামেণ্টারি মোহ থেকে মুক্ত করে বিপ্লবের পতাকার নীচে টেনে আনা। সংযুক্ত ফ্রণ্টগঠনের জন্য সংগ্রামকে তখন একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী রূপে নেওয়া হয়েছিল।

ফ্যাসি-বিরোধী সংযুক্ত ফ্রণ্ট —সংযুক্তফ্রণ্টের তত্ত্বটি পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়ের পটভূমিতে এবং বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের আশু কর্মসূচীতে তা কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যে পরিণত হয়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে যখন সংযুক্তফ্রণ্টের নীতি রূপায়িত হয় সেই সময়ের পরিস্থিতি ছিল পূর্ববর্তী পরিস্থিতির তুলনায় গুণগতভাবে ভিন্ন। ফ্যাসিবাদ (যাকে একচেটিয়াপুঁজির সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্ব সংজ্ঞা দেওয়া হয়) তখন প্রতিবিপ্লবের অত্যন্ত হিংস্র পাণ্টা আক্রমণ রূপে শ্রমিক ও সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তা পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রকে ধ্বংস এবং

শ্রমিক ও জনসাধাবণেব অন্যান্য অংশেব সুদীর্ঘ কালেব সংগ্রামে অর্জিত গণ-তান্ত্রিক অধিকাবেব শেষ চিহ্নকে পর্যন্ত মুছে দিচ্ছে। এরূপ পবিস্থিতিতে সমগ্র শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনেব সামনে আত্মবক্ষা অর্থাৎ ফ্যাসিবাদেব আক্র-মণকে ঠেকাবাব প্রশ্নই হযে উঠেছে আশু জরুবী প্রশ্ন।

ইতালীতে ফ্যাসিবাদেব অভ্যুদযেব অভিজ্ঞতা থেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন যথোচিত শিক্ষা নিতে সমর্থ হযনি। কিন্তু নাৎসী জার্মানীব মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতাব পবে আব আত্মসন্তুষ্টিব অবকাশ বইল না। এই পবিস্থিতিতে, ফ্যাসিস্ট কবলিত দেশে বাস্তবেব অমোঘ তাগিদই সমস্ত ফ্যাসি-বিবোধী শক্তিকে সংযুক্ত কার্যকলাপেব পথ নিতে বাধ্য কবল। আব যে সব দেশে তখনও ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায প্রতিষ্ঠিত হযনি সেখানে পার্লামেন্টাবি গণতন্ত্র এবং গণ-তান্ত্রিক অধিকাব বক্ষাব দাযিত্ব এসে পডল শ্রমিক শ্রেণীব উপবে। প্রথমে ফ্যাসিজমকে ঠেকাতে হবে, তাবপব কবতে হবে পাল্টা-আক্রমণেব প্রস্তুতি। সেজন্য চাই শ্রমিকশ্রেণীব সুদৃঢ় ঐক্যেব ভিত্তিতে জনগণেব ব্যাপকতম ঐক্য। সেই ঐক্য গডে তোলাব অপবিহার্য হাতিযাব হিসাবেই দেখা দিল সমস্ত ফ্যাসি-বিবোধী দল, গণ-সংগঠন ও সংস্থাব ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গডে তোলাব প্রযোজন।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকেব সপ্তম কংগ্রেসে সংযুক্তফ্রন্ট নীতিব চবিত্র, কর্ম-কৌশল এবং পবিপ্রেক্ষিতকে সুস্পষ্ট ভাবে রূপাযিত কবেন জর্জি দিমিত্রফ।

সেদিন ফ্যাসিবাদেব বিরুদ্ধে প্রধানতম হাতিযাব হিসাবে শ্রমিক-আন্দো-লনেব ঐক্য অর্থাৎ সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি, প্রধানত এই দুই পার্টিব প্রভাবাধীন শ্রমিকদেব ঐক্যেব প্রতি গুরুত্ব আবোপ কবা হয়। এই ঐক্যকে যেমন নিচেব তলা অর্থাৎ কাবখানা ও স্থানীয় ভিত্তিতে সমস্ত শ্রমিকেব সংগ্রামী মোর্চা হিসাবে গডে তোলাব চেষ্টা কবতে হবে তেমনি চেষ্টা কবতে হবে উপবোক্ত দুই পার্টিব উপবতলাব নেতৃত্বেব মধ্যে যৌথ কার্যক্রমেব চুক্তি সম্পাদনেব জন্য। সপ্তম কংগ্রেসেব আগেব যুগে অনুসৃত নীতিব সঙ্গে এটি একটি বড পার্থক্য।

সপ্তম কংগ্রেসে দিমিত্রফেব বিপোর্ট ও প্রস্তাবে সুস্পষ্ট ভাষায ঘোষণা কবা হয যে, কমিউনিস্টবা শ্রমিক-ঐক্যেব প্রশ্নকে একটি বাজনৈতিক মারপ্যাঁচ হিসাবে দেখে না। মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ফ্যাসি-বিবোধী সংগ্রামের ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং একান্ত কাম্য। দিমিত্রফ বলেন

যে, পুঁজিবাদের ধ্বংস ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আগে তার ক্ষেত্র প্রস্তুতি হিসাবে অত্যাবশ্যক প্রয়োজন হল (পার্টি-আনুগত্য অথবা সংগঠন নির্বিশেষে) শ্রমিক শ্রেণীর সমস্ত অংশের কর্মের ঐক্য (unity in action) প্রতিষ্ঠা।

সংযুক্তফ্রণ্টের মূল প্রাণবস্তু (basic content) কি এই প্রশ্নের উত্তরে দিমিত্রফ বলেন যে শ্রমিকশ্রেণীর আশু কর্তব্য হল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ-রক্ষা এবং ফ্যাসিবাদের আক্রমণকে প্রতিহত করা। কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে ঐক্যের জন্য একটিই মাত্র শর্ত উপস্থিত করা হয়। শর্তটি এত প্রাথমিক যে সমস্ত ধরনের শ্রমিকের পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ, সেই কর্মের ঐক্য পরিচালিত হবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, পুঁজির আক্রমণ ও যুদ্ধের আশঙ্কার বিরুদ্ধে, এককথায় শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে।

সংযুক্তফ্রণ্টের মূল ভিত্তি সোশাল-ডেমোক্রাটিক ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রভা-বাধীন শ্রমিকদের ঐক্য হলেও তার পরিধি ঐটুকুতে সীমাবদ্ধ নয়। শ্রমিকদের যে অংশ কোন দলের অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা অসংগঠিত ও পশ্চাৎপদ, তারাই সংখ্যায় বেশি। সুতরাং তাদের সংযুক্তফ্রণ্ট আন্দোলনে টেনে আনার উপরে বিশেষ জোর দিতে হবে।

ফ্যাসি-বিরোধী গণ-ফ্রণ্ট

শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য তথা সংযুক্তফ্রণ্টকে দেখা হয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বৃহত্তম গণ-ফ্রণ্টের অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে শ্রমজীবী কৃষক ও শহরের পাতি-বুর্জোয়াদের মৈত্রীর ভিত্তি-রূপে। কৃষক ও পাতি বুর্জোয়া জনসাধারণের উপরে যে সব রাজনৈতিক দলের বা সংগঠনের প্রভাব ছিল তাদের সঙ্গে ঐক্যের প্রশ্নটিও স্বভাবতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এই ধরনের অধিকাংশ পার্টি বা সংগঠনের উপর বুর্জোয়াদের এক অংশের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। একই দল বা সংগঠনের সভ্যদের মধ্যে ধনী কৃষক ও ভূমিহীন কৃষক, বড ব্যবসায়ী ও ছোট দোকানদার পাশাপাশি অবস্থান করত। দলের কর্তৃত্ব ছিল বুর্জোয়াদের হাতে কিন্তু অধিকাংশ সাধারণ সভ্য সে সম্বন্ধে বা দলের মূল চরিত্র সম্বন্ধে অবহিত ছিল না। এই প্রসঙ্গে দিমিত্রফ বলেন যে, দলের নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের হাতে থাকলেও বিশেষ পরিস্থিতিতে ঐ সব দল বা সংগঠন অথবা তাদের একাংশকে ফ্যাসি-বিরোধী গণ-ফ্রণ্টে টেনে আনার জন্য বিশেষ চেষ্টা

কবতে হবে। ঐক্যেব ভিত্তি হবে নিম্নতম কর্মস্থচী। দলগত বা সংগঠনগতভাবে আনুষ্ঠানিক ঐক্য হোক বা না হোক, তাদেব প্রভাবাধীন জনগণকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে টেনে আনাব জন্য নিববচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিযে যেতে হবে।

ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাব প্রশ্ন

সংযুক্তফ্রন্ট তথা গণফ্রন্ট মানেই সংগ্রাম অর্থাৎ সংগ্রামেব মধ্যে তাব প্রতিষ্ঠা, নিববচ্ছিন্ন সংগ্রামেব মাধ্যমে তাব শক্তি বৃদ্ধি এবং অগ্রগতি হবে। একটি সর্বনিম্ন কর্মস্থচীব ভিত্তিতে ঐক্য দিযে যা শুরু হবে তাকে ক্রমশঃ এগিযে নিযে যেতে হবে ফ্যাসিবাদেব বিরুদ্ধে আত্মবক্ষা থেকে পাল্টা-আক্রমণেব দ্বাবা তাকে পর্যুদস্ত কবাব অভিযানে।

সেই অভিযানেবই একটি পর্যাযে, গণ-সংগ্রামেব তবঙ্গশীর্ষে পার্লামেণ্টে সংখ্যা-গবিষ্ঠতা অর্জন এবং গণফ্রণ্টেব গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাব পবিপ্রেক্ষিত উপস্থিত কবা হয।

এইরূপ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাব বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দেবে বাজনৈতিক সঙ্কটেব পবিস্থিতিতে। দিমিত্রফ এই গভর্ণমেণ্টেব চবিত্রেব কথা পবিষ্কাব ভাবেই ব্যাখ্যা কবেন। এই গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবে ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত কবাব আশু কর্মস্থচীব ভিত্তিতে। এই গভর্ণমেণ্ট শ্রমিক-বিপ্লবেব বিজযেব ফলে প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্ট নয বা শ্রমিক-শ্রেণীব একনাযকত্বও নয। তা হবে মুখ্যত ফ্যাসিবাদ ও প্রতিক্রিযাব বিরুদ্ধে সংগ্রামেব হাতিযাব।

ঐ আওযাজ দেওযাব সময কমিউনিস্টবা নিশ্চযই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও শ্রমিকশ্রেণীব একনাযকত্বেব লক্ষ্য বিসর্জন দেয নি। কিন্তু তাবা জানত যে, শ্রমিকশ্রেণীব বৃহত্তম অংশ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদেব বাস্তব অভিজ্ঞতাব মাধ্যমে সেই লক্ষ্যকে গ্রহণ না কবছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই লক্ষ্য জোব কবে তাদেব উপব চাপিযে দেওযা সম্ভব নয। ফ্যাসিবাদেব বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামেব আগুনে পুড়ে তাবা সেই অভিজ্ঞতা অর্জন কববে।

এই প্রসঙ্গে অতি বামপন্থীদেব একটি অতি-পবিচিত ভুলেব সমালোচনা কবে দিমিত্রফ বলেন যে তাবা (অতিবামেবা) ভাবে যে, বাজনৈতিক সঙ্কটেব পবিস্থিতিতে সশস্ত্র বিপ্লবে'ব ডাক দিলেই জনসাধাবণ বুঝি তাতে সাড়া দেবে আব এক লাফে শ্রমিকশ্রেণীব বিপ্লবী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হযে যাবে। জন-সাধাবণ শ্রমিকশ্রেণীব একনাযকত্বেব আওযাজ গ্রহণ কবাব আগে তাদেব বাজ-নৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন কবা প্রযোজন। সেইজন্যই শ্রমিক-একনাযকত্বে

পৌঁছাবাব আগে কতকগুলি অন্তর্বর্তী রূপেব মধ্য দিযে যেতে হতে পাবে। লেনিন এই ধবনেব অন্তর্বর্তী রূপ অনুসন্ধানেব উপব বিশেষ গুরুত্ব আবোপ কবেছিলেন।

কোন কোন দেশে সংযুক্তফ্রন্ট অথবা গণ-ফ্রণ্টেব গভর্ণমেণ্ট এইবকম একটি অন্তর্বর্তী রূপ হিসাবে কাজ কবতে পাবে। সেইগ ভর্ণমেণ্ট বুর্জোযা শ্রেণীব আধিপত্যকে বিনষ্ট এবং ফ্যাসিস্ট প্রতিবিপ্লবেব সম্ভাবনাব মূল উচ্ছেদ কবতে সমর্থ হবেনা বটে। কিন্তু যদি তা ফ্যাসিবাদেব বিরুদ্ধে সংগ্রামেব সুসঙ্গত হাতিযাব হিসাবে কাজ কবে তবে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষকে সেই চবম-লক্ষ্যেব দিকে অনেকদূব এগিযে যেতে সাহায্য কববে।

দুই ধবনেব বিচ্যুতি সম্পর্কে হুঁশিযাবী

সংযুক্তফ্রণ্ট গভর্ণমেণ্টেব পবিপ্রেক্ষিত উপস্থিত কবতে গিযে দিমিত্রফ যুগপৎ দক্ষিণ ও বাম বিচ্যুতিব বিরুদ্ধে হুঁশিযাবী দেন। একটা স্বাভাবিক পবিস্থিতিতে অর্থাৎ বাজনৈতিক সঙ্কটেব অস্তিত্ব ছাড়াই কমিউনিস্ট পার্টিব সমর্থনে শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট গঠন কবা যাবে এই ধবনেব চিন্তা হল দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদেব পবিচয। শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণেব অন্যান্য অংশেব ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ঐরূপ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাব কথাও একই বিচ্যুতিব অভিব্যক্তি। তাব ফলে কোথাও কোথাও দেখা দিযেছিল সোশাল-ডেমোক্রাটদেব সঙ্গে নীতিবর্জিতভাবে কোযালিশন গঠনেব চিন্তা। অন্যদিকে অতি-বামপন্থীদেব মতে একমাত্র সশস্ত্র অভ্যুত্থানেব দ্বাবা বুর্জোযা শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত কবা ছাড়া ঐরূপ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয। তাবা ত' সোশাল-ডেমোক্রাটদেব সঙ্গে যে কোন ধবনেব কোযালিশনকেই প্রতিক্রিযাশীল আখ্যা দিত। ফ্যাসিজমেব বিপদ এবং শ্রমিকশ্রেণীব ফ্যাসি-বিবোধী সংগ্রামী মনোভাবেব প্রভাবে সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিব মধ্যে যে পবিবর্তন দেখা দিযেছে এবং একটা শক্তিশালী বামপন্থী ধাবা গড়ে উঠেছে সেই সত্যকে অতি-বামপন্থীবা উপেক্ষা কবে। দিমিত্রফ আবো বলেন যে, অতীতে সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি যে ধবনেব 'শ্রমিক-গভর্ণমেণ্ট' গঠন কবত তাব সঙ্গে সংযুক্তফ্রণ্টেব গভর্ণমেণ্টেব চবিত্রেব বিবাট পার্থক্য।

সংযুক্তফ্রণ্টে কমিউনিস্টদেব ভূমিকা

শ্রমিকশ্রেণীব সংযুক্তফ্রন্ট এবং বিশেষতঃ ব্যাপকতম ভিত্তিতে গঠিত গণফ্রণ্ট যে সব উপাদানে গঠিত হবে তাতে ফ্রণ্টেব মধ্যেও সংগ্রাম চলতে থাকবে। সে

সংগ্রাম হবে অস্থিরচিত্ত মিত্রদের দোদুল্যমানতা, গণসংগ্রামের রাশ টেনে রাখার চেষ্টা ইত্যাদি দুর্বলতার বিরুদ্ধে। কিন্তু সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তা থেকে এর চরিত্র হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই দ্বিতীয়-ধরনের সংগ্রামের উদ্দেশ্য হবে ফ্রন্টের জঙ্গী ঐক্যকে আরো শক্তিশালী করে তোলা, নমনীয় অথচ সঠিক রাজনৈতিক আওয়াজ এবং কৌশলের সাহায্যে ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত জনগণের চেতনাকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে সাহায্য করা।

সংযুক্তফ্রন্ট তথা গণফ্রন্টের সাফল্য সুনিশ্চিত করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সংহতি ও শক্তিবৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। কেন না এই পার্টিরই রয়েছে সংগ্রাম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট পরিপ্রেক্ষিত এবং এই পার্টিই সুসঙ্গত ও অবিচলভাবে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের জন্য লড়াই করে। কিন্তু সেই শক্তি-বৃদ্ধির জন্য একাধারে সঙ্কীর্ণতাবাদ ও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সংযুক্তফ্রন্ট মানে এই নয় যে, কমিউনিস্ট পার্টি তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলবে বা স্বাধীন কার্যকলাপ বন্ধ করবে। তাহলে সংযুক্ত ফ্রন্টই দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সংযুক্তফ্রন্টকে লেজুড়ে পরিণত বা দুর্বল করা নয়। পার্টি তার স্বাধীন কার্যকলাপ চালিয়ে যাবে সংযুক্তফ্রন্টের ঐক্যকেই আরো শক্তিশালী করার আন্তরিক সংকল্প নিয়ে।

কমিউনিস্ট পার্টি সংযুক্তফ্রন্টে নিজ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বদানের এবং জনগণের সমস্ত সংগ্রামের প্রথম সারিতে থেকে আত্মত্যাগ ও বীরত্বের পরিচয়দানের মাধ্যমে, নেতৃত্ব জোর করে চাপিয়ে দিয়ে নয়। সেই জন্যই সপ্তম কংগ্রেসে সংযুক্তফ্রন্টের তত্ত্ব ব্যাখ্যার সময় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের কথা বলা হয় নি। যে জিনিসটির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় সেটি হল শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রমিক-বিপ্লবের জয়ের স্বার্থে দ্বিধাবিভক্ত শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্য প্রতিষ্ঠা। সেই ঐক্যেরই স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর একটি মাত্র গণ-রাজনৈতিক পার্টি গঠনের আওয়াজ দেওয়া হয়। সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রভাবাধীন শ্রমিকদের মধ্যে তখন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলে একটি মাত্র পার্টি গড়ার যে আগ্রহ লক্ষিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই উক্ত আওয়াজ দেওয়া হয়েছিল।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে এইরূপ ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠনের জন্য একটি মাত্র শর্ত রাখা হয়। তা হল এই যে, সোশাল-ডেমোক্রাটদের বুর্জোয়া প্রভাবমুক্ত হয়ে শ্রমিক-বিপ্লব এবং সোভিয়েত রূপের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর

একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার নীতি মেনে নিতে হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে পূর্ব-ইউরোপের কয়েকটি দেশে যখন শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠিত হয় তখন সোভিয়েত রূপকেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের একমাত্র রূপ হতে হবে বলে শর্ত আরোপ করাও হয়নি।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংযুক্তফ্রন্ট

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসেই ঔপনিবেশিক এবং অর্ধ-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জন্য দেওয়া হয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংযুক্তফ্রন্টের আওয়াজ। ফ্যাসি-বিরোধী সংযুক্তফ্রন্টের তত্ত্বের মূল শিক্ষার ভিত্তিতেই তা করা হয়। তবে ঔপনিবেশিক এবং অর্ধ-উপনিবেশিক দেশগুলিতে বিপ্লবের স্তর, চরিত্র এবং শ্রেণী সমাবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ার দরুণই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংযুক্তফ্রন্টের নীতিকে তুলে ধরার প্রয়োজন দেখা দেয়।

ইউরোপের বেশির ভাগ দেশে বিপ্লবের স্তর ছিল সমাজতান্ত্রিক। ঔপনিবেশিক এবং অর্ধ-ঔপনিবেশিক দেশগুলির বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক স্তরে। শুধু তাই নয়। এই সব দেশের বিপ্লবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের দিকটি প্রাধান্য লাভ করে এবং এখানকার বিপ্লবকে একটি বিশেষ চরিত্র দেয়। রুশিয়ার বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে এখানেই তার পার্থক্য। দ্বিতীয় পার্থক্য হল ঔপনিবেশিক এবং অর্ধ-ঔপনিবেশিক দেশের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকায়। রুশিয়ার গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল সম্পূর্ণভাবে বিপ্লব-বিরোধী। কিন্তু ঔপনিবেশিক দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীকে (সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল এক ক্ষুদ্র অংশ বাদে) নিজ স্বার্থেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। একদিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত এবং অন্যদিকে নিজ দেশের শ্রমজীবী জনগণের, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের আন্দোলন সম্বন্ধে ভীতি এই উভয় উপাদানের সমাবেশে দেখা দেয় জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বৈত চরিত্র অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোসের আগ্রহ অথচ স্বার্থ-সংঘাতের ফলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা।

সুতরাং কমিউনিস্টদের পক্ষে সঠিক কর্মকৌশল নির্ধারণের সময় ঐ দ্বৈত চরিত্রের উপর মনোযোগ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বুর্জোয়াশ্রেণী যে পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করবে সেই পরিমাণে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং যুগপৎ তাদের আপোসমুখীনতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া। এ থেকেই ওঠে বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে

ব্যাপকতম সংযুক্তফ্রন্ট গঠন, বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং সংযুক্তফ্রন্টের ভিতর সঠিক কর্মনীতি অনুসরণের প্রশ্ন।

১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত "উপনিবেশ এবং অর্ধ-উপনিবেশগুলির বিপ্লবী আন্দোলন" সংক্রান্ত প্রস্তাবে কতকগুলি ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ভুল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তম কংগ্রেসে সেই ভুল দৃষ্টিভঙ্গিকে দূর করে সঠিক পথ নির্দেশের চেষ্টা হয়।

ষষ্ঠ কংগ্রেসের উক্ত প্রস্তাবে ঔপনিবেশিক দেশগুলির বিপ্লবী আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের চরিত্রটির উপর সঠিকভাবেই প্রাধান্য আরোপ করা হয়। সেই সংগ্রামের সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য শ্রমিক, কৃষক ও শহরের পাতি-বুর্জোয়াদের মৈত্রী এবং সেই মৈত্রীতে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য উপস্থাপিত করা হয়। একথাও বলা হয় যে, উক্ত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার একটি অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত হল কমিউনিস্টদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে অগ্রণী অংশ গ্রহণ। সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কতকগুলি বুলি আওড়ালে যে কোন কাজ হবে না ররং আন্দোলনের ক্ষতি হবে সে সম্বন্ধে হুঁশিয়ারী দেওয়া হয় ঐ প্রস্তাবে। কমিউনিস্ট পার্টিকে বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড় হওয়ার বদলে স্বাধীন শক্তিরূপে সংগঠিত হতে এবং মুক্তিসংগ্রামের নেতারূপে এগিয়ে আসতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এইগুলি ছিল উক্ত প্রস্তাবের বলিষ্ঠ ইতিবাচক দিক।

ঐ প্রস্তাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বৈত চরিত্রের দিকটিও তুলে ধরা হয় এবং বুর্জোয়াদের ভূমিকাকে আখ্যা দেওয়া হয় "জাতীয় সংস্কার-বাদ।" জাতীয় সংস্কারবাদ সম্বন্ধে দক্ষিণ ও বাম উভয় ধরনের বিচ্যুতির সম্ভাবনা সম্পর্কে হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়।

কিন্তু ঐ প্রস্তাবে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি ও স্ব-বিরোধিতা দেখা যায়। যথা :—(১) বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দেশের পরিস্থিতি বিশদভাবে অধ্যয়নের বদলে ভাসা-ভাসা বিশ্লেষণ এবং সমস্ত দেশের পক্ষে একই ধরনের সাধারণীকৃত সিদ্ধান্ত করা হয় (২) বিশেষত, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার সম্ভাবনা ও গণ-প্রভাব দুটিকে অত্যন্ত ছোট করে দেখা হয়। ধরেই নেওয়া হয় যে তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা খুবই অস্থায়ী ঘটনা। সুতরাং তাদের সঙ্গে কমিউনিস্টরা বড় জোর সাময়িক সহযোগিতা করতে

পাবে। বলা বাহুল্য যে, এরূপ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বুর্জোয়াদের সঙ্গে সংযুক্ত ফ্রণ্ট গঠনের কোন প্রশ্ন ওঠে না। অথচ ঐ প্রস্তাবেই যেখানে ঔপনিবেশিক বিপ্লবের অর্থনৈতিক ভিত্তির বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেখানে বলা হয় যে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সংঘাত হল মৌলিক। সাম্রাজ্যবাদ চায় পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। জাতীয় বুর্জোয়ারা দুর্বলতর পক্ষ হিসাবে বারবার নতি স্বীকার করেও থাকে বটে। কিন্তু জনগণের শ্রেণী-বিপ্লবের সম্ভাবনা একেবারে আশু ও চূড়ান্তভাবে দেখা না দেওয়া পর্যন্ত তারা চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে না।

উক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকার সম্ভাবনাকে যতটুকু গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল তাও প্রস্তাবে দেওয়া হয়নি। সুতরাং প্রস্তাবের কার্যকরী অংশে যে সব নির্দেশ দেওয়া হয় তাতে সঙ্কীর্ণতাবাদই প্রশ্রয় পেয়েছে। যেখানে সঠিক নীতি হওয়া উচিত ছিল জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে যুগপৎ ঐক্য ও সংগ্রাম বা সমালোচনার নীতি অনুসরণ করা, সেখানে প্রাধান্য লাভ করে নিছক নেতিবাচক সমালোচনা।

(৩) প্রস্তাবে জাতীয় আন্দোলনের যে ধারণাটিকে "বামপন্থী সংস্কারবাদ" আখ্যা দেওয়া হয় অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়ার বামপন্থী অংশ এবং পাতি-বুর্জোয়া জাতীয় বিপ্লবী ধারা, সে সম্পর্কেও গ্রহণ করা হয় নিছক নেতিবাচক সমালোচনা তথা মুখোশ খোলার নীতি।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে শ্রমিক-নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে বুর্জোয়া সংস্কারপন্থীও পাতি-বুর্জোয়া বিপ্লবী ধারার প্রভাব থেকে মুক্ত করে আনার কর্তব্যটিকে দেখা হয় অত্যন্ত সরলীকৃতভাবে।

এই সব ত্রুটির ফলে ভারতবর্ষের মত দেশে কমিউনিস্টদের মধ্যে ইউরোপের কমিউনিস্ট আন্দোলনের শৈশবের ব্যাধিগুলি অর্থাৎ অন্যান্য বামপন্থীদলগুলি সম্বন্ধে ছুঁৎমার্গী উন্নাসিকতা, কেতাবী বুলি আওড়ানো এবং নেতিবাচক সমালোচনার মনোভাব ইত্যাদি প্রবল হয়ে ওঠে। অথচ জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা দূরে থাকুক, সক্রিয় অংশ গ্রহণের কাজটিই নিদারুণ-ভাবে উপেক্ষিত হয়। ফলে, তারা জাতীয় মুক্তিআন্দোলন তথা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনগণের বৃহত্তম অংশ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

সপ্তম কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংযুক্তফ্রণ্টের

যে আওয়াজ দেওয়া হয় তার মূলনীতি ছিল পূর্বতন সঙ্কীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন। সেখানে এই সব দেশের কমিউনিস্টদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় যে, তারা যেন সংযুক্তফ্রন্ট গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেই উদ্দেশ্যে জাতীয় সংস্কারপন্থীদের নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কর্মসূচীর ভিত্তিতে জাতীয় সংস্কারপন্থী ও জাতীয় বিপ্লবী শক্তিগুলির যৌথ কার্যকলাপের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বলা হয় যে, কমিউনিস্টরা নিজেদের রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক স্বাধীনতা বজায় রেখে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেবে ও তার ভিতরে জাতীয় বিপ্লবী ধারাটির শক্তি-বৃদ্ধির জন্য কাজ করবে।

সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত ঐ নীতি ঔপনিবেশিক দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের এবং সেই আন্দোলনের সব চাইতে সুসঙ্গত শক্তি অর্থাৎ কমিউ-নিস্ট পার্টির সামনে এক মহান সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। তার শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ হল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক অনুসৃত সংযুক্তফ্রন্ট নীতির অত্যন্ত সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। ঐ পার্টি সংযুক্তফ্রন্ট রূপায়ণে একদিকে যেমন মূলনীতি অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম ও শ্রমজীবী জনগণের মৌলিক দাবীর সমর্থনে দৃঢ়তা অবলম্বন করে তেমনি অন্যদিকে কৌশল সম্বন্ধে যথেষ্ট নমনীয়তা ও বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় দেয়।

শুধু তাই নয়, প্রাক্-সপ্তম কংগ্রেস যুগে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সঙ্কীর্ণতাবাদের যা ছিল মূল উৎস সেটির প্রতি চীনের পার্টি সঠিকভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ এবং তাকে পরিহার করে। ঐ উৎসটির সম্বন্ধে বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে ১৯৫৬ সালে লিখিত "On the Historical Experience of the Dictatorship of the Proletariat" নামক প্রবন্ধে। ঐ উৎসটি ছিল নিম্নলিখিত স্তালিন-নির্দেশিত সূত্র: বিপ্লবের বিভিন্ন যুগে মধ্যবর্তী সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিগুলির উপরে প্রধান আঘাত হানা এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলাই হল প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। চীনের পার্টির উল্লিখিত প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত মধ্যবর্তী শক্তিকে কোনঠাসা করার নীতি সঠিক হতে পারে কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে নির্বিচারে ঐ নীতি প্রয়োগের চেষ্টা নিতান্ত ক্ষতিকর। চীন-বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে প্রধান আঘাত হানা

আর মধ্যবর্তী শক্তিগুলির সম্বন্ধে যুগপৎ ঐক্য ও সংগ্রামের নীতি মেনে চলাই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সংযুক্তফ্রন্টের ঐক্যের শক্তিবৃদ্ধির জন্য অর্থাৎ ফ্রন্টের ভিতরে সংগ্রামের নীতিকে নাম দেওয়া হয় 'ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য' নীতি, অর্থাৎ, বিভেদপন্থীদের কোনঠাসা করতে হবে এবং মধ্যবর্তী শক্তিগুলির অস্থিরচিত্ততার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। ঐক্যকে আরো বেশি শক্তিশালী করাই তার উদ্দেশ্য। মধ্যবর্তী শক্তিগুলিকে যাতে নিজেদের পক্ষে টেনে আনা যায় সেজন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতে হবে। সহিষ্ণু বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনা ও সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব-দানের দ্বারা ঐসব শক্তিকে অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করার মাধ্যমেই তা সম্ভব হবে।

চীনে মধ্যবর্তী শক্তিগুলি ছিল (আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া বাদে) জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, বিভিন্ন গণতান্ত্রিকদল ও গ্রুপ এবং নির্দলীয় ব্যক্তিরা। সংযুক্তফ্রন্ট-গঠনের ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টি তথা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে পূর্বশর্ত হিসাবে আরোপ করা দূরে থাকুক চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিক-ভাবে চিয়াং-চক্রের নেতৃত্ব মেনে নিতে দ্বিধা করে নি, যদিও চিয়াং-চক্রের বিভেদপন্থী ভূমিকা সম্বন্ধে পার্টি যথেষ্ট সচেতন ছিল। ফ্রণ্টে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেবিষয়ে সেদিন মাও-সে-তুং নিম্নলিখিত উপায়গুলির কথা উল্লেখ করেন: (১) ইতিহাসের বিকাশের ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মূল রাজনৈতিক আওয়াজ দেওয়া এবং সেই আওয়াজকে বাস্তবে রূপায়ণের লক্ষ্য সামনে রেখে সংগ্রামের প্রত্যেক ধাপে ও প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে সঠিক কর্তব্য নির্দেশ করা (২) সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় ঐ কর্মনীতির প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির আনুগত্য এবং আত্মত্যাগের জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন (৩) নিজস্ব মূল নীতি বিসর্জন না দিয়ে মিত্রদের সঙ্গে যথোচিত সম্পর্ক স্থাপন এবং তাকে সংহত ও শক্তিশালী করা, (৪) কমিউনিস্ট পার্টির সম্প্রসারণ, আদর্শের ঐক্য ও শৃঙ্খলা।

চীনের পার্টি সেদিন উপলব্ধি করেছিল যে, নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজটি অগ্রসর হয় বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে। স্বাভাবতই চরম পর্যায়ে পৌছবার আগে পর্যন্ত কম বা বেশি পরিমাণে অর্থাৎ ফ্রন্টের ভিতরকার শক্তিসাম্যের অবস্থানুযায়ী অন্যান্য শক্তি তথা শ্রেণীর সঙ্গে নেতৃত্বের অংশীদারী করতেও হয়। মোট কথা, উক্ত উপলব্ধিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছিল বলেই

চীনেব কমিউনিস্ট পার্টি জাপ সাম্রাজ্যবাদবিবোধী সংযুক্তফ্রণ্টে নিজেব নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত কবতে পেবেছিল। জাপানেব পবাজযেব পব যখন চিযাং-চক্র মার্কিন সমর্থনপুষ্ট হযে আবাব গৃহযুদ্ধ শুরু কবে তখন তাকে জন-সমর্থন থেকে বিচ্ছিন্ন এবং চূড়ান্তভাবে পবাজিত কবতে বেশি বেগ পেতে হয নি।

সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী সংযুক্তফ্রণ্ট নীতিব সাফল্যেব আব একটি শ্রেষ্ঠ উদাহবণ হল ভিযেতনাম। প্রথমে জাপ সাম্রাজ্যবাদেব ও পবে ফবাসী সাম্রাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে জাতীয মুক্তিসংগ্রামে শ্রমিক, কৃষক, শহুবে পাতিবুর্জোযা এবং জাতীয বুর্জোযাদেব ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট গঠনে কমিউনিস্ট পার্টি উদ্যোগ নেয। সঠিক নীতি অনুসবণেব ফলে পার্টি সেই ফ্রণ্টে নিজ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কবে। সেই ফ্রণ্ট উত্তব ভিযেতনামে বিজযলাভ কবে। দক্ষিণ ভিযেতনামে আজ যে অপূর্ব বীবত্বপূর্ণ জাতীয মুক্তিসংগ্রাম দৃঢ পদক্ষেপে জযেব দিকে এগিযে চলেছে তাবও প্রাণশক্তি হল কমিউনিস্ট পার্টিব উদ্যোগে গঠিত সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তিব ঐক্যবদ্ধ মোর্চা—"ন্যাশনাল লিবাবেশন ফ্রণ্ট"। ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্টেব নীতি এবং অভিজ্ঞতা বাদ দিযে ভিযেতনাম থেকে শুধু সশস্ত্র সংগ্রামেব শিক্ষাটুকু নেওযাব চেষ্টা আসলে সেখানকাব ইতিহাসকে অস্বীকাব কবা ছাড়া আব কিছু নয।

জন-গণতন্ত্রেব শিক্ষা

দ্বিতীয মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদেব বিরুদ্ধে সোভিযেত ইউনিযনেব ঐতিহাসিক জযলাভ সমগ্র বিশ্বপবিস্থিতিতে বিবাট পবিবর্তনেব সূচনা কবে। সেই অনুকূল পবিবেশে পূর্ব-ইউবোপে এবং এশিযাব কযেকটি দেশে জন-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেব অভ্যুদয হয। তা যথাক্রমে ফ্যাসি-বিবোধী সংযুক্তফ্রণ্ট এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী সংযুক্তফ্রণ্ট কর্মনীতিব সার্থক প্রযোগেবই পবিণতি।

পূর্ব-ইউবোপেব দেশগুলিতে বুর্জোযাশ্রেণীব একচেটিযা অংশ ও ভূস্বামীবা দখলদাব ফ্যাসিস্ট শক্তিব সঙ্গে সহযোগিতা কবায দেশদ্রোহীরূপে গণ্য হয। বুর্জোযাশ্রেণীব বাকী অংশকে গণ্য কবা হয জাতীয বুর্জোযারূপে এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীব ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ফ্রণ্টে তাবাও অংশগ্রহণ কবে।

জন-গণতান্ত্রিক বাষ্ট্রেব নেতৃত্ব ছিল প্রথম থেকেই শ্রমিকশ্রেণীব বা তাব অগ্রণী অংশেব হাতে। সেইজন্যই তা অপেক্ষাকৃত অল্প সমযেব মধ্যে সমাজতন্ত্রেব দিকে এগিযে যেতে সমর্থ হয কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে বাখা দবকাব যে, পূর্ব-ইউবোপ এবং এশিযা উভয ক্ষেত্রেই জন-গণতন্ত্র দুটি সুনির্দিষ্ট স্তব

অতিক্রম করেছে। দুই স্তরে বিপ্লবের চরিত্র এবং কেন্দ্রীয় কর্তব্য ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথম স্তরে তা ছিল সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী বিপ্লব এবং বিপ্লবী ক্ষমতার যন্ত্ররূপে জন-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। শ্রেণীগত বিষয়বস্তুর দিক থেকে তা ছিল শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের অনুরূপ জিনিস আর দ্বিতীয় স্তর হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। তখন জন-গণতন্ত্র শ্রেণী-চরিত্রের দিক দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে উত্তরিত হয়েছে।

এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণ যত কম সময়েই হয়ে থাকুক না কেন, কোন স্তরকে ডিঙিয়ে যাওয়া হয় নি। বরং প্রথম স্তরের মূল কর্তব্য যত তাড়াতাড়ি এবং ব্যাপকভাবে সম্পন্ন করা গিয়েছে, তত তাড়াতাড়ি পরবর্তী স্তরের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

জন-গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা নানা দিক থেকে মূল্যবান। তা সংযুক্তফ্রন্টের তত্ত্বকে আরো সমৃদ্ধ করেছে, জাতীয় বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণাকে প্রসারিত করেছে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় নতুন অবদান দিয়েছে। সর্বোপরি, একমাত্র সোভিয়েত রূপের মাধ্যমেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে যে ধারণা এর আগে প্রচলিত ছিল, তার স্থানে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নতুন রূপের সন্ধান দিয়েছে।

জাতীয় গণতন্ত্র

সংযুক্তফ্রন্টের এই সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার প্রাণবস্তুর ভিত্তিতেই ১৯৬০ সালে একাশি পার্টির ঘোষণায় এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে অ-ধনতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ এবং তার যন্ত্র হিসাবে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের তত্ত্ব উপস্থিত করা হয়।

জাতীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে কমিউনিস্ট মহলে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। এই প্রশ্নে দক্ষিণ ও বাম উভয় ধরনের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় পাওয়া যায়। সে সম্বন্ধে আলোচনা স্বভাবতই প্রবন্ধের উপসংহারে সম্ভব নয়। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সংযুক্তফ্রন্টের তত্ত্বের বিকাশের ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিচার করলে উপরোক্ত প্রশ্নে দক্ষিণ ও বাম উভয় ধরনের ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হবে।

অঘটন ঘটল

গোপাল হালদার।

কুলীন তো নয়ই, অত আদরের পাত্রও নয়, তবু বাঞ্ছা নামটাই স্থায়ী হয়ে গিয়েছে। আসলে নাম নয়, অবস্থাটা বিবেচনা করেই কমলা দি' বলেছিলেন, 'অবাঞ্ছিত'। যেদিনে পাড়ার গদাই কামারের ছেলে সদা পর্যন্ত শিকলে-বেঁধে এলসেশিয়ান্ নিয়ে বেরোয় না—

খাঁ-দের, চৌধুরীদের এল্‌সেশিয়ানরা হয় বেরোয় মোটরে, নয় চাকরের সঙ্গে,—সেদিনে 'একটা নেড়ী কুত্তাকে তুই কোথা থেকে এনে জুটোলি, রূপা ?' রূপা বল্‌লে, গাড়ী চাপা পড়েছিল—স্টেশনের কাছে।

—তাতে কি ? মরছিল ?

—মনে হল মরে যাবে—যত্ন না করলে।

—তোর যেমন কথা। ওই স্টেশন—পাড়ার কুকুরগুলোকে দেখেছিস্ ? ওরা রেলে কাটা পড়লেও মরে না।—

রূপার উত্তর ছিল না। তার কাজটা কেউ পছন্দ করে নি—একমাত্র ছোট তিন ভাই-বোন্ ছাড়া, পান্না তার বোন, আর বৈমাত্র ভাইবোন কানু বানু। নোতুন মা তো দেখেই আগুন—মা অবশ্য বিমাতা,—সতীন কন্যা দুটির উপর সব সময়েই বিরক্ত।

হবেন না কেন ? 'সে তো বিইয়েই সরে পড়েছে—বিছানায় শুয়ে ছিল বছর চা'র, তারপর আর কি ? এই বাঁদীর ঘাড়ে। বড়ো ভাইটা ওপারে মাসি বাড়ি চলে গেছল। এখন নাকি কাজ করে কারখানায়। তার মাসির যদি অত দরদ ছিল বোন ঝিদের নিলে না কেন ? আর, তুই ও ভাই। বড় ভাই, কাজই যদি করিস বোন্‌কে কেন এখানে ফেলে রেখেছিস ?' রূপা জানে —কথাটা মা-বাবা কখনো কাউকে না বললেও রূপা জানে—মাসে বিশ টাকা করে বাবার হাতে দেয় সোনা,—স্বর্ণকুমার ঘোষ, সি-৫০৩, এলিয়াস্ এ্যাণ্ড বর্‌টনের 'বদলি'। দাদাই রূপাকে বলেছে—পাঁচ টাকা করে তাকে দেয় রেলে ফিরবার পথে—'বলবি নে—পান্নাটাকে খিদে পেলে কিছু কিনে দিস্ মাঝে মাঝে।' পাঁচ টাকা বেশি না হলেও কম নয়—নিজের কাছে রাখা চলে না। কমলা দি'র কাছে রাখাই ভালো—কলকাতার কোন্ সেলাই'র কলের ইস্কুলে

তিনি পড়ান। নিজে রোজগার করেন। রেলে ডান পা কাটা পড়ে স্বামী পঙ্গু, স্টেশনের কাছে জামা কাপড়ের দোকান চালান। কমলারই তা সেলাই। নিজে রোজগার করেন, কেউ কমলাকে অগ্রাহ্য করতে সাহস পায় না। ওর কাছে বুটি তোলার কাজ শিখতে শিখতে রূপারও রোজগার হয় কিছু, তাও সবাই জানে,—মাসে দু চার টাকা চন্দ্রমুখীই রূপার মজুরী থেকে আদায় করে। কমলাকে বলে,—তা কাজ যদি ও জানে তা হলে তুমিই ওকে নিযে নাও না—এখানকার ইস্কুলে পড়ে কি হবে?

—ইস্কুলে পড়ছে পড়ুক ফ্রিই তো পাচ্ছে—

—'ফিরি। 'তাই তোমরা দেখ'—দু দুটো বোন্—খাওয়া-পরা আসে কোথেকে? বই পত্র? কমলা তাও কিছুটা জানে। তবু সহজ ভাবে বলে—

আপনার আরও দুটি আছে মাসিমা, ওরা তাদেরই দিদি—নয় চারটেই ধরুন আপনার। শুলু কাকা ওদের বাপও—রোজগার পত্র কম নয়—বড় বাবু অফিসের—

তা ওদের বাপ হয়ে থাকলেই পারতো,—আমাকে কেন নিয়ে এল হাড় জ্বালাতে। ওকে সাধাসাধি করছিল কে?

কে করছিল, কমলা তার উত্তর জানত।—অপিসে চন্দ্রমুখীর বাপের তাতে সুবিধা কম হয় নি—কিন্তু সে উত্তরে রূপা পান্নার অদৃষ্টে নিগ্রহ আরও জুট্‌বে। তাই ওসব কথা ছেড়ে দিয়ে তোযাজ করে বললেন,—আপনি না হলে কে দেখত শুলু কাকার সংসার—আর এই মা-মরা ছেলেমেয়ে দুটোকে—

কথাটায় কিছু কাজও হল। চন্দ্রমুখী মানল,—সে কথা বোঝে কে? তুমি নয়, জানো সব, কিন্তু—তো ওর ভাগ্নী এসেছিল সেদিন গোকুল চক্কোত্তি দের বিয়ের নেমন্তন্নে, এ পাড়ায় দেখাও করে নি। বলে গেছে আমিই নাকি বাবার বাড়ি সব চালান করছি। আর সৎমায়ের জ্বালায় ছেলেটা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছে, মেয়ে দুটিও বাঁচলে হয়।

বলি এতই যদি দরদ তবে তুমি তো মামাত বোনদের—নিয়ে গেলেই পারতে? না হয় মামার সঙ্গে সংসার পাত্‌তে—

কমলা মীমাংসা করে দেয়—আপনি কান দেন কেন ওসব কথায়? কত কথাই তো কত লোকে বলে—আমাকেই কি কম বলে? আপনিও তো জানেন। আমি কান দিই?—কেউ তারা খাওয়াবে-পরাবে আমাকে, না, দেখবে আমার ঘর সংসার?

তা যা বলেছ। তোমাকে ধন্নি দিতে হয়। আটটা বাজতে-না-বাজতে ছেলেকে নাইয়ে খাইয়ে ইস্কুলে পাঠিয়ে দাও—স্বামীকে বসিয়ে দাও দোকানে আর ওই ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে আটটা চল্লিশের টাইম ধরে ছোট কলকাতায়। আবার ছটা তেরোতে ফেরো। সাবাস বলি। তবু মনে কিছু করোনা—অমন মেয়ে মানুষের একা-একা ওভাবে চলা কি ঠিক? অঘটন ঘট্‌তে কতক্ষণ? কমলা বলে, মনে করবো কেন? তবে এখানেই তো দেখছেন কী না ঘট্‌ছে। ও জন্য আর শহরে যেতে হয় কারো আজ।

কমলার কথার ইঙ্গিত ছিল। বছর চার হল চন্দ্রমুখীর দিদি সুধামুখী এসেছিল বোনের কাছে। বিধবা মানুষ। চন্দ্রমুখীর তখন ছেলে হবে। মেয়ে হল। কিন্তু সুধামুখী দেখা গেল যাবে না। কিন্তু তার পরেই একটা একটা কাণ্ড ঘটল—পাড়ার লোকে ঘোষ মশায়কে বল্লে—এসব ভদ্রলোকের পাড়ায় চলবে না—ঘোষ মশায় আমতা-আমতা করেন, চন্দ্রমুখীর কাছে সাহস করে এ কথা তুলতে পারেন না তবু সুধামুখীকে পার করে না দিয়ে উপায় রইল না। সে বছর চারেক আগেকার কথা। তারপরেও আরও অনেক কিছু ঘটেছে ওপাড়ায় সেপাড়ায়—চন্দ্রমুখী তাই ভাবে সুধামুখীর কথাটা সে সবে চাপা পড়েই যাওয়া উচিত। সেরূপ ভাণ করেই চন্দ্রমুখী বললে, তা যা বলেছ—এখনকার ছেলেমেয়েদের তো আর কোনো বাঁধন নেই।

ওই তো শুন্‌লে—নিমুর ভাইএর বউটাকে নিয়ে সেদিন দু'পাড়ার ছেলেরা সিনেমার কাছে বোতল ছোঁড়াছুড়ি আর ছুরি মারামারি করেছে এদল বলে 'ও আমাদের', ওদল বলে 'না ও আমাদের।'

—বউটা কি বলে?

—সে আবার কি বলবে?

—কেন? বলতে পারতো—যখন যার হাতে তখন আমি তার।

এই তো আমাদের মেয়েমানুষদের কথা।

চন্দ্রমুখীও হেসে ফেল্‌ল—তা যা বলেছ, ছ্যাদন দড়ি, বাঁধন দড়ি এখন তুমি কার? যখন যার হাতে, তখন আমি তার।

সুমীমাংসা হয়ে গেল। টাকা তিনটা আঁচলে বেঁধে চন্দ্রমুখী উঠে পড়ল—তা হলে রূপার কথাটা একটু মনে রেখো—তোমার ইস্কুলে লাগিয়ে দাও, আমি আর কত পারি বলো?

এই বিমাতার সংসারে এগারো বৎসরের রূপা একটা কুকুরের ছানা এনে

জুটিয়ে আরও এক বিপত্তি ঘটালো। চন্দ্রমুখী দেখেই জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু ওদিকে নিজের কন্যা বানু তখন বসে গিয়েছে বাচ্চাটার পাশে, গলায় একটা দড়ি বেঁধে তাকে ধরে বসেছে। ময়রার দোকান থেকে দুধ নিয়ে এসে রূপা ঝিনুক করে তাকে দুধ খাওয়াচ্ছে পান্না ঠ্যাং দুটো ধরে বসেছে, বাচ্চাটা তখনো বেদনায় কোঁ কোঁ করছে, কিন্তু দুধের স্বাদ পেয়ে, আবার মাথাও তুলছে—বানু ও কানু চেঁচিয়ে উঠ্ছে, 'খাচ্ছে, খাচ্ছে।' চন্দ্রমুখী চীৎকার করে উঠল—মাথা খাচ্ছি শত্রুদের। এ দুধ এল কোত্থেকে, শুনি—

রূপা বল্লে, তিনু ময়রার দোকান থেকে চেয়ে এনেছি।

—চেয়ে এনেছিস্। সে তোর কোন্ কুটুম শুনি যে চাইলেই দিলে। এমন মানুষ তিনু গয়লা।—

কথাটা ঠিক। রূপা তাই বললে, না, বলেছি এখন বাকী থাকবে।

—পরে শোধ করবি কি দিয়ে—গায়ে-গায়ে? তা পারবি যেমন হয়ে উঠ্ছিস্ দিন দিন।

কথাটা না বুঝে রূপারও উপায় নেই — গাঁয়ের মেয়ে, আর চন্দ্রমুখীর মুখে একথা ও তার সঙ্গে সংযুক্ত ইঙ্গিত নতুনও শুনছে না। খুব বেশি না হলেও একটু সে দমে যায় মাথা নীচু করে বলে, কমলাদি'র কাছ থেকে না হয় দামটা নিয়ে দিয়ে দোব —কালই।

—কেন? সেখানে ন' শ' পঞ্চাশ তোমার জমেছে।' নিজের অন্ন জোটে না, শঙ্করাকে ডাকে।

তবু বাচ্চাটাকে তখন তখনি দূর করা সম্ভব হল না। বানু ও কানু কান্না, লাফা-লাফি, দাপাদাপি জুড়ে দিলে – 'না,মা, ওকে কিছুতেই ছাড়ব না।' দড়িতে বাঁধা হল। সাহস পেয়ে একটা প্যাকিং বাক্স জোগাড় করলে রূপা, নিয়ে এল খড়, ছেঁড়া ব্যাগের টুকরো, বাচ্চাটার জন্য তৈরী করলে গায়ে দেবার কম্বল। প্রায় সময়ই হল না—ওদের ক'জনের কোনো কাজের এদিকে চন্দ্রমুখী থেমেও থামেনি। ভাবছে—থাক্ কিছুক্ষণ 'একটু পরেই ছেলেমেয়ে দুটো ভুলে যাবে, আর ওই শয়তান পান্নাটাকে পাঠিয়ে দেবে কমলার কাছে—পড়তে। তখন, না হয় আরও একটু পরে, বানু কানু ঘুমুলে—ওই বাকস শুদ্ধ সব সাতুকে দিয়ে টেনে ফেলে দিয়ে আসবে—একেবারে দূলে পাড়ায়। যেখানকার জঞ্জাল সেখানে যাবে। ততক্ষন অবশ্য চন্দ্রমুখী

বাবেবাবেই জানাবে ছেলেমেযেদেব—ওই দিদিব ও পান্নাব সঙ্গে মিলে এসব অনাসৃষ্টি না কবতে।

রূপাব বোধহয় সন্দেহ হযেছিল। সে-ই গিযে কমলাকে প্রথম বললে—কমলা দি। একটা উপায কবো।

কমলা শুনে বললো—কি কুকুব ?

রূপা বললে—খুব ভালো কুকুব।

কমলা জেবা কবতে লাগল—কেমন দেখতে ?

—সুন্দব।

—তা নয। এ্যালসেশিযান্ ?—চিনিস্ না ? দেখিস ? ওই যে ওবা নিযে বেবোয, শেযালেব মতো—

—না, না, একটুও শেযালেব মতো নয।

—তবে ? কালো, না, সাদা ?

—পিঙ্গল।

—কান কেমন ? নাক, মুখ, চোখ ? সবই আছে। কেবল স্পষ্ট বোঝা গেল না কেমন। কমলা তবু অনুমান কবতে পাবল—অন্তত নামজাদা কোনো বিলিতি কুকুব নয—হলেও দোঁআশলা, কিম্বা তাবও বেশি দশ-বাবো আঁশলা। রূপা তা মানে না, বলে, চলো না, একবাব দেখবে।

কমলা বুঝলে তাতে রূপাবই বিপদ বাড়বে। বললে, না, আজ থাক। কাজটা ভালো কবিস্ নি—আমাকে দেখলে মামী মা বুঝবেন—আমিও বুঝি তোব সঙ্গে আছি। 'কিন্তু মা যদি বাত্রে ওকে ফেলে দেন—'

সে দেখা যাবে—চোখ বাখিস্, তখন না হয আমাদেব বাডি নিযে আসব।

রূপা ভবসা পেল না, কিন্তু বাডি ফিবে সাবধানে বইল।

শুভ্র ঘোষ বাডি ফিবলেই বানু-কানু তাকে সোৎসাহে সম্বর্ধনা কবে জানিযেছে—বাবা, দেখবে এসো। উৎসাহ তিনিও বোধ কবেছিলেন—'কি ?' দেখোই না,—তাবা টেনে নিযে যায—তিনিও হেসে যেতে-যেতে বলেন, কী, বলোই না। 'তুমিই দেখো আগে।' কিন্তু তাব আগেই চন্দ্রমুখী অবতীর্ণ হল, আব মুহূর্ত মধ্যে ঘোষ মশাযেব হাসি নিবে গেল। কিছুই বুঝতে পাবেন না—ইতস্ততঃ কবে বলেন আমি উৎসাহ দিচ্ছি কি ? না, না—আমি কিছু জানি না। কি এনেছ ? কুকুব ছানা ?—তা কি হযেছে ?

—কি হযেছে তাও বলতে হবে ? আমাব পিণ্ডি দেবে, না তোমাব

পিণ্ডি দেবে। বাড়িঘব নোঙবা কববে না। কি খাওযাবে?' ইত্যাদি। ঘোষ-মশায সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীব সঙ্গে একমত হলেন—'না, এসব আপদ জোটানো ঠিক নয।' একবাব বললেন, কিন্তু ছেলেমেযে দুটো যে বড আবদাব ধবেছে।' তাবপব বুঝিযে বললেন স্ত্রীকে, 'ওদেব এ-সখ কিছুক্ষণ থাকবে। তাবপব চলে যাবে। তখন দূব কবে দিলেই হবে।—এখন একটু চুপ কবে থাকো—তাহলেই ওবা ভুলে যাবে।'

কিন্তু সাবধান হল বানু-কানু। প্যাকিং বাক্সটাকে তাবা নিজেদেব শোবাব তক্তপোষেব নিচে আনবে, মা দিচ্ছে না। তাবাও তুমুল কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। খাবে না। শেষ পর্যন্ত বাবান্দাব কোনে বাচ্চাটাব বাক্সটা এসেছে। আব খাওযাব পবে বানু-কানু তাব কাছ ছাড়ে না। হ্যাবিকেন নিযে গিযে বাববাব দেখে—'ঘুমুচ্ছে।' 'হ্যাঁ, এখনো ঘুমুচ্ছে।' 'চুপ, চুপ'—। 'এই, চোখ খুলেছে',—'চোখ খুলেছে—চোখ খুলেছে'—'ও বডদি চোখ খুলেছে, খাওযাবি নাকি, আয।' 'দুধ আনব, না, কি?'

চন্দ্রমুখী অবিবত মুণ্ডপাত কবছে ধাড়ী মেযেটাব। আব ওই পান্নাটা। তাব ছেলেমেযেব মাথা খাবে এই শযতান মেযেদুটো।

অগত্যা বাচ্চাটা একবাত্রিব মতো ঠাঁই পেল ওই বাবান্দায। টালিব ছাওযা বাবান্দাব এক পাশে একটা ছোট কুঠুবী, বাক্স-প্যাটবা, জামা-কাপডেব ট্রাঙ্ক, সুটকেস, ছেঁড়া বই-কাগজ বোঝাই কাঠেব আলমাবি, সিন্ধুক—আব তাব সঙ্গে ছোট তক্তপোষ—রূপা ও পান্না ঘুমোয। রূপা এক-একবাব উঠে দেখে—বাক্সটা আছে তো। মেঝেয শোয ক্ষ্যান্তব মা। জেগে যায, বলে, কি হল তোমাব রূপাদি?

—না। বাচ্চাটা কাঁদছে না কেন?

—কাঁদা বুঝি খুব ভালো? পাগল হবে নাকি? ওটা চেঁচালে এখনি গলা টিপে ওকে মেবে ফেলবেন নতুন মা।

সত্যি কথা। কিন্তু-চোট পেযেছে। অতটুকু বাচ্চা, সাড়াশব্দ নেই, মবে যায় নি তো? রূপাব মনে কিছুতেই স্বস্তি আসে না। বাত্রিতে দু একবাব বাচ্চাটা একটু কোঁ কোঁ কবলে খুশিতে রূপাব মন ভবে ওঠে—।

সেই প্রথম বাত, তা মনেও বাচ্চাটাব থাকবাব কথা নয। পবদিনই তাব বাড়ি বদলাতে হল। বানু-কানু তখনো ছাডবে না—রূপা দূবে দূবে পালিযে বেড়ায। এবাব বাচ্চাটাব গলা শুনা গেল। চন্দ্রমুখী সকাল থেকেই

আগুন। 'বাড়ি-ঘর ময়লা করছে।' ঘোষমশায় ভেবে পান না কি করা যায়। কমলা আসাতে একটা পথ হল। বাচ্চাটা সে নিয়ে যাক। পান্না কমলাদির কাছে গিয়ে বসে আছে। কমলা নিয়ে না যেতে চন্দ্রমুখী ঠাণ্ডা হল না—। বান্টু-কান্নুর কান্না কিছুটা থামল—তারাই থাকবে বাচ্চাটার মালিক—কমলাদির ছেলে কল্যাণের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেল।

এবারে নামকরণ। কি হবে নাম?—টাইগার, টম, জিমি, বিলি, না, -পি,? কুকুরদের মাতৃভাষা ইংরেজী। পিঙ্গল রঙ, লেজের ডগায় আর কপালের উপর খানিকটা সাদা, কান দুটো এখনো নেতিয়ে আছে। পা দুটো সরু সরু, লম্বা, রোগা। রোগা-রোগা একহারা খাঁটি নেড়ি কুকুরের বাচ্চা। কমলাদি বাচ্চাটাকে দেখে, আর অনুকম্পায় হাসে।

—'এ নেড়িটারও ইংরেজি নাম?' পুত্র কল্যাণকুমারকে কমলা বলে।

—'নেড়ি?' রূপা আপত্তি করে। কল্যাণ জিজ্ঞাসু চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—'তবে কি? গ্রে হাউণ্ড, না টেরিয়র, না, এলসেশিয়ান?'

রূপা ওসব নাম-পরিচয় জানে না। কুলগৌরবও বোঝে না। মোটাসোটা বোঁয়াআলা কুকুরগুলোই তার চোখে দেখতে সুন্দর। নিশ্চয় এটাও তাই হবে।

—'বোঁয়া পরে হবে, কি বলো?'—কমলাদিকে জিজ্ঞাসা করে। কমলা হেসে বলে—'দূর। এ জাতনেড়ি।

রূপা সানুনয়ে বলে, 'না, হবে—নিশ্চয় দেখো—ওই দেখছ, কেমন কুৎকুৎ করে তাকাচ্ছে—উঠতে চায়, ছুটতে চায়—'

কমলা বললে, 'পালাতেও চাইবে।'

এবার কল্যাণ আপত্তি জানালে—'কেন, আমরা ওকে চেনে বেঁধে রাখব'।

—'ছাড়া পেলেই পালাবে। আর নাহলে চীৎকার করে এমনি পাড়াশুদ্ধ জ্বালাবে'।

—'না, না। আমরা ওকে খুব যত্ন করে রাখ্‌ব—আমার ভাগ থেকে দুধ দোব—'

—'তা হলে তো মাথায় উঠবে। বরং মার-ধোর করলেই পোষ মানতে পারে। যার যেমন স্বভাব—'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর' বলে না?' তখনো নামের মীমাংসা হয় নি। কমলাদি বললেন, 'ওর আবার নাম কি? কে চায় ওকে? অবাঞ্ছিত।'

—'না কমলাদি।'

কল্যাণও বললে, 'না মা। ওকে আমরাই তো ধরে এনেছি।'

'বাড়িশুদ্ধ, পাড়াশুদ্ধ, সবাইকার আপত্তি। তোদের যা বাঙ্গা তাই কর।'

রূপা বললে—'বাঙ্গা।'

বাঙ্গার জীবনকাব্যের এসব তার অজানা অধ্যায়। কবে আবার সে অন্য কিছু ছিল 'বাঙ্গা' ছাড়া, সে বরাবর জানে সে বাঙ্গা। আর বাঙ্গা জানে—ওই রূপা মেয়েটা তাকে খাওয়ায়-শোয়ায়, পান্না মেয়েটা আর কল্যাণ থাকে সঙ্গে। বানু-কানু তাকে ভুলে গেছে। তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে, এক-আধবার তাকে নিয়ে মাঠে বেড়াতে যায়। রূপার তাতে ভয়—বাঙ্গা বুঝি পালিয়ে যাবে, সেও সঙ্গে থাকে তাই। সেখানে আরও সব পোষাকী কুকুর তাকে দেখলে অবজ্ঞায় গোঁ গোঁ করে। ঘৃণায় কখনো বা ফিরে তাকায় না, কখনও বা রাগে গর-গর করে। বাঙ্গার কি সম্মানবোধ নেই? সেও খ্যাঁক-খ্যাঁক করে তাদের জানাতে ছাড়ে না, 'আয় না, আয় না'। কল্যাণ খুশী হয়—'যা-যা।' শক্ত হাতে রূপা শিকল টেনে রাখে। বাঙ্গা জানে সে তা ছাড়বে না। তাই আরও তেজে সে দু-পা শূন্যে তুলে সদর্পে চীৎকার করে—'ঘেউ, ঘেউ', ওপক্ষের কেউ কদাচিৎ শিকল ঢিলে দিয়ে বলে—'জিমি, চার্জ।' সেই দুর্দান্ত কুকুরটা দু-পা লাফিয়ে আসতে নিজেরাই শিকল সামলে ধরে। ততক্ষণে রূপা ব্যাকুল হয়ে ওঠে, ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঙ্গাকে আড়াল করে বলে, 'বাঙ্গা বাঙ্গা, চুপ চুপ, শিগগির সরে আয়।' ওপক্ষের জিমি বা টম বা লীলা বা হিটলার তখন এগিয়ে এসেছে। রূপা প্রাণপণে শিকল আরও টেনে নিয়ে নিচু হয়ে বসে, বাঙ্গার গলা জড়িয়ে ধরে—ওদের আক্রমণ থেকে বাঙ্গাকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে রাখবে। বীরু মিত্তিরও তার লায়নকে তখন আর এগুতে দেয় না। আরও কারণ আছে। তাদের অনেক আদরের দামী কুকুর—বংশপীঠিকা আছে, অবশ্য খাঁয়েরা বলে তা জাল। লায়ন খাঁটি এলসেশিয়ান নয়। তাদের ব্ল্যাক এলসেশিয়ান জোড়া হিটলার ও ইভার সঙ্গে তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে। বীরু কিন্তু সে কথায় কান দেয় না। রয়ড্ স্ট্রীটের ব্যারিং সাহেব তাকে নিজে বংশতালিকা দেখিয়েছে—তিন পুরুষ মাত্র এদেশে এসেছে লায়ন। তাই দুরন্ত তেজ। এমন একটা খাঁটি জাতক্ষত্রিয় ওসব নেটীর সঙ্গে মারামারি করলে—তার মর্যাদা থাকে?

লায়ন নিঃসন্দেহে রূপার নেড়ীটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। কিন্তু নেড়ীগুলোর তো স্বভাব ওরকম, ভালো কুকুর দেখলেই যেমন করে পারে লাগিয়ে দেবে তাকে একটা কামড় কিম্বা আঁচড়। তাতে যে কী বিষ আছে, কত দূষিত বীজ, তার ঠিকানা আছে? লায়নের মতো খাঁটি জাতের গায়ে তা লাগলে তারা আর বাঁচে না। নেড়ীগুলিরও বদমায়েসি—ওদের গায়ে দূষিত রক্ত ঢুকিয়ে দেবে। পোকা লাগবে, বিষ ছড়াবে—বদজাতের ওই তো উদ্দেশ্য ভালো জাতদের ওপর এমনি করে সর্বনাশ করে প্রতিশোধ নেওয়া। সত্যি কথা বলতে কি, বাঞ্ছারও এসব শুনে এক একবার মনে হয়—বেশ, তাই তবে করব। দেবো এক কামড়। ওই সদা কি এমন মানুষ যে, টিটকিরি দেয় রূপাকে—

—'নেড়ী কুকুরকে আবার হাওয়া খাওয়ানো কেন?'

রূপা বলে—'হাওয়া তো সকল কুকুরেরই চাই। মাঠওতো এ দেশেরই।'

—'হ্যাঁ, মোটরে হাওয়া খেতে তুমিই বা তাহলে যাওনা কেন? ময়দান তো সকলের—তোমার ও খাঁ-দের কর্ত্রীদেরও'। রূপা মুখ নিচু করে। 'আস্তাকুঁড়ে আর ডাস্টবিনে বরং নিয়ে যাও—যেখানকার কুকুর।'

বাঞ্ছা 'ময়দান', 'হাওয়া খাওয়া' প্রভৃতি কথাগুলো না বুঝ্লেও বুঝতে পারে তার প্রতি ওদের অবজ্ঞা, রূপার প্রতি ওদের উপহাস, এমন কি, খাঁ-দের খাঁকি পরা বলরাম সর্দারের ও আমোদী ঝির ব্যঙ্গবিদ্রূপ। দু-জনায় গল্প করতে বসে মসগুল—ইভা ও হিটলারকে চেন থেকে খুলে দিয়ে দৌড়ুতে দেয়—নিজেরা রূপাকে শুনিয়ে কি বলে, একে আর জনার গায়ে হেসে গড়াগড়ি যায়, রূপা থাকলে বাঞ্ছাকে টেনে অন্য দিকে নিয়ে যায়, ওসব কুকুর আর কুকুরের পাহারাদারদের কাছেও ঘেঁষতে চায় না রূপা। বাঞ্ছা বোঝে না কেন। বাড়িতে ফিরে বাঞ্ছা খানিকক্ষণ ছাড়া পায়—মাঠে তাকে জোর করে চেনে বেঁধে রাখে রূপা—বাড়িতেও সদাদের কুকুরের মতো কল্যাণ পান্না ওকে চেনে বেঁধে রাখতে চায়। বানু-কানু এখন আর তাকে পছন্দ করে না—বলে 'নেড়ী।' বাঞ্ছার নিজেকে অপমানিত মনে হয়। সে কেন থাকবে বাঁধা? রূপা খেতে দেয় ভালো কথা। পান্না কল্যাণও আদর করে,—বেশ, কিন্তু অত বেশি আদরও ভালো লাগে না। একটু সরে যেতে চাইলেই—তারা তাকে বেঁধে রাখে। তখন ভারি রাগ হয় বাঞ্ছার। কেন? সবাই মাঠে ছুটোছুটি করে। বলরাম ও আমোদী না দেখলে তার কাছেও তারা কেউ কেউ আসতে চায়।

রূপাদিই বাধা দেয়। অথচ একবারও তাকে রূপা মাঠে একটু ছেড়ে দেয় না। কেন? সে দৌড়ুতে জানে না? দিক না তাকেও অমনি কাঠের বল ছুঁড়ে - সেও অমনি কামড়ে আনবে। অবশ্য, বাড়িতে দেখেছে—কল্যাণের বলটা বড় বেশি বড়ো, সে কামড়ে ধরতে পারে না। তা নিয়ে কল্যাণ রাগ করে। মারো মাঝে মারেও। মারে রূপাও, তবে সে ছেড়েও দিত। কিন্তু ছাড়া পেয়ে বাঙ্গা একদিন নিজের ঘ্রাণের জোরে খোঁজ পেয়ে গেল—কোন দিকটায় আসল জায়গা। দু-বাড়ির পিছনটায়। ওখানে আস্তাকুঁড়। দেখতে পেয়ে কমলাদি রূপাকে ডেকে কি বলে চেঁচিয়ে উঠল, রূপা ঘরের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। কঠিন কণ্ঠে ডাকল—'বাঙ্গা', ডাক শুনে বাঙ্গা চমকে গেল। সেবারই বুঝল তার মানে—কাছে যেতেই রূপা তাকে বাঁধল। তার গায়ে-পায়ে জল ঢেলে দিলে, কান্নাকাটি কে শোনে। কমলাদি'র পরামর্শে এই প্রথম রূপাদি তাকে একটা লাঠি দিয়ে মারলে, তার মুখ ঘষে দিল আস্তা-কুঁড়ের ওখানটায়—তারপর তাকে মুছিয়ে আবার নিয়ে এল বারান্দায়, বেঁধে রাখল চেনে। সেই প্রথম বার। বাঙ্গা বুঝল ওখানটায় যাওয়া তার নিষেধ। কিন্তু রূপাদি কেন বোঝে না ওখানটা—যেখানটাকে ওরা বলে আস্তাকুঁড় —কী আশ্চর্য জায়গা। ও জায়গাটায়, আর চমৎকার ওসব খাদ্যে কী সুগন্ধ। বাঙ্গা মারের কথা ভুলতে পারে নি, আর সেই জায়গাটাও না। না জায়গাটার গন্ধ বড়ো অদ্ভুত—তাকে ছাড়ে না। রূপাদি না দেখলে— আর কোনো রকমে ছাড়া পেলেই আবার হপ্তা দুই পরে সেখানে ছুটে যেত— আর আবার খেত মার, পেত লাঞ্ছনা। বাঙ্গা কিন্তু ভাবলে মারুক—তাতে আর কি। তবে শিগগিরই আরেকটা জায়গাও সে আবিষ্কার করে ফেলল— মাঠে যেতে পিছনের রাস্তায়, একরাশ জঞ্জাল। আরও দু-একটা পথের কুকুরও স্বাধীনভাবে সেখানে কী খোঁজাখুঁজি করে—বাঙ্গা সেদিকে পা দিলেই কিন্তু রূপাদি তাকে টেনে নিয়ে আসে। ধমক দেয়—'উঃ আবার।' বাঙ্গাও আপত্তি জানায় গোঁ গোঁ করে—এ অত্যাচার কেন তার ওপর? বাঙ্গার মনে রাগ হয়। সবাই যেমনখুশি ঘোরে—জঞ্জালে, আস্তাকুঁড়ে, ধুলোয়, মাটিতে— কোনখানে না? কেবল তারই মানা। কেন? কী তার অপরাধ? বাঙ্গা বিদ্রোহ করল একদিন, পালিয়ে বেরিয়ে গেল—একেবারে সেই জঞ্জালের পুঞ্জে। সেখানে তাকে নতুন দেখে অন্যরা ধেয়ে এলো। মারামারি বাঁধল তাদের সঙ্গে। খাওয়া-খাওয়ি। বাঙ্গা মার খেল, কামড় খেল, নিজেও ছাড়ল না। রক্তারক্তি

হল, তাবপব যুদ্ধে ক্লান্ত হযে বাড়িতে এসে পিছনেব দুযাবে শুযে বাঙ্গা হাঁপাতে লাগল। শিগ্‌গিবই চোখ পডল রূপাব। অবস্থা দেখে কী বুঝল—তাকে গালমন্দ কবে আবাব নাইযে মুছিযে, ঔষুধপত্র লাগিযে দিল, আব বেঁধে বাখল। তখনকাব মতো বাঙ্গাও তা মেনে নিযেছে। কিন্তু বুঝতে পাবল—কী হবে? সে টেব পেযেছে—আশ্চর্য আনন্দ আছে ওই জীবনে। তাই দিনকয পবেই আবাব বাঙ্গা পালাল। আবাব সেই মাবামাবি। কিন্তু এবাব অত সহজে ফিবল না। একপাডা থেকে অন্য পাডায চলে গেল তাব বন্ধুদেব সঙ্গে—মাবামাবি কবতে কবতে আনন্দে দিনটা কাটিযে দিলে, বিকাল হল, অন্ধকাব হল। বাঙ্গাবও কেমন ভয হল বাত্তিবে—অনেক বাত্তিবে ফিবে এল। দুযাব বন্ধ। কবাট আঁচডাতে লাগল, কেউ সাডা দেয না। শেষে এসে রূপাব ঘবেব বাইবে কুণ্ডলী পাকিযে শুযে পডল। হঠাৎ অন্য পাডায কুকুবদেব ডাক শুনে আবাব মাথা তুলে বসল। তাবপব দাঁড়াল। তাবপব উচ্চস্ববে চীৎকাব কবলে—হো-উঃ উঃ। একবাব-দুবাব, কিন্তু আব না। কে দুযাব খুলে এসেছে। তাব গাযেব গন্ধ চেনা। রূপা তাকে জডিযে ধবলে। আঁচল দিযে গলা বেঁধে ফেলল। তাবপব বাডিব বাইবে একটা দডি দিযে বাঁধল। ইচ্ছা কবলে তা কামডে ছেঁডা যেত, কিন্তু বাঙ্গাব সে ইচ্ছা তখন আব ছিল না। সাবাদিন আব বাত সে অনেক ঘুবেছে। এখন একটু বিশ্রাম চায। চুপ কবে সেখানে শুযে পডল। ভোবেই রূপা উঠে এলো। সঙ্গে পান্না। তাবা টেনে নিযে গেল বাঙ্গাকে কমলাদিব বাডিতে। কমলাদিকে ঘুম থেকে তুলল—সেখানে বেঁধে বাখল—পাছে এ বাডিতে 'নতুন মা', উঠে টেব পান—তাব আগেই বাডি ফিবে এসে হাত-মুখ ধুযে রূপা কাজে লাগবে। কমলাদি' বলেন—'তা, এত সকালে আব কেন জ্বালাস। ও এমনি কববে।' রূপা বলে—'কেন পালায দেখুন তো।' 'জাত নেডী। ঘবে থাকতে ওদেব ভালো লাগে না।' বাঙ্গা খুশীই হল। একটু অপবাধবোধও আছে। আবাব মজাও পেল।

বছব খানেক পবেই বাঙ্গা অন্য ব্যাপাবে আবাব পালাল, সে আবেক বকম ব্যাপাব। বাঁধা থেকে থেকে কেমন অস্থিব হযে উঠেছিল সে, কেমন অস্বস্তি বোধ কবছিল। আব সেই সমযে দেখা হযেছিল ও-পাডাব কালি সেই কুত্তিটাব সঙ্গে। তাব চোখেও যেন কেমন চাউনি, আব কেমন একটা আকর্ষণ—বাববাব ঘুবে এসে দুযাবেব বাইবে দাঁডায—বাঙ্গাকে দেখে, দেখাও দেয। বাঙ্গাও সেই প্রবোচনাতেই যেমন কবে হোক বাত্রে শিকল খুলে পালাল।

আব কালিও কাছে। কিন্তু অমনি কালি দূবে সবে যায়, অথচ একেবাবে তাব সঙ্গ ছেড়েও পালিয়ে গেল না। কাছাকাছি, ঘুবে ঘুবে কেবলি তাব কাছে থেকে যায়। কোথা দিয়ে কী ভাবে বাঙ্গাব সমস্ত চৈতন্যকে আশ্রয় কবে একটা প্রবল তাড়না তাকে একেবাবে বন্দী কবে ফেললে। সেই বাগানেব পাশে লোকজন তাদেব একবাব দেখল, অন্য দিকে চোখ ফিবিয়ে চলে গেল। এক-আধটা ধাড়ী ছেলে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। কে যেন বললে—'রূপাকে ডেকে আন না। দেখুক'। পালিয়ে বাঙ্গা কোথায় গিয়েছে রূপাও খুঁজে পায়না। নানা খানে ঘুবে আসতে আসতে দূব থেকে দেখেই অন্য দিকে সে তাকিয়ে বইল। তাবপব নিঃশব্দে ফিবে গেল। আবও পবে বাঙ্গা অপবাধীব মতো বাড়িতে আবাব ফিবে এলো। কল্যাণ চেঁচিয়ে উঠল, 'এসেছে মা, ফিবে এসেছে।' কমলাদি বললেন, 'থাক, কিছু বলিস না।' রূপা একবাব এসে দেখল। তাবপব কমলাদিই তাকে কি বললেন—নিজেব খানিকটা মাছ-ভাতেব শেষ বাঙ্গাব বাটিতে ঢেলে দিয়ে রূপা নীববে জানাল, 'খা'। কল্যাণেব ইচ্ছা—পালানোব জন্যে বাঙ্গা শাস্তি পাক। কিন্তু মা গম্ভীব হয়ে বলেন,—নাঃ। তোমায় শাস্তি দিতে হবে না। কল্যাণ থেমে যায়—মা এমন গম্ভীব কেন? রূপাকে কমলাদি শান্ত কণ্ঠে বলেন, ওকে আব বেঁধে বাখিস নাএ সময়। বাঙ্গাও বিস্মিত। মাব নয়, ভর্ৎসনা নয়, গঞ্জনা নয়—সত্যই আশ্চর্য। বাঁধলও না তাকে রূপা। বাঙ্গাব কেমন অভিমান হল, দুঃখ হল। সে কি এতই অন্যায় কবেছে যে, কেউ তাকে আজ পালাবাব জন্য শাস্তিও দিচ্ছে না। অনেক পবে—বিকালে রূপা তাকে দূব থেকে নাইয়ে আবাব ছেড়ে দিল। খাবাব দিল, বললে 'খা'। তাবপব নীববে দাঁড়িয়ে দেখল তাব খাওয়া। কিন্তু তখনো কোনো কথা বলল না। ইস্কুল থেকে পান্না কল্যাণ বাড়ি এসে বাঙ্গাকে নিয়ে একবাব পড়ল—'পালিয়েছিলি কেন?' 'মাব খেতে ইচ্ছে হয়, না?' মা বাড়ি নেই, দু-এক ঘা কল্যাণ বসায়ও। বাঙ্গা ববাববকাব মতো এক-আধবাব চীৎকাব কবে আপত্তি জানায়, বাড়িব অন্য দিকে ছুটে যায়। কিন্তু বাইবে যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে। কল্যাণ চেন নিয়ে এগিয়ে যায়। তবু বাঙ্গা পালায় না। আব কল্যাণ চেন পবিয়ে দিলে শান্তভাবে তা মেনে নেয়। টানতেই কল্যাণেব পায়ে লুটিয়ে পড়ে—তাবপব একটু আদব খায়। আব দেখতে না-দেখতে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেব জায়গায় শুয়ে পড়ে। কিছুই আব তাব বিসদৃশ মনে হয় না। সব ভুলে যায়।

তবু কল্যাণের থেকে ঘনিষ্ঠতা বাঙ্গার বেশি থেকে যায় রূপার সঙ্গে, কমলাদির সঙ্গে, পান্নার সঙ্গে। কল্যাণও ভালো, কিন্তু বড় খেয়ালী সে। বড় হতে হতে নিজের খেলা ও বন্ধুবান্ধব নিয়ে মেতে উঠেছে। বাঙ্গাকে দু-এক সময়ে আদর না করে তা নয়। এক-আধদিন খেলার মাঠেও ডেকে নিয়ে যায়। কিন্তু তারপর আর তার মনেও থাকে না বাঙ্গার কথা। বাঙ্গাও সব বুঝে নিয়েছে—এখন ভোর ছটা বাজতেই সে তৈরি হয়ে ওঠে। কল্যাণ ও পান্নার সঙ্গে স্কুলে যায়। তারপর আবার তিনটে বাজতেই রূপার সঙ্গে যায় রেল-স্টেশনে। রূপা ট্রেনে ওঠে, বাঙ্গা পিছনে লাফিয়ে উঠতে যায়। রূপা অনেক কষ্টে তাকে নামিয়ে দেয়—মারের ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়—গাড়ি ছাড়ে। বাঙ্গা তবু কতকটা গাড়ির সঙ্গে যায়, প্লাটফর্মের শেষ অবধি। তারপর থামে, দাঁড়িয়ে থাকে। শেষে আস্তে আস্তে ফিরে চলে—দাসবাবুর জামা-কাপড়ের দোকানের সামনে দাঁড়ায় দু-এক মিনিট। কখনো দু-এক দফা মারামারিও করে ওখানকার কুকুরগুলোর সঙ্গে। কিন্তু শেষ অবধি বাড়ি ফিরে যায়। খালি বাড়িতে পাহারা দেয়। এখন পান্নাই কল্যাণের খাবার বের করে দেয়। বাঙ্গাকেও একটু কল্যাণের প্রসাদ দেয়, বাঙ্গাও তারপর আবার ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। কখনো একা পথে, কখনো বা অন্য পাড়ায়, কিম্বা মাঠে ঘাটে। সন্ধ্যায় কমলাদির আগে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু রাত্রি নয়টার দিকে আবার গিয়ে দাঁড়ায় স্টেশনে। রূপা আসবে—ইভনিং ক্লাসের পড়া শেষে রূপা আসে। নামতেই বাঙ্গা তার গায়ে লাফিয়ে উঠতে যায়, সেই স্টেশনের মধ্যেই তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। একটু আদর না করতে রূপার নিষ্কৃতি নেই। বাঙ্গাও ছাড়বে না। রূপারও সম্ভবত ও রূপই ইচ্ছা, অন্তত অভ্যাস।

হাঁ, সে নেড়ী কুকুর, কিন্তু বাঙ্গা জানে সে সামান্য নয়। রূপার সে কুকুর, কমলাদি'রও আদর পায় আর পান্নার কল্যাণের। আরেকটা কথাও সে জানে—তার দেহ রীতিমতো পুষ্ট বৃহৎ ও সবল। মার খেয়ে খেয়ে তার হাড় শক্ত। মারামারিতে সে হার মানে না। বরং অন্যদেরই পরাস্ত করে। এক আধ কামড় খেলেও চেটে সেরে ফেলে নিজেকে। নাহলে রূপাও বেঁধে দেয় চুনে হলদিতে পাতা দিয়ে তার ব্যাণ্ডিজ। এখন তাকে সমীহ করে বড় বড় চেনে বাঁধা কুলীন কুকুরেরা। তাদের মুনিবেরাও আর অত সহজে তার বিরুদ্ধে ওসব লায়ন হিটলারদের লাগিয়ে দেয় না। এমন কি, তার পিঙ্গল রঙের ঔজ্জ্বল্য গা বেয়ে পড়তে দেখে তারা তাকিয়ে থাকে। 'তোর

বাঙ্গার কোটটা চমৎকার হয়ে উঠেছে।' সস্মিত মুখে কমলাদি বলেন রূপাকে। রূপা সস্নেহে তাকিয়ে থাকে বাঙ্গার দিকে। কমলাদিকে বলে, 'তুমিতো বলো নেডী।'

কমলাদি বলেন, 'তা নয়তো কি বলব—সাহেবের বাচ্চা?'

—না হোক, কিন্তু দেখছ তো রঙটা চকচকে—কমলাদি বলেন,—'দেশী রঙ কি ফ্যালনা?—তোর নিজের রঙটাই দেখনা?'

রূপা লজ্জা পেয়ে বলে, হ্যাঁ, নেডী তো, তাই ভালো, না রে বাঙ্গা?'

কথাগুলি না বুঝলেও বাঙ্গা অর্থ গ্রহণ করতে পারে। সগৌরবে লেজ সঞ্চালিত করে মুখের দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠবার উদ্যোগ করে।

মতলব বুঝে বাঙ্গাকে কমলাদি ছল করে হুকুম দেয়, 'থাম ছুঁচো, ওকে তোর জড়িয়ে ধরতে হবে না। অনেক লোক আছে সেজন্য।'

সে ছল-হুকুমে বাঙ্গা বাধা না মেনে বরং উৎসাহিত হয়ে দুপা তুলে দেয় রূপার প্রায় কোলের ওপর। ছাড়িয়ে দিতে গেলে চারদিকে এমনভাবে নৃত্য জুড়ে দেয় যে, রূপা ছাড়াতে পারে না। কমলাদিও তাকে ছাড়াতে গেলে বাঙ্গা তাকেও ঘিরে শুরু করে দুরন্তপনা। রূপা ও কমলা দুজনায় ছাড়াতে-ছাড়াতেও খুশিতে হাসিতে হাঁপিয়ে ওঠে।

'হুঁ বাঙ্গার খুব বস হয়েছে।'—কমলাদি' বলেন।

রূপা বলে, 'তোমাকে ও ভালোবাসে কমলাদি।'

—'তবু ভালো, একটা কিছু প্রেমে পড়েছে—জীবনটা তো না হয় শেষ হয়ে যাচ্ছিল অমনি। কি বলিস বাঙ্গা? রূপাকে চাই, না আমাকে?'

বাঙ্গা রূপার নাম শুনে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দু-পা সুদ্ধ পাছার উপরে বসে দু-পা সামনে রেখে মুখটা একেবারে রূপার মুখের দিকে রাখে আর ঘন ঘন শ্বাস ফেলে হাঁপায়।

কমলাদি বলেন, 'দেখলি আমার কপালে তাও নেই। একটা নেডী কুকুরও তাকাবে না। তোর বাঙ্গা তোরই থাক।'

২

এরই পরে বাঙ্গার কপালে একটা অঘটন ঘটল। কখন কি হয়েছিল জানা যায় নি—বাঙ্গা তা কাউকে বলেনি। রূপাকেও না। আর যারা জেনেছিল তারাও গেছল চেপে। কিন্তু ক-মাস পরে খাঁ-দের সাধের এলসেশিয়ান বাজ্জী ইভা যে নতুন বাচ্ছা চারটি উপহার দিল তা' কারও সাধ্য নেই বলে আর্য

ফ্যুহববেব তা অপত্য। মাযেব আদল সত্ত্বেও শাবকদেব পিতাব পবিচয তাদেব সাবা দেহেই নাকি বিদ্যমান। পা, নখ, দেহেব গডন অবিকল বাঞ্ছাব। খাঁ-দেব বাডিতে যে প্রলয ঘটলে, তা জানা গেল না। বলবাম সর্দাবেব প্রথমে চাকবি গেল, তাবপব চাকবি বইল কিন্তু বেতন কাটা গেল। অঘটনেব কাবণ যে মূলতঃ আমোদী ঝিব সঙ্গে বলবামেবও একটা বিশেষ সম্পর্কেব জন্য, সে কথাটাও খাঁ-দেব কানে উঠল। কিন্তু সকলেব ক্রোধ হল এই গুণ্ডা নেডী কুত্তাটা উপবে—বিশেষ কবে বলবামেব। একটা পবিত্র কুলে সে কালি দিযেছে। গুলি কবা মাবা উচিত।

তাকে মাববাব ষডযন্ত্র চলছে বাঞ্ছাবও তা বুঝতে দেবি হল না। সতর্কও সে হল। মাথায লাঠি পডতে পাবে। বলবামেব চাকবিতে অত ক্ষতি হল, আব খাঁ বাবুদেব ইভাব অমন কবে জাত মেবে দিলে এই গুণ্ডা নেডী কুকুবটা। সদা, বীকবাবু, হাবান ভট্টাচার্য প্রভৃতিও একটু চিন্তিত হল। ভোঁতা হযেছে বটে খাঁদেব মুখ, কিন্তু এই বাঞ্ছাটাব হাতে তাদেব কুলীনপুত্র ও কুলীন কন্যাদেবও নিগ্রহ ঘটতে পাবত। বুঝে বাঞ্ছা পথে বিপথে বেপাডায যাওযা-আসা কমিযে দিযেছে। তবু স্টেশনেব দিকে কে তাকে একটা ধাবাল লোহা ছুঁডে মাবল, আব লাগবি তো লাগ, তা লাগল বাঞ্ছাব পিছনেব পাযে। বক্তাবক্তি। অনেক কষ্টে বাঞ্ছা দোকানে গিযে পৌছল। কিন্তু খোঁডা দাশবাবু নডতে পাবেন না। বাডিতে খবব পাঠান। রূপা ছুটে এলো—কাপড দিযে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বাঞ্ছাকে বিক্সা কবে সে নিযে চলল তিন মাইল দূবেব পশু হাসপাতালে। সেদিন কলেজে যাওযা হল না। বাত্রিতে কমলাদিবও প্রায খাওযা দাওযা বন্ধ। রূপাব তো কথাই নেই। কাজটা বলবাম সর্দাবেব বোঝা গেল—কিন্তু উপায কি ? আপাতত নিশ্চিন্ত হতে পাবল—সদাবা।

মাস তিনেকে বাঞ্ছা তবু দাঁডাল—তবে তিন ঠ্যাং-এ। সদা বলে—'ওই দাশবাবুব মতোই।' বাঞ্ছা ছুটতে পাবে না। বাধা মানবাব মতো সে নয, সাডে তিন ঠ্যাং-এও সে দাঁডিযে ওঠে, দৌডোয একটু লেংচিযে। কিন্তু ফলে সে আবও বেশি কবে রূপাব সঙ্গী হযে উঠল—ববং সঙ্গীবও বেশি। রূপাব যত্নেই বেঁচেছে, নইলে ঠ্যাংটা কেন, প্রাণটাও যেত।

রূপাব সঙ্গেই যায-আসে—স্টেশনে, বিকালে সন্ধ্যায। চেনে সে তাব প্রত্যেক সহযাত্রীকে। আব, দেখতে দেখতে আবেকটা জিনিস বাঞ্ছা দেখে

নেয। সেই যে বাবুটি কমলাদিদেব বাডি কদিন ছিল, কি কাজ কবে শহবে, এখন শহবেই থাকে—সেই অজিতবাবু কেমন কবে জানে কোন ট্রেনে রূপা যায শহবে পডতে, কোন ট্রেনে ফেবে। আব তাবপবে কদাচিৎ রূপাব সঙ্গে হঠাৎ তাব দেখা হযে যায়। স্টেশনেব পথে, কখনো বা দাশবাবুব দোকানে, কখনো বা ফিবতি ট্রেনে। আব রূপাকে একেবাবে প্রায বাডি অবধি পৌঁছে দিযে অজিত ফিবে যায। ডাউন ট্রেনে। দু-সপ্তাহে দু-একদিন এমনি হয। হঠাৎ দেখা হয তাদেব। তাবপব দু-তিন দিন, তাবপব প্রতিদিন। বাঞ্ছা তো অবাক, রূপা এখন তাকে দেখে আদব কবতেও ভুলে যায, ববং সেই অজিতবাবু তাকে বলে—'কি কাণ্ড। থাম না', কিম্বা, 'বড বেশি তোমবা নাই দিযেছ। মাঝে-মাঝে প্রহাবও কবতে হয—নেডী তো।' রূপা বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবে বলে অজিতকে—'বিলিতি না হলে আপনাদেব মনে ধবে না।' 'একেবাবে মিথ্যে নয। কিন্তু বিলিতি সবটাই কি ভালো বলি ?'

রূপা বলে 'কোনটা ভালো বলেন দেশেব, বলুন তো।'

—'কেন, দিশি বউ।'

রূপাও অজিতেব সঙ্গে পবিহাসমুখব হতে পাবে বিলিতি পান না বলে বোধহয।'

—'না, পেলেও তাবা বউ হয না বলে।'

—'কি হয তবে তাবা।'

—'ওযাইফ্।'

—'সে বুঝি বউ নয।'

—'তাব থেকে বেশি—যদি বনে, তাব থেকে অনেক কম—যদি না বনে।'

—'তাতে নতুন কি আছে ? বনলে চমৎকাব। না বনলে, প্রাণান্ত—এতে আবাব দিশি-বিলিতি কি ? কিন্তু আমাব বাঞ্ছাকে দেখুন—ও হতভাগা হাড জ্বালাতেও ওস্তাদ, আবাব মাব খেযেও আক্কেল নেই। ছাডবে না।'

—'প্রায দিশি স্বামী।'—অজিত বলে।

এবাব রূপা পাবে না। 'ছিঃ, কি বলেন। আপনাবা যা-তা বলতে পাবেন। আমবা কিন্তু অত ভালোও দেখি না, অত মন্দও বুঝি না তাদেব।' গল্পে মশগুল। বাঞ্ছা যে সঙ্গে চলেছে, তা যেন ওদেব দৃষ্টিতেও পডে না।

একদিন সন্ধ্যায এলো বৃষ্টি—পথেব মাঝে।

অজিত বললে, 'চলো ভিজি।'

রূপা বলে - 'পাগল ? ভেজা জামা-কাপড় শুদ্ধ তোমাব ফিবতে হবে না ?

কাছে একটা পড়ো-পড়ো চালা ঘব—কেউ নেই। রূপা দেখিযে বললে, 'চলো একটু দাঁড়াই বৃষ্টিটা ধরুক।'

দাঁড়াল ওবা দুজন—আব বাঙ্গা এক কোণে।

বৃষ্টিব ছাঁট আসছে, ওবা কাছাকাছি প্রায় ঘেঁষে দাঁড়ায—বাঙ্গাও এসে দাঁড়ায পাযেব কাছে। রূপাব একটা হাত ধবে অজিত। 'ওকি'—রূপা সবে যায। কথা বলে না।

অজিত এগুতে গেল—বাঙ্গা ওব গাযে লাফিযে উঠতে যায।

অজিত বিবক্ত হযে বলে—'নুইসেন্স।'

রূপা বাগ কবে বাঙ্গাব উপব - 'বাঙ্গা। কী হচ্ছে।' বাঙ্গা থামে। তাব অপমান বোধ বেড়ে যায। সে আবও বেযাদপি কবতে চায। রূপাকে ঘিবে ধববে তাব সাড়ে তিন ঠ্যাং নিযে। 'আঃ'—রূপা বিবক্ত হযে বলে। অজিত একবাবেব মতো বাঙ্গাকে একটা লাথি মাবতে যায। রূপা তাকে ধবে ফেলে বলে 'ছিঃ।' একটা খোঁড়া জীব।' অজিতই লজ্জিত হয, বলে 'সবি।' তাবপব বাঙ্গাব মাথায হাত বেখে তাকে শান্ত কবতে চায আদব কবে। বাঙ্গা গ্যাঁক কবে ফিবে তাব হাতে বসিযে দিলে এক কামড। 'বাঙ্গা' বলে রূপা ধমক দিযে ফল পায না, বাঙ্গা তখন দূবে সবে গিযেছে। অজিতেব হাত রূপা নিজেব হাতে তুলে নেয—'বক্ত বেবিযেছে ?'

অজিত বলে—'নাঃ।'

– 'বেবিযেছে, নিশ্চযই বেবিযেছে—'

—'নিশ্চযই নয।' অজিত রূপাকে কাছে টেনে নেয।

তাবপব বাঙ্গা যা ভেবেছিল তাই বুঝি ঘটে। কিন্তু ওদেব দুজনাব দেহ এক নিমেষও একত্র হল না। রূপা এক লাফে ঘব থেকে বাইবে এসে পড়ে। বৃষ্টিব মধ্যে সে পথে বেবিযে পড়ে। আব অজিত ক মুহূর্ত স্তম্ভিত হযে দাঁড়িযে থেকে তাব পিছনে পিছনে ছোটে। বাঙ্গা ছোটে তাবও পিছনে পিছনে। ভিজে জোব গলায বাঙ্গা চীৎকাব কবে। একটা গাছতলায রূপা আশ্রয নেয। অজিত এসে একটু দূবে দাঁড়ায।

দুজনায কি বলতে থাকে। কি ভাবে কাঁদতে থাকে রূপা। কেন ? অজিত দু-হাত ধবে। আবাব রূপা চুপ কবে। কেন ? তা বাঙ্গাব বুঝবাব সময হয

নি। ভিজে ভিজে সে প্রাণপণে ডেকে চলেছে, তারই মধ্যে দেখে রূপা অজিতের হাত হাতে তুলে নিলে। রক্ত। বাঙ্গা তুই কি সর্বনাশ করলি—' তারপর আর কথা নেই। হাতে হাত দুজনে বৃষ্টি মাথায় ষ্টেশনে ছুটে গেল। বাঙ্গা বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল। অজিতের হাতে কি লাগাল ষ্টেশন বাবু। গাড়ি এলে অজিত চলে গেল, রূপা শুকনো মুখে বলল—'কি হবে বলো?' রূপার পিছনে পিছনে ভিজে একাকার হয়ে বাঙ্গাও এলো বাড়ি। তখনি চেনে বাঁধা হল তাকে—একজন ভদ্রলোককে ও কামড়েছে। দেখতে হবে কি হয়—আসছে পনের দিনে। বাঙ্গারই যেন সব দোষ।

দিন চলে গেল—বাঙ্গা বাঁধন ছিড়লে না। সে ভদ্রলোকও আর আসে কিম্বা আসে না, তা বাঙ্গা জানে না। তারপর বাঙ্গা ছাড়া পেল—আবার রূপার সঙ্গে যায় স্টেশনে, আবার আসে রূপার পিছনে। রূপা দেখেও তাকে দেখে না।

বাঙ্গা দেখলে—একদিন রূপার নতুন মায়ের সঙ্গে কমলাদির তুমুল কলহ। সেসব বাঙ্গার পক্ষে দুর্বোধ্য।

শুভ্র ঘোষ বললেন, 'কুলীনের মেয়ে, তোমাদের ঘরে দোব, এমন কথা ভাবলে কি করে? তোমরা তো ন ঘরের মধ্যেও পড়ো না, আমার আরও মেয়ে আছে তাদের পরে কোথায় বিয়ে হবে এখন, তোমাদের কি ঘরে বললে—নবশাখ—তিলি না তামলি যাই হোক—আমরা কি করে তোমাদের ঘরে বিয়ে দিই, বলো?'

চন্দ্রমুখী বললেন 'তখনি জানি অঘটন ঘটবে। এ মেয়ে কুলে কালি দেবে। ওবাড়িতে যখন অত ঘুস্ ঘুস্—তখনি আমার বুঝতে বাকি নেই। এখন দেখো আর কি হয়—পেটে কী আছে ওর—'

এসব বাঙ্গার বুদ্ধির অতীত। সে কেবল দেখল রূপার ও পান্নার কান্নাকাটি। বাড়িতে রূপা কয়েদ হল, পান্নার স্কুল বন্ধ হল। দু বাড়ির মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ সকলের। বাঙ্গা বুঝেই ওঠে না—তারই মধ্যে তবু একদিন দুপুরে রূপা চলে গেল স্টেশনে। বাঙ্গা তার পিছনে। অজিতও এলো, কী কথা হল—কে জানে, ট্রেন ছাড়ছে অজিত রূপার হাত ধরে টানতে লাগল—রূপা নড়েনা, মাথা নেড়ে বললো 'না'।

সে গাড়ি ছেড়ে গেল। কেউ গেল না। প্লাটফর্মের এক কোনে দুজনা রৌদ্রে—বাঙ্গা দূরে বসে দেখে। আরেক গাড়ি এলো। দুজনে হাত ধরে চলল।

কিন্তু গাডিব কাছে গিযে রূপা টিপ কবে প্রণাম কবে উঠে দাঁডাল, তাবপব মুখ ফিবে দিল দৌড। বাঙ্গা সঙ্গে সঙ্গে সাডে তিন ঠ্যাংএ ছুটছে—অজিত তখনো ডাকছে। কিন্তু রূপা আব ফিবে দাঁডাল না। স্টেশনেব বাইবে চলে গেল। গাডিও ছেডে দিল। রূপাব দু-চোখ জলে ভবে গেল।

রূপাব পিছনে পিছনে বিনা বাক্যে বাঙ্গাও এলো বাডি।

সেদিন বাত্রিতে খুট কবে দুযাব খুলতেই বাঙ্গাও দাঁডিযে উঠল। একটু কান পেতে বইল রূপা—তাবপব পা বাডাল। বাঙ্গাও পিছনে পিছনে আসছে—রূপাব সে বোধ নেই। তাবপব পিছনেব দুযাব খুলে সেই আধা জঙ্গুলে মাঠ পেবিযে রূপাব পিছু পিছু বাঙ্গাও চললে। কোথায ? একটা কাদা-জলে-ভবা নর্দমা পেবিযে রূপা গিযে উঠল বেল লাইনে। দূবে দেখা যায সিগন্যাল। তাবপব হাঁটতে লাগল লাইন ধবে, হাঁটতে লাগল হাঁটতে লাগল—হাঁটতে লাগল—

শব্দ শোনা যায। বাঙ্গাব কান খাডা হয—অনেক দিনেব চেনা শব্দ। অবশ্য রূপাব কানে তা পৌঁছায না। বড নিচু—লোহায একটা সুদূবেব ঘর্ষণেব ক্ষীণ শব্দ তাও গড গডগড শব্দ। বাঙ্গা এ শব্দ চেনে—দূবে ট্রেন আসছে। হাঁ নিঃসন্দেহে আসছে—টুঙ টুঙ টুঙ এশব্দ অভ্রান্ত। মানুষেব কানে তা তখনো ধবা পডে না। কিন্তু বাঙ্গাব কানকে ফাঁকি দেওযা যায না। সেই শব্দ আবও স্পষ্ট হচ্ছে। বাঙ্গাব কানে—ঢঙ্ ঢঙ্ ঢঙ্ ঢঙাস ঢঙ্—। এ শব্দ পবিষ্কাব। আবও শব্দ—লাইনেব ওপবে পিছন ফিবে দাঁডায বাঙ্গা। ইঞ্জিনেব আলো দেখা যায, এই আলোও চেনা বাঙ্গাব। না মালগাডি আসছে। এগিযে আসছে। এখনি এসে পডবে। কিন্তু রূপা কবছে কি ? শুনছে না ? একবাব পিছন ফিবে তাকাল রূপা।—গাডীটাকে দেখল, তাবপবে সেদিকে পিছন ফিবে দুলাইনেব মাঝখানে রূপা চলতে লেগেছে। রূপা একি কবছে। একি। একি কবছে রূপা ? গাডি যে এসে যাচ্ছে। আব যে সময নেই। বাঙ্গা সশব্দে আর্তনাদ কবে উঠল 'রূপাদি' 'রূপাদি' 'রূপাদি।' গাডিব শব্দ ছাডিযেও একটা পবিচিত ডাক কানে গেল এবাব রূপাব—'বাঙ্গাব ডাক ?' 'বাঙ্গা কোথায ?' ফিবে তাকাল রূপা, আব এক মুহূর্তে বুঝল বাঙ্গা তাবই পিছনে পিছনে লাইন ধবে আসছে। ইঞ্জিনেব নিচেই বুঝি যাবে। 'বাঙ্গা' 'বাঙ্গা' 'বাঙ্গা' আর্তস্ববে রূপা ডাকে 'বাঙ্গা'। বাঙ্গা দাঁডায, একবাব দাঁডায, তাবপব একটু পাশে গিযে দাঁডায। 'বাঙ্গা, বাঙ্গা, সবেযা, সবে যা।' সাডে তিন পাযে লাফিযে বাঙ্গা

রূপাকে জড়িয়ে ধরে গুমরিয়ে ওঠে—'ওঃ। ওঃ।' তারপর একবার আর্তনাদ করে গলা ফাটিয়ে—সাড়া দেয় 'সরে এসো, সরে এসো, সরে এসো'। রূপা তাকে টেনে ছাড়িয়ে সরিয়ে দিতে চায় লাইনের বাইরে। কিন্তু, 'না, না', 'না', বাঞ্ছা ছাড়ে না, শাড়ী ছিঁড়ে যায়—খুলে আসে বাঞ্ছা। অসভ্য। উন্মাদ—

'আঃ।' দুহাতে শাড়ি সামলিয়ে নিয়ে বাঞ্ছাকে ঠেলে দিতে যায় রূপা। আর সময় নেই, সময় নেই। হতভাগা মরবে এখন। প্রাণপণে রূপার উপর লাইন ছাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠেলে দেয় বাঞ্ছা উঁচু রেলপথের একেবারে নিচে তারপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে চেষ্টা করে। সে চীৎকার গাড়ি হুড় হুড় করে ডুবিয়ে বিকট আওয়াজ তুলে চলে যেতে থাকে ঘট, ঘটাং ঘটাং ঘট।

সত্যই অঘটন ঘটল। ভোর রাত্রে অজিত তার বাড়ির দুয়ার খুলে দেখলে—আলুথালু চুল উদ্দীপ্ত চোখমুখ রূপা—আর তার পিছনে সেই সাড়ে তিন ঠ্যাংএর বাঞ্ছা—ক্লান্ত রূপা হাসতে চেষ্টা করলো,বললে—'তোমার কথাই রাখলাম—বাঞ্ছার জন্য। কিন্তু পান্নাকে আনতে হবে তো—।

যেন জনৈকা মার্কসীয়া

বিষ্ণু দে

চেনাই কঠিন, কখনও হযতো মালতীলতাই দোলে,
কখনও বা নাচে সাগবোত্থিতা হাওযায,
আবাব কখনও অশ্রুসিক্ত পূবেব চোখেব জলে,
কখনও বা পাতাঝবা গান কবে অবিবাম মুদ্রায।

তাকেই কি দেখি পিযাল আবাব অটল অচল ঠায ?
শিকড়ে শিকড়ে গম্ভীব স্থিতি, ঝড যত হাওযা তোলে
তালফেবতায দ্বন্দ্বমুখব হবেক আকর্ষণে,
সে কবে হৃদযে রূপান্তবিত, ঠাটে বাঁধে, মাথা নাড়ে,
মৃদু আলোছাযা দুইহাতে পডে পল্লবঅঞ্চলে।

কি ক'বে মালতী হল যে পিযালী-স্বয়ং।
কোন্ শক্তিব মৃত্তিকা থেকে লাগডাঁটে ধবে নিজেকে ?
এই উল্লাসে এই মর্ষণে অপবাজেয কি কেন্দ্রিকে
মার্কসীযা যেন খুঁজে পেল তাব বিশ্বব্যাপ্ত বিচিত্রায সোহহম্ ?
কিসেব মাধ্যকর্ষণে ?

সত্যকাম

উমানাথ ভট্টাচার্য

চরিত্র

বাণী — বয়স ২৭	সমরেশ — বয়স ২৫
অরুণ — বয়স ৩৫	নিমাই — বয়স ২৫
মধু — বয়স ২০	নন্দ — বয়স ২৩
হরনাথ — বয়স ৬৫	কানু — বয়স ২০

[ঘর। দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। সতরঞ্চি ঢাকা তক্তপোষ, কাঠের চেয়ার একটা, ছোট টেবিল। পিছনে জানালা। বাইরের দিক থেকে অরুণ ও ভিতর দিক থেকে বাণী—একই সঙ্গে দুজনের প্রবেশ। সময়—সন্ধ্যার প্রাক্কাল।]

বাণী ॥ আজ কেমন দেখলে অরুণদা ?

অরুণ ॥ বসো, বলছি।

বাণী ॥ না, বসব না। বাবাকে ওষুধ খাওয়াতে হবে।

অরুণ ॥ আলোটা জ্বালো না।

[বাণী সুইচ টিপে আলো জ্বালে। আবছায়া কেটে গিয়ে উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে যায়]

বাণী ॥ বলো এবার। বলো না। বলছি আমার তাড়া আছে।

অরুণ ॥ তাহলে ওষুধটা তুমি খাইয়েই এসো।

বাণী ॥ বেশ, তাই আসি। (ভিতরে যেতে গিয়েও থেমে যায়, কি ভাবে, ফিরে আসে) না, তুমি বলো, শুনেই যাই। জানি, ভালো আছে, তবু আর একবার শুনতে ইচ্ছে করে।

অরুণ ॥ তোমার মুখ থেকে আমারও তো অনেক কিছু শুনতে ইচ্ছে করে; তাই বলে—

বাণী ॥ রঙ্গ রাখো। বলো না।

অরুণ ॥ তুমি ওষুধটা খাইয়ে এসো, তারপর বলছি।

বাণী ॥ বেশ। চলে যেওনা যেন।

(ভিতরে প্রস্থান)

[অরুণ ইতস্তত পায়চারী করে। প্রবেশ করে মধু]

অরুণ ॥ একি! তুই চলে এলি কেন? তোকে না ওখানে থাকতে বললাম?

মধু ॥ একা একা আমার ভয় করছিল।

অরুণ ॥ আমি তোকে বলে এলাম না, আমি এখুনি যাচ্ছি?

মধু ॥ একা একা আমার ভয় করছিল অরুণদা।

অরুণ ॥ তাজ্জব কথা শোনালি মধু। হাসপাতালের ভিড়ে মানুষে পা ফেলার জায়গা পায় না, আর তোর একা একা ভয় করছিল।

মধু ॥ ওরা সব রুগী তো!

অরুণ ॥ আর তুই খুব সুস্থ, না? বললাম ধারে কাছে থাকতে, যদি হঠাৎ কিছু দরকার হয়। এখন খুঁজলে কাকে পাবে বল?

মধু ॥ তুমি আর কাউকে পাঠাও।

অরুণ ॥ শোন মধু, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। ডাক্তাররা বলেছে crisis, কিন্তু একেবারে তো হাল ছেড়ে দেয়নি। আমিও চাইছি না এই crisis-এর কথাটা এখুনি পাঁচ-কান হোক। crisis এর আগেও এসেছে, আবার কেটেও গেছে। এবারও নিশ্চই কেটে যাবে। কী দরকার খারাপ অবস্থার কথাটা পাঁচজনকে শুনিয়ে শুনিয়ে অযথা ব্যস্ত করার? তুই যা, ডাক্তার মুখার্জিকে বলিস, আমি একটু পরে যাচ্ছি। কাছে কাছে থাকিস।···যা।

মধু ॥ তুমি বুঝতে পারছ না অরুণদা—

অরুণ ॥ স্ স্। আস্তে বল।

মধু ॥ তুমি কেন বুঝতে পারছ না অরুণদা? এইটুকু বয়স থেকে আমরা একসঙ্গে খেলা করছি, একসঙ্গে ইস্কুলে পড়েছি, একসঙ্গে রাজনীতিতে নেমেছি। ঝগড়া করেছি, মারামারি করেছি, আবার মুখোমুখি বসে শুধু কথা বলে কতদিন কেটে গেছে।—ওয়ার্ডের বাইরে বেঞ্চিতে বসে জানলা দিয়ে আমি যতবার ওর দিকে তাকাই, সেইসব কথা মনে পড়ে আমার ··ডুকরে কান্না পায় অরুণদা। সত্যকাম যে আমার ভাইয়ের মতো—

[চাপা কান্নায় গলা বুজে আসে]

অরুণ ॥ (মধুব কাঁধে হাত বাখে) মধু। (মধু মুখ তুলে তাকায়।) চল বাইবে—

[দুজনে বাইবে যায়। ভিতব থেকে প্রবেশ কবে বাণী]

বাণী ॥ অরুণদা।· এ কি। চলে গেল। বললাম বসতে—

[হবনাথেব প্রবেশ]

হবনাথ ॥ আজকেব খববেব কাগজটা কোথায় বেখেছিস বাণী ?

বাণী ॥ তুমি আবাব উঠে এলে কেন বাবা ?

হবনাথ ॥ খববেব কাগজটা—

বাণী ॥ ওই ঘবেই আছে। চলো, দিচ্ছি। হাঁটা-চলা কবা তোমার একদম বাবণ চলো—

[দুজনেব ভিতবে প্রস্থান। প্রবেশ কবে অরুণ]

অরুণ ॥ বাণী।

নেপথ্যে বাণী ॥ যাই।

[বাণীব প্রবেশ]

বাণী ॥ ভানুমতীব খেল দেখাচ্ছ নাকি অরুণদা ? এই আছে, এই নেই। কোথায় গিয়েছিলে ?

অরুণ ॥ বাবাকে ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে ?

বাণী ॥ হ্যাঁ। এইবাব বলো। সত্যকাম বাড়ি ফেবাব জন্যে খুব ব্যস্ত হয়েছে, না ?

অরুণ ॥ ও তোমাব থেকে ক' বছবেব ছোট ?

বাণী ॥ কে, সত্য ? তা বছব পাঁচেক হবে। মা যখন মাবা গেল, ওব বয়েস তিন, আমাব তখন আট কি নয়।

অরুণ ॥ তুমিই তো সবচেয়ে বড ?

বাণী ॥ হ্যাঁ। কিন্তু পুবনো কথা—এসব আবাব জানতে চাইছ কেন ?

অরুণ ॥ জেনে বাখি। সত্যকাম একটা ঐতিহাসিক চরিত্র হয়ে উঠেছে তো। যদি কোনো দিন ইতিহাস লিখি, কাজে লাগবে।

বাণী ॥ ঐতিহাসিক চবিত্র তা বটে। ডাক্তাব ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যেদিন বললেন, উচ্ছৃঙ্খলতা কেমন কবে দমন কবতে হয় আমি জানি এবং আমি তা কবব—তখন একবাবও ভাবতে পাবিনি যে, আইন-শৃঙ্খলাব প্রথম গুলিটা ওকেই এসে আঘাত কববে। ওদেব গণতন্ত্রেব প্রথম শিকার···ঐতিহাসিক তো বটেই।

অরুণ ॥ আবও আছে।

রাণী ॥ হ্যাঁ, আবও আছে। বুকে গুলি খেযে ওই বাইশ বছবেব ছেলেটা আজ দেড মাসেব ওপব মৃত্যুব সঙ্গে সমানে লডাই কবেছে, লডাইযে জিতে সুস্থ হযেও বাডি ফেবাব জন্য তৈবি হচ্ছে। এমন লডাই কজনে দেখেছে বলো ?

অরুণ ॥ এমন লডাই কজনে কবেছে বলো ?

রাণী ॥ হ্যাঁ সত্যকাম আমাব ভাই, ভাবতে আমাব গর্ব হয অরুণদা। (অরুণ বাণীব দিকে একদৃষ্টে চেযে থাকে।) কী দেখছ ? বলো, সত্য আজ কী বলল। বাবার শবীবটা হঠাৎ খাবাপ হযে পডল বলে আজ যেতে পাবলাম না। এত খাবাপ লাগছে—

অরুণ ॥ এখন যাবে ?

রাণী ॥ এখন বাবাকে একলা ফেলে—। তোমবাই তো ছিলে ; বলো না, কি বলল। আমি ববং কাল সকালে যাব। তুমি সঙ্গে কবে নিযে যেও।

অরুণ ॥ বেশ। তবে আমি বলছিলাম, এই সমযটা আত্মীয-স্বজনেব সঙ্গে কথা বলাব জন্যে মন ছটফট কবে তো।

বাণী ॥ তুমিই তো বযেছ। নাইট ডিউটি না আজ ? ··ওকে বোলো, কাল সকালবেলা আমি গিযে ওব সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ গল্প কবব। (হঠাৎ হেসে ফেলে) কাল বিকেলে ও আমাকে কি বলেছিল জানো ? ফিবে এসে ইস্কুল-বাডিতে একটা মিটিং কববে, আব সেখানে পাডাব সব বুডোদেব ডেকে দেখাবে ওব বুকেব ফুটোটা, তাবপব বলবে—

অরুণ ॥ (হেসে) বুঝেছি। তুমি কি বললে ?

বাণী ॥ এদিকে বাজনীতিব ধুবন্ধব, কিন্তু ছেলেমানুষী গেল না।

অরুণ ॥ ছেলেমানুষই তো। তুমি কিছু বলোনি ?

রাণী ॥ আমি ? হ্যাঁ। আমি বললাম, হাসপাতাল থেকে তুই ফিবে আয ; তাবপব দেখবি—তোকে দেখাব জন্যে বাডিতে লোক ভেঙে পডেছে।, বুকে গুলি খেযে তো কেউ ফিবে আসে না। (হঠাৎ কেমন গম্ভীব হযে যায) অরুণদা। সত্য আজ কি বলল তোমাদেব, কই এখনো আমাকে বললে না তো।

অরুণ ॥ (প্রথমটা যেন চমকে ওঠে, তারপর হেসে হালকাভাবে) তুমি··· তুমি তো জানো—সেই একই কথা। প্ল্যান করছে। বাড়ি ফিরে প্রথমে ও একটা প্রবন্ধ লিখবে, তারপরে—যেদিন ও গুলি খেল, সেদিন সেই মিছিলের শুরু থেকে মুক্তির সময় পর্যন্ত—

বাণী ॥ হাসপাতাল থেকে ও কবে ছাড়া পাবে অরুণদা ?

অরুণ ॥ পাবে।—খুব শিগিরই পাবে।

[দ্রুত সমবেশের প্রবেশ]

সমবেশ ॥ বাণীদি।··· এই যে। গুজব শুনেছ ?

বাণী ॥ কিসের ?

সমবেশ ॥ সিংহাসন টলমল। গেল-গেল-গেল, ধর-ধর-ধর। আর বোধহয় ঠেকিয়ে রাখা গেল না।

বাণী ॥ কী ঠেকিয়ে রাখা গেল না ?

সমবেশ ॥ সারাক্ষণ ঘরে বসে গুজুগুজু করে সময় কাটালে—

বাণী ॥ (ছদ্ম-ধমক) অ্যাই।

সমবেশ ॥ sorry বাইরে না বেরোলে কি করে জানবে দিদি ? সারা শহর সন্ধ্যে থেকে মুকিয়ে আছে, এই বুঝি দিল্লী থেকে খবর এল। এখনও বুঝলে না ? বাঙলার মসনদ হাতছাড়া—তুঘলকের রাজত্ব খতম ? ব্যস।

অরুণ ॥ এখনও তো খবর আসেনি।

সমবেশ ॥ আসবে দাদা, আসবে ; ফুটো নৌকো কতক্ষণ আর জল ছেঁচে ভাসিয়ে রাখতে পারবে বলো।

বাণী ॥ তাহলে তুই বলছিস, ঠেকা দিয়েও বাঁচাতে পারল না ?

সমবেশ ॥ উলটো, ঠেকা দিতে গিয়েই তো যত বিপদ। ভাগের বখরা নিয়ে কামড়া-কামড়ি। (হেসে ফেলে) এ জমেছে ভালো। এক ঘোষ রাজত্ব করে, আর এক ঘোষ তাকে মদত দেয়, আর থার্ড ঘোষ সবাইকে লেঙ্গি মেরে বাজী মাৎ করতে চায়। বোকারা বোঝে না যে, আমরা আছি , ওদের এই ল্যাং মারামারির ফলে মাঝখান থেকে আমরা জিতে যাই। · ভালো কথা। (অরুণকে) সত্যকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ দিচ্ছেন কবে ?

অরুণ ॥ অ্যাঁঃ। ও। হ্যাঁ।··· এসে পড়বে ; খুব শিগ্‌গিরই ছাড়া পাবে।

বাণী ॥ হ্যাঁ ; প্রায তো সেবে উঠেছে।

সমবেশ ॥ বাকিটুকু যা আছে, আমবা বাড়িতে এলে তদ্বিব কবে সাবিযে দেবো। পাবব না? (অরুণকে) আপনিতো ওখানকাব ডাক্তাব, তাড়াতাড়ি ওকে বিলিজ কবিযে দিন না।

অরুণ ॥ সময না-হলে আমাব কি ক্ষমতা যে তাড়াতাড়ি বিলিজ কবাব।

সমবেশ ॥ আসাব সময মধুটাব সঙ্গে দেখা হলো, হন্‌হন্‌ কবে কোথায চলেছে। ডাকলাম, একবাব গোল গোল চোখ কবে তাকিযে চলে গেল।

অরুণ ॥ কিছু বলেনি?

সমবেশ ॥ না। মনে হলো, কি যেন একটা ভাবনায পেযেছে। কি হযেছে ওব?

অরুণ ॥ আমি কেমন কবে জানব।

বাণী ॥ মধুব আজ বিকেলে হাসপাতালে যাওযাব কথা ছিল না?

অরুণ ॥ গিযেছিল—আমি দেখেছি ও গিযেছিল।

বাণী ॥ সত্য আজ কী বলল, আমায বলে গেল না তো।

অরুণ ॥ আসেনি এদ্দিকে। পবে এসে বলবে'খন।

সমবেশ ॥ ঘোষেবা বিদায নিক, সত্য ফিবে আসুক। তখন দুটোকে একসঙ্গে মিলিযে আমবা একটা অনুষ্ঠান কবব। বিজয—বিজয · কি নাম দেওযা যায়?·· victory celebration. ভালো হবে না?

বাণী ॥ বাঙলায কুলোল না।

[নিমাইযেব প্রবেশ

নিমাই ॥ এতেই victory? তোদেব এই ক্ষুদ্র-চিন্তাব কথা আমি যত ভাবি, তত আমাব গা বি বি কবে।

সমবেশ ॥ কবে বুঝি? বোস এখানে। বিপ্লব! (ধমকে) বোস! (নিমাই বসে) নতুন খবব শুনলি কিছু?

নিমাই ॥ নট্ ইন্টাবেস্টেড। তোমাদেব এই বুর্জোযা পার্লামেন্টারি পলিটিক্স-এ ঘোষ-বোস-মুখুজ্যে-লাহিড়ী—কে কি বলল আব কে কি কবল, তাতে দেশেব লোকেব কিছু আসে যায না।

সমবেশ ॥ তা তো বটেই। কিন্তু মুখ্যু এদেশেব মানুষগুলো, এব কিছু

বুঝল না, পার্লামেন্টকে গণতন্ত্র রক্ষার হাতিয়ার মনে করে লাঠিগুলির সামনে বুক পেতে এগিয়ে গেল, আজ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ হাজার লোক জেলে গেল। সত্যি, দেশের লোকগুলো কী বোকা।

নিমাই ॥ বোকাই তো। আর তোমরা সেই বোকামির সুযোগ নিচ্ছ।

সমরেশ ॥ কি ভাবে?

নিমাই ॥ পার্লামেন্ট মুক্তির সোপান, এই মোহ সৃষ্টি করে জনগণকে একটা বাজে আন্দোলনে সামিল করিয়েছ।

সমরেশ ॥ তাহলে ভুল করেছি, বল।

নিমাই ॥ শুধু করেছ নয়, এখনও করছ।

সমরেশ ॥ কি করলে ঠিক হতো?

নিমাই ॥ রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে জনগণকে পরিচালিত করা, বিপ্লব ছাড়া মুক্তির কোন পথ নেই—এই কথাটা বুঝতে দেওয়া।

সমরেশ ॥ ও। তাহলে এইজন্যেই তোরা এ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিসনি?

নিমাই ॥ হ্যাঁ। এসব পার্লামেন্টারি আন্দোলনে আমরা বিশ্বাস করি না।

বাণী ॥ আমি ভেতরে যাচ্ছি। তোমরা বসো।

অরুণ ॥ আমায় একা ফেলে চললে?

বাণী ॥ (হেসে) বসে শোনো না, ওরা কি বলে।

[বাণীর প্রস্থান]

সমরেশ ॥ তাহলে তোরা বিপ্লব চাস?

নিমাই ॥ নিশ্চই।

সমরেশ ॥ রক্তাক্ত সশস্ত্র বিপ্লব।

নিমাই ॥ নিশ্চই। রক্তপাতহীন বিপ্লব বিপ্লবই না। আর বিপ্লব মানেই সশস্ত্র। (সমরেশ হেসে ফেলে) হাসছিস কেন?

সমরেশ ॥ (গম্ভীর) না। আমি ভাবছি, বিপ্লবটা ঘটে কোথায়? আকাশে, না, মাটিতে, না, নিমাইবাবুদের মাথায়?

নিমাই ॥ (ঈষৎ উত্তেজিত) মাথায় বিপ্লবের চিন্তা না থাকলে বিপ্লব কোথাও ঘটে না।

সমরেশ ॥ এবং মাথায় অতিরিক্ত বিপ্লব জমা হলে কি হয় জানিস তো? তুই

তাব নমুনা। চোখ লাল কবে, মাথাব চুল খাড়া কবে ঘবে বসে গজবাস্, আব বিপ্লবেব নাটকেব শেষ অঙ্কেব শেষ দৃশ্যে অভিনয কবাব জন্যে হাত মুঠো কবে বসে থাকিস। এদিকে দেশেব মানুষগুলো যে পাযে পাযে এগিযে চলেছে, এটা তোবা দেখতে পাস না। বিপ্লব যে একটা ঘটনা না, একটা ঘটনাস্রোত—এই কথাটা তোদেব মাথায কিছুতে ঢোকে না।

নিমাই ॥ (উত্তেজিত) বক্তপাতহীন বিপ্লব কোথায কবে ঘটেছে, আমাকে বলতে পাবিস ?

[বাণীব প্রবেশ]

সমবেশ ॥ আস্তে বন্ধু। বক্ত-বক্ত কবে দেখছি মাথাটাই খাবাপ হযে যাবে। কোনদিন দাডি চাঁছতে গিযে গাল কেটে বক্ত বেবোলেও চিৎকাব জুডে দিবি—বক্ত। শুরু হযেছে· বিপ্লব।—আহাম্মুক।

নিমাই ॥ কিন্তু তাই বলে—

বাণী ॥ এই, ওঘবে বাবা আছেন।

[নিমাই চুপচাপ]

সমবেশ ॥ বল, কি বলছিলি।

নিমাই ॥ কি আব বলব। সব বলাব বাইবে চলে গেছিস তোবা।

[একটুক্ষণ সবাই চুপচাপ]

সমবেশ ॥ আচ্ছা তুই বল, গত দু মাসে বাঙলাদেশেব বুকেব ওপবে এই যে এত বড বড কাণ্ড ঘটে গেল, এব কি কোনো দাম নেই ?

নিমাই ॥ দাম আছে কি নেই, সেটা যাচাই হবে কী উদ্দেশ্যে কাব নেতৃত্বে এগুলো ঘটেছে—তাব ওপব। উত্তবপাডায জালিযানওযালা-বাগেব পুনবাবৃত্তি হলো, দবজা ভেঙে ঘবে ঢুকে সেপাই-শান্ত্রীবা বৌ-বাচ্চা-মেযে-পুরুষ সবাইকে পিটিযে লাস কবলে, হাজাব-হাজাব লোক জেলে যাচ্ছে, পথে বেবোতে মানুষ ভয পায, এমন অবস্থাব সৃষ্টি হযেছে ;—কেন ? না, ঘোষেদেব বিদায কবতে হবে। তাতেই নাকি গণতন্ত্রেব জযজযকাব। Silly

সমবেশ ॥ তাহলে স্বীকাব কবছিস্, ঘোষেবা অপবাধ কবেছে।

নিমাই ॥ তাবা তো কববেই, এই ওদেব শ্রেণী-চবিত্র। কিন্তু ঘোষেব বদলে মুখুজ্জে কি বোস এলে তাতে জনগণেব কী লাভ ? Basic change কিছু ঘটবে কী ?

সমরেশ ॥ না। কিন্তু তুই যে বিপ্লবের কথা বলছিস, এদের সহায়তায় সেই আন্দোলন অনেক দূর এগিয়ে যাবে, ধাপে ধাপে, একটু একটু করে; শেষ লড়াইয়ের দিকে।

নিমাই ॥ কল্পনা কর।

সমরেশ ॥ নিশ্চই করব। তোর মতো লম্ফ দিয়া গাছে ওঠার কল্পনার থেকে এ কল্পনা অনেক ভালো। ইতিহাসে তার নজির আছে।

নিমাই ॥ থাক, আর ইতিহাস দেখাতে হবে না।

সমরেশ ॥ Sorry সব ইতিহাস যে তুই গুলে খেয়েছিস, আমি জানতাম না।

নিমাই ॥ ঠেস দিয়ে কথা বলিস না সমরেশ। পড়াশুনা আমি কিছু কম করিনি।

সমরেশ ॥ আমিও কিছু কম করিনি।

নিমাই ॥ বল তো দেখি—

অরুণ ॥ (বাধা দেয়) থাক, থাক। পারশোনাল লেভেল-এ চলে যাচ্ছে।

সমরেশ ॥ পড়াশুনার গরম দেখায়।

নিমাই ॥ তুই-ই বা কি গরম দেখাস? করিস তো চোঙাবাজী, নয় তো গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহ আর মিছিল; বিপ্লবের তুই কি বুঝিস রে?

সমরেশ ॥ ঠিক আছে। তোমার বিপ্লব তুমিই বোঝো, তাহলেই দেশ সগ্‌গে যাবে। আমার আর বুঝে কাজ নেই।

নিমাই ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ।

সমরেশ ॥ হুঁ।

[অরুণ ও বাণী হেসে ফেলে]

বাণী ॥ আচ্ছা, তোমাদের এ ঝগড়া কি কোনোদিন মিটবে না?

অরুণ ॥ মিটবে। তেমন একটা কিছু চোখে পড়ুক; দেখবে, দুজনে হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেছে।

বাণী ॥ কবে?

অরুণ ॥ তা জানি না।

সমরেশ ॥ চা বলে আসি। (নিমাইকে) না কি, অবিপ্লবীর পয়সায় চা খাওয়াও বারণ?

নিমাই ॥ ঢং কবিস না সমবেশ। আমি যাচ্ছি, তুই বোস।

[নিমাইযেব প্রস্থান]

বাণী ॥ (অরুণকে) তোমাব নাইট-ডিউটিব সময হলো না? কখন যাবে?

অরুণ ॥ এই যাব। এ ছোঁড়া যে গোঁজ হযে বসে বইল। তোমাব সঙ্গে আলাদা কবে দুটো কথা বলব ভেবেছিলাম—

সমবেশ ॥ নিভৃতে?

বাণী ॥ (ছদ্ম-ধমক) অ্যাই, চোপ!

সমবেশ ॥ বিযে কবে ফেল না বাপু, ঝামেলা মিটে যায। (অরুণ হাসে) আমি যাচ্ছি, তোমবা বসে কথা বলো। (উঠে দাঁডায)

বাণী ॥ (হাত ধবে সমবেশকে বসায) বসো না।

[হবনাথেব প্রবেশ। হাতে খববেব কাগজ]

হবনাথ ॥ আব কোনো খবব আসেনি বাণী? এব সবই পুবনো।

বাণী ॥ পুবণো কি! ওটা আজকেব কাগজ তো?

হবনাথ ॥ হ্যাঁ, সকালেব। বিকেলে কোনো খবব আসেনি?

বাণী ॥ না। তুমি আবাব উঠে এলে কেন বাবা? চলো ওঘবে—

হবনাথ ॥ না, আমি এখানেই বসি।

(বাণী অরুণেব দিকে তাকায, অরুণ ঘাড নাডে। ততক্ষণে হবনাথ বসে পডেছে)

খবব আসুক, তাবপব যাব।

অরুণ ॥ আপনাব শবীব এখন কেমন আছে?

হবনাথ ॥ ভালো।

একটুক্ষণ চুপচাপ কাটে]

আমি ববং ওঘবেই যাই। খবব এলে পাঠিযে দিও।

[উঠে ধীরে ধীবে ভিতবে যায]

বাণী ॥ ডাক্তাব হযেছ, ওঁকে সাবিযে তুলতে পাবো না?

অরুণ ॥ বোগটাই যে ধবতে পাবছি না।

বাণী ॥ বিশ্রী লাগে। শবীবে কোনো অসুখ নেই, অথচ—

সমবেশ ॥ আমি বলব? সত্য মুক্ত হোক, দেখবে আপনিই ওঁব বোগ সেবে গেছে।

অরুণ ॥ তাব মানে তুই বলছিস, সত্য বন্দী?

সমবেশ ॥ বন্দীই তো। হাসপাতালেব চৌহদ্দীব মধ্যে—

অরুণ ॥　সত্য বন্দী। কথাটা মার্ক করো বাণী।

বাণী ॥　মুক্ত করে দাও না বাপু। সব তো তোমাদের হাতে।

অরুণ ॥　অত সহজ না। আমি উঠি। ডিউটির সময় হলো।

বাণী ॥　সত্যকে বোলো, আমি কাল সকালে যাব।

[অরুণের প্রস্থানোদ্যোগ, হৈ হৈ করতে করতে প্রবেশ করে নন্দ ও কানু। কানুর হাতে একটা ট্রানজিস্টর রেডিও সেট]

কানু ॥　আ গিয়া, হো গিয়া

অরুণ ॥　কি ব্যাপার।

নন্দ ॥　দাদা টেলিফোন করেছিল পি-টি-আই অফিসে। খবর দিয়েছে— (কানুকে) দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ধর না।

সমবেত ॥　ব্যাস।—(একটা তালি দিয়ে উদ্দাম হাসিতে ফেটে পড়ে)

অরুণ ॥　কি হয়েছে, বলবি তো।

কানু ॥　আমার এখন উদ্ধ্বাহু হয়ে নাচতে ইচ্ছে করছে।

নন্দ ॥　তুই নাচ। (রেডিওটা ওর হাত থেকে নেয়) দে আমাকে। ·· শালা, এতদিন পরে—

অরুণ ॥　দেখ কাণ্ড। আসল কথাটাই এখনও বলল না।

কানু ॥　অতই সোজা। দিন বদলেছে দাদা। মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করে কেউ পার পাবে না। আচ্ছা, তুমি কি মনে করো—

নন্দ ॥　স্ স্, আস্তে।

(নন্দ রেডিও টিউন করে। নানারকম শব্দ হয়)

কানু ॥　কিছু বলছে?

নন্দ ॥　বলবে, বলবে। আরে ঘোষ কোম্পানি আউট, এটা একটা ইণ্টারন্যাশনাল খবর, না-বলে যাবে কোথায়?

বাণী ॥　অরুণদা।

অরুণ ॥　সত্যি?

বাণী ॥　আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলো অরুণদা, সত্যকে বলে আসব। এই খবর পেলে দেখবে ও রাতারাতি সেরে উঠেছে।

অরুণ ॥　এখন যাবে? কী দরকার। কাল সকালে বরং—

বাণী ॥　দেরি হয়ে যাবে না?

নন্দ ॥　স্ স্। বলছে।

বেডিও ॥ " · ঘোষণায বলা হযেছে—পশ্চিমবঙ্গে বাষ্ট্রপতির শাসন জাবি কবা হযেছে। এখন থেকে বাজ্যপাল শ্রীধবমবীবা বাষ্ট্রপতিব প্রতিনিধি হিসাবে বাজ্যেব শাসনভাব পবিচালনা কববেন। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও ঘোষণা কবা হযেছে যে, যতশীঘ্র সম্ভব পশ্চিমবঙ্গে অন্তবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। যতদিন না—"

[নন্দ ও কানু এবাব সত্যিই উধ্ব'বাহু হযে নৃত্য শুরু কবে এবং দুজনে একসঙ্গে উচ্ছ্বাস প্রকাশ কবে। সমবেশ আব-একবাব উদ্দাম হাসিতে ফেটে পড়ে। বেডিওব শব্দ চাপা পড়ে যায। বাণী ও অরুণ পবস্পবেব দিকে চেযে দাঁড়িযে থাকে]

কানু ॥ আ গিযা হো গিযা

নন্দ ॥ ইনকিলাব জিন্দাবাদ

কানু ॥ ধেই ধেই ধেই, তাথৈ তাথৈ · আঃ, সমরেশ দ' দাঁড়িযে বইলে কেন , এসো না—

নন্দ ॥ হৃদয আমাব নাচেবে আজিকে সত্যকাম জিন্দাবাদ—(সমবেশেব হাত ধবে টানে) এসো না—

[সমরেশ এদেব দেখছিল]

সমবেশ ॥ (হাত ছড়িযে নেয) ধ্যাৎ।

(প্রবেশ কবে নি তাই, সঙ্গে চা-ওলা ছোকবা—হাতে চাযেব কেটলি ও ভাঁড)

আমবা ঠিক কবে ফেলেছি নিতাই, সেলিব্রেট কবব। Victory celebration

নন্দ ॥ ডবল victory ঘোষেব পতন ও সত্যব প্রত্যাবর্তন।

নিমাই ॥ তা কবো , কিন্তু আমি ওব মধ্যে নেই।

নন্দ ॥ তা থাকবে কেন ? ভালো-মন্দ বোঝাব ক্ষেমতা থাকলে তো।

নিমাই ॥ থাক, আমাকে আব ভালো-মন্দ বোঝাতে হবে না।

নন্দ ॥ নাঃ, সব বুঝে একেবাবে বুজগুডি মেবে বসে আছো তো।

নিমাই ॥ বেশি কথা বলিস না নন্দ ; ছেলেমানুষ ছেলেমানুষেব মতো থাক।

কানু ॥ নিমাইদা, তোমাব কোনো reaction হচ্ছে না ?

নিমাই ॥ না।

কানু ॥ তাহলে তুমি আমাদেব সঙ্গে থাকবে না ?

নিমাই ॥ বললাম তো, না।

নন্দা ॥ না , উনি বিপ্লব কববেন , এসব ছোট ব্যাপাবে—

নিমাই ॥ মাবব এক চড টেনে।

সমবেশ ॥ আহা, থাক থাক। নন্দ, ও বলছে, থাকবে না ; জবরদস্তি করিস কেন ?

নিমাই ॥ এই ছ'মাসে অনেক রক্তক্ষয় হয়েছে। কিন্তু ফল কী হলো ? রাষ্ট্রপতির শাসন এবং আর-একটা নির্বাচন। হ্যাঃ। ·· ওর মধ্যে আমি নেই।

সমবেশ ॥ রক্তক্ষয় হয়েছে বলছ , তাহলে রক্ত দিলে যারা, তাদের প্রতি সম্মান—

নিমাই ॥ সম্মান আমার মনে মনে।

নন্দ ॥ বিপ্লবটাও মনে মনে।

সমবেশ ॥ আঃ. নন্দ।

নিমাই ॥ ঠিক আছে। তোমরা করো, আমার এখানে দরকার নেই।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

চা-ওলা ॥ চা—

বাণী ॥ নিমাই। রাগ করে চলে যাচ্ছ ?

নিমাই ॥ রাগ নয় বাণীদি। এদের বোকামি দেখে দুখ্‌খু হয়।

সমবেশ ॥ ঠিক আছে। তোকে এর মধ্যে থাকতে হবে না। তুই বোস। · এই, চা দে। (চা-ওলা সবাইকে চা দেয়। সমবেশ কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসে) তাহলে মিটিংটা কোথায় হবে ?

নন্দ ॥ কেন, ইস্কুল-বাড়িতে।

কানু ॥ হল-এ জায়গা হবে না।

নন্দ ॥ হল-এ কেন, মাঠে করব।

সমবেশ ॥ বেশ। তারপর বলো, সভাপতি কে হবে।

নন্দ ॥ রামবাবুকে নিয়ে এসো। সৎ লোক , পাড়ার সবাই মান্যি করে—

কানু ॥ কিন্তু রাজনীতিতে—

সমবেশ ॥ তা হোক। আমরা তো আর পার্টি-মিটিং করছি না।

নিমাই ॥ হুঁ।

সমবেশ ॥ (নিমাইকে) তুই আবার এর মধ্যে মন্তব্য করিস কেন ?

নিমাই ॥ মন্তব্য করিনি। বলছিলাম, রামবাবুকে সভাপতি করলে তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

সমবেশ ॥ কী উদ্দেশ্য ?

নিমাই ॥ তোমবাই জানো।

সমবেশ ॥ তোব কোনো suggestion আছে, সভাপতি হিসেবে—

নিমাই ॥ Suggestion নাও তো বলতে পাবি।

সমবেশ ॥ বল না।

নিমাই ॥ না, থাক।

সমবেশ ॥ ঠ্যাকাব কবিস নে নিমাই। দেখছিস, একটা সিবিয়স্ কাজ হতে যাচ্ছে—

নিমাই ॥ তাহলে বিবাজবাবুকে নিযে এসো।

নন্দ ॥ আ—এঁকেই তো চাইছিলাম। এতক্ষণ নামটা মনে পডেনি।

নিমাই ॥ পডবে কি কবে। মাথায তো গোবব ছাডা কিছু নেই।

সমবেশ এই, আবাব আবম্ভ কবলি। নে, বল এবাব, বক্তা কে কে হবে। (নিমাইকে) তুই বলবি ?

নিমাই ॥ দেখা যাবে।

নন্দ ॥ উলটো-পালটা গাইলে কিন্তু আমিও ছেডে দেবো না ; মাইক কেডে নিযে আমিও চাড্ডি শুনিযে দেবো।

নিমাই ॥ আমি যে বলবই, একথা তোকে কে বললবে মুখ্যু।

সমবেশ ॥ ধ্যাৎ। কাজেব কথাটা শেষ করে নে না।—বল, বক্তা কাকে কাকে ঠিক কবা যায়।

নিমাই ॥ ওটা সবাব সঙ্গে আলোচনা কবে তাবপব ঠিক কবিস।

সমবেশ ॥ · Good idea

অরুণ ॥ (সহাস্যে) নিমাই, তুমি ভিডবে না বলেও এদেব দলে ভিডতে চলেছ—বুঝতে পাবছ কি ?

রাণী ॥ আবাব খোঁচাও কেন অরুণদা ?

সমবেশ ॥ তাহলে এইবাব বলো, মিটিংটা হবে কবে ?

রাণী ॥ আমি বলছিলাম, সত্যকামেব তো আজকালেব মধ্যেই ফিবে আসাব কথা। ও ফিবে এলেই না-হয · বলো না অরুণদা।

অরুণ ॥ আমি বলব ? হ্যাঁ—সত্যকামেব ফিবে আসাটা দবকাব তা বেশ তো ; মিটিং যখন আমবা কববই আসলে এমন দাঁডিযেছে, যেন ওই আমাদের মুক্তি এনে দিলো। তাই সত্যকে বাদ

দিযে—। আমি ববং হাসপাতালটা একবাব ঘুবে আসি। নাইট ডিউটি

(দ্রুত মধুব প্রবেশ। কেমন উসকো-খুসকো দেখাচ্ছে ওকে। মধু কোনো কথা বলে না। সবাই ওব দিকে চেযে থাকে একটুক্ষণ)

সমবেশ ॥ তুই এতক্ষণ কোথায ছিলি মধু ?

অরুণ ॥ ও আমি ওকে একটা কাজে পাঠিযেছিলাম। আয মধু।

[তাডাতাডি ওকে নিযে অরুণ বেবিযে যেতে চায]

সমবেশ ॥ আলোচনাটা শেষ হোক না।—খুব জরুবি কিছু ?

অরুণ ॥ হ্যাঁ একটু জরুবি।

সমবেশ ॥ তাহলে celebration-এব ব্যাপাবে ওব মতামতটা জেনে নি। শোন মধু, আমবা—

অরুণ ॥ (হঠাৎ বিশ্রী চিৎকাব করে) বলছি জরুবি কাজ—বিশ্বাস হচ্ছে না ? (মধুব হাত ধবে বাইবেব দিকে পা বাডায) আয—

বাণী ॥ শোনো অরুণদা। মধু বিকেলে হাসপাতালে গিযেছিল, সত্যব সঙ্গে ওব কী কথা হযেছে বলল না তো।

অরুণ ॥ (মধুব হাত ধবে টানে) আয না—

বাণী ॥ দাঁডাও (অরুণ ও মধু দাঁডিযে পডে, বাণী ওদেব কাছে যায) কোথায যাচ্ছ অরুণদা।

অরুণ ॥ ওকে ওকে একটা কাজ দিযেছিলাম, তাই—

বাণী ॥ মধু কোথায গিযেছিল অরুণদা।

অরুণ ॥ ওই তো কাজ দিযেছিলাম—

বাণী ॥ (মধুকে) সত্যকামেব সঙ্গে আজ দেখা কবেছিলে ? (মধু বাণীব দিকে চেযে থাকে) কী বলল সত্য ? (মধু তখনও কথা বলতে পাবে না। বাণী ভিতবে যেতে যেতে) যাই বাবাকে খববটা দিযে আসি—(কিন্তু দু পা এগিযেই দাঁডিযে পডে, ফিবে আসে অরুণেব কাছে) অরুণদা, তুমি সত্যি কথাটা বলছ না কেন,—সত্যকাম

[মধু আবেগ বোধ কবাব চেষ্টা করে, তক্তপোষেব একধাবে বসে, তাব উপব কযেকটা ঘুসি মাবে, তাবপব ডুক্‌বে কেঁদে ফেলে। সবাই স্তম্ভিত]

আমি যাই, বাবাকে খববটা দিযে আসি।

[ভাবলেশহীন বাণীব ধীবে বীবে পা টেনে টেনে ভিতবে প্রস্থান। কাঁধেব আঁচল তাব মাটিতে লুটছে]

(কযেকটি স্তব্ধ মুহূর্ত। হবনাথেব প্রবেশ)

হবনাথ ॥ তোমবা আছ। নতুন খবব পেলে কিছু ?

অরুণ ॥ ইতিহাস লিখব বলেছিলাম। কিন্তু কী লিখব ? সত্য আমাদেব মুক্ত কবল, না, আমাদেব মুক্তি সত্যকে মুক্তি দিল ?

পর্দা

বেঁচে বর্‌তে থাকা

দেবেশ রায়

পাশ কাটিয়েই চলে যাচ্ছিল, দু-পা গিয়েই পেছন ফিরে দেখল, হ্যাঁ, বাস-ই তো, ট্রাফিক জামে আটকে পড়া সারিসারি গাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘরঘর, বিজিত আর বাসের মধ্যে দু-সারি গাড়ি। এতোক্ষণ, এই প্রায় ঘণ্টা দেড় যে—অন্যমনস্কতা নিয়ে হাঁটছিল মুহূর্তে তা হাওয়া, এবং বাসটা ধরতে সে গায়ে-গায়ে লাগা গাড়িগুলোর এদিক-ওদিক গলে এগিয়ে যেতে-যেতেই হিসেব কষে যদি ইতিমধ্যেই গাড়িগুলো নড়ে, তাহলে তো বাসটা বেরিয়ে, সুতরাং, কোণাকুণি গলে বাসটা যে-সারিতে তার আগে গিয়ে, যাতে বাসটা ছেড়ে দিলেও—। এবং হিসেব কষতে কষতেই বিজিত বাসের গোড়ায়। ঝুলতে হবে। সুতরাং বাসটা চলা শুরু করলে উঠলেই হবে। এমন মাঝ নদীতে বাসটা দাঁড়িয়ে যে হঠাৎ হ্যাণ্ডেল বেদখল হওয়ার ভয় নেই। একটা হাত হ্যাণ্ডেলে ছুঁইয়ে সেই মাঝনদীতে দাঁড়িয়ে চারদিকের আলোতে চমকানো বৃষ্টিতে বিজিত ভিজতে লাগলো।—পথ চলতে-চলতে যেন ঈশ্বরকে পেয়ে গেছে—ফুটপাথ থেকে বাসের গোড়া পর্যন্ত বিজিতের এমনই আসা। অথচ সেই বাসই যদি ধরবে অফিস পাড়া থেকে ধরলেই পারতো, দেড়ঘণ্টা মিছিমিছি হাঁটলো কেন, সেই অফিস থেকে এই পর্যন্ত বিজিতের এমনই আসা। আর এই বাসটা চোখে পড়লোই বা কি করে, তাও আবার এতোটা দূর থেকে। এতক্ষণের, এই দেড়ঘণ্টার বৃষ্টি ভেজা হাঁটাটা যেন বিফলে গেল। এতক্ষণের, এই দেড়ঘণ্টার বৃষ্টিভেজা হাঁটাটাকে সার্থক করতেই যেন বিজিত হ্যাণ্ডেলের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিল, ইচ্ছে করলেই তো ও এখন বাসটা ছেড়ে দিতে পারে। ছেড়ে দিতে যে-পারে না তা হাতেনাতে প্রমাণ করতেই যেন বাসটা নড়ে উঠলো আর ভিজে পিছল হ্যাণ্ডেলটা থেকে হাত খুলে বা জলে কাদায় নদীর ঘাটের মতো সিঁড়ি থেকে পা হড়কে না যায়—জানলার সিক কি দরজার মাথা কি ভেতর—দরজার চৌকাঠ বা জানলার খাঁজ বা ডানহাতটা ছড়িয়ে একেবারে বাসের পেছনের খাঁজটা যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। বাসের এই সমস্ত নানা জায়গা-ই বিজিত আঁকড়াতে বা আঁচড়াতে লাগলো।—বাসের ভেতর থেকে গরম হাওয়ার হলকা—বৃষ্টির জন্য

সবগুলো জানলা বন্ধ—গাদাগাদি মানুষ। বাইরে বৃষ্টির ঠাণ্ডা হলকা। আর দরজার ওপর গোল করা টিনের পাতটায় জল জমে জমে বাসের এক একটা ধাক্কার সঙ্গেসঙ্গে গলগল পড়ে ডানদিকটাকে ভেজায় আর রাস্তার জমা জল বাসের চাকায় চাকায় স্রোতের মতো উঠে এসে প্যান্ট-জুতো সহ পা ধোয়ায়। টেরিকটের এই সুবিধে কাল অফিসে যাবার আগেই জামা-প্যান্ট শুকিয়ে যাবে। এই যে এতটা রাস্তা নানা কায়দা কসরত করে বাসে চড়ে এলো তার যেন কোনো স্মৃতিটুকুও বাস থেকে নাবার পর থাকলো না। হেঁটেই বাড়ি ফিরবে বলে অফিস থেকে বেরিয়েছিল, হেঁটেই ফিরছে যেন। জলে ভিজে আয়না পথে, জলে ভিজে নদী পথে আলোর আলোর আলোর প্রতিবিম্বের বিম্বের বিম্বের রঙিন রঙিন রঙিন ছুটে যাওয়া আর পথ আয়না, দেয়াল আয়না, মানুষ আয়না হয়ে যাওয়ায় একটি মানুষ দুমানুষ তিনমানুষ চারমানুষ পাঁচমানুষ হয়ে যাওয়ায় রূপকথা আর নিয়তির মতো নির্মম বাস আর ট্রামের পেছনে ঘামে ভেজা বৃষ্টিতে ভেজা, ভেজা মানুষের লোককথা। অফিসের পর ইউনিয়ন অফিসে কিছু কাজকর্ম করে পথে বেরিয়ে বৃষ্টির কলকাতার সেই দ্বন্দ্বে নিজেকে আর জড়াতে চায় নি। বৃষ্টিও ছিল ঝিরঝির। এ-গলি ও-গলি দিয়ে পথ কমিয়ে শেয়ালদর দিকে হাঁটা। মোটামুটি নির্জন গলি খুঁজতে হাঁটতে খারাপও লাগছিল না। চাঁদনির মধ্যে একবার জোরে বৃষ্টি নামায় বারান্দায়, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পেরিয়ে একবার এক গেটের নিচে আর ঠাকুরদাস পালিত লেনে একটা চায়ের দোকানে বসে এককাপ চা খেয়ে শেয়ালদতে পৌঁছেই, বাস। মোড়ে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে বাকি পথটা হেঁটেও ভিজে বাড়ির গলিটাতে ঢুকতে, যেন শাড়িটা দেখেই, যেন ধক করেই, বিজিতের মনে পড়ে গেল বাড়িতে, বাড়িতে, স্বপ্না।

স্বপ্না তার স্ত্রী, সাত বৎসর তারা বিবাহিত জীবন যাপছে, তার আগে তিন বছর প্রেমের জীবন, অথচ এতোক্ষণে, বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কি না বিজিতের মনে পড়ে বাড়িতে স্বপ্না, যেন স্বপ্না অতিথি, দুদিন আগে ছিল না, দুদিন পরে থাকবে না এবং তাই বিজিতের মনে পড়া না-পড়ার রুটিনের মধ্যে তার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। নাকি প্রতিদিনের দোরগোড়াটাই বিজিতের মনে পড়ার রুটিনের স্বপ্নার স্থান।

প্রথমে ঠুক্-ঠুক্ করে কড়া নাড়লো। বিজিত যেন নিশ্চিত নয় কীভাবে কড়া নাড়া উচিত। অথচ এতো দিনে, এই সাতবছরে বাড়ি ফেরার পায়ের

শব্দগুলি চেনা হয়ে যাওয়া উচিত, কড়া নাড়াব ছন্দটা বপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত। একটু বেশি সময় বিবতিব পব এবাব একটু জোবে কিন্তু ঐ মাত্র তুবাব। তাবপব একটু আস্তে কিন্তু চাববাব। ভেতবে পাযেব শব্দ। দবজাটা একটু বেশি জোবে আটকে যায। টেনে খুলতে হয। ছিটকিনি খোলাব আওযাজ পেযে বিজিত এ-পাশ থেকে আস্তে দবজাটায ধাক্কা দিল।

"এমন কবে কড়া নাড়ো না, আমি বুঝতেই পাবছি না পাশেব বাড়ি কি না—"

ফ্ল্যাট না, বাসা না, স্বপ্না এখনো বাড়ি বলে, পাশেব বাড়ি, স্বপ্নাদেব দেশেব বাড়ি ছিল ·। দবজাটাব ছিটকিনিটা চেপে লাগাতে লাগাতে বিজিত মুখ ঘুবিযে হাসলো। স্বপ্না পেছন ফিবে বাথরুমেব দিকে। "আমি এসে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই তুমি যেমন দবজা খুলে দাও—সাবাদিন তো দিবসবজনী আমি যেন তাব আশায আশায থাকি।

"আশায আশায ছিলাম, এলো না তো—" বাথরুমেব ভেতব থেকে স্বপ্নাব জবাব। "এলো তো" বলতে বলতে পর্দাটা ঠেলে ভেতবে যেতেই বিজিত দেখে বাথরুমে স্বপ্না তুপুবেব প্লেটগুলো ধুচ্ছে। "কি ব্যাপাব? শান্তিদি আসেন নি?" "তাহলে আব বলছি কি? এতোক্ষণ বসে থাকলাম, শেষে আব কবি কি" "আব তুটো প্লেট বেব কবে নিলেই, কাল সকালে একবাবে" "তোমাকে আব বুদ্ধি দিতে হবে না, জামা কাপড ছাড়ো" "আসছি ছেড়ে, তোমাকে একটু এ্যাসিষ্ট কবা উচিত।" পর্দা ঠেলে বেবিযে ঘবে গিযে ঢোকে বিজিত। তুহাতেব আঙুল দিযেই জামাব বোতাম খুলছিল, একটা হাত নামিযে টেবিলেব ওপব বাখা চিঠিপত্রগুলো দেখে। পোস্টকার্ডটা তুলে নিযে তাবপব জামাটা হ্যাঙ্গাবে ঝুলিযে, প্যাণ্টটা খাটেব স্টাণ্ডেব সঙ্গে ঝুলিযে, লুঙিটাতে গিঁঠ দিতে দিতে বাথরুমেব দিকে এগতেই বাটি-প্লেট হাতে স্বপ্না বেবিযে আসছে—"বাঃ, তুটি প্লেট, তুটি বাটি ধুতে উনি সেজেগুজে অ্যাসিস্ট কবতে আসছেন। বোসো, তোমাকে একটা প্রিপাবেশন খাওযাবো।" স্মিত বিজিতেব পাশ কেটে স্বপ্না ডান দিকেব ঘবে ঢুকতেই পেছন থেকে বিজিত "মানে, আমাকে একটা প্রিপাবেশন কববে?"—খানিকটা স্বস্তিতেই বিজিত ঘবে ঢুকলো, স্বপ্না কাজেব মেজাজেই আছে, তাব মানে ভালো মেজাজে, তাব মানে হয নতুন নতুন বান্না কবতে বসবে, নযতো নতুন কবে ঘব গোছাতে, নযতো বেরুতে চাইবে। দ্বিতীয আব তৃতীয়টাতে বিজিতেব আপত্তি, বড

ব্যতিব্যস্ত হতে হবে, প্রথমটাই ভালো। সুতরাং বিজিত "আজকের দিনটাই তো রান্নার ও খাওয়ার, বাইরে যে বৃষ্টি পড়ছে, একেবারে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড।" খাটটার ওপর বসলো। জোড়াসনে। পিঁড়ির ওপর উবু হয়ে গ্যাসের চুল্লিতে স্বপ্না ছোট্ট কড়া চাপালো। বিজিত জিজ্ঞাসা করলো "আজ কি দুপুরে ঘর গুছিয়েছ?" "দেখলে?" "না তাহলে প্রিপারেশন কেন?" "মানে?" "আমি ভাবলাম বুঝি ঘর গোছাতে গিয়ে সেই তোমার রান্নার বইটা হাতে পড়েছে, তাই।" কড়াটা দুহাতে তুলে নিয়ে স্বপ্না দোলালো "তোমার ক্যানটিনের বিল এ-মাসে কতো হলো" "কেন" "বাড়িতে তো আমি রান্না করি না—এক বই না পড়লে, তোমার আর ক্যানটিনে না খেয়ে উপায় কি—" কথাগুলো স্বপ্না বলছে অর্ধমনস্ক। তার আসল মনটা রান্নাতেই। কড়াটা উনুনে চাপিয়ে পাশ ফিরে একটা বাটিতে হাত দিতেই বিজিত বললো, "তাহলে নিশ্চয় দুপুরে মহিলামহল শুনেছ"

"তা আর কি করবো বলো, সিনেমাও বন্ধ, তাই উল্টোরথেও আর নতুন ছবি নেই, মহিলামহল শোনা ছাড়া আর করার আছে কি?"

"দুপুরে বসে যে কাঁথা সেলাই করবো তারও তো কোনো—" কথা স্বপ্না অসমাপ্ত রাখলো।

"তোমরা সব প্ল্যাস্টিক মাদার, তোমরা কি আর কাঁথাতে ছেলেপুলে মানুষ করবে?" বলে ফেলেও বিজিত তৈরি থাকলো।

স্বপ্না কোনো কথা বললো না। মুখটা ঘোরালে বোঝা যেত। স্বপ্নার চোখের পাতা দেখে বুঝতে পারি। উনুনের ওপর থেকে কড়াইটা নামিয়ে বিজিতের দিকে পেছন ফিরে বসে স্বপ্না—"কি, বাবুর মুখ গোমড়া তো? এখন মনে মনে ভাবছো কি কি কথা বলে আমাকে আবার মুড়ে আনা যাবে—" তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে বিজিতের দিকে তাকিয়ে বললো—"যাও, তোমাকে নির্ভয় দিলাম, নো ঝগড়া ঝাঁটি, নো থিয়োরি—" ঘাড় ঘুরে গেল। তারদিকে স্বপ্নার ঘাড় ফেরানোর জন্য বিজিত তৈরি না থাকায় যথাসময়ে হাসতে পারে নি, সে পেছন থেকে ছুঁড়ে দিল—"অল প্র্যাকটিশ?"

"কতো বছর বিয়ে হলো স্যারের?"

"বিয়ে যে কবে হয় নি তাই তো ভুলে গেছি"

"আত্মবঞ্চনা পাপ, বিজিত" হঠাৎ থেমে গেল। বিয়ের আগে স্বপ্না নাম ধরে ডাকতো। বিয়ের পর অপরের কাছে উল্লেখের সময় নাম বলে কিন্তু

ডাকে নি কখনো। বিরতি ভেঙে স্বপ্না—"বিয়ে যে করে হয়েছে এটাই তুমি মনে করতে পারো না"—স্বপ্না কি আত্মবিস্মৃতিতে নাম ধরে ডেকেছে? নাকি নিজের অপ্রস্তুতিটা ধরিয়ে দিতে চায় না।

"দেখো আত্মসম্মানে ঘা দিয়ো না, এ-রকম একটা সাড়ে পাঁচ ফুটি জবরদস্ত গিন্নি নিয়ে রীতিমতো দিন কাটাচ্ছি আর বলছো কিনা—পুরোন দিন হলে জানো আমি এতোদিন শ্বশুর টশুর হয়ে যেতাম, বেয়াই ফেয়াই বলে বুড়োসুড়ো লোকজন ডাকাডাকি করতো—"নিন বেয়াইমশাই"—চকিতে রান্নাঘরের পিঁড়ি থেকে ডিসহাতে স্বপ্না বিজিতের সামনে। বিজিত চামচেটা দিয়ে স্বপ্নার হাতের ডিস থেকে খাবার তুলে মুখে দিল। মুখ হাঁ করে মাথা ঝাঁকিয়ে গরম সামলায়। স্বপ্না দেখে, হেসে, বিজিতের কোলের ওপর ডিসটা নামিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোয়। স্বপ্না কি চাইছিল খাইয়ে দিতে? "বস্তুটি কি বেয়ান মশাই?"

"ভাগ্যিস তোমার বেয়ান নেই, তাকে যদি মশাই বলতে—সে তোমার মেয়ে ফিরিয়ে দিত—, গাজরের হালুয়া, কেমন হয়েছে?"

"ফাস্ট ক্লাশ, তুমি খাবে না?"

"খাবো, পরে"

"ওঃ স্বপ্না দত্ত, অতি অকথ্য। গরম গরম খাও, গরম গরম খাও"

"এই তো চা টা নাবিয়ে নি"

"আচ্ছা তুমি আমাকে সব সময় উইকার পার্টনার মনে করো কেন?"

"কে বলেছে, পুরুষসিংহ"

"এই যে বললে বেয়ান আমার মেয়ে ফিরিয়ে দিত, বেয়ানের মেয়েও তো আমার ঘরে আসতে পারতো"

"ও আর হিসেব কষে লাভ কি বলো, তোমার ঘরে আসতো, তোমার ঘর থেকে যেত-ও, মোটামুটি ব্যালান্স অফ পাওয়ার ঠিকই থাকতো"—স্বপ্না ট্রের ওপরে পট আর নিজের খাবারের ডিস সাজিয়ে দেয়ালের গায়ে লাগানো টেবিলের ওপর রেখে চেয়ারে বসলো। খাট থেকে উঠে বিজিত চেয়ারে গেল।

"তা বেয়ানশাই খাবারটা ভালই বানিয়েছেন—এ-রকম এক্সপেরিমেণ্ট মাঝেমধ্যে করুন, ইতরজনরা মিষ্টি খেয়ে সুখী হোক আর আমার বৌমাকে একটু শিখিয়ে দেবেন—" চায়ের কাপটা সামনে নিয়ে বিজিত।

"বেযাইমশাই তো আজকাল এদিকে আসেনই না, পথ যদি ভুল না কবেন, আজ এমন বৃষ্টি হচ্ছে, ভিজে এলেন, তাই একটু আপ্যাযন কবলাম,"—এক চামচ খাবাব মুখে দিযে স্বপ্না চেযাবে গা হেলালো, "তা-ছাডা আমাবই কি ছাই মনে আছে, আব আপনাব বৌমাবা একেলে মেযে, তাবা চপ কাটলেট বানাতে শেখে, আমাদেব মতো পিঠে পুলি বানাতে বা খেতে শিখলে তো আবাব সেকেলে বলবে—"

"কী যে বলেন আপনি বেযান। যতোই চপকাটলেট হোক, সেকালকাব চন্দ্রপুলি আব বসকদম্ব আব পুলিপিঠে আব পাযেসে ভেজানো সবাপিঠে —একি আব কোনদিন পুবোন হবাব বেযান, ওবা পেলই বা কি বেযান, তাই চপকাটলেটেই মন দিযেছে, তা যতোই বলুন না কেন. বৌমা মাংসটা বডভালো বাঁধে" "সে তো আব ওব হাতেব গুণ নয, আপনাব জিভেব গুণ, বৌমা যাই বাঁধে তাই আপনাব মুখে ভালো লাগে"

"সে না হয আমাব বেলায, কিন্তু ওব শাশুডী-ও তো ওব বান্নাব প্রশংসায পঞ্চমুখ"—উত্তবেব খোলা জানলা দিযে বৃষ্টি এসে ঘবেব মেঝে ভেজাচ্ছে, সেদিকে তাকিযে বিজিত।

"তাব মানে কি ওব শাশুডী নিন্দে কবতে পেলেই খুশি হতেন"

"না না, তবে মেযেদেব মুখেব স্বাদ তো একটু বেশি-ই"

"তা বটে, সে-যাক, আব ও-সব কথা তুলে মন খাবাপ কবে দেবেন না। সে বামও নেই. সে অযোধ্যাও নেই। কোথায পাবেন খাঁটি দুধ, কোথায পাবেন চিনি, কোথায পাবেন গুড,—কিছুই তো পাওযা যায না। আচ্ছা এমন হলো কেন বলুন তো বেযাই"

"সবই কালধর্ম বেযান, সবই কালধর্ম, যাক আজ উঠি, বড আনন্দ পেলাম, আপনাব বেযান আবাব ভাববেন"

"আপনি কি নতুন কবে দাবপবিগ্রহ কবেছেন, শুনেছিলাম আপনাব পত্নী-বিযোগ হযেছে"

"ঐ বিযোগ হযেই আবাব যোগ হয, এ-বুড়ো বযসে আমাদেব প্রেম এতো গভীব যেন দ্বিতীয পক্ষ। ঐ একজনই ফিবে-ফিবে আসেন।" চেযাব ছেডে উঠে বিজিত স্বপ্নাব মুখটা নিজেব দুই কবতলেব মাঝখানে নিযে গলা ছেডে গাইল—"তোমায নতুন কবে পাবো বলে ."

"বেষানেব গায়ে এ-বকম হাত দিলে আব পিঠে খেতে হবে না, পিঠে খেতে হবে"

"বাঃ বাঃ শিববাম চক্রবর্তী স্ত্রী,—কাগজটা কোথায় ?"

"ও-ঘবে—"টেবিলেব দু পাযাব মাঝখানেব কাঠটাতে ভব দিযে চেযাব দোলাতে-দোলাতে স্বপ্না। পাশেব ঘবেব দিকে যেতে দবজা পেবলো বিজিত। চেযাব দোলাতে দোলাতে স্বপ্না বললো—"কী হযে গেল বাঙালি যুবকেব প্রেমালাপ ?" থমকে না-গিযেও বিজিত যেন হোঁচট খায। কথায কথায এতোক্ষণ সে ভুলেই গিযেছিল। সাবাদিন অফিস আব ভিড আব লোকজন আব কথা আব কথা। তাই এখন কিছুটা সময কাগজ সামনে খুলে চুপচাপ শুযে থাকা। সে ভুলেই গিযেছিল সাবাদিন স্বপ্না এই দুটি ঘব আব একটি বান্নাঘব আব একটুকবো লবি এই সোযা পাঁচশ বর্গফুটেব মধ্যে। সাবাদিন শুধু বসা আব শোযা আব বান্না আব খাওযা। তাই এখন কিছুটা সময বিজিতকে সামনে বসিযে কথা বলা। এখন এ-ঘব থেকে কাগজটা নিযে খুলে ও-ঘবে ঢুকতে ঢুকতে কথা বললেও স্বপ্নাকে বোঝানো যাবে না বিজিত এ-ঘব থেকে কাগজটা নিযে যেতে এসেছিল। দবজায দাঁড়িযে দেখলো পুবেব জানলা দুটো আব উত্তবেব দবজা দিযে আসা জলে ঘব থৈ থৈ। স্বপ্নাকে ডাকতে গিযে-ও না ডেকে বিবেচনা কবতে লাগলো তাকে ডেকে ব্যাপাবটা দেখানো আব না ডেকে দবজা-জানলা আটকে ঘবটা পবিষ্কাব কবা—এই দুই উপাযেব মধ্যে কোনটি আগেব ভুলটাকে তাড়াতাড়ি মেবামত কববে। যদি চাযেব টেবিল থেকে গল্প কবতে কবতে উঠে এসে দুজন একসঙ্গে ব্যাপাবটা দেখতো তাহলে এখান থেকেই নতুন মজাব মজাব ব্যাপাব হতো। এত নিপুন গোছানো ঘবটাব আকস্মিক এমন দশায স্বপ্না খুশি হতে পাবত। বা এখনো হাত বা ঘাড ধবে নিযে আসা । এখন ডাকলে যদি স্বপ্না জবাব না দেয। বললে যদি স্বপ্না জবাব না দিযে উঠে এসে ঘব সাফ কবতে বসে। বা মুখ না ফিবিযে নিজেকে কবে নিতে বলে। চোখেব পাতা না দেখে বিজিত কি কবে বুঝবে স্বপ্না কি কববে। অথচ সামনে জল বাতাসে বিপর্যস্ত জানলা দবজাব বড বড পর্দাগুলি, হলদে আব খাটেব ঢাকনি, গোলাপি। যেন অভিনযেব পব নাটমঞ্চ।

এই ঘবটাকে, তাব এত সাধেব সাজানো ঘবটাকে এত বেশি ভুলতে চায স্বপ্না যে এই প্রবল জলঝড়েও মনে পডে না। নাকি বিজিত আসতে,

বিজিতেব সঙ্গে গল্পে গল্পেই এত বেশি ভুলতে পাবে স্বপ্না যে এই প্রবল জলঝড়েও মনে পড়ে না। তাহলে তো বিজিত চলে আসাব পব মনে পড়া উচিত ছিল।

"বৃষ্টিতে ভিজেও কি বৃষ্টিব সাধ মেটেনি, এখন ঘবেব ভেতব বৃষ্টি দেখছো"—বিজিতেব একটু পেছনে কোমবে দুহাত দিয়ে স্বপ্না দাঁড়িয়ে। এত কম হিসেব জানা মেয়ে স্বপ্না নয় যে আব দু-ঘণ্টা পব ঘুমিয়ে আবো চব্বিশঘণ্টাব আগে যে-দুঘণ্টা আব ফিবে আসবে না তাকে অভিমান দিয়ে নষ্ট কববে। স্বপ্না যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে অপেক্ষাকৃত অন্ধকাব, তাই তাকে ভালো দেখা যাচ্ছিল না। পেছন থেকে বিজিতকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ভেতবে ঢুকিয়ে স্বপ্না দবজায় এসে দাঁড়ালো। সে হাসছিল। একটু আগেব আড্ডাব উপসংহাব সে জোব কবে ভুলতে চাইছে, তাব হাসিতে সেটা স্পষ্ট। ঘবটাকে অভিনযেব পব নাটমঞ্চ মনে না হয়ে অভিনযেবই এক দৃশ্য মনে হচ্ছিল। বিজিত স্বপ্নাব দিকে তাকিয়ে ভাবছিল সত্যি স্বপ্নাকে সবচেয়ে সুন্দব লাগে কাজেব মধ্যে। বা যেমন এখন।

"হাঁ কবে দেখছো কি, ঘবটা ঠিক কবো"—এই কথাটা বলা শেষ হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে ও-ঘবেব আড্ডাব উপসংহাবেব স্মৃতিটা স্বপ্নাব মুখ থেকে নিঃশেষ সবে গেল। "বেডকভাবটা তোল আব দেখো বালিশ তোশক ভিজেছে কি না"—বিজিত খাটে উঠলো আব স্বপ্না জানলাব কাছে গিয়ে চাবফুট বাই চাবফুট জানলাব আটফুট বা ছয়ফুট পর্দাটা টেনে সবিয়ে দুটো শিকেব মাঝখানে মুখ বাখলো, বৃষ্টি এসে তাব মাথাব চুল, মুখ, গলা, শাড়ি ভিজিয়ে দেয় ভিজিয়ে দেয়। বাইবে পেট্রলপাম্পেব বড়-বড় আলো পর্দাসবানো জানলা দিয়ে ঘবে আসাব পথে স্বপ্নাব ভেজা মুখে বেগনি গোছেব আবছা আভা।

"বেডকভাবটা কি তুলে ফেলবো?"—পেছন থেকে বিজিত শুধোতেই "হ্যাঁ" বলে, শিক ধবে জানলাব চৌকাঠে পা দিয়ে লম্বা হয়ে একটানে পর্দাটা নামিয়ে খাটেব ওপব ফেলে। খোলা জানলা দিয়ে জল সবাসবি ঘবেব ভেতব। পবেব জানলায় একইভাবে উঠে পর্দাটাকে নামিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই স্বপ্না ছুঁড়ে দিল খাটে বসে থাকা বিজিতেব মাথাব ওপব। তাবপব হো হো কবে হাসতে হাসতে খাটেব ওপব। ঝুঁকে বাঁ হাতে দেয়ালে ভব। শবীব সামলে ডান হাতে টান দিয়ে দবজাব পর্দাটা। খুলে বিজিতেব ওপব ছোড়ে। পর্দাঢাকা বিজিত। স্বপ্না হো-হো হাসতে-হাসতে হুমড়ি খেয়ে সেই পর্দাঢাকা বিজিতকে

পেছন থেকে জড়িয়ে ধবে খাটেব উপব শুইযে দিল, বিজিত চেঁচিযে বললো—
"কি মাবামাবি হবে নাকি"—

"হোক হোক" বলে স্বপ্না তাব ললিত বাহু দিযে বিজিতকে বেষ্টন কবে খাটেব ওপব শুযে পড়ে, বাঁ পা দিযে পা চেপে বেখে ডানহাত দিযে বিজিতেব বুকেব ওপব চাপ দিযে বাখতে চায। পর্দায ঢাকা বিজিত দুহাত দিযে পর্দাটা সবিযে ফেলতে আব স্বপ্নার শবীবেব চাপ ঠেলে উঠতে চায। খোলা জানলা আব দবজা দিযে হাওযা আব জল এসে ঘব-খাট-তোশক ও তাদেব দুজনকে ভেজায। তোশকেব ওপব কোন চাদব নেই, জানলা-দবজায কোনো-পর্দা নেই। তাব মাথাব ওপব থেকে পর্দা সবিযে বেবিযে স্বপ্নাব কাঁধ ধবে উল্টে দেবাব চেষ্টা কবতেই, "এঃ মা ও-বাড়িব জানলা দিযে সব দেখা যাচ্ছে" বলে বিজিত স্বপ্নাকে ছেড়ে দিল। আব স্বপ্না "যাক গে" বলে সম্মুখ দিযেই বিজিতেব দুই-হাতেব নিচ দিযে হাত চালিযে তাকে খাটেব কিনাবায শুইযে ফেললো। বিজিত শবীবে একটা ঝাঁকানি দিতেই—তাবা দুজনে গড়িযে জলভবা মেঝেতে। বিজিত ডান পা দিযে স্বপ্নাব পা চেপে বেখে, দুই হাতে স্বপ্নাব দুই হাত শবীবেব সঙ্গে সমকোণে সবিযে বাখলো। স্বপ্নাব আঁচল কাঁধ থেকে নেমে ডান বাহুব কনুই পর্যন্ত ছড়ানো—পাখাব মতো, চুল খোলা, সাবা শবীব ভেজা, মুখে জলবিন্দু—সে হাসছে। আব সেই হাসিতে আন্দোলিত বুকেব ওপব বিজিত মুখটা গুঁজতেই স্বপ্না সাবা শবীবে একটা তীব্র ঝাঁকুনি দিল আব বিজিতেব মাথাটা ছিটকে পেছনে খাটেব সঙ্গে খট কবে লাগলো। "উঃ" বলে বিজিত মাথা নামাতেই স্বপ্না তড়াক কবে লাফিযে উঠে খাটেব ওপব বসে হাঁফায। তাব পাযেব কাছেই মেঝেতে বিজিত পড়ে। পেছনে দুহাত দিযে শবীবটাকে হেলিযে মাথাটাকে পেছনে ঝুলিযে শুকনো গলায খড়খড়ে হাসতে হাসতে, সাদা পাথবেব মতো গলাটাব বল উঠিযে নামিযে, স্বপ্না "নাও খোকা কাঁদে না, আব মাববো না, ওঠো, ফ্যানটা চালাও"। তালুতে হাত বোলাতে-বোলাতে বিজিত উঠলো—"তুমি না একেবাবে যা-তা, কথাবার্তা নেই এখন শবীব অস্থিব কবছে তো ?" ফ্যানটা চালিযে দিযে, পাশে বসে স্বপ্নাব কপালেব ঘামেব সঙ্গে লেগে থাকা চুলগুলোকে সবিযে দিতে-দিতে বিজিত বললো—
"জল খাবে ?" ভঙ্গি বদলে, বিজিতেব কোলেব ওপব মাথাটা দিযে চোখ বুঁজে স্বপ্না বললো "তোমাকে খাবো"—

"সে তো খাবেই, চিবিযে, না, জল দিযে ?"

"সেদ্দ কবে"—স্বপ্না চোখ বুঁজে। চোখ বুঁজেই বাঁ হাতটা বিজিতেব কপাল-চুলে বুলিযে কাঁধেব ওপব ফেলে—"তোমাব মাথায খুব লেগেছে, না ?"

"না, লাগবে কেন, এতো কুসুম প্রহাব"

চোখ বুজে একটুক্ষণ শুযে থেকে স্বপ্না উঠে বসে একহাত দিযে মাথাব চুল ঠিক কবে আব এক হাত খাটেব বাজুব ওপব বেখে ঘবেব চাব পাশে তাকিযে বললো"—"এম্‌মা কী অবস্থা হযেছে ?"

"যে-লঙ্কাকাণ্ড কবলে, ঘবেব আব দোষ কি ?"

স্বপ্না উঠে মেঝেতে ছড়ানো ছিটোনো পর্দাগুলি তুলতে শুরু কবতে বিজিত উঠে দবজা জানালাগুলি বন্ধ কবে। বাইবেব পেট্রল পাম্প থেকে ঘবেব ভেতব যে-আলো ও বৃষ্টিব যে-ছাঁট তা বন্ধ। পর্দাগুলিকে জড়ো কবে নিযে স্বপ্না বাইবে দবজাব পাশে ডার্টি বক্সে বাখে। তাবপব একটা ঝাঁটা নিযে ঢুকে ঘবেব জল পবিষ্কাব কবে। খাটেব বিপবীত দিকে দাঁড়িযে বিজিত শুধোল "পর্দা লাগাবে না" ? মেঝেতে ঝাঁটা বুলোতে বুলোতে স্বপ্না "কী হবে পর্দা টাঙিযে, দিনবাত দবজা-জানলা বন্ধ কবে পদা টাঙিযে সাজিযে গুছিযে—"

"তা ভালোই তো ওপ্‌ন্ টু এযাব এণ্ড সান, তবে মুশকিল হচ্ছে কলকাতায আবাব সবাব ঘবেব ভেতবেই সবাব দৃষ্টি চলে"

"চলুক না, সবাব দৃষ্টিকে এতো ভয কিসেব"

"আমি কি ভযেব কথা বলছি ?"

"তুমি বলো চাই না বলো আমি কি বুঝি না ভেবেছো, তোমবা সাবাদিন বাইবে-বাইবে ঘুবে এসে গৃহ চাও আব গৃহ মানেই তো তোমাদেব কী বলে শান্তি, সুখ, নীড, গৃহিনী, নাকি—"

"বা বা তুমি যে আজ বীতিমতো বিদ্রোহিনী—"

"কোথায ? খ্যামতা আছে নাকি বিদ্রোহ কবাব। ঐ তোমাব কাছে একটু লেকচাব দিচ্ছি—। তুমিও এক কান দিযে শুনছো, আব-এক কান দিযে বেব কবে দিচ্ছ।"

"মোটেই না, এক কানে আঙুল দিযে আছি, যাতে বেবিযে না যায"

ও-সব বলে কি আব হবে। তোমাব সাধ্য আছে আমাব কথা বোঝ ?" খাটেব তলা থেকে বেবিযে ঝাঁটা হাতে স্বপ্না এবাব দাঁড়াল, তাবপব খাটেব বিপবীত পাশে বিজিতেব দিকে তাকিযে "তোমাব দিক থেকে সত্যি তো

তুমি পাবফেক্ট। আমি যখন যা আব্দাব ধবেছি তাই কবেছো। তোমাব পক্ষে কষ্ট হলেও কবেছো। এবং উই হ্যাভ গট এ পাবফেক্ট হোম—"

স্বপ্নাকে থামিযে দিযে একলাফে খাট টপকে এসে স্বপ্নাব দুই হাত ধবে বিজিত বললো—"ঝাঁটা ফেলো, ঝাঁটা ফেলো"

স্বপ্না হেসে বললো, "কেন?" হাত থেকে ঝাঁটা খসে যায, "দুহাত ওপবে তোল" নিজেই স্বপ্নাব দুইহাত ওপবে তুলে দিযে—এইবাব 'উইহ্যাভ-গট এ পাবফেক্ট হোম উইথ, উইথ, উইথ—'

স্বপ্না চেঁচিযে উঠলো "উইথ ফ-অ-ব্-মি-কা-আ" একহাতে স্বপ্নাব কোমব ধবে, একহাত বাইবে বাডিযে বিজিত চেঁচায, "উইথ সা-ন্-গ্ল-স্—" তাবপব যোগ কবে—"হুইচ ইজ যোব বিউটিফুল?" দুইহাত ওপবে তুলে একপাক ঘুবে স্বপ্না "অ্যানি ফ্রেঞ্চ হেযাব বিমুভাব"—

বিজিত স্বপ্নাকে ছেডে দিযে দেযালেব দিকে যেতে-যেতে "স্লিভলেস না পবে কি আব হেযাব বিমুভাব কবা যায—" তাবপব—"ম্যান অন দি গো—ইন থ্যাকাবসে-ফ্যাব্রিকম"

"থিফ? ল্যাক্‌মি ট্যাল্‌ক"—একটু ঝুঁকে কোমব হেলিযে স্বপ্না। আব সঙ্গে সঙ্গে, যেন তাল বেখে ডিসকর্ডে সমবেত প্রচণ্ড চীৎকাব উঠলো—"হে ল্ প্"—। বেকর্ড প্লেযাবটা চালিযে দিযেই বিজিত ছুটে এসে স্বপ্নাব পাশে সোজা, স্বপ্নাও মুহূর্তে যেন অ্যাটেনশনে, বিজিত স্বপ্নাব বাঁ হাতটা ডান হাত দিযে ধবে সবল বেখায উচুঁতে তুলে দুহাত দুদিকে কাঁধেব সমকোণে ছডিযে প্রায সমকোণে ঘাড ঘুবিযে পবস্পবেব দিকে মুখ ফিবিযে, যেন পবস্পবেব মুখেব বিববে, ছুডে দিল, বেকর্ডেব সঙ্গে কোবাসে গলা মিলিযে—"হে-এ-ল্-প্", তাবপব মুখ আবাব সামনেব দিকে ফিবিযে পুতুলেব মতো এক-একবাব এক-একটা হাত ও পা তুলে ও নামিযে—"নেসকাফে ফব মডার্ণ লিভিঙ," "পাবফেক্টলি ব্লেণ্ডেড উইল্‌স্ ফিল্টাব" আব যেই বেকর্ডে শম, অমনি দুজন সমকোণে দুজনেব দিকে ঘাড ঘুবিযে মুখবিববেব মধ্যে ছোঁডে, "হে-এ-ল্-প্" তাবপব আবাব গানেব তালে তালে হাত-পা নামিযে উঠিযে—স্বপ্নাব মুখটাকে সামনে এনে একটা চুমু দিযে বিজিত—"স্যুইট লাইক এ গুর্ডনাইট কিস্ গোযা-লিযব স্যুটিঙ্‌স্।" বিজিতেব গালটাকে টেনে নামিযে তাব ওপব গাল বেখে "ফেদাবটাচ শেভিঙ বাই পামঅলিভ।"—"হে-এ-ল্-প্।" বেকর্ডে মোটবেব হর্ন বাজছে তালে-তালে, যেন কলকাতাব বাস্তা, শেযালদব, চৌবঙ্গিব,

ড্যালহৌসির মোড, যেন ট্রামের তারের ঘর্ষণ রেকর্ডে। "হে-এ-ল্-প্।" স্বপ্নার ঘর্মাক্ত মুখকে হঠাৎ ঘোমটা দিয়ে ঢেকে—"ট্র্যাডিশন অফ ইণ্ডিয়াইন ডি-সি-এম শাড়িজ", পুতুলের মতো খটখটিয়ে দুপা হেঁটে বিজিত "গো-ও দি কোহিনুর ওয়ে" "হে-এ-ল্-প্।" "কার্ম্ টু মোকাম্বো, ডান্স উইথ শেলি" "হে-এ-ল্-প্।" "ক্যালকাটাস বেস্ট নাইট স্পট ব্লু ফক্স।" "ডু-উ দি বির্কলিয়েস্ট থিঙ ইন নিবলর্ন শাড়িজ।" "দি স্মেল দ্যাট লাস্টস সো লঙ। হে-এ-ল্-প্।" "হা-যা-র এ্যাণ্ড হা-যা-র অ্যাণ্ড হা-যার, দি থিঙস দ্যাট মেক এ মডার্ণ হোম" "হে-এ-ল-প" "হাঁযার পারর্চেজ, হাঁযার পারর্চেজ, হাঁযার পারচেজ ইয়োর ডে-এ-এ-এ্যাণ্ড না-আ-ইট অ্যাণ্ড লা-আ-আ-আ-ই-ই-ফ" "হে-এ-ল্ প্। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে হাসে। আর রেকর্ডটাতে ক্ষণিক বিরতির পরই নতুন একটা সুর।—প্রায় কোনো রকম বাজনা ছাড়াই একটা গভীর মন্দ্র কণ্ঠ বিলম্বিত লয়ে যেন কলকাতার জনহীন পথে, রাত্রির বা বৃষ্টির, কোনো যুবক আপনমনে, যেন দোলনা, যেন দোলনা আর শেষে সেই দোলানিকে থামিয়ে "অ্যাণ্ড ইউ হ্যাভ গট টু হাইড ইয়োর লাভ অ্যাওয়ে।"

স্বপ্না ঝাঁটা তুলে নিয়ে ঝাড় দিতে লাগল। বিজিত বললো "আমাকে বলো না কেন কোথায় আছে পর্দাগুলো, টাঙিয়ে দি"

"তুমি পর্দা লাগাবার কি জানো ?"

"রিঙের ভেতর দিয়ে চেন পরাতে পারি"

"সে তো কুকুরের চেন-ও তাই, তার সঙ্গে পর্দার ডিফারেন্স কি"

"কুকুর শিকে বাঁধা থাকে, পর্দা শিক ঢেকে রাখে"

"কতোটুকু শিককে কতোখানি পর্দা ঢেকে রাখবে ?"

"একহাতি জানলাকে দশহাতি পর্দা, মনে হবে যেন পর্দা তুললে ঘুলঘুলির বদলে ফুটবল খেলার মাঠ"—"অ্যাণ্ড ইউ হ্যাভ গট টু হাইড ইয়োর লাভ অ্যাওয়ে"

"তাতে লাভ কি ?"

"পাঁচ বাই সাত খাটে শুয়েও তুমি আকাশের তলে শুয়ে আছ—ভাবতে পারো ‐ "

"তাতে লাভ কি ?"

"ইনটিরিয়র ডেকরেশনের ক্লাশ খুলেছে, ক্যামাক স্ট্রীটে, দুপুর বেলা, ভর্তি

হও” “তাতে লাভ কি ?” “হোমা ডেকবেশনেব দর্শন জানতে পাবে।” “তাতে লাভ কি ?”

“বেঁচে থাকাব পার্সপেকৃটিভ পাবে—” “অ্যাণ্ড ইউ হ্যাভ গট টু হাইড ইযোব লাভ।”

“তাতে লাভ কি”

“তোমাব একটা প্রাসঙ্গিকতা আসে—”

“তাতে লাভ কি ?”

“জীবনযাত্রাটাকে একটা শিল্পে পবিণত কববে” “অ্যাণ্ড ইউ হ্যাভ গট টু”

“তাতে লাভ কি ?” স্বপ্না দবজা খুললো।

“বাঁচতে ভালো লাগে” “অ্যাণ্ড ইউ”

“তাতে লাভ কি ?” মযলাগুলোকে ঝেঁটিযে স্বপ্না বাইবে ফেলে দিল

“বাঁচতে ভালো লাগে”

“তাতে লাভ কি ?” দবজাব ছিটকিনি লাগিযে দুইহাত পেছনে বেখে দবজায হেলান দিযে স্বপ্না বিজিতেব দিকে তাকিযে—“তাহাতে কি আমি অমৃত পাইব।” তাবপব ঘড়িব দিকে তাকিযে “ও-বাবা বাত সাড়ে নয, ঐ স্টিলেব আলমাবিতে পর্দাগুলো আছে, তুমি লাগাও, আমি একটু স্নানে যাই”- “অ্যাণ্ড ইউ হ্যাভ ·”

পাশেব ঘবে গিযে স্টিল আলমাবী খুলে পর্দাব তাকটায তাকিযে বিজিত বুঝলো তাকে পছন্দ কবতে হবে। পর্দা আব বেডকভাবেব ব্যাপাবে স্বপ্না ভীষণ। আব ও-ঘবেব বেকর্ড প্লেযাবে তীব্র আর্তনাদ উঠলো। তাড়াতাড়ি একটা মেরুন বঙেব পর্দাব সেট আব একটা কটকটে হলদে বেডকভাব নিযে এ-ঘবে এসে বেকর্ড প্লেযাব বন্ধ কবতেই বাথরুম থেকে ঝবঝব জলেব সঙ্গে স্বপ্নার গুনগুন গলা।

বিঙগুলো স্প্রিঙেব ভেতব ঢোকাতে জানলায উঠে পর্দা খুলে ধবতেই দেযালেব, আলোব, পর্দাব বঙ মিলে আলোড়ন। বিযেব পব দেশলাই বাক্স আব সিগাবেটেব প্যাকেট দিযে ঘব বানিযে, তাতে ছোট্ট ছোট্ট নানাবঙেব পর্দা ঝুলিযে এক্সপেবিমেণ্ট তবে পর্দাব বঙ আব বেড-কভাবেব বঙ, ইস্কুল কলেজেব চাকবি যখন পাচ্ছিই না ভাবছি ইনটিবযব ডেকবেব একটা ব্যবসা ধববো কি না,· চাকবি পাবে না কাবণ অনার্স নেই, কাবণ এম্-এতে সেকেণ্ড ক্লাসেব নিচেব দিকে বিযে হযে গেলে বিসেপসনিস্ট বা সেক্রেটাবিব কাজ দেয ? ·

অফিসে চাকবি কবলে কি দোষ? টাকা পযসাব ব্যাপাবটা ছেড়ে দাও, এতবড একটা শবীব নিযে জাস্ট এক্সপেণ্ডেব্‌ল্‌ মেটেবিযাল হযে জীবনেব একটা পার্সপেকটিভ বেঁচে থাকাব প্রাসঙ্গিকতা বাচ্চা হতে পাবে তখুনি যখন আমি মা হওযাব জন্য তৈবি জীবনে ব্যর্থ হযে সফল মা হওযা যায না জাস্ট একটা মাথা আব একটা শবীবেব স্বীকৃতি মেলে এমন কিছু অ্যাপযেণ্টমেণ্ট সাবাটা দিন সাবাটা জীবন কি কববো, আজ দুপুবে এই বাডিব ফ্লোব স্পেস মেপেছি সোযা পাঁচশ বর্গফুট একটা কিছু ঘটবে একটা কিছু হবে আমি যে-একটা মানুষ তা প্রমাণ হবে তাবপব মা হবো শাশুড়ি হবো বেযান হবো ঠাকুমা হবো ধবধবে সিঁথিতে টকটকে সিঁদুব পববো ।

খাটেব ওপব বেডকভাবটা ছড়িযে দিযে নিজেব মনেই বিজিত বলে "বাঃ।" চাবপাশে মেরুনেব স্তব্ধ গভীবতাব মাঝখানে কটকট হলুদেব ওপব ছোট ছোট ফুলেব সোনালী নক্সা। পাশেব ঘব থেকে দুটো ধূপকাঠি নিযে এসে গুঁজে দেয। আফশোষ, বজনীগন্ধাব ডাঁটা নেই, তাহলে মেরুনেব পটভূমিতে । ঘবেব ম্লান কমলা বঙেব আলোটা। ঘবেব পবিস্থিতিটা বদলে গেল। দবজা আবজে ঘব থেকে বিজিত বেবিযে যায।

'তুমি হাতমুখ ধুযে নাও" স্বপ্না লবিব আলোটা জ্বালে আব ওদিক দিযে বিজিত বাথরুমে। শোবাব ঘব, দ্বিতীয শোবাব-খাবাব-পডাব ঘব, বাথরুম—এক লাইনে। শোবাব ঘবেব সামনে দশ বাই পাঁচ লবিব এক দেযাল ঘেঁষে একটা সোফা কাম্‌-বেড আব তাব সামনে দুপাশে দুটো বেতেব চেযাব, একটা নিচু বেতেব টেবিল। আব এক দেয়াল ঘেঁষে একটা বুকসেলফ ও তাব পাশে আযনা। তাবপবই পার্টিশন-পর্দা—বাথরুম বান্নাব জাযগা ও দ্বিতীয শোবাব ঘবটিকে আডাল কবা।

বাথরুম থেকে বেবিযে বিজিত যখন আযনাব সামনে দাঁড়িযে চুল আঁচডায স্বপ্না তখন টেবিলে হটবক্স খুলে খাবাব দিচ্ছে।

ঘবে ঢুকে চেযাবে বসে বিজিত বললো— 'কী ব্যাপাব, আমাকে ভোলাবাব আযোজন?"—স্বপ্নাব গাযে হাতাকাটা জামা, কাঁধ আব গলা নিচু। তাব পুষ্ট বাহু আব কাঁধ পাউডাবেব স্নিগ্ধতায ললিত। "তুমি আমাব স্বামীদেবতা, আমাব একটা কর্তব্যজ্ঞান তো আছে"

"সেটা আবাব কি বস্তু"

চেযাবে বসতে৽বসতে স্বপ্না "আমাকে ভোলাতে তুমি কত খেলনা এনে দিযেছ"

ভাত মুখে দিযেছিল বিজিত "আমি আবাব তোমাকে ভোলাতে" একটা লম্বা দুই দাঁতেব পাটিব মাঝখানে বেখে ছিঁডে স্বপ্না "কেন, এই যে এত সুন্দব একটি ফ্ল্যাট, নানাবঙেব পর্দা, নানা কিসিমেব বেডকভাব, সোফাকামবেড, বেতেব চেযাব, বান্নাব গ্যাস, প্রেসাব কুকাব, বাতে যাতে বাঁধতে না হয হট-বক্স ক্রকাবিজ, এত এত শাডি-জামা" স্বপ্না ঢোঁক গিলে হাসলো—

"কী যে বলো তাব ঠিক নেই, মডার্ন লিভিঙ"

"বাখো তোমাব মডার্ন লিভিঙ। শুনতে খাবাপ লাগলেও আসলে তো আমি তোমাব সবচেযে　"

"ব্যস ব্যস আব নয, বেলাইনে যাচ্ছো"—বিজিত।

"যাচ্ছি। তোমাব শুনতে খাবাপ লাগছে, লাগুক।" বিজিতকে জল খেতে দেখে স্বপ্না যোগ কবলো "বিষম লাগছে—ষাট ষাট"—কাঁচেব গ্লাসেব ওপব দিযে স্বপ্নাব দিকে তাকিযে বিজিত বুঝতে চাইল সে আক্রমণ কবছে নাকি বঙ্গ।

"সুতবাং আমাব এমন প্রভুব জন্য যদি একটু সাজগোজ না কবি পাপ হবে না　?"

বিজিত ডিসেব ওপব হাতটা ফেলে বেখে চেযাবে হেলান দিযে বললো "সেবে নাও, তাবপব খাবো।"

"আচ্ছা যাও, ছেডে দিলাম, তোমাব আবাব আক্রমণেব সামনে কেমন মাযেব খোকা মাযেব খোকা গোছেব চেহাবা হযে যায। তা আক্রমণ কবাব জন্য তো আমাব সম্মুখে কাউকে দবকাব।"

"আমাব চাইতে বেশি কেউ-ই সইতে পাববে না"—

"তোমাকে তো আমি সইতে বলি নি, আব কি-ই-বা সও"

"আব কি সওযাতে চাও"

"আমি যা বোজ সহ্য কবি, এই ঘবগুলোতে একা একা থাকা, সাবাদিন"

"বেডাতে গেলেই পাবো—"

"ভালো লাগে না, তাই যাই না, আব ভালো লাগলে এই এখন বাত দুপুবে যাবো—"

"তাহলে তোমাব ভালো লাগাব জন্য চাকবি-বাকবি ছেডে আমাকে

বাডিতে বসে থাকতে হয -” শেষবাবেব মতো জলখেতে গেলাসটা ধবলো বিজিত।

জলখেযে, ঠক কবে শব্দ তুলে গেলাসটা নামিযে, একটা বিদঘুটে শব্দে উদ্‌গাব তুলে স্বপ্না ঠোঁট বেঁকিযে—“অতটা প্রেম তোমাব প্রতি আমাব নেই যে সাবাদিন তুমি ঘবে থাকলেই ভালো লাগবে—” উঠে, ধাক্কা দিযে চেযাবটা সশব্দ সবিযে ঘব থেকে বেবিযে চলে যায। স্বপ্না বাথরুম থেকে বেবিযে শোযাব ঘবেব দিকে চলে যাওযাব পব বিজিত ওঠে। ঘবে ফিবে যাবাব সময দবজা দিযে মুখ গলিযে স্বপ্না বলে গেল “কি আব কববে, ডাইভোর্স কবতে পাবো—তাও আমাব একটা চিন্তা কবাব বিষয ঘটবে।”

বাডিব সব আলো নিবিযে, দবজা বন্ধ কবে, শোবাব ঘবেব পর্দা ঠেলে ঢুকতেই স্বপ্না বললো “কম্‌প্রোমাইজ—তুমি এমন সুন্দব ঘব সাজিযে বেখেছ জানলে আমি কখনোই তোমাব সঙ্গে ঝগডা কবতাম না।’ কোনো জবাব না-দিয়ে বিজিত পাখাটা চালিযে দিযে, দবজায ছিটকিনি দিযে শুযে পডে, বাঁকনুইটাব ভাঁজ নাকেব গোডায বেখে। একটু পবে স্বপ্না নিজেব বালিশ ছেডে বিজিতেব হাতেব নিচে মাথা দিযে, ডানহাতে তাকে জডিযে ধবে, ডানপা তাব শবীবেব ওপব দিযে গুনগুন বললো—“বেযাইমশাই, বাগ কবো না।” তাবপব বিজিতকে ঝাঁকাতে লাগলো একটু একটু “বাগ কবে না বাগুনি, বাঙা মাথায চিরুণি, বব আসবে একখুনি নিযে যাবে তকখুনি।” তাবপব ধীবে ধীবে গুনগুনানি থেমে, দোলানি থেমে, একেবাবে চুপ। যেন ঘুম। পাখাব বাতাস না জানলাব ওপাবে কলকাতায মৌসুমী বাতাস শাঁ শাঁ ধ্বনি তুললো আব মবা বক্তেব মতো বঙেব পর্দা সাবা ঘবময দুলতে লাগলো।

বিজিত ডানহাত দিযে ধীবে স্বপ্নাকে বেষ্টন কবে বুকেব কাছে ধবে বাখলো,—স্বপ্না ফিসফিস—“ভালো লাগে না, ভালো লাগে না, এব চেযে দশবাবোটা ছেলেমেযেব মা হওযাবও একটা মানে—।” বিজিত স্বপ্নাব মাথায হাত দেয। “নিজেব কোনো পবিচযই নেই।” বিজিত স্বপ্নাব সিঁথিতে আঙুল বোলায। “এ-সব ফেবত দিযে দাও, আমি ঘবদোব মুছবো বান্না বাডি কববো, এত খাটনি বাঁচিযে লাভ কি”—বিজিতেব বুকে চোখেব জলেব উষ্ণতা। “কাঁদে না স্বপ্না কাঁদে না, পবিচয সংগ্রহ কবতে হয, হেবে যাবে কেন।” “তুমি কি আমাব বাবামশাই যে উপদেশ দিচ্ছ” স্বপ্না জলভবা চোখ তুলে চাইল। পাশ ফিবে তাকে বুকেব মধ্যে আবো টেনে নিযে

বাচ্চাদের মতো ঘুম পাড়াতে পাড়াতে বিজিত "হ্যাঁ আমি তোমার বাবামশাই, এবার ঘুমোও তো লক্ষীটি।" জানালার বাইরের সমুদ্রের হাওয়া, নাকি পাথার হাওয়া ঝড়ের মতো, সমুদ্রের ঝড়ের মত দেয়ালে দেয়ালে ঘা খায়। আর পর্দাগুলো যেন দুলে- দুলে উঠছিল, আর সারা ঘরটা যেন পর্দায় পর্দায় ফুলে ফুলে। আর ওরা নাকি ঘুমোয়।

মাঝরাতে স্বপ্নার নতুন মায়ের ত্রস্ততায় ধড়মড় করে নিজের বালিশে ফিরে কমলা রঙের আলোতে নগ্ন দীর্ঘ হাত মেলে বিজিতকে টেনে তার মাথা আর-এক পুষ্ট বাহুর ওপর এনে বিশদ স্তন দুটির মাঝখানে বিজিতের ঠোঁট দুটিকে গুঁজে দেয়—"বিজিত সোনা, কাঁদে না।"

মৌসুমী বায়ুবাহিত সামুদ্রিক তরঙ্গ জানলায় শার্সিতে আছড়ায়। জানলার ভেতরের ও বাইরের সামুদ্রিক হাওয়া দেয়ালে-দেয়ালে হা-হা। হাওয়ায় হাওয়ায় শুকনো রক্তের রঙের পর্দা জাহাজের পালের মতো ফুলে ফুলে ওঠে। জাহাজের। জাহাজের পালের মতো। ফুলে ফুলে॥

শিয়রে প্রলয়ের পাল নিয়েও সংরক্ষিত প্রাণী দুটি কিছুতেই নরনারী হয়ে উঠতে পারছে না।

যেমনটি তেমনিটি

অন্নদাশঙ্কর রায়

ছেলেবেলায় যিনি আমাদের অঙ্ক শেখাতেন তিনিই শেখাতেন অঙ্কন। একবার তিনি আমাকে একটা অশথের পাতা দিয়ে বলেন, যেমনটি দেখছ তেমনিটি এঁকে নিয়ে এস। আমি সেই পাতাটাকে পাতলা কাগজ দিয়ে অবিকল ট্রেস করি। মাস্টার মশায় তো মহাখুশি। যেমনটি দেখতে তেমনিটি দেখিয়েছি। আর কী চাই? অঙ্কনের জন্যে সেবার আমি পুরোমার্ক পাই। আমিও মহাখুশি।

বড়ো হয়ে বুঝতে পারলুম যে অঙ্কের বেলা যেটা খাটে অঙ্কনের বেলা সেটা খাটে না। মাস্টার মশায় আসলে অঙ্কের লোক। অঙ্কনের ভার তাঁর উপর দেওয়া হয়েছিল অধিকন্তু। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে দুই আর দুই মিলে যেমন চার হয় তেমনি গাছের পাতা আর খাতার পাতা মিলে এক হয়। বড়ো হয়ে জ্ঞান হলো যে প্রকৃতির অনুকৃতির নাম আর্ট নয়। অশথের পাতার হুবহু নকল যারা করে তারা শিল্পী নয়। আমি যে পুরো মার্ক পেয়েছিলুম সেটা আমার পাওনা নয়। তখন আমি মহাদুঃখিত হই।

অনেকের স্মরণশক্তি এত প্রখর যে তাঁরা অশথের পাতা সামনে না রেখেও বিলকুল তেমনিটি আঁকতে পারেন। সেটাও অনুকৃতি। এক্ষেত্রে সামনে রাখা না রাখাটা পয়েন্ট নয়। পয়েন্ট হচ্ছে যেমনটি তেমনিটি। সেটা হয়তো আমার খাতার অশথপাতার মতো জালিয়াতী নয়। কিন্তু সেটাও একপ্রকার কেরামতী যার জন্যে স্মরণশক্তি থাকলেই যথেষ্ট।

ধরো, একজনের স্মরণশক্তি নেই। তা বলে কি সে শিল্পকর্ম করবে না? শিল্পী হবে না? নিশ্চয়ই হবে। যাঁরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চান তাঁরা নিরাশ হয়ে বলবেন, অশথ পাতা এরকম তো হয় না। অতএব ফেল। যাঁরা মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন মনে করেন না তাঁরা বলবেন, গাছের পাতা গাছেই সুন্দর। ছবিতে তাকে না এনে তার ভিতরের সুষমাটুকু ফোটাও। তা হলেই পাশ।

এ জগৎ যেমনটি তাকে তেমনিটি দেখতে হবে, একথা ঠিক। কিন্তু একে তেমনিটি দেখাতে হবে, একথা ঠিক নয়। যদি বলি তেমনিটি দেখাতে হবে

তবে কথাটাব একটা বিশেষ অর্থ আছে যে অর্থে সেটা ঠিক। সেই বিশেষ অর্থটা যাঁবা বোঝেন তাঁবাই শিল্পী, বাদবাকী ফোটোগ্রাফাব।

ডাক্তাবদেব মতো শিল্পীবাও অ্যানাটমি ফিজিওলজি শিখতে পাবেন, কিন্তু আঁকবাব সময সে বিদ্যা ভুলে যেতে হবে। অঙ্কনেব কাজ প্রকৃতিব সঙ্গে মিলিযে নেওযা নয, তাব বহস্য ভেদ কবা। বিযালিটি তাব আডালে বযেছে। তাকে ছাডিযে বযেছে। তাকে ধবতে পাবাটাই আসল। সহজে কি সে ধবা দেয? দিব্যদৃষ্টিব শবণ নিতে হয। তখন যা ফোটে তা সাধাবণ অর্থে যেমনটি তেমনিটি নয, বিশেষ অর্থে যেমনটি তেমনিটি।

সাধাবণেব চেনা জগতেব সঙ্গে শিল্পীব আঁকা জগতেব ষোল আনা মিল আশা কবাই অন্যায। আশা যাঁবা কবেন তাঁবা ধবে নেন যে আর্ট মানে মিল বাখা বা মিল দেওযা। যে যত মেলাতে পাববে তাবই তত বাহাতুবি। এই যে বদ্ধমূল সংস্কাব এটাকে ভেঙে দিতে গিযে একালেব শিল্পীবা অনেক সময ইচ্ছে কবেই অমিল উদ্‌ভাবন কবছেন। যে যত না-মেলাতে পাববে সে তত বাহাতুব। আদৌ যদি না মেলে তো পুবো মার্ক পাওনা।

এইসব বিদ্রোহীবা বিপবীত দিকে দৌডতে দৌডতে ইতিমধ্যে এতদূব চলে গেছেন যে প্রকৃতিব দিকে ফিবেও তাকান না। কিংবা অনুকৃতিব অপবাদ খণ্ডনেব জন্যে সঙ্কেতেব বা ফ্যানটাসিব আশ্রয নেন। এঁদেব দিব্যদৃষ্টি যে বস্তুব অন্তর্ভেদী তাও নয। এঁবা ববং বস্তুকে ব্যবচ্ছেদ কবেন ও টুকবোগুলিকে নতুন কবে সাজান।

যেমনটি দেখব তেমনিটি দেখাব এ তত্ত্বে এঁদেব বিশ্বাস নেই। সাধাবণ অর্থে তো নযই, বিশেষ অর্থেও না। বিযালিটিব সঙ্গে ষোল আনা অমিল না থাকলে আর্ট হয না, এটাই মনে হয এঁদেব পালটা তত্ত্ব। সাদৃশ্যের বেশটুকুও থাকবে না, তবেই সেটা হবে আর্ট, নইলে হবে না, এটাই বোধহয় এঁদেব পালটা দাবী।

প্রকৃতিব জগৎ ও আর্টেব জগৎ যে এক নয তা মানতেই হবে। কিন্তু এক নয বলে কি তাদেব ষোল আনা বিসদৃশ হওযা চাই? আর্টেব কি তবে প্রকৃতিব কাছে পাঠ নেবাব দায নেই? চোখ মেললেই প্রকৃতিকে দেখতে পাই, প্রকৃতিব প্রতিবিম্ব মনেব মুকুবে পডবেই। তাকে কি আমি সচেতনভাবে বহিষ্কাব কবব? অতখানি আত্মসচেতন হলে কি আমি ৰূপধ্যান কবতে পাবব? ৰূপসৃষ্টি কবতে পাবব?

আর্ট হবে প্রকৃতিছুট এমন কোনো তত্ত্ব যদি কেউ প্রচার করেন তবে সেটা হবে একপ্রকার ডগমা। চোখ বুজে সেটা মেনে নিলে আর চোখ খোলা রাখতে পারব না। অথচ শিল্পীকে সর্বক্ষণ চোখ খোলা রাখতে হয়। তা না করে যদি কেউ সর্বক্ষণ চোখ বন্ধ রাখেন তবে হয় তিনি একজন ধ্যানী, যাঁর ধ্যানদৃষ্টি সক্রিয়, আর নয়তো তিনি একজন পাতালচারী, যাঁর বিহার অচেতন বা অবচেতন রাজ্যে।

বলা বাহুল্য রিয়ালিটির অন্বেষণ কতক শিল্পীকে পাতালে নিয়ে গেলেও সেটা বৃহত্তর অন্বেষণের শামিল। পাতালও রিয়ালিটির এলাকার বাইরে নয়। সেক্ষেত্রে ষোল আনা অমিল অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু সেটা যেন আত্ম-সচেতনভাবে জাহির করা না হয়। আপনা হতে যতটা অমিল আসে তাকে আসতে দাও। জোর করে টেনে না আনলেই হলো। রিয়ালিটিকে ধরতে ছুঁতে না পারলে শুধুমাত্র আকার অবয়ব শুদ্ধভাবে আঁকাই কি আর্ট? রূপ কি কেবল যেমনটি দেখতে?

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে রেনেসাঁসের পর যুক্তির যুগ এসে এমন এক গাণিতিক বিশ্বের রূপ বর্ণনা করে যে আর্টও বেশীদিন পেছিয়ে থাকতে পারে না। আর্টকেও নতুন রিয়ালিটির সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হয়। অঙ্কের নিয়ম অঙ্কনেও প্রভাব বিস্তার করে। এখন গাণিতিক বিশ্বের উপর নির্ভরতা টলেছে। প্রকৃত বিশ্ব যে একান্ত গাণিতিক নয় এ সংশয় জেগেছে। মধ্য-যুগের শাস্ত্রীয় বিশ্ব যেমন একদিন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের আলোয় অবাস্তব ঠেকেছিল আধুনিক যুগের গাণিতিক বিশ্বও তেমনি গভীরতর অনুসন্ধানের আলোয় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মশৃঙ্খলাবদ্ধ ও কার্যকারণশাসিত বলে প্রতিভাত হচ্ছে না।

আমরা আবার এক যুগসন্ধিতে পৌঁছেছি। রিয়ালিটির স্বরূপ সম্বন্ধে সংশয়মোচন না হলে সে সংশয়ের ছায়া আর্টের উপরেও পড়বে। সংশয়ই এ যুগের বাদী সুর। বৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক বা বৈপ্লবিক সাফল্য এর কণ্ঠরোধ করতে পারছে না।

বিজ্ঞান তথা বিপ্লবী মতবাদ মিলে খোদার উপর খোদকারী করতে পারে, মহাশূন্য অভিযান গ্রহগ্রহান্তর জয় করতে পারে। আত্মকলহে নির্বাণ লাভ না করলে মানবজাতি আক্ষরিক অর্থে অপার্থিব হতে পারে। এমনি কতরকম মধুর স্বপ্ন আমাদের জীবনে। কিন্তু রিয়ালিটির স্বরূপ সম্বন্ধে নতুন করে যে

সংশয় জন্মেছে তার কণ্ঠস্বর দিন দিন জোরালো হয়ে উঠছে। যুক্তির যুগ ধীরে ধীরে নির্যুক্তির যুগে পরিণত হচ্ছে। এর লক্ষণ চারদিকে।

বাইরে যদি নির্যুক্তির রাজত্ব হয় তবে আর্টের ঘরে তার পদসঞ্চার অপরিহার্য। আর্টের ঘর তো সংসারের বাইরে নয়। আর্ট বড়ো জোর স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারে, কিন্তু বিচ্ছিন্নতা দাবী করতে পারে না। তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হাওয়া তার দেহের বাইরের সঙ্গে তার এলাকার বাইরের সঙ্গে ওতপ্রোত।

নির্যুক্তির যুগে বাস করলে আর্টের ভিতরেও তার অনুপ্রবেশ মেনে নিতে হয়। কিন্তু ছেলেবেলায় অশথপাতার গায়ে দাগা বুলিয়ে আমি যে ভুল করেছিলুম সেই ভুলই আবার করা হবে, যদি নির্যুক্তির জগতের গায়ে আর্টের দাগা বুলোতে যাই। প্রকৃতির অনুকৃতি যদি ভ্রম হয় তবে নির্যুক্তির অনুকৃতিও ভ্রম। যেমনটি দেখছি তেমনিটি দেখাব বলতে কি এই বোঝায় যে দুনিয়াটা একটা পাগলা গারদ বা মানসিক হাসপাতাল? না, এক্ষেত্রেও সেই বিশেষ অর্থে বুঝতে হবে। সাধারণ অর্থে যেমনটি তেমনিটি মানে নির্যুক্তির অবিকল অনুকৃতি। আর বিশেষ অর্থে যেমনটি তেমনিটি মানে নির্যুক্তির আড়ালে যে উচ্চতর সত্য আছে তার সঙ্গে সত্য রক্ষা। আর্টে সে জিনিস কোনো মতেই নকলনবিশী হতে পারে না।

দুনিয়াতে যদি নিয়ম বলে কিছু না থাকে, সমস্তটাই হয় অনিয়ম, তা হলেও আর্ট তার নিজের নিয়ম মেনে চলবে, নিয়মভ্রষ্ট হবে না। আর্টের শাসন গতকাল যেমন কঠোর ছিল আজ তেমনি কঠোর, আগামীকালও তেমনি কঠোর হবে। বাইরে নির্যুক্তির যুগ এসেছে বলে ও প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনগুলোর সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিয়েছে বলে আর্ট তার আপনার নিয়মনিষ্ঠতা বিসর্জন দেবে না। আর্ট একজায়গায় স্থির থাকবে। সেটা তার ঘরের শাসন।

এর মানে অবশ্য এমন নয় যে আর্টের নিয়মাবলী বদলায় না। নিশ্চয় বদলায়। বার বার বদলায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারা শাসিত। নিয়মশৃঙ্খলা এক্ষেত্রে আর্টের স্বকীয়। পরকীয় নিয়মশৃঙ্খলার বেলা সে সত্যাগ্রহী।

এমন যে আর্ট সে নির্যুক্তির যুগেও স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে না, যেমন যুক্তির যুগেও স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়নি। অঙ্কনের বেলা যেমন অঙ্কের নিয়ম খাটেনি তেমনি খাটবে না অগাণিতিক নিয়ম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চোখে

জগতের চেহারা যেমনি হোক না কেন আর্টে হুবহু তেমনিটি ফুটবে না। তবে তার যেটা স্পিরিট সেটা ফুটতে পারে।

প্রধানত অনুভূতি ও কল্পনা নিয়েই আর্টের আপনার সংসার। যুক্তি কিংবা নির্যুক্তি কোনোটাই সেখানে মুখ্য নয়। যুক্তিও জীবনকে গণ্ডীবদ্ধ করতে পারে, সেইজন্যে জীবন তার মুক্তির জন্যে নির্যুক্তিকে স্বাগত জানাতে পারে। আবার নির্যুক্তি যে মুক্তি দেয় সে মুক্তিও জীবনকে পাগলা গারদে কোণঠাসা করতে পারে। তার বাইরে পা দিলেই সে গাড়ী চাপা পড়তে পারে।

যাতে সব চেয়ে কম সঙ্কোচন সব চেয়ে বেশী প্রসারণ সেইরূপ জীবনই আর্টের কাম্য। জীবন যদি মোটের উপর সঙ্কোচনশীল হয়ে ওঠে আর্ট ত্রাহি ত্রাহি করবে। আর যদি মোটের উপর প্রসারণশীল থাকে তবে সেই আওতায় আর্ট তার আপনার বিকাশে মন দেবে। বিকাশের পক্ষে প্রসারণশীলতাই শ্রেয়।

তা বলে শিল্পীর উপরে জীবনকে প্রসারণশীল করার ভার অর্পণ করা হয়নি। আর্ট যদিও জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে, জীবনের গতি নির্দেশ করতে পারে তবু সে কাজ সচেতন-ভাবে করতে যাওয়াও একপ্রকার উদ্দেশ্যসাধন আর সে উদ্দেশ্য আর্টের ঘরোয়া উদ্দেশ্য নয়। রিয়ালিটিকে জানতে চাও, বুঝতে চাও, ধরতে চাও, ছুঁতে চাও—বেশ। কিন্তু তাকে নিজের হাতে বানাতে যেয়ো না। অন্তত সচেতনভাবে নয়। তা করতে গেলে এতদূরে সরে যাবে যে অনায়াসে স্বক্ষেত্রে ফিরে আসতে পারবে না। স্বক্ষেত্রত্যাগ স্বধর্মত্যাগের মতোই ভয়াবহ।

আধুনিক মানুষ রিয়ালিটিকে বানিয়ে নেবার স্পর্ধা রাখে। তা বলে শিল্পী যেন স্বস্থানচ্যুত না হয়। স্বস্থানে পা ঠিক রেখে টাল সামলে সুস্থির হয়ে তার পরে অন্য কথা।

দেবদাস এবং তিতির

নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তালা খুলে ঘবে ঢুকেছে, আলোটা জ্বেলেছে, অমনি দারুণভাবে চমকে দিযে—মুখেব ওপব ঝটপট কবে ডানাব ঝাপট মেবে কী একটা নিযে ঢুকল আলমাবীব তলায়।

হকচকানো দেবদাস প্রথমটা লাফিযে বেবিযে গেল ঘব থেকে। তাবপব নিজেকে ধিক্কাব দিযে বললে, 'আচ্ছা কাওযার্ড তো।' সুতবাং অবিলম্বে বীবেব মতো পুনঃ প্রবেশ। 'নিশ্চয চড়ুই-টড়ুই কিছু হবে—একবাব দেখতে হবে ব্যাপাবটা।'

সাড়ে পাঁচফুট শবীবটাকে বেশ পবিশ্রম কবে নোযাতে হল, তাবপব খোঁজা শুরু হল, আলমাবীব নীচে। হাত ঢুকিযে দিযে ভয ভয কবছিল একটু—যদি আঁচডায-ফাঁচডায। নবম নবম পাখিব মতোই কী একটা হাতে ঠেকল কযেকবাব। সবে সবে গেল, দু-একবাব পাখাও সাপটালো, তাবপবেই খপাৎ।

চড়ুই? চড়ুই কি এত বডো হয?

হাতেব মুঠোব ভেতবে ছোট্ট একটু নবম বুকেব ধুকপুকুনি। আলোব ভেতবে বাব কবে আনতেই—আবে—আবে এ যে তিতিব দেখছি একটা। ছোটই। এল কী কবে?

পাখিটাকে মুঠোব ভেতবে ধবে—গম্ভীবভাবে চেযাবে এসে বসল দেবদাস। হুঁ—তিতিবই বটে, কোনো সন্দেহ নেই। গোল শবীব, মেটে বঙ, কালো কালো ছিট তাব ওপব। হলদে লম্বা ঠোঁটটা একটু বাঁকানো। এই পাখি-গুলো ছেলেবেলা থেকে দেবদাসেব চেনা। এদেব বডো জাতটা পোষা কুকুব-বেডালেব মতো মনিবেব পেছনে পেছনে ঘুবে বেডায, আব এগুলোকে তালিম দেওযা হয স্রেফ মাবামাবিব জন্যে—যাকে বলে লডাযে তিতিব।

কিন্তু সে তো বিহাব-যুক্তপ্রদেশেব ব্যাপাব। এখানে—এই কলকাতা শহবেব একেবাবে মাঝখানটিতে—এই লডাযে তিতিব এসে হাজিব হল কোত্থেকে। এক আধটা টিযা-মযনা মাঝে-মাঝে খাঁচা থেকে পালিয়ে উডে

আসে অবশ্যি, একটা বুড়ো টিয়াকে ধরাতে হয়েছিল কয়েক বছর আগে, কিন্তু তিতির। নদীর ধারের ঘাস বনে যার বাস, দেহাতের কোনো মাটিলেপা উঠোনে যার তালঠুকে লড়াই—এখানে সে পৌছুল কোন্ ম্যাজিকে।

বাইরে আকাশটা মেঘে কালো। সারাদিনের টিপি-টিপি বৃষ্টি একটু থেমেছিল বিকেলের দিকে, আবার নামল। তখন মনে পড়ল, ঠিক কথা। শেয়ালদা-বৌবাজার-মৌলালী জুড়ে রথের মেলা বসেছে, সেইখানে পাখির হাট। কোনো খেটে খাওয়া মানুষ—কলকাতায় ঝাঁকা বইতে বইতে কিংবা রিকস্ টানতে টানতে কিংবা বোঝাই ঠেলাগাড়ী নিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে যে দেহাত, অড়হর ক্ষেত আর মহাবীরজীর ঝাণ্ডার স্বপ্ন দেখে—সেই ওটা কিনে নিয়ে যাচ্ছিল মেলা থেকে। তারই হাত থেকে পালিয়েছে পাখিটা। ভালো উড়তে পারে না—খানিক উড়ে, খানিক লাফিয়ে ঢুকে পড়েছে এই গলিতে—বেড়ালের নজর এড়িয়ে খোলা জানলা দিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে দেবদাসের ঘরে, আলমারিটার মাথায়। তারপর আলো জ্বলতেই নিজে চমকেছে এবং দেবদাসকে চমকে দিয়েছে।

অতএব কী করা?

'মালিকের কাছে তোমায় পৌছে দিতে পারব না বাপু, এই লাখ চল্লিশেক লোকের ভেতরে তোমার কথা স্বত্বাধিকারীকে খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশে একটা বিজ্ঞাপন অবশ্যি দেওয়া যায়, কিন্তু প্রথম কথা—তোমার যা দাম বিজ্ঞাপনের খরচা তার চাইতে বেশি হবে। দ্বিতীয় কথা, তোমার মালিক আদৌ কাগজ পড়ে কিনা সন্দেহ আছে—যদি অতটা আলোকপ্রাপ্তই হত, তা হলে আর পয়সা খরচ করে একটা লড়ায়ে তিতির কিনতে যেত না।'

সুতরাং আমার গেস্ট হয়েই থাক।

পাখিটা ছটফট করছিল আবার, হাঁ করছিল থেকে থেকে, আঁচড়ে দেবার চেষ্টাও করছিল না তা নয়। দেবদাস উঠে পড়ল। সেই বুড়ো টিয়াটার জন্যে যে লোহার খাঁচাটা কেনা হয়েছিল আর বারান্দার এককোণে যেটা জীর্ণ হচ্ছিল রোদে-জলে, তার মধ্যে চালান করল পাখিটাকে।

কিছুক্ষণ প্রচণ্ড লম্ফঝম্প। কাওয়ার্ড। রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসে খাঁচার ভেতরে এখন যত লাফানি।

'লাফাও—লাফাও—আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এটা মনে রেখো,

তোমাকে ছেড়ে দিলে রাত্রেই তুমি বেড়ালের ডিনার হয়ে যাবে। রাত দশটা-সাড়ে দশটার পরেই কয়েকটা হুলোর আনাগোনা শুরু হয়—তুমি যে লড়ায়ে বীরদের বংশধর—সেটা তারা বিবেচনা না করতেও পারে।'

তিতিরকে ঝুলিয়ে রেখে ফিরে আসতে আসতে একবার ভাবল, ওটাকে কিছু খেতে দেওয়া উচিত। কিন্তু কী ওরা খায়? পোকা-টোকাই নিশ্চয়। কিন্তু এত রাতে কোথায় আমি পোকা ধরতে যাব ওর জন্যে? চাল-টালও খায় খুব সম্ভব। কিংবা কিছুই দরকার নেই আপাতত—রাত্রে বোধ হয় কিছুই খাবে না। যা দরকার করা যাবে কাল সকালে।

পাখিটা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ঘরে এল দেবদাস, সার্ট-ট্রাউজার খুলল, লুঙ্গি পরল, কলতলায় গিয়ে মুখহাত ধুয়ে এল, তারপর দরজা বন্ধ করে বিছানায় লম্বা হল। চাদরটা ময়লা হয়ে গেছে, পিঠের নীচে বালি কিচ-কিচ করছিল, কিন্তু আপাতত ওটাকে বদলাবার উৎসাহ আর পাওয়া গেল না।

স্ত্রী ঘরে নেই, হাসপাতালে। কী সব মেয়েলি গোলমাল। দু-বার মা হতে গিয়েও পারল না স্ত্রী, পৃথিবীতে আসবার আগেই মরে গেল বাচ্চারা। গণ্ডগোল তারপর থেকেই—খেতে পারে না, ভালো ঘুমোয় না—মধ্যে মধ্যে টেম্পারেচার ওঠে অকারণে, আর চেহারার দিকে তো চাওয়াই যায় না। এখন ডাক্তারের রায়—অপারেশন করাতে হবে। আপাতত রেখেছে অবজারভেশনে, কাটাকুটি কী যেন করবে এর পরে।

ভাবতে ভালো লাগে না, ভাবলে মাথার শিরাগুলো দপদপ করে, একটা ক্লীব যন্ত্রণা কুরে কুরে খেতে থাকে পাঁজরার ভেতরে। কিছু করবার নেই, কিছু না। টাকা নেই, থাকবার কথা নয়—অপারেশনের টাকাটা লোন নিতে হবে কো-অপারেটিভ থেকে। মাস মাইনের আঁজলার জলে আরো টান পড়বে—আরো পাক ধরবে রগের চুলে, পনেরো বছর আগে ফুটবল খেলতে গিয়ে ডান পায়ের গোড়ালি যেখানে ভেঙে গিয়েছিল—প্রতি অমাবস্যা-পূর্ণিমায় যন্ত্রণার জোয়ার ফেঁপে ফেঁপে উঠতে থাকবে সেখানে।

কিছুই করবার নেই।

আজকাল অফিসে ঢুকতে হয় ঘাড় নীচু করে, নিজের গায়েই থু থু ছিটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে তখন। সেই ক'বছর আগেকার স্ট্রাইকটা যখন ফেঁসে গেল, বণ্ডে সই দিয়ে সুড়-সুড় করে ঢুকতে হল আবার—যারা ছাঁটাই হল তাদের

আব ফিবিযে আনা গেল না—মামলা মিটে আছে সেই থেকেই। এখন কিছু কববাব নেই—কিছুই না।

মাঝখানে একবাব একটু—

আট-ন মাসেব আলেযা হাওযায মিলোল। টিকতে দিলে তো। একে তো নিজেদেব খেযোখেযি, তাব ওপবে পাযেব তলায গর্ত খোঁড়া। গেল আবাব যে। তিমিব, সেই তিমিব।

স্ত্রীব কথা নয, নিজেব কথা না—অফিস না—দেশ না—কিচ্ছু না। ক'হাজাব এঞ্জিনীযাব বেকাব হে দেশে? চোবাবালিব ওপব দাঁড়িযে আছে সব—হুড়মুড়িযে তলাবে একদিন।

দেবদাস বিছানাব ওপব চিৎ হল। গলাটা জ্বালা কবছে একটু—অম্বলেব ভাব-টাব হল নাকি? হোটেলেব খাওযা অভ্যেস নেই, তবু তাই খেতে হচ্ছে—নিজে বেঁধে খাওযাব উৎসাহ নেই, পোষাযও না। কী তেল-টেল যে খাওযায ওবাই জানে।

বাইবে টিপটিপ কবে ছিঁচকাঁহুনে বৃষ্টি। এই গলিটা কর্পোবেশনেব নজবে আসে না—ইট-ফিট যা ছিল, বহুকাল আগে উধাও হযে এখন যত্রতত্র গর্ত আব প্যাঁচ-পেঁচে কাদা।

জানলা দিযে এখন সেই কাদাব ছুর্গন্ধ আসছে। কোথায একটা ছোট বাচ্চা ক্রমাগত কাঁদছে আব কাশছে সশব্দে ঘং ঘং কবে—হুপিং কাফ নিশ্চয। কিবকম বাপ-মা, ওষুধ-পত্তবও এনে দিতে পাবে না একটু?

কানেব পাশ দিযে পিনপিন কবে একটা মশা গান শুনিযে গেল, সজোবে তালি বাজিযে সেটাকে মাববাব অকাবণ চেষ্টা কবল দেবদাস। ওদেব মাবা যায না। বাঁ কানেব পাশে আবাব পিনপিন শোনা গেল ঠাট্টা কবল বলে মনে হল এবাব।

কিচ্ছু হবে না—কিচ্ছু না। আবে বাপু—দেশ-টেশ যাই বলো, জিতটা তো শুরু হয নিজেব ভেতব থেকেই। মাথা নীচু কবে যখনই বণ্ডে সই দিতে হল, তোমাব ইউনিযন যখন হাত-পা ছড়িযে মবা ব্যাঙেব মতো চিৎ হযে পড়ল (ভেতবে এত দালাল ছিল কে জানত তখন।), তখনই বাবোটা বাজিযে ছাড়লে লড়াইযেব। অনেক আশা-ভবসা দিযে যাদেব টেনে আনলে, আব মুখ আছে তাদেব সামনে দাঁড়াবাব? এখন ক্যান্টিনে বসে ফুসফুস কবে বিড়ি টানো, আব চোবেব মতো তাকাও এব ওব মুখেব দিকে। মযদানেব

মিটিঙে গিয়ে গরম হতে পারো—গলা মেলাতে পারো শ্লোগানে, কিন্তু ভুলতে পারো একথা —নিজেরা হার মেনে গেছ, জনতার শরিক হতে পারো নি ?

মাথা গরম হয়ে উঠছে, বালিশটা তেতে যাচ্ছে আগুনের মতো। বিকেলে হাসপাতালে দেখা করতে গেলে বৌ কাঁদছিল।

'বাঁচব না—দেখো, অপারেশন হলে আমি ঠিক মরে যাব -'

'কী যে পাগলামি করছ, কোনো মানে হয় না।'

মানে কিছুরই হয় না। এই ঘরটার না—এই গলা জ্বালা করাটার না—রাস্তার কাদার গন্ধের না। এই যে বালিশটাকে উল্টে নিয়ে মাথাটাকে একটু ঠাণ্ডা করার চেষ্টা, এরও না। হঠাৎ তিতিরটাকে মনে পড়ল তখন।

লড়ায়ে তিতির। কিন্তু লড়াইয়ের ভয়ে পালিয়ে এসেছে। কাওয়ার্ড।

আর তুমিই বা কী বাপু! স্ত্রীকে একটা ভরসা দিতে পারোনা—তাকে জোর করে বাঁচার কথা বলতে পারো না, ঘাড় সোজা করে অফিসে ঢুকতে পারো না—শুধু ক্যান্টিনে বসে, ফুস্-ফুস্ করে বিড়ির ধোঁয়া ছড়িয়ে—

বাইরের টিপটিপানি বৃষ্টিটা অসহ্য। যেন এক-একটা হিমেল ফোঁটা নিজেরই গায়ে এসে পড়ছে। আর কাদার গন্ধটা! যেন মনের ভেতর থেকেই উঠে আসছে ওটা। বীভৎস।

উঠে, ধড়াস্ করে জানলাটা বন্ধ করল দেবদাস। গুমোট গরম এখন একটা মোটা কম্বলের মতো ঠেসে ধরবে নাকে মুখে। তা হোক—তা হোক। কবরের জীব কবরেই থাকো এখন। আর নইলে মুখ গুঁজে খাঁচার মধ্যে বসে থাকো ওই তিতিরটার মতো—ও-সব জানলা-ফানলা তোমার জন্যে নয়।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে তিতিরটাকে নিয়ে।

সকালে বুদ্ধি করে খাঁচার ভেতর খানিক কাওন দিয়েছে, চালও দিয়েছে, একটু, জল তো দিয়েইছে। কিন্তু পাখিটার কোনো উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। খুব খিদে পেলে একটু খাচ্ছে কি খাচ্ছে না—তারপরেই খাঁচার এককোনায় সরে গিয়ে আফিংখোরের মতো আধবোজা চোখে ঝিমুচ্ছে আর ঝিমুচ্ছেই।

'আরে—হাঙ্গার-স্ট্রাইক করে মারা যাবি নাকি ? খা না।'

পাখিটা ঝটপট করে উঠল।

'খা না রাস্কেল। এর চাইতে ভালো খাবার—মানে লুচি-সন্দেশ-টন্দেশ

তো তোব জোটে বলে মনে হয না। পোকা-টোকা ধবাও আমাব-কর্ম না, ও আশা ছেড়ে দে।'

পাখিটা মিটমিট কবে চেযে বইল, যেন কথাটা বোঝবাব চেষ্টা কবছে।

'আবশোলা-টাবশোলায তোব রুচি আছে কিনা ঠিক জানি না। কিন্তু আজ আবাব নন মীট-ডে, ও-সব না-ই খেলি। তাছাড়া আমাব অফিসেব টাইম হযে গেছে, আজকাল একটু লেট হলেই কেস খাবাপ, কাজেই এখন ওসব ধবতে পাবব না। কাল ববং চেষ্টা কবা যাবে। এখন যা দিযেছি, তাই একটু মুখে দে—আমি দেখে চোখ সার্থক কবে স্টেটবাসে ঝোলবাব জন্যে বেবিযে পড়ি। খা না—এই স্টুপিড্ '

বাইবে থেকে একটু খোঁচাই দেওযাব চেষ্টা কবেছিল, ফল হল মাবাত্মক।

একেবাবে পাগলেব মতো খাঁচাব গাযে আছড়ে পড়ল পাখিটা। যেন শুরু কবল খণ্ড-প্রলয। উল্টে গেল জলেব বাটি—চাল আব কাওন ছড়িযে গেল চাবদিকে।

আঁতকে পিছযে গেল দেবদাস।

'এ যে মাবাত্মক মেজাজ দেখছি। ওদিকে বণক্ষেত্র থেকে পলাযন, এদিকে খাঁচাব ভেতবে মহাযুদ্ধ। আমিও যখন কোথাও পাত্তা পাই না—তখন খামোকা বৌযেব ওপব বাগ কবে চাযেব কাপ ভেঙে ফেলি, তাবপব কিনতে গিযে—। হুঁ, তুইও দেখছি আমাব মতো ইডিযট। থাক্ তা হলে—উপোস কবেই বসে থাক।'

চটে গোঁ-গোঁ কবে বেবিযে গেল দেবদাস।

অফিসে গিযেই মনে হল, আবহাওযা আবো প্যাঁচালো হযেছে কোথাও। তখন খোঁজাখুঁজি কবাব সময ছিল না, উৎসাহও না। জানা গেল সেই ক্যান্টিনে। ফুসফুস কবে বিড়ি টানবাব সময।

'শুনেছ, এবা হেড্ অফিস তুলে নিচ্ছে এখান থেকে?'

'তাব মানে বম্বে? এখন তো সব বাস্তাই বোমেব দিকে।'

'উঁহু, মহাবাষ্ট্রও তেতে উঠছে। এখন সাউথ আব গুজবাটই হচ্ছে গুড বয। এবা বোধ হয ব্যাঙালোবে চলল।'

'আমবা বেজিস্ট্ কবব।'

'হুঁ, খববেব কাগজে লীডাব বেরুবে। আব কিছু হবে না।'

টেবিলে একটা কিল মারল দেবদাস। দুটো চায়ের গ্লাস ঝনঝন করে উঠল : 'ইম্‌পসিব্‌ল। রুখতে হবে।'

'বললুম তো, খবরের কাগজে সম্পাদকীয় লেখা হবে। ইচ্ছে হলে তোমরাও চেঁচিও একদিন। কিন্তু ক্যান্টিনের গেলাস ভেঙোনা।'

'তার মানে শেষ করে দিতে চায় আমাদের ?'—দাঁতে দাঁতে ঘসল দেবদাস।

'এখনো ওদের সম্পর্কে অন্য ইলিউশন আছে নাকি তোমার ?'—কাটা ছাঁটা জিজ্ঞাসা আর এক জনের।

'কিন্তু সাউথে বসন্তের বাতাস বইবে চিরকাল ?'

'বইবে না। কিন্তু ঘরের এক কোণায় আগুন ধরলে আর এক কোণায় তো সাময়িক আশ্রয়। সেইটেই লজিক।'

'কিছুতে পারবে না এ ভাবে বাঁচতে।'

'ওরা কী পারবে না পারবে সেটা আলাদা কথা। কিন্তু তোমরা গেলে। ট্রান্সফারের জন্যে তৈরি হতে থাকো এবার।'

হিংস্র ভাবে ধোঁয়া বেরুতে লাগল গোটা আষ্টেক বিড়ি থেকে। কেউ আর কথা বলল না। শুধু যন্ত্রণাটা। সেই ক্লীব যন্ত্রণাটা। পাঁজরার হাড়গুলোকে কুরে কুরে খাচ্ছে ঘুণের মতো।

'আর একটু চা দিয়ো হে -' দাঁতের ফাঁকে সাপের মতো শিস টানল একজন।

আজ আর হাসপাতালে গেল না—কী হবে রোজ গিয়ে ? কোনো নতুন কথা নেই, কোনো সান্ত্বনা নেই, হেড অফিস ট্রান্সফার হওয়ার আনন্দ-সংবাদ এত তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে পৌঁছে না দিলেও চলবে। চূড়ান্ত বিস্বাদ মন, মুখ ভর্তি বিড়ির তেতো নিয়ে বাসায় ফিরল দেবদাস। বেলা থাকতেই।

ঘর খুলতে গিয়ে আগে চোখ পড়ল তিতিরটার দিকে। আত্মমর্যাদায় টং হয়ে বসে আছে ধ্যানী বুদ্ধের মতো। রাস্কেল।

'আছিস তো না খেয়ে ? জলও ফেলে দিয়েছিস। বোঝ্‌ এবারে।'

কিন্তু হাজার হোক পাখিটা গেস্ট্‌। তারই মতো লড়ায়ে হয়েও লড়াই থেকে পালিয়ে খাঁচার ভেতরে গাধার মতো বসে।

'আমিও যখন খাই, খেতেও পারি, তুই-ই বা অভিমান করে থাকবি কেন ?'

অগত্যা আবার জল আর খাবার দিতে যাওয়া, এবং—

আবার সেই প্রচণ্ড ভাবে—বদ্ধ পাগলের মতো লাফাতে লাগল পাখিটা। খাঁচার গলায় হিংস্রভাবে মাথা আছড়ালো কয়েকবার, তারপর একেবারে শুয়ে পড়ল পাখা ছড়িয়ে।

কী সর্বনাশ—মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে যে পাখিটার। এ কী ভয়ঙ্কর মেজাজ।

তটস্থ হয়ে জল ঢেলে দিল হাঁ করা ঠোঁটে, কিন্তু তিতিরটা আর সে জল খেতে পারল না। রক্ত আর জল গড়িয়ে পড়ল ঠোঁটের পাশ দিয়ে, চোখের ওপর আস্তে আস্তে শাদা পর্দা নেমে এল তার।

মরে গেল।

দেবদাস শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পাখিটার দিকে তাকিয়ে।

রাস্তায় ওটাকে ফেলে দেবার সময় চোখে পড়ল এক বুড়ো হিন্দুস্তানীর। জিজ্ঞাসু হয়ে চাইল দেবদাসের দিকে।

'তিতিরটা মরে গেল বাবু?'

'হাঁ, খাঁচায় মাথা ঠুকে—মাথা ফাটিয়ে—' দেবদাস আর বলতে পারল না। নিজেকেই তার হত্যাকারী বলে মনে হচ্ছিল তখন।

'তিতির ওই রকমই করে বাবু, লোহার খাঁচায় ওদের রাখতে নেই। বাঁশের খাঁচা হলে—' দেবদাস শুনতে পাচ্ছিল না। আজও দুপুরে বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তার গর্ত থেকে কাদার কুৎসিত গন্ধ। তার মধ্যে পড়ে আছে তিতিরটা। দৃষ্টি তার সেই দিকেই।

রক্ত মাথা মৃত পাখিটা তো তার দলের নয়। সে একটা প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদটা তখন দেবদাসের সামনে একটা আকাশজোড়া তিতির হয়ে ডানা মেলছিল, তার মাথায় রক্তটা আগুন হয়ে জ্বলছিল যেন, তার বাঁকা হলদে ঠোঁটটা তখন একটা বাঁকা তলোয়ারের মতো চলে যাচ্ছিল আকাশ ছিঁড়ে॥

ইছামতী বহমান

অমলেন্দু চক্রবর্তী

প্রায সন্ধ্যা নাগাদ একটা বাড়িব দবজায এসে থমকে দাঁড়ালো ওবা। লঞ্চ থেকে নেমে দেখতে দেখতে প্রায চোখেব উপব চাবদিকেব গাছ-পালা, ঝোপ-জঙ্গল, আকাশ আব ইছামতী নদী অন্ধকাব হযে এলো। ছোট-বড়ো, সরু-লম্বা ঝাঁকড়া কতো বকমেব গাছ—প্রায কোনটাই ভালো কবে চেনে না মৃন্ময়ী, মাটিব-ঘব, ধানেব মবাই, খড়েব পালুই, ডুলি-পালকি, পাখিব ডাক,—দু'পাশে যা কিছু চোখে পড়েছে সব নতুন। কিন্তু উৎসাহিত হবাব মতো আবেগ অনুভব কবেনি, অদ্ভুত একটা ভয কণ্ঠনালীটা খামচে ধবছিল ভিতব থেকে, ভীষণ তেষ্টায গলাটা শুকিযে আসছিল, পুবো একটা বাত বাকি, আজ বাতেই একটা কিছু হবে,একটা ভযঙ্কব কিছু, বুকেব ভযটাই যেন বাইবে অন্ধকাব হযে উঠছে,ঘবে আলো নেভালে যে অন্ধকাব সেই অন্ধকাব গোটা পৃথিবী জুড়ে—ভাদ্রমাস, সাবাদিন ধবে আকাশ মেঘলা ছিল,থেমে থেমেই বৃষ্টি পড়েছে সেই সকাল থেকে, পাযেব তলায কাদা, হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে কোথাও, দু-পাশে ব্যাঙ আব ঝিঁ-ঝিঁব একটানা ঘ্যানব ঘ্যানব, ব্যাঙগুলি লাফিযে লাফিযে পড়ছে সামনে, ভযে-আতঙ্কে আব ঘৃণায শিউবে উঠছে শবীব, বড়ো বড়ো গাছগুলিব তলা দিযে যাবাব পথে ঝুব ঝুব এক পশলা জলে ভিজে যাচ্ছে মাথাব চুল—কিন্তু কোন কথা নয, টু-শব্দটি পর্যন্ত না,—শক্ত কবে দাঁতে ঠোঁট চেপে ভিতবেব কান্নাটাকে জোব কবে বাববাব ঢোক গিলে আটকে বেখে সার্কাসেব মেযেগুলিব মতো দু'হাতে ভাব সামলে সন্তর্পণে এগোচ্ছিল, জলে আব কাদায গোড়ালিব শাড়ি আব শাযাব নিচুটা সপ্ সপ্ কবছে, হাঁটুতে জড়িযে আসে, শবীব ভেঙে ক্লান্তি, সামনে বড়দা, পিছনে মা, ওবাও ক্লান্ত, দু-দুবাব কাদায পিছলে পড়ে যাচ্ছিলেন মা, সেই বহস্যময অদ্ভুত মানুষটা, যে আজকেব এই সমস্ত ব্যাপাবটা ঘটাতে চলেছে, সমস্ত ব্যবস্থা কবেছে এবং কলকাতা থেকে বসিবহাট, হাসনাবাদ, লঞ্চ, পালকি সব কিছু কবে এখানে নিযে এসেছে, তাব একটা টর্চ, তীব্র জোবালো টর্চ, স্যুটকেশ আব টর্চটা বড়দাব হাতে, আব একহাতে ছাতা বাগিযে অন্য হাতে মা-কে ধবে পিছনে পিছনে আসছে লোকটা, অনর্গল কথা

বলেছে গোটা পথ, কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধ থেকে আযুব খাঁব শাসন পর্যন্ত লোকটা সব জানে, দুনিয়াব সব দেশেই তো আইন থাকে আব আইনেব কেতাবগুলিব মধ্যে উইযেব মতো ঢুকে ফুকুব-ফাকব, ফন্দি-ফিকিব খুঁজে বেবিযেও আসতে হয। সীমান্ত আবাব কী? ও'সব তো জাহাজ-উড়োজাহাজ, মোটবগাড়ি-বেল-গাড়িব জন্য, নইলে সোনা-দানা থেকে জ্যান্ত মানুষ পর্যন্ত সবই তো এপাব ওপাব কবা যায। একটু সাহস চাই, বুকেব পাটা। অকাবণে এমন ফিসফিস কবে কথা বলে, যেন নিশাচবেব মতো অন্ধকাবে ঘুবে-ঘুবে পৃথিবীব অনেক গোপন কথা জেনে ফেলেছে লোকটা। মা অতোসতো বোঝেন না, পুবানো দেশ-গাঁযেব কথা হাঁ হযে শুনেছেন, মাঝে মাঝে কপাল কুঁচকেছেন বড়দা, ব্যাগ থেকে টাকা বেব কবে দিযেছেন দবাজ-হাতে, যেন কিসেব একটা নেশা লেগেছে বড়দাব, কোথাও কৃপণতা নেই, ইতিহাসেব অধ্যাপক, গম্ভীব, কম কথা বলেন, যেন দুর্জ্ঞেয একটা বহস্যেব শেষ পর্যন্ত দেখাব জন্যই মবীযা। এবং সাবাদিনেব এত ক্লান্তিব পবও শবীবটাকে ভুলে যাচ্ছে মৃন্ময়ী, গলা-বুক শুকিযে আসছে। পিছনে মা-কে ধবে আসছে মানুষটা, কথা বলছে, হাসছে, শুধু টাকা চাইবাব সমযই লোকটা অদ্ভুতভাবে হাসে, অন্য সমযে আবেক ধবণেব হাসি, এবং অন্ধকাবে লোকটাকে দেখা না-গেলেও তাব কথায, হাসিতে, পাযেব শব্দে, বুকেব ভিতবটায আগুনেব ছ্যাকা লাগে। অথচ কী ভীষণভাবে লোকটাকে বিশ্বাস কবে ফেলেছেন বড়দা, মা। এই বিশাল ভাবতবাষ্ট্রেব এক প্রান্তে, সীমান্ত এলাকায কী সব হবে আজ বাতে, অন্ধকাবে, নিঃশব্দ গোপনে—এবং এই অদ্ভুত ভযঙ্কব লোকটাই নাকি সব আযোজন কবেছে। সাত-জেলে-মৌলা-খালি গ্রাম, কী অদ্ভুত নাম। আব এই অজানা অপবিচিত একটা গ্রামে এমনি একটা অজ্ঞাত পবিচয মানুষকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কবে, এমনি ভযঙ্কব অন্ধকাব বাতে নিজেদেব সম্পূর্ণ সমর্পণ কবে আব ভাবতে পাবে না, দম বন্ধ হযে আসে, শুধু মা আব বড়দাকে নিবাপদ ভবসা মনে কবে সাহস কুড়োয, শক্ত হয।

কিন্তু চাবদিকেব এই দুর্যোগেব অন্ধকাবেব সঙ্গে নিজেব বোঝাপড়া কবতে গিযে কেমন যেন নিজেব বুদ্ধি-বিবেচনা-ভাবনাগুলি তালগোল পাকিযে যায। 'কোথায যাচ্ছি আমবা?'—সকালে বসন্ত বায বোডেব বাড়ি থেকে বেড়িযে ট্যাক্সিতে ওঠাব সময প্রশ্ন কবেছিল মৃন্ময়ী, বড়দা কথা বলেন নি, তাকিযেছিলেন মা-ব দিকে, নিঃশব্দে, মা তাকিযেছিলেন বড়দাব দিকে, বাইবে

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন বৌদিরা, রাস্তায় একেবারে ট্যাক্সির দরজা ছুঁয়ে নেমে এসেছিলেন মেজদা, ছোড়দা, 'আমি কি পর হয়ে যাচ্ছি, তোমরা কথা বলো'—মেজ বৌদিকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল, ওকে ঘিরে অনেক-গুলি ভালোবাসা, স্নেহ, আদর, পিঠের উপর অনেকগুলি হাতের ঘোরা ফেরা, মা কাছে টেনে নিয়েছিলেন—'আমি যাচ্ছি, ভয় কী মা।' নিজে ধরে ধরে রাস্তায় নেমে একসঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠেছিলেন, তারপর সারাদুপুর ধরে বাঙলাদেশের বুকের ওপর দিয়ে বাস, বসিরহাট-হাসনাবাদ, তারপর অন্ধকার নামল, এই অন্ধকার, আলো নেভানো ঘরের বাইরে গোটা পৃথিবী জুড়ে একসঙ্গে এত অন্ধকার নামতে পারে, সেই পাক্-ভারতের যুদ্ধের সময় ব্ল্যাক আউটের কলকাতার বীভৎস রাতগুলি ছাড়া আর কোনদিন, অন্য কোন রাত্রির কথা মনে করতে পারে না মৃন্ময়ী।

এবং এখন অন্ধকার পথ ডিঙিয়ে এতদূর এসে একটা দরজার সামনে দাঁড়াবার পর সেই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর লোকটা বাড়ির ভিতর চলে গেল, বাইরে জল-কাদা আর অন্ধকারে মিশে গিয়ে তিনজন একান্ত আপন, চুপচাপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বাতাসের একটা শব্দ হচ্ছে চারদিকে, ঠাণ্ডা আর্দ্র বাতাস, ব্যাঙ আর ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে, দূরে নদীর জলে মোটর-লঞ্চের বাঁশি, দূরে গলা-ছিঁড়ে কে যেন ডাকছে কাকে। মাঝি-মাল্লা। হয়তো বা। একেবারে পার ধরেই এতক্ষণ হেঁটেছে ওরা, ও'পারে দু'একটা ইতস্তত আলো, ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে ফাঁকে স্পষ্ট দেখা যায়, ওপারে কালীগঞ্জ থানা, খুলনা জেলা,—হয়তো বা অন্যমনস্কভাবেই হাতের টর্চ জ্বেলে আলোটা মাথার উপরে চারদিকে ঘুরিয়ে নেন বড়দা, সে আলোয় ওরাও তাকায়, খুব বড়ো বড়ো গাছ সামনে, অনেক উঁচু, অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না, কি গাছ তা-ও জানে না, চেনে না, তারপরই ঢালু জমি, তারপর নদী, তারপর ওপারে পাকিস্তান। কেমন ভয় করে মৃন্ময়ীর, সব মিলিয়ে ভয়, রাত-অন্ধকার-অচেনা-জায়গা-পাকিস্তান। সীমান্তের এত কাছাকাছি, এ'পারে ও'পারে। গরু-ভেড়া-ছাগল-চুরির ঘটনা, সীমান্ত-পুলিশের সংঘর্ষ—খবরের কাগজে প্রায়ই তো থাকে, যদি তেমনি হঠাৎ কিছু হয় আজই, ঠিক এখানেই। অন্ধকারে দেখা যায় না, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায়, ওই আলোগুলির দিকে তাকিয়ে আছেন মা, এবং ওই আলোগুলির জন্যই হাতের টর্চটা অমন ছেলেমানুষের মতো জ্বলে উঠেছিল বড়দার হাতে। এই বিপুল অন্ধকারের মধ্যে তিনটি হৃদয়, তিনজন আপন-মানুষ, নিঃশব্দে, পরস্পরকে

স্পর্শ না-কবে, পাশাপাশি দাঁড়িযে, নির্বাক বিস্ময়ে অথবা গভীব বেদনাকে বুকে চেপে, দুঃখে-যন্ত্রণায—মৃন্ময়ী স্পষ্ট অনুভব কবে—একই কথা ভাবছে। বৃষ্টিব জলে-অন্ধকাবে-কাদায তিনজনেই যেন অন্ধেব মতো হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে একটা কিছু, কোন হাবানো সম্পদ। 'নদীটা বইছে দেখ মিনু, পুবনো অভ্যাসে বইছে ইছামতী, যাব এ'পাবটা সত্য, ওপাবটাও সত্য। আমাব কৈশোব আব প্রথম যৌবনটা ওপাবে, সেটা মিথ্যে হযে গেছে। আব তোব ' বড়দা থেমে গিযেছিলেন, হাসনাবাদ থেকে লঞ্চটা আসছিল, অপলক তাকিযে ছিলেন অন্যদিকেব পৃথিবীতে, সকাল থেকে ট্যাক্সি-বাস-বিক্স-লঞ্চ, সাবাদিনেব দীর্ঘ পথে একটি কথাও বলেন নি বড়দা, শুধু সন্ধেবেলা নদীতে নদীতে ভাসতে ভাসতে, ওপাবেব সূর্যটা যখন এ'পাবে ঢলে পড়ছিল, নিতান্ত স্বগতোক্তিব মতোই কথাগুলি উচ্চাবণ কবেছিলেন, বোনেব পিঠে হাত বেখে 'মা-ব একদিকে তুই, অন্যদিকে আমি, দু'জনেই সত্য। কিন্তু হঠাৎ আজ যখন ওই সত্যটাকেই জোবেব সঙ্গে বুঝে নিতে চাইছি, কাঁদিস নে, কেঁদে লাভ নেই, কোথাও একটা বিশ্বাস খুঁজে নিতেই হবে আমাদেব। শক্ত হযে দাঁড়াতে হবে।' বড়দাব কথাগুলি মনে হতেই এবং সেই দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা কবেই অন্ধকাবে হাত বাড়াল মৃন্ময়ী। বড়দা আব ওব মাঝখানে মা, শবীবে হাত পড়তেই দু'হাত বাড়িযে মা কাছে টানলেন। মা-ব কাঁধে মাথা লুকিযে মৃন্ময়ী থবথব কবে কেঁপে উঠল,ভিতব থেকে একটা কান্নাব বাষ্প কোনদিকে বেবোবাব পথ খুঁজে না-পেযে পাক খেযে খেযে গুমবোতে গুমবোতে যন্ত্রণায তোলপাড় কবছে বুকেব ভিতবটা, ঠোঁট দুটো কাঁপছে বাঁশ-পাতাব মতো, চোখেব জলে ভিজছে বুক। অন্ধকাবেই দু-হাতে বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন না—'আমি আছি, আমি আছি, ভয় কী মা তোব?' অন্ধকাবে স্থিব হযে দাঁড়িযে বড়দা নির্বাক। শুধু ঝিঁ-ঝিঁ আব ব্যাঙেব ডাক চাবদিকে, অন্ধকাবে জোনাকি, কোথায ডানা ঝাপটাচ্ছে একটা পাখি, তাব শব্দ। মৃন্ময়ী কান্নায ভাসল, বৃষ্টিতে ভেজা মাযেব আঁচলটা চোখেব জলে ভিজল। অচেনা এক গেঁযো-গেবস্তেব বাড়িব দবজায অন্ধকাব আড়াল কবে নিল সব, শুধু শব্দ, চাবদিকেব অগুনতি অদৃশ্য ধ্বনিব মধ্যে ইছামতীব স্রোত আব কান্নাব শব্দ। তোমাব বযস। তোমাব বযস কতো মিনু? বৌদি? স্বাধীনতাব একুশ বছবে তুই কতো বড়ো হয়ে উঠেছিস মিনু। ধব, মনে কবা যাক, তুই জন্মেছিলি উনিশ শ' সাতচল্লিশে, পনেবই আগস্ট, স্কুলেব খাতায, তোব হাযাব সেকেণ্ডাবিব

সার্টিফিকেটে তাই তো লেখা আছে , কটা পনেরই আগস্ট, কতগুলি জন্মদিন পেরিয়ে তুই আজ এত বড়ো হয়েছিস রে, যখন ছোট ছিলি ফ্রক কিনে দিতাম, এখন শাড়ি, তোকে আদর করেই আমাদের স্বাধীনতা-উৎসব। মেখলা পরিস না কেন তুই, তোর জন্মদিনে পরবি, ঘাগরা হবে সবুজ, ব্লাউজ হবে সাদা, ওড়না হবে জাফ্রান। মেজদা। মৃন্ময়ী, মিনু, মৃন্ময়ী—মৃৎ মৃত্তিকা, মৃৎময়, মৃত্তিকাময়, মাটি, মাটিই যার সব, বাবা তোর নাম রেখেছিলেন, বাবা নেই, কিন্তু তোর নামটা আছে। নিজের নামের মধ্যে ডুবে যেতে পারিস মিনু? অন্তত নিজের পরিচয়টা, নিজের ইতিহাস। সেজদা! সে অনেকদিন আগে, দেশ-বিভাগের পর সাত-পুরুষের ভিটে-মাটি ছেড়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে, কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে চারদিক থেকে ছুটছে মানুষ, হাজারে হাজারে, লক্ষ লক্ষ, মানুষের মাথা মানুষ খায়, আমরাও ছিলাম ফরিদপুরের মাদারীপুর মহকুমার পালং গ্রাম থেকে, বিকেল বেলা, গোয়ালন্দ,পদ্মার জাহাজঘাট থেকে রেলগাড়ি, ভিড়ের চাপে কে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, চিৎকার-হল্লা-গুতোগুঁতি, বৃষ্টি পড়ছিল, শ্রাবণ মাস, পায়ের তলায় কাদা, কাদায় লেপটে-থাকা একটি মেয়ে, ফুটফুটে সুন্দর একটি শিশু, কতো আর বয়স তখন, দেড়-দুই, অসহায়, আহা রে, কোন হতভাগী মায়ের বুক থেকে খসে-পড়া হৃৎপিণ্ড, চারদিকের মানুষগুলি তখন জন্তু, কেউ এক নিমেষের জন্যও থামতে জানে না, ওনার চোখে পড়ল, তুলে নিয়ে আমার বুকে দিলেন, আমার বুকে তখন শ্যামল, এক বয়সী, চলে এলাম, অনেক খোঁজ-খবর চলল তারপর, কত মানুষ এলো চারদিক থেকে, কত মায়ের বুক ভেঙেছে, বিশ্বাস করার মতো প্রমাণ জুটল না কোথাও, মায়া-জড়ানো মেয়েটাকে ছাড়তে পারলাম না। মা। এতকাল ধরে লুকিয়ে রাখলে যদি, কেন আজই বললে, কেন লুকিয়ে রাখলে না? মা-গো আজ একুশ বছর পরে । চোখের ওপর একটু একটু করে বড়ো হলি তুই, স্কুল-কলেজের সব পড়া শেষ করে এম-এ পড়ছিস। কিন্তু এই একুশ বছর ধরে একটানা সন্ধান চলছে তোকে গোপন করে। তোর পরিচয়। কেন সংশয় মা? যদি জানতে, আমি মুসলমান, ডোম বা শূদ্রের মেয়ে মা তোমার একুশ বছরের আশ্রয়, মা তোমার একুশ বছরের ভালবাসা, মা আমার একুশ বছরের বিশ্বাস। হাজার বছরের পুরনো একটা বটগাছ মিনু, মাটির তলার অন্ধকারে তার শিকড় গুলি পাক খেয়ে খেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে, অনেক তলায় অন্ধকারের গভীরে ডুবে নিজের একটা সাম্রাজ্য গড়তে চায়, অন্ধকারের ওই শক্তিটা আছে বলেই মাটির

ওপবে আলোয মাথা উঁচু কবে, শক্ত-ঋজু হযে এত এত দীর্ঘদিন, হাজাব বছব সোজা হযে দাঁড়িযে থাকে। আমাদেব জন্মেব আগে মাতৃগর্ভে সেই অন্ধকাব, সেই অন্ধকাবে আমাদেব শিকড,আমাদেব জন্মেব মধ্যে বক্তেব পবিত্রতা খোঁজাব কুসংস্কাব নয মিন্নু,নিজেব জীবনটাকে সম্পূর্ণ কবে জানাব জন্যই আমাদেব শিকড় খুঁজি, আমাদেব নিজেদেব ইতিহাসটা পুবোপুবি বোঝাব জন্য। বড়দা। আমাব শৈশব থেকে আমিও তোমাকে একটা বটগাছ ভেবে এসেছি,কতোবড়ো তুমি। ·আমবাও আমাদেব শিকড হাবিযেছি মিন্নু, খুঁজছি, ঠিক তোব মতো, আমবা সবাই। মাটিব তলায শিকড নেই, শক্ত বিশ্বাসে মাটিকে আঁকড়ে-থাকাব বিশ্বাস, মাটিব ওপবে আলোয আমবা আগাছা। মৃন্মযী, মিন্নু, মৃন্মযী-মৃৎ মৃত্তিকা, মৃৎ-ময, মৃত্তিকাময, মাটি, মাটিই যাব সব। জনকবাজাব বথেব তলায মাটি, মাটিতেই জন্ম নিলেন কন্যা, জানকী, শঙ্খধ্বনি মিথিলাব সুবম্য হর্ম্যে, অশোক কাননে নিঃসঙ্গ বেদনা, অযোধ্যায বঞ্চনা, ফিবে ফিরে সেই দ্বিধা-ধবিত্রী, শেষ আশ্রয। খণ্ডিত জন্মভূমিতে জন্ম তোব মিন্নু, ফাটল ঘোচাবি তুই। আবাব সেই ফাটলেব কাছে, বাববাব ফিবে ফিবে আমবা আসব মিন্নু, আমবা সবাই, তোব সঙ্গে, এই ফাটলটাব কাছে, তোকে জানতে, তোব পবিচযটা

কাদেব যেন পাযেব শব্দ, ফিসফিস কথা, দবজাব ওপাশ থেকে কাবা এগিযে আসছে, সেই লোকটা, সঙ্গে আবও কেউ, একটা লালচে আলোব আভাস অন্ধকাবে এগিযে আসছে। সচকিত হযে উঠল সবাই। মাযেব কাঁধ থেকে মাথা তুলে সোজা হযে দাঁড়াল মৃণ্ময়ী এবং অন্ধকাবেই হাতড়ে হাতড়ে ওব চোখেব নিচে গালেব ওপব আঙুল বুলিযে দিলেন মা—'কাঁদিস নে, কাঁদিস নে মা, আমি আছি, ভয কী তোব?' মৃণ্ময়ী ওব রুমালটা চোখে মুখে গালে সর্বত্র বুলিযে নিল, সোজা হযে দাঁড়াল।

অন্যমনস্কভাবেই টর্চেব আলোটা ডানদিকে বাঁ-দিকে ঘোড়ালেন বড়দা, দু'পাশ থেকে লম্বা মাটিব দেযাল এসে একটা দবজায এসে মিশেছে, দবজাব লাল-কাঠেব গাযে কোন শিশু হাতেব সাদা খড়িমাটিব ছবি—মানুষ বলে ধবে নিতে হবে এমনি একজন মানুষ, মাথায লোহাব-টুপি, হাতে বন্দুক, আবেক দিকে তিন-বঙা ঝাণ্ডা, মধ্যে চক্র, উপবে আঁকা-বাঁকা হবফে 'জয-হিন্দ'। সীমান্তেব শেষ বেখা ছুঁযে পশ্চিম থেকে পুব-দিকে, যেন সতর্ক-নির্দেশ, ইলেকট্রিকেব পোষ্টে যেমন মবা-মাথাব খুলি আব আড়াআড়ি কঙ্কালেব হাড়।

একটা লণ্ঠন নিযে দু'জন মানুষ এসে দবজায দাঁডালেন, লণ্ঠনেব লালচে-আলোয কেমন ভযঙ্কব দেখাচ্ছে মানুষ দু'জনকে। সেই বিদঘুটে লোকটা, সঙ্গে কালো মোটা ধুমসো-মার্কা আবো একজন, হাঁটু-উঁচু নোংবা ধুতি, খালি গা, বোমশ বুকে কাবেব সুতোয-বাঁধা একটা চ্যাপ্টা মাদুলিব লকেট, মেদ-থলথল কনুই-এ ঢাক-ঢোলেব মত আধ ডজন কবচ-মাদুলি। লোকটা গোঁফেব ফাঁকে হাসল—'পেন্নাম হই গো কত্তাবাবু, মা-দিদিবা পেন্নাম—' লোকটা লণ্ঠন শুদ্ধু হাত জোড কবে বুক পর্যন্ত তুলল—'গবীবেব ঘবে বাত কাটাবেন এট্টা, আসুন, আসুন ' বডদা এগোলেন, তাবপব মা, তাদেব অনুসবণে মৃণ্ময়ী পা বাডাল। দবজাব ওপাশেও প্যাক প্যাক কাদা, দুটো কবে ইট গাযে গাযে বসানো, একটু দূবে দূবে, উঠোনটা বডো, অনেক বডো, কতো বডো, বোঝা যায না, লণ্ঠনেব আলোয ইটগুলো কতদূব গিযে হাবিযে গেছে, কিন্তু দূবে লণ্ঠন-হাতে দাঁডিযে আছে আবও কিছু মানুষ, ঘবেব বৌ ঝিবা। ঘুটঘুটে অন্ধকাবে লুকোন চাবিদিকটা ভালো কবে বুঝে উঠতে ন-পাবলেও, এবই মধ্যে, শুধু সদব দবজা পেবোতেই মৃণ্ময়ীব মনে হলো, বডদা, মা এবং সে নিজে কী দুঃসাহসিক অভিযানে অদ্ভুত একটা জগতে এসেছে, বেমানান, বসন্ত বায বোডেব সুন্দব ওই ফ্ল্যাটবাডিতে বসে ভাবাই যাযনি এতদিন, পৃথিবীতে কিংবা এই বাংলাদেশে এবকম একটা জগৎ আছে, এত অন্ধকাব, এত স্তব্ধতা, এই বিচিত্র মানুষগুলি। হযতো বা এদেব কাছে নতুন কিছু নয, আবও অনেকে আসে, আবও অনেক মৃণ্ময়ীব জন্য আবও অনেক মানুষ, এই ফাটলটাব কাছে। শুধু বিস্ময, বাশি বাশি বিস্ময, কিন্তু বুকেব ঢিপ্ ঢিপ্ ভযটা। মৃণ্ময়ীব অবশ পা-দুটো থমকে দাঁডায। বিকট একটা হাঁক আসে অনেক দূব থেকে, মানুষেব হাঁক, সঙ্গে সঙ্গে আবও কতগুলি হাঁক, কাছে মনে হয, খুব কাছে, এই নিশুতিতে বুক ধডাস কবে ওঠে। বডদা, মা, থমকে দাঁডান। সেই অদ্ভুত লোকটা হাসে—'ও কিছু না, কিছু না পাকিস্তানেব পুলিশ· ।'

'পুলিশ··· ।'

'শুনলেন না, এপাব থেকেও জবাব গেল। এখন আব কি? বাত বাডুক্, তিষ্ঠোতে দেবে না।'

'কেন, এসব কেন?'

'আমাদেব শাসাচ্ছে, ঘুষেব টাকা আগাম না দিযে যাচ্ছ কোথায হে?'

'সেকি ?' আৎকে ওঠেন মা—'ভয করে না আপনাদের ? যদি গুলি ছোঁড়ে।'

'গুলি ?' ওরা হাসল, লকলকে হাসি—'ওপারে চাঁদ-তারার ছাপ, এপারে তিন-সিংহ, মাঝখানে এই চরটায় সারারাত ধরে এখন এই তো চলবে মা। আকাশে যুদ্ধ হবে, কলকাতায় ঢাকায় বোমা পড়ে আপনাদের মারবে. আমরা এই চরের মাঝখানটায় শিবঠাকুর সেজে মজা দেখব।'

বড়দা নিঃশব্দে এগোলেন। ওরা ডানদিকে নিয়ে গেল বড়দাকে। টর্চের আলো ফেললেন বড়দা—ছোট একটা মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি। মৃণ্ময়ী শিউরে উঠল। ওঘরে কোথায় যাচ্ছেন বড়দা। বড়দা আলাদা হয়ে যাচ্ছেন। বসন্ত রায় রোডে বাইরের বসবার-ঘরের দেয়ালে একটা বিলিতি কোম্পানির ক্যালেণ্ডারে গোপাল ঘোষের ছবিতে এরকম একটা ঘরের ছবি ঝুলছে। একেবারে জ্যান্ত ক্যালেণ্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে মৃণ্ময়ী আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠল। বড়দাকে নিয়ে ওরা চলে যেতেই দূর থেকে মেয়েরা এসে আলো দেখাল, মা'র পিছু পিছু যেতে মৃণ্ময়ী শুধু দুপাশের কতগুলি গেঁয়ো বৌ-মেয়ের লাল সবুজ ডোরা কাটা নোংরা শাড়ির গন্ধ নাকে সয়ে এগোতে লাগল। মা আর ও—মৃণ্ময়ী অবাক হলো, দুটো মেয়েমানুষের কাছে কী লজ্জা বৌ-গুলির, ঘোমটা টেনেছে একহাত। বার-তের বছরের মেয়েটাও শাড়ি পরেছে, আর ওর বয়সী বাইশ-পঁচিশের বৌ-গুলি শাড়ি পরেছে, ব্লাউজ নেই, শায়া নেই, নাকে ফুল, কপালে-সিঁথিতে ড্যাবড়েবে সিঁদুর। পাশাপাশি চলতে চলতে মৃণ্ময়ী লক্ষ্য করল, সোজাসুজি চোখে চোখ রেখে অথবা ঘোমটা সরিয়ে আড়চোখে ওরা দেখছে ওকে। রাগ হলো মেজো-বৌদির উপর, ও নিজে চায়নি, কিন্তু মেজো বৌদি নিজে আলমারি থেকে খুলে জোর করে রঙিন শাড়িটা পরিয়ে দিয়েছেন।

আরও একটা মাটির-ঘর। দাওয়ায় উঠতেই অন্ধকারে কিসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল মৃণ্ময়ী, ভয়ে চীৎকার করে উঠল, খলখল খলখল হেসে উঠল মেয়েরা, ওকে ছাড়িয়ে দিল। এপাশ থেকে টান করে রাখা বড়ো বড়ো মাছ ধরার জাল, আঁশটে গন্ধ, গা গুলিয়ে আসে। ঘরের ভিতরেও আঁশটে গন্ধ, মৃণ্ময়ী আবিষ্কার করল এতক্ষণ যে গন্ধটা ঠিক চিনতে পারছিল না অথচ বিচ্ছিরি লাগছিল, সেটা মাছের গন্ধ, এদের মানুষগুলির গায়ের গন্ধও আঁশটে। পায়ের জুতো জোড়া বাইরে রেখে ঘরে ঢুকতেই কান্না পেল। প্রায়ান্ধকার ঘরটায়

ভেজা মাটিব মেঝেতে ঢালা-বিছানা, ছেঁডা-ফাটা, নোংবা, হতচ্ছিবি কাঁথাব উপব তেল-চিটচিটে ওযাব-ছাডা বালিশকে জডিযে, কেউ বা বালিশ ছাডাই ঘুমে-কুঁকবোনো একপাল ন্যাংটো ছেলে-মেযে, একপাশে ইঁটেব ওপব উঁচু-কবা পুবনো তক্তপোশে ততোধিক নোংবা দুর্গন্ধময কাঁথাব বিছানায দুটি বালিশ। মা বসলেন, মা-ব গা ঘেঁসে মৃণ্ময়ী। ওবা মা-কে প্রণাম কবল একে একে, বামুন-ঠাকরুনেব পাযেব ধূলি, মা-কে সাবদা-মাযেব মতো দেখাচ্ছিল এবং সেই লণ্ঠনেব লালচে আলোয ওদেব সকলের মুখগুলি দেখছিল মৃণ্ময়ী, মেযে-বৌ-বুডি, হাড গিলগিলে শবীবগুলি। এবং প্রণামেব শেষে ওবাও মৃন্ময়ীকে ঘিবে দাঁডাল তিন দিক থেকে, একেবাবে গা-ঘেঁসে, চোখে-মুখে ভবাট-বিস্ময। বযসে নুযে-পডা সেই বুডিটা ছানি-পডা চোখ তুলে, চোযাল চুষতে চুষতে দেখতে চাইল, হাতেব লণ্ঠনটা আবও উঁচু কবে ধবল একজন, মৃন্ময়ীব চোখ বুঁজে এলো, ঝিম মেবে বসে বইল, শুনল বুডিকে বলছে কেউ—'রূপবতী কন্যে গো, মা-লক্ষ্মীব ঝি, ডাগব ডাগব চোখ, মেঘববণ কেশ, বেহুলা-কন্যেব কপাল গো, জলে ভাসতে এলি।' বোঁজান চোখেব পাতা ভেদ কবে লণ্ঠনেব আলো এসে বেঁধে, কপালে ঘাম জমে, দাঁতে দাঁতেব চাপ পডে। অন্য কোনদিন হলে এ' অবস্থায নিঃসন্দেহে হাসি পেত পেটে-খিল-ধবা হাসি, কিন্তু ঠোঁট কাঁপছে, বক্তচাপ-মাপাব ডাক্তাবি-যন্ত্রেব পাবা-ওঠানামাব মতো কণ্ঠনালীটা ঘন ঘন উঠ-বোস কবছে, বুকেব ভিতবটা কান্নায ভিজছে। ফুলসজ্জাব বাতে শ্রাবণীকে দেখাব জন্য. টেবিল-লাইট মুখেব সামনে এনে পনেব-মিনিট ধবে কী-সব হাসা-হাসি মন্তব্য কবেছিল সবাই, ক্লাসে মেযেদেব কাছে গল্প কবেছে, সে কী হাসিব হুল্লোড, কেমন একটা বোমাঞ্চও ছিল বক্তে। মৃন্ময়ীব কান্না পাচ্ছে। ওবা মুগ্ধ হযে দেখছে, এমন রূপ ওবা কখনও দেখে নি অথবা কদাচিৎ। কিন্তু নিজে চোখ খুলতে পাবছে না। একই আলোয ও কাদেব দেখবে? বোগা চোযাল ভাঙা, হতকুচ্ছিত কতগুলি মেযেব মুখ, কণ্ঠা বেবিযে আছে, চোখ গেথে গেছে, গা ভবে আশটে-গন্ধ। অবশ চোখ বুজেও সেই গন্ধে বমি আসছে ওব। যদি চোখ বুঁজেই বসে থাকা যেত আজ, সাবাবাত। এই লণ্ঠন তো আজ আবাব ওব মুখেব সামনে তুলে ধবা হবে। নাক-মুখ-চোখ-কান-চুল-দাঁত-হাতেব আঙুল, পাযেব গোডালি—শবীবে আচমকা ধাক্কা লাগে, যদি সত্যি তাই হয। যাবা আসবে, যদি দাবি কবে স্মাগ্‌লাব মেযেবা যেমন তাদেব শাযা আব ব্লাউজেব নিচে সুপুবিব পুটলি বা আফিং-এব ডেলা লুকিযে চোবেব মতো সীমান্ত পাব

হয, তুমি। তুমিও নিজেব পবিচযটাকে গোপন কবে পালিযে যাচ্ছো কোথায ? ওবা না-চাক, মা প্রমাণ চাইবেন। এবং তখন যদি পুরুষমানুষেব চোখেব আড়াল থেকে দূবে সবে গিযে, মা আব ভুল-মা দু'পাশে দাঁড়িযে লণ্ঠনেব আলো তুলে ওব কোমবেব শাড়িব গিঁট, শাযাব দড়ি একটু খুলে ঠিক উরুব উপবে একটা কালো জড়ুল খুঁজে পায, জন্মেব চিহ্ন। আব ভাবতে পাবে না মৃন্ময়ী, এত কুৎসিত, এত অশ্লীল সব ব্যাপাব ঘটতে পাবে ওকে নিযে, কল্পনা কবা যায না। মাথা ঝিম ঝিম কবে, মুখেব এত কাছে লণ্ঠনেব তাপ, মাথাব শিবাগুলি দপদপ কবে যন্ত্রণায।

'কী গ মা-ঠাকরুণ ? উনুনটা বইযে গেছে, দুটো চা'ল ফুটিযে নিন।'

মৃন্ময়ী চোখ খোলে। সামনে ছেলে-কোলে একজন বযস্ক বৌ, গিঁট দেওযা ডোবা-কাটা গোলাপী শাড়িটা বুক থেকে সবিযে ছেলেব মুখে মাইটা পুবে ছেলেকে দোলাচ্ছে, একেবাবে খোলাখুলি, চোখেব উপব।

মা বললেন—'না বাপু, আমি বিধবা মানুষ, বাতে কিছু খাব না।'

'পব ভাবেন কেন গ মা-ঠাকরুণ। কিছু মুখে দেবেন নি ? একবাটি দুধ। ও'খানে বামুনঠাকুব, হেই দিদিঠাকরুণ '

'ওবা তোমাদেব বান্নাই খাবে, ওবা জাত মানে না।'

'মোবা জেলে গ মা-ঠাকরুণ, জেলে-বৌব হাতে বামুনঠাকুবেব ভ্‌গ্‌,' অ মা-গো, মোদেব পাপ হবে নি ?

মৃন্ময়ী উঠে দাঁড়ায। ডালা-বন্ধ কবা সিন্দুকেব ভিতবেব পুবনো দলিল দস্তাবেজ, নথি-পত্তব, ভিক্‌টোবিযাব মুণ্ডু-মার্কা টাকা আব কাঁসা-পেতলেব হাড়ি-কলসীব মতো এইটুকু ঘবেব মধ্যে এতগুলি মানুষেব গাদা। দম বন্ধ হযে আসে। আপাতত ভেজা-শাড়িটা পাল্টানো দবকাব, পাযেব তলায সপ্‌-সপ কবছে, কাদায মাথামাখি। কিন্তু স্যুটকেশটা ও'ঘবে, বড়্‌দাব কাছে। বড়দাব কাছে যাওযা যায না ? সাহস পাওযা যেত। কিন্তু বাইবেব উঠোনে অন্ধকাবেব কথা ভেবেই মনটা সিঁধিযে গেল। বড়দাকে নিযে এখন ওবা নিশ্চযই শলা-পবামর্শ কবছে, মৃন্ময়ী ভিতবে ভিতবে ঘামতে শুরু কবল। বাত গাঢ় হচ্ছে ঢাকা থেকে কালীগঞ্জ এসে ওবাও নিশ্চযই অপেক্ষা কবছে, তাবপব বাত আবও গভীব হলে সেই ভযঙ্কব আব অদ্ভুত লোকটা নিজেই ও'পাব যাবে অথবা লোক পাঠাবে, বাত-দুপুবেবও পবে একটা-দেড়টা-দুটো, কতো বাত কে জানে, গাঢ় অন্ধকাবে গা ঢেকে, কোন আলো না-জেলে, কোন শব্দ না-তুলে

ইছামতী পেরিয়ে নৌকোটা এ পারে পৌঁছোবে। তারপর? গোটা শরীর ঝিম মেরে যায়, সম্ভাব্য দৃশ্যটা চিন্তা করতেও পারে না, ঘামতে থাকে। আবার হয়তো লণ্ঠনের লালচে আলো উঠবে নাকের ডগায়, চোখ খুললেই লণ্ঠনের অর্ধবৃত্ত অগ্নিকণা আর চিমনির কালি-ঝুলির ওপারে কতগুলি ঔৎসুক চোখের চাউনি। ওরা কারা? রক্তের প্রবাহে ঝড় ওঠে, শরীরটা অবশ, মৃন্ময়ী চোখ বোঁজে। তোমরা কারা? কি চাও? আমি চিনি না। এই একুশ বছর ধরে বড়ো একটা আলোর জগতে আমার বড়ো হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতাটা কেড়ে নিতে চাও। তার আগে, তোমাদের অতীতের ভুল আর অন্যায়ের পাওনা আদায় করতে কেন তোমরা এলে? নিমজ্জিত অন্ধকারে বইছে ইছামতী, মৃন্ময়ী যেন তার স্পষ্ট কলধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। যদি ভেসে যেতে পারতাম সেই স্রোতে, বিপুল অন্ধকারে স্নিগ্ধ জলের ধারা, শীতল বাতাস, ডান-হাতে জল কাটলে সবুজ দিগন্ত, বাঁ-হাতে সেই একই সবুজ, একই মৌসুমী বাতাসে এ'পারে ও'পারে জল।

শেষ পর্যন্ত মা-কে বাঁধতে যেতে হয়, অশোককাননে সীতার মতোই চুপচাপ করে বসে থাকে মৃণ্ময়ী। নিচে নোংরা বিছানায় এবং তার পাশে চটের বস্তা বিছিয়ে বুড়িটা ঘুমোয়, মৃণ্ময়ী তাকিয়ে থাকে, এক সময়ে হাই ওঠে, ঘুম পায়। তারপর রাত আরও গভীর হলে খাওয়া-দাওয়ার পর সেই সদরের ঘরে যেতে হয়। ঘরের জানালা থেকে বাইরের দিকে তাকিয়ে স্থির বসে থাকেন বড়দা। জানালা থেকে ওপারের আলো দেখা যায়। সারারাত ধরে আলো জ্বলছে ও'দিকে—বর্ডার চেক পোস্ট। চৌকি-দারী হাঁকের মতো হুঙ্কার আসে ওপার থেকে, এপারে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল বাজিয়ে হিন্দীগানের শিস্ দেয়, পাল্টা জবাব দেয়। আর অন্ধকারে গা ঢেকে গোপন পথে কারা আসে? নিশাচর মানুষেরা, মানুষ-পাচারের দালালরা, চোরাই চালানের কুৎসিত মানুষগুলি। এর মধ্যে মায়েরাও আসেন, পিতারা, সন্তানের কাছে, সন্তানের খোঁজে। মৃণ্ময়ী মা আর বড়দাকে দেখে। ঘুম নেই, কথাও নেই, যেন পৃথিবীতে বলার মতো কোন কথা নেই কারও, সব বলা হয়ে গেছে। এখন শুধু ইছামতী বইবে ধীরে, গাঢ়-ঘন-জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রাত গড়িয়ে যাবে, আর সময়—দীর্ঘ একুশ বছরের বয়সগুলির সিঁড়ি একে একে ভেঙে এখন শুধু এই ভয়াবহ রাতের প্রতিটি মুহূর্তকে আঙলের কড় দিয়ে গোনা গলা পর্যন্ত দুর্ভাবনার

বিষ—ওবা আসছে। ঘডিতে আডাইটা, হয তো আবও বাত হবে। বক্তচক্ষু সীমান্ত পুলিশ আব কালো-চাদবে ঢাকা বীভৎস মানুষগুলি ছাডা যখন আব কেউ জেগে নেই এপাবে ওপাবে, সেখানে জাগবেন ইতিহাসেব অধ্যাপক বডদা, মা, আব আমি—মৃণ্ময়ী ভাবল, আব জাগবে ওবা, অন্ধকাবেব নদীতে সীমানা পেবিযে ওবা আসবে।

বাইবে কী এক কর্কশ ডাক, পাখি। মা বললেন—'কালপেঁচা'। হৃৎপিণ্ডেব ভিতবে গিযে থামচে ধবল শব্দটা, ভযে শিউবে উঠল মৃণ্ময়ী, বডদাও আঁৎকে তাকালেন। শুধু মা জানেন, কালপেঁচাব ডাক। মা-ব অনেক বযস। বাইবে কাদেব চাপা কণ্ঠস্বব, দবজায খিল-তোলাব শব্দ, মবচে-পডা পেবেকেব চিৎকাব? বুকেব জ্বালাটা চাবদিকে ছডিযে পডল, সেঁধিযে আসছে দেহ। গভীব উৎকণ্ঠায বডদা নিঃশব্দে উঠলেন, এগোলেন, মা এগিযে এসে মৃণ্ময়ীব পাশে দাঁডালেন—'আমি আছি, আমি আছি, ভয কী মা তোব?' তক্তোপোশেব উপব পা ঝুলিযে বসে, মা-কে জডিযে মাযেব বুকে লুকিযে চোখ বুঁজে থবথব কবে কাঁপতে লাগল ভিতবে ভিতবে। লণ্ঠনেব লালচে আলোয আধো অন্ধকাব এ' ভৌতিক ঘবটায তোমাকে ছুঁযে থাকতে দাও মা। মাযেব বুকে এলোপাথাবি নাক ঘসে ঘসে শেষমুহূর্তে একটু শক্ত হতে, বুক বাঁধতে চাইল মৃণ্ময়ী।

ওবা এল। প্রথম সেই অদ্ভুত ভযঙ্কব মানুষটা, তাব সাঙাত আশ্রযদাতা জেলে-বুডো। তাবপব একজন প্রৌঢা নাবী, লাল বেল্ল-পাড সাদা শাডি, সেমিজ, বোগা বিষণ্ণ মুখ, টিকোল নাক, ভাঙা-চোযাল, কপালে দগদগে সিঁদুব। পিছনে বৃদ্ধ, হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, সস্তা কাপডেব ঢোলা-হাতা পাঞ্জাবি, রুগ্ন, কালো, যেন পৃথিবীতে পাওনাব চেযে অনেক বেশি দিন বেঁচে থেকে এখন ক্লান্ত। ওবা দবজাব চৌকাঠে স্থিব হযে দাঁডিযে। মৃণ্ময়ী মাযেব বুকে মুখ লুকিযে আডচোখে দেখছিল, মা ওব থুতনি ধবে জোব কবে মুখ তুলে ধবলেন, নিজেব পিঠ থেকে ওব হাত দুটো ছাডিযে নিযে সবে দাঁডালেন। সেই অদ্ভুত বিদ্‌ঘুটে লোকটা হঠাৎ তীব্র টর্চেব আলো ফেলল মুখেব উপব, অসভ্যেব মতো। চোখ ঝাঁঝিযে উঠল, বুঁজে এল, সমস্ত মন-প্রাণ কেন্দ্রীভূত কবে স্থিব শক্ত হযে সোজা হযে বসল মৃণ্ময়ী, মনে হলো, এখন সে আস্তে আস্তে সত্যি যেন পট হযে উঠছে, লক্ষ্মীব পট। আধো-অন্ধকাব এই বহস্যময ঘবটায সবাই অপলক তাকিযে আছে, ওকে দেখছে। এ কী, এত স্তব্ধতা কেন? এতটুকু শব্দ নেই

কোথাও। বাইরের বাতাসও কী বন্ধ হয়ে গেছে, ইছামতীর স্রোত? পৃথিবীতে সত্যি কী সব কথা শেষ? অনেক দূর থেকে এসেছে ওরা, বাংলাদেশের মাঠ-নদী ভেঙে, ঢাকা-রাজধানী থেকে, আমরাও অনেক দূর থেকে, বাংলার বুকের উপর দিয়ে, কলকাতা, রাজধানী কলকাতা—আমরা এসেছি এই ফাটলটার কাছে। তবে এই নীরবতা কেন? দম বন্ধ হয়ে আসে। সত্যি যদি মা—তবে কান্না নেই কেন। একুশ বছর ধরে যে-কান্নাটা জমেছে বুকের ভিতর। ওরা সবাই কি পাথর হয়ে গেছে। নিজের ভিতরের কান্নাটা গুমরোতে থাকে, ঠোঁট দুটো কাঁপে, মুখের নিঃশ্বাসে কান্নাকে চেপে রাখার যন্ত্রণায় বুদ্বুদের শব্দ, চোখের নিচে নাকের দু'পাশের ঢালুতে অসহ্য যন্ত্রণা। মৃণ্ময়ী চোখ খোলে, চমকে ওঠে, মুখের এক-বিঘতের মধ্যে সেই লণ্ঠন উঁচিয়ে ধরা, আর একেবারে মুখোমুখী, প্রায় নাকের সঙ্গে নাক ছুঁয়ে আরেকটি মুখের ছবি—কে? সমস্ত রক্তের স্রোতে হল্‌কা লাগে, ভরাট বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে, চোখে চোখ, পলক নেই, আমি কী দর্পনে নিজেকে দেখছি? নিজের মুখ? সেই রোগা বিষণ্ণ মুখ, টিকোল নাক, ভাঙা-চোয়াল, কপালে দগদগে সিঁদুর। কিন্তু মুখের আদলে এ কার প্রতিবিম্ব? ঠিকুজি-কোষ্ঠী নয়, রক্তের পরীক্ষা নয়, উরুতে জড়ুলের চিহ্ন নয়, সাক্ষ্য-প্রমাণ কিছু নয়—আমি, আমার মুখ। মৃণ্ময়ী সারা দেহে নিজের উত্তর শোনে—মা, আমার মা। কিন্তু পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে শরীরটা, তীক্ষ্ণতায় তাকিয়ে থাকে। ও-দিকে থুতনিশুদ্ধ কাঁপছে ঠোঁট, ছলছল করে উপচে উঠছে চোখ, লণ্ঠন-ধরা হাত ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে ভেঙে পড়বে এক্ষুনি। কে এসে লণ্ঠনটা নিয়েগেল হাত থেকে এবং প্রচণ্ড আবেগে কান্নার হিক্কা তুলে সেই রুগ্ন শরীর আছড়ে পড়ল মৃণ্ময়ীর গায়ে, মৃণ্ময়ীকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে কান্না, কান্না, কান্না, একুশ বছরের সঞ্চিত কান্নার দেনা-মেটানোর পালা। এবং সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মৃণ্ময়ীর মনে হলো, একটা স্নিগ্ধ জলপ্রপাতের নিচে দাঁড়িয়ে আছে সে। প্রসন্ন অবগাহন। এবং ঘরের আর যারা রুদ্ধবাক দাঁড়িয়েছিলেন, মৃণ্ময়ী তাদের কারও দিকে তাকাতে পারল না, এমন কি বড়দা, মা-ও না, শুধু সেই বৃদ্ধ, পিতা, মৃণ্ময়ী চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল। অত্যন্ত সন্ত্রস্তভঙ্গিতে এগিয়ে আসছেন বৃদ্ধ, কাঁপতে কাঁপতে, একেবারে গা ঘেঁসে পাশে দাঁড়িয়ে দুটো কাঁপা-কাঁপা হাত প্রসারিত করেও দ্বিধায় স্থির হয়ে গেলেন, বৃদ্ধ হলেও একজন পুরুষমানুষ এবং একটি যুবতী মেয়ের শরীর, চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন,

স্থিব পলকেব উপব দিযে সময বইতে লাগল, সেই হাত এসে মাথায স্পর্শ পেল, মাথা থেকে কাঁপতে কাঁপতে গলা-কাঁধ-পিঠ ছুঁযে কোমব পর্যন্ত নামল। সাবা-দেহেব বক্তে একটা স্নিগ্ধতাব ঢল নামছে, আশ্চর্য শিহবণ, ঝিম মেবে দাঁড়িযে বইল মৃণ্ময়ী, সত্যি সে পট হযে গেছে, মা-লক্ষ্মীব পট। এবং সেই নাবী যখন আশ্লেষ থেকে ওকে মুক্তি দিযে ওব বুক-কোমব হাঁটু থেকে গড়িযে একেবাবে পাযেব কাছে পড়ে ডুকবে কেঁদে উঠল এবং সেই পুরুষ,বৃদ্ধ,ওব শবীব থেকে হাত তুলে নিযে উবু হযে সেই নাবীকে তুলতে চাইল, তখনই নিজেব মধ্যে আবাব নিজেকে ফিবে পেযে ছুটে গিযে মৃণ্ময়ী মা-কে জড়িযে ধবল, ডুকবে কেঁদে উঠল, অঝোব কান্না। মা তোমাব একুশ বছবেব আশ্রয, মা তোমাব একুশ বছবেব ভালোবাসা, মা আমাব একুশ বছবেব বিশ্বাস। কান্নায শবীব কাঁপছে, অনুভব কবে, পিঠে আঁচলেব নিচে মাযেব হাত আদব বুলোচ্ছে, ওপাবে কান্না থেমেছে, পিছনে না তাকিযেও স্পষ্ট বোঝা যায, হতবাক বিস্ময়ে এ-পাবেব দিকে তাকিযে আছেন ভুল-মা। মা বললেন—‘প্রণাম কব, ওঁদেব প্রণাম কব মিনু।’ কান্নায শবীব ভাঙছে, সোজা হযে দাঁড়াতে পাবে না মৃণ্ময়ী। শুনতে পায, কাঁপা-গলায কে যেন বলছেন, বৃদ্ধেব কণ্ঠ—‘নাম ছিল পারুল, পারুলবাণী মালাকাব, পিতাব নাম শম্ভুনাথ মালাকাব, সাকিন শুভড্ডা, কেবানীগঞ্জ থানা, ঢাকা সদব, গোত্র বাৎস বাঢী শ্রেণী।’ মৃণ্ময়ী শোনে, বক্তেব পবিচয, মা-কে জড়িযে ধবে আবও জোবে, আবও নিবিড় কবে। ও-পাব থেকে, যেন বহুদূব থেকে দৈববাণী—‘মাইযাটাবে গোযালন্দেব ভিড়ে হাবাইযা আব আমবা ভাবতেব দিকে পা বাড়াই নাই। বাপ-ঠাকুর্দাব ভিটা গেল, একটামাত্র বুকেব মাইযা, যদি হেইটাও যায তবে আমাগো আব ভাবতে কাম নাই। ছেলে দুইটাবে লইযা ফিবা গেলাম।’ কান্নাব হিক্কা থামে না। মা আবাব বললেন—‘প্রণাম কব, ছিঃ প্রণাম কব মিনু, প্রণাম কব ওঁদেব।’ মৃণ্ময়ী শক্ত হয, সোজা হযে দাঁড়ায। কিন্তু অবাক হযে তাকিযে থাকে - ঘবেব চৌকাঠ ডিঙিযে বাইবেব অন্ধকাবে মিশে যাচ্ছে ওবা। শুধু শেষবাবেব মতো একবাব, আলোব শেষ বেখায পিছন থেকে সেই নাবীমূর্তিকে আবছা দেখা গেল, তাবপবই অন্ধকাব, অন্ধকাব, আব মনে হলো যেন একটা দূবাগত বৃদ্ধেব কণ্ঠস্বব—পারুলবাণী মালাকাব, পিতা শ্রীশম্ভুনাথ মালাকাব, সাকিন শুভড্ডা, কেবানিগঞ্জ থানা ঢাকা সদব, গোত্র বাৎস, বাঢীশ্রেণী।

মধ্যবাতে লণ্ঠনেব লালচে-আলোব চাবপাশে প্রাযান্ধকাবে আবাব সেই

নীববতা। তিনটি আপন হৃদয় স্তব্ধবাক, তিনজনেব উপব দিয়ে সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, ইতিহাসেব সময়। মা তক্তপোষে গিয়ে শুলেন আব সেই জানালাব ধাবে তাকিয়ে আছেন বড়দা। ইছামতী বহমান, ওপাবে আলোটা জ্বলছে, সাবাবাত জ্বলবে। ক্লান্ত শবীব টেনে নিয়ে মৃণ্ময়ী পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মধ্য-বাতেব অন্ধকাবে পথ খুঁজে খুঁজে কাবা এগিয়ে যাচ্ছে ইছামতীব দিকে, কালো জমাট বাধা অন্ধকাবে মাঝে মাঝে টর্চ জ্বলে উঠছে, দূবে, দূবে মিলিয়ে যাচ্ছে, জানালা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, অন্ধকাবে গায়ে কালো চাদব ঢেকে ওবা ওপাবে চলে যাচ্ছে, ও'পাবেব ওই আলোটাব দিকে। মৃণ্ময়ী অপবিসীম মুগ্ধতায় তাকিয়ে থাকে। ওবা কাবা। মৃণ্ময়ী চোখ বুঁজে একাগ্রভাবে নিজেব বক্তেব অণুতে-পবমাণুতে নিজেকে হাতড়ায়। শ্রীশম্ভুনাথ মালাকাব, একটা অন্ধকাবেব নাম, খুঁজে পায় না। শুভড্ডা গ্রাম, কেবানীগঞ্জ থানা, ঢাকা সদব। পৃথিবীব কোথায় সে দেশ? কতদূবে? এই ফাটলটাব ওপাবে কোথায় যাচ্ছো তোমবা শ্রীশম্ভু মালাকাব? হঠাৎ একটা হাত এসে কাঁধে জড়ায়, মৃণ্ময়ী বড়দাব বুকে মাথা বেখে স্থবিব হয়ে যায়, নিবাপদ আশ্রয় আব বিশ্বাসেব শান্তি। চোখ বুঁজে আসছে, ঘুম। আব মনে হলো, স্বপ্নেব মধ্যে কে যেন পবম আদবে ওব ভালো-বাসাব চামব বুলোচ্ছে সর্বাঙ্গে, যেন স্বপ্নেব মধ্যে কাব কণ্ঠস্বব—'কাঁদিস নে, কাঁদিস নে মিনু। এবপবও তো পৃথিবীতে বাঁচতে হবে আমাদেব। মানুষেবা বুক থেকে হৃৎপিণ্ড তুলে নিয়ে অন্যদেহে সংস্থাপনেব সার্থক অস্ত্রোপচাবেব যুগে আমবা, পৃথিবীকে উত্তবমেরু আব দক্ষিণ মেরুব উত্তবে-দক্ষিণে, সূর্যোদয়েব থেকে সূর্যাস্তেব পথে পূবে-পশ্চিমে, আমবা পৃথিবীব হৃদয় ছিঁড়ছি মিনু। সতেব অক্ষবেখায় ভিয়েতনামে মিনু, আটত্রিশ অক্ষাংশে কোবিয়ায়, ব্র্যাণ্ডেনবুর্গেব চূড়ায় চাব-অশ্বেব বথ থেমে আছে। এপাবে ওপাবে দীর্ঘশ্বাস। আব আমাদেব ইছামতী বইছে। দেখ, দেখ মিনু, ইছামতীব জলে জ্যোৎস্নাব আলো আমবা এই ফাটলটাব কাছে বাববাব ফিবে ফিবে আসব, আমবা সবাই, তোব সঙ্গে এই ফাটলটাব কাছে, শুধু তোব একাব জন্য নয়, আমাদেব সকলেব পবিচয়টা জানতে ' বাইবে ইছামতীতে তখন মধ্যবাতেব চাঁদ উঠছে। মৃণ্ময়ীব ক্লান্ত শবীবে ঘুম।

চেকোশ্লোভাকিয়ার অগ্নিপরীক্ষা

সুকুমার মিত্র

কমিউনিজমের জন্মকাল থেকেই দুটি বাহু তাকে গেলবার চেষ্টা করছে—একটি বামে, একটি দক্ষিণে। মার্কস এঙ্গেলস ও লেনিনকে লড়তে হয়েছে দুই বাহুর বিরুদ্ধে। স্তালিনকেও লড়তে হয়েছে। কিন্তু মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, আগে প্রধানতঃ লড়াই চলেছে হয় বাম নয় দক্ষিণী বাহুর বিরুদ্ধে। যুগপৎ দুই বাহুর আক্রমণের (এবং তা অত্যন্ত ভয়াবহ আকারে) মোকাবিলা করতে হচ্ছে একেবারে সম্প্রতিকালে। অতি বামের উগ্র বিপ্লবীয়ানার প্রতিনিধি চীনে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মাও গোষ্ঠী যখন সমগ্র জগতে কমিউনিস্ট আন্দোলন তথা শ্রমিক আন্দোলনকে বিভেদের মুষল হেনে বিপর্যস্ত করছে ঠিক তখনই দেখা দিয়েছে বুর্জোয়া মতাদর্শের দ্বারা অভিভূত দক্ষিণপন্থার বিপদ। চেকোশ্লোভাকিয়ায় এই বিপদ চরমে উঠেছে। অতিবামমার্গী চীনের মাও গোষ্ঠীর কাণ্ডকারখানা সাম্রাজ্যবাদী মহলকে পুলকিত করছে, তারা এদের কার্যকলাপের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে সদা তৎপর। ভিয়েতনাম তারই জলন্ত দৃষ্টান্ত। দক্ষিণী শোধনবাদ বা সংস্কারবাদ কমিউনিজমকে কিভাবে টুকরো টুকরো করে বিকলাঙ্গ করে দিতে পারে তার প্রকৃষ্টে দৃষ্টান্ত চেকোশ্লোভাকিয়া। সাম্রাজ্যবাদ সাফল্যের আশায় উল্লসিত। "সব জাতিই সমাজতন্ত্রে উপনীত হবে—এটা অনিবার্য, কিন্তু সকলেই ঠিক একইভাবে উপনীত হবে না"—লেনিনের এই ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

দুনিয়ায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন যে পথে সিদ্ধিলাভ করেছে, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ ঠিক সেই পথে সিদ্ধিলাভ করে নি। বিভিন্ন দেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক বিকাশের বিচিত্র ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের পথ নির্ধারিত হয়েছে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের পথ যতই বৈচিত্র্যপূর্ণ হোক না কেন সাধারণ ধারার ব্যতিক্রম কোন ক্ষেত্রেই হয় নি। এই সাধারণ ধারাটি হল: দূরপ্রসারী সামাজিক বিপ্লব ব্যতিরেকে কোন দেশেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং হবে না। আর

মেহনতী জনগণেব শ্রেণী সচেতন সংগ্রামেব ফলেই এই বিপ্লব সংঘটিত হতে পাবে এবং এই সংগ্রামকালে বাষ্ট্র থাকবে শ্রমিকশ্রেণীব অগ্রগামী অংশেব নেতৃত্বে পবিচালিত, শ্রমিকশ্রেণীব বাজনৈতিক নেতৃত্বাধীনে। বিপ্লবেব লক্ষ্য হবে সর্বপ্রকাব শোষণেব অবসান ঘটানো, উৎপাদনেব উপাযগুলির সামাজিকীবণ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাব প্রতিষ্ঠা।

চেকোশ্লোভাকিযায সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হযেছে শান্তিপূর্ণ পথে। এখানে কোন সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান বা গৃহযুদ্ধেব পথ অনুসৃত হয নি। অবশ্য সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানেব পথ চেকোশ্লোভাকিযায অজানা ছিল না। অক্টোবব বিপ্লবেব পব সোভিযেত বাষ্ট্র গঠিত হলে হাঙ্গেবী ও শ্লোভাকিযায গণ-বিপ্লবেব ফলে সমাজতান্ত্রিক বাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয। সদ্যজাত সোভিযেত বাষ্ট্র এই দুটি নবজাত সমাজতান্ত্রিক বাষ্ট্রকে বাঁচাতে পাবে নি। ধনিকশ্রেণীব আক্রমণ, আভ্যন্তবীণ ও আন্তর্জাতিক নানা জটিলতা এবং পার্টিব ত্রুটি বিচ্যুতি স্বল্পকালেব মধ্যে নবজাত সমাজতান্ত্রিক বাষ্ট্র দুটিব আযু শেষ কবেদেয। এ সত্বেও শ্রমিকশ্রেণীব সংহতি এবং বিপ্লবী ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

প্রথম মহাযুদ্ধেব পব চেক ও শ্লোভাকজাতি মিলিতভাবে যে স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিযা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কবেছিল তাব জন্যে চেক ও শ্লোভাকদেব দীর্ঘ সংগ্রাম চালাতে হয। এই-সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীব দান ছিল বিপুল। নবগঠিত প্রজাতন্ত্রে ধনিক শ্রেণীব গণতন্ত্র বিবোধী নীতি প্রবল অসন্তোষেব সৃষ্টি কবে। শ্রমিকশ্রেণীব সংহতি এবং শক্তি ধনিকমহলে আতঙ্ক জাগায এবং ১৯২৩ সালে তাদেব প্রবোচনায সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে। এব কযেক মাস আগেই শ্লোভাকিযায সোভিযেত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হযেছিল। শ্লোভাকিযায সোভিযেত প্রজাতন্ত্রেব পতন এবং শ্রমিকদেব উপব ধনিক শ্রেণীব আক্রমণ সত্বেও অন্যতম প্রধান জাতীযশক্তি শ্রমিকশ্রেণীকে দমন কবা সম্ভব হয নি। ১৯২১ সালে চেকোশ্লোভাকিযায কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয এবং ১৯২৫ সালেব সাধাবণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয বৃহত্তম বাজনৈতিক দল রূপে চেকোশ্লোভাক বাজনীতিব উপব বিপুল প্রভাব বিস্তাব কবে।

ফ্যাসিজমেব বিরুদ্ধে মবণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হযে ইযোবোপেব বহু দেশেব মত চেকোশ্লোভাকিযাতেও কমিউনিস্ট পার্টি সংগ্রামেব পুবোভাগে থেকে চবম ক্ষয ক্ষতি স্বীকাব কবে। এব ফলে কমিউনিস্টদেব প্রভাব আবও বেড়ে

যায়। হিটলারের পরাজয়ের পর লণ্ডনে অবস্থিত নির্বাসিত বৈধ সরকার মস্কোয় চেকোস্লোভাক কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এর ফলে ১৯৪৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল চেক ও শ্লোভাকদের জাতীয় সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের অধীনে দেশে শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ও দূর প্রসারী সংস্কারসাধিত হলে জনসাধারণের মধ্যে নতুন জাগরণের জোয়ার আসে। ১৯৪৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি ৩৮ শতাংশ ভোট পেয়ে বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। এর ফলে দূর প্রসারী সামাজিক বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হয়। ধনিকশ্রেণী বিচলিত হয়ে ওঠে। গভীর চক্রান্ত শুরু হয় এবং কমিউনিস্ট নেতা ক্লিমেন্ট গটওয়াল্ডের নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা চলে। কমিউনিস্ট পার্টি ধনিকশ্রেণীর চক্রান্ত-সৃষ্ট সংকটের কারণ ব্যাখ্যা করে জনসাধারণের কাছে এই চক্রান্ত ব্যর্থ করার আহ্বান জানান।

১৯৪৮ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ চক্রান্তে জড়িত পদত্যাগকারী মন্ত্রীদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করবার এবং প্রধানমন্ত্রীর তাঁর ইচ্ছামত নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করার ক্ষমতা স্বীকারের দাবি জানালো। গণবিক্ষোভের উত্তাল তরঙ্গের সামনে রাষ্ট্রপতি বেনেস নতি স্বীকার করেন। এর পর জাতীয় ফ্রন্ট, সরকারের নতুন কর্মসূচী গৃহীত এবং নতুন সংবিধান চালু হয়। ১৯৪৮ সালের ৩০ শে মে সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় ফ্রন্টের প্রার্থীরা শতকরা ৯০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। এই ভাবে "নিচে থেকে" শ্রমিকশ্রেণীর চাপের সঙ্গে সঙ্গে "উপর থেকে" রাষ্ট্রক্ষমতায় শ্রমিকশ্রেণীর সোৎসাহ অংশ গ্রহণের ফলে সৃষ্ট চাপ বিপ্লবকে শান্তিপূর্ণ পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জয় এবং দেশের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের অংশগ্রহণ যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তারই ফলে চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশের পক্ষে শান্তি পূর্ণ পথে বিপ্লবে সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয়েছিল।

সংকটের সূচনা :

কিন্তু এই সব দেশে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও বুর্জোয়া জীবনধারার প্রতি প্রীতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হল না। বিপ্লববিরোধী ও সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তি থেকে গেল। স্তালিন আমলের কঠোর নীতি এই শক্তিকে মদত যোগালো।

গণতন্ত্রের প্রসার, সেকেলে পন্থা পরিহার, আমলাতান্ত্রিকতার অবসান ইত্যাদির দাবি যখন প্রবল হয়ে উঠল তখন এই সব শক্তি সুরে সুর মিলিয়ে জনসাধারণের নানা সংস্থার মধ্যে প্রতিপত্তি বিস্তার করল। ব্যাপারটি সকলের চোখ এড়ায়নি এবং এড়ায়নি বলেই নোভতনি গোষ্ঠীর অপসারণকালে সোভিয়েত নেতারা বার বার চেকোশ্লোভাকিয়া গিয়ে এই বিপদের প্রতি চেকোশ্লোভাক নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। তখন বুর্জোয়া কাগজগুলিতে নোভতনিকে গদীতে রাখার জন্যে সোভিয়েত চাপ দিচ্ছে বলে প্রচার করা হয়েছিল। সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলি কোন বাধা না পাওয়ায় যেসব অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার ঘটল সেগুলি এই রকম:
(১) বেতারকেন্দ্র, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র সমূহ সমাজতন্ত্রবিরোধীদের কবলে চলে গেল। চেকোশ্লোভাক টেলিভিসান কেন্দ্র থেকে পশ্চিম জার্মানীর একজন রাজনৈতিক ভাষ্যকারকে সরাসরি সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে প্রচারের অধিকার দেওয়া হল। বন্ সরকার খুশি হলেন এবং পশ্চিম জার্মানীর প্রগতিশীল মহল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন।

(২) পশ্চিম জার্মানী থেকে অবাধে দলে দলে ট্যুরিস্টের বেশে চেকো-শ্লোভাকিয়ার প্রাক্তন জার্মান জমিদারেরা চেকোশ্লোভাকিয়ায় ঢুকতে লাগল। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় একটি ফটো ছাপানো হল যাতে দেখা গেল পশ্চিম জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্তের বেড়া ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। 'রেইনিসৃসে পোস্ট' নামক একটি জার্মান পত্রিকার একজন সংবাদদাতা অস্ট্রিয়া হয়ে প্রাগে গিয়েছিলেন। তিনি সহাস্যে জানালেন: "অস্ট্রিয়া চেকোশ্লোভাক সীমান্তের ঘাঁটিগুলিতে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বরাবরই যৎসামান্য। আপনার মোটর গাড়ির খোপে কি আছে তা জানতেও সীমান্ত রক্ষীদের কোন আগ্রহ নেই।" এই সীমান্ত দিয়ে পশ্চিম জার্মান থেকে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র চালান যেতে লাগল এবং কোন ক্ষেত্রে তা ধরাও পড়ল।

(৩) সমাজতন্ত্রবিরোধী বুদ্ধিজীবীর দল প্রকাশ্যেই প্রতিবিপ্লবের আহ্বান জানালেন "দুই হাজার কথা"র মার্জিত এক আবেদনে। এই আবেদন লিখেছিলেন লুডভিক ভাকুলিক নামে জনৈক লেখক এবং এটি অনুমোদন করেছিলেন ৭০ জন বুদ্ধিজীবী। এই আবেদনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা অস্বীকার করা হল। সরকার, ট্রেডইউনিয়ন ও অন্যান্য সংস্থা থেকে কমিউনিস্ট

ও সমাজতন্ত্রে আস্থাবান কর্মকর্তাদের বিতাড়িত করার আহ্বান জানানো হল এবং চাপ সৃষ্টির জন্যে ধর্মঘট, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও বয়কট করারও সুপারিশ করা হল। এ ছাড়া নাগরিক কমিটি গঠন করার অধিকার ঘোষণা করে পরিষ্কার ভাবেই পাল্টা সরকার গঠনে উসকানি দেওয়া হল। কমিউনিস্ট পার্টির হাতে "কোন সংগঠন এমন কি কোন কমিউনিস্ট সংগঠনও নেই" বলে জাহির করা হল এবং বলা হল 'কি করে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে হয় পার্লামেণ্ট এখন তা আর জানে না, সরকার জানে না কি ভাবে শাসন করতে হয়, প্রশাসকেরা জানে না কি ভাবে প্রশাসন চালাতে হয়।"

"জনগণের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা তুলে দাও", 'গণতন্ত্র' অর্থাৎ "বুর্জোয়া গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠা করে—এই হল "দুই হাজার কথা"র নির্গলিতার্থ।

এই আবেদন প্রকাশিত হল যুগপৎ চারটি চেকোস্লোভাক সংবাদপত্রে। পশ্চিম জার্মানী চেকো-স্লোভাকিয়ার সীমান্তে বিরাট সামরিক মহড়ার জন্যে প্রস্তুত হল।

পশ্চিম জার্মানীর "বেইনিস্‌শে পেস্‌ট" দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখলেন "সংস্কারের বর্তমান প্রক্রিয়ায় লক্ষ্য হওয়া উচিত চেকোশ্লোভাকিয়ায় ধাপে ধাপে কমিউনিজমকে ভেঙ্গে ফেলা।" এই উপদেশ বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি বললেন যে, 'প্রাগের ভাবগতিক থেকে এ কথাও বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বাজারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে আবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি-করণই মেনে নেয়'।

সঙ্কট মোচনের প্রয়াস

সঙ্কট যখন চরমে উঠল চেকোশ্লোভাকিয়ায় কমিউনিস্ট নেতৃত্ব তখন কেন্দ্রীয় কমিটির মে মাসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে দক্ষিণপন্থী ও সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলিকেই প্রধান বিপদের কারণ বলে ঘোষণা করলেন। ১৪ই ও ১৫ই জুলাই ওয়ারশতে পাঁচটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারী ও কমিউনিস্ট নেতাদের বৈঠক হল। এই বৈঠক থেকে চেকোশ্লোভাকিয়ায় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লিখিত একটি যুক্ত পত্রে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপদের উল্লেখ করে বিপন্মুক্তির জন্যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করা হল।

চেকোশ্লোভাকিয়ার সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টাকে বুর্জোয়া সাংবাদিকেরা "স্বাধীন রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ" এবং "কট্টর পন্থীদের গদিয়ান" করার চেষ্টা বলে প্রচার করলেন। অথচ সোভিয়েতের পার্টিই তো স্তালিন আমলের সমস্ত গলদ দূর করার জন্য সর্বত্র বদ্ধপরিকর হয়েছে, সোভিয়েতে নতুন অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেছে, গণতন্ত্রের প্রসার ঘটিয়েছে, জনগণের সঙ্গে সংযোগ ঘনিষ্ঠতর করেছে, আমলাতন্ত্রেরও সংকীর্ণতাবাদ দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছে। আর একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। হাঙ্গেরীর মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এখানে তথাকথিত একটি পশ্চিম-প্রেমিক সরকার গঠন চেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে বুঝেই পশ্চিম দুনিয়ায় এত হল্লা উঠেছিল যার ঢেউ আমাদের দেশেও পৌঁছেছে।

এবার আবার চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট নেতৃত্বের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক। পাঁচটি সমাজতান্ত্রিক দেশের চিঠির জবাবে চেকোশ্লোভাক নেতারা সব স্বীকার না করে ররং মে মাসের কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে বললেন: "চলতি পরিস্থিতি প্রতিবিপ্লবী, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি প্রত্যক্ষভাবে বিপন্ন, আমাদের সমাজতান্ত্রিক পররাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা পরিবর্তন আনার প্রস্তুতি চলেছে এবং আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সুনির্দিষ্ট বিপদ বর্তমান—এ কথা বলার মত কোন কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না।"

এর সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রবিরোধীদের তৎপরতা বৃদ্ধির অভিযোগের পাল্টা জবাবে তাঁরা বললেন "মতান্ধ ও সংকীর্ণতাবাদী শক্তিগুলিও একই সময় তাদের তৎপরতা বাড়িয়েছে।"

দেখা যাচ্ছে মে মাসে যে সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলির কার্যকলাপকে প্রধান বিপদ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, তাদের সম্বন্ধে চেকোশ্লোভাক নেতারা একেবারেই উদাসীন, তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ 'প্রধান বিপদের' প্রতি নয়, মতান্ধ ও সংকীর্ণতাবাদীদের প্রতি।

২৩ শে জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকে সোভিয়েত কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে নাক গলাতে নিষেধ করল। সঙ্গে সঙ্গে 'প্রাভদা' চেকোশ্লোভাক নেতারা "বিপদের সমগ্র গভীরতা উপলব্ধি করতে চাচ্ছেন না" বলে অভিযোগ করে লিখল:

"চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, বৈরী শক্তিগুলি দেশকে সমাজতান্ত্রিক পথ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে এবং সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে চেকোশ্লোভাকিয়াকে টেনে বের করে নিয়ে যাওয়ার বিপদ সৃষ্টি করছে।" 'প্রাভদা'র একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হল: "প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগে চেকোশ্লোভাকিয়ার পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা পর্যন্ত অপেক্ষা করার সত্যিই কি কোন দরকার আছে?"

এর পরই ২৩শে জুলাই সোভিয়েতের তিন হাজার মাইল দীর্ঘ পশ্চিম সীমান্তে বিরাট যুদ্ধের মহড়া শুরু হয়। এরই সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় চেকোশ্লোভাক নেতাদের সঙ্গে সোভিয়েত নেতাদের আলোচনা। চেকোশ্লোভাক নেতারা পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের সূচনা স্বরূপ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের ১৩ জন পদস্থ ব্যক্তিকে বরখাস্ত করা হয়। এরা সকলেই সোভিয়েত ও সমাজতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল।

চেকোশ্লোভাক-সোভিয়েত আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে ব্রাতিসলাভা সম্মেলনে। চেকোশ্লোভাকিয়া সহ ৬টি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টি একটি যুক্ত বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে. বর্তমান জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্র, শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের নাশকতামূলক কার্যকলাপ বিবেচনা করে তাঁরা মনে করেন যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি আরও দৃঢ় করা প্রয়োজন। সমাজতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেসব নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, সেগুলির সমাধানের জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির একযোগে প্রচেষ্টা চালানো দরকার বলেও তাঁরা মনে করেন।

সমাজতান্ত্রিক অবস্থান সংহত করা এবং সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করার ব্যাপারে সাফল্যের গ্যারান্টি হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি অনমনীয় আনুগত্য, জনগণকে সমাজতন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাবধারার মর্মবাণীতে শিক্ষাদান, বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম।

পশ্চিম জার্মানীর নয়া নাৎসীবাদ, যুদ্ধবাদ এবং প্রতিহিংসালিপ্সার বিরুদ্ধে মিলিত কর্মনীতি অনুসরণের এবং জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে

সমর্থনেব দৃঢ সংকল্প বিবৃতিতে ঘোষণা কবা হযেছে। ঘোষণায ভিযেতনাম সহ আবও কযেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষযেব উল্লেখ কবা হয। সুষ্ঠুভাবে ঐ কবণীয-গুলি সম্পন্ন হলে শুধু চেকোশ্লোভাকিযা নয, সমগ্র সমাজতান্ত্রিক দুনিযাব একটি বড় বকমেব সঙ্কটেব অবসান হত। কিন্তু তা হল না।

ব্রাতিসলাভা চুক্তি কেন কার্যকব হল না

ব্রাতিসলাভা বৈঠকেব পব সাবা দুনিযাব লোক স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলেছিল, ভেবেছিল চেক সঙ্কটেব অবসান ঘটল। কিন্তু দেখা গেল ব্রাতিসলাভা ঘোষণাব কোন অংশই চেকোশ্লোভাক সবকাব ও কমিউনিস্ট পার্টি বাস্তবে রূপাযিত কবতে পাবছেন না, বা কবছেন না। কাবণ কি? কাবণটা পবিষ্কাব হল লণ্ডনেব 'টাইমস্' পত্রিকাব মন্তব্যে। 'টাইমস্' বললেন: "প্রকৃতপক্ষে ঘোষণায খুব সাধাবণভাবে সদিচ্ছা প্রকাশ ছাড়া আব কিছু কবাব বাধ্যবাধকতা চেকোশ্লোভাকিযাকে স্বীকাব কবতে হযনি।" এ শুধু একটা সম্পাদকীয মন্তব্য নয, চেক প্রতিক্রিযাশীলদেব 'লাইন' দেওযাব উদ্দেশ্যেই এই মন্তব্য কবা হযেছিল।

স্তালিনপন্থীদেব বিতাড়নেব অজুহাতে কমিউনিস্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিযন এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে হাজাব হাজাব অভিজ্ঞ ও বহু সংগ্রামে পবীক্ষিত কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদেব সবিযে দিযে প্রতিক্রিযাশীল অথবা প্রতিক্রিযাশীল গণতন্ত্রেব ভাঁওতায বিভ্রান্ত ব্যক্তিদেব ঐ সব পদে নিযুক্ত কবা হযেছিল। এ ছাড়া চেকোশ্লোভাকিযাব শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টিব গৌববময ঐতিহ্য স্মবণ কবেও স্বীকাব কবতে হবে যে, ১৯৪৮ সালে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দলেব সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিব ঐক্যবদ্ধ হওযাব পব থেকে পার্টিব মধ্যে সোস্যাল ডেমোক্রাটদেব সংস্কাববাদী ভাবধাবা বেশ প্রবল হযে উঠে। তথাকথিত "গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদেব" কর্মসূচী চেকোশ্লোভাকিযায সমাদব লাভ কবে। প্রতিবিপ্লবীবা এব পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ কবে। অভিজ্ঞ ও পবীক্ষিত কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীবা দাযিত্বপূর্ণ পদগুলি থেকে অপসাবিত হওযায এবা আবও বেপবোযা হযে ওঠে এবং প্রকাশ্যেই পার্টিব বিরুদ্ধে প্রচাব চালাতে থাকে। ভিতবে ও বাইবে নাশকতামূলক কাজ অব্যাহতভাবে চালিযে প্রতিবিপ্লবীবা কার্যত পার্টি ও সবকাবকে দুর্বল কবে ফেলেছিল। ব্রাতিসলাভা ঘোষণা কাগজে পত্রেই থেকে গেল এবং তাব উল্টো ব্যাপাবগুলিই দ্রুত ঘটতে শুরু করল।

ওযাবশ চুক্তিব বাধ্যবাধকতা অগ্রাহ্থ কবা, অর্থনীতিব অ-সমাজতন্ত্রীকবণ, মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী ও অন্যান্য পশ্চিমী বাষ্ট্রেব সঙ্গে 'বিশেষ' সম্পর্ক স্থাপন এবং শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদেব পুনঃ প্রতিষ্ঠা—এইলক্ষ্যগুলি সামনে বেখে প্রতিবিপ্লবীবা শোধনবাদীদেব তাদেব শিখণ্ডীৰূপে ব্যবহাব কবতে লাগল। চেকোশ্লোভাকিযায় প্রতিবিপ্লব সুকৌশলে আঘাত হানতে হানতে যখন পার্টি ও সবকাবকে দুর্বল কবে দিযে শেষ আঘাত হানাব জন্যে প্রস্তুত হযেছে, তখনই চেকোশ্লোভাকিযাব পার্টি ও সবকাবেব কতিপয় নেতা সামবিক সাহায্য সহ সর্ববিধ সাহায্যেব জন্যে সোভিযেত ইউনিযন সহ ওযাবশ চুক্তিভুক্ত সমস্ত দেশগুলিব নিকট আবেদন জানালেন। এই আবেদনে সাডা দিযে সোভিযেত ও অন্য চাবটি সমাজতান্ত্রিক দেশেব সৈন্যবাহিনী চেকোশ্লোভাকিযায প্রবেশ কবল—দেশ দখলেব জন্যে নয, প্রতিবিপ্লবকে চূর্ণ কবাব উদ্দেশ্যে। অবস্থা আযত্তে আসাব পব সমাজতান্ত্রিক সৈন্যবাহিনী বহু ব্যক্তিব তথাকথিত 'সমাজতন্ত্রেব নীতি বিপন্ন' ধ্বনিকে মিথ্যা প্রমাণ কবে সমাতজন্ত্রেব জযকে অক্ষুণ্ণ বেখে সমস্ত প্রবোচনা ব্যর্থ কবে স্বস্থানে ফিবে যাচ্ছে। বর্তমানে কোন কোন শহব থেকে সোভিযেত ফৌজ অপসাবিত হওযাব পব সেখানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঘটেছে। এ কথা এখানকাব জাতীযতাবাদী সংবাদপত্রগুলিতেও প্রকাশিত হযেছে।

নতুন আলোচনা ও বিবৃতি

চেকোশ্লোভাকিযায় ওয়াবশ শক্তিবর্গেব ফৌজ প্রবেশ কবাব পব বহু বোমহর্ষক, প্রবোচনামূলক ও উত্তেজক মিথ্যা ও অর্ধসত্য সংবাদ পশ্চিম জার্মানীব মাধ্যমে এবং বযটাব ও এসোসিযেটেড প্রেস অব আমেবিকাব দৌলতে সাবা দুনিযায প্রচাবিত হযেছে। তবে এসব ছাপিযেও সব চেয়ে বড খবব একদিন পাওযা গেল : চেকোশ্লোভাকিযাব বাষ্ট্রপতি স্ভোবোদা মস্কোয গেছেন এবং পূর্ণ বাষ্ট্রীয মর্যাদায সম্মানিত হযেছেন। এব পবে জানা গেল কমিউনিষ্ট নেতা দুবচেকও (নিরুদ্দেশও না, মৃতও না) মস্কোয উপস্থিত হযেছেন। চেক ও সোভিযেত নেতাদেব মধ্যে ২৩শে আগস্ট থেকে ২৬শে আগস্ট পর্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ পবিবেশে আলোচনা চলাব পব মস্কো থেকে ২৭শে আগস্ট যে বিবৃতি প্রকাশিত হযেছে তাতে আবাব নতুন আশাব সঞ্চাব কবেছে। কিন্তু পথ এখনও দুর্গম, বাধাও দুস্তব। প্রতিবিপ্লবীবা এখনও

সক্রিয়। দীর্ঘ ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করেই চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

পৃথিবীর সর্বত্র গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ধ্বংসের উদ্দেশ্যে যা কিছু কার্যকলাপ তার 'নাটের গুরু' হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ইয়োরোপে তার প্রধান চেলা পশ্চিম জার্মানী। এরাই হাঙ্গেরীর মত চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্র উৎখাতের চক্রান্তে লিপ্ত ছিল এবং আছে। ট্রাজেডি হল এই যে, পশ্চিম জার্মানীতে যখন পশ্চিম জার্মান সরকারের পক্ষপুটে নাৎসীবাদ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে ঠিক তখনই চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্র বিরোধীরা কমিউনিস্টবিদ্বেষে অন্ধ হয়ে পশ্চিম জার্মানীর চক্রান্তকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

কিন্তু সাম্প্রতিক মস্কো আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রী শিবিরের চেকোশ্লোভাকিয়া নিয়ে মতদ্বৈধ ও মতানৈক্য কমে গেছে। দ্বিধাহীন ভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগই চেকোশ্লাভাকিয়ায় সমাজতন্ত্রের বিজয় অব্যাহত রাখতে পারে, মস্কো আলোচনার নির্গলিতার্থ এটাই।

বিযুক্ত স্মাবক

বিমলচন্দ্র ঘোষ

বিযুক্ত বিশাল জীবন শ্রীযুক্ত নয কেন ?
এ প্রশ্নেব উত্তব যে কেউ দিতে পাবে।
ক্যালেণ্ডাবে স্বাধীনতাব দ্বাবিংশতম স্মাবক সংখ্যা
একেব পিঠে পাঁচ
আকাশে ফাটানো আতসবাজী
বানে ভাসা খবায পোড়া রুক্ষ পিচ্ছিল অন্ধকাবে
বারুদপোড়া ছাই ছড়ায।
হিবণ্যগর্ভ জাতীযচেতনা হিবণ্যবিক্ত

আদিগন্ত বলযিত কালো ঘেবাটোপে ঢাকা
দিন কালো
সূর্যশিখা কালো
মাব কোলে সন্তানেব কচি মুখ কালো
দু-হাত দূবেব দৃশ্যও
কালোয বিলীযমান
ছাযাচ্ছন্ন যুক্ত প্রাণস্রোত।

কোনো আদর্শ-গদগদ আত্মিক উচাটনে
কিংবা কোনো বিমূর্ত প্রত্যযেব নিশ্চেষ্ট ঘোষণায
বিযুক্ত স্মাবক শ্রীযুক্ত হয না।
আত্মভুক নিঃসঙ্গতা
তারুণ্যেব কাঁচা বাঁশে ঘূণ ধবায়।
অহংকারে থ্রম্বোসিস বক্তেব গ্রন্থিতে
স্নায়ুব সঙ্গীতে বাঁধা দ্রুততাল নিঃশব্দ গিটকিবি।
অথচ সবুজেব শ্যামছাযা

কিংবা দুর্বোধ্য জীবনের বহুবর্ণ মায়া
ছানিপড়া দু-চোখের গোমেদ পাথরে
বাঁচার সাধ জাগায়।
দুর্নিরীক্ষ্য আনন্দের সন্ধানে
অতন্দ্র বিষাদ
বিশ্বরীক্ষণের ভ্রূকুটিতে নিষ্পলক।

অবিরাম জন্ম আর মৃত্যুকে
যারা অহেতুক বলে
কিংবা যারা বলে,
নিজের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জগতে আসেনি
বিযুক্ত জীবনেও তারা অহংগর্বে গর্বিত।

কালো রোদ্দুরে আদিগন্ত ঢাকা
দায়শূন্য ঊর্ধ্বনেত্র জাতীয় প্রশ্রয়ে
দুর্বার যমকোপ আজ উদ্ধত
কাককৃষ্ণ নাক্ষত্রিক রাত্রির বিমর্ষ ঘেরাটোপে।
জন্মেরও সম্মান নেই
মৃত্যুরও চরম নির্লজ্জতা
বন্যায় ভূমিকম্পে ঝড়ে।

কালোত্তীর্ণ আলোর ছিটেফোঁটাও নেই
ক্যালেণ্ডারের রক্তমাখা বিযুক্ত স্মারক সংখ্যায়।

হাজার কার্পাস ফাটে

মণীন্দ্র রায়

হাজার কার্পাস ফাটে বাগানে, এখন
খুঁজি শুধু ধুনুরীর হাত।
ঢুম্ ঢুম্ আঘাতের নিয়ত টংকার কোন্ পথে
খোঁজে বলিদান।

হে কৃষ্ণ মৃত্তিকা, ওগো জলধারা, চাষী,
কোথা সেই কঠিন সুযোগ?
তুলোর উৎসবে দিন আকাশে উড়ন্ত, ডাকো ডাকো
ধুনুরী তোমার।

ঢুম্ ঢুম্ শব্দ ওঠে মুহূর্তের গম্বুজে, সময়
কেঁপে ওঠে রাগী বিস্ফোরণে।
ছিটকায় নক্ষত্র, ওড়ে জ্যোতিষ্মান তন্তু, বুকে বুকে
এলো কি ধুনুরী।

এমন কার্পাস, আর ওই বস্ত্র। ঘটনাকে ছেনে
এ কেমন শিল্প-প্রযোজনা?
এত কাঁচামাল, এই আকাঁড়া জীবন, ধুনুরী হে,
মানুষ পাব না।

তাবপব

মঙ্গলাচবণ চট্টোপাধ্যায়

বলতে বলতে উঠে যাই, তবু বসে থাকে

ঃ ক্রমশ খবচ বাড়ছে
দাযিত্ব ইত্যাদি
জীবনধাবণ কাকে বলে হাড়ে হাড়ে
সত্যি কী বাজাব   বুঝলে
বর্ষাব কোকিল বন্ধু
অনন্ত অভয সদাশিব
সুব্রত, সে নমাস-ছমাসে
জীবন-সংগ্রাম (ক্রমে উচ্চগ্রামে)
জীবনটা বাদ দিযেই
যাকগে, বুঝে কিবা লাভ

বলতে বলতে শুনতে পাই
ঃ তাবপব ?   তাবপব কী

ঃ তাবপব ?
ধাব চাইব ভাবছিলুম

ঃ ক্ষুবধাব জীবনেব সরু তাবে
হাঁটাব ম্যাজিক কতকাল
এ-মুহূর্তে শিখীনৃত্য
পদস্খলন পবমুহূর্তেই
স্খলনেব পতনেব আতঙ্কেব দিকে পলে পলে
পাযে পাযে

শেষ পদক্ষেপ নিতে
পাযে পাযে পলে পলে

: তাবপব ? তাবপব কী

: একেক সময মনে হয
এই কথা এই গান এই মত্ত কার্নিভ্যাল
এবপবই
সমযেব ভাঁড উলটে শুকনো শাল পাতা
উডবে হলুদ শূন্যতা
ঘুবতে ঘুবতে
আলোব নাগবদোলা ঘুবতে ঘুবতে
এই মুহূর্তেব হাসি
স্তব্ধ অট্টহাসি হযে লেগে থাকবে নেপথ্যেব মুখে
এবপবই
অন্তবালে ধ্বংস ভংশ শূন্য চূর্ণ অট্টহাসি
মেশামেশি স্পষ্ট হবে
বিস্ফোবিত বিস্ফোবিত বিস্ফোবিত
হবে

বলতে বলতে উঠে যাই, তবু বসে থাকে

: তাবপব ?
: ধ্বংস
: তাবপবও ?
: ধ্বংস
: তাবপবও ?

অফিসে বাস্তায মোডে বাজাবে বিকেলে

নিঃসঙ্গ পায়চারি
সঙ্গে সেই এক
প্রশ্নের প্রলেপ-মাখা মুখ
সঙ্গে ছায়ার মতন। ছায়া
এই ট্র্যামে বাসে
ভিড়ে
একাকী ও ভিড়ে
নৈঃশব্দ্যে চিৎকারে
ভিড়ে
তারপর ভিড় থেকে নৈঃশব্দ্যে একাকী
তারপর নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে ভিড়ে
—ও আমার ছায়া
অমোঘ ধ্বংসের কথা বলতে বলতে
ভিড়ে মিশে ভিড়ও ছাড়িয়ে
অমেয় যাত্রায় সেই ছায়া
জড়িয়ে ছড়িয়ে
পাকে পাকে
ঘন হয়ে ছোট হয়ে
মধ্যাহ্নে আমার সঙ্গে মিশে যায়
ছায়ার আমি-সে।

জন্মভূমি

বীবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায

তিমিববিনাশী তুই, জন্মভূমি।
মেলাস বুকেব পদ্ম, দিঘিব কান্নাকে
শিশুব মুখেব বৌদ্রে, শান্ত
উষাব আগুনে।

বাত্রি ভোব হয
পদ্মেব পাতায, জলে। মন্ত্রগুলি
অবাক ভোবেব পাখি
আব আগুনেব বঙে বাঙা মানুষেব শোক।
জন্মভূমি,
তোব পায়ে মাথা বাখতে সাধ হয।

তোব পায়ে মাথা বেখে জেগে উঠতে সাধ হয়
ফুলেব, ফলেব,
সবুজ শস্যেব গানে ধানক্ষেতগুলি
বুকেব বসন খুলে ডাক দেয পৃথিবীব কালো,
সাদা, হলুদ শিশুকে।

তুই তিমিববিনাশী। তাই কুরুক্ষেত্রে প্রতিটি বক্তেব ফোঁটা
এমন নির্মল।

মাথার ওপর আকাশখানা

অবন্তীকুমার সান্যাল

মাথার ওপর আকাশখানা এমন ঘন নীল
নীলই ছিল, অবাক একি চোখেই দেখিনি।
কথা কথা অনেক কথা কত কথার মিল
মনেই ছিল, অবাক তবু কিছুই লিখিনি।

মনে আমার হাত বাড়াত, ঘুম কাড়াত চোখে,
এই তো সে মন, অবাক তবু ভেবেছি আর কেউ।
মনে আমার মনই ছিল, সেই যে প্রেমে শোকে
দু-পাড় ভাঙা আথাল-পাথাল পাহাড়-তোলা ঢেউ।

অবাক দেখি তেমনি আছে, তেমনি আছে গাঁথা
রৌদ্র আকাশ ঘাসের শিষে শিশির কণাটুক,
আছে আছে সোনার গাছে হীরের ডালে পাতা
মুক্তোগড়া, সন্ধ্যাসকাল, বুলেট-বেঁধা বুক।

আমি ছিলাম, আমিই আছি, আমার আমি খালি
পেরিয়ে এলো এড়িয়ে এলো ছায়াগভীর বন,
তেষ্টা-ফাটা আগুন-ছোটা তেপান্তরের বালি
মাড়িয়ে এলো, ছাড়িয়ে এলো অবাক আমার মন।

অবাক হাসি, অবাক কাঁদি অবাক ভালোবাসি।
হাতের ছোঁয়া চেনা, হাজার চোখের চেনা মিল,
চেনা আমার জীবন মরণ শরণ পাশাপাশি।

সেই তো আকাশ, অবাক অবাক, এমন ঘন নীল।

হেঁটে যাই

চিত্ত ঘোষ

আমি কোনো স্থিবতাব সড়ক জানি না ,
হে প্রেম হে প্রতিবিম্ব হে আমাব নিঃসঙ্গ চেতনা
দূবত্বেব মাপগুলো পাথবে বাঁধানো জ্ঞান ।
স্বপ্নগুলো বাজিব মতন পোড়ে ।
নির্জন বুকেব মধ্যে স্যানিটোবিযাম
মন্দিব মেঘেব চূড়া অবণ্য পর্বত নদী অন্ধকাব ভেবে,
আমি সেই নিবাসেব বাহিব প্রাঙ্গণে
আমি কোনো স্থিবতাব দৃশ্যে নেই
দৃশ্যগুলো বদলায বদলায
বযসেব বাতিগুলো জ্বেলে জ্বেলে কে যায, কে যায ।
আমি যেন এক পাথব থেকে অন্য পিছল পাথবে
আমি যেন এক সময থেকে অন্য সমযের দেহেব ভেতবে
হেঁটে যাই ।

মার্জার হত্যার উপাখ্যান

মিহিব সেন

ঘুম ভাঙ্গতে শোনে, আবাব সেই বিডাল নিযে হৈ চৈ। মলিনাব চীৎকার চেঁচামেচি থেকে পুবো ঘটনাটা পরিষ্কাব না হলেও অনুমান কবতে পাবে পবেশ, ঠিক এই মুহূর্তে মূল আসামী পুষনিব সঙ্গে পবেশ, পিউ, পিকলু এবং মলিনার ভাগ্য—একযোগে সকলেই আসামীর কাঠগডায দণ্ডায়মান। অন্যান্য দিন মা এসব সময মলিনাকে বোঝানোব চেষ্টা কবেন, আজ মা-ও মলিনাব সঙ্গে অভিন্ন মত, রোজ এ অশান্তি আর সহ্য হয় না। এবাব এ পাপ বিদায কব বাবা।

এই অপ্রীতিকব পবিস্থিতিগুলো এড়িয়ে যেতে চায় বলে পরেশ বিছানা ছাডে না। উত্তাপটা থিতিয়ে আসাব অপেক্ষায় চোখ বুজে শুয়ে থাকে।

একটু বাদেই পিউ, পিকলু বই বগলে গুটিগুটি পাযে এ ঘবে এসে পডতে বসে। বুঝতে পারে পবেশ, এ সময়ে ওবা মা-ব হাতের আওতায় থাকাটা নিরাপদ মনে কবছে না। এসব মুহূর্তে বাবাব আশ্রয়টাও যে পূর্ণ নির্ভবযোগ্য, তা নয। তবু, ওদেব শিশু অভিজ্ঞতায় ওরা এটুকু বুঝে নিযেছে যে, চবম বিপদেব মুখে পুষনি এবং ওদেব সপক্ষে মাঝে মাঝে বাবা যথাশক্তি সমর্থন নিয়ে দাঁডানোব চেষ্টা কবে।

ওদের অনুমানটাও অবশ্য মিথ্যে নয়। পিউ, পিকলুব মতো পুষনি বলতে অজ্ঞান না হলেও, বিডালটাব ওপর কিছুটা দুর্বলতা আছে পবেশেব।

ওটা তিন পুরুষ থেকে এ পবিবাবেব সঙ্গে জডিত বলেই নয়, গৃহপালিত সব জীবজন্তুব ওপবই ওব একটা মমতা আছে।

পিকলুকে এক সময় আস্তে জিজ্ঞেস কবে পবেশ, পুষনিটা কি কবেছে রে?

পিকলু চাপা গলায বলে, কাল বাতে বিছানায বমি করে বেখেছিল।

বিছানা তোলার সময় দেখতে না পেয়ে মা-র হাতে লেগে গেছে।

পরেশ আস্তে জিজ্ঞেস করে, পুষনিটা কোথায় ?

পিউ ফিসফিস করে বলে, দেখছি না তো ! বোধহয় পালিয়ে গেছে।

বিড়ালটার হাবভাব দেখে মাঝে মাঝে অবাক হয় পরেশ। ও কি করে যেন পরিস্থিতিগুলো বুঝতে পারে। তাছাড়া, ও যেন বুঝে নিয়েছে, এ বাড়ির ঐ একটি মাত্র মানুষের অবহেলা বা বিরূপতা মানিয়ে চলতে পারলে এ বাড়িতে ওর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। আবহাওয়া গোলমেলে ঠেকলেই তাই কেটে পড়ে। পরিস্থিতিটা ফের নির্ভরযোগ্য মনে হলেই নিঃশব্দ পায়ে ফিরে আসে আবার। নিরাসক্ত মুখে বাড়িময় ঘুরে বেড়ায়। পায় পায় ঘুরে আদর কাড়ায়।

ঘড়িতে ছ-টা বাজায় আর বেশিক্ষণ বিছানার আড়াল নিয়ে থাকা সম্ভব হয় না পরেশের পক্ষে। বাজার যেতে আর দেরি করলে সময় মত অফিসে যেতে পারবে না। তার ওপর অফিসে যে রকম গোলমাল চলছে।

কলতলায় আসতেই মলিনার মুখোমুখি। তোষক বালিশ বাদে গোটা বিছানাই প্রায় কলতলায় এনে ফেলেছে।

পরেশকে দেখে নতুন করে রাগটা উস্কে ওঠে ওর। পরেশই যেন এ সবের জন্য দায়ী। প্রধান আসামী। এক তরফা মুখে যা এল তাই বলে বকে গেল ও পরেশকে।

পরেশ নিঃশব্দে শুনে যায় সব। জানে, এ সময় যে কোনো কথা, সে ওর পক্ষে বা বিপক্ষে যাই হোক না কেন, আরো ঘৃতাহুতির কাজ করবে। কিন্তু মনটা এতে বিসিয়ে যায়। ঘরে বাইরে এত ঝামেলা আর সহ্য হয় না আজ-কাল। এমনিতেই তো জীবনের সর্বক্ষেত্রে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। অসহায় সহনশীলতায় সব কিছু মেনে নিতে হচ্ছে। তার ওপর এই অহেতুক বাড়তি ঝামেলা আর কাঁহাতক ভালো লাগে !

তা ছাড়া, আজকাল নিজেও বুঝতে পারে পরেশ, আগের সে ধৈর্য আর নেই ওর। সব কিছু মানিয়ে নেওয়ার, সয়ে যাবার অটুট ধৈর্য দেখে এক সময় দিদিরাও বলত, তুই কি অনুভূতিশূন্য, না গৃহী সন্ন্যাসী।

আগে এই উক্তিগুলোকে প্রশংসাপত্র হিসাবে গ্রহণ করে আত্মতৃপ্তি বোধ করত। ও জানত, অনুভূতিশূন্য ও নয়' ববং অনেক ক্ষেত্রেই ওর অনুভূতিগুলো অন্যের চেয়ে অনেক প্রখর। যেটা ওর গুণ, সেটা অটুট ধৈর্য।

সহজাত যে গুণটাকে চেষ্টার মাধ্যমে আরো শক্ত করে নিয়েছিল।

কিন্তু এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, সেটাই ওর জীবনে আজ সবচেয়ে বড় অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবাই যেন ধরে নিয়েছে—আঘাত করতে হলে, নিজেদের মনের সঞ্চিত ক্ষোভ গ্লানি কারো ওপর নিক্ষেপ করে সাময়িক শান্তি পেতে হলে, এই লোকটিই একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু একটা জিনিস কেউ বুঝতে চায় না, লোকের ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। এবং দীর্ঘ অবরুদ্ধ ধৈর্যের বাঁধ যখন ভাঙ্গে, তখন তা মাঝে মাঝে অকল্পনীয় বিপর্যয় ঘটিয়ে বসতে পারে।

বাজারের থলিটা নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় পরেশ আড় চোখে একবার বিড়ালটাকে খোঁজে। খুঁজে পেলে এ অশান্তি আজই ও বিদায় করে দিয়ে আসবে। পিউ, পিকলু দু-দিন কাঁদবে হয়তো, তারপর ওরাও ভুলে যাবে।

কিন্তু বিড়ালটা চোখে পড়ল না। নির্ঘাৎ অন্য কোনো বাড়ি গিয়ে বসে আছে, এ বেলায় আর ফিরছে না। যা ত্যাঁদড় ওটা!

এমনিতেই বাজারের কথা ভাবলে আজকাল মন খিঁচড়ে যায় পরেশের। ভীড়, দাম, দুটোর কথা ভেবেই। আজ যেন বাজারে আরো ভীড়। জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য। মাছের দাম শুনে হঠাৎ মাথায় রক্ত উঠে যায় পরেশের। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, তোমরা পেয়েছ কি? তোমাদের মর্জি মতো দাম বাড়ালেই হলো?

মাছওয়ালা আর একজনের দু-কিলো মাছ ওজন করতে করতে, কাঁটায় চোখ রেখেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, না পোষায় সরে যান। আপনাকে মাথার দিব্বি দিয়েছে কেউ কেনার জন্য?

সরে যান কথাটায় দারুণ অপমানিত বোধ করে পরেশ। রিরি করে ওঠে গোটা শরীর। পাশের এক ভদ্রলোক সখেদে বলেন, এমনিতেই রক্ষে নেই, তার ওপর আজ জামাইষষ্ঠী। ডবল দাম হাঁকলেও সব মাছ উঠে যাবে।

কিন্তু পরেশের তখন সেদিকে কান ছিল না। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারল না ও। দাঁতে দাঁত চেপে মাছওয়ালাকে বলল, একটু ভদ্রভাবে কথা বলতে পারো না?

লোকটা এবার পরেশের দিকে ফিরে তাকায়। চোখ দুটো রাত জাগায় লাল টকটক করছে। আগের চেয়েও অভদ্র ভঙ্গিতে জবাব দেয় এবার, যান যান দাদা, যেখানে পোষায় সেখানে গিয়ে কিনুন। এখানে ভদ্রতা শেখাতে

এসে ডিসটার্ব করবেন না।

আচমকা ॰চীৎকাব কবে ওঠে পবেশ, শাট আপ। ক্রেতাব গলা কেটে দুটো পযসা কবে সাপেব পাঁচ পা দেখেছ, না? দমদম দাওযাই তোমাদের আসল ওষুধ, বুঝলে?

মাছওয়ালা এবার ঘুবে বসল। দেখতে দেখতে লোক জমে গেল চাব পাশে। ক্রেতাবাও পক্ষে বিপক্ষে জডিযে পডে আবো জটিল কবে ফেলল পবিস্থিতিটাকে। কি কবে কি ঘটে গেল ঠিক বুঝতে পাবল না পরেশ। খেয়াল হলো বিশৃঙ্খল পবিস্থিতিটা থেকে কয়েকজন ওকে জডিয়ে ধবে বের করে আনাব পব।

একজন সান্ত্বনাব স্থবে বলছিল, মেজাজ খাবাপ করে কি কববেন দাদা, বলুন? পডে পডে মার খাওয়া ছাডা আমাদের কিস্সু কবার নেই। হৈ চৈ কবা মানে নিজেদেবই অশান্তি বাডানো।

আব একজন বললেন, দোষটা অবশ্য আমাদেরও কম নয়। সবাই যদি একজোট হযে আমবা একদিন কেনা বন্ধ বাখি, একদিনে ওদেব টাইট কবে দেওয়া যায়। কিন্তু যত দামই হাঁকুক, একটা মাছও পডে থাকে? কেমন হামলে প'ডে সব কিনে নিয়ে যাচ্ছে দেখছেন না?

আচমকা এবকম একটা নাটকীয় ঘটনাব কেন্দ্র হয়ে পডায সঙ্কোচে এবাব নিজেব ভেতবই গুটিয়ে আসে পরেশ। জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত হতে ওর একটা সহজাত সঙ্কোচ আছে। কাবো কথাব কোনো জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে সবে আসে তাই। তরিতবকাবীর দোকানের দিকে পা বাডিয়ে ভীডে মিশে যায়।

কিন্তু ফেবাব পথেও কিছুতেই ঘটনাটা মন থেকে ঝেডে ফেলতে পাবে না। বাগ, ক্ষোভ, অপমানে মনটা বিবি করতে থাকে। সত্যিই কি অসহায় অবস্থা। দেশে যেন শাসন বলে কিছু নেই। শাসক বলে কেউ নেই। ব্যবসায়ীবা—ছোট হোক, বড হোক, যাব যখন যেমন খুশি দাম বাডাবে। যখন যা খুশি বাজাব থেকে উধাও কবে দেবে। কিন্তু তাব কোনো প্রতিকার নেই।

প্রতিকাব কে করবে? এই ব্যবসায়ীদেব কাছে সরকারও যেন ক্রেতাদেব মতোই অসহায়। মাঝে মাঝে ধমক ও শাসানি ছাডা তাদের করণীয় কিছু নেই যেন। শুধু কি দাম? একটা গোটা জাতকে ভেজালেব ভেতব ঠেলে দিয়ে

বিকলাঙ্গ পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে, সরকার অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে তাও তো দেখে যাচ্ছে।

পরেশ জানে কেন। এই ব্যবসায়ীদের জোরটা কোথায় ও জানে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই একটা হিসেব পেয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি থেকে, হিসেবটা মনে আছে ওর। এখানকার ব্যবসায়ীরা দুশ কোটি টাকা ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেয়। আর সেল ট্যাক্স ফাঁকি দেয় কুড়ি কোটি টাকা। একবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারীও গোটা দেশের একটা হিসেব দিয়েছিলেন। তাঁর হিসেব মতো গোটা দেশে প্রায় এক শ হাজার কোটি কালো টাকা দেশময় উড়ে বেড়াচ্ছে। ভুবনেশ্বর কংগ্রেস অধিবেশনেই বোধহয় বিজু পট্টনায়ক বলেছিলেন, কালো টাকার জোরে ব্যবসায়ীরা রীতিমতো একটা সমান্তরাল সরকার চালাচ্ছে এ দেশে।

এ অবশ্য বড় ব্যবসায়ীদের ব্যাপার, এসব চুনো পুঁটিরা তার ভেতর পড়ে না। কিন্তু সরকার সমেত ক্রেতাদের অসহায়ত্বের মূল কারণটা লুকিয়ে আছে ওখানেই, এ বিষয়ে নিশ্চিত পরেশ। কিন্তু ওর অসহ্য লাগে তখন, যখন সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে ক্রেতারা দুএক সময় প্রতিরোধে এগিয়ে এলে, এই সরকারই আইন-শৃঙ্খলার নামে দু-দলের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড ক্ষোভে, দুঃখে হাসি পায় পরেশের। এ যেন আততায়ীর আক্রমণের মুখে আক্রান্তর হাত-পা চেপে ধরে তাকে আদালতের অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

বাড়ির মুখে এসে খেয়াল হয় পরেশের, এতটা পথ ও অন্যমনস্কতায় পেরিয়ে এসেছে। মনটা খিঁচড়ে যায় ওর। এসব কথা মনে পড়লেই মনটা কেমন যেন বিষিয়ে ওঠে। তার চেয়ে এই আড়াল-কথাগুলো যেন না জানাই ভালো। জানলেই যন্ত্রণা।

বাজার রেখে ঘরে এসে দেখে খাটের তলে গুঁড়িসুড়ি মেরে শুয়ে আছে বিড়ালটা। মনে মনে শঙ্কিত হয় পরেশ। মলিনার চোখে পড়লেই আর এক কুরুক্ষেত্র শুরু হবে। অথচ ওটাকে তাড়াতেও ভয় পায়। তাতে হয়তো আরো তাড়াতাড়ি ওটাকে মলিনার দৃষ্টিতে এনে ফেলা হবে। কি করবে ঠিক বুঝতে পারে না।

ওর এই দোদুল্যমানতার মুখে মলিনা ঘরে আসে। থমথমে মুখে জানায়, একটু আগে মোহিতবাবু এসেছিলেন। তারপর একটু থেমে বলে, মাসে মাসে অন্তত দশটা টাকা করেও কি শোধ করে দিতে পারো না তুমি? তোমার

গণ্ডারের চামড়া হতে পারে, কিন্তু ভদ্রলোকের এই ঘনঘন তাগাদায় আসাটা আমার খুব বিশ্রী লাগে।

মলিনার কথার ঢংটা খারাপ লাগে পরেশের। পাওনাদারের ঘনঘন তাগাদাটা যেন ওরই খুব ভালো লাগে। কিছুটা শ্লেষের সঙ্গে বলে তাই পারি না কেন, তা নিজে বোঝো না?

মলিনা বলে, আমার বোঝা না বোঝায় কি এসে যায়। কিন্তু ধার যখন করেছ, শোধ তো করতেই হবে। লোকে ঠেকলে পরে তো আয় বাড়ানোর চেষ্টাও করে। তোমার মতো হাত পা ছেড়ে বসে থাকে ক-জন?

বড় বড় পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মলিনা। ও জানে শরটা সঠিক জায়গায়ই বিদ্ধ হয়েছে।

পরেশ মনে মনে ফুঁসতে থাকে। ওর এই অক্ষমতায় কেউ না জেনে আঘাত করলেও তাকে ক্ষমা করতে পারে না ও। এই অক্ষমতার জন্য ওর নিজের ক্ষোভও কম নয়। রাজনীতির খেলায় দেশভাগ না হলে স্কুল ছাড়ার পরই এভাবে সংসারে জড়িয়ে পড়তে হত না ওর। নেহাৎ বাবার বন্ধুর পায়ে তেল মাখিয়ে সেদিন এই কেরানির চাকরিটা পেয়েছিল বলে। না হলে হয়তো এই সামান্য বিদ্যেটুকুর জোরে বাঁচার মতো অন্নসংস্থানও করতে পারত না। কিন্তু সেই সামান্য বিদ্যেটুকুর মূলধন নিয়ে এই প্রতিযোগিতার বাজারে আয় বাড়ানোর ভদ্র কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যে সম্ভব নয়, সে কথা কি বোঝে না মলিনা? হয়তো অন্য কিছু চোরাগোপ্তা পথও আছে, কিন্তু সে পথে পা বাড়াতে কোথায় যেন বাধে ওর। বোঝেনা—সংস্কার, না বিবেক?

আচমকা রান্নাঘরের দিক থেকে একটা ঝনঝন শব্দ আর হৈ চৈ শুনে ছুটে যায় পরেশ। কেউ পড়ে-টড়ে গেল না তো?

গিয়ে দেখে ডালের কড়াইটা উনুন থেকে উল্টে নিচে পড়ে আছে। চারদিকে গরম ডাল গড়িয়ে যাচ্ছে। কড়াইটার পাশে কয়লা ভাঙার হাতুড়িটা প'ড়ে। দরজার কাছে সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মলিনা। আর মা ওকে বকছে, তুমি যে করে বিড়ালটাকে খুন করে বসবে বৌমা! বলি, রাগ-ঘেন্নারও তো একটা মাত্রা থাকবে। বেড়াল দেখলে এমন পাগলের মতো হয়ে যেতে তো আমি সাতজন্মে দেখিনি কাউকে।

আন্দাজেই বুঝতে পারে পরেশ, পরিস্থিতি বিচারে কিছু ভুল হওয়ায় পুষনিটা কখন যেন বেরিয়ে রান্না ঘরে চলে এসেছিল। কয়লা ভাঙতে ভাঙতে

হঠাৎ চোখে পড়ায় হাতুড়ীটা ছুঁড়ে মেরেছিল ওকে মলিনা।

নিঃশব্দে নিজের ঘরে ফিরে আসে আবার। মলিনার এ ব্যাপারটাকে ওরও স্রেফ পাগলামি বলে মনে হয়। বিড়ালের ওপর বরাবরই কেমন যেন একটা জাতক্রোধ আছে মলিনার। কিন্তু ক্রমেই যেন সেটা একটা মানসিক রোগে এসে দাঁড়াচ্ছে।

মনে মনে ঠিক করে ফেলে পরেশ, এবার ও আপদটাকে বিদায় করতে হবে। সত্যিই কোনোদিন চোখের ওপর একটা খুনখারাপি ঘটে গেলে এক কেলেঙ্কারির ভেতর পড়তে হবে তাছাড়া আজকাল প্রায়ই বিড়ালের ওপর রাগটা মলিনা পরেশের ওপরও ঝাড়তে শুরু করেছে। এমনিতেই অশান্তির শেষ নেই, তার ওপর এই বাড়তি অশান্তি আর ভালো লাগে না।

একটু পরেই সাইরেনের ভোঁ শুনে স্নান করতে যায় পরেশ। অনেকদিন হয় ঘড়িটা খারাপ হয়ে আছে। কোনো মাসেই সাহস করে সারাতে দিতে পারছে না। একটা না একটা বাড়তি খরচ লেগেই আছে। তবু বাঁচোয়া, রোজ এই সাইরেনটা বাজে বলে। অন্তত এই একটি উপকার করার জন্য মাঝে মাঝে সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে হয় ওর। না হলে বোধহয় রোজই ট্রেন ফেল করতে হতো।

দৌড়-ঝাঁপ করে খেয়ে দেয়ে স্টেশনে এসে দেখে প্লাটফর্ম লোকে গিস্ গিস্ করছে। হেতু ট্রেন লেট। আগের ট্রেনটাই নাকি এখনও আসে নি।

মনটা আবার বিষিয়ে যায় পরেশের। নিত্য-নৈমিত্তিক এই ট্রেনের গোলমালগুলো আর ভালো লাগে না। এমনিতেই এই ডেইলিপ্যাসেঞ্জারি এক নরকযন্ত্রণা বিশেষ। জন্তু-জানোয়ারের মতো বোঝাই গাড়িগুলোর অবস্থা দেখে মাঝে মাঝে ভুলে যেতে হয় যে স্বাধীন সভ্য দেশের স্বাভাবিক সময়ের যাত্রী ওরা। যুদ্ধের সিনেমায় দেখা বন্দী ইহুদী বোঝাই গাড়ীগুলোর কথা মনে পড়ে।

অথচ মজা, এর কোনো প্রতিকারও নেই। শুধু এই ক্ষেত্রেই নয়, সাম্প্রতিক যে কোনো জায়গার যে কোনো বিশৃঙ্খলার জন্য যাঁর কাছেই জবাবদিহি চাওয়া যাক, তিনিই নিরাসক্ত মুখে উর্ধ্ববর্তী কাউকে দেখিয়ে দেবেন। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় পরেশের, ধৈর্য ধরে শেষপর্যন্ত এগোলে শেষতম ব্যক্তিও নিরাসক্ত মুখে যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করবেন, তিনি উর্ধ্বস্থিত নিরাকার ব্রহ্ম।

স্টেশন মাস্টারেব ঘবেব সামনে আবহাওযা ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। ট্রেনটা ইতিমধ্যে না এসে পডলে শেষ পবিণতিটাও অনুমান করতে পারে পরেশ। যাত্রীদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ শেষপর্যন্ত ফেটে পডবে, এ গোলমালেব জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নয়, এমন কিছু সহজলভ্য কর্মচারীর ওপর। মাঝে মাঝে ভেবে লজ্জিত হয় পরেশ, আজকাল এসব ক্ষেত্রে অহেতুক প্রহৃত লোকগুলোব ওপবও কেন যেন আন্তবিক সহানুভূতি অনুভব কবে না ও। বরং উল্টে ভাবে, প্রত্যক্ষভাবে জড়িত দাযী লোকগুলোকে খুঁজে না পেলে জীবনেব সর্বক্ষেত্রে জর্জবিত লোকগুলোই বা কী কববে? কোথায় প্রতিবাদ জানাবে? কার ওপর শোধ তুলবে? মাঝে মাঝে ধৈর্যেব শেষসীমায় পৌছলে ওব নিজেবও ঐ উচ্ছৃঙ্খলতায় মিশে গিযে কিছু কবাব জন্য হাত নিশপিশ কবে। কিন্তু সংস্কাবে, রুচিতে বাধে বলে পাবে না। পারে না বলে যন্ত্রণা আবো বাড়ে। অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিবির মতো ভেতবে জ্বলে খাক হতে থাকে।

ট্রেনটা এল আবো আধ ঘণ্টা বাদে। এতক্ষণ অনিযমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভব্রত একতাবদ্ধ লোকগুলোর ভেতব মুহূর্তে প্রচণ্ড লডাই শুরু হযে যায় গাড়িতে পা রাখার জন্য। শক্তিমানবা গায়ের জোব প্রযোগ করছে। দুর্বল বা বিনয়ীরা দবজায দবজায় কাতব প্রার্থনা নিযে ছুটোছুটি কবছে, দাদা, একটা পা বাখাব জায়গা দিন দয়া কবে। কোনো রকমে একটা মাত্র পা বাখার জায়গা।

এই আকুল প্রার্থনাব সামনে দাঁডিয়ে অনেক সময় মনে হয পরেশের, গাড়িটা যেন কখন গোটা দেশ হযে গেছে। দেশেব সর্বত্র আজ দুর্বল ভদ্র বিবেকবানদের এই একই আর্তি, একটু পা রাখাব জাযগা দিন। স্বস্তিতে দাঁডানো নয়, বসা নয়, শোয়া নয়—অনিবার্য পতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য দয়া করে একটু পা বাখাব জাযগা দিন।

পবেশ কোনো রকমে ডান পাযেব আঙ্গুলকটা ঠেকানোব মতো একটু জায়গা পেযে যায়। গাড়িটা ছাডাব আগে ভেবেছিল, ঠিকই আছে। কিন্তু গাড়িটা ছাড়াব পর অনুভব কবে ও, এভাবে বিস্ক নেওযাটা ভুল হয়ে গেছে। ঐ কটা আঙ্গুলেব ওপব কিছুতেই বাইবে ঝুলে পড়া দেহেব ভব ঠিক বাখতে পাবছে না। দবজাব মাথাটা শক্ত কবে ধবা মুঠটা ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছে। হাতটা ছিঁড়ে পডছে যেন। বাধ্য হযে পাশের ভদ্রলোককে অনুবোধ জানাতে হয়, ইঞ্চিখানেক একটু সবে যাবেন দাদা। ভদ্রলোক খেঁকিয়ে ওঠেন, কোথায় সবব

বলুন না। ভেতরে এক ইঞ্চি ফাঁকও চোখে পড়ছে ?

সামনের ভদ্রলোক বোধহয় অনুমান করতে পারেন পরেশের অবস্থাটা। অনেক চেষ্টায় নিজের পা সামান্য সরিয়ে পরেশকে গোটা পা-টা রাখতে সাহায্য করেন।

একটা নৈর্ব্যক্তিক ক্ষোভে রাগে মনটা খিঁচড়ে থাকে পরেশের। এসব মুহূর্তে মাঝে মাঝে ট্রেন থেকে পড়ে মারা যাওয়া লোকদের দেখে ঈর্ষা হয় ওর। মনে হয়, ওরা বেঁচে গেল। এ যুগে বিরল, বহু লোকের সহানুভূতি কেড়ে নিয়ে দিব্বি ড্যাং ড্যাং করে সব সমস্যা আর যন্ত্রণার বাইরে চলে গেল !

শিয়ালদায় পৌঁছেও তিন-চারটে বাস ছেড়ে দিতে হলো পরেশের। উঠতে পারল না। মনে মনে শঙ্কিত হয় এবার। অফিসের আবহাওয়াটা কিছু দিন থেকেই খারাপ চলছে। প্রতি মুহূর্তে কর্তাদের মন জুগিয়ে চলতে হচ্ছে। তার ভেতর এ রকম বিসদৃশ লেট মাথায় নিয়ে অফিসে ঢোকার কথা ভাবতেই আতঙ্কে বুক শুকিয়ে যায় ওর।

এই আতঙ্কই যেন পরবর্তী বাসটায় অভদ্রভাবে ধাক্কিয়ে তুলে দেয় পরেশকে। গেটের মুখের কটূক্তি ও গালাগালগুলোকে ওর গায়ে বিঁধতে দেয় না। ওকে ঠেলে একেবারে বাসের মাঝখানে এনে ফেলে। এলোমেলো হয়ে যাওয়া চুলগুলোকে হাত দিয়ে একবার ঠিক করে নেয় ও। আড় চোখে পাশের রড ধরে থাকা একটা হাত থেকে সময় দেখে নেয়। সময়টা ওর আতঙ্ক আরো বাড়িয়ে দেয়।

এতক্ষণে খেয়াল হয় পরেশের, গাড়ির ও প্রান্তে দুই ভদ্রলোকের ভেতর কি নিয়ে যেন তুমুল তর্ক চলছে। প্রথমে ভেবেছিল বোধহয় জায়গা নিয়ে, বা কেউ না দেখে কারো পা মাড়িয়ে দেওয়ায়। কিন্তু কাটা কাটা ক-টা কথা কানে আসতে মনোযোগী হয় পরেশ। ভদ্রলোক দুজন দেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে তর্ক করছেন।

বর্তমানে যিনি বক্তার ভূমিকায়, বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা তাঁর। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। প্রতিপক্ষের কোনো একটি উক্তির উত্তরে ভদ্রলোক উষ্মার সঙ্গে বলছিলেন, ওসব ছেঁদো কথা ছেড়ে দিন মশায়। রাষ্ট্রের শৈশব দেখিয়ে আপনি কতদিন লোককে ঠাণ্ডা রাখবেন। সাধারণ লোক অত রাজনীতি-ফিতি বোঝে না। তাদের কাছে সবচেয়ে বড় যুক্তি রুটি। সেই রুটি দিয়েই বিচার করুন না দেশের অবস্থাটা। পার্লামেন্টে বিরোধী পক্ষ দাবি করেছিল

দেশেব শতকবা ষাটজন লোকেব দৈনিক আয তিন আনা। পবিকল্পনা মন্ত্রী উত্তরে বলেছিলেন, ঠিক তা নয়, তাদেব দৈনিক ব্যয় সাত আনা কবে। ভাবত-বর্ষের শতকবা সত্তর জনেব বেশি কৃষক বা কৃষিকাজেব ওপব নির্ভবশীল। সেই কৃষক পরিবাবগুলোব অবস্থা জানেন? শতকবা তেত্রিশটি পবিবাবেব গডপডতা দৈনিক আয মাত্র দু-টাকা। যদি পাঁচজন কবেও একটা পবিবাব ধরি, মুখে মুখে দৈনিক দু-টাকাব একটা বাজেট করুন তো?

প্রতিপক্ষ এই সম্মুখ আক্রমণে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেন যেন। আমতা আমতা করে বলেন, কিন্তু বন্যাব তোড়েব মতো দেশের জনসংখ্যাটা কি রকম হারে বাডছে সেটাও দেখবেন তো।

ভদ্রলোক সামান্য শ্লেষের সঙ্গে বললেন, উল্টো দিক দিযে বিচাব কবলে জনশক্তি দেশেব একটা সম্পদও সে শক্তিকে আমরা কাজে লাগাতে পেরেছি? আপনি জানেন, এখনও এদেশে দশ থেকে পনেব কোটি একর জমি অনাবাদী পডে আছে? দেশের সমৃদ্ধিব জন্য একটা করে পবিকল্পনা কবছি আমবা, আব দেশেব বেকার সংখ্যা ততই বাডছে, জানেন সেটা? আমবা তৃতীয় পবিকল্পনাব যাত্রা শুরু কবেছিলাম নব্বই লক্ষ কর্মক্ষম বেকার নিয়ে। আধা-বেকাবীর সংখ্যা যোগ কবলে সংখ্যাটা গিযে দাঁডায় এক কোটি আশি লক্ষে। বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা কর্জ করে আব দেশেব লোককে কর-ভাবে জর্জবিত কবে যতই আমবা সমৃদ্ধ হবার জন্য বিভিন্ন পবিকল্পনায় টাকা ঢালছি, দেশেব দুর্দশাও ততই বাডছে। সেদিনই শিক্ষাক্ষেত্রেব একটা হিসেব দেখে অবাক হলাম। স্বাধীনতা পাওযাব চাব বছর পব দেশে নিবক্ষবেব সংখ্যা ছিল বাইশ কোটি। দশ বছব পব তা কমাব বদলে বেডে দাডিয়েছে তেত্রিশ কোটিতে। এনি কমেণ্ট?

প্রতিপক্ষ সামান্য চুপসে যান এবাব। তাঁব বিশ্বাসের সমর্থনে স্মৃতিব সীমানায় উপযুক্ত পবিসংখ্যানেব অভাবেই হযতো। তবু, এত লোকের সামনে এভাবে কোণঠাসা হয়ে পডায বলেন, দেখুন, উদ্ধৃতি আব পবিসংখ্যান, দুটোই কিছুটা প্রোভার্ব-এব মতো, শুনতে মিষ্টি, কিন্তু যুক্তি নয়।

আগেব ভদ্রলোক হেসে ফেলেন। বলেন, সে জন্যই তো আগেই আমি বলেছিলাম সাধারণ মানুষেব কাছে আসল যুক্তি তাব পেট। স্বাধীনতা পাওয়াব পব জাতীয় আয় বেডেছে তা তো আমিও অস্বীকাব কবছি না। কিন্তু সেই আয়েব বণ্টনটা কি সমান ভাবে বেডেছে? আমাব স্পষ্ট মনে আছে,

পণ্ডিত নেহরু একবার পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে সখেদে বলেছিলেন, জাতীয় আয় এত বাড়ার পরও যদি মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ লোক তার ফল ভোগ করে, আর পঁচানব্বই ভাগ লোক বঞ্চিত হয়, তাহলে ফলাফল খুব ভালো হয়েছে বলা চলে না। কাজেই স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীই যখন ফলাফল ভালো হয়নি স্বীকার করছেন, তখন আমাদের সেটা স্বীকার করে নিতে আপত্তি কি? কিন্তু তার চেয়েও চিন্তার ব্যাপার কি জানেন? ফলাফলটা বর্তমানে এমন এক বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে যে এখনই সাবধান না হলে গোটা দেশ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

ভদ্রলোকের শেষের কথাগুলো ত্রিকালদর্শী তান্ত্রিকের অভিশাপের মতো উচ্চারিত হয়। কেমন যেন ভয় ভয় করে পরেশের।

পাশে দুটি হালের যুবক দাঁড়িয়ে ছিল। একজন বলল, ভাষণ-দাদাটি হয় সাংবাদিক, না হয় রাজনীতি করা লোক। হিসেবগুলো কেমন ঠোঁটস্থ দেখছিস?

দ্বিতীয় জন ব্যঙ্গের সুরে বলে, ট্রাম-বাসের স্ট্যাটিসটিকসের কোনো মা-বাপ আছে নাকি? তুই যা খুশি বলে যা না, কে মিলিয়ে দেখতে যাচ্ছে। শুধু স্মার্টলি বলতে পারলেই হলো।

ওদের কথার ভঙ্গি খারাপ লাগে পরেশের। এ যুগের ছেলেদের এই সব-কিছু নস্যাৎ করে দেবার মনোভাবটা সহ্য করতে পারে না ও। পরেশের ঠিক পাশেই দাঁড়ানো এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক গভীর মনোযোগে এতক্ষণ আগের তর্কটা শুনছিলেন। যুবকটির দিকে ফিরে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের আজ-কাল কারো ওপরেই শ্রদ্ধা নেই, না?

যুবকদের একজন সোজা বৃদ্ধের চোখে চোখ রেখে বলল, আস্থাও নেই।

যুবকটির স্বরে দৃঢ় প্রত্যয়। বৃদ্ধ স্তিমিত স্বরে বলেন, সেটা কি খুব ভালো? এ দেশটা কি তোমাদেরই নয়?

দ্বিতীয় জন সামান্য তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, সেটা এ্যাকসিডেণ্টালি। ঈশ্বর-ফিশ্বরে বিশ্বাস নেই, তবু ঈশ্বর নিচে ফেলার সময় হাতটা আর একটু স্যুইং করলে অন্য দেশে গিয়েও জন্মাতে পারতাম।

অন্য এক ভদ্রলোক কৌতুকের সুরে বললেন, কিন্তু জন্মেই যখন পড়েছ, তখন—

তাঁর কথার মাঝখানেই প্রথম জন বেপরোয়া ভঙ্গিতে জবাব দিলো, সেটার

পিছেও আমাদের কোনো ইচ্ছে-অনিচ্ছের প্রশ্ন ছিল না। জীবনের কাছ থেকে কিস্‌সু পাইনি আমরা, সুতরাং বিনিময়ে কিছু দেবার প্রশ্নও আসেনা। বাঁচা নিয়ে কথা, যে যেভাবে পারেন বেঁচে যান না।

কথা বলতে বলতেই নেমে যায় ওরা। ওদের স্টপেজ এসে গেছে। বাসের বয়স্ক যাত্রীরা কেউ ক্ষুব্ধ, কেউ বিস্মিত, বোঝে পরেশ। আস্তে বলে, এদের দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। এ জেনারেশনটার জন্মই প্রায় শেয়ালদার প্লাট-ফর্মে, চূড়ান্ত অবহেলার ভেতর। এদের কাছে সুস্থ চিন্তা আশা করাটাও অন্যায়।

পূর্ববর্তী তর্কের সেই পুরু লেন্সের চশমা চোখে ভদ্রলোক ওপ্রান্ত থেকে আপত্তি জানান। কিন্তু ওঁর বক্তব্য শোনার কৌতূহল ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও নেমে যেতে হয় পরেশের। হঠাৎ খেয়াল হলো ওর, অফিসের স্টপ এসে গেছে।

অফিসের দিকে এগোতে এগোতে ভাবে পরেশ, পথে ঘাটে, বাড়িতে, দেশে উৎসাহিত হবার মতো, খুশি হবার মতো একটি ঘটনাও কি ঘটে না আজকাল!

অফিসে পা দিয়ে দেখে অফিস উত্তেজনায় টালমাটাল। এত দিনের উড়ো সংবাদটা আজ, গোপন পথে এলেও, সঠিক সংবাদ হিসেবে বাইরে এসেছে। অফিসে ছাঁটাই হচ্ছে। কর্তাদের নিভৃত টেবিলে প্রথম তালিকা প্রস্তুতির পথে।

সংবাদটা আচমকা নয়, কিছু দিন থেকেই মুখে মুখে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু তার প্রত্যক্ষ রূপটা যে এমন ভয়ঙ্কর, ধারণা ছিল না পরেশের। সমস্ত শরীর কেমন যেন শিথিল হয়ে আসে। পুরো চেতনা দিয়ে ঘটনাকে পর্যালোচনা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। যেন সম্মোহিত, এমন ভঙ্গিতে নিঃশব্দে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে।

কর্মচারীদের ভিতর তখন দুটো মত। এক দল বলছে, ছাঁটাই রুখতে হলে এখনই ইউনিয়নের ধর্মঘটের পথে এগিয়ে যাওয়া উচিত। অন্য দলের মতে সেটা মালিকপক্ষের হাতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার একটা হাতিয়ার যুগিয়ে দেওয়া হবে। বরং সংবাদের সত্যতার জন্য অপেক্ষা করা উচিত।

পরেশের সেটাই ভালো মনে হয়। প্রথম তালিকায় নাম না থাকলে বর্তমানের মতো বাঁচার সেটাই শেষ আশা। ওর চাকরি না থাকা অবস্থাটা ভাবতে পারছে না ও। চোখের সামনে কেমন যেন সব অন্ধকার হয়ে আসছে।

তালু শুকিয়ে আসছে।

বাড়ি ফেবাব পথে গোটা পথটা যেন একটা আবছা চেতনায় পাব হয়ে আসে পবেশ। যেদিন প্রথম দেশ ভাগ হবাব সংবাদ পায়, সেদিনেব কথাটা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সেদিন পদ্মার দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল, গোটা পদ্মা যেন ভয়ঙ্কব পাহাড়-সমান ঢেউয়েব ফনা তুলে গর্জন কবতে কবতে ওব দিকে এগিয়ে আসছে। আজ গঙ্গায় সেই গর্জনের শব্দ শুনতে পায় যেন আবাব।

বাড়িতে ঢোকাব মুখে বাস্তা থেকেই শুনতে পায় কি নিয়ে যেন তুমুল হৈ চৈ হচ্ছে বাড়িতে। মলিনা আব মা দুজনেব গলাই সপ্তমে ভয়ে ভয়ে বাড়ি ঢোকে পবেশ।

ওকে দেখতে পেয়ে মা প্রায় ছুটে আসেন। কান্নায় ভেঙ্গে পড়া গলায় বলেন, বোজ আব এ অশান্তি সহ্য হয় না পবেশ। হয় ঐ আপদ বিদায় কব, নাহয় আমাকে কাশী বেখে আয়

গম্ভীব স্ববে জিজ্ঞেস করে পরেশ, কি হয়েছে?

মলিনা ঝঙ্কাব দিয়ে ওঠে, নতুন করে আব কি হবে? তোমাব পেয়াবেব পুষনি শনি পূজোব সব দুধ ঢাকনা ফেলে খেয়ে গেছে। নাও, আবো আদব কবে লেপেব তলে নিয়ে গিয়ে শুয়ে থাকো গে।

আচমকা পবেশেব ভেতব কী যেন ঘটে যায়। পাথবেব মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তাবপব ছাতাটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বেখে গলাব সব জোর একত্র কবে ডাকে, আয় আয় আয়, পুষনি আয়।

মা ওব চোখেব দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ভয় পান। ওব গলাব স্ববে মনে মনে সামান্য চমকায় মলিনা। স্তিমিত স্ববে বলে, ওটাকে আবাব ডাকছ কেন?

উল্টো দিকের বাড়ি থেকে পুষনি তখন রাস্তা পেবিয়ে ছুটে আসছে। এ ডাক ওব কাছে শুধু আদরেব নয়, পূর্ণ আস্থাব, আশ্রয়ের।

পায়েব কাছে আসাব আগেই সামনেব পাটা এগিয়ে খপ কবে ধরে ফেলে ওকে পরেশ। মুহূর্তে ওব চোখেব দিকে তাকিয়ে জান্তব অনুভূতিতেও বোধহয় বুঝতে পাবে পুষনি ওব আসন্ন বিপদ। পবেশেব চোখে আততায়ীব ছায়া দেখতে পায় বলেই বোধহয় মুক্তিব শেষচেষ্টায় আচমকা উল্টে গিয়ে পবেশেব হাতে একটা কামড় বসিয়ে দেয়। পবেশ নিচু হয়ে এক ঝটকায় ওব মুখটা

সবিয়ে দিযে ওব গলা টিপে ধবে। হাত দিয়ে দব দব করে বক্ত পডছে ওব। চোয়ালেব হাড দুটো ইস্পাতেব মতো শক্ত খাড়া হয়ে উঠছে।

মা আতঙ্কে চীৎকার কবে ওঠেন, কি কবছিস পবেশ? ছেড়ে দে, ছেড়ে দে ওটাকে।

ততক্ষণে পবেশ ওর সমস্ত শক্তি দিযে শূন্যে তুলে নিয়েছে বিড়ালটাকে। যেন কোনো হিংস্র আততায়ীব বিরুদ্ধে মবণপণ লড়াইযে নেমেছে। মলিনাও চীৎকাব কবে উঠেছিল। কিন্তু তাব আগেই চোখেব নিমেষে পাশেব বাড়িব দেওয়ালেব গায়ে ছুঁড়ে মেবেছে পবেশ বিড়ালটাকে।

হয়তো এ উদ্দেশ্য ছিল না ওব। কিন্তু বিড়ালটা গিয়ে প্রাচীবেব মাথায় বর্শাব মতো উদ্যত শিকেব ভেতব আমূল গেঁথে যায়। মৃত্যুযন্ত্রণায় আকুল কর্কষ চীৎকারে পাগুলো ছুঁড়তে থাকে বিড়ালটা। বক্তে ভেসে যায় প্রাচীবেব গা। মা, মলিনাও চীৎকাব চেঁচামেচি শুরু কবে দেয়। পিউ পিকলু ডুকবে কেঁদে ওঠে।

মুহূর্তে ভীড জমে যায় বাস্তায়, প্রাচীবেব পাশে। কিন্তু কেউ সাহস কবে এগোতে পারছে না বিড়ালটার কাছে। মৃত্যুব মুখোমুখি এসে মবিয়া এখন জন্তুটা।

মুহূর্তে চীৎকাব, চেঁচামেচি, জল্পনা, কল্পনা, সহানুভূতি, ধিক্কাবে মুখবিত হয়ে ওঠে ঘটনাস্থল। ছিঃ ছিঃ করতে শুরু কবে লোকে। এত হিংস্র, এত নিষ্ঠুরও হতে পাবে মানুষ! নিবীহ শান্ত এমন একটা প্রাণীকে এমন নির্দয়ভাবে হত্যা কবতে একবার বিবেকেও বাধল না লোকটাব? লোকটাকে বাইবে থেকে দেখে তো নিবীহ ভিজে মানুষ বলেই মনে হয়, এমন মার্জাবাব প্রকৃতিব বলে তো মনে হয় না।

কিন্তু এব কোনো কিছুই তখন কানে যাচ্ছিল না পবেশেব। ও নিষ্প্রাণ পাথবেব চোখে শিকে গাঁথা বিড়ালটাব দিকে তাকিয়ে ছিল। কখন যেন ওব চোখে বিড়ালটা পবেশ হযে গেছে। শিকবিদ্ধ পবেশ মৃত্যু যন্ত্রণায় আকাশ কাঁপিয়ে চীৎকাব করছে। সর্বাঙ্গ দিয়ে বক্ত ঝবছে ওব। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসছে না। কেউ ওকে বাঁচানোব জন্য হাত বাড়াচ্ছে না।

চীৎকাব কবতে কবতে পবেশ যেন এক সময় ক্লান্ত হযে পড়ে। ক্রমেই ওব স্বর রুদ্ধ হয়ে আসছে। শিকটাব দু-পাশে শিথিল হয়ে ঝুলে পডছে হাত-পা চারটে। মাঝে মাঝে শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছে শবীবটা। প্রাণটা দেহ ছেড়ে

বেরিয়ে যাওয়ার সময় বোধহয় কষ্ট হয়। পরেশের গলায় এখন আর স্বর নেই। দেহটা স্থির হয়ে আসছে প্রাচীরের ওপর। শিকটা বিঁধে না থাকলে এতক্ষণে বোধহয় গড়িয়ে পড়ত। হঠাৎ শেষবারের মতো একবার ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠল পরেশের দেহটা। তারপর শান্ত হয়ে গেল। আর নড়ছে না। আর কাঁপছে না। শিকের মাথায় স্তূপ করা একটা সাদা পতাকার পিণ্ডের মতো পড়ে আছে নিস্পন্দ দেহটা।

এতক্ষণে দুহাতে মুখ ঢেকে চীৎকার করে কেঁদে উঠল পরেশ, এ আমি কী করলাম! এ কী করলাম আমি।

আগুন জ্বালাবার গল্প

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকটা উবু হয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর হাত-পা সামনে পিছনে সটান করে দিলো। দেখলে মনে হবে মানুষটা এই হিমেল শীতে যোগাভ্যাস করছে। মানুষটার গায়ে জোব্বার মতো আলখাল্লা, লম্বা পকেট, পিঠের উপর টুটা-ফাটা জায়গাটা দেখলে মনে হয় ভারতবর্ষের মানচিত্র পিঠে লটকিয়ে মানুষটা নিরন্তর হাঁটছে। চুল লম্বা, অযত্নে চুলে জট, চোখ লাল এবং গোলাকৃতি, আর হাত-পা বড় শীর্ণ। চোখ লাল গোল গোল, কোটরাগত চোখে অন্ধকারের মতো সামান্য উত্তাপ—কিছু দিনের ভিতরই সেটা মরে যাবে। মরে গেলে কি আর থাকে, সুতরাং মানুষটা সময় সময় হাঁকছিল, আগুন। আগুনের জ্বালা, অথবা আগুন জ্বালো। তারপর চিৎ হয়ে পড়ে থাকার মতো বলত, নফর হে, নফর, তুমি তো চোর-ছেঁচোরের বংশধর—যার কোনো ইতিহাস নেই—গোলাম ইতর জাতি, তুমি কেবল নিরীক্ষন করো। বলতে বলতে মানুষটা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল, তারপর দাঁড়াল এবং ছুটতে থাকল, হে নফর, তুমি মণিহার পরাও গলে। ফুলের মালাতে ফুল সাজাও। আর কি বলে মানুষটা, বলে অন্ধকার শরীরে উত্তাপের কল লাগাও। বলে মানুষটা ঘুরে ফিরে নাচতে আরম্ভ করল।

সামনে একটা কুন্দ ফুলের গাছ, গাছের নিচে হরিমতী ছিল। হরিমতী অনেকদিন পর আবার কুন্দ গাছটার নিচে এসে আস্তানা গেড়েছে। কোথায় করে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় হরিমতী, কেউ জানে না, আবার একদিন এই কুন্দ গাছের নিচে হরিমতী ওর সব পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে ফিরে আসে, সে কাল হরি-মতীকে কুন্দ ফুলের গাছটার নিচে বসে থাকতে দেখেছে, জলে ভিজে গেছে

সব। ওর পোঁটলাপুঁটলি সব ভিজে গেছে। এখন নেই হরিমতী। সে ছুটে এসেছিল হরিমতীর কাছে, হরিমতীকে পেলে সামান্য আগুন চাইত। কারণ হরিমতীর পোঁটলাপুঁটলির ভিতর গোটা সংসার। ভাঙ্গা মগ হাতা খুন্তি খুড়ি এবং উচ্ছিষ্ট খাবার সে কোত্থেকে কোন হেঁসেল থেকে সংগ্রহ করে বড় যত্নে রেখে দেয়। হরিমতী দয়ালু, হরিমতীর চুল শনের মতো। রাস্তার কলে চান করে তেনা-কানি পরে বসে থাকলে কে বলবে হরিমতী পাগলিনী-প্রায়! মনে হবে ওর বুদ্ধির অগম্য কিছু নেই। গরমের দিনে হাতপাখা নেড়ে সে একবার তাকে ঘুম পাড়িয়ে ছিল। কুন্দ ফুলের গাছটাতে তখন পাতা ছিল না। শীর্ণ গাছ, প্রখর রৌদ্রে ওলাওঠার মতো হলে হরিমতী এই গাছের নিচে বসে ওকে আলো এবং বাতাস দিয়ে রক্ষা করেছিল।

ক্রমে রাত বাড়ছে। ক্রমে হিমেল ঠাণ্ডাটা আরও শক্ত হয়ে নামছে। একটু আগুনের জন্য হরিমতীর কাছে ছুটে আসা। অথচ গাছের নিচে হরিমতী নেই। চারিদিকে তাকাল—না কোথাও নেই। কিছু দূর হেঁটে গেলে শহরের চৌরাস্তা এবং মোড়ে পাঁঠার মাংসের দোকান। দোকানী এই শীতে, হিমেল শীতে, সকাল সকাল ঝাঁপ বন্ধ করে চলে গেছে। রাস্তা-ঘাট ক্রমে নির্জন হয়ে আসছিল। শীতের দিনে ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি এবং ঠাণ্ডা এই নগরীকে হিমের মতো অথবা মৃত মানুষের মতো অসাড় করে ফেলছে। একবার এই মাংসের দোকানে—কবে কোন দিন মনে পড়ে না, কেবল মনে পড়ে—সামান্য পাকস্থলীর নীল চামড়ার মতো মাংসটুকুর লোভে সে হাত জোড় করে অপেক্ষা করলে এক বাবু মানুষ অৎকোষের লোভে বসে থাকার সময় প্রশ্ন করেছিল, তোমার নাম?

—আমার নাম রাজা হরিশ্চন্দ্র।

রাজা! বাবু মানুষটা চোখ উল্টে ব্যঙ্গ করেছিল। তারপর সে প্রতিদিন দেখেছে, বাবু পাঁঠা কাটা হলেই এক জোড়া অণ্ডকোষ নিয়ে পান চিবুতে চিবুতে বাড়ি ফিরছে। কি করে দোকানীকে ফাঁসির দড়ি থেকে রেহাই দিয়েছিল। দোকানীর গোঁফ জোড়া দুলে উঠলে টের পায় হরিশ, মানুষটা একটা আস্ত মানুষকে এই দোকানের খুপরি ঘরটাতে এনে পাঁঠা কাটার দা দিয়ে কুপিয়ে কেটেছিল—লোভ ছিল কার উপর—সে একদিন শুধু হরিমতীকে দেখেছিল রাস্তা দিয়ে যেতে—হরিমতী মানুষটার মুখে থুথু ছিটিয়ে বড় রাস্তায় ছুটে গেছে এবং হাত তুলে যেন সে এক পাখির পালক উড়াচ্ছে বাতাসে

তেমনি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। সেই থেকে কি যেন এক সম্পর্ক মনে হতো। হবিমতী বাবু এবং দোকানীব গোঁফজোড়া ফুলে উঠলে কুন্দ গাছেব নিচে বসে তাব মানুষেব জন্য কাঁদত। আব কেবল বাবু মানুষটাব সঙ্গোপনে এক জোড়া অণ্ডকোষেব জন্য বসে থাকা। বসে থাকতে থাবতে মহড়া দেওযা—আমি এক মানুষ, থানাব বডবাবু, বযেস এই তিন কুড়ি হবে—খাতায কলমে তুই কুডি দশ—ঘবে আমাব যুবতী বৌ। বুঝি অণ্ডকোষ খেলে অনন্ত যৌবন মেলে তেমন মুখ কবে বসে থাকত বাবু মানুষটা। অন্ধকাবে যেতে যেতে হবিশেব মনে হলো, এই বাবু মানুষ এবং দোকানী মিলে হবিমতীকে পাগল কবে দিযেছে। সে ভিতবে ভিতবে কষ্ট অনুভব কবল। কোথায হবিমতী। সে ফেব্র কুন্দ গাছটাব নিচে ফিবে এসে দেখল—না, এখনও হবিমতী ফিবে আসেনি। কোথায় গেল। এমন বৃষ্টি এবং হিমেল ঠাণ্ডাতে হবিমতী কোথায গেল। ওব চোখ-মুখ ফুলে উঠেছে, হাত-পা ফুলে গেছে—আব নগবীব উপব তীক্ষ্ণ হিমেল ঠাণ্ডা অবিবাম চললে ফুটপাথেব সব মানুষেবা মবে যাবে। সে একটু আগুনেব জন্য ছটফট কবছে। হায, একটু আগুন জ্বালতে পাবলে এমন শীতেব বাতে অন্তত নিজেকে বক্ষা কবতে পাবত। হবিশ এবাব একটু আগুনেব জন্য কাঙ্গালেব মতো ছুটতে থাকল। সহসা সহসা কোনো মানুষেব ছাযা অন্ধকাবে ভেসে উঠলে অনুসবণ—পোড়া সিগাবেট অথবা সামান্য আগুন—কিন্তু হায, পথ কর্দমাক্ত বলে এবং পিচ্ছিল বলে সে ছুটতে পাবছে না। সে আগুন ধবতে পাবছে না। পোড়া আগুন জোনাকিব মতো জ্বলতে না জ্বলতেই নিভে যাচ্ছে। শীতে হবিশ ঠক ঠক কবে কাঁপছিল। বাস-স্ট্যাণ্ডেব নিচে অথবা পার্কেব কোণে পবিত্যক্ত ভাঙ্গা টালিব ঘবে হবিমতী আছে কিনা দেখল। থাকলে হযতো কাঙ্গালেব মতো এমন ছুটতে হতো না। হবিমতীব কাছে আগুন পাওযা যেত। হবিমতী পাগলিনী-প্রায়, তবু হবিমতীব সংসাবে সামান্য আগুন আছে। কাবণ হবিমতীব বযস আব কত। ত্রিশ হতে পাবে, পঁয়ত্রিশ হতে পাবে, আবাব পঞ্চাশ হতে পাবে। ওব নোঙবা, ছেঁড়া এবং কিম্ভূতকিমাকাব পোশাকেব ভিতব্র বযসটা কিছুতেই ধবা যায় না। একবাব হবিশ, কবে যেন হবিশ, দেখেছিল হবিমতী ফুটপাথেব কলে স্নান কবছে। এমন শবীব হবিশ দীর্ঘকাল দেখেনি। ঐ দেখে হবিশেব হাত-পা যখন শীতেব দিনেব মতো ঠক ঠক কবে কাঁপছিল—

হবিমতী ফ্যাক ফ্যাক কবে হাসছে তখন। বাস্তায কোনো জনমনিষ্যি সে দেখতে পাচ্ছিল না। একমাত্র জনমনিষ্যি বলতে এই হবিশ। পাগলা হবিশকে দেখেই সে লজ্জায ভাঙ্গা মগ দিযে যেন বা শবীব ঢাকাব চেষ্টা করে। বিয়েব পিঁডিতে যেমন বধূ বসে থাকে, তেমন এক বধূব মতো মুখে ব্যাণ্ডেব মতো উপুব হযে সে হবিশকে দেখে—যেন হবিশ তাব কতকালেব নাগব। হবিমতীকে স্নানেব ভিতব বড় কাতব দেখাচ্ছে। এতলোক নগবীতে এবং বাজপথে আব বাজপথেব কলে হবিমতী সব তঞ্চকতা গিলে ঠাণ্ডা জলে স্নান কবতে কবতে হবিশেব সঙ্গে পিবিত কবছে, পিবিত কবাব সময মনে হযেছে বড অভাবী সে, সুতবাং সাবা দিনমান ঘুবে বেড়ানো। যেন পাখি ধবাব মতো ঘুবে বেডায হবিমতী। ঘুবে ফিবে, পাযেব উপব পা তুলে নাচতে নাচতে—পযসা নাই, হাতি নাই, ঘোডা নাই, সংসাবেব জল নাই, অন্ন নাই—কি যে নাই বলতে বলতে, হবিমতী নাচে গায, ছেঁডা কানি উডিযে বেডায এবং কোনো এক আন্থিকাল থেকে সংসাবেব সব সুখ ও মোহ থেকে মাঝে মাঝে মৃত স্বামীব আহত মুখ ভেসে উঠলে কুন্দ গাছেব নিচে বসে হায হায কবে কাঁদে।

হবিশ বলেছিল, মতি তুই কান্দস ক্যান?

—নাগব, আমাব নাই বইলা কান্দি আমি।

—কি নাই তব?

—আমাব হাতি নাই, ঘোডা নাই।

—আমাব হাতি ঘোডা আছে, নিবি?

—ইতব, তুমি নাগব ইতব।

হবিশ বাতেব বেলাতে হাসতে হাসতে মতিকে জডিয়ে ধবেছিল। বাতেব অন্ধকাবে ফুটপাথেব বাসিন্দাবা ঘুমোচ্ছে। হবিশ মতিব কোমবে ছেঁডা কানি-তেনা দেখে ভাবল—এই হায দ্রৌপদীব বসন-ভূষণ। গোটা অঙ্গে কত বিচিত্র বাস। কত বকমেব হিজিবিজি তালিমাবা সংসাবেব যাবতীয অনাচাব-অবিচাবেব বসন-ভূষণ—সাবা অঙ্গে পেঁচিযে পাঁচিযে প্রায ব্যাণ্ডেজেব সামিল কবে ফেলেছে। বাগে দুঃখে সে তেনা-কানিব মধ্যে যে মতি, তাকে ধবতে চায। হায এই ঠাণ্ডা থেকে পবিত্রাণ! বস্তুত হবিশ ছিঁডে ফুঁড়ে অন্তবে প্রবেশ কবতে চাইলে মতি তালে তাল দিতে থাকে। মতিকে সোহাগ কবতে কবতেই হবিশ মাদুবেব নিচে হাত

বাড়িয়ে দেয়। বালিশের নিচে উচ্ছিষ্ট হাড়-মাংস চোষা—শত সহস্রবার চুষে শুধু সাদা হাড়—মতি কিছু সংগ্রহ করতে না পারলে দিনমানে ফুটপাথে বসে অথবা রাতের বেলায় এই নগরীর ট্রাম-বাস এবং মানুষ-জন যখন ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসে তখন তার ডেরায় শুয়ে সারারাত সেগুলো কড়মড় করে খায়। দাঁতে কি শক্তি হরিমতীর। যত অভাব বাড়ছে, অনাচার বাড়ছে, তত দাঁতে শক্তি বাড়ছে। হরিশ তালে তাল দেবার সময় মতির ভাঁড়ারে পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে দিলো। সুখে মতি যত ডুবে যাচ্ছিল, হরিশ তত সেয়ানা হয়ে উঠছিল। পিরিতের ফাঁদে আটকে সে মতির পোঁটলাপুঁটলি থেকে সব চুরি করে নিচ্ছিল। সেই মতি এখন কুন্দগাছের নিচে নেই, পার্কে নেই, ফুটপাথে নেই—কোথায় যে গেল। মতিকে না পেলে যেমন অন্যসময় চীৎকার করে ট্রাম-বাস কাটিয়ে রুমাল উড়িয়ে যায়—তেমনি সে ছুটতে ছুটতে হাঁকল, কার হাতি? কে ঘোড়া নিয়ে যায়। বাদ্য বাজে কেন? ইতর এই সংসারে তোমার কি ইচ্ছা যুবতী। সে রাজপথে দাঁড়িয়ে সুন্দরী যুবতী দেখলে হাসত। আর ঐ মানুষটা, দারোগাবাবু—যার ঘরে তার বিবি, নাকে এখন নথ, কোমরে বিছেহার এবং ছাগলের অণ্ডকোষে যে-মানুষের প্রাণ-পাখি পোরা (শুধু কেন জানি মাঝে মাঝে সবলার চোখ ভাসতে থাকলে সে হাঁকে—কার হাতি? কার ঘোড়া? বাদ্য বাজে কেন?)—সেই দারোগাবাবু হরিশকে এখন আর চিনতে পারেন না। হরিশের বড় দাড়ি, কোটরাগত চোখ এবং গোল গোল চাউনি। পাগল হরিশ পাকস্থলীর নীল চামড়ার মাংসের জন্য বসে থাকলে কেবল শুনতে পায়—কারা যেন বাদ্য বাজায়। কিসের বাদ্য? যুবতী, কি বাদ্য বাজে? যুবতী, যবে যুবতী কলেজে যায়, সিনেমায় যায—কি তাড়না তার ভিতরে—সে ভেবে পায়না—কেবল সেই এক দৃশ্য। সে এবার জোরে হাঁকল, মতি, মতি আছ নি। ফুটপাথে, কবরভূমির এপাশটায় এবং দালানের বড় আলোটার নিচে দাঁড়িয়ে ডাকল মতি, মতি আছ নি। ইট্টু আগুন না হলে যে প্রাণপাখি রাখা দায়।

ফুটপাথ পার হলে নোংরা বস্তিঅঞ্চল, পাশে বড় আঁস্তাকুড়—পাহাড়-সামিল আঁস্তাকুড়ে পচা ইঁদুর-বিড়ালের গন্ধ। মতি এখানে থাকতে পারে—নির্জন নিরালাতে আঁস্তাকুড় পেলে মতি শুয়ে থাকে। তখন বৃষ্টি ছিল না, আকাশটা ধরে এসেছিল—ছাইগাদায় পোড়া কয়লা—ঝুড়িতে বস্তিবাসীরা পোড়া কয়লা তুলে নিচ্ছিল, হরিশ সবুর করতে

পারেনি, পায়ের উপরে গোটা শরীরের বোল তুলতে তুলতে বাদ্য বাজাতে বাজাতে ছুটো ঝুড়ি চুরি করে যেন হরিশ যুদ্ধে যায়,দামামা বাজিয়ে যুদ্ধে যায় ‥ হরিশ ঝুড়ি চুরি করে পালিয়ে গিয়ে কুন্দ গাছটার নিচে মতির অপেক্ষাতে বসে ছিল। রাত হলে, হিমেল ঠাণ্ডা ক্রমে বাড়লে, সে এবং মতি খড়কুটোতে ঝুড়ির বেতে বাঁশে আগুন জ্বেলে চুরি করে এই নগরীতে আর-একটা রাত কাটিয়ে দেবে। কিন্তু কোথায় মতি, কোথায় সামান্য আগুন। সে ডাকল ফের, মতি, অ মতি, আছ নি। তিনদিন থেকে ভিজে ভিজে এখন একটু আগুন না হলে প্রাণ রাখা দায়। মতি, মতি আছ নি? অ মতি। বড় বড় গাড়ি রাতের আঁধারে মুরগি গিলতে গিলতে চলে যাচ্ছে। সে ডাকল, মতি, অ মতি, মতি আছ নি। বড় বড় বাড়ি দু-পাশে স্থির, সে ডাকল, মতি, অ মতি, মতি আছ নি। বড় বড় দেয়ালে হলুদ সব ছবি রঙীন চিত্রের মতো ভিজে ভিজে তেলাপোকার সামিল। দেয়ালে ছবিগুলো বৃষ্টিতে ভিজে নড়ছে। সে ডাকল, মতি, মতি আছ নি! সে আবার সেই নির্জন জায়গাটা পার হবার সময় দেখল, অনেক উঁচুতে একটা জানালা খোলা। সেই আলোতে সে উত্তাপ পাবে ভেবে নিচে চুপচাপ ভালো মানুষের মতো দাঁড়িয়ে ডাকল, মতি, অ মতি, মতি আছ নি। শীতে সে যত ঠক ঠক করে কাঁপছে, তত হন্যে হয়ে নগরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে—মতি, মতি আছ নি। হরিশ ছুটে ছুটে ক্রমে এক কবরখানায় পৌছয়। মতি এখানে গোঁসা করলে চলে আসে—ভাঙ্গা টিনের ছাউনির অন্ধকারে চুপচাপ পুঁটলি শিয়রে রেখে শুয়ে থাকে। সে ডাকল, মতি, মতি আছ নি। অন্ধকার মানুষের মতো ছায়া ভেসে উঠল। ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর ছোট্ট এক ছাউনির নিচে দু-বাহু বিছিয়ে মতি উপুড় হয়ে আছে—সে এতক্ষণে লক্ষ্য করল ক্রমান্বয় এই হাঁটা এবং অনুসন্ধিৎসা তাকে মতির কাছে পৌছে দিতে সাহায্য করেছে।

সে প্রথমে কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস গলায় ডাকল, মতি, মতি জাগে নি! কোনো উত্তর পেল না। মতি তুমি আমার ভালোবাসার জীব। সে মতিকে ছুঁতে চাইল। মতির হাত-পা বরফের মতো ঠাণ্ডা। সে মতিকে জড়িয়ে ধরতে চাইল—এই মতি। সে মতিকে ঠেলা দিলো এবার—এই মতি। মতির শরীর শক্ত। কতদিন এমন শরীর শক্ত করে রেখেছে—আজ হয়তো শীতে তা আরও শক্ত হয়েছে। আবার চারা গাছটির মতো শীত পার হলে নূতন পাতা মেলে ধরবে—সুতরাং সে মতির

ঠ্যাং ধরে টানতে গেলে দেখল—যথার্থই হুঁশ নেই তার। সে এবার করবখানায় দুহাত তুলে চীৎকার করে উঠল, মতি রে। এখন কি তার করণীয় সে ভেবে পাচ্ছিল না। সে খাবলে খুবলে মতির পোঁটলাপুঁটলি খুলে আগুন খুঁজতে থাকল। মতির কত কিছু রাখার অভ্যাস। খালি সিগারেটের বাক্স, ভাঙ্গা হাঁড়ি, ছেঁড়া কানি-তেনা—যা কিছু পথের, সব মতির পোঁটলাপুঁটলির ভিতর—মায় পাখির পালক পর্যন্ত। কিছু খাদ্যদ্রব্য, মুসুরীর ডাল এবং পোড়া রুটি—কতদিনের পচা কে জানে। বাসি দুর্গন্ধ, মাছি উড়ে উড়ে জায়গাটাকে পুতিগন্ধময় করে রেখেছে। খাবলে খুবলে পোঁটলাপুঁটলি খুলে হরিশ আগুন আবিষ্কার করতে পারল না। সে হতাশায় এবং দুঃখে লম্বা হয়ে গেল, পায়ের নিচে মতি উবু হয়ে পড়ে আছে—আগুন জ্বালতে পারলে মতি বাঁচত। সে শেষবারের মতো মতি যেখানে পয়সা লুকিয়ে রাখে—প্রায় ঘাগড়ার নিচে, ট্যাঁকে—সেখানে হাত ঢুকিয়ে দিলো। ছোট্ট নীল রঙের থলে, কিছু পয়সা, কানাকড়ি এবং পোড়া বিড়ির দুটো অংশ, আর ম্যাচ বাক্স। প্রায় যেন রাক্ষসের প্রাণ রুপোর কৌটায় ভ্রমরের ভিতর, মতির প্রাণ এই থলে—নীল রঙের থলে। সে এবার থলে নিয়ে দু-লাফে সদর-রাস্তায় নেমে ছুটতে থাকল। মতির প্রাণ এই রাজপুত্রের হাতে। সে দুই ঝুড়ি এবং খড়কুটোর অনুসন্ধানে ছুটতে থাকল। আগুন জ্বালতে পারলে মতি আর একবার বাঁচবে। সে আলো-আঁধারিতে নগরীর এমন নিস্তব্ধ রাতকে ব্যঙ্গ করে হেঁকে উঠল, শহরে কে জাগে। উত্তর এলো, কারা যেন দূরে কোলাহল করে যাচ্ছে—রাক্ষসের ভাই খোক্কস জাগে। এক সঙ্গে একদল খোক্কসের গলা পাওয়া গেল। সে নিজের ভয় দূর করার জন্য হাঁকল, কে জাগে। এবার যেন অন্ধকার থেকে উত্তর এলো, আমি মতি জাগি। কে জাগে। সে এবার জবাব পেল, আমি অমানুষ জাগি।

হরিশ যত সম্ভব পারল খড়কুটো এনে আগুন জ্বেলে ফেলল। আগুন জ্বাললে রাক্ষস-খোক্কসের ভয়টা কমে, সে প্রথমে আগুন জ্বেলে কেমন জড় পদার্থের মতো মুখ গুঁজে বসে থাকল। তারপর মতিকে দেখতেই মনে হলো ওর হাতে মতির প্রাণপাখি পোষা, সে তাড়াতাড়ি আগুন থেকে উত্তাপ নিয়ে মতির গালে কপালে দিতে থাকল। মতিকে চিত করে শুইয়ে দিলো। জলে সব ভিজে শপ শপ করছে। সে মতির শরীর মুছে দিলো। ঠাণ্ডায় বেহুঁশ মতির চোখ দুটো শুধু সাদা সাদা, হাত পা সাদা সাদা, পাণ্ডুর এবং

নাকের নিচে কাটা দাগ। রক্ত গড়াতে গড়াতে বরফ হয়ে গেছে। মতির থেকে থেকে শ্বাস পড়ছে। এবং মনে হয় কিছুক্ষণ কি ভেবে ভেবে তারপর মতি শ্বাসের কথা মনে হলে একবার নিঃশ্বাস ফেলছে। সে মতিকে তাড়াতাড়ি কাত করে দিলো। পিঠের কাছে আগুন পেলে মতির ফুসফুস পরিষ্কার হতে পারে ভেবে পিঠে এবং পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আগুনের উত্তাপ দিতে থাকল। কিন্তু মতি যেমন অসাড় হয়ে পড়েছিল, এখনো তাই। সাদা ফ্যাকাশে চোখ যেমন ছিল, হাতে পায়ে যেমন জলের ঘা ছিল, এখনও তেমনি সাদা চোখ, পায়ের পাতায় সাদা মাংস উঠে আসছে, জলে জলে মতির পায়ে ঘা হয়ে গেছে—মতির চারপাশে মশা-মাছি উড়ছে কেবল। সে ডাকল, এই মতি, তুমি কথা কও। কথা না বললে ভয় লাগে। হায়, সর্বত্র এক নিদারুণ তৃষ্ণা, বেঁচে থাকার তৃষ্ণা—মতি বেঁচে থাকার জন্য এতদূর হেঁটে এসে জলের ঝাপটা থেকে প্রাণ রক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন মতি জানে না, মতির প্রাণবায়ু ঠাণ্ডায় এবং শীতে অথবা অনাহারে উড়াল দিচ্ছে। সে দুই হাতে উত্তাপ এনে মতির গালে কপালে বুকে এবং পায়ে ঘসতে থাকল। পা ঘসলে গাল-কপাল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, গালে কপালে দিলে পা সাদা এবং উরু-মূল বরফ হয়ে যায়। মতিকে সে আগুনের দিকে মুখ করে মরা মাছের মতো কাত করে রাখল। আর কাত করতেই মনে হলো মতি বুঝি প্রাণ পাচ্ছে। মতির নিঃশ্বাস পড়ছিল। থেমে থেমে, আগের চেয়ে দ্রুত। সে তাড়াতাড়ি মতির ভেজা বসন-ভূষণ সব চিপে আগুনের উপর টানিয়ে দিলো। গরমে গরমে শুকিয়ে গেলে শুকনো কাপড়ে আবার মতিকে ফুলমতী মনে হবে। কিন্তু আগুন যে সামান্য। চারিদিকে জল, আর কর্দমাক্ত বন্যা—জীবনে এই নগরীতে কেবল মৃতমুখ ভেসে বেড়াচ্ছে। হরিশ আগুনের উত্তাপে বল পাচ্ছে। সে মতিকে কাঁধে নিয়ে আগুনের চারপাশে ঘুরতে থাকল—ওর কেবল নৃত্য করতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু আগুন সামান্য সময় জলে নিভে যেতে থাকলে যেমন সে মরা মাছটির মতো কাত করে রেখেছিল, এবার সে তেমনি মরা মাছটির মতো মতিকে চিত করে রাখল। আগুন ক্রমে কমে এলেই নিঃশ্বাস কম-বেশি পড়ছে। সে দেখল—সব খড়কুটো শেষ, বেত-বাঁশ শেষ, এখন শুধু মতির বসন-ভূষণ আছে। বসন-ভূষণ সে এক-দুই করে আগুনের ভিতর ছুঁড়ে দিতে থাকল। কারণ এই আগুন এখন প্রাণের চেয়ে মূল্যবান। ভোরের দিকে দুই আদিম নরনারী দরকার হলে সূর্যের দিকে

পিঠ দিয়ে বসে থাকবে। এই রাত, শীতের হিম ঠাণ্ডা, ক্রমে তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আগুন নিভে গেলে সে এবং মতি মরে যাবে। ক্রমে এই আগুনের জন্য হরিশ স্বার্থপর হয়ে উঠল। মতির যাবতীয় তৈজস, যায় খালি সিগারেটের বাক্স, পাখির পালক এবং নীল থলে আর কানাকড়ি, যদি পারা যায় তো এমন কি মতির অঙ্গ কেটে তাজা মাংস রক্ত চর্বি আগুনের ভিতর নিক্ষেপ করতে পারলে বুঝি প্রয়োজনীয় উত্তাপ হয়। ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর মতির বয়স বিশ কি বাইশ, পঁয়ত্রিশ কি পঞ্চাশ ধরা যাচ্ছে না। মতির চোখের নিচটা ফুলে গেছে, হাত পা ফুলে গেছে। মতিকেও আর মতি বলে চেনা যায় না। হরিশ মতির শরীরে হাত রেখে বুঝল, এ-শরীর আর গরম হবার নয়। সে খুব সংলগ্ন হয়ে বসল। বলল, মতি তুমি আমার ভালোবাসার জীব। বলে সে তার মতিকে নিয়ে এবং সামান্য আগুনের উত্তাপ নিয়ে কেমন জড়াজড়ি করে বাকি রাত-টুকুর অপেক্ষাতে পড়ে থাকল—আশা ভোর হলে সূর্য উঠতে পারে আকাশে।

প্রাতঃকালে সূর্য আকাশে কিরণ দেবে ভেবেছিল কিন্তু হরিশ চোখ মেলে দেখল আজও ঈশ্বর তাঁর নীল উজ্জ্বল ছায়া ছায়া আগুনের ঘর আকাশের গায়ে টানিয়ে দেননি। তার গায়ের জোব্বা—যার পিঠের দিকটা টুটা-ফাটা ভারতবর্ষের মানচিত্রের মতো এবং যা তাকে অন্য শীতের রাতে উত্তাপ দিতে সাহায্য করবে—সেই পরম প্রয়োজনীয় বস্তুটি—যা না হলে কাল রাতে অথবা পরশু রাতে সেও মতির মতো অস্থানে কুস্থানে মরে পড়ে থাকবে—শরীর থেকে খুলে সে মতির শরীর ঢেকে দিলো। ছেঁড়া তালিমারা পাজামা খুলে মতিকে পরিয়ে দিলো—যেন সাদা থান কাপড় অথবা কাফনের মতো বস্ত্র, কারণ মতির কি জাত এবং কি ধর্ম সে এ সময় আর ঠিক করতে পারছে না। কেবল ওর এখন মতির চারপাশে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করতে ইচ্ছা হচ্ছে। নৃত্য না করলে, ঘুরে ফিরে না নাচলে কুঁদলে হিম ঠাণ্ডাতে তার শরীর বরফ হয়ে যাবে। সে এবার মাথায় ডান হাত রেখে, পাছায় বাঁ হাত রেখে, কোমর দুলিয়ে মতির চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচছিল আর গাইছিল—মাগো, তুই ভারতবর্ষ, টুটা-ফাটা তুর শরীর, (আমি মা) রেতের বেলা পোকামাকড়, দিনের বেলা পাগলা হরিশ।

মৌগাঁয়ের পথে ভোর

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ওরা চারজন এসেছিল শহর থেকে। মৌগাঁয়ের খালের ধারে এক টেরে মা মনসার খাল। সেখানে জ্যৈষ্ঠসংক্রান্তিতে মনসাপুজোর মেলা। বিরাট হুল্লোড় জলসা জলকাদায়। মান্ধাতা বটের তলায় মাটি মাতালের মতো কাহিল। পারঘাটে হাজার ঝুরি থরথর দোলে হাজারজনা মানুষের গায়ের ঘেঁষায়। সাপ আছে সাপিনী আছে কোটরে। পুরনো বেদীতে ইঁটের ফাটল নোনা শ্যাওলা। চিকচিক করে জিভ। দুধের পাত্রে মুখ ছোঁয়ায়। ওরা শুনেছিল।

ভাঙখেকোদের বড় ভীড় মেলায়। 'ছোট বাঁশি'তে মুখ দিয়ে পড়ে থাকে অনেক মানুষ। ধুঁয়োয়-ধুঁয়োয় ভরা মনসাতলা। নেশা ঝিমঝিম করে লালচে চোখে। যুবতীরাও। সেইসব কাজলরেখা চোখ আলতাপরা পা. পায়ে রুপোর পাঞ্জুড়ি ঝুমঝুম গেঁয়ো সুন্দরীরাও। সবাই নেশায় ছলছল। গা ছুঁলে মানা নেই। বগলে হাত রাখলে মুখ ফেরায় না। চাপ পড়লেই বলে শুধু, আ ছি ছি, ওকি নাগর, কী করো ওরা শুনেছিল।

আহা, ওই গেঁয়ো মেয়েগুলো বড় নেবোধ। পথ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে আক্কেল গুড়ুম করা সহজ অতি। আর বেশি চাইলে, সরাসরি সামনাসামনি ইচ্ছে হলে, ঝুমরী সুন্দরীরা আছে। পাছা দুলিয়ে গায়ঃ একটি পয়সায় লাও কিনে হে তালপাতারো বাঁশি বাঁশি বাজাতে সাধ যায় যদি, প্রথমে উর্ধ্ববাহু পেলা ধরাই যথেষ্ট। পেলার পয়সা নিতে নিতে শরীরে বারকয় কমপক্ষে আড়াই শো ভোল্টের শক। এক শকে না মরলেও তিনচারবার সওয়া অসম্ভব। ওরা মরতে গিয়েছিল।

ওরা চারজন শহুরে ছেলে। চারজন দিওয়ানা খুস্কোচুল টাঁসা চোখ ঘুরঘুট্টি রঙের চোঙপরা, কচ্ছপের ছবি-আঁকা ঘাসফড়িং রঙের জামা গায়ে,

ধূসব খড়িখড়ি নীবস মুখে ব্লাস্টফার্নেসেব বিচ্ছুবণ। চাব মস্তান। কিটব্যাগে একটা বড়খোকা একটা ছোটখোকা। ডজন দুই ক্ষুদে ক্র্যাকাব। ছুঁচো। তুবড়ি। হাউই। ছুঁচলো জুতোয শূন্য চষা জমিব সাদা গুঁড়ো মেখে ওবা খালপাড়েব মেলায গিয়েছিল। ওবা নাচছিল হুলাহুপ। ম্যাম্বো। ওয়াণ্টজ। মাঝেমাঝে বেড ইণ্ডিয়ানদেব ওয়াবক্রাই ইয়াহু। তা শুনে জনাকতক কাহাব বাউবি বাববেঁশে নাচল। খাস বাঙালী ওয়াবক্রাই ঝাড়ল মুখে হাতেব তালু নাচিয়ে। আ—বা—বা—বা। মেলা জমল। তুবড়ি হাউই ক্র্যাকাব কুকুবেব লেজে ছুঁচো। কুকুবটা খালেব পাঁকে মাবা পড়াব দাখিল। তাকে পাঁক থেকে তুলে এনে ওবা চুমু খেল। ডার্লিং বলে আদব কবল। সবলা গ্রামীন কুকুবীও মজে গিয়েছিল।

ব্যস। শুধু এই অব্দি। কাজলবেখাবা আছে, বড শেযানা। সঙ্গে ভাতাব-পুত ভাসুব দেওব। হাতে হাতে সব তেলপাকানো লাঠি। গাযে গা লাগলেই চখেওঠা গাভীব মতো সবে গিয়ে শিঙ নাড়ে—হুস্ পালা। ঝুমবী মাগীবাও লাইসেন্স পাযনি। খোঁজ, কোন বেটা এব অথবিটি। দাবোগা শুনে মন খাবাপ কবা ছাড়া উপায কি এ বিভুঁয়ে। এখানে ওখানে জুযোব ছক। চাবধাবে থকথকে পোকাব মুণ্ডু। থুতনিতে হুব, চাবটি ছেলেকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল মাঝবাতে। মাঝবাতে ওবা একটা গাছে হেলান দিযে ছোটখোকাকে নিকেশ কবেছিল। তাবপব পাঁপবভাজা কিনে প্যাচপেচে মাটিতে সেটা শুইযে বেখে হেঁটেছিল তাব ওপব। ধুস্ শালা, শব্দই ওঠেনা। তাহলে ক্র্যাকাব ফাটাও। মেলাব বাবোটা বাজাও।

বাজল না, জমল। জুয়াড়ীবা চেঁচাল, বহুত আচ্ছা মেবে দোস্ত। ওবা জুযোব ছকে গেল। কিছুক্ষণেব মধ্যেই ঝোলাশুদ্ধ ফেব উঠল। খোকা নেই। হাউই তুবড়ি ক্র্যাকাব ছুঁচো পযসাকড়ি সিগ্রেট, কুচ্ছু নেই। সব কুছ খো গ্যাযা ইযাব। লেকিন এক চীজ তো হ্যায মেবা ভাই! ・ বাতাও। দিল দিল তো হ্যায ঠিক জগাহ্ পব

এই শালা বায, বুকটা ছাখ তো।

কী হলো বে? লম্বা লম্বা পা ফেলে কাছে এলো বায।

ব্যানার্জি বলল, মাই সুইট হার্ট। আই হ্যাভ লস্ট ইট।

বোস ফ্যাচ ফ্যাচ কবে হেসে বলল, যাবে কোতায আব। বড় জোব লিপি সেনেব কাছে। সে মাগী একন বাযেব কাকুব ঘবে

রায় গর্জাল, শাট আপ। আমার মেজাজ ভালো নেই। ফিরব, বিট্টু।

গুহ বলল, এ্যাহন পথ চিনিয়া যাওনের বিপদ আছে। হুমুন্দির রাত্রটা য্যান গাও চাটবার চায়। ক্যান এ্যামন লাগে রে? সুড়সুড় ফুসফুস টুসটুস কাট্টুস কুট্টুস।

ব্যানার্জি বলল, বাঙালটা গেছে রে। বলো হরি

হরি বো ও ল।

মধ্যরাতের পর মেলা ঝিমিয়ে আসছিল। অল্পসল্প লোকজন। মেয়ে নেই। ছোট্ট একটা কীর্তনের আসর। শ্রোতার বড় অভাব। তবে শেষ রাতের দিকে ঘুম পুষিয়ে নিয়ে আবার লোকেরা আসবে। এখন সব বিমর্ষ। হ্যাজাগগুলো বিবর্ণ হয়ে আসছিল। ফাটা ম্যাণ্টেলে পোকা। কেবল শোঁ শোঁ শব্দ। বাতাস বহে না। বটের ঝুরির নিচে কাদার চটানে গড়াগড়ি যাচ্ছিল জনাকয় মাতাল। মনোহারীর দোকানে ঝাঁপ পড়ছিল। পাঁপরওলার চুলোয় জল ঢালবার শব্দ। এখন ঘুমের সুড়সুড়ি মেলার গায়ে। নক্ষত্রের কাছে স্থির নাগরদোলা। মন্দিরের দরজার পাশে চত্বরে হাঁটু মুড়ে বসেছিল পুরুতঠাকুর। ঢাকীরা হাঁ করে ঘুমঘুম চোখে কীর্তন শুনছিল। কেবল একটা কুকুরের বিরাট ছায়া মেলার গায়ের ওপর ঘুরেঘুরে নেমে গেল খালের দিকে টানা অন্ধকারে।

ওরা চারজন যেন মেলার বারোটা বাজিয়ে উঠল। গুহ পা বাড়িয়ে শাসাল, ফ্যালাইয়া যাসনা য্যান, কইয়া দিলাম। চাক্কু দিয়া ভুঁড়ি ফাঁসাইয়া ফ্যালব, হঃ।

গুহটা গোঁয়ার। দেখা গেল, ফিরে যাবার পথ সে-ই চেনে। এরা বেহদ্দ বিদিশ। গুহ সামনে হাঁটছিল। খালের উপর নড়বড়ে কাঠের সাঁকো। তারপর বাঁধের পথ। পাঁচ মাইল চললে হাইওয়ে। ফের পাঁচ মাইল চললে শহর। এখন বাস নেই। হাঁটতে হবে। ওরা জানে। জেনেশুনেই এসেছিল।

অন্ধকার শুকনো পথ। মাটির ওপরটা চকচক করছিল নক্ষত্রের আলোয়। ওরা টলছিল। ক্লান্তি পায়ে পায়ে জড়ানো। হতাশ চার তুখোড় ইয়ার। খোকারা নেই। ক্র্যাকার নেই। সিগ্রেট নেই এবং আর আশাও নেই।

রূপশালিধানভানে যে আলতাপরা পা, কাজলরেখা চোখ, সেই গ্রামীন যুবতীদের সামনে পিছনে তেলপাকানো লাঠিহাতে ভাসুর দেওর ভাতারপুত।

ঝুমবীদেব লাইসেন্স দেযনি যে দাবোগা, তাব ভুঁডি চাক্কু দিয্যা ফাঁসান গেল না,
· প্লে হালুযা ।

মৌগাঁযে মৌ মেলে না। তাহলে কোতা মেলে বে? বোস আস্তে আস্তে বলল।

ছাতুবাবুব গলিতে। বায জবাব দিলো।

তবে গার্লস হোস্টেলেব পাশে তুই ঘুবিস কেন বে? ফুটো ডাউস উডবে না খুকুমনি।

এই ব্যানার্জি, সেদিন কাব সঙ্গে কথা বলছিলি?

ও প্রাইভেট এ্যাফেযাব।

প্রাইভেট। শালা, বিট্রেযাব। নো প্রাইভেট এ্যাফেযাব, মাইণ্ড ছাট।

চাবজনে একজন। গাডলেব মতো কথা বলিস কেন বে? আফটাব টোযেনটি ওযান ফব ওযান, বিফোব টোয়েনটি ওযান ফব মেনি।

গুহ থেমে বলল, কী কস তোবা?

প্রেম।

প্রেম? কাবে কয দাদা?

জানো না? ন্যাকা? এই বায, ধব তো বাঙালটাকে, চিৎ কবে ফ্যাল ·

সেই মুহূর্তে ব্যানার্জি গান গেযে উঠেছে হঠাৎ। এ জানেবালে হোঁসিয়াব, হাম হ্যায বাজকুমাব।

বায চেঁচিয়ে বলল, কভী নেহী।

অবাক ব্যানার্জি বলল, কী বে?

সঙ্গম!

অগত্যা তাই। তিনটি কণ্ঠ সঙ্গম গায। সুতরাং তাই—মেবে মনকা গঙ্গা, তেবে মনকী যোমুনাকা ·

গান গাইতে গাইতে ওবা ফিবে আসছিল। ছায়াপথেব মতো এখন এই মেঠো পথ। দুপাশে ঝোপঝাড। আলো নেই একফোঁটা। ওপবে নক্ষত্র শুধু। সব মৌজ ফৌত হযে যাওযা চাব দেউলিয়া। টুইস্টনাচা কোমবে ক্লান্তি। জুতোব ভিতব ক্লান্তি। গা ময ঘাম। শুকনো জিভ। গলাব মধ্যে সেলোফেনেব মতো জিভ খডখডে। একসময তেষ্টা ওদেব সঙ্গমেব গানটা খুন কবল।

হঠাৎ বায থেমেছে। পিছিয়ে এসেছে ডুপা। ঠোঁটে চাপা শিস। হল্ট।

কাছাকাছি ঘন হলো ওবা। বায ফিসফিস কবে বলল, জাস্ট এ জোক, ফ্রেণ্ডস।

অধীব গুহ বলল, হাসব না। হাসি পাইব না। কইতে পাবস।

ধব, যদি হঠাৎ এখনই সামনে কোনো মেয়ে পেয়ে যাস তোবা?

ব্যানার্জি ফ্যাঁচ কবে হাসল। পেলে তো!

ধব যদি পাস, কী কববি?

বোস ঘোঁৎঘোঁৎ কবে বলল, ডিপেন্ড্স্। বযস কত?

যদি সতেব থেকে বাইশ হয়?

গুহ বলল, কইস না, কইস না। শুযাবেব মত দাঁত দিযা এফোঁড ওফোঁড কবিয্যা দিতে সাধ যায।

ব্যানার্জি মিষ্টি কবে বলল, তাকে ভালোবাসব, আদব কবব, বুকে বাখব।

বোস বলল, ডিপেন্ড্স্। এখন এই নিশীথবাতে কী যে কবব, বলা কঠিন। বাট আই এ্যাসিওব, আই উইল কিস হাব লাইক এনিথিং গড্ড্যাম হেল কিন্তু তুই? বায বল।

বায বলল, বৌ কবে নিযে যাব। সাবাজীবন ঘব কবব তাকে নিযে।

ওবা এবাব একসঙ্গে হাসল। তাবপব ব্যানার্জি চ্যালেঞ্জেব স্থবে বলে উঠল, দেন প্রমিজ, মা কালী, থুড়ি, হোযাট্স্-হাব-নেম, মা মনসাব দিব্যি কব।

কবলুম।

তাই হবে। বোস সায দিলো। তোব বে দিযে ড্যাংড্যাং কবে ফিবব সক্কালবেলা।

এবাব ব্যানার্জি বলল, ডিপেন্ড্স্। ও যদি বৌ হতে না চায?

জবাবটা গুহ দিলো। হঃ। বাযেব মতন পাত্র পাওনেব ঝঞ্ঝাট আছে। ও যদি খেঁদী-পেঁচী হয়?

বায শান্তভাবে জবাব দিলো, মেযে তো বটে। এখন একটা যাহোক ধবনেব মেযে আমাব ভীষণ দবকাব।

বোস পা বাড়িয়ে বলল, ঠিক আছে। ধব, সত্যিসত্যি যদি একটা তেমন কেউ মিলে যায, আমবা তোকেই ছেড়ে দেবো।

মধুচন্দ্রিকা বল। হনিমুন ইন দি ডার্কনেস। হায় কপাল, তুমি মচকাও শুধু, ভাঙো না। ভাঙলে তো বেঁচেই যাই বাবা।

ফেব ওবা সামনেব দিকে ঝুঁকে হাঁটছিল। হুমড়ি খেয়ে পডবাব মতো ঝোঁক আসে। পাছায হাত বুলোয কেউ। স্যাঁতসেতে লাগে। মনসা-তলাব জলেব ছোপ পাছায। ছুঁচলো জুতোব ডগা টোক্কব খায। বিডবিড কবে গাল দেয় ওবা। তলপেট থেকে কণ্ঠনালী অব্দি ঘুলিয়ে আসে কী উর্ধ্বচাপ। বায থুথু ফেলে 'বলে, চাবটেই টেক্কা, তুরুপেব তাস বাইবে! আমবা মবব। আব গুহ বলে, চাকুগ্‌গা শযতান। তা শুনে ব্যানার্জিব মন্তব্য : চাব জন ক্লাউন এংন গ্রীনরুমে যাচ্ছে। তখন বোস শুযাবেব মতো মুখ উঁচু কবে শ্বাস টেনে বলে, সিংহেব চামডা কেটে বেবিযে পডেছে চাব-চাট্টে গাধা।

ওবা নিজেদেব ওপব বেগে কাঁই হচ্ছিল। নিজেদেব গালাগালি কবছিল। আস্তে আস্তে সামনেব আকাশটা ফবসা হযে আসছিল। জ্বলজ্বল কবছিল একটা নিঃসঙ্গ নক্ষত্র। একটু লালচে বঙেব ছোপ দিগন্তে। কিছু ভাঁজ কবা পাতলা মেঘ দুধেব শবেব মতো। দুপাশে পড়ে আছে বাসি মুখেব মতো শস্যহীন ধূসব মাঠ। আবছাযা।

বায গলা ঝেডে নিযে বলে, একটা গল্প বলি শোন। আমবা চাবইযাব স্ফূর্তি মাবতে গিযেছিলাম এক গেঁযো মেলায। আমবা মাল খেযে ফৌত হয়ে গিযেছিলাম। ফেবাব পথে পেযে গেলাম এক অপূর্ব অষ্টাদশী সুন্দবী মেযে— ধব, তাব নাম কাজলবেখা।

বর্ণনা বা নামে আপত্তি থাকলেও কেউ বাধা দেয না। মেজাজ নেই।

তোবা তাকে খানকী বলবি, কেননা বাতদুপুবে মাঠে একা একজন যুবতী মেযে। আমি বলব, সে কোনো বিপদে পডেই একা পাডি দিতে বাধ্য হযেছে। হযতো স্বামী তাকে জ্বালায, স্বামী মাতাল. জুযো খেলে, ঠ্যাঙায— এইসব পাডাগেঁযে মেযেদেব কথা আমি শুনেছি, আই গট এ ফ্রেণ্ড সামহোয়্যাব ইন দি ভিলেজেজ এনিওযে, মেযেটি আমাদেব পাল্লায পডে গেল।

সবাই চুপচাপ কিছুক্ষণ। শুধু শ্বাসপ্রশ্বাসেব শব্দ ওঠে চলমান চাবটি দেহ থেকে।

বায বলতে থাকে। অন্ধকাব বাত্রি। বিবাট একটা মাঠ। কোথাও কোনো লোক নেই। যা খুশি কবা যেতে পাবে। আমবা তাকে ঘিবে

ধরলাম। মেয়েটি বোকা হলে কান্নাকাটি করবে। নিজের দুঃখের কথা ইনিয়েবিনিয়ে বলবে। এমনকি দিদি-মা-মাসি হতে চাইবে। আমরা ছাড়ব না। মেয়েটি বুদ্ধিমতী হলে কী করবে? আমাদের ভোলাবে। আমি জানি, বোসটা ভীষণ ব্যস্ত। সে ওকে জড়িয়ে ধরবে, চুমু খাবে। গুহ তার পাছায় চিমটি কাটবে। এ্যাণ্ড ব্যানার্জি' মাস্ট ট্রাই টু প্রেস হার। কিন্তু মেয়েটি তাতে বিচলিত হচ্ছে না।

রায় দম নিয়ে শুরু করে। হ্যাঁ, মেয়েটি বুদ্ধিমতী ছিল। আমরা তাকে নিয়ে ভাগাড়ের মড়ার মতো চারদিক থেকে কামড়াকামড়ি শুরু করলাম। সে বাধা দিলো না। শুধু বলল, একসঙ্গে জমে না। ব্যানার্জি বলেছিল, ওয়ান ফর ওয়ান। মেয়েটি বলল, একে একে আসুন। একটু আড়ালে যাই, আমার লজ্জা করে। সে তো ঠিকই। কিন্তু আমরা বললাম, না, ওতে স্ফূর্তি জমে না। একে-একে তো বটেই, তবে বাকি তিনজন ঘিরে থাকব। মেয়েটি রাজী। রাজী না হয়ে উপায় নেই। প্রথমে কে আসবে। আমরা আমরা পরস্পর তাকাতাকি করছিলাম। কে আগে? বোস, তুই বড্ড সেক্সম্যাড, তুই। বোস হঠাৎ নার্ভাস বোধ করল। বলল, আমি বরাবর লাস্টবেঞ্চার। ব্যানার্জি, তুই। ব্যানার্জি বলল, লেট মি ফার্স্ট সি এ্যাণ্ড বি ইট ইন ব্লাড, ও ইটস হেল, সো ফুল গুহ জিভ কেটে বলল, হাজার হউক, ভদ্রসন্তান, এ্যামন যাওন যায় ক্যামনে? এবং তখন আই রিমেন?—রায় দি গ্রেট।

রায় একটু হাসে। আসলে ব্যাপারটা কি জানিস? আমরা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেছি। দিস ইজ দি বায়োলজি। দিস ইজ পিওর সেক্স। যাই হোক, তখন গোড়ার প্রস্তাবটাই উঠল। মেয়েটির হাত ধরল কে? কল্পনা করতে পারিস? প্রথমে কে সামনের ঝোপটার ওপাশে নিয়ে গেল।

তিনজনে ফিসফিসিয়ে উঠেছে এতক্ষণে, কে?

· আমি, রায় দি গ্রেট। রায় বুড়ো আঙুলে নিজের বুকটা দেখায়।

তিনজনেই ঘড়ঘড়-করে, কেন?

রায় হাসে। দিস ইজ হিউম্যান সাইকলজি। মাইণ্ড ছাট, আমিই গল্পটা বলছি। ফার্স্ট প্রেফারেন্স সেদিক থেকে আমারই।

গুহ ঘুষি তোলে। চোপাহান ভাঙিয়া ফ্যালাইব একেরে।

বোস গর্জায়, শালা, আমরা বুঝি নপুংসক?

ব্যানার্জি থামায় ওদের। ছেড়ে দে রে। শালা, গল্পের মাগী গাছে

চড়ছে। স্বপ্ন যাকে বলে।

বোস সকৌতুকে বলে, কেন হয় বে ?

ওই তো হচ্ছে। ব্যানার্জি বাযেব দিকে কটাক্ষ কবে।

বায একটু কেশে ফেব শুরু কবে। আমি ওকে বেশ একটু তফাতেই নিযে গেলাম। তখনও ঘন অন্ধকাব আছে। কিছু দেখা যায না। কথা ছিল, হয়ে গেলে আমি শিস দেবো—অন্য একজন আসবে। পাছে মেযেটা পালিযে যায, তাই এ ব্যবস্থা। তাবপব কিন্তু অনেক দেবি হযে গেল। তোবা অধৈর্য হযে ফুঁসছিস। এত দেবি অস্বাভাবিক। তোবা ডাকছিলি। সাড়া না পেযে তিনজনেই ছুটে গেলি। দেখলি, আমি একা বলদেব মতো দাঁড়িযে আছি, সে নেই।

তিনজনে লাফিযে ওঠে। নেই ? পালিয়েছে ? হাত ফসকে ছুটে গেছে ?

বায বলে, না। আমিই পালাতে দিযেছি। বিলিভ মি, ছুঁইনি।

শালা মহাপুরুষ।

বিলিভ মি

কেন ?

হঠাৎ আমাব সব খাবাপ লাগল। কী হবে ? আমি ভাবছিলাম—সবি, তা নয—আমাব হঠাৎ ওকে ঘৃণা হলো। ভীষণ ঘৃণা। সাবা শবীব ঘৃণায ঘুলিযে উঠল। ওব মুখে থুথু দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ওকে মা-মাসি তুলে গালাগালি কবলাম। ওব পাছায লাথি মেবে বললাম, দূব হ খানকী। ও পালাল। তাবপব তোবা আমাকে একা দেখে

গুহ বলে ওঠে, চাক্কু মাবব।

ব্যানার্জি বলে, হাড়মাংস একাকাব কবে দেবো।

বোস ক্ষ্যাপা ষাঁড়েব মতো চেঁচায, বিট্রেয়াব!

হাত তুলে বায বলে, ওযেট। তোবা তিনজনে দারুণ ক্ষেপে গেলি। নিঃশব্দে দাঁতে দাঁত চেপে তোদেব কিলচড়ঘুঁষি আমি হজম কবছিলাম। আমাব চোখেব ওপব এক খাবলা মাংস ঝুলে পড়ল। বক্তে শবীব ভেসে গেল। তাবপব আমি অজ্ঞান হযে গেলাম। তোবা আমাকে জুতোয মাড়িযে চলে গেলি। ভোব হযে আসছিল।

ভোর হয়ে আসছিল। মেঠোপথের সামনে কংক্রিট স্ল্যাববসানো হাইওয়ে। খুব কাছেই। হঠাৎ বোস অমানুষিক গর্জন করে উঠেছে, রায়, তুই সত্যি সত্যি বিট্রেয়ার।

থমকে দাঁড়িয়েছে ওরা। আবছা আলোয় কয়েকশো গজ দূরে একটি মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ওরা বুঝতে পেরেছে, সারাপথ ও সামনে হেঁটে এসেছে। বুঝতে পেরেছে, এই শয়তানটা ওকে দেখেছিল।

বোস ব্যানার্জি আর গুহ ছুটে গিয়ে মেয়েটির পিছনে পৌঁছোয়। রায় একা আস্তে আস্তে হাঁটে। ওরা তিনজনে মেয়েটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মেয়েটি কিন্তু হাসে। ভোরবেলার আকাশের মতো সাদা একটু হাসি। কাজল-রেখা। আলতাপরা পা। পাকাশশার মতো বাহু। পায়ে রূপোর পাঞ্জুড়ি। হাতে রেশমী চুড়ি। কাজলরেখা।

কিন্তু ততক্ষণে কান্দী থেকে চারটে ত্রিশের যে বাসটা ছেড়েছিল, সে এসে পৌঁছোয় পথের এই মোড়ে। মৌগাঁয়ের বটতলায় স্টপ। ট্রেনের যাত্রী চলেছে ঘুমঘুম চোখে। বাস থামতেই মেয়েটি ওঠে। ভীড়ে হারাবার আগে তাকিয়ে একটু হেসে ওঠে ফের। কণ্ডাকটরের ঘন্টির শব্দ শোনা যায়। বাসটা গড়িয়ে চলে।

দূরপথে বাসটার ধূসর হতে হতে মিলিয়ে যাওয়া ওরা দেখছিল। সেই সময় রায় এলো। মরা মানুষের মতো টলছিল সে। দুটো লম্বা হাত দুপাশে দুলছিল খাপছাড়া মুখটা ঝুলিয়ে রেখেছিল সে। সৈনিকের মতে দেখাচ্ছিল তাকে—যার আর লড়াই করার উৎসাহ নেই।

বোস ফের শূন্যে লাফ দিয়ে চেঁচাল, বিট্রেয়ার! তারপর ঘুঁষি তুলে এগোতেই

ব্যানার্জি ওকে ধরেছে। সে বলে, ছেড়ে দে।

গুহ বলে, ছাড়ান দাও।

এগিয়ে এসে বোসের হাত হাতের তালুতে নিয়ে অন্তরঙ্গস্বরে রায় বলে, নেক্সট বাস ছটায়। ততক্ষণ হাঁটি। এবং ভোরবেলার মতো শান্ত হাসে সে।

ভারতের কৃষিতে পুঁজিবাদী রণনীতি

জ্যোতি দাশগুপ্ত

প্রচারধর্মী আমাদের এই যুগে নানা কথার আবরণ ভেদ করে সারবস্তু পেতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। তবে, ব্যাপক প্রচারের এই যে যুগ, তার মাহাত্ম্যেই মানুষ যখন সত্য কথাটা টের পায়, তখন সেই কথা চারদিকে বেশ বৃহৎ আকারেই জানাজানি হয়ে যায়।

গত এক যুগ ধরে বলাবলি হয়েছে আমরা আমেরিকার খেয়ে বাঁচি। বছরে ৬০ লাখ টন গমের আমদানি করা হলে, তার ছবি ছাপালে, চুক্তি করার নানা কাহিনী টানাপোড়েন দরকষাকষি শর্তশিকল শেষপর্যন্ত বন্দরে বোঝা নামানোর কাজে "লাখ লাখ" শ্রমিকের হাঁকডাক খাটুনি সবিস্তারে প্রকাশ পেতে থাকলে ৬০ লাখ টন গম প্রত্যহ চোখের সামনে নাচতে থাকে। তার তুলনায় বছরে যে ৬-৭-৮ কোটি টন খাদ্যদানা আমাদের দেশের কৃষকেরা নিঃশব্দে তৈরি করে চলেছে তা বিস্মৃতি ও তাচ্ছিল্যের অন্ধকারে তলিয়ে যায়। আসলের চেয়ে উপরি সর্বদাই মনে বেশি দাগ কাটে।

এবার আমাদের দেশের কৃষকেরা কিছু বেশি ফসল ফলিয়েছে। অমনি "আমেরিকার খাই" প্রচারটা চুপসে যেতে বসেছে এবং বিকৃত সত্যের বদলে আর একটি সত্য চোখের সামনে ভেসে উঠতে আরম্ভ করেছে যে দেশে খাবার থাকলেই মানুষের খাওয়া হয়না। "চায়ের কাপ ও ঠোঁটের মধ্যে বিস্তর ফারাক।" এতদিন ধরে নেওয়া হয়েছিল দেশে খাদ্যের টান বলেই মানুষের যাকিছু দুর্ভোগ। এবার স্পষ্ট হতে থাকলে প্রাচুর্যের মধ্যেও অভাব থাকতে পারে এবং তার প্রাদুর্ভাবটাই এদেশের প্রধান রোগ। খাদ্যের অভাবের তুলনায় আমাদের স্বভাবের সেই ব্যাধিটাই অনেক বেশি প্রাণান্তকর।

বিদেশ থেকে ৬০ লাখ টন গম আমদানির কথাটা প্রচারগুণের দৌলতে

ফাঁপিয়ে তোলা আদৌ কঠিন ছিলনা। গোটা পশ্চিমবাঙলায় যে পরিমাণ খাদ্য তৈরি হয়, তার প্রায় দেড়া বিদেশ থেকে আনা নিশ্চয়ই খুব লঘু ব্যাপারও নয়। কিন্তু ভারতবর্ষ জুড়ে উৎপাদিত খাদ্যের মাত্র ৬-৭ শতাংশ যা আমদানি করা হয়, কোমর বেঁধে দাঁড়ালে সেই ঘাটতিটা পূরণ করা যায় এই কথাটা এমন কঠিন শোনাবে কেন? আসৎ সত্য ঐ দ্বিতীয়টির মধ্যেই নিহিত। কিন্তু দেশের প্রয়োজনে যে কথা খুবই সহজ সরল কথা বলে মনে হয়, সম্পত্তির মালিকানার জটের মধ্যে সেকথাটাই বিস্তর গোলমাল পাকিয়ে দেয়। "কার গোয়াল আর কে দেয় ধোঁয়া" আপ্তবাক্যটি দৈত্যের আকার ধারণ করে। মালিকানায় অধিকাংশ সম্পত্তির যারা অধিকারী তাদের সেই জমিতে কাজ করে ভাগচাষী। পুঁজি এবং শ্রম দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে।

পুঁজি ও শ্রমের সমন্বয়ের অভাব ভারতীয় কৃষির সামনে প্রধান সঙ্কট। ভাগচাষী ছাড়াও স্বল্পবিত্ত চাষী দেশ ছেয়ে রয়েছে। পুঁজির অভাব তাদেরও খোঁড়া করে রেখেছে।

মাথার উপরে আছে পুঁজিবাদী সরকার। তারা পুঁজির মাহাত্ম্য জানেন না, এমন কথনো হতে পারেনা। বরং পুঁজির শক্তিকে তাঁরা এমন মাত্রা ছাড়িয়ে বুঝেছেন যে, তাতে নতুন বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়েছে। পুঁজির যখন জোর তখন বেশি লোকের হাতে তাকে ছড়িয়ে দেবার বদলে মুষ্টিমেয়কে বলীয়ান করার প্রবৃত্তি তার থেকেই জন্মেছে। তবু ঐ তত্ত্বটা বিকৃত। বিকৃত একারণে যে, পুঁজির যেমন জোর, শ্রমের জোর আরও বেশি। উভয়ের সমন্বয়ে সার্থকতা। অন্যথায় পুঁজি ও শ্রমে হানাহানি ও কাটাকাটি যার ফলে সমাজের চূড়ান্ত বিকৃতি ঘটে।

এবারের কিছু অধিক ফলনে শাসকদের প্রচারগুলি যে মূর্তি ধরেছে—তা সেই বিকৃত পুঁজিবাদী চিন্তারই নতুন সংস্করণ। গত তিনবছর খরায় ফলন মার খেয়েছে। সেচের অভাবের কথা তখন খুবই পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। তিনবছর আগে '৬৪-'৬৫ সালে ভারতের সীমিত সেচ-জমির মধ্যেও প্রধানত সুবৃষ্টির ফলে খাদ্যের উৎপাদন হয়েছিল ৮ কোটি ৯০ লাখ টন। তার তুলনায় চলতি '৬৮ সালে ৯ কোটি ৬০ লাখ টন খাদ্য হয়েছে। অর্থাৎ ৭০ লাখ টন বেশি খাদ্যদানা এবছর পাওয়া গেছে। তিনবছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধরলে ফসল বৃদ্ধির কোনো হার বড় থাকেনা। অথচ কী উল্লাস। গবর্ণমেণ্ট "সবুজ-বিপ্লব স্মারক" ডাক-টিকেট ছেপেছেন।

এই যে ফসলবৃদ্ধি, তা নাকি আবার সরকারেরই কৃতিত্ব। তিনবছর খরার মধ্যে যে সাফল্য টের পাওয়া যায়নি, পুনরায় একটি সুবৃষ্টির বছরে সরকারই নাকি সে অবস্থার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। এক মাঘে শীত যায় না। পশ্চিম-বাঙলা, গুজরাট ও ত্রিপুরায় বন্যা এবং অন্ধ্রের খরা ইতিমধ্যেই আগামী মাঘ মাস সম্পর্কে দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করেছে।

ভারত সরকার কৃষিতে একটি "রণনীতি" অনুসরণ করছেন। তার মূলাধার হলো "বিস্ময়কর বীজ।" এই রণনীতির উদ্গাতা হলেন শ্রীসি সুব্রাহ্মনিয়ম। '৬৭ সালের নির্বাচনে পরাজিত হবার আগে তিনি ছিলেন ভারতের খাদ্য ও কৃষিদপ্তরের মন্ত্রী। '৬৫ সাল থেকে চালু বলে ঘোষিত এই রণনীতির ব্যাখ্যায় শ্রীসুব্রাহ্মনিয়ম নিজেই বলেছিলেন যে, তাঁর কর্মনীতির দুখানা ডানা হলো :

(১) ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ একর জমিতে পৌঁছনোর লক্ষ্য নিয়ে একটি কার্যক্রম যার অবলম্বন হলো নতুন আবিষ্কৃত অধিক-ফলনের বীজ, জলের ব্যবস্থাপনা, কীটনাশক এবং সর্বোচ্চ পরিমাণে সারের ব্যবহার, আর তারই উপযোগী সুশিক্ষিত কৃষি-সংগঠন। এই উন্নত চাষের জন্য এবং ফলন-বর্ধক উপাদান ব্যবহারের জন্য কৃষককে প্রচুর পরিমাণে ধানের জোগানও দিতে হবে।

(২) প্রধান প্রধান খাদ্যদানার চাষে অল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতা-সম্পন্ন বীজের প্রচলন করা হবে যাতে দেশের সেচ-অঞ্চলের জমিতে একের বদলে দু'টি ফসল হতে পারে। '৭০-'৭১ সাল নাগাদ এই কার্যসূচীর মধ্যে ৩ কোটি একর জমি এনে ফেলা হবে।

ভারতবর্ষে মোট ৪৫ কোটি একর জমিতে চাষ করা হয়। শ্রীসুব্রাহ্মনিয়ম তথা ভারত সরকারের পরিকল্পনা হলো তার মাত্র ৩ কোটি ২০ লাখ একর খারিয়া ও ৩ কোটি একর রবি মোট এই ৬ কোটি ২০ লাখ একর জমির উপর বাগান বানিয়ে দেশকে উদ্ধার করে দেওয়া। সেচযুক্ত জমিও সবটা ধরা হয়নি। ভারতে সেচ-যুক্ত জমির পরিমাণ প্রায় ৯ কোটি একর। তার মধ্যে মাত্র ৬ কোটি ২০ লক্ষ একর জমির উপর সরকারী পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ। আদতে ৬ কোটি একর জমিও নয়। দো-ফসলা জমি দু-বার ঐ হিসেবের মধ্যে রয়েছে। ফলে বড়জোর [illegible] কোটি একর জমি নিয়েই সরকার কিস্তিমাতের কথা ভাবছেন।

একটু নজর দিলেই দেখা যাবে আবার সেই উপরির পাল্লায় পড়া গেল : সরকারের কোনো পরিকল্পনা ও সাহায্য ছাড়াই ৪০ কোটি একরের আবাদ যাহোক করে চাষীরা করে যাবেন, তা থেকে দেশের সিংহভাগ ফসলও পাওয়া চাই—কিন্তু সরকারের যা কিছু মাথা ব্যথা তা শুধু উপরি এককোটি টন অধিক ফসলের জন্য। বলাই বাহুল্য এই দৃষ্টি আদৌ বাস্তববাদী নয়।

এই বিকৃত চিন্তা কোথায় টেনে নামায় তার একটি দৃষ্টান্ত পাঞ্জাবের প্রাক্তন সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীলছমন সিং গিলের একটি ভাষণ। ভারত সরকারকে উদ্দেশ করে তিনি বলেছিলেন :

"দেশে ৭৫ লাখ ঘাটতি খাদ্যের পুরোপুরিটা পাঞ্জাব একা মিটিয়ে দিতে পারে—যদি ভারত সরকার পাঞ্জাবকে ৫০০ কোটি টাকা দেন। এজন্য পাঞ্জাবের দরকার হবে একলাখের কিছু বেশি ট্রাকটর এবং নব্বই হাজার টিউবওয়েল।"

ভারতের দশকোটি টন নিতান্ত প্রয়োজনের খাদ্যদানা উৎপাদনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি নিয়ে উপরি মাত্র ৭৫ লাখ থেকে ১ কোটি টন উৎপাদনের কথা ভাবলে শ্রীগিলের ঐ দাবি অযৌক্তিক ও অবাস্তব নয়। কিন্তু প্রকৃত সমাজ-বাস্তবে ঐ হিসাব ভুল। কারণ, ৪০ কোটি একর জমির কৃষি ও কৃষককে উপেক্ষা করে উপরির জন্যই যখন সমগ্র সরকারী নজর নিবিষ্ট করা হবে, তখন তারই আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়া হবে উপেক্ষিত জমির এবং কৃষকের উৎপাদিত ফসলের হ্রাস। সেই আসলের ক্ষয়কে কখনোই উপরি দিয়ে পূরণ করা যাবে না।

পুঁজিবাদীদের দৃষ্টি বড়ই ক্ষীণ। কৃষিতে পুঁজির জোগান দেবার জন্যই শাসক কংগ্রেস দলের মধ্যেও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দাবি তীব্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাকে ধামাচাপা দিয়ে আনা হলো ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিল। কৃষির ব্যাপক উন্নতির স্বার্থকে উপেক্ষা করে সীমিত উন্নতির কর্মধারার এই হলো প্রত্যক্ষ পরিণতি।

আর তার ফল কি দাঁড়ায়? ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রনকে কার্যকর করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি "জাতীয় ঋণদান পরিষদ" তৈরি করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই স্বয়ং ঐ পরিষদের সভাপতি। সদস্য হলেন প্রধানত কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কর্তারা। পরিষদ '৬৮—'৬৯ সালের ব্যাঙ্কের অতিরিক্ত ঋণদান সম্পর্কিত যে-খসড়া তৈরি করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, ব্যাঙ্কের

মোট ২৮০-৩২০ কোটি টাকা অতিবিক্ত লগ্নিব মধ্যে কৃষিব জন্য ৩৫-৪০ কোটি টাকা পাওযা যেতে পাবে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণেব আগেই '৬৭-'৬৮ সালে কমার্শিযাল ব্যাঙ্কগুলি কৃষিতে ১৮ কোটি টাকা ঋণ জুগিযেছে। অনেক বাগবিস্তাব কবে বচিত আইনেব দৌলতে মাত্র ঐ সামান্য টাকা কৃষি পেলেও পেতে পাবে।

ফাঁকির কথাটা ওখানেই শেষ নয়। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি গ্রামে প্রবেশ কবলে টাকা শুধু তাবা লগ্নি কববেনা, গ্রামেব টাকার আমানতও বেড়ে যাবে। ফলে ব্যাঙ্ক কৃষিব জন্য যে-ঋণ জোগাবে, তাব চেয়ে অনেক বেশি টাকা কামাবে।

আর তাব সঙ্গেই যোগ হলো, সেই টাকাও দেওয়া হবে কিঞ্চিৎ স্বচ্ছল ব্যক্তিদেব।

অনেক প্রতিবাদ এবং প্রতিকাবেব কোনো কথাই আপাতত পুঁজিতান্ত্রিক সবকাব শুনতে বাজি নন। কাঁধেব ভূত তাঁদেব সহজে নামাব নয়।

উদাহরণ পশ্চিমবাঙলা রাজ্য সবকাব প্রচার কবেছেন যে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি বাজ্যেব কৃষিতে মোট ২০ কোটি টাকা ঋণ দিতে প্রস্তুত এবং ঐ টাকায ৪০ হাজাব নলকূপ বসানো হবে। কাবা ঐ টাকা পাবেন? সবকাব বলে দিলেন এক লপ্তে অন্তত পাঁচ একর জমি না থাকলে কেউ ঐ টাকাব জন্য আবেদন জানাতে পারবেন না। একলপ্তে পাঁচ একর জমি কেন, মোট পাঁচ একব জমিব মালিক কজন আছেন? পুঁজিবাদী সবকার তেলা মাথায তেল দিযেই একটি পুঁজিতান্ত্রিক কৃষকশ্রেণী গডতে চাইছেন।

পুঁজিতান্ত্রিক ঐ কৃষি বণনীতিব বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত হযেছিল পরিকল্পনা কমিশনেব মধ্যেই। পবিকল্পনা কমিশনেব সহসভাপতি শ্রীগ্যাডগিল এবং কমিশনেব মধ্যে কৃষি-বিশেষজ্ঞ-প্রধান শ্রীভি কে আব ভি. রাও প্রকাশ্যে ঐ তথাকথিত বণনীতিব বিরুদ্ধে দাঁড়িযেছিলেন। কিন্তু নীতির চেয়ে চাকুবী বড হলে যা হয় এক্ষেত্রে সেই পবিণামই ঘটছে।

তবু প্রতিবাদ থামেনি। নতুন নতুন জায়গা থেকে সতর্কবাণী উচ্চাবিত হচ্ছে।

বোম্বে বিশ্ববিদ্যালযেব অর্থনীতিব অধ্যাপক ডঃ পি আব ব্রহ্মানন্দ গত ১৬ই মে (১৯৬৮) বাঙ্গালোবে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন'-এর একটি সভায় ভাষণ দেন। তিনি বলেন ঃ

"কৃষিপণ্যেব সববৰাহেব ব্যাপাবে নতুন বণনীতিব উপব ভরসা কবে চলা একটি জুয়াখেলা।" বিশদ বিশ্লেষণে তিনি দেখান যে, ঐ বণনীতিব দৌলতে বছবে ৫ শতাংশ হাবে কৃষিজাত দ্রব্য বাড়াতে হলে ফসলবর্ধক শিল্পজাত উপাদান অন্তত দ্বিগুণ দবকাব হবে। দ্বিতীয়ত ঐ বণনীতিব ফলে "গ্রামদেশে অসমতা এবং অঞ্চলভিত্তিক অসমতাও বেড়ে যেতে থাকবে। যাব আছে ও যাব নেই, তাদেব ব্যক্তিগত অসমতা বাড়বে। শুধু তাই নয়, এক বাজ্যেব সঙ্গে অন্য বাজ্যেব এবং একবাজ্যেব বিভিন্ন অঞ্চলেব মধ্যে সমস্যাগুলিও আগামী বছবগুলিতে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।"

এই অসমতা-বৃদ্ধিব বিষয়টাকেই প্রথমে আলোচনা কবা যাক। পশ্চিম-বাঙলাব ডঃ অশোক মিত্রও ডঃ ব্রহ্মানন্দেব ভাষাকে আবও স্পষ্ট কবে ভেঙ্গে দেখিয়েছেন যে ঐ বণনীতিব দরুণ বাজ্য হিসেবে "পাঞ্জাব, হবিয়ানা, গুজবাট, মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্রে সম্ভবতঃ বছবে ১০ শতাংশ ফসল বৃদ্ধি হতে পাবে, কিন্তু অন্যদিকে উড়িষ্যা, পশ্চিমবাঙলা, আসাম, বাজস্থান ও কেবলসমেত অন্যান্য বাজ্যে ফসল হয়তো বা ৩ থেকে ৪ শতাংশ গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে বৃদ্ধি হলেও হতে পাবে।"

ডঃ মিত্র কী কবে ঐ সিদ্ধান্তে এসেছেন? স্বাভাবতই সেচযুক্ত জমিব পবিমাণ দেখে। পশ্চিমবাঙলায় সেচ-জমিব আবও দুর্ভোগ রয়েছে। ডি-ভি-সি, ময়ূবাক্ষী, কংশাবতী প্রভৃতি পশ্চিমবাঙলাব প্রধান সেচগুলি বৃষ্টিব জলেব উপব নির্ভবশীল। ফলে ববিচাষেব সেচ পশ্চিমবাঙলায় খুবই সীমিত। সেজন্যই পশ্চিমবাঙলা উপেক্ষিতেব দলে পড়ে গেছে।

সম্বৎসব সেচেব জন্য প্রকল্প গড়া ভালো কথা—কিন্তু একবোখা কথা। অন্য প্রয়োজন হলো কৃষিব স্বার্থেই জলনিকাশীব ব্যবস্থা কবা। জলনিকাশী ব্যবস্থাব অভাবে পশ্চিমবাঙলার কত জমি অপচিত হচ্ছে তাব সীমা নেই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সবকাবেব নতুন কৃষি বণনীতিতে তাব স্থান নেই। বসিবহাট, বাবাসত, বনগাঁ, ব্যাবাকপুব অঞ্চলেই জলনিকাশীব অনেক পবিকল্পনা সবকাবেব খাতাপত্রেব মধ্যেও ছিল। কিন্তু আজ সবই শিকেয় উঠিয়ে বাখা হয়েছে।

সবকাবী নতুন কৃষি-বণনীতিতে জমি বাছাইয়েব কাজ ওভাবেই সীমিত হয়ে গেল। দ্বিতীয় কথা, ব্যাঙ্ক ও সবকাবেব পুঁজিব সাহায্য কাবা পাবেন? ডঃ অশোক মিত্র সমীক্ষালব্ধ জ্ঞানেই বলেছেন:

"সমবায় ঋণ সমেত যাবতীয় ঋণদানেব ব্যাপাবে এবং সাব বিতবণেও অপেক্ষাকৃত বেশি জমিব যাঁবা মালিক তাঁবাই প্রাপক হচ্ছেন · এ হচ্ছে পৃথক এক ভাষায় বলে দেওয়া যে, আমাদেব দেশ যে-কৃষিব উন্নতিব জন্য ব্যগ্র তা যেন শুধু গ্রামদেশে বিদ্যমান অসাম্যকে আবও বাড়িয়েই অর্জন কবা সম্ভব।"

এভাবেই ভাবতে কৃষিতে পুঁজিবাদী তত্ত্বকে খাড়া কবা হয়েছে।

ডঃ ব্রহ্মানন্দ তাঁব ভাষণে অপব একটি সতর্কবাণী যা শুনিয়েছেন তা হ'ল "ফসল-বর্ধক দ্বিগুণ শিল্পজাত উপাদান" ব্যবহাবেব বিপদ। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা বিপদের তো নয়ই, ববং মুগ্ধকব। কৃষি ও শিল্পেব হাত ধবাধবি কবে চলা এবং বিজ্ঞানেব প্রয়োগ মনোমুগ্ধকব কথা সন্দেহ নেই। সবকাবী কৃষি-নীতিতে বিস্ময়কব বীজেব সঙ্গেই কলকাবখানায় প্রস্তুত বাসায়নিক সারেব স্থান দেওয়া হয়েছে। সাবেই বিস্ময়কব বীজকে কথা বলায়। সমীক্ষাতে দেখা গেছে প্রচলিত বীজেব উপর প্রতি ৫ কেজি অ্যামোনিয়াম সালফেট সাব প্রয়োগে যখন ৮ কেজি বেশি ধান পাওয়া যায় তখন বিস্ময়কব বীজ-এব উপর ৫ কেজি সাব প্রয়োগ ১৫ কেজি বেশি ধান ফলাতে পাবে। নতুন বণনীতিব অধিক উৎপাদনেব সূত্রটাই হলো বীজ ও সাবেব যোগফল। তবে, শেষোক্ত বীজ ধবলেও প্রতি এক কেজি সাবে তিন কেজি ধান পাওয়া সম্ভব। এক কেজি অ্যামোনিয়াম সালফেট সাবেব বর্তমান বাজার দর সবকাবী ভর্তুকি দিযে কমাবাব পবও ৯২ পয়সা। প্রতি তিন কেজি ধান যাব সবকাবী দব দু টাকাব কিছু কম তা উৎপাদনেব জন্য শুধু সাবের খবচই দাঁড়াবে প্রায় ১ টাকাব মতো।

এই সাবও মুখ্যত বিদেশ থেকেই আমদানি কবতে হবে। ভাবতবর্ষে এবছব বাসয়নিক সাবেব উৎপাদন মাত্র ৩ লাখ ৬১ হাজাব টন। অথচ ভাবত সবকারেব কৃষি রণনীতিতে এবছব বাসায়নিক সাবেব প্রয়োজন হবে ২০ লাখ টন। বাইরে থেকে আমদানিব মোট ১৭ লাখ টনেব মধ্যে ৯ লাখ টন আমদানিব চুক্তি যা আমেবিকার সঙ্গে স্বাক্ষবিত হযে গেছে তাব বাবদ ভাবতকে ১৫০ কোটি টাকা দিতে হবে। অর্থাৎ গত দশবছর ভাবতবর্ষ আমেবিকাব পি-এল ৪৮০ গমেব জন্য গড়ে বছবে ১৫০ কোটি টাকা দিয়েছে—এবছব গমেব বদলে সাবে ১৫০ কোটি টাকা দেবে। আব এবই নাম বাখা হয়েছে ভাবতেব "কৃষিবিপ্লব"।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি কথায় মানুষেব স্বাভাবিক যা টান আছে ভাবতেব পুঁজিবাদী সবকাব তাবই প্রচাবে দেশেব চিন্তাকে ঝলসিয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে যেমন কর্মনাশা অটোমেশনেব বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে লডতে হয়, কৃষিক্ষেত্রেও তাব ব্যতিক্রম নেই।

ভাবতেব প্রকৃত কৃষি-বিপ্লবকে সমাজ-বিপ্লবের হাত ধবেই আসতে হবে। পুঁজিতান্ত্রিক সবকাব সেই নির্দিষ্ট সমাজ-বিপ্লবেব প্রয়োজনটিকেই এডিয়ে চলতে চান। কংগ্রেসীয়া কী বলতে ও কবতে চান তাব সূত্রাকাব একটি বর্ণনা দিয়েছেন পশ্চিমবাঙলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন বীবভূমে সাম্প্রতিক একটি নির্বাচনী ভাষণে। তিনি বলেছেন ঃ

"শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা কবতে হলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি কবে শিল্প উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। কংগ্রেস কৃষি-বিপ্লব চায় প্রযুক্তি বিদ্যাই দেশে বিপ্লব আনতে পারে। তাই কংগ্রেস প্রযুক্তিবিদ্যার পথে শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নতিব দিকে দেশকে এগিয়ে নিতে চাইছে।"

দেশের ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান আবও বাডিয়ে প্রযুক্তিবিদ্যাব ঐ প্রয়োগ যে প্রতি-বিপ্লব সেকথা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু ধনিকশ্রেণী তারই নাম রেখেছে "কৃষি-বিপ্লব"।

নিয়তি

অমল দাশগুপ্ত

রেলকোম্পানি বিজ্ঞাপন দিয়েছিল একজন পানিপাঁড়েব জন্যে। মাসে ষাট টাকা মাইনে। তবে সম্ভবত মাইনেব জন্যে নয়, তৃষ্ণার্তদেব জলদান কবাব পুণ্য সঞ্চয়েব জন্যে অন্যান্য অনেকেব সঙ্গে বহু বি-এ, বি-এস্‌সি, এম-এ, এম-এস্‌সি, এমনকি বি-ই পর্যন্ত এই পদটির প্রার্থী। ত্রেতায় ও দ্বাপবে যা স্বাভাবিক ছিল কলিতে তা অবশ্যই নয়। কিন্তু বামায়ণ-মহাভাবতেব এই সনাতন ভাবতবর্ষে পুণ্যার্থীদেব সংখ্যা এই ঘোব কলিতেও বিলীয়মান নয়, তা এই ঘটনাটিব দ্বাবা প্রমাণিত।

খববেব কাগজে ছাপা হওয়া সত্ত্বেও খববটি যাঁবা এখনো অবিশ্বাস করছেন, বুঝতে হ'ব তাঁবা এমন পুণ্যবান নন যে পবিপূর্ণ বিশ্বাসী হতে পাবেন। আমাব ক্ষমতা সামান্য, তবুও আমি এই খববেব সমর্থনে একটি স্পেসিফিক দৃষ্টান্ত উপস্থিত কবতে চাই। একজনেব মনে বিশ্বাস সৃষ্টি কবতে পাবলেও পুণ্যলাভটা উভয়তই

ছেলেটিব নাম বাখাল। এম-এস্‌সি পর্যন্ত পবীক্ষাব ধাপগুলো এমন অবলীলাক্রমে পাব হয়ে এসেছে যে আত্মীযস্বজনেব ধাবণা হয়েছিল ছেলেটি প্রতিভাবান এবং ছেলেটি মস্ত একটা কিছু হবে। মস্ত একটা কিছু মানে অবশ্যই মস্ত চাকুরে। এম-এসসি পাশ কবাব পবে অধ্যাপক হবাব প্রথম সুযোগটি যখন নিতান্ত তাচ্ছিল্যেব সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে বসল তখনো আত্মীয়-স্বজনেব ধারণা চিড খায়নি। অনেকেই আশা কবেছিল বাখাল এবাবে কোনো একটা ফাউণ্ডেশনের স্কলাবশিপ নিয়ে বিদেশে যাবে এবং বিদেশেব কোনো একটা সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হবাব পবে মস্ত একটা চাকরিব অফার পকেটে

নিয়ে দেশে ফিরবে কিংবা আরো মস্ত একটা চাকরি নিয়ে বিদেশেই থেকে যাবে।

রাখাল কিন্তু কোনো দিকেই গেল না, এমনকি যতোটুকু চেষ্টা করলে কোনো একটি ফাউণ্ডেশনের স্কলারশিপ পাওয়া যেতে পারত তাও নয়। কিছুকাল কাটিয়ে দিল নিশ্চিন্ত মনে দেশ বেড়িয়ে, ফিরে এসে ঘোষণা করল কোনো একটি পরিসংখ্যান সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে সে নাকি ইলেকট্রনিক কম্পুটর নিয়ে গবেষণা করছে। গবেষণার বিষয়ঃ কম্পুটেশন-তত্ত্ব ও ঘটনা-বিচার।

ওর সম্পর্কে একটা উঁচু ধারণা যারা এতদিন ধরে লালন করে এসেছে তারা এবারে যেন একটু থমকে দাঁড়াল। কম্পুটর মানেই তো অটোমেশন। আমাদের দেশে এ-লাইনের ভবিষ্যৎ কী? সারা দেশ জুড়ে অটোমেশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে, মানুষগুলো এমন মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে যে চুপিসাড়েও কোথাও একটি কম্পুটর বসানো যাচ্ছে না, হাজার মানুষের ক্রোধ আগুনের মতো গন্‌গন করছে—রাখাল কি কিছু খবর রাখে না? বেশ তো, কম্পুটর নিয়ে গবেষণা করতে চাও তো বিদেশে যাচ্ছ না কেন? কম্পুটরের দেশ অমেরিকা? শিকাগো? এম-আই-টি?

রাখাল এই বলে সবাইকে আশ্বস্ত করতে চায় যে তাঁর গবেষণার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল, অটোমেশন-বিরোধী আন্দোলনের জন্যে সেই ভবিষ্যতের কোনো রকম হানি ঘটাবে এমন আশঙ্কা নেই। বরং কম্পুটরের সাহায্যেই সে এই মুহূর্তে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পারে, আমাদের দেশে যে-ফর্মে অটোমেশন প্রবর্তনের চেষ্টা হচ্ছে তা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক। যতো শীঘ্র এ-চেষ্টা বন্ধ হয় দেশের পক্ষে ততোই মঙ্গল।

বিষয়টিকে স্পষ্ট করবার জন্যে রাখাল একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকে। আজকাল প্রত্যেকটি স্কুলের নিচের ক্লাশে কিশলয় নামে একটি বই পড়ানো হয়। বইটি আকারে নিতান্ত ছোট নয়, ওজনেও নয়। শিশুদের ওপরে এমনিতেই যথেষ্ট বোঝা, আবার এই কিশলয়ের বোঝা চাপাবার দরকারটা কী। গোটা কিশলয় বইটির মাইক্রোফিল্‌ম করা হোক। শিশুরা তখন শার্টের বুকপকেটেই গোটা বইটি পুরে নিয়ে চলাফেরা করতে পারবে। ক্লাশে থাকবে প্রত্যেকের জন্যে একটি করে প্রোজেক্টর। সেই যন্ত্রে মাইক্রোফিল্‌ম প্রোজেক্ট করে শিশুরা গড়গড় করে কিশলয় পড়বে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই টেকনিকাল উদ্ভাবনার

আশ্চর্য প্রযোগ দেখে স্বয়ং আমেবিকাও শিহবিত হতে পাবে। প্রোজেক্টবেব অভাবে অধিকাংশ শিশুব পডাশুনা যদি বন্ধ হযে যায তো প্রধানমন্ত্রী সংসদে এই মর্মে একটি বিবৃতি দিতে পাবেন যে ভাবতেব একটি শিশুও মূর্খ থাকুক তা তাঁবা চান না এবং এ-সম্পর্কে যা কিছু কবণীয় তাঁবা কবছেন।

যাই হোক, অটোমেশন যেক্ষেত্রে টেকনিকাল অগ্রগতিব আধুনিকতম একটি নিদর্শন ভাবতকেও অবশ্যই সামিল হতে হবে। পাবমাণবিক শক্তি উৎপাদনে ভাবত কি পিছিয়ে আছে ? বকেট নির্মাণে ? পবমাণু-বোমাব কথা যদি বলো তো ভাবত কি অনেকবাবই ঘোষণা কবেনি যে পবমাণু-বোমা ফাটানো ভাবতেব অসাধ্য নয় ?

আসল কথা, কম্পুটব প্রবর্তনের সঠিক ক্ষেত্রটি নির্বাচনে ভুল হযেছে মজাব কথা এই যে একমাত্র কম্পুটবেব সাহায্য নিলে পবেই এই ভুলটি গোডাতেই ধবা পডত।

ভাবতেব চতুর্থ পবিকল্পনাকে যে এখনো পর্যন্ত আঁতুড থেকেই বাব কবা গেল না তাব জন্যে বিশেষজ্ঞদেব দোষ এটুকু যে তাঁবা কেন ঠিক সমযটিতে কম্পুটবেব সাহায্য নেওয়াব প্রয়োজন বোধ কবেন নি ? কম্পুটব বহু পূর্বেই অবধারিত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পাবত যে কযেক কোটি লুপ ও কিছু মাকিন বিশেষজ্ঞ অবলম্বন কবেই ভাবত চতুর্থ পবিকল্পনা-কাল উত্তীর্ণ হতে পাবে।

বাখাল এই মত পোষণ কবে যে এমনি নানা ক্ষেত্রে কম্পুটব প্রবর্তনেব অতিবিস্তৃত সুযোগ ও সম্ভাবনা ভাবতে বযে গিয়েছে। এমনি একটি ক্ষেত্র হচ্ছে ভাবতীয় সংসদ। নির্বাচন বন্ধ কবাব কথা হচ্ছে না। এম পিবা অবশ্যই নির্বাচিত হবেন। তাঁরা অবশ্যই নানা বিষয়ে প্রশ্ন তুলবেন। কিন্তু সেই প্রশ্ন নিযে সংসদে আদৌ আলোচনা হবে কিনা তা সদস্যবা নিজেবাই স্থিব কববেন কম্পুটবেব সাহায্যে। যেমন, ধবা যাক, মাননীয় সদস্য মহোদয় প্রশ্ন তুললেন, প্রতিবক্ষা মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে ভাবতেব উত্তব সীমান্তে শত্রুব তৎপবতা বৃদ্ধি পেয়েছে ? প্রশ্নটি সকল ড্যাটা সমেত কম্পুটবে ফীড কবা হল। সঙ্গে সঙ্গে আউটপুট কার্ডে পাঞ্চড হযে বেবিযে এল প্রতিবক্ষা মন্ত্রীব জবাব : মাননীয় সদস্য মহোদয নিশ্চিন্ত হতে পাবেন, শত্রুব আক্রমণেব মোকাবিলা কবাব ক্ষমতা আমাদেব জওযানদেব আছে। অতঃপব এ প্রশ্নটি নিযে আলোচনা না তোলাই সঙ্গত হবে। অপর কোনো সদস্য হযতো প্রশ্ন কবতে চান : প্রধানমন্ত্রী কি এ-বিষয়ে অবহিত যে যৌথ কোলাবোবেশন কোম্পানি মাধ্যমে বিদেশী

পুঁজি ভারতে শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং ভারতকে একটি নয়া-উপনিবেশে পরিণত করছে। কম্পুটরের জবাব পাওয়া গেল : মাননীয় সদস্য মহোদয় নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হতে পারে এমন কোনো ব্যাপার ভারত গভর্ণমেণ্ট বরদাস্ত করবেন না। অতঃপর এ-প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্যে পীড়াপীড়ি না করলেই মাননীয় সদস্য মহোদয় সংসদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সমর্থ হবেন।

ভারতে কম্পুটর প্রবর্তনের এমনি ক্ষেত্র আরো বহু। যেমন, পশ্চিমবাংলার আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন। ময়দানে সভা ডাকা হয়েছে। উদ্দেশ্য নির্বাচনী প্রচার। কম্পুটরের সাহায্যে আগে থেকেই জানা গেল সভা কেমন হবে, কে কী বক্তৃতা দেবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনি কিছুদিন চলার পরে অতঃপর আর নির্বাচনী প্রচারের জন্যে সভা ডাকারও আর কোনো প্রয়োজন হবে না।

রাখাল জোর দিয়ে বলে যে বিশ্বের তাবৎ ঘটনার নির্ভুল ব্যাখ্যা কম্পুটরের সাহায্যে পাওয়া সম্ভব। তবে ড্যাটা অবশ্যই নির্ভুল হওয়া চাই।

কম্পুটরের সাহায্যে ঘটনার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করাটা শেষপর্যন্ত রাখালের একটা নেশার মতো দাঁড়িয়ে গেল। এমন প্রচণ্ড নেশা যে ময়দানের খেলার ফলাফল কী হবে তাও সে কম্পুটরকে দিয়ে আগে থেকে বলিয়ে নেবার চেষ্টা করত। ফলাফল ভুল প্রমাণিত হলে নিশ্চিত ধারণা করে নিত যে ইন্‌কম্‌প্লিট ড্যাটা।

এমনি সময়ে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও হুগলি জুড়ে শুরু হল প্রচণ্ড বন্যা। রাখাল অত্যন্ত অভিনিবেশের সঙ্গে ড্যাটা সংগ্রহ করতে লাগল। মোট বৃষ্টিপাত, ডি-ভি-সির জলাধারের মোট জলধারণক্ষমতা, নদীর জলস্রোতের বেগ ও সংশ্লিষ্ট অন্য সমস্ত ড্যাটা। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলেই পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে নিল যে ড্যাটাগুলো নির্ভুল। তারপরে কম্পুটরে ফীড করল। অঙ্কের ভাষায় জবাবও পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে, মুখের ভাষায় রূপান্তরিত করলে যার মানে দাঁড়ায় : সীমাবদ্ধ এলাকায় ক্ষণস্থায়ী বন্যা।

সমস্ত ড্যাটা ভালো করে চেক করল। তবুও সেই একই জবাব : সীমাবদ্ধ এলাকায় ক্ষণস্থায়ী বন্যা।

তবে তো এই বন্যা মানুষের সৃষ্টি! কে অপরাধী? উনিশ-শো আটষট্টি সালেও মানুষের ভুলে বা মানুষের গাফিলতিতে এমন সর্বনাশা বন্যা কেন হতে দেওয়া হবে?

ড্যাটা খুঁজবার জন্যে একদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বসে মিউনিসিপ্যাল গেজেটের পৃষ্ঠা ওলটাচ্ছে, সায়েন্স কলেজের পুরানো এক অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা। সমস্ত শুনে তিনি শিশুর মতো সরল হাসি হেসে বললেন, বন্যা তো হবেই। পাঁজীতে লেখা আছে যে! দ্যাখোনি।

তারপরেই রাখাল পানিপাঁড়ের পদপ্রার্থী। সম্ভবত এও কম্পুটরের অমোঘ নির্দেশেরই ফল।

পক্ষীরাজ

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

ছোট মামা চেঁচিয়ে ডাকলেন : 'ওরে ভন্টু, রত্না, গাড়ী চড়বি তো চলে আয়।'

আমরা দু'জন মিলখা সিং-এর মত ছুটে নেমে এলাম।

'একটা গাড়ী না হলে আর চলছিল না। তাই একটা কিনেই ফেললাম।'

'গাড়ীটা তোমার, ছোটমামা, একদম তোমার ?'

'এক দম।'

'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ?' হতাশ গলা রতনের।

'হ্যাঁ। কিন্তু নতুনের চেয়ে ভাল। আজকালকার গাড়ী দেখতেই চকচকে। কিন্তু ভেতরটা পেঁপে গাছের মত নরম, জানিস! আর এর ইঞ্জিন ছুটবে কি—পক্ষীরাজের মত।'

'ঝরঝরে।' বলল রতন।

'চড়ে দ্যাখ্ না।

আমার এদের তর্ক ভাল লাগছিল না। বললাম, 'উঠব, মামা ?'

'হ্যাঁ, ওঠ।' বলে ছোট মামা হাতটা কাত করে ছুড়ে দরজাটা খুলতে গেলেন। কিন্তু—

'জং ধরে গেছে।' বলল রতন।

'না রে, খুব শক্ত গাড়ী তাই। আয় টান তো দরজাটা।'

আমরা তিনজনে টানতে লাগলাম।

ক্যাঁকড—ক্যাং একটা শব্দ। আমি আর রতন মাটিতে।

'লাগল নাকি ?' বললেন ছোট মামা।

'না।' বললাম আমি।

বতন কোনো উত্তব না দিয়ে প্যাণ্ট ঝাডতে লাগল।

উঠলাম তিন জনে।

বতন গজব গজব কবতে লাগল। আমাব কিন্তু গাড়ীটা ভালই লাগছিল। প্রকাণ্ড একটা দেশলাই-এর বাক্সোব মত। স্টার্ট বোধহয় দেওযাই ছিল। থবথব কবে কাঁপছে।

স্টিয়াবিং-এ হাত ছুঁইযেই ছোট মামা বললেন, 'এই যা! নোঙর তোলা হয নি।'

ছোট মামা নামলেন। এতক্ষণে দেখলাম গাড়ীটা একটা শক্ত দডি দিয়ে গাছেব সঙ্গে বাঁধা ছিল।

জিজ্ঞেস কবলাম, 'বাঁধা কেন?'

'আব বলিস না। গাড়ীটা বড অবাধ্য মানে খামখেযালি। স্টার্ট দিলে বন্ধ কবা যায় না। আবাব বন্ধ কবলে স্টার্ট দেওযা মুস্কিল। তাই স্টার্ট দিযে বেখেছি। আবাব স্টার্ট দেওয়া থাকলে, দাঁডিযে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ হুস্ কবে বেবিয়ে গেল। এই বদ অভ্যেসেব জন্যে কোথাও নামলে স্টার্ট দিয়ে বাখি, গলায দডিও দিয়ে বাখি। হঠাৎ একা একা ছুটে চলে যাবে, সেটা ভাল নয়। হয়তো কাউকে চাপা দিয়েই দিল। না, না, চট্ কবে দেবে না। হর্ণ দেবে। ব্রেক্‌ও কষবে। অবিবেচক নয। কিন্তু তাও—'

বতন হি-হি কবে হাসতে লাগলো।

হাসবাব কি আছে এতে আমি বুঝতে পাবলাম না। সব কথাই সঠিক বলে আমাব মনে হোলো। আমি হলেও ই কবতাম। কিন্তু বতনকে কিছু বলা যায না। ও আমাব চেযে দু'বছবেব বড। কথায় কথায এমন বাম-গাঁট্টা বসায়!

ছোটমামা বিযে-থা কবেন নি, মা বলেন, 'সেইজন্যে ওব মাথায পোকা হয়েছে।'

ছোটমামা কিন্তু কাবো কথায বাগ করেন না। হেসে বলেন, 'ভণ্টা, ছ্যাখ তো খুঁজে, মাথায পোকা পাস কিনা। ভণ্টা, পেলি?'

আমি অনেক খুঁজে একটাও পোকা পেলাম না। ভেবেছিলাম, অন্তত একটা উকুনও পাবো।

গাড়ী চলেছে।

'হুঁউ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ।' হর্ণ দিচ্ছেন ছোটমামা।

গাড়ীর সামনে রাস্তায় একটা কুকুর শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

জোরে এবং অনেকক্ষণ ধরে হর্ণ দেওয়া হোলো।

কুকুরটা উঠল না। বোধহয় জাগলও না।

আরো কয়েকটা হর্ণ দিয়েও কুকুরটাকে বিচলিত করা গেল না। অগত্যা মামা নামলেন: 'একটা প্রাণীকে চাপা দেওয়া যায় নাতো। মরে যাবে কুকুরটা।'

রতন আমার কানে কানে বলল, 'মামা নামল কেন জানিস। কুকুরটার সঙ্গে ধাক্কা লাগলে মোটরটা চুরমার হয়ে যেত।'

মামা কুকুরটার ঠ্যাং ও ল্যাজ ধরে টেনে রাস্তার পাশে রাখলেন।

কুকুরটা ঘুমোতেই লাগল।

মামা ফিরে এসে বললেন, 'কুকুরটার ঘুম ভাঙ্গাবার কোনো অধিকার আমার নেই। রাস্তা সবারই।'

গাড়ী আবার চলতে লাগল। লোকালয় পেরিয়ে গেলাম আমরা। একটা রাস্ত সোজা অনেক দূর চলে গেছে। টানা লম্বা। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। রাস্তাটা দূরের দিকে গিয়ে ক্রমশই সরু হয়ে গেছে মনে হয়। দু ধারে গাছের সার তাদের ডাল মাথার ওপর এসে আকাশের আলোকে কোথাও ঢাকে, কোথাও ছাড়ে। রাস্তার ওপর ছায়ার ছবি পড়ে।

বলি, 'মামা, কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'আজ আর বেশি দূর যাব না আমরা। এই ময়দানে নোঙর করি আয়।'

মাঠের ধারে আমরা নামলাম।

রতন একটা চারা গাছ দেখিয়ে বলল, 'ঐ গাছটায় বেঁধে রাখো।'

ছোটমামা বললেন, না র রতনা, হঠাৎ চল্‌তে সুরু করলে ও চারাগাছটাকে উপড়ে নিয়ে যাবে। গাড়ীটার গায়ে ভীষণ জোর। কত হর্স্ পাওয়ার জানিস?'

মামা একটা বড় গাছে নোঙর বাঁধলেন।

মস্ত মাঠ। সবুজ ঘাসের ছোপ লেগে আছে মাটিতে। মধ্যে মধ্যে দেবদারু গাছ মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। রোদ পড়ে গেছে কিন্তু অন্ধকার হয় নি। মাঠের ওপাশে আকাশ একটু লালচে। এখানকার আলোতেও তাই লাল আভা। দেবদারুর পাতায় সেই আভা পড়েছে। কয়েকটা পাখি—কী পাখি আমি নাম জানি না—ঐ লালচে আকাশের বুক থেকে ভেসে ভেসে

এলো এই দেবদারু পাড়ায়। কী যেন বলাবলি কবছিল তারা নিজেদেব মধ্যে। দূব থেকে সে কথাগুলোকে সুবেলা লাগে।

বতন বলল, 'মামা, আলুকাবলি খাব।'

'দাঁড়া, একটু ওদিকে দেখি যদি পাই।'

পাওয়া গেল। ঝাল-টক আলুকাবলি খেতে খেতে বললাম, 'জায়গাটা খুব সুন্দর, তাই না মামা? ভাগ্যিস তুমি গাড়ীটা কিনেছিলে।'

'তুই ঠিক বলেছিস বে ভল্টু। সবাই বলছে—গাড়ীটা পুবোনো। আবে পুবোনো তাতে হোলো কি! কাজ দিচ্ছে কেমন বল।'

বতন বলল, 'একটু বং কবে না নিলে—'

ছোট মামা বোধহয় বতনেব কথা শুনতেই পেলেন না। আমাব আগেব কথাব জেব টেনে বলতে লাগলেন, 'এ জায়গাব থেকেও অনেক সুন্দব জায়গায় তোদেব নিয়ে যাব।'

'কোথায় মামা?'

'ঐ বাস্তা দিয়ে আবো অনেক দূব, একেবারে সমুদ্রেব ধাবে চলে যাওয়া যায়।'

'কবে যাব মামা?'

'দাঁড়া, আমাব কাজেব ভীড়টা একটু কমলেই—।'

ফেববাব জন্যে গাড়ীতে উঠেই মুস্কিল হোলো। ছোটমামা বেজাব মুখে বললেন, 'গাড়ীটা চলছে না।'

আমি বললাম, 'নোঙব তুলেছ, মামা?'

'হ্যাঁ। তাও চলছে না।'

'তাহলে?'

'তোবা নেমে একটু ঠ্যাল্ তো।'

আমবা দু'জনে নেমে অনেক ঠেললাম। গাড়ীটা মাঝে মাঝে হুংকাব দিয়ে যাত্রাব উপক্রম কবল। কিন্তু—

'আগেই বলেছিলাম তোদেব। গাড়ীটাব ঐ একটাই মাত্র দোষ। চললে থামানো মুস্কিল। থামলে চালানো শক্ত। তোবা একটু বিশ্রাম কবে নে। আমি এব যন্ত্রপাতিগুলো একটু দেখি।'

আমবা মাঠে বসে পড়লাম।

রতন গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল : 'সারা রাত এখানেই থেকে যেতে হবে দেখছি।'

আমার তাতে খুব আপত্তি ছিল না। রাত্তির এসে দিনের আলোকে আরো অনেকটা মুছে নিয়েছে। পুরো অন্ধকার নয়। একরকম বৃষ্টি আছে, যা এত হালকা যে চোখে দেখা যায় না। অন্ধকার যেন ঐ রকম বৃষ্টির মত সারা মাঠ জুড়ে পড়ছে। ঐ বৃষ্টিটা কোনো শব্দ না করে ঝরছে লালচে আকাশে, দেবদারুর ডালে-পাতায়। পাখীদের সুরেলা কথাকেও শান্ত করে দিয়েছে বৃষ্টিটা। মাঝে মাঝে দু' একটা পাখী ডানা ঝাপটাচ্ছিল বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য।

ছোটমামা গাড়ীটাকে খুব বকাঝকা করছেন, থাপ্পড়-চাপড় মারছেন।

'এইবার একটু ঠ্যাল দেখি।' ছোটমামা ডাকলেন।

প্রথম কিছুক্ষণ গাঁইগুঁই করে হঠাৎ আগের জিদ ছেড়ে গাড়ীটা এক প্রচণ্ড লাফ মেরে আমাদের পেছনে ফেলে তেজী ঘোড়ার মত ছুটল।

আমরা হাঁউমাউ করে উঠলাম : 'ছোটমামা, ছোটমামা।'

ছোটমামা খানিকটা গিয়ে গাড়ী ঘুরিয়ে আনলেন আমাদের কাছে। কিন্তু গাড়ীটা পুরো থামালেন না। চেঁচিয়ে বললেন—

'গাড়ীটা একেবারে থামাবো না। তাহলে আবার আটকে যেতে পারে একদম। তাই আস্তে করে দিচ্ছি। চলতি গাড়ীতে উঠে পড়। না, না, খুব আস্তে করে দেব।'

রতন দু'বার হোঁচট খেয়ে আর আমি তিনবার হোঁচট খেয়ে নিরাপদে গাড়ীতে উঠলাম।

বাড়ী ফিরে রতন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আর যদি কোনো দিন ছোট-মামার গাড়ীতে চড়ি — !'

রতন তার এই কথা রাখবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করত। দূর থেকে ছোট-মামার গাড়ী আসতে দেখলে ছুটে পালাত। যেন গাড়ীটা ওকে চাপা দিতে আসছে। দু'এক দিন অবশ্য চাপা-টা এড়াতে পারে না—

আমি বেশির ভাগ একাই ছোটমামার গাড়ীর সওয়ারি হয়ে ঘুরতে লাগলাম।

মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিই : 'ছোটমামা, সমুদ্দুরে নিয়ে যাবে বলেছিলে।'

'যাবো বে।' রুক্ষ চুলটা কপাল থেকে সবিযে ছোটমামা বলেন, 'কাজের ভীড়টা কাটলেই একদিন যাব।'

দিন চলতে লাগল। গাড়ীটাব সঙ্গে ছোটমামাব খুব ভাব হয়ে গেছে। আমাবও।

লোকে গাড়ীটাকে ঠাট্টা কবে বলে, 'পক্ষীরাজ।' ছোটমামা কিন্তু আদব কবেই বলে—পক্ষীবাজ।

আমাব পক্ষীবাজকে খুব ভাল লাগে। দু' এক দিন ছোটমামা না এলে মন খাবাপ লাগে। বাতে ঘুমোতে যাওযাব সময আমাব মনে হয় এই গাড়ীটাব কথা। শুযে শুযেও বেশ দেখতে পাই, লম্বা সোজা বাস্তা দিয়ে এই বাতে তাবাব আবছা আলোয পথ দেখে ছোট মামা পক্ষীবাজে চেপে চলেছে—বোধহয় সমুদ্রে।

দু' এক দিনেব বেশি ছোটমামা না এলে আমিই চলে যাব ছোটমামাব বাড়ীতে। তাবপব সাবাদিন মামাব সঙ্গে পক্ষীবাজে কবে ঘুবে বেড়াই। মামা নানা কাজকর্ম করেন, এখানে-ওখানে যান, আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুবি। মামা কাজে কোনো অফিসে বা কোথাও ঢুকলে আমি পক্ষীবাজে বসে থাকি।

মামা বলেন, 'তোব বসে থাকা ভাল।'

'কেন?'

'আমাব বয়স হচ্ছে তো। নোঙবেব দড়িটা পুরোনো হচ্ছে। কখন দড়িটা ছিঁড়ে হযতো ষ্টার্ট নিযে ফেলবে পক্ষীবাজ, যে দিকে ওব চোখ যায সেদিকে হাঁটা দেবে। এই দুশ্চিন্তায বাতে ঘুম হয় না আমাব।'

'আমি বসে থাকাব সময পক্ষীরাজ নোঙব ছিঁড়ে বেবিয়ে গেলে বেশ মজা হয়, মামা।'

'কেন বে?'

'অনেক জায়গায ঘোবা যায়। ঐ সেই দেবদারু গাছেব জাযগাটায। কি হয়তো ও সোজা সমুদ্দুবেও চলে যেতে পাবে।'

'মন্দ বলিস নি। একদিন কী হয়েছিল জানিস! আমি নোঙবটা সবে তুলে দড়িটা বেখেছি, এমন সময পক্ষীবাজ হঠাৎ ছিটকে ছুটতে আবম্ভ কবল।'

'তোমায় ফেলে?'

'হ্যাঁ। আমি তখনও উঠি নি।'

'তারপর? আবাব ফিবে পেলে কী করে?'

'প্রথমে কী রকম হতভম্ব হয়ে গেলাম। তারপরে ডাকলাম—অ্যায়, অ্যায়, কোথায় যাচ্ছিস। আমায় ফেলে চললি কোথা। ফিরে আয়। ফিরে আয়!'

'ফিরে এলো?'

'সহজে কি আসতে চায়। চেঁচিয়ে তখন ধমক দিলাম—ফিরে আয় বলছি। তখন সুড়সুড় করে ফিরে এলো।'

'ব্যাক্ ক'রে, না ঘুরে?'

'ব্যাক্ ক'রে। আসতেই মারলাম দুই চাঁটি। ফলটা হোলো, আমি ওঠবার পর আর ও চলতে চায় না। অনেক তোয়াজ করার পর তবে চলল।'

মাঝে মাঝে মা আমাকে বকেন, 'হ্যাঁরে ভণ্টা, তুই বড় হচ্ছিস না? তোর বয়স বাড়ছে না? তোর পড়াশুনো নেই? সারাদিন গাড়ীতে চড়ে ঘুরে বেড়ালেই জীবন কাটবে? ত্মাখ তো বত্নাকে, বয়সও বাড়ছে, পড়াশুনোতে মনও বসছে। আর তুই?

মা ছোটমামাকেও বকেন 'এই বুড়ো পাগলটা ভণ্টাকে খেপিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

ছোটমামা হেসে বলে, 'আমাকে আবার পাগল দেখছ কোথায় বড়দি?,

'হ্যাঁ, তুই পাগল।'

'আর কোনদিন ভণ্টাকে নিয়ে গাড়ী করে বেরোবি না।'

'কেন?'

'বলছি। শুনবি। ব্যস।'

'আচ্ছা। আচ্ছা।'

'আচ্ছা আচ্ছা নয়। আমার কথা না শুনলে তোকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেব না।

ছোটমামার হাসি-হাসি চোখটা একটু যেন নিবে আসে। বলেন 'আচ্ছা।'

মা-র আড়ালে আমি বলি, 'ছোটমামা, তা হবে না কিন্তু। আমাকে নিতে হবে, এই বলে দিলাম, হ্যাঁ।'

'আচ্ছা আচ্ছা।'

'একদিন তুমি সমুদ্দুরে নিয়ে যাবে বলেছ মনে থাকে যেন।'

'আচ্ছা, যাব।' কী যেন ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ভাবে বললেন ছোটমামা।

এর পর কয়েকদিন ছোটমামার দেখা নেই, পক্ষীরাজেরও দেখা নেই।

মা বলেন, 'বাঁচা গেছে। যেমন পাগল তেমনি তার গাড়ী।'

রতন বলল, 'ঐটেকে আবার ছোটমামা বলে—পক্ষীরাজ।'

'যেমন রাজপুত্তুরের ছিরি, তেমনি তার পক্ষীরাজের ছিরি।'

আরো কয়েক দিন বাদে আমি নিজেই একদিন চলে গেলাম ছোটমামার বাড়ীতে।

ছোটমামা বেরোচ্ছিলেন। আমাকে দেখে একটু থমকে গেলেন। বললেন, 'অ। ভণ্টু এসেছিস।'

'হ্যাঁ, মামা. তুমি তো আর যাও না।'

'যেতে পারি না রে। এত কাজের ভীড। এই তো এখন বেরোতে হচ্ছে।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব মামা।'

'আমি যে অনেক ঘুরব রে।'

'সে তো বেশ মজা।'

'বডদি বলছিল—'

'আমি উঠলাম।'

'আচ্ছা। আয।'

সারা দুপুর আমরা ঘুরলাম। দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করছিল। ছোটমামা যে কী কাজ করে ভগবান জানে। এই এখানে যাচ্ছেন, এই ওখানে যাচ্ছেন। কোথাও পাঁচ মিনিট, কোথাও একঘণ্টা থাকছেন। আমি সে-সময়টা গাডীতে বসে ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরের চোখ-ধাঁধানো রোদে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম—ঘামতে ঘামতে হাঁটছে লোকেরা, রিকসা চলেছে ঠুনঠুন শব্দে, একটা হাত তুলে তার ছুঁয়ে ছুটেছে ট্রাম, বাস্-এর নাক দিয়ে গরম নিশ্বাস বেরোচ্ছে। ঘুরলাম অনেক, কিন্তু ঘোরার চাইতে যেন বসে-থাকাটা বেশি হয়ে যাচ্ছিল।

বসে থাকতে থাকতে যখন বেশ ক্লান্ত, তখন হঠাৎ পক্ষীরাজ নোঙরটা তুলে ফেলল। দড়িটা খুলল, কি ছিঁড়ল, তা জানি না। শুধু জানি, পক্ষীরাজ ছুটল। প্রথমে আস্তে, তারপরে জোরে। মনে হোলো, পেছনে চুপটি মেরে ওকে আরো জোরে ছোটাই। আমি ষ্টিয়ারিং-এ এসে বসলাম। ষ্টিয়ারিং-টা থরথর করে কাঁপছিল। লোকজন, রিক্সা, ট্রাম, বাস—সব জোর কদমে পেছনে ছুটে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে লাগল। রাস্তার দু'ধারের বাড়ীগুলো হালকা হয়ে উলটো দিকে উডে চলে গেল।

লাইটপোস্টগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লম্বা রণপায় চড়ে এক একটা পা ফেলে এক এক মাইল পেরিয়ে যেতে লাগল।

সহরের চেহারা ক্রমে ফিকে হয়ে এলো। গ্রামীণ ঘরবাড়ী, গাছপালা। রাস্তার ধারে ধারে গরুবাছুর, আদুল-গা ছেলেমেয়েরা। ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে চলেছে চাষী মেয়ে। ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা নারকেল গাছ চোখ বুঁজে কী যেন ভাবছে। একটা গরুর গাড়ীর ক্যাঁচড় কোঁচড শব্দ।

লম্বা সোজা সেই রাস্তাটা—যে-রাস্তায় আমরা একদিন এসেছিলাম। এ রাস্তাটা পক্ষীবাজ ভাল চেনে, আর হয়তো ভালও বাসে। সেই দেবদারু-পাড়া। দীঘল গাছেরা আমাদের জন্যেই যেন দাঁড়িয়ে ছিল। পাতাগুলোয় আলো পড়ে চিকচিক করছে আমাদের দেখে ঝিরঝির করে হেসে উঠল তারা। মাঠে দু'একটা গরু চরছে। রোদ কমে এসেছে। বোধহয় বেলা পড়ে এলো। অনেক বড় আকাশ দেখা যায় মাঠের ওধারে। আকাশে লাল রং লাগতে আরম্ভ করেছে। লালের ফাটলে ফাটলে রোদ গলে পড়ছে—আকাশ-ঝর্ণা।

পক্ষীবাজ ছুটছে। আমি ব্রেক কষতে জানি না। কষতেও ইচ্ছে করছে না। পক্ষীবাজের মত আমারও যেন একটা মাতন এসে গেছে।

দেবদারু পাড়া রইল পেছনে। সোজা রাস্তা। অনেক দূর এসে পড়লাম। কতদূর কে জানে।

এখন আর রাস্তা নেই। বালির ওপর দিয়ে চলেছে পক্ষীবাজ। বালির মাঠ। আর কয়েকটা ঝাউ গাছ।

হঠাৎ ঝাউ গাছের একটা জটলা চোখের ওপর থেকে সরে যেতেই চোখে পড়ল—আঃ! কী আনন্দ! সমুদ্র!

ঢেউগুলো মস্ত মাথা তুলে দুলছে। মনে হচ্ছে সারা পৃথিবীটাই দুলছে। হাজার হাজার ফেনা সেই দোলায় চড়ে নাচছে। সবাই হাত ধরে. জড়াজড়ি করে, মিলে-মিশে। যতদূর চোখ চলে শুধু এই নাচ। ছুটে আসছে দল বেঁধে—দলের পর দল। ঢেউয়ের দল। হাসতে হাসতে আসছে। হেসে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে সাদা সাদা অজস্র ফেনায়। ঐ ফেনাগুলোই বোধহয় জমে জমে অসংখ্য ঝিনুক হয়ে জন্মেছে হলুদ বালিতে।. সোনার মুখে চন্দনের ছোট ছোট ফোঁটা। কতগুলো দুষ্টু ঢেউ হেসে খেলে ছুটে এসে মাঝে মাঝে বহু ফোঁটা মুছে দিয়ে যাচ্ছে। আবার ভালো ঢেউরা পরিয়ে দিচ্ছে।

সমুদ্রটা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। ঢেউদের গাড়ীতে চড়ে। কেশর ফুলিয়ে ঢেউগুলো সমুদ্রের গাড়ীকে টানছে। টানছে না, উড়িয়ে নিয়ে আসছে। আমাদের দেখে সমুদ্র খুব খুশী হয়েছে। পক্ষীবাজও প্রচণ্ড খুশী। এতদিন নোঙরে বাঁধা ছিল। আজ হঠাৎ ছাড়া পেয়ে ছুটেছে সমুদ্রে। থামবার নাম নেই। সমুদ্রের গায়ের ওপর এসে পড়েছে, তবু ছুটছে। ওর একটা মাতন লেগেছে আজ। সমুদ্র আর বালির মধ্যে যেখানে ফেনাগুলো বারবার সাদা দাগ টেনে দেয়, সেই দাগটাও পেরিয়ে গেল পক্ষীবাজ। সমুদ্র অনেক হাত বাড়িয়ে আমাদের টেনে নিল।

এতক্ষণ সোজা ছুটছিলাম তীরের মত। এখন আগু-পিছু দোলায় কখনও কখনও হুস করে অনেক দূর এগিয়ে যাই, কখনও থমকে খানিক পেছনে যাই। কখনও ঢেউগুলো খুব আলতো ভাবে তাদের মাথায় আমাদের তুলে নেয়, কখনও খেলার ছলে ঢেউয়ের ঢালু দিয়ে গড়িয়ে দেয়, কিন্তু নরম হাতে ধরেও নেয় শেষ ধাপে। আবার উঁচুতে, ছুঁড়ে দেয়। আমার ছোট বেলায় ছোট-মামা আমায় শূন্যে ছুঁড়ে দিত, আবার ধরে নিত, আমি খিলখিল করে হাসতাম। তেমনি খেলায় মেতেছি আমরা। কিন্তু তোলা, ধরা, দোলানো সবই খুব নরম হাতে —জলের হাতে।

মাঝে মাঝে ফেনারা ফোঁটা পরাচ্ছে আমার মুখে গায়ে। মোছবার আগেই মিলিয়ে যাচ্ছে। ঢেউয়ের ডগা থেকে দু' একটা ঝিনুক এসে পড়ছে আমার কোলে।

চারদিকেই জল। সাদায় নীলে সবুজে মেশানো রং। গাঢ় নয় রংটা। একসঙ্গে জড় হয়ে থাকলে তবু রংটা একটু ঘন দেখায়। ছিটকে ছড়িয়ে ছোট ছোট কণা যখন, তখন হালকা হয়ে প্রায় জলেরই রং। নানা দিক থেকে ঘন ঢেউগুলো ছুটে এসে এ ওর ঘাড়ে পড়ে, ধাক্কাধাক্কি করে, ভেঙ্গে-চুরে ছিটকে ওঠে, কলকল করে হাসে, আবার মিশে এক হয়ে যায়।

যতদূর চোখ চলে সব দিকেই জল—একেবারে আকাশ অবধি গিয়ে ছুঁয়েছে। আকাশটা দশদিক থেকে ঝুঁকেছে ঢেউগুলোকে ছোঁয়ার জন্যে। জল আর আকাশের মধ্যেখানকার দাগটা মুছে গেছে। কোথায় কোন্‌টা শেষ বোঝা যায় না। মনে হচ্ছে, সমুদ্রের ঢেউ চার দিক থেকে লাফিয়ে উঠে আমাদের মাথার ওপর ঢেউ-রঙের একখানা আকাশ তৈরী করেছে। মস্ত বড়

একটা জলের ফোঁটার মধ্যেখানটা ফাঁকা—আর তার মধ্যে বসে আমরা দোল খাচ্ছি।

ঢেউগুলো যেন হাজার হাতি। জোর কদমে চলেছে—কিন্তু তুলকি চালে। আর মাঝে মাঝে হাজার শুঁড়ে জল ছিটোচ্ছে।

ওপারটা চোখে পড়ছে না কোথাও। কিন্তু পক্ষীরাজ ছুটছে ওপারের দিকে — তার কী এক মাতন লেগেছে। ভাগ্যিস আজ পক্ষীরাজ নোঙর ছিঁড়ে আমায় নিয়ে বেরিয়েছিল। সমুদ্রের ওপারটাও দেখে ফিরতে পারব আজ।

কিন্তু চলেছি তো চলেছিই। ওপারের নামগন্ধ নেই। পক্ষীরাজ আর আমি অবশ্য থামব না।

'কী-রে ভন্টু।' ছোটমামার গলা।

মস্ত বড় জলের ফোঁটায় একটা চিড় খেয়ে গেল। চিড়ের সরু ফাঁক দিয়ে এগিয়ে এলো শানানো রোদ—ইস্পাতের বর্শার মত।

বর্শাটা আস্তে পিঠে আমার ধাক্কা দিল: 'কীরে, তোর ঝিমুনি এসে গেছে যে!'

ফোঁটাটা ফেটে ফেটে অনেক রোদ। ল্যাম্পপোষ্টগুলো রণপা পরে ছুটে আবার ফিরে গেল যে যার যায়গায় হেডমাষ্টারমশাইর গলা শুনলে আমরা যেমন করে থাকি।

'যা রোদ! চল্ তোকে বাড়ীতে দিয়ে আসি।'

রোদের সমুদ্রে হাঁসের মত পক্ষীরাজ নেমে পড়ল।

বাড়ী ঢুকতেই মা চেঁচিয়ে উঠলেন: 'হ্যাঁ, রে ভন্টা, সারা দুপুর কোথায় ছিলি। অ, বুড়ো পাগলটার সঙ্গে! হ্যাঁ রে, তোর এত বয়স হোলো, তোর কোনো কাণ্ডজ্ঞান হোলো না। ঐ কচি ছেলেটা—ওর নাওয়া-খাওয়া লেখা-পড়া সব নষ্ট করছিস দিনের পর দিন। আর কোনদিন যদি ওকে গাড়ীতে চড়িয়েছিস তবে তোর একদিন কি আমার একদিন। দিন নেই, রাত নেই, সারাক্ষণ ছেলের গাড়ী-গাড়ী করলেই চলবে!'

ছোটমামা অনেক কিছু বলবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মা-র কথার তোড়ের সামনে দাঁড়াতে পারেন নি।

আমারও অনেক কিছু বলবার ছিল কিন্তু ছোটমামাই যেমন কুঁকড়ে গে[illegible] আমি আর মুখ খুলব কী করে।

মা ছোটমামাকে বললেন, 'আর কোনো দিন ও গাড়ী নিয়ে এ বাড়ীতে[illegible]

আসবি না। ও যা গাড়ী, আব তুই যা ড্রাইভার, তাতে যে কোনো সময় অ্যাকসিডেন্ট কবে ভন্টাব একটা বিপদ ঘটাতে পারিস তুই—এ ভযও আছে আমাব মনে। দুর্গা, দুর্গা, মাগো !'

বতন আমায় চুপিচুপি জিজ্ঞেস কবল, 'কোথায় গিযেছিলি বে ?

'সমুদ্দুবে।'

'গাডীটা ঠেলতে ঠেলতে চলে গেলি বুঝি !' হাসল বতন।

বেশ কিছুদিন ছোটমামা আসেন নি। বোজই ভাবি, আজ আসবেন। কিন্তু কোনোদিনই পক্ষীবাজেব গলা-খাঁকাবি শুনি না।

আজকালেব মধ্যেই ছোটমামাব কাছে চলে যাব একদিন। রোজ ভাবি—যাব, যাব।

কিন্তু আমায় যেতে হোলো না। ছোটমামা নিজেই একদিন এলেন। পক্ষীবাজেব গলা শুনলাম না তো।

শুধোলাম, 'ছোটমামা. পক্ষীবাজ কোথায় ?'

'আব বলিস না। একদিন দড়িটা বোধহয় আলগা ছিল, হঠাৎ নোঙব তুলে হুস করে বেবিয়ে গেছে। আমি কাছে ছিলাম না তখন। ফিবে এসে দেখি—চলে গেছে !'

'আবাব কবে আসবে ?'

'তা কী কবে বলব বে ! আসবে কিনা তাই বা কে জানে।'

মা বললেন, 'না আসাই ভাল। আপদ গেছে।'

বতন কানে-কানে বলল, 'বেবিযে গেছে না হাতি। কোথায় ধাক্কা লেগে অক্কা পেযে গেছে'তাব ঠিক নেই।'

আমাব কিন্তু ছোটমামার কথাটায় অবিশ্বাস হয় নি। আমি চোখেব ওপব বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম, পক্ষীবাজেব একটা মাতন এসে গিযেছে আব ও ছুটতে ছুটতে চলে গিয়েছে সমুদ্রে। ঢেউয়েব ডগায় ডগায় নেচে ও আজ সমুদ্রও পাব হযে গেল। ও এখন সমুদ্রেব ওপাবে পৌছে একটু দম নিচ্ছে। আব ওপাবেব অনেক ছেলেমেয়ে তাকে ঘিবে ধবে তাব সঙ্গে পবিচয় কবছে, বন্ধুত্ব কবছে। মাডগার্ড ছুঁয়ে, দবজায ধাক্কা দিযে, ভেঁপু টিপে হর্ণ বাজিয়ে সীটে লাফালাফি কবে ওবা এতক্ষণে বন্ধু হয়ে গেছে। একটু পবেই ওদের কাঁধে চাপিযে পক্ষীবাজ আবাব ছুটবে। কোথায যাবে ? তা আমি জানি না। আব দেখতে পাচ্ছি না আমি। মা বলেছেন, আমাব বয়স হচ্ছে। বযস হলে বোধহয় আব দেখা যায় না।

মৃত্যুতেই শেষ নয়

শঙ্কর চক্রবর্তী

গত এক বছর ধরে যে ঘটনাটি সারা পৃথিবী জুড়ে বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে এবং যুগযুগান্তরের সেই পুরনো প্রশ্ন মৃত্যু সম্বন্ধে নতুন তর্কের অবতারণা করেছে, সেটি হল—হার্ট ট্রান্সপ্লানটেসন বা হৃদযন্ত্রের পুনঃ সংস্থাপন। এককথায় বলা যায়, এ হল হৃদযন্ত্রের কোন দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রী একটি মানুষের হৃদযন্ত্রের জায়গায় সত্যমৃত কোন ব্যক্তির হৃদযন্ত্রকে সংস্থাপন করা। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিচারে সমগ্র ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল সন্দেহ নেই এবং এপর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেখানকার শ্রেষ্ঠ শল্য-বিদেরা যে প্রায় পঁচিশটির মত এজাতীয় ঘটনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন, তার মধ্যে মাত্র সাত জন ব্যক্তি এখনো বেঁচে রয়েছেন, বাকি ব্যক্তিরা সবক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের কোন ত্রুটির জন্যে না হলেও অন্যান্য উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে কোন সময়ে কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন, আবার কোন ক্ষেত্রে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস বাদে মারা গেছেন।

মানুষের শরীরকে আমরা একটি যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করি। একটি যন্ত্রের কোন অংশ বিকল হলে, তার জায়গায় একটি নতুন অংশ বা 'স্পেয়ার পার্ট' যেমন আমরা ব্যবহার করি, তেমনি মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, যেমন ফুসফুস, হৃদযন্ত্র, লিভার, কিডনী প্রভৃতির স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা বিপর্যস্ত হলে তাদের জায়গায় কিভাবে সুস্থ কার্যক্ষম অঙ্গদের স্থাপন করা যায়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের এ বহুদিনের স্বপ্ন। সোজাকথায়, মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের একটি ব্যাংক বা মজুতকেন্দ্র তৈরি করতে পারলেই তাঁরা সবচেয়ে খুশী হন। এখন প্রশ্নটা হল, এই ব্যাংক তৈরি হবার পর মানুষের অঙ্গরূপী যে 'স্পেয়ার পার্টে'গুলো সেখানে জমা থাকবে, যদি জীবন্ত মানুষের দেহ থেকে

ওদেব সংগ্রহ কবা হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলোব স্বাভাবিকভাবে সংবক্ষণেব সমস্যা অনেক—দু একটি ছাড়া, বেশীব ভাগ ক্ষেত্রেই সে সমস্যাব সমাধান আজো সম্ভব হয নি। অঙ্গগুলি যদি কৃত্রিম হয়, তাহলে সংবক্ষণেব সমস্যাব জটিলতা কমবে সন্দেহ নেই, কিন্তু মানবদেহেব কৃত্রিম অঙ্গ তৈবিব গবেষণায় আজও বিশেষ কোন সাফল্য অর্জিত হয় নি।

এছাড়া একদেহেব অঙ্গ অন্যদেহে স্থাপনের ক্ষেত্রে অন্য জটিল সমস্যাও বয়েছে, যে কথায় আমবা পবে আসছি।

হৃদযন্ত্র : দু একটি কথা

একদেহ থেকে আব একদেহে হৃদযন্ত্রকে স্থাপন কবা, সমগ্র ঘটনাটির সঙ্গে আমবা আজো পর্যন্ত ধাতস্থ হযে উঠতে পেবেছি বলে মনে হয় না। হৃদযন্ত্র সম্বন্ধে মানুষেব আজন্ম সংস্কাবেব কথাটা এপ্রসঙ্গে ভুলে গেলে চলবে না। বহুদিন পর্যন্ত মানুষের ধাবণা ছিল, তাব সমস্ত চিন্তা, চেতনা অনুভূতি ও আবেগের কেন্দ্র হল হৃদয়। মস্তিষ্কই যে এদের আসল কেন্দ্র, এই কথাটা বিজ্ঞান-সম্মতভাবে গ্রহণ করতেও মানুষেব বহুদিন সময লেগেছে।

হৃদযন্ত্র আমাদেব সমগ্র আবেগেব কেন্দ্র, এই ভ্রান্ত ধাবণাটিব জন্যে ঐ অঙ্গটির ওপর কোনবকম অস্ত্রোপচাব চালানো ছিল প্রায় নিষিদ্ধ ব্যাপাবের মত। ১৮৮৩ সালেও প্রখ্যাতনামা ইংরেজ শল্যবিদ বিলবথ বলেছিলেন যে, কোন সার্জন যদি হৃদযন্ত্রেব অস্ত্রোপচাব কবেন, তাহলে তাঁব সতীর্থদের কাছে তাঁকে অবজ্ঞা ও অসম্মানভাজন হতেই হবে। দশ বছবেব মধ্যে বিলবথেরই একজন স্বদেশবাসী হৃদযন্ত্রেব ক্ষত নিরাময়ের জন্যে একটি সফল অস্ত্রোপচাব কবেছিলেন।

হৃদযন্ত্র হল আমাদেব সমস্ত আবেগ ও অনুভূতির কেন্দ্র, এই পুবনো ধারণাটি যেমন বাতিল হয়ে বসে আছে, তেমনি ওটি যে একটি ক্ষীণ প্রত্যঙ্গ নয় তাও আজ আমবা ভালভাবেই জানি। হৃদযন্ত্র আসলে একটি অত্যন্ত শক্ত সবল অঙ্গ। একে জোরালো মাংসপেশীবহুল একটি পাম্প বললেই বোধহয় সঠিক বর্ণনা দেয়া হয়। কিন্তু অন্য যে কোন যান্ত্রিক পাম্পেব তুলনায় এব কার্যক্ষমতা ও যোগ্যতা অনেক বেশী।

একজন মানুষেব হাত মুষ্টিবদ্ধ কবলে যতটুকু জায়গা নেয়, তাব হৃদযন্ত্রও ঠিক ততখানি জায়গা জুড়ে বয়েছে। আমাদেব বক্ষস্থলেব মধ্যরেখাব খানিকটা

বামদিকে এর অবস্থিতি। একজন পুরুষের হৃদযন্ত্রের সাধারণ ওজন হল প্রায় ৩-৪ পাউণ্ড, মেয়েদের হৃদযন্ত্রের ওজন এর চেয়ে দু আউন্সের মত কম। যারা শরীরচর্চা বা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কাজ করেন, তাদের হৃদযন্ত্রের গঠন আকারে আরো বড় হতে পারে। কোন কোন রোগে হৃদযন্ত্রের আকার ছ' গুণ পর্যন্ত বড় হতে দেখা গেছে।

হৃদযন্ত্রের বেশীর ভাগ অংশটাই মাওকার্ডিয়াম নামে জটীল পেশীসূত্রের দ্বারা গড়ে উঠেছে এবং এর বাইরের দেয়ালগুলো পুরোপুরি এদের দিয়েই তৈরি। এই পেশীসূত্রদের কাজ হল সবলভাবে এবং বিরামবিহীনভাবে, সেকেণ্ডে একবার—এই গতিতে সারাটা জীবন ধরে স্পন্দিত হয়ে চলা। এণ্ডো-কার্ডিয়াম নামে একটি পাতলা, মসৃণ পর্দা হৃদযন্ত্রের ভেতরকার পেশীকে ঘিরে রয়েছে।

আমাদের শরীরে প্রায় ৫ ৭ লিটারের (১$\frac{১}{২}$ গ্যালন) মত রক্ত রয়েছে। হৃদযন্ত্রের একমাত্র কাজ হল, এই রক্তকে অবিরামগতিতে ধমনী, জালকনালী (ক্যাপিলারি) এবং শিরা—শরীরের এই বিভিন্ন নালীগুলোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে চলা। এই কাজটা করার জন্যে হৃদযন্ত্র গড়ে উঠেছে একজোড়া পাম্পের মত। হৃদয়ের বাম ও দক্ষিণ, এই দুই অংশ হল এই দুটি পাম্প। একটি শক্ত পেশীর দেয়াল হৃদযন্ত্রকে এই দুটি অংশে ভাগ করে রেখেছে। প্রতিটি অংশে রয়েছে একটি অলিন্দ (অরিকল্) ও একটি নিলয় (ভেণ্ট্রিকল্)। অলিন্দের কাজ হল বিভিন্ন ধমনী থেকে রক্ত সংগ্রহ করা। নিলয় অলিন্দের কাছ থেকে রক্ত গ্রহণ করে এবং ক্রমাগত সংকোচনের দ্বারা সেই রক্তকে শিরার মধ্য দিয়ে চালিত করে। নিলয়ের এই সংকোচনই হৃৎস্পন্দনরূপে দেখা দেয়, যার মাত্রা হল সেকেণ্ডে সত্তর বারের মত।

নিজের কাজ চালানোর জন্যে হৃদযন্ত্রও যথেষ্ট পরিমাণে রক্তের দাবী জানিয়ে বসে। করোনারী শিরার মাধ্যমে এই প্রয়োজনীয় রক্ত হৃদযন্ত্রে পৌঁছোয় এবং এই রক্তের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি যখন দেখা যায় যে, করোনারী শিরার একটিমাত্র শাখা বুজে গিয়ে অথবা ফেটে গিয়ে একটি মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানুষের হৃদযন্ত্রের কাজের দক্ষতার (এফিসিয়েন্সি) সত্যিই কোন তুলনা নেই। মানুষের তৈরি বেশীরভাগ যন্ত্র শক্তিকে প্রয়োজনীয় কাজে রূপান্তরিত করার সময় শতকরা পাঁচভাগের বেশী দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে না,

যেখানে মানুষেব হৃদযন্ত্র শতকবা চল্লিশভাগ দক্ষতাব কাছাকাছি কাজ কবে থাকে।

দৈনন্দিন জীবনে আমবা যত নানা ধবণেব জটিল কাজ ও চিন্তাব বোঝায় জড়িয়ে পডছি, তত হৃদযন্ত্ররূপী আমাদেব এই অনন্যসাধাবণ কর্মক্ষম প্রত্যঙ্গটিব স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা বিপর্যস্ত হচ্ছে। হৃদযন্ত্রেব বাত, উচ্চচাপ ও কবোনাবী ধমনীব ত্রুটিজনিত ব্যাধি আজ পৃথিবীব বিভিন্ন দেশে বিবাট ঘাতকেব ভূমিকা গ্রহণ কবতে চলেছে।

অঙ্গেব সংস্থাপন

শল্যবিজ্ঞানীব হাতে মানুষেব শবীবটা একটা যন্ত্রেব মত। এই যন্ত্রেব ছোট বড অনেক ত্রুটিকে দূব কবাব জন্যে অনেক সময় নতুন অঙ্গেব সংস্থাপনেব ব্যবস্থাটা তাঁকে বেছে নিতে হয়। দুর্ঘটনায় মুখেব বা শবীবেব কোন জাযগায চামড়াব তন্তু নষ্ট হযে গেলে বা বিকৃতি ঘটলে, শল্যবিদ শবীবেব অন্য জাযগা থেকে তন্তু কেটে নিযে সেটি আহত বা বিকৃত জাযগায বসিয়ে দেন। এই পদ্ধতি অটো-গ্রাফটিং নামে পবিচিত। তন্তু সংস্থাপনেব ব্যাপাবটা যেহেতু একই শবীবেব মধ্যে ঘটছে, তাই শল্যবিজ্ঞানীদেব কোন জটিলতাব মধ্যে পড়তে হয নি।

জটিলতা দেখা দিল যখন শবীবেব কোন আভ্যন্তবীণ অঙ্গ গুরুতবভাবে আহত বা অকেজো হযে দাঁডাল। দুটি ফুসফুস বা দুটি কিডনীব একটি অকেজো হযে পডলেও বাকি একটিকে দিযে কাজ চলতে পাবে। কিন্তু লিভাব, হৃদযন্ত্র, পাকস্থলী, অন্ত্র, প্যানক্রিয়াস প্রভৃতি অঙ্গেব ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা নেই। একমাত্র অন্য কোন মানুষেব দেহ থেকে এগুলো দান হিসেবে পাওযা গেলেই গ্রহীতাব অভাব মিটতে পাবে।

মনে কবা যাক, দান হিসেবেই একটি অঙ্গকে অন্য একজনেব কাছ থেকে পাওয়া গেল। সেই অঙ্গটি গ্রহীতাব দেহে সংস্থাপন (এই পদ্ধতি হমো-গ্রাফটিং নামে পবিচিত) কবাব কিছুকাল পবেই দেখা গেল, গ্রহীতাব সমগ্র জৈবিক ব্যবস্থা বাইবে থেকে পাওযা সেই অঙ্গটিকে প্রত্যাখ্যান কবছে। এই ব্যাপাবটি বহুদিন পর্যন্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানীদেব কাছে একটি জটিল সমস্যা হযে ছিল। এই বহস্য সমাধানেব জন্যে তাঁদেব জীবকোষেব অন্দবমহলেব গভীবে অনুপ্রবেশ করতে হল, প্রেটোপ্লাজম বা জীবোপাদান ও ক্রোমোসোম সম্পর্কে

বিস্তৃত অভিজ্ঞান নতুন করে অর্জন করতে হল। এক পর্বতপ্রমাণ কাজ শেষ করার পর বাইরে থেকে সংস্থাপিত কোন অঙ্গকে প্রত্যাখ্যানের যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের প্রত্যেকের শরীরে রয়েছে, তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা চিকিৎসাবিদদের আয়ত্তে এল। অন্যান্য যন্ত্রের মতই মানুষের শরীরের জন্যে 'স্পেয়ার পার্ট' ব্যবহারের কাজে তাঁরা নেমে পড়লেন।

জীবন্ত টিস্যু বা কলা সংস্থাপনের ব্যাপারটা আজ আর সমস্যা নয়। কয়েক দশক ধরে সারা পৃথিবীর হাসপাতালগুলোতে একদেহ থেকে আর একদেহে রক্তদানের ব্যাপারটা চলছে। মৃত ব্যক্তির চোখের কর্নিয়া বা অচ্ছোদপটলকে সংস্থাপন করে বহু হাজার ব্যক্তি তাঁদের দৃষ্টিশক্তিকে ফিরে পেয়েছেন। বর্তমানে একব্যক্তির চামড়া, কার্টিলাজ বা তরুণাস্থি এবং কানের পর্দা অন্য একব্যক্তির দেহে হামেশাই সংস্থাপিত হচ্ছে। এই অস্ত্রোপচারের কাজগুলো খুব জটিল নয় কারণ তন্তুগুলোকে কার্যক্ষম রাখার জন্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থাটা সহজেই করা যায় এবং ওদের নতুনভাবে সংস্থাপনের সময় প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটা কোন জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না।

প্রাণীদেহে আরো জটিল অঙ্গের সংস্থাপনের কাজও অনেকদিন থেকেই শুরু হয়েছে। ১৯৫৪ সালে অ্যামেরিকার বোস্টন শহরে একটি হাসপাতালে দুটি যমজ সন্তানের একজনের দেহ থেকে একটি কিডনী নিয়ে আর একজনের দেহে সংস্থাপন করা হয়। কিডনী সংস্থাপনের সেটিই ছিল পৃথিবীর প্রথম পরীক্ষা। লিভার তুলনায় অনেক জটিল অঙ্গ। ইতিমধ্যেই শূকরের বিচ্ছিন্ন লিভারের মধ্য দিয়ে সাময়িকভাবে রক্তস্রোতকে প্রবাহিত করে বেশ কয়েকটি রোগীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। একদেহ থেকে আর একদেহে লিভার সংস্থাপনের সাফল্যজনক পরীক্ষার প্রচেষ্টা চলেছে। এছাড়া প্যান-ক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয়, ডিওডিনাম বা গ্রহণী, ক্ষুদ্রান্ত্র, কোলোন বা মলাশয় সংস্থা-পনের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু সাফল্যজনক পরীক্ষা পৃথিবীর নানা জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নতুন হৃদযন্ত্রের সংস্থাপন : শল্যবিদের স্বপ্ন

মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের একদেহ থেকে আর একদেহে সংস্থাপনের ঘটনাগুলো আমাদের কাছে খুব চমকপ্রদ সন্দেহ নেই কিন্তু শল্যবিদেরা যে অঙ্গটি সংস্থাপনের সফল পরীক্ষার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন, সেটি হল হৃদযন্ত্র—মানবদেহে মস্তিষ্কের পরেই যেটি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

অন্য জীবদেহে নতুন হৃদযন্ত্র সংস্থাপনের পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানীরা ইতিপূর্বেই হাত লাগিয়েছিলেন। এ বিষয়ে কুকুরদের নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সফল পরীক্ষায় নতুন হৃদযন্ত্র সংস্থাপনের পদ্ধতি বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল। তাঁদের পরীক্ষিত বেশ কয়েকটি কুকুর নিজেদের হৃদযন্ত্রের জায়গায় অন্য কুকুরের হৃদযন্ত্র নিয়ে দিব্যি বহালতবিয়তে বেঁচে রয়েছে।

ইতিহাসে, মানুষের দেহে রোগজীর্ণ হৃদযন্ত্রের জায়গায় নতুন হৃদযন্ত্র সংস্থাপনের প্রথম সফল পরীক্ষার গৌরব অর্জন করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার শল্যবিদ ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান বার্নার্ড। তিনি ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কেপটাউনের গ্রোটে স্কুর হাসপাতালে পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক লুই ওয়াসকানস্কির দেহে একটি মোটর দুর্ঘটনায় নিহত জনৈকা তরুণীর হৃদযন্ত্রকে সংস্থাপন করেন। ওয়াসকানস্কি চার সপ্তাহ আগে হৃদযন্ত্রের এক অত্যন্ত জটিল ত্রুটির চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে ভর্তি হন। স্বাভাবিকভাবে বেশীদিন বাঁচার মেয়াদ তাঁর ছিল না। তাঁর অসুস্থ, রোগজীর্ণ হৃদযন্ত্রের জায়গায় নতুন একটি হৃদযন্ত্র লাভ করার পর আঠার দিন পর্যন্ত ওয়াসকানস্কি বেঁচে ছিলেন। অন্য একটি কারণে তাঁর মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর এই নতুন হৃদযন্ত্রটি সুষ্ঠুভাবে কাজ করে চলে।

এরপর সারা পৃথিবী জুড়ে হৃদযন্ত্র পরিবর্তনের ঘটনাকে কার্যকরী করার জন্যে শল্যবিদেরা উঠেপড়ে লাগলেন। ডাঃ বার্নার্ডের ঐতিহাসিক অস্ত্রোপচারের তিনদিন পর নিউইয়র্কে বাইশ জন ডাক্তারের একটি দল সদ্যমৃত মাত্র দু দিনের একটি শিশুর হৃদযন্ত্রকে আড়াই সপ্তাহের একটি শিশুর দেহে সংস্থাপন করলেন, কিন্তু অপারেসনের অল্প সময় বাদেই শিশুটি মারা যায়। তারপর গত আট মাসে এজাতীয় অনেকগুলি ঘটনার সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। আমাদের ভারতবর্ষেও এজাতীয় একটি পরীক্ষা হয়েছে। বোম্বাই শহরে কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাসপাতালের অধ্যাপক-ডিরেক্টর ডাঃ প্রফুল্ল কুমার সেন এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে পঁয়তাল্লিশজন ডাক্তারের সহযোগে একটি উনিশ বছর বয়সের মেয়ের হৃদযন্ত্রকে একটি সাতাশ বছর বয়সের যুবকের দেহে সংস্থাপন করেন। অস্ত্রোপচারের তিন ঘণ্টা পরে ফুসফুসের অবস্থা খারাপ হয়ে নতুন হৃদযন্ত্রের কাজ ব্যাহত হয় এবং রোগীটি মারা যায়।

নিজের হৃদযন্ত্র পরিবর্তনের পর নতুন হৃদযন্ত্র নিয়ে সবচেয়ে দীর্ঘসময় বেঁচে

আছেন যে মানুষটি, তিনি হলেন কেপটাউনের দন্তচিকিৎসক ডাঃ ব্লেইবার্গ। ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারী ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান বার্ণার্ডের হাতে তিনি তাঁর নবজীবনরূপী নতুন হৃদযন্ত্রটি লাভ করেন। মাস দুয়েক আগে সর্দি, ব্রংকাইটিস প্রভৃতি রোগের আক্রমণে তাঁর নতুন করে প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। যদি অন্য কোন উপায়ে তাঁর ঐতিহাসিক রোগীটিকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে না পারেন, তাহলে ডাঃ বার্ণার্ড ভেবে রেখেছিলেন, তিনি আর একটি নতুন হৃদপিণ্ড ব্লেইবার্গকে উপহার দেবেন। ব্লেইবার্গ অবশ্য বলেছিলেন, ডাক্তারদের কৃতিত্ব অর্জনের জন্যে তিনি আর ছুরিকাঁটার হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে রাজী নন। সে যাই হোক, এযাত্রা বেঁচে গিয়ে ব্লেইবার্গ তাঁর রক্ষাকর্তার ঐতিহাসিক কৃতিত্বকে অম্লান রেখেছেন।

দেহের প্রহরায় নিযুক্ত

এক ব্যক্তির রুগ্ন হৃদযন্ত্রকে অপসারিত করে সে জায়গায় অন্য ব্যক্তির সুস্থ হৃদযন্ত্রকে সংস্থাপন করতে গিয়ে শল্যবিদদের যে হিমালয়প্রমাণ বাধাটিকে জয় করতে হয়েছে, তা হল —বাইরে থেকে যে কোন অপরিচিত অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে সদাজাগ্রত আমাদের শরীরের প্রতিরোধব্যবস্থা। একে 'ইন্‌কমপ্যাটিবিলিটি ব্যারিয়ার' বা অঙ্গের বৈসাদৃশ্যজনিত বাধা এবং 'ইমিউন রেসপন্‌স্' বা রোগ-প্রতিরোধে বাধা দেবার ক্ষমতা প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিরোধ-ব্যবস্থা আমাদের শরীরের পক্ষে একটি আশীর্বাদের মত, বাইরে থেকে কোন রোগের আক্রমণ ঘটলে এ শরীরযন্ত্রকে আত্মরক্ষার কাজে সাহায্য করে থাকে।

যখন কোন রোগের বীজাণুজাতীয় সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি বস্তু কোন মানুষের রক্তস্রোতের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন রক্তের মধ্যে লিম্ফোসাইটিস নামে যে শ্বেত রক্তকণিকারা রয়েছে, তারা অ্যান্টিবডি নামে একটি বস্তুর গঠনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে বসে। এই নবজাত অ্যান্টিবডির দল আক্রমণকারী বীজাণুবাহিনীর সঙ্গে মিশে গিয়ে ওদের ধ্বংস ঘটায়। আমাদের শারীরিক নিরাপত্তার জন্যে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন কোন সময়ে এই ব্যাপারটিই আবার যথেষ্ট বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে যখন কোন তন্তু বা অঙ্গ কোন দেহে সংস্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

অন্য অঙ্গ বা হৃদযন্ত্র সংস্থাপনেব অস্ত্রোপচাব এপর্যন্ত যাবা করেছেন, তাঁদের সবাইকেই নতুন অঙ্গ গ্রহণেব বিরুদ্ধে শবীরেব স্বাভাবিক প্রতিবোধ ব্যবস্থাকে কাটানোব জন্যে নানা উপায় খুঁজে বাব কবতে হযেছে। শবীরের প্রতিবক্ষার দুর্গের প্রহবী শ্বেত বক্তকণিকা লিম্‌ফোসাইটদেব কাবু কববাব জন্যে অ্যান্টিলিম্‌ফোসাইটিক সিবামেব উদ্ভাবন কবা হয়েছে। নতুন হৃদযন্ত্রেব অধিকাবীরূপে যে সাতজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি এখনো বেঁচে বযেছেন, তাদের মধ্যে পাঁচজনেব নাকি এই সিবামেব দৌলতেই প্রাণটা বক্ষা পেয়েছে। ডাঃ ব্লেইবার্গেব সাম্প্রতিক প্রাণসংকটেও নাকি এই সিবামই বক্ষাকর্তাব ভূমিকা গ্রহণ কবেছিল। এই সিবামটিব একটি মস্ত গুণ হল এই, বাইরে থেকে নতুন তন্তু বা অঙ্গকে গ্রহণেব বিরুদ্ধে শবীবেব স্বাভাবিক বাধাকে এ জয কবছে ঠিকই, কিন্তু অন্য বোগেব সংক্রমণেব বিরুদ্ধে শবীবেব যে বাধা, তাব কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

বহুদিনেব পুবনো প্রশ্ন

চিকিৎসাবিজ্ঞানীদেব আশা, আগামী এক দশকেব মধ্যে নতুন হৃদযন্ত্র সংস্থাপনেব ঘটনা বক্তপ্রদানেব মতই একটি সহজসাধ্য ঘটনা হযে দাঁড়াবে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আব একটি মস্ত বড পুবনো প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁডিযেছে। প্রশ্নটা মৃত্যুব সংজ্ঞাকে নিয়ে।

যে মানুষটিকে মৃত বলে ঘোষণা কবে তাব দেহ থেকে হৃদযন্ত্র সরিযে নিয়ে আর একটি মানুষেব দেহে সংস্থাপন কবা হচ্ছে, কোন্‌ মানদণ্ডের বিচারে তাকে আমরা সম্পূর্ণ মৃত বলে ধবে নিচ্ছি। কিছুকাল আগে পর্যন্তও একটি মানুষ যে মাবা গেছে তা বুঝতে ডাক্তাবকে বিশেষ বেগ পেতে হত না। বোগীর কোন হৃৎস্পন্দন বা শ্বাসপ্রশ্বাসের আওযাজ শোনা যাচ্ছে না, বক্ষেব ওঠানামা বন্ধ হয়ে গেছে, বোগীর চোখে কোন পলক পড়ছে না—ডাক্তাব নিশ্চিন্তমনে রোগীকে মৃত বলে ঘোষণা কবে দিলেন। কিন্তু বর্তমানে, এটুকুই যথেষ্ট নয়। এখন শ্বাসপ্রশ্বাসেব কাজ বন্ধ হয়ে গেলে বোগীব ফুসফুসেব সে কাজের দাযিত্ব একটি যন্ত্র গ্রহণ করতে পাবে, এমনকি, হৃদযন্ত্রের কাজ যখন বন্ধ হযে গেছে, তখন তাকে বৈদ্যুতিকভাবে উত্তেজিত কবা যায বা হৃদযন্ত্রেব জায়গায় একটি হার্ট-লাংগ যন্ত্রকেই কাজে লাগিযে দেওযা যেতে পাবে।

আইনের দিক থেকেই বাধাটা আসছে সবচেযে বেশী। সে দিক থেকে

প্রশ্নটা হল, 'একটি মানুষকে আমরা কখন আইনগতভাবে মৃত বলে বিবেচনা করব ? কোন মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ স্তব্ধ হয়ে গেছে, রক্ত পরিবহনের কাজ বন্ধ হয়েছে, মস্তিষ্কও আর কাজ করছে না—ডাক্তার রোগীকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন। আমরা কি সে অবস্থায় রোগীকে আইনগতভাবে মৃত বলে ধরে নেব ?' অথবা যে জৈবিক প্রক্রিয়াগুলোর কাজ বন্ধ হল, তারা যে আর ফিরে কাজ করবে না, এটা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে ডাক্তারীমতে এবং আইনগতভাবে মৃত বলে ঘোষণা করা চলবে না। কিছুদিন আগে পর্যন্তও এটা ছিল নেহাতই একটা অ্যাকাডেমিক বা কূটতর্কের প্রশ্ন, কিন্তু কিছুকাল আগে অ্যামেরিকাতে একটি হৃদযন্ত্র সংস্থাপনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ বছরের গত ৭ই মে অ্যামেরিকার টেক্সাস প্রদেশের হাউসটন শহরে এক মদের দোকানে ক্ল্যারেন্‌স্ নিক্‌স্ নামে ৩২ বছর বয়সের এক যুবক দুটি তরুণের সঙ্গে মারামারিতে প্রাণ হারায়। ঠিক ঐ সময়েই শহরের এক হাসপাতালের ডাক্তার ডেন্টন কুলি ৬২ বছর বয়স্ক জন ষ্টাকওয়াসের বক্ষে সংস্থাপনের জন্যে একটি নতুন হৃদপিণ্ডের সন্ধান করছিলেন। ডাঃ কুলি প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে নিক্‌সের হৃদপিণ্ড অপসারিত করে ষ্টাকওয়াসের গুরুতরভাবে রুগ্ন হৃদ্‌পিণ্ডের জায়গায় সেটিকে স্থাপন করলেন। অবশ্য রোগীটি সাত দিন পরে অন্য উপসর্গের ফলে মারা যায়।

আদালতে যখন নিক্‌সের দুই হত্যাকারীকে অভিযুক্ত করা হল, তখন তারা নিজেদের নির্দোষ বলে ঘোষণা করল। ওদের বক্তব্যটা ছিল এই যে, নিক্‌স্ তাদের ঘুষিতে মারা যায় নি, তার হৃদ্‌যন্ত্রটি অপারেসন করে বার করে ফেলার জন্যেই সে মারা গেছে। ব্যাপারটা অন্য একটি কারণে আরো ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। টেক্সাস প্রদেশের একটি নিয়ম অনুযায়ী শবব্যবচ্ছেদের দ্বারা কোন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের পর কোন সিদ্ধান্তে পৌছনো চলবে না, যদি দেখা যায় যে মৃত ব্যক্তির কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে যেহেতু মৃতব্যক্তির হৃদযন্ত্র অপসারণের পর শবব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে, কাজেই অভিযুক্ত দুই হত্যাকারীর পক্ষ সমর্থন করে সহজেই বলা যাবে যে, মারাত্মক আঘাতের ফলেই লোকটির মৃত্যু ঘটেছে, এক্ষেত্রে তার কোন আইনগত প্রমাণ নেই। যদি এই সামান্য ছুতোয় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা নিষ্কৃতি লাভ করে, তাহলে এরপর কোন দেশের কর্তৃপক্ষই হত্যাকাণ্ডে মৃত কোন

ব্যক্তিব দেহ থেকে হৃদযন্ত্র অথবা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে অপসাবিত কবে অন্য দেহে সংস্থাপনেব অনুমতি দেবেন না বলেই মনে হয।

মৃত্যুব সংজ্ঞা

মৃত্যুব সংজ্ঞা নিযে তাই এক জটিল প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁডিযেছে। কোন ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা কবলেই কি তাকে মৃত বলে ধবে নিতে হবে। মৃত্যু সম্বন্ধে গবেষণা কবতে গিযে জীববিজ্ঞানীবা এ সম্বন্ধে কি জানতে পেবেছেন, আমবা সংক্ষেপে তা আলোচনা কবব।

বৈজ্ঞানিক গবেষণাগাবে জীববিজ্ঞানীবা কুকুব বা অন্য প্রাণীদেহেব ওপব মৃত্যুব ধীব অগ্রগতিকে লক্ষ্য কববাব জন্যে ওদেব দেহ থেকে সমস্ত বক্তকে বাব কবে নেন। তাব ফলে যে প্রচণ্ড আঘাতেব সৃষ্টি হয, তাতে ধীবে ধীবে প্রাণীটিব শ্বাসপ্রশ্বাসেব কাজ ও হৃৎস্পন্দন বন্ধ হযে আসে। এ অবস্থায প্রাণীটিব মাথাব ওপব যদি ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাফ যন্ত্রেব কাঁটাকে বাখা যায়, তাহলে যন্ত্রে প্রাণীটিব মস্তিষ্কেব সবচেযে উন্নত অংশ সেবিব্রাল কর্টেক্স থেকে উত্তেজনা প্রবাহ লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। মৃত্যুব বিরুদ্ধে শবীবেব সমগ্র প্রতিবোধ ব্যবস্থাকে জাগ্রত কবে তোলাব জন্যে এ যেন মস্তিষ্কেব সংগ্রাম।

তাবপব মৃত্যুব দিকে পববর্তী ধাপটিকে বলা হচ্ছে অ্যাগোনাল স্তব—এ অবস্থায় প্রাণীটি চেতনা হাবিযে ফেলে এবং তাব ব্যথাব কোন অনুভূতি থাকে না। মস্তিষ্কেব সেবিব্রাল কর্টেক্স অংশেব কাজ প্রচণ্ডভাবে বাধা পেতে থাকে এবং মস্তিষ্কেব আব একটি অংশ মেডুলাব (এ মস্তিষ্কেব সবচেযে নীচে, কর্টেক্স ও কেন্দ্রীয স্নাযুতন্ত্রেব মধ্যে যোগসূত্রেব মত কাজ কবে) ওপব এব নিয়ন্ত্রণেব ক্ষমতাও স্তব্ধ হযে আসে।

কিন্তু কর্টেক্স হাল ছেডে দিলেও, মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিযে যায স্নাযুতন্ত্রেব অন্য দুটি অংশ—মেডুলা এবং মেরুদণ্ড। হযত ক্ষণেকেব জন্যে হৃৎস্পন্দন ফিবে এল, মস্তিষ্কে এবং হৃদযন্ত্রে কিছু বক্তও হযত গিযে পৌছোল। এই অবস্থাটি মৃত্যু যে কাবণে ঘটেছে এবং প্রাণীদেহেব অবস্থাব ওপব নির্ভব কবে, কযেক মিনিট থেকে কযেক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থাযী হতে পাবে।

এবপব আসে মৃত্যুব ক্লিনিকাল স্তব। ডাক্তাবিমতে যাকে সত্যিকাব মৃত্যু বলা হযে থাকে। হৃৎস্পন্দন এবং শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হযে গেছে। চেতনালোপ হয়েছে অনেক আগেই, কিন্তু অতি নীচু স্তবে জীবনেব এক সূক্ষ্ম প্রবাহ এখনো

বয়েছে —এ হল বিভিন্ন তন্তু এবং অঙ্গেব স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন জীবন।

মস্তিষ্ক হল এবকমই একটি স্বতন্ত্র অঙ্গ। এ যতক্ষণ বেঁচে থাকবে, তার মধ্যে ডাক্তারি মতে মৃত একটি প্রাণীকে বাঁচিযে তোলা সম্ভব হলেও হতে পাবে। কিন্তু ক্লিনিকাল মৃত্যুব ক্ষেত্রে আবাব প্রাণ ফিবিযে আনাব এই সময়, পাঁচ, ছয়, খুব বেশী হলে আট মিনিটেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতার সঠিক কাবণগুলো বর্তমানে আমবা জানি। বেঁচে থাকাব জন্যে মস্তিষ্কেব স্নাযুকোষ-গুলোব চাই অক্সিজেন, যে অক্সিজেন শবীবেব শর্কবাজাতীয় বস্তুব সঙ্গে দহন-কাজেব মধ্য দিযে ঐ স্নাযুকোষগুলোব প্রযোজনীয় শক্তিকে যোগাবে। মৃত্যুব ক্লিনিকাল স্তবে, হৃদযন্ত্রেব কাজ বন্ধ হযে মস্তিষ্কেব কাছে কোন বক্ত আব পৌছচ্ছে না। অক্সিজেন নেই, তাসত্ত্বেও মস্তিষ্কেব হেফাজতে নিতান্ত জরুরী অবস্থাব জন্যে কিছু শক্তি মজুত বযেছে, সেটি হল অক্সিজেনের অবর্তমানে শর্কবা ও প্রোটীনেব দহনকাজেব জন্যে একটি বিশেষ পদ্ধতি, যার নাম অ্যানি-বোবিক গ্লাইকোলিসিস। কিন্তু এই জরুবীকালীন মজুতেব পবিমাণ খুবই কম এবং কয়েক মিনিটেব মধ্যেই সে সঞ্চয নিঃশেষ হযে যায। এবপব, মস্তিষ্কের স্নাযু-কোষেবা চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হযে পড়ে। যদিও মস্তিষ্কেব কিছু কিছু অংশ এব পবেও হযত কিছুটা সময বেঁচে থাকে, কিন্তু মস্তিষ্কেব সবচেযে উন্নত অংশ কর্টেক্সেব বেশীব ভাগ এলাকা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হযে যায। মস্তিষ্কেব শক্তিব শেষ সঞ্চয়টুকু নিঃশেষ হয়ে যাবাব পব যদি একটি মানুষকে মৃত্যুব হাত থেকে আবাব বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হয, তাহলেও বাকি জীবনটা তাকে নিতান্ত জড়-বুদ্ধি অবস্থায় কাটাতে হবে।

সাম্প্রতিককালেব কিছু কিছু পবীক্ষায জানা গেছে যে, মৃত্যুব ক্লিনিকাল স্তবকে কযেক ঘণ্টা ঠেকিয়ে বাখা যায়, যদি প্রাণীদেহেব চাবপাশে অতি নিম্ন তাপমাত্রাব (৪৬ ডিগ্রী থেকে ৫৯ ডিগ্রী ফাবেনহিট) পবিবেশ সৃষ্টি কবানো যায়। এ অবস্থায প্রাণীব সমগ্র জৈবিক প্রক্রিযাব গতি অত্যন্ত মন্থব হযে আসে এবং মস্তিষ্ক তাব শক্তিব শেষ সঞ্চয়কে এত ধীবগতিতে কাজে লাগিয়ে চলে যে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েও মস্তিষ্ক এবং সমগ্র প্রাণীদেহ মৃত্যুব ক্লিনিকাল স্তবে কয়েক ঘণ্টা কাটিযে দিতে পাবে।

আগেব আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পাবছি, একটি মানুষকে সম্পূর্ণ মৃত বলে ঘোষণা কবতে হলে, তাব মস্তিষ্কেব যে মৃত্যু ঘটেছে, তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ কবতে হবে। কিছুদিন আগে ফ্রান্সের চিকিৎসাবিজ্ঞান জগতেব সর্বোচ্চ

কর্তৃপক্ষ স্থিব করেছেন যে, একটি মানুষেব হৃৎস্পন্দনেব কাজ চলতে থাকলেও তাকে মৃত বলে ঘোষণা কব যাবে, যদি প্রমাণ কবা যায যে, তাব মস্তিষ্ক কোন-মতেই দেহেব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাদিব ওপব নিজেব নিযন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আব কার্যকবী কবতে সক্ষম হবে না।

মানুষের মস্তিষ্কেব কাজ যে সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হযে তাব মৃত্যু ঘটেছে, এটা একমাত্র ধবা পড়তে পাবে ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাফ যন্ত্রে মস্তিষ্ক থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন তবঙ্গকে যে যন্ত্র লিপিবদ্ধ কবে চলে। এ যন্ত্রেব কাঁটার গতি নিশ্চল হযে পডলেই বুঝতে হবে মস্তিষ্কেব মৃত্যু ঘটেছে।

মৃত্যুব সংজ্ঞা নিযে তর্কেব শীগগিব শেষ হবে বলে মনে হয না। নতুন হৃদযন্ত্র সংস্থাপনেব পবীক্ষা চলতেই থাকবে। এ পবীক্ষায় তরুণদেব দেহ থেকে তাজা হৃদযন্ত্র নিযে বৃদ্ধেবা ক্রমেই লাভবান হতে থাকবেন বলে চার্চের মুরুব্বী লোকেবা আশংকা প্রকাশ কবছেন। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদেব এ প্রসঙ্গে উক্তিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁবা মানুষেব দেহে জীবন্ত হৃদযন্ত্রেব বদলে কৃত্রিম হৃদযন্ত্র সংস্থাপনেব পরীক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত কবাব ওপব অনেক বেশী জোব দিচ্ছেন। হৃদযন্ত্র সংস্থাপনেব পবীক্ষা যদি অবিচ্ছিন্নগতিতে চলতেই থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে, যাবা যথেষ্ট বিত্তের অধিকাবী, একমাত্র তাবাই যথেষ্ট মূল্যেব বিনিময়ে একটি তাজা হৃদযন্ত্র কিনে নিযে নিজেব দেহে সংস্থাপন কবতে পাববেন, দবিদ্রেবা সে অধিকাব থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু একটি কৃত্রিম হৃদযন্ত্র অনেক সহজে এবং স্বল্পমূল্যে তৈবি কবা সম্ভব হবে, কাজেই সেটি যাবই প্রযোজন, তিনিই ব্যবহাব কবতে পাববেন। হৃদযন্ত্রেব চাহিদা পূবণেব জন্য হয়ত অনেক সময আফ্রিকাব কালো চামড়ার লোকেদেব জোব কবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হতে পাবে, এ আশংকাও সোভিযেত বিজ্ঞানীবা প্রকাশ কবেছেন।

সে যাই হোক, শল্যবিজ্ঞানীবা চিকিৎসা-বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে যে নতুন দিগন্তটিকে উন্মুক্ত কবলেন. সেখানে আরো চমকপ্রদ ঘটনাব জন্যে আমবা সাগ্রহ প্রতীক্ষায বয়েছি।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম ও মুসলিম সমাজ

শান্তিময় রায়

কয়েক মাস পূর্বে একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের বক্তৃতায় উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে মুখ্য বক্তব্য ছিল—ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে মুসলিমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ও দেশ-বিভাগ তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। দেশ বিভাগের কারণ এই আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। কিন্তু 'বিশ্বাসঘাতকতার' বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় সংহতিকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করছে, ভারতের প্রায় ৬০ কোটি হিন্দু-মুসলিম নাগরিকদের মনের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণা একটা উঁচু দেওয়াল তৈরী করতে সাহায্য করেছে। এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি-আন্দোলনে ভারতের মুসলিমদের সদর্থক ভূমিকা কতখানি ছিল সে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রথম মুক্তি-যুদ্ধ শুরু হয়—উনবিংশশতাব্দীর প্রথম দশকে। সৈয়দ আহমেদ নামে রায় বেরিলীর জনৈক মুসলিম ফকিরের নেতৃত্বে সারা উত্তর ভারতে ওহাবী সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রামে-বন্দরে-পাহাড়ে-কন্দরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদে বিরুদ্ধে অর্ধশতাব্দী ব্যাপী সংগ্রাম করেছিলেন, যে সংগ্রামের খরস্রোত সিপাহী বিদ্রোহের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে মিলিত হয়ে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং যার সর্বশেষ অভিব্যক্তি হয় ১৮৭২ সালে আন্দামানে লর্ড মেয়োকে হত্যার মধ্য দিয়ে। আততায়ী শের আলি বীরের মতো ফাঁসির রজ্জু বরণ করেন। এর আগে ১৮৭১ সালে বিচারপতি নরমানকে হত্যা করে আবদুল্লা নামে আর একজন ওহাবী-বিপ্লবী ফাঁসী বরণ করেন। ১৮১৮ সালে নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহে একজন বঙ্গ-সন্তান, শ্রীরফিক মণ্ডলের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৮৩২ সালে বাবাসতের নিকটবর্তী স্থানে--তিতু মিঞা, ওবফে তিতুমীর, প্রথমে জমিদাবদেব অত্যাচারেব বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্যলাভ কবেন, পবে প্রবল প্রতাপশালী ব্রিটিশ ফৌজেব বিরুদ্ধে বিপুল সংগ্রামেব মধ্য দিয়ে তাঁব বীবত্বেব গৌববোজ্জল স্বাক্ষব বেখে গিয়েছেন। বাংলাব লোকগাথায় আজও তিনি ব্রিটিশ বিবোধী স্বাধীনতাকামী অমব শহীদ হিসেবে স্বীকৃত।

সিপাহী বিদ্রোহেব অবসানে সাম্রাজ্যবাদবিবোধী সংগ্রামেব এক অধ্যায় শেষ হয়। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ও নবীন বাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনেব সহযোগী ও সহমর্মী ছিলেন। ১৮৬০ সালেব পর থেকে যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদেব জন্ম হলো তাঁব আকৃতি ও প্রকৃতি হিন্দু-সংস্কৃতি ভাবাপন্ন। এই নবীন জাতীযতাবাদে মুসলিম সমাজ সামিল হলেন না। এঁবা তখনো মনে কবতেন যে, এই তথাকথিত নবীন জাতীযতাবাদীবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেব সহযোগী। ১৮৭০ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামেব উৎক্রান্তিকাল। এই সমযেব মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিবোধী সংগ্রাম প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক স্তর অতিক্রম কবে জাতীয় সংগ্রামেব স্তবে উন্নীত হবাব সূচনা দেখা দেয়। এই সময়ে দুইটি ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, যাব ঐতিহাসিক প্রভাব জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে প্রভাবান্বিত কবে। প্রথম হলো, হিন্দু উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীব মধ্যে হিন্দু জাতীয়তাব উন্মেষ। এই জাতীয়তা বাজা বামমোহন বা ডিবোজিওব জাতীয়তাবাদ নয়। বাজা রামমোহনের জাতীয়তাবাদ পশ্চিম ও পূর্বেব মিলিত শ্রেষ্ঠ চিন্তা-ধাবার সমন্বিত দর্শন। ফবাসী বিপ্লব দিয়ে যে জাতীয়তাবাদেব সূচনা হলো পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্তিব সুযোগলাভে যে চিন্তা একদিন সর্বজনীন সমাজ-বিপ্লবী বিশ্বদর্শনমুখী হওয়া অনিবার্য ছিল। কিন্তু বাধা পেল সে মুক্ত চিন্তাব স্রোত। শুধু প্রাচীনেব মধ্যে ভাবাবেগের বাজ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠাব মধ্যেই ভারতের আগামী মুক্তি-আন্দোলন পুবোনো জবাজীর্ণ অন্ধ গলিতে প্রবেশ কবলো।

উনবিংশ শতাব্দীব ষাট দশকে তরুণ বুদ্ধিজীবীবা রাজনাবায়ণ বসুব নেতৃত্বে হিন্দু মেলাব প্রতিষ্ঠা করলেন (১৮৬৭)। 'প্রাচীন ভাবতের মধ্যে ভবিষ্যৎ'—এই আন্দোলনেব প্রথম প্রধান প্রবক্তাবা ছিলেন অবশ্য ইংরেজ প্রাচ্যবিদগণ। ব্রিটিশ আমলের প্রথমযুগে ওহাবীদের সাম্রাজ্যবাদবিবোধী সংগ্রাম, হিন্দু বাবু ও ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণীর সেকালেব প্রবর্তিত ইংবেজী শিক্ষাব ব্রত গ্রহণ

ও এই নব্য ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীব প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী সাম্রাজ্য-বাদবিবোধী সংগ্রামেব বিবোধিতা, সিপাহী বিদ্রোহোত্তব কালেও মুসলিম সাম্রাজ্যবাদবিবোধী সংগ্রামেব পবাভবেব যুগে নব্য হিন্দু-সংস্কৃতিভাবাপন্ন যে জাতীয় ভাবধারাব উন্মেষ ঘটলো, অত্যন্ত স্বাভাবিক কাবণেই সগুপবাজিত মুসলিম সাম্রাজ্যবাদবিবোধী সংগ্রামীবা সেই নব্য জাতীয়তাবাদকে সানন্দে গ্রহণ কবতে পাবলেননা। কিন্তু এদিকে ব্রিটিশ সবকাব এইবাব এই নবীন জাতীযতাবাদেব সুব ও মেজাজ সম্পর্কে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। বিক্ষুব্ধ ভাবতীয় বণিকশ্রেণী এবং বিক্ষুব্ধ দক্ষিণ ভাবতেব চাষীকুলেব সঙ্গে যুক্ত হলো—বাংলা দেশেব নব্য শিক্ষিত উচ্চাভিলাযী 'বুদ্ধিজীবীরা। এঁবা বাজনৈতিক সংগঠন গডে তুললেন। আনন্দমোহন বসু, সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবত-সভা গঠন কবলেন। ব্রিটিশ সবকাব অক্টোভিয়ান হিউমেব উদ্যোগে এই ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভেব এক বহির্গমনেব পথ কবেছিলেন, জাতীয কংগ্রেসেব জন্মেব ঐতিহাসিক (১৮৮৫) তাৎপর্য—এইখানে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সবকাব স্যাব সৈয়দ আহমেদেব উদ্যোগে মুসলিম সমাজেব অভিজাতদের ইংবেজী শিক্ষাব দিকে নিযে আসবাব সহাযতা কবলেন। ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে ব্রিটিশ সবকাবের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায একাবণে উচ্চশিক্ষিত মুসলিম বুদ্ধিজীবীব বিকাশ ঘটলো। এইবাব এঁবা হলেন নবীন জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এবং কংগ্রেসেব জাতীয় দাবীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারেব সহযোগী। উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধে যাবা ছিলেন সংগ্রামী, শেষার্ধে তাবা হলেন সহযোগী। আব যারা ছিলেন সহযোগী তাবা হলেন সংগ্রামী। ব্রিটিশ সরকাবের এই সার্থক কূটনীতি দুটি কাবণে সম্ভব হলো। প্রথম, বাংলাব তথা ভাবতেব নবজাগরণেব স্ববিবোধিতা ও স্বধর্মজনিত আদর্শগত দুর্বলতা (intrinsic ideological limitation)। দ্বিতীয়, মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীব মধ্যে সাম্রাজ্যবাদেব নির্মমতাব অবসান শুধু যে ধর্মীয় "জেহাদে" সম্ভব নয় এই "আত্মসমালোচনা" মূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শেব অভাব।

এক কথায়, "মুসলিম নবজাগবণ" শুধু মাত্র বাহ্যিক ইংবেজী শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো। তাদেব মধ্যে কোন বামমোহন এলেন না। বাজনারায়ণ বসুব মত মানুষ তাঁবা অনেক পেয়েছিলেন। তাই "ইসলামেব" সীমান্ত পাব হবার সংগ্রাম তাঁবা সাধাবণভাবে কবেন নি।

কিন্তু এই স্বাধীনতা অর্জন কবাব সংগ্রাম যে একেবাবে ছিল না তা নয়। মুসলিম সমাজেব যেসব শ্রেষ্ঠ সন্তান তৎকালীন সংস্কার ও বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য কবে সংগ্রামে নেমেছিলেন তাঁবা নিঃসন্দেহে ইতিহাসেব স্বীকৃতিব দাবী বাখেন।

সাম্রাজ্যবাদবিবোধী জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামেব প্রথম ব্যাপক প্রকাশ ঘটে ১৯০৬ সালেব বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব প্রচণ্ড বিক্ষোভে। বরিশাল সম্মেলনে, যিনি এই সংগ্রামেব প্রস্তাবে পৌবোহিত্য করেন, তিনি ছিলেন বিখ্যাত আইনজীবী আবদুল্লা বসুল। যেকোন ত্যাগ স্বীকারেব মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই তিনি এই সংগ্রামে নেমেছিলেন। সবকাবী দপ্তবে বঙ্গভঙ্গ-বদ আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলনেব যে নথিপত্র আছে তাতে দেখা যায় যে, পূর্ববঙ্গেব বিভিন্ন জিলায বঙ্গভঙ্গ-বদ আন্দোলনে হিন্দুদেব সঙ্গে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদেব এক উল্লেখযোগ্য অংশ বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। জিলা-ওযাবী সভাব যে হিসেব দেওয়া আছে তাতে মৈমনসিংহ—১১০, ঢাকা—৭৫, কুমিল্লা - ৬৫, ববিশাল—৮০, চট্টগ্রাম ৫০, নোযাখালী—৪০, কলিকাতা—২০০, ফবিদপুব—৫০টি সভা হয বলে জানা গেছে। এই সব জিলায বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনসাধাবণ অংশগ্রহণ কবেছিলেন ও মুসলিম জননেতাবা এই সব সভাগুলিতে ভষণ দিয়েছিলেন। এই বক্তাদেব মধ্যে বেশীব ভাগ ছিলেন উকিল, মোক্তার, শিক্ষক ও তালুকদাব।

মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজেব এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপে শঙ্কিত হয়ে লর্ড মিণ্টো, লর্ড মর্লে ১৯০৯ সালেব সংস্কার আইনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যেব সম্প্রসাবিত ভিত্তিকে ধ্বংস কবাব জন্য সাম্প্রদাযিক বাটোযাবাব শর্ত জুড়ে দিলেন। সংগ্রাম-বিবোধী মুসলিম অভিজাতশ্রেণী এতে আনন্দিত হলেন।

কিন্তু নব্য মুসলিম বুদ্ধিজীবীর দল এতে সন্তুষ্ট হলেন না। এঁদেব নবম-পন্থীদলেব নেতা মহম্মদ আলি জিন্না তখনো কংগ্রেসেব মধ্যে অন্যতম সম্মানিত নেতা। অন্যদিকে মুসলিম লীগেব নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আগা খান। বস্তুত, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ—তাদেব বার্ষিক অধিবেশনে (১৯১০) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেব জযগানে ও বিশ্বস্ততাব প্রদর্শনীতে একে অন্যকে অতিক্রম কবাব পাল্লা দিয়েছিলেন।

এ সময়ে ইউবোপে যুদ্ধেব ঘনঘটা। ভাবতেব বিপ্লবী দলগুলি যতীন মুখার্জি ও ডাঃ বাসবিহাবী বোসের নেতৃত্বে ভাবতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানেব জন্য

তৈরী হচ্ছিলেন। এই বিপ্লবী আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অনেক মুসলিম যুবক উত্তর ভারতে ও ভারতের বাইরে এই প্রস্তুতির সঙ্গে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। অনেক মুসলিম যুবক মুসলিম গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। মৌলানা আজাদ মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অবশ্য তিনি প্রথমে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর মাধ্যমে বাংলা দেশের 'যুগান্তর' বিপ্লবীদলের নেতাদের সংস্পর্শে আসেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্থান, পেশোয়ার ও উত্তর ভারতের অনেক জায়গা পরিক্রমা শেষ করে কোলকাতায় হালিবুল্লা নামে বিপ্লবী সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই সমিতির মাধ্যমে তিনি বাংলা দেশে ও বাংলার বাইরে অনেক দেশপ্রেমিক মুস্লিম বুদ্ধিজীবীকে তাঁর দলভুক্ত করেন। ১৯১৮ সালের পরেও তিনি একদিকে অসহযোগ আন্দোলন ও হিজারত আন্দোলনে যোগদান করেন, আবার অন্যদিকে নানাবিধ বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রাখেন। যুগান্তর বিপ্লবীদলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের জন্য তাঁকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ "ভয়ঙ্কর লোকের" তালিকাভুক্ত করেছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ওবিদুল্লা নামে আরএকজন মুসলিম বিপ্লবীর কথা সরকারী নথিপত্রে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে।

ওবিদুল্লা সিন্ধু প্রদেশের লোক ছিলেন। দিল্লী, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে তিনি বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন এবং আফগান-সরকারকে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে সাহায্য করার জন্য আবেদন করেন।

নানা কারণে আফগান সরকারের পক্ষে সে আবেদনে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয় নি। তারপর ওবিদুল্লা—রুশিয়ার জার সরকারকে ব্রিটিশের মিত্রতা পরিত্যাগ করে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে সাহায্য করতে আবেদন জানান। এই সময়ে জার্মান ও তুর্কী সরকারের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে তিনি "প্রথম অস্থায়ী আজাদ হিন্দ" সরকার গঠন করেন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ছিলেন সভাপতি আর অধ্যাপক বরকতুল্লা ছিলেন এই সরকারের প্রধান মন্ত্রী। এই বিপ্লবী দল কাবুল, আঙ্কারা, দামাসকাস ও কাইরোতে কয়েকটি গোপন কেন্দ্র স্থাপন করে বার্লিন কমিটির সহযোগিতায় এক ব্যাপক অভ্যুত্থানেরও আয়োজন

কবেছিলেন। বসবাতে ও ব্রহ্মদেশে সেনা-বিদ্রোহেব মূলেও এঁদেব হাত ছিল।

বিখ্যাত "বেশমী রুমাল ষডযন্ত্র" (১৯১৬) বলে উল্লিখিত নথিপত্রে যে-সব মুসলিম বিপ্লবীব নাম পাওয়া যায় তাঁদেব মধ্যে ছিলেন মৌলভী ওবিদুল্লা ছাড়াও মহম্মদ আবদুল্লা, ফতে মহম্মদ, মহম্মদ আলি। মৌলানা মহম্মদ হাসান ছিলেন এই বিদ্রোহেব অন্যতম মূল নেতা। তিনি মৌলভী আনসাবি ও ওবিদুল্লাব সঙ্গে যুক্ত হয়ে তুর্কীব গভর্ণব গালিব পাশাব সক্রিয় সহযোগিতায় মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম সেনাদেব মধ্যে ব্যাপক প্রচাবকার্য চালান। এঁদেব সঙ্গে যোগ দেন মিঞা আনসাবি ও হায়দাবাবাদেব শেখ আবদার বহিম। মহম্মদ হাসানেব নিকট হেজাজে যে-সব সাঙ্কেতিক চিঠিপত্র লেখা হতো সেগুলি বেশমী রুমালেব মধ্যে সুন্দব ভাবে লেখা। প্রায় সবগুলি চিঠি ব্রিটিশদেব হাতে পড়ে। গালিব পাশা ও অন্যান্য মুসলিম বিপ্লবীদেব মক্কাব শেবিফ বিশ্বাসঘাতকতা কবে ধবিযে দেন। ফলে. এই ষডযন্ত্র ব্যর্থ হয। সেনাবাহিনীব বহু ব্যক্তি ও ভাবতেব অনেক বিপ্লবী মুসলিম ছাত্র ধবা পডেন ও সুদীর্ঘকালেব জন্য কাবাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

এই সব বিপ্লবীবা বার্লিনে ও জুবিখে অবস্থিত বার্লিন কমিটিব সঙ্গে যে এক যোগে কাজ কবেছিলেন তাব অনেক প্রমাণ আছে। এই প্রসঙ্গে আবএকজন মুসলিম বিপ্লবীব নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। মহাপ্রাণ প্রাজ্ঞ বিপ্লবী মৌলানা মহম্মদ ববকতুল্লা প্রথম মহাযুদ্ধেব সশস্ত্র বিদ্রোহেব শ্রেষ্ঠ নাযকদেব মধ্যে অন্যতম। তিনি ভূপালের গবিব মধ্যবিত্ত পবিবাবে জন্মেছিলেন। কৈশোবে কঠোব জীবন-সংগ্রামেব মধ্যে শিক্ষা সমাপ্ত কবে তিনি শিক্ষকতাব বৃত্তি গ্রহণ কবেন এবং কিছুদিনেব জন্য জনৈক শিক্ষানুবাগীব সহৃদয়তায তিনি উচ্চশিক্ষাব জন্য লণ্ডনে যান এবং সেখানে বিভিন্ন ভাষায অসাধাবণ ব্যুৎপত্তি লাভ কবেন। তিনি যখন লিভাবপুল বিশ্ববিদ্যালযে অধ্যাপনা কবছিলেন. সেই সময়ে (১৮৯২) তিনি বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণবর্মাব সংস্পর্শে আসেন এবং যে সশস্ত্র বিপ্লবেব পথেই একমাত্র ভাবতেব মুক্তি—এই আদর্শে দীক্ষা গ্রহণ কবে আজীবন বিপ্লবেব জন্য সংগ্রাম কবে যান। এব কিছুদিন পব তিনি হবদযাল, মাদাম কামা, বীবেন দাশগুপ্ত প্রভৃতিব সঙ্গে কখনো গদব পার্টিব সংগঠকরূপে, কখনো বিপ্লবী সাংবাদিকরূপে কখনো ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক হিসেবে, নিউইয়র্ক, প্যাবিস, টোকিও, বার্লিন, জুবিখ, কাবুল, মস্কো

প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন মিশনে নেতৃত্ব করেছেন। তিনি ছিলেন প্রথম আজাদ হিন্দ অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী। তুর্কীর পরাজয় ও বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে হিরাটের দিকে রুশিয়ার সীমান্তে প্রবেশ করেন।

বলশেভিক সরকার এঁদের যোগ্য মর্যাদা দিয়ে মস্কোয় নিয়ে যান। ১৯২৭ সালে বিদেশে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে দীর্ঘ রোগভোগের পর বরকতুল্লা প্রাণত্যাগ করেন। [তাঁর বিশেষ অভিলাষ ছিল যে, কোনদিন স্বদেশে যেন তাঁর কবর দেওয়া হয়। তাঁর শেষ অভিলাষ আজও অপূর্ণ আছে।]

ওবিদুল্লা, মহম্মদ হাসান, বরকতুল্লা, আলি মনসুর প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন আরো একজন মুসলিম বিপ্লবী—সিন্ধু অধিবাসী আমির হায়দার। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের মধ্যে তিনিও অংশ গ্রহণ করেন। পর পর কয়েকবার দুর্গম সীমান্ত অতিক্রম করে সমুদ্রে পর্বতে সীমান্ত রক্ষীদের সজাগ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে তিনি সারা পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবী সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, জাভা, সুমাত্রা, জাপানে বিভিন্ন জাহাজের জাহাজীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলে সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরী করা ছিল তাঁর প্রধান কাজ। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কখনো ধরতে পারে নি। পরবর্তীকালে তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনে যোগ দেন। [১৯৪৫ সালে নেত্রকোণা কৃষক কংগ্রেসে তাঁর সঙ্গে লেখকের দিন দুই কাটাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। এইরূপ অসাধারণ বিপ্লবী-চরিত্র লেখকের সচরাচর চোখে পড়েনি, খুব সম্ভবত বর্তমানে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে আছেন।]

•

প্রথম মহাযুদ্ধে ব্যর্থ বিপ্লব-প্রচেষ্টায় যে সব বিপ্লবী সৈনিক হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছিলেন বা দীর্ঘদিনের জন্য কারাবরণ করেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। এবং এ-সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য এখনো সংগ্রহ করাও শেষ হয়নি। তবু দুই একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি। যে-প্রচেষ্টা ভারতীয় বিপ্লবী যতীন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রাসবিহারী বসু ও প্রবাসী বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ—বীরেন দাশগুপ্ত, হেরম্ব গুপ্ত, নরেন ভট্টাচার্য, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, আলি মুনসুর, অধ্যাপক বরকতুল্লা প্রভৃতি শুরু করেছিলেন, যার সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন মুস্লিম বিপ্লবীবৃন্দ—ওবিদুল্লা, মহম্মদ হাসান,

আমিব হাইদাবী প্রভৃতি—তাবই রূপায়ণে এগিয়ে এসেছিলেন—সিঙ্গাপুব, মান্দালয়, বেঙ্গুন, জাভা, সুমাত্রাব সেনা-বাহিনীব মধ্যে কর্মবত বিপ্লবীবা। এঁদেব মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম। বিভিন্ন বন্দবে জাহাজীবা এঁদেব মধ্যে "জাহানী ইসলাম" নামে বিপ্লবী সংবাদপত্র বিলি কবতে সাহায্য কবতেন। এব একটিতে ঈজিপ্টেব ইনভাব পাশাব একটি আবেদন ছিল: "হিন্দু ও মুসলমান তোমবা উভয়েই একই বাহিনীব সৈনিক। তোমবা দুই ভাই। এই নীচ ইংবেজজাতি তোমাদেব শত্রু। এদেব বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে (জেহাদ) যোগ-দিয়ে তোমবা মহত্ত্বলাভ কব। ভাই-এব সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ভাবতেব মুক্তি অর্জন কব।"

এই সংগঠিত প্রচেষ্টাব ফলে ১৯১৫ সালেব জানুয়াবী মাসে ১৩০-নম্বব বেলুচি রেজিমেন্ট বেঙ্গুনে, ব্যাঙ্ককে ও সিঙ্গাপুবে বিদ্রোহেব পতাকা উত্তোলন কবে।

১৫ই ফেব্রুযাবী, ১৯১৫ সালে ৫নং নেটিভ লাইট পদাতিক সেনাবাহিনী (যাব প্রায় গোটা সেনাবাহিনীই মুসলিম) সিঙ্গাপুবে বিদ্রোহ কবে।

এই সব বিদ্রোহ ব্যর্থ হয। এই বিদ্রোহীদেব দুইজনকে ফাঁসী দেওয়া হয়। ৪৩ জনকে গুলি কবে হত্যা কবা হয। বাকী সবাইকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তবেব আদেশ দেওযা হয।

এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে যে,ব্রিটিশ সেনা বিভাগেব পাঁচজন ইংরেজ সৈনিক বিদ্রোহীদেব সঙ্গে যোগ দেন এবং বিপ্লবী সৈনিকদেব সঙ্গে মাথা উঁচু কবে একই সঙ্গে মৃত্যুববণ কবেন। ১৯১৭ সালে দ্বিতীয় মান্দালয ষডযন্ত্র মামলায তিনজন বিপ্লবী সৈনিকেব প্রাণদণ্ড হয। এঁবা হলেন মুজতাবা হোসেন (জয়পুবেব অধিবাসী), অমব সিং (লুধিযানা), ফৈজাবাদেব আলি আহ্‌মদ। ১৯১৫ সালেব জুন মাসে সিঙ্গাপুবে কাসিম ইসমাইল খাঁন মনসুব নামে একজন ধনী সদাগব সেনানিবাসেব সঙ্গে সংযোগ কবাব জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯১৫ সালে মার্চ মাসে বসুল্লা খান, ইমতিয়াজ আলি, ও রুকনুদ্দিন খান নামে তিনজন সৈনিক বিদ্রোহের অপবাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। এঁবা সবাই প্রাণভিক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃত হন এবং পবস্পরকে আলিঙ্গন করে বীরেব মতো ফাঁসিব বজ্জু ববণ কবেন। ১৯১৫ সালেব মার্চ মাসে সিঙ্গাপুবে ৪৫ জন এন. সি. ও, বিদ্রোহ কবেছিলেন। এঁদেব মধ্যে হাবিলদাব সুলেমান, নায়েক মুস্‌তি খান, নাযেক জাফব আলি খান,

নাযেক আবদুল বেজ্জাক খান সাতজন শিখ ভ্রাতাব সঙ্গে প্রাণদণ্ড ববণ কবেন।

১৯১৮ সালেব পব ভাবতেব মুসলিম সমাজ দুইটি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, একটি খিলাফৎ, অন্যটি হিজাবত।

খিলাফৎ আন্দোলনে মুসলিম নেতাদেব সাবা দেশ-পবিক্রমা ও তাঁদেব কারাদণ্ডেব ইতিহাস অনেকেই জানেন।

পূর্ববর্ণিত মৌলানা আজাদ খিলাফৎ ও হিজাবত আন্দোলনেব অন্যতম প্রধান নাযক ছিলেন। কিন্তু বিপ্লবীদেব সঙ্গে তাঁব সংযোগেব তথ্য খুব কম লোকেরই জানা আছে। খিলাফৎ ও হিজাবত আন্দোলনেব সময তিনি মুসলিম যুবকদেব মধ্য থেকে কয়েকজনকে তাঁব বিপ্লবীদলে সংগ্রহ কবেন। কয়েকজনকে তিনি উত্তব-পশ্চিম সীমান্তে প্রচাব পুস্তিকা ও অস্ত্রশস্ত্র আমদানীব কাজে নিযোগ কবেন। এই সময়েই আবদুব বেজাক খাঁ নামে একজন অসাধাবণ মুসলিম যুবক তাঁব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন। এই বেজাখাঁন 'যুগান্তব' ও 'আত্মোন্নতি'ব বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদেব সংযোগ বক্ষাব কাজে নিয়োজিত হযেছিলেন। এই দুই দলেব মধ্যে অস্ত্র সবববাহ কবাই তাঁব অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। পববর্তীকালে তিনি গণ-বিপ্লবেব পথ বেছে নিযে ভাবতেব কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। উত্তব পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আফ্রিদি উপজাতি ও অন্যান্য মুসলিমদেব মধ্যে বিপ্লবেব প্রচাব ও প্রসাবে মৌলানা আজাদেব অবদান অবিস্মবণীয এবং এই কাজে আবদুব বেজাকখাঁ ছিলেন তাঁব একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী। রেড সার্ট আন্দোলনেব গোডাব দিকে তিনি এঁদেব সঙ্গে ছিলেন. বস্তুত মৌলানা আজাদ ও অধ্যাপক ববকতুল্লাকে এশিযাব অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষা-সম্পন্ন বিপ্লবী বল্লেও অত্যুক্তি হয না।

১৯১৮ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বিপ্লববাদী আন্দোলনেব নতুন কবে সূত্রপাত হলো। ১৯১৭ সালে রুশিযায বিপ্লব, ১৯২০ সালে শ্রমিক আন্দোলনেব প্রধান সংগঠন ট্রেড ইউনিযন কংগ্রেসেব প্রতিষ্ঠা, ১৯২১-২২ সালেব অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনেব ব্যর্থতা ভাবতেব গণবিপ্লবেব পথকে সুগম কবেছিল। মুসলিম সমাজেব মধ্যে যাঁবা শ্রেষ্ঠসন্তান এইবাব তাঁবা এই গণ-বিপ্লবেব পথে আকৃষ্ট হলেন এবং এব সংগঠক হলেন। বাংলা দেশে এইসমযে মুজফ্‌ফব আহমদ ও কবি নজরুল ইসলাম সাহিত্য-সেবাব মধ্য দিযে প্রথম

সাম্যবাদেব পথে পবিক্রমা শুরু কবেন (১৯২২)।

তাছাড়া অনুশীলন সমিতিব অন্যতম নেতা শচীন সান্যালেব প্রভাবে সাংবাদিক কুতুবুদ্দিন আহামেদ ও আবদুল হালিম প্রথমে বিপ্লববাদেব পথে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং পববর্তীকালে এঁবাও সাম্যবাদেব পথ গ্রহণ কবেন। উত্তব ভাবতে ও উত্তব পশ্চিম সীমান্তে বলশেভিকবাদেব প্রথম প্রবক্তাবা প্রায় শতকবা ৯০ জন এসেছিলেন মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও মুসলিম জাহাজী শ্রমিকদেব মধ্য থেকে। পেশোয়াব বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলাব আসামীবা প্রত্যেকেই মুসলিম সমাজেব শ্রেষ্ঠসন্তান। অধ্যাপক ববকতুল্লাব প্রভাব এঁদেব ওপব ছিল অপবিসীম। এই সময় আবদুল মোমিন নামে একজন মুসলিম যুবক আত্মোন্নতি সমিতির অন্যতম নেতা -বিপিন গাঙ্গুলীব বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাব সঙ্গে যুক্ত হন। পববর্তীকালে তিনি বহুদিন কাবাগাবে কাটান এবং পবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দন।

যুগান্তব বিপ্লবী দলেব সঙ্গে যেসব মুসলিম যুবক যুক্ত ছিলেন—তাঁদেব মধ্যে নেত্রকোনাব মকসুদ্দীন আহমেদ বাংলাদেশেব বিপ্লবীদেব নিকট পরিচিত। তাছাডা জামালপুবেব মোলবী গিয়াসুদ্দীন আহমেদ, নাসিরুদ্দীন আহমেদ ও তাঁব কন্যা বাজিযা খাতুন ও মৌলভী আবদুল কাদেব প্রভৃতি বিপ্লবী কর্মী যুগান্তর দলেব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও বিপ্লবী আদর্শেব জন্য বহুবাব কাবাববণ ও ত্যাগ স্বীকাব কবেছেন। "বিদ্রোহী" গোষ্ঠিব সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবীদলের সঙ্গে যাঁবা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ কবেছিলেন তাঁদেব মধ্যে কিশোবগঞ্জেব আলিনেওয়াজ, মহম্মদ ইসমাইল, চাঁদ মিয়া প্রভৃতি ও অনুশীলন দলেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপ্লবী আলতাফ আলিব নাম উল্লেখযোগ্য।

'যুগান্তব দলেব অন্যতম নেতা—ভূপতি মজুমদাবেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সিবাজুল হক ও হামিদুল হক, এঁবা উভযেই দীর্ঘদিন কাবাববণ কবেছিলেন। বর্তমানে এঁবা সাম্যবাদেব প্রতি সহানুভূতিশীল কর্মী।

মৈমনসিংহেব পব চট্টগ্রামেব বিপ্লবীদেব মুসলিম গণভিত্তি ছিল সবচেযে বেশী। যে কাবণে ব্রিটিশ সবকাবেব শত চেষ্টা সত্বেও অত্যাচাবী কর্মচাবী আসানুল্লাকে হত্যাব পব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো ব্যর্থ হয়েছে। যখন হিন্দু পবিবাবেব ছেলেবা কাবাগাবে, মুসলিম পবিবাবেব মেযেবা তখন বিপ্লবীদেব আশ্রয দিয়েছেন, শুশ্রূষা কবেছেন, বাঁচিযে বেখেছেন। অম্বিকা চক্রবর্তীকে প্রাণে বাঁচানো ও আশ্রয দিযেছিলেন একজন মুসলিম চাষী। ইবাদতুল্লাহ

নামে জনৈক যুবক বিপ্লবী অনন্ত সি কে আশ্রয় দেন এবং কলকাতার বিপ্লবীদের আড্ডায় নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সূর্য সেন, কল্পনা দত্ত, তারকেশ্বর দস্তিদার, এঁদেরও বার বার মুসলিম চাষীর ঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছে। পটিয়া থানার সম্মুখে শৃঙ্খলিত ও লাঞ্ছিত সূর্য সেনকে দেখে হাজার হাজার গ্রামের সরল মুসলিম চাষী ক্রোধে দুঃখে চোখের জল ফেলেছিলেন। শত লাঞ্ছনা যন্ত্রণার মধ্যে ও এই ঘটনা বিপ্লবী সূর্য সেনের দৃষ্টি এড়ায় নি। আজও চট্টগ্রামের এই দেশপ্রেমিক মুসলিম চাষীভাইদের কথা উঠলে চট্টগ্রামের প্রতিটি বিপ্লবীর চোখের কোণে অশ্রুরেখা দেখা দেয়। তাদের জীবনের অনেক কিছুই নেই কিন্তু যে জিনিষ আছে সেটা হচ্ছে তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ মূলধন—মুসলিমচাষীর সহজ দুঃসাহসী ভালবাসা– (কল্পনা যোশীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার)। ১৯৩০ সালের মে মাসে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে যখন দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়, সোলাপুরের বীর শ্রমিকেরা সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন সেই আন্দোলনে। সোলাপুরের চারজন বীর শ্রমিকের এজন্য জারবেদা জেলে ফাঁসী হয়। এঁদেরই অন্যতম ছিলেন আবদুল রশিদ ও কোরবাণ হোসেন। প্রাণ ভিক্ষা তাঁরা চাননি।

আর একজন মুসলিম বিপ্লবীর আত্মত্যাগের কাহিনী দিয়ে এই নিবন্ধ শেষ করবো। ১৯৩৪এর পরে মুসলিম সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে স্থানাভাবের জন্য এ-প্রবন্ধে বর্তমানে লেখা সম্ভব নয়। উত্তর ভারতে ভগৎসিংহ, বটুকেশ্বর ও চন্দ্রশেখর আজাদ প্রভৃতি বিপ্লবীরা হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মি নামে একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন। এই দলের অন্যতম সক্রিয় সভ্য ছিলেন আসফাকুল্লা। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় অন্য তিনজনের সঙ্গে তাঁর প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজেন লাহিড়ী, রামপ্রসাদ বিস্মিল। বন্ধুদের বিরুদ্ধে সামান্য মুখ খুললেই তিনি মুক্তি পেতেন এই রকম আভাস তাঁকে দেওয়া হয়। ঘৃণাভরে আসফাকুল্লা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর ফাঁসীর আগের দিন ফৈজাবাদ জেলে অগণিত বন্ধু-বান্ধব দেখা করতে এসে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলেছিলেন ঃ

"যে মহৎ ব্রতের শেষদিন আমি পালন করতে যাচ্ছি তা আমাকে ধীর ও শান্ত ভাবে পালন করতে না দিলে এর পবিত্রতায় বিঘ্ন ঘটবে। আমি আজ নিজেকে ধন্য মনে করছি এই মনে করে যে, আমার উপর মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি মহৎ ও পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। তোমাদের আনন্দিত

ও গর্বিত হওয়া উচিত যে তোমাদেরই একজনের সৌভাগ্য হয়েছে জীবন উৎসর্গ করবার। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কানাইলাল ও ক্ষুদিরামের মত মহৎ প্রাণকে তাঁরা উৎসর্গ করেছেন। আমার পক্ষে এটা পরম সৌভাগ্য যে আজ মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন হিসেবে আমি সেই মহৎ-প্রাণ বিপ্লবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার সুযোগ লাভ করেছি।" সেদিন বধ্যভূমিতে পাশা-পাশি মঞ্চে রামপ্রসাদ ও আসফাকুল্লা গীতা ও কোরাণের আরত্তির মধ্যে ফাঁসীর রজ্জু বরণ করেছিলেন। আবার জন্ম হবে, আবার দেখা হবে, আবার তাঁরা মাতৃভূমির জন্য একসঙ্গে লড়বেন—এই ছিল রামপ্রসাদের শেষকথা। এই মহৎ বিপ্লবীরা এক শাশ্বত মানবতার অব্যক্ত বেদনার ভাষাকে রূপ দিয়ে গিয়েছিলেন "মৃত্যুহীন প্রাণের" বিনিময়ে। ইতিহাস এঁদের স্মরণ করবে চিরকাল, ইতিহাস সত্যনিষ্ঠ।

সংক্ষিপ্ত তথ্যসূচি: ১। হাণ্টার: দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান, ২। মৌলানা আজাদ পেপারস্ (মহাফেজখানা) ৩। নিক্সন রিপোর্ট ও রাওলাট রিপোর্ট, ৪। পেট্রি কমিশন রিপোর্ট, ৫। কালীচরণ ঘোষ: দি রোল অফ অনার, ৬। বরকতুল্লার বিষয়ে দলিল (মহাফেজখানা), ৭। জর্মান বিদেশী দপ্তরের দলিলপত্রের মাইক্রো ফিল্‌ম, ৮। পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলার কাগজপত্র, ৯। 'সিল্ক কনসপিরেসি' (মহাফেজখানা), ১০। কল্পনা যোশী ও সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১১। যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়: বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিকথা, ১২ ভূপেন্দ্র দত্ত: বিপ্লবের পদচিহ্ন, ১৩। মুজফ্‌ফর আহমেদ: সমকালের কথা, ১৪। ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী: দি এক্সট্রিমিস্ট চ্যালেঞ্জ প্রভৃতি।

আমি শুনতে পাই

বাম বসু

আমি শুনতে পাই
প্রেমিকাব মৃদু ভাষণেব চেয়ে গভীব
অতর্কিত আর্তনাদেব চেয়েও তীব্র
ইতিহাসেব ইঙ্গিতেব চেয়েও অব্যর্থ
সেই সব, যা স্থিব-হয়ে-আসা নদীতে থিতিয়ে থাকে
আমি শুনতে পাই, সব শুনতে পাই।

পাখি যা হাবিয়ে ফেলেছে আমি তাই খুঁটে নিয়েছি
সেই হৃত সমুদ্র, বিস্তীর্ণ গোধূলি, হলুদ বনভূমি
আমি সঞ্চয় কবে বেখেছি কৃষ্ণবাত্রি মুখেব ভাঁজে ভাঁজে
আমি শুনতে পাই, সব শুনতে পাই।

কারুকার্য কবা অপবাধে গা ঢেকে বসে আছে মন্ত্রী
আমি চাই না সেই বক্তাক্ত ভাষণ যা মৃত্যুকেও ম্লান কবে দেয়
আমি তাই অবণ্যেব পাতাব স্তূপে নির্মাণ কবেছি আগ্নেয় মন্দিব
হৃদ্‌পিণ্ড উপড়ে তুলে আমি পূর্বমুখী
হে সূর্য হে আদিদেবতা!

গ্রন্থিমুখে যা এসে মিশেছে তা স্মৃতি নয়
মন্দিবেব স্ফটিক সোপানে তীববিদ্ধ পাখি নয়
সে আকীর্ণ ছায়াব পুঞ্জে জীর্ণ নুনেব কান্না আব জ্বালা
বিকৃত চোয়ালেব কাছে একটা ফুল আব নীলা

গ্রন্থিমুখে যা এসে মিশেছে
আমাদের ক্লিন্ন স্বার্থে পবিপুষ্ট দিন
আমাদেব স্বপ্নহীন অপবাধী দিন।

আমি শুনতে পাই
সেই উন্মাদ অশ্ব আঁধিব দিকে তাকিয়ে ডেকে উঠছে
যেই সুন্দব মানুষ পাহাড়ের মতো বুক চিতিয়ে দিয়েছে
সেই অপরূপ পাখি তাকে ঘিবে পাক খাচ্ছে
আমি শুনতে পাই—
সময়কে বিদ্ধ কবো
সময়কে বিদ্ধ করো
বিমূর্ত বিশ্ব পেতে দাও শূন্যেব ভিতবে
গেবিলাব মতো নিঃশব্দ অথচ অব্যর্থ উত্তাপে
এক মুঠো মাটি তুলে নাও
তাকে চুমায় চুমায় ভূষিত কবো
যা আমাদেব বক্ত-মাংস চুঁইয়ে বৌদ্রেব মতো
বৌদ্রেব মাতাল বিভূতিব মতো

আমাদেব সত্তায় প্রবাহিত হবে
গানের চেয়েও নম্র
স্বপ্নেব চেয়েও পূত
প্রেমের চেয়েও গভীব নীববে।

আমি সব শুনতে পাই

শীত

অসীম বায

দ্যাখো দ্যাখো হোটেলখানাও বন্ধ, কী শীত, নিভন্ত উনুন, পথে
পথিক নেই ভিখিবী নেই গাছেব তলাও শূন্য,
জাহাজঘাটে মাস্তুলেব আলোব পাশেই জমজমাট মেঘে
বন্ধ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নিগানও।

পানেব দোকান বেতাবমাতাল দেশপ্রাণ বক্তা এমন বাতেও
বলেন, চাল চুলোয় যাক গাজব খাও খাও মটব চানা,
বাত বাড়ছে খিদিবপুবে খালেব বুকে পাটেব গুদাম ছেড়ে
পানসি এসে জমায ভিড, জেটিব গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়াব দোলা।

কী শীত কী শীত! পঁচিশ বি-ব ঐ পাশেই হলদে বাড়ির ত্রিতল ঘরে
আজ বাতেই বাসব পায়াভাঙা তক্তপোষেব ভালো কোণে
আজ বাতেই রোমাঞ্চিত স্পর্শ, হাওয়ায় বেড়াল ছানাব স্ববে
শানাই কখন বেজে ওঠে, কখন শুভদৃষ্টি হ্যারিকেনে।

আজ বাতেই মাতাল হয়ে কাপ্তেনেব কালো বুইক গাড়ি
উধাও হলো ট্র্যাফিক-পুলিশ-শূন্য খাঁ খাঁ ব্রিজেব বুক দিয়ে
হবিণসম চকিত বেগ—অনেকক্ষণ পবেও থেকে থেকে
আদবে ভবা নারীর গলা কাঁপতে থাকে বাজাবে মন্দিরে।

ঘুমায় কুকুব, ঘুমায় ছেঁড়া নিশান কাছেই মসজিদেব মাথায়,
বাসাব পানে বাড়িয়ে পা বেহলা-মুখী বাদামভাজাওয়ালা
"বিদায় দাও মা ঘুবে আসি" ভাঙাগলায় গেয়ে ওঠাব শেষেই
চাঁদও ওঠে—অনেক পাতাখসা বটের শীর্ণ মগডালে।

ডাকাতি

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

দবজায় প্রচণ্ড লাথির শব্দ
চমকে উঠে দেখি
চাবিদিক মশালের আলোয লালে লাল।

প্রচণ্ড লাথির শব্দ দবজায়, আব চীৎকাব
দবজা খোলো, দবজা খোলো
আমবা লুঠ কবব।

মশালেব আলোয় চাবিদ্দিক লালে লাল,
আমি কিছুই দেখতে পেলাম না
কতকগুলি ইস্পাতেব ফলা থেকে বিচ্ছুবিত আলো
আমাব চোখ ধাঁধিয়ে দিলো।

বাইবে কেউ কেউ মৃত্যুযন্ত্রণায ককিয়ে উঠল
প্রাণেব ভযে চীৎকাব কবে উঠল কেউ কেউ, আব
আমার বোধহীন চেতনাহীন অন্ধকাব দবজা ভেঙে
হুড়মুড কবে ঢুকে পডল
ওরা।

দুই হাতে চোখ ঢেকে নতজানু আমি
একবাবই মাত্র চেঁচিয়ে উঠলাম,
সর্দাব সর্দাব, আমাকে বাঁচাও

আমাব গর্দানে খাঁডাব ঘা পড়ল॥

আলোর বৃত্তে ঘুরে

ধনঞ্জয় দাশ

আমরা আলোর বৃত্তে ঘুরতে ঘুবতে
ঘুবতে ঘুরতে হয়তো একদিন
জীবনকে বাজি ধরব
এবং অন্ধকাবকে খুন কবে
আকাশেব মাঠে
সেই লাশটা শুইযে দিয়ে
নাচতে নাচতে—
নাচতে নাচতে জ্বেলে দেবো
দাউ দাউ প্রাণেব আগুন।

আমরা আলোব বৃত্তে ঘুবতে ঘুরতে
ঘুবতে ঘুবতে হযতো একদিন
অগ্নিবর্ণ শাড়ি খুঁজব
এবং দু-চোখেব তূণ ছুঁড়ে
নিরন্ন সংসারে
তাকে হাত ধবে টেনে এনে
নাচতে নাচতে—
নাচতে নাচতে মেলে দেবো
তাবি চুলে বসন্ত-ফাগুন।

অন্ধকারেও ফুলের মালা

কৃষ্ণ ধর

ও কিছুই চায় নি শুধু অন্ধকাবে বসেছিল হাত পেতে
ওকে দেখাচ্ছিল যেন আজকেব নয়
গতকালের কোনো মানুষ
অন্ধকাবেব জামাটা ওব সর্বাঙ্গে লেপটে ছিল নিখুঁতভাবে।

আগে বলত, কিছু দিয়ে যাও বাবা
বলত, মা-লক্ষ্মীদের মনে দয়া হোক
বলত, আমি অন্ধ নাচার এবং অসহায়।
মনে হতো, যেন গতকালেরই কোনো মানুষ
অন্ধকারের জামার তলায় গুটিসুটি মেরে বসে আছে।

অনেকদিন আর ওকে দেখি না
ওর জায়গাটায় বসে থাকে এক ভিখিরি তরুণী
কথা বলে সুরেলা গলায়
চোখেও আছে কিছু ঝিলিক
অন্ধকারে যেন আলো জ্বলে

বলেছিলাম, সেই অন্ধ নাচার অসহায় মানুষটা
কোথায় গেল বলতে পার
সেই অন্ধকারের জামা গায়ে দিয়ে বসে থাকত
গতকালের যে-মানুষ!

তরুণীটি শীর্ণ মুখে ফিক করে হাসে
চোখে ঝিলিক তুলিয়ে বলে,
ও তো আমার মানুষ বাবু,
ওকে আজ ফুলতলায় পাঠিয়েছি
আমার জন্য একটা মালা ভিখ মেগে আনবার জন্য।

খুঁজবে না স্বকীয় আভাস

সিদ্ধেশ্বর সেন

"And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eyes"

দৃষ্টি কি শুধুই ধুলোবালি
এবং কাঁকর
অথবা সে তিলতম দাগ

নাকি তা তোমার প্রসাদ হবে, বলো,

চতুর্দিকে যদিবা রেখেছ খোলা চোখমনকান
ক্লিষ্টের এ অভিমান, কেন, তবে দায়
আত্মসর্বস্বতায় খুইয়েছ ?

তুমি কি নিজের দিকে তাকাবে না
কোনোকাল
দেখবে না তোমার উদ্ভাস, জ্বালায় শতেক দীপ, আলো

তুমিও কি নিজের প্রকৃতি ভুলে, অন্য—
পরতন্ত্রে ধরবে হাল, বাড়াবে ভোগের চালচুলো
খুঁজবে না স্বকীয় আভাস

দৃষ্টি কি শুধুই ঢাকবে ধুলোবালি
কাদাপাঁক, জড়,
অথবা সে তিলতম দাগ

বন্ধুর মুখের বিভা, ভাইসোদরের চোখে যতটুকু বিভা
নিমেষে তাকেও করবে কালো

নাকি সে দৃষ্টির প্রসাদ বইবে বলো।

মর্মর

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

আঘাতের শব্দ জানি, প্রতিঘাতে দ্বিগুণ ঝংকার।
এখন জলের থেকে ভালো লাগে জলের উত্থান,
উন্মুখ বাগান
ফুলের ভিতর থেকে তুলে ধরে লৌহময় ঢাল
দিগন্ত উত্তাল—
রামধনু যেন কোন বাঁকা সেতু, কে যাবে ওপার?
সমস্ত দুয়ার
খুলে গেলে পৃথিবীর প্রধান উৎসব।
মেঘের উদ্ভব
সমাদরে ভরে দেয় কলসের সোনালি অন্তর—
এও তো মর্মর।
এখন জাহাজ ছাড়া সব ঘাটে ভেসে যায় পাল,
ভয়ংকর জাল
ছিঁড়ে ফেলে ফুলে ওঠে অহংকারে অতিকায় লাল—
নিদ্রার ভিতর থেকে জেগে-ওঠা ঝড়—
এও তো মর্মর।

দুঃখ বিষয়ক স্বরবৃত্ত

শিবশম্ভু পাল

বাজার থেকে দুঃখ কিনে এনে
সূক্ষ্ম পানপাত্র ভরাব না।
দাঁড়িপাল্লা সাজিয়ে আছে বেনে
কলেজ স্ট্রীটে সবাই তাকে চেনে
ছায়া-ধরার ব্যবসা ফেঁদে কামায় মন্দ না।

আমার নিজের একশ বিঘে জমি

হাত বাড়ালেই দুঃখ পরিতাপ
মানে না সে সপ্তমী অষ্টমী
তিথির বালাই, বিপুল অসংযমী
অতিবৃষ্টি খরা রাখে স্বেচ্ছাচারের ছাপ।

ছড়িয়ে দেবো ইচ্ছামতো দান
অক্ষরের পাত্রে পরিপাটি
হাত বাড়ালেই ফুলের অপমান
পক্ষপাতী আদিম পঞ্চবাণ
গ্রহান্তরে, পায়ের নিচে দুঃখ আমার মাটি॥

আত্মপরিচয়হীন

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

আমি রেশমের দাম জানি নিকেলের অডিকোলনের রুপালি মাছের
সবুজেরও, মাছি আর স্টেইনলেস স্টীলের আড়তে
প্রোটিন ও ভালোবাসার দরদস্তুর তাও জানা।
আমার ভালোই লাগে ধূসরতা বহুদূর নিঃশব্দতার
উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান , কাচের শো-কেস থেকে এই নিচু ঘরবাড়ি করে,
কেবলই অলীক বলে ফিরে পাওয়া ভিতরের যা-কিছু গোপন ,
আত্মপরিচয়হীন, তাই আছি বাইরে দাঁড়িয়ে
বাইরেও আমার ছিল লোকজন বিত্ত ও বৈভব আর ভালো-বাসা-বাড়ি
মানবজমিনে ঢের শস্য ছিল, শরীরের ভিতরেও টিয়া।
আমিও জানতাম, এই সবই একদিন
হয়তো ফুরাবে—আজ আছি সেই বহিরবয়বে !

আমার ভালোই ছিল ধর্মাধর্ম, চলাচল, হাতের ভঙ্গিমা,
শিরস্ত্রাণ ছিল না হে, দূরবীন ছিল না
যা হোক, তোমার দয়া তারই মাঝে আমাকে নিয়েছে মেপেজুকে ,

আজ বুঝে দেখো ফেব, কী আছে আমার।
আমি রেশমেব দাম জানি নিকেলেব
তথাপি তোমাব দাম দিতে পাবি এমন ক্ষমতা
কোনোদিনই ছিল কি আমার।

সেরিনেড

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

তোমাকে শোনাই গান—কানাগলি-আকাশেব তলে,
ভাডাটে বাডিব
ঘুণধরা জানলার নিচে,
ফুটপাতে দাঁড়িযে—
তোমাব চোখের কোল থেকে
এক পোচ কালি
মুছে দিতে,
আমিও শোনাই গান—ধোঁয়াশায়
দম বন্ধ হয় বাববাব—
ঝলকে ঝলকে
ওঠে স্বব, গলা চিবে
যৌবনেব একবোঝা গান
ছুটে আসে—কলকাতা-কুঞ্জবনে
আমাব এ নিবেদন
বেমানান, পবিচয়হীন—
তুমি শুনতে পাও কিনা,
স্নায়ুর বিশ্রাম
একটু কি দিতে পারি?
কানাগলি-আকাশের তলে,
ভাড়াটে বাড়িব
ঘুণধরা জানলাব নিচে
ফুটপাতে দাঁড়িয়ে·

বেড়া ভেঙে ঘর পালাল

তুষার চট্টোপাধ্যায়

আলুক মালুক শালুক রে বনশালুকের পাতা
দিল্লী বলে কেটে ফেল্লাম বাঙলাদেশের মাথা।

বাঙলাদেশে বরকন্দাজ ধরমে বড় বীর
আজি ডাঙা কাজী ডাঙা মধ্যে বাঙলাদেশ
মন্ত্র পড়েন গুণের ভাসুর জিন্দা গাজীর পীর
কুচবরণ কন্যার মেঘবরণ কেশ।

মেঘ সাজল ওলা ঝোলা সামাল ডাইনে বাঁয়
পাঁচ এযোতি জোকার দিলো মাথায় বরণ কুলো
ছাঁদনাতলায় মাসতুতো ভাই আছাড় পিছাড় খায়
জোড়কাঠিতে বাজনা বাজে উড়ল পথে ধুলো।

ইন্নি ফুল বিন্নি ফুল আর তো ফুল কেশে
বেড়া ভেঙে ঘর পালাল পড়শী মরে হেসে।

পাসপোর্ট-বিহীন বাঙলাদেশ

অমিতাভ দাশগুপ্ত

মা জানেন আমার পিপাসা—
ভরা দুধের বাটির ছাঁদে টলোমলো চাঁদ,
ইচ্ছার আবেগে নৌকা খরতোয়া,
চারপাশে খিলখিল সর্বনাশ,
"জলের মতন সোজা"—এ প্রবাদ মিথ্যে করে জল
কুটিল বঙ্কিম স্ফীত রয় রাজকীয় স্বেচ্ছাচারে,
অতলে ধানের শিশু
অগণিত কচি কচি শবমুণ্ড ব্যথিত প্রশ্নের

অনুত্তরে শুয়ে থাকে—এখানে ওখানে
শাণিত খড়্গের বেগে লগির দামাল ওঠা-পড়া,
তারই যোগ্য যোগায় মহড়া
ছপাছপ পাড় ভাঙা,
বাতুল চরণ পাট অপেক্ষায় কালো হয়ে আসে,
খুব কাছ ঘেঁষে যাই, ছুটে আসে সর্পগন্ধ
ফিসফাস বাচাল বাতাস
সালতির তলদেশ কখন হৃদয়ে টানে মগ্ন চর,
মজ্জমান হাত নাড়ে নীল চীনে-বাঁশের দঙ্গল।

এক বুক জলে এক গলা ভালোবাসা ডুবি করে
বাঙলার উত্তরে এসে এ ভাবেই গোয়ালন্দ স্টিমার-ঘাটার
পদ্মা এসে মেশে নাকি ?
ছুটে আসে শীতলাক্ষ্যা—এপার ওপার
কাঁটা তার, সীমান্ত-প্রহরী, রোয়েদাদ-হীন
বুড়ী তিস্তা অভিমানী কিশোরী মেঘনাকে
বুকে টানে,
পুবের মাঝির ভাটিয়ালি
লুফে নেয় রাজবংশী যুবার ভরাট কণ্ঠনালী।

মা জানেন আমার পিপাসা,
অবিরল চন্দ্রপাতে কোটালের রাক্ষসীবেলায়
দুপার নিশ্চিহ্ন,
জাগে পাসপোর্ট-বিহীন ভালোবাসা।

উত্তাপ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

মনে হয় এবারের শীতকালেও আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।
দুহাতে দস্তানা, কোট কম্ফর্টার নিয়ে প্রভাত ভ্রমণে বেরিয়ে দেখব
পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের কাছে শুষ্ক নেমে আসছে বৃক্ষের বিষণ্ণ পাতা,
দেখব পৌষের সমাকুল কুয়াশায় বাড়ির নম্বরগুলি
স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে স্তব্ধ মহিষের মতো হয়ে আছে।
মনে হয় এবার শীতেও আমার গরম জল
লাগবে, সূর্যকে মাথার উপর অক্ষরের খড়্গে
লম্ব হতে দেখলে ইজিচেয়ারের নিখুঁত আলস্যে
পুনর্বার গত বছরের কবিতায় চোখ বোলাব, যেখানে
অসংখ্যবার লেখার পরেও "মানুষ" শব্দের ব্যবহার সঠিক হয় নি,
আয়ুর সমান তোমাকে বর্ণনা করতে চেয়েও যেখানে পৃথিবী থেকে
আমি কোনো নতুন নি:শ্বাস পাইনি। এখন তাই
আমার ভাষায় বড় শ্মশানের শোচনা, দুপুরে
শরীর ও ছায়া যখন নীরব প্রতিদ্বন্দ্বী, যখন কেবল
কাক ছাড়া অন্য কোনো পাখি স্বেচ্ছাসেবকের মতো
তার আপাদমস্তক কালো নিয়ে খুব কাছে আসতে চায় না
আমি রৌদ্রকে বুঝিয়ে বলি কেন ভালোবাসা আজ আর খাদ্যবস্তু নয়।
বলি. কেন এখন বুকের পাশে অসম্ভব খোলা
কবিতার খাতার উপর উড়ে এসে পড়ছে শুকনো পাতা,
উপমাক্রান্ত ইন্দ্রিয়সমষ্টির মতো যারা হাল্কা, ভাষণবিহীন।
তাই বাঁ হাতে কেবলি তাদের সরিয়ে দিচ্ছি, কেননা এখনো
ডান হাতে আমার ঝর্ণা কলম—যার অর্থ হলো
এবারের শীতকালেও আমাকে শব্দ থেকে তাপ এনে বেঁচে থাকতে হবে।

লালোৎপল

সৈয়দ আবুল হুদা

নীল সাগরে মিশাও এবার
লাল সাগরের জল।
কানায় কানায় লালে লালে
করুক টলমল ॥

নীলের বনে লালের হাওয়া
নিত্য করুক আসা যাওয়া,
নীল আকাশে লালের আভা
করুক ঝলমল ॥

নীলের কণ্ঠে লালের বাঁশি
নীলের মুখে লালের হাসি,
ভোরের নীলে ফুটুক এবার
রক্ত শতদল ॥

লালের চুমো নীলের গালে
নীলের বিনাশ হোক রে লালে,
লালের হাওয়ায় নীলের পালে
উড়িয়ে নিয়ে চল ॥

লালের অঙ্গে মিশে নীলে,
লাল হবে নীল তিলে তিলে
নীলোৎপলের বক্ষ চিরে
ফুটুক লালোৎপল ।

কলকাতায় বৃষ্টি ও পক্ষীরাজ

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

গভীর রাতে ঘোড়ার গাড়ি, অনেক স্মৃতি জাগিয়ে তোলে
গভীর রাতে ডুবছে শহর প্রবল কোনো ঘূর্ণিপাকে
রাস্তা কোথায়, রাস্তা কোথায় অন্ধকারে চেঁচিয়ে উঠে
সহিস জোরে চাবুক ঘোরায়, দুলতে থাকে ঘোড়ার গাড়ি

জলের মধ্যে মাছের মতো শব্দ ওঠে ছপছপিয়ে
হাঁটুর তলায় জোয়ার আসে, সারা শহর গঙ্গাজলে
ডুবতে গিয়ে বন্যা বন্যা চেঁচিয়ে ওঠে সতীর্থরা
ট্রাফিক-পুলিশ মত্ত সেও আজকে এমন বন্যাত্রাণে।

ঘোড়ার গাড়ি চড়া হয়নি একুশ বছর শহরবাসে
পা বাড়ালে ট্যাকসি নিয়ে পক্ষীরাজের সাধ মেটানো
আজকে হঠাৎ ভুলতে পেরে ভালোই হলো বৃষ্টি এসে
কলকাতাকে ডুবিয়ে দিয়ে ডুবুরীরা মুক্তো খোঁজে।

মন্ত্র পেয়ে হাজার ঘোড়া ছুটতে থাকে অন্ধকারে
পায়ে পায়ে ঘুরছে যেন ঘুন্‌সি বাঁধা ঝড়ের হাওয়া
সওয়ারীদের চিন্তা কেবল যেমন তেমন ঘরে ফেরার

সারা শহর জলের নিচে মৎস্যকন্যা খুঁজতে থাকে।

বাঘবন্দী

গণেশ বসু

বাঘবন্দী, ওমনি হঠাৎ
শানাই বুকে স্বপ্নচাবুক
স্রোতের বাঁকে দুঃখে ক্রোধের
স্কোয়াড্রনে, দ্বিমুখটানে

আত্মঘাতী শিবায় শিবায়,
রক্তচাপে
হিংহি শহর
তৃষ্ণা জমি
স্কুইসগেটের চ্ছলাৎ প্রেমে।

আছড়ে তুমি আমায় যদি,
স্বভাববশে রুক্ষ পাহাড়
ঝলসে ওঠে প্রতিশোধের
লক্ষ চূড়ায়, বক্ষে মাদল
যৌবনেরই, পাঁজর ফাটে,
দরজা খোলে
মনের ভিতর
বোধের ভিতর
প্রতিশ্রুতির বক্ষে মাদল।

ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকি পলকা হাওয়ায়
স্বেচ্ছাচারের মত্ত ফণা
আকাশপাতাল ছায়ার মতো
খুবলে খায়, চক্রময়
পদচ্যুতির অসীম শোক
থেঁতলে যাই
নিজের পাপে
ভগ্নসুখের
আঁকড়ে স্মৃতি যন্ত্রণাতে।

বাঘবন্দী, অমনি হঠাৎ
অধিকারের খড়্গ তুলি
কাঠ গোলাপে, অন্ধকারের
ডুবড়ে যাওয়া মুখের রেখায়
সর্বনাশের ঝুঁটি নেড়ে,

ধানের স্বাদে
তপ্ত বুকের
বর্শা তুলি
টুকরো দেশের পাঁজর থেকে।

উদয়গিরির পথে

বত্নেশ্বর হাজরা

অপরাহ্নের দিকে মুখ করে যে থেমেছিল তার অবয়ব
পাথর
অবসাদের কপাল ছুঁয়ে যে দাঁড়ায়
সে অবসান—
উদয়গিরির পথে রোজ সেই পর্যটকের সঙ্গে দেখা
যার ডাইনে উত্তর বাঁ দিকে দক্ষিণ
যেখানে সূর্য ডুবে যায় সেখানে
তার ঘর
সেখানে আমার

উদয়গিরির পথে তার মুকুট
লবেল পাতার সবুজে
ঢাকা—
আমার বর্ম
শিরস্ত্রাণ
অসমান পথে পথে ছড়িয়ে পড়ে
বর্শাবিদ্ধ খণ্ড খণ্ড যৌবন
অপরাহ্নের দিকে মুখ এক দীর্ঘ পাথরের
ছায়ায়।

দেবো ভাবলেই দেযা যায় না

তুলসী মুখোপাধ্যায়

দেবো ভাবলেই অনেক কিছু দেয়া যায় না   দেবো দেবো কবে
মরা কান্না জুড়লেও   অনেক সময অনেক কিছুই অদেয় থেকে যায
দেবো ভাবলেও অনেক কিছু দেয়া যায না—

যেমন, ভালোবাসার কথাই ধবো না—দিতে গেলেই কোনো না কোনো
গন্তব্যে যাওযা চাই   ভালোবাসা তো আব ক্যাম্বিস বল নয
যে—ছুঁড়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে গেল   কিংবা কোনো
পার্সেল-টার্সেলও নয যে ডাকবাক্সে ফেলে দিলেই—ব্যস!
দেবো ভাবলেই যা হোক একটা গন্তব্য চাই-ই চাই   অথচ
বাস্তায় নামলে সকল সময বাস্তা পাওযা যায় না   ট্রাফিক
জাম আছে, কাবফ্যু আছে, আছে গুণ্ডা-বদমাসেব ঝক্কি-ঝামেলা
সর্বোপবি মোড়েব মাথায় জববদস্ত পুলিশ—আমদানী
বাবদ মুনাফা?   না, কেবল রপ্তানী খবচ?   বিদেশী
মুদ্রা ব্যয়ে এ বকম সৌখীন বিলাস!

দেবো ভাবলেই অনেক কিছু দেযা যায না   যেমন ভালোবাসা—
ভেতবে ভেতবে একটা আঁকুপাঁকু ভাব থাকলেও দবজায
খিল দিযে বসে থাকতে হয!

আমার বাঙলাদেশ

অমিয় ধর

আকাশ ভবা তারার ফুল অবাকটানা চোখ,
চোখেব পাতায় চলন-বিল বুকেব পাশে নদী—
জ্যোৎস্না-ধোয়া ভাটিয়ালির আকুল করা স্মৃতি :
এপার ওপার তুমি তো-এক আমার বাঙলাদেশ!

আর এক বিজয়া

হিরণকুমার সান্যাল

১৩১২ বঙ্গাব্দের ৩০-এ আশ্বিন বাঙলাদেশ খণ্ডিত হয়েছিল কার্জনের শাসনদণ্ডের আঘাতে। কয়দিন পরে বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ির প্রাঙ্গণে আহূত বিজয়া-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

" হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া-সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একেবারে আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ করো। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত, নদীজাল-জড়িত পূর্বসীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত করো। যে চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখা-প্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও, আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্না-ধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ শুচিরুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দেমাতরম্‌' গীতধ্বনি একপ্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক—একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান ॥

তেবট্টি বছব আগেব ওই বিজযা-সম্মিলনীতে আমি উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু একথা ভেবে আজ গর্ব অনুভব কবি যে সেদিনকাব যে বিপুল আন্দোলনে শুধু বাঙলাদেশ নয়, সাবা ভাবতবর্ষ আন্দোলিত হয়েছিল—তাতে আমি যোগ দিয়েছিলাম। তখন আমাব বয়স ছয়, আমাবই কাছাকাছি বয়সেব বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়ে নিয়ে গঠিত হয়েছিল একটি শিশুবাহিনী আব এই শিশুবাহিনীব কাজ ছিল "বাংলাব মাটি বাংলাব জল" প্রভৃতি গান গেয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুবে শহববাসীব মনে উদ্দীপনা-সঞ্চাব। কিন্তু উদ্দীপনা হতো বোধহয় নিজেদেব মনেই বেশি।

বাঙলাব মাটি ও বাঙলাব জলেব সঙ্গে নিবিড় পবিচয ঘটেছিল ইতিমধ্যেই, কেননা আমাব মাতুলালয় কুষ্টিযাব অনতিদূরে গোবাই নদীব ধাবে। 'ছিন্নপত্র'ব পাঠকদেব কাছে গোবাই নামটি পবিচিত। অনেকেবই মনে পড়বে সেই আশ্চর্য চিঠিব কথা—যাতে ববীন্দ্রনাথ লিখছেন :

"আমি বিকেলে,বেলা সাড়ে ছ'টার পব, স্নান কবে ঠাণ্ডা এবং পবিষ্কাব হযে চবেব উপব নদীব ধাবে ঘণ্টাখানেক বেড়াই, তাব পব আমাদেব নতুন জলিবোটটাকে নদীব মধ্যে টেনে নিযে গিযে তাব উপবে বিছানাটি পেতে ঠাণ্ডা হাওয়ায সন্ধ্যাব অন্ধকাবে চিৎ হযে চুপচাপ পড়ে থাকি। চোখের উপবে আকাশ তাবায় একেবাবে খচিত হবে যায়—আমি প্রায বোজই মনে কবি, এই তাবামব আকাশেব নীচে আবাব কি কখনও জন্মগ্রহণ কবব ? যদি কবি, আব কি কখনও এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটিব উপব বাংলাদেশেব এই সুন্দব একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে জলিবোটের উপব বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাব ? হয়তো আর-কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধেবেলা আব কখনও ফিবে পাব না। তখন কোথায দৃশ্যপবিবর্তন হবে—আব, কিবকম মন নিয়েই বা জন্মাব! এমন সন্ধ্যা হযতো অনেক পেতেও পাবি, কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তাব সমস্ত কেশপাশ ছড়িযে দিযে আমাব বুকেব উপবে এত সুগভীব ভালো-বাসাব সঙ্গে পড়ে থাকবে না।"—ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ৯৮

এই গোবাই—ববীন্দ্রনাথেব গোবাইযেব সঙ্গে আমাব পবিচয শৈশব থেকে। কুষ্টিযা বেলস্টেশনেব গাযে-লাগা একটি লালবর্ণেব দোতলা বাড়ি—তখন এটা ছিল শিলাইদা কুঠিবাড়িবই একটা ঘাঁটিব মতো। ববীন্দ্রনাথ তাঁব ভ্রাতুষ্পুত্র ——— ঠাকুরের সঙ্গে একদা যখন পাট-ব্যবসাযে প্রবৃত্ত হযেছিলেন,তখন এই

বাড়িটিই ছিল তার কেন্দ্র। কৈশোরে যখন রবীন্দ্রসাহিত্যজগতে প্রবেশ করে একেবারে আবিষ্ট হয়ে পড়ি,তখন থেকে কুষ্টিয়া স্টেশনে নামবার পরেই একবার গিয়ে দেখে আসতাম ওই লাল বাড়িটি। তারপর গোরাই নদী বেয়ে নৌকো-পথে যেতাম মাতুলালয়ে।

পদ্মা হলো গঙ্গার প্রধান অববাহিকা আর,পদ্মারই একটি শাখা হলো গোরাই নদী। এই গোরাই নদী আবার দক্ষিণে গিয়ে পরিচিত হলো মধুমতী নামে। পূর্বপাকিস্তানে এখন কুষ্টিয়া স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা পেয়েছে। ব্রিটিশ আমলে কুষ্টিয়া মহকুমা ছিল প্রথমে পাবনা ও পরে নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। কুষ্টিয়া মহকুমার পর গোরাই নদীর দুই তীরে এখনো রয়েছে ফরিদপুর ও যশোহর জেলা। এই যশোহর জেলার মাগুরা থানার অন্তর্গত মহম্মদপুর একসময়ে ছিল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী। জায়গাটি মধুমতীর ধারে।

গোরাই-এর স্রোতে ভাসতে ভাসতে আমরা চলে গিয়েছি বহু দূরে। রবীন্দ্রনাথ নিজে অতদূর যান নি, কিন্তু একথা শুনেছি যে শিলাইদা থেকে গোরাই নদী বেয়ে তিনি একবার এসেছিলেন আমার মাতুলালয়ের পাশের গ্রামে। ওপারে ছিল খোক্‌সা-জানিপুরের গঞ্জ আর সেখানে ছিল ঠাকুরবাবুদের এক কাছারি। ওই সময়ে নাকি তিনি এক বাউলের গান শুনে তাকে পুরস্কার দিয়েছিলেন। কৈশোরে এসব কথা শুনেছি ঐ গ্রামবাসী এক বৃদ্ধের মুখে। শিলাইদা আমি যাইনি—কিন্তু অনেক বছর আগে কুষ্টিয়া থেকে স্টীমারে পাবনা গিয়েছিলাম গোরাই ও পদ্মা সঙ্গমে শিলাইদার পাশ দিয়ে। পাবনায় যে বাড়িতে ছিলাম, তার অল্প দূরে ইচ্ছামতী নদী এসে মিশেছে পদ্মায়। চৈতালির "ঐ তন্বী ইচ্ছামতী"।

বিজয়া-সম্মেলনের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখা-প্রশাখা বাহিয়া, ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের পূর্ব পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও।" রবীন্দ্রনাথ যে অকুণ্ঠ আবেগে এই আলিঙ্গন বিস্তার করেছিলেন, তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর কবিতায় গানে গল্পে। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির জমিদারির তিনটি পরগণা, বিরাহিমপুর, সাজাদপুর ও কালীগ্রাম—এই অঞ্চলটির সঙ্গেই ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়। বিরাহিমপুর পরগণার কাছারি ছিল শিলাইদা কুঠিবাড়িতে, সাজাদ-পুরের কাছারি ছিল সাজাদপুর গ্রামেই আর-একটি কুঠিবাড়িতে, আর

কালীগ্রাম পরগণার কেন্দ্র ছিল পতিসর গ্রামে নাগর নদীর ধারে। এখানে তেমন বাড়িঘর কিছু ছিল না, নাগর নদীতে 'পদ্মা' বোটই ছিল রবীন্দ্রনাথের একমাত্র আশ্রয়। এইখানেই লেখা হয় 'চৈতালি'র বেশিরভাগ কবিতা।

সম্প্রতি সাজাদপুর, রবীন্দ্রনাথের সাজাদপুর, বাঙলার দৈনিক পত্র-পত্রিকায় সংবাদ হবার মর্যাদা লাভ করল। শোনা গেল যে পাকিস্তান সরকার এখানকার কুঠিবাড়ির অপব্যবহার করছেন—শিলাইদার কুঠিবাড়ির মতন এটি রক্ষণা-বেক্ষণের কোনো আয়োজন হয়নি। পরে জানা গেছে খবরটি ঠিক নয়। পাকিস্তান সরকার জানিয়েছেন যে সাজাদপুরে কবির স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে তাঁরা উদাসীন নন। জানিনা কেন এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্রনাথের উল্লেখ কোথাও দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে দেখাশোনা করলেও ঐ সাজাদপুর পরগণার মালিক ছিলেন অবনীন্দ্রনাথেরা তিন ভাই—দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর এই ভাগ মহর্ষি নিজে করে দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের আশ্চর্য কয়েকটি ছবিতেও সাজাদপুর অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

'ছিন্নপত্রাবলী'তে সাজাদপুরের কথা আছে বারবার। তবে রবীন্দ্রনাথের টান ছিল শিলাইদার প্রতি অনেক বেশি, কেননা শিলাইদা জায়গাটি একেবারে পদ্মাপারে, যে পদ্মাকে রবীন্দ্রনাথ এক হেমন্তের দিনে গোধূলির শুভলগ্নে পশ্চিমের অস্তমান সূর্য সাক্ষী করে প্রাণসমর্পণ করেছিলেন।

পঁয়তাল্লিশ বছর আগে শান্তিনিকেতনে একদিন রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শিলাইদাতে তিনি আর বেশি যান না কেন। উত্তরে কবি বলেছিলেন, "আমার নদী শিলাইদা থেকে দূরে চলে গেছে।"

কিন্তু তবু সেদিনকার পদ্মা ছিল আমাদের সকলের নদী, বাঙালির নদী। আজ পদ্মার অধিকার থেকে বহু বাঙালি বঞ্চিত। কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার সীমিত হলেও আধ্যাত্মিক অধিকারে পদ্মানদী সমগ্র বাঙালি জাতির নদী। তাই তেষট্টি বছর আগেকার বিজয়া-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের সে ভাষণ স্মরণ করে আজ আর-এক বিজয়ার প্রাক্কালে আমার আলিঙ্গন প্রসারিত করব গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও যমুনা, ইছামতী ও গোরাই—অখণ্ড বাঙলার সব কটি নদ-নদীর কূলে ও উপকূলে।

আগামী বিজয়াতে আরো স্মরণ করব ঐ অঞ্চলের শুধু জল-স্থলকে নয়, ঐ জলে-স্থলে যারা বাস ও বিহার করে—সেইসব হিন্দু ও মুসলমানকে, এবং অবশ্যই স্মরণ করব এই বিরাট উপমহাদেশের সমগ্র হিন্দু ও মুসলমান সমাজকে, বিশেষভাবে মুসলমানদের—যাদের এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আমরা আজও আপন বলে গ্রহণ করতে পারি নি।

পরিচয়

পরিচয়
বর্ষ ৩৮ ॥ সংখ্যা ৩
আশ্বিন ॥ ১৩৭৫

সূচিপত্র

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদপট

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়।

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৩৮। সংখ্যা ৩

পরিপ্রেক্ষিতের রবীন্দ্রনাথ

দেবেশ রায়

তরুণ কবি-সমালোচক সুরজিৎ দাশগুপ্ত "দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথের" মধ্যে কিছু কিছু মিল আবিষ্কার করেছেন তো বটেই, পরন্তু সাহিত্যের তিন সত্তাকে মিলিয়ে ভাবতে চেয়েছেন কোনো বুনিয়াদি সূত্র, যা কবিত্বের মহত্ত্বকে নির্ধারিত করেও আধুনিক। রসগ্রাহী চিন্তাবিদ আবু সয়ীদ আইয়ুব বোদলেয়রীয় শিল্পভাবনাকে রবীন্দ্রনাথের চারপাশে খাড়া করিয়ে দেখতে চেয়েছেন ভারতীয় কবির মঙ্গলভাবনার সঙ্গে বোদলেয়রীয় আধুনিকতার সম্বন্ধ। আর বিশ্বমনীষার আনন্দ নিস্যন্দন আকাশে নিঃশ্বাস গ্রহণেই অধিকতর অভ্যস্ত, "রাবীন্দ্রিক বাংলার মানুষ", বাংলা ভাষার কবিতার আধুনিকতার পরিপ্রেক্ষিতের রচনায় নিজের হাত ব্যবহার করছেন গত কয়েকযুগ ধরে সেই বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চেয়েছেন তাঁর "আত্মপরিচয় বা সত্তাসংক্রান্ত সংকটানুভব ও উত্তরণ"-এ আধুনিক বিশ্বের সত্তাঘটিত সংকটের ওয়ালেস স্টিভেনসীয় ও ব্রেখ্‌টীয় দুই বিপরীত উত্তরের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ গ্রহণ-বর্জন মিল-অমিলে।

ফলে আমাদের মতো তৃষিত গৌড়জনের এ-রকম একটা অভাবিত লাভ ঘটে গেল যে যথাক্রমে তিন লেখকের "দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ" "আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ" "রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা"—তিনটি রচনা একত্রে গত সাতশ বৎসরের পৃথিবীর সাহিত্যের প্রধানতম সৃষ্টিপ্রক্রিয়াগুলি প্রায় কালানুক্রমিক ভাবেই এনে দিয়েছে। পরস্পরের অজ্ঞাতেই বাংলাদেশের শিল্পজিজ্ঞাসাকাতর মনীষী সহ তরুণ থেকে বার্ধক্যের মহৎ তরুণ কবি পর্যন্ত যে প্রায় একটি সুপরিকল্পিত স্তরবিন্যস্ত অনুসন্ধানের অংশী হয়ে পড়লেন তাতে বোঝা যায় দৈনন্দিনের আত্মপরিচয়হীন গড্ডলে "স্রোতের শ্যাওলাসম" ভেসে বেড়ানো যদিচ প্রায় পরিণত জাতীয় অভ্যাস, মলেও যায় না, সঙ্গে

সঙ্গে দেড়শ বছব আগে জাতীয় আত্মজিজ্ঞাসাব সেই তাড়া এখনো দুর্মব, মলেও যায না।

এই আত্মজিজ্ঞাসাব উত্তব খুঁজতে প্রধান বিবেচনা মেথডেব। অববোহী পদ্ধতিব বিন্যাসে সুবজিৎ দাশগুপ্ত ত্রযোদশ শতকী ইতালি থেকে উনিশ শতকী বাংলা-তে চলে আসেন মধ্যআঠাব-শতকেব জার্মানিকে ছুঁযে—তাঁব গ্রন্থেব প্রথমতম বাক্যটিকে যেন ব্যাখ্যা কববাব জোবেই "মহাকবিবা ক্রান্তিকালেব সন্তান।" আবাব বিস্ময, শুভ ও মঙ্গলবোধ বা এই তিনেব সমন্বযকেই বোম্যান্টিক কবিতাব প্রধান ধাবকচেতনা ধবে নিযে বোদলেযাবি অমঙ্গল-বোধেব অসাবতা আব ঠাকুবি অশুভবোধেব সাববত্তাব নজিব ও তুলনায ব্যস্ত হযে পড়েন আইযুব। অপবদিকে, আবোহী বিন্যাসেব টানে শার্লক হোমসেব শেষ বক্তৃতাব অব্যর্থতায কবি কাহিনী থেকে শেষলেখা পর্যন্ত বচনাব তদন্তেব অন্তে বিষ্ণু দে এক পদ্ধতিব আভাস কবেন কলোনিব চৈতন্যে যাতে বিশ্ব, বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতাব লড়াই, ফ্যাসিবাদ আব সমাজতন্ত্রেব আলোড়নে আধুনিকতাব একটি স্বস্থ সংজ্ঞা জন্ম নেয।

মেথডেব প্রসঙ্গ অত্যন্ত জরুবি হযে পড়ে। ভাবতীয চিন্তায সংশ্লেষেব ঝোঁক ববাববেব, তাই সে ঝোঁক যেমন বুদ্ধদেবকে জড়িযে নেযা দশাবতাব স্তোত্রেব বচযিতা কাটিযে উঠতে পাবেন না, তেমনি কাটিযে উঠতে পাবি না আমবা। বা ববীন্দ্রনাথ। বা এমন-কি বুদ্ধদেব বসুও। "যে ধ্রুবপদ দিযেছ বাঁধি বিশ্বতানে, মিলাব তায জীবন গানে"—এমন একটা কথা একান্তে জপতে জপতে ও প্রকাশ্যে ভনতে ভনতে কখনো কখনো নিজেব কাছে আব প্রায সর্বদাই বাইবে এমন একটা ধাবণা ববীন্দ্রনাথ প্রায প্রতিষ্ঠা কবেই ফেলেছেন যে কী তাঁব কাব্য বা জীবন বা দুটো মিলিযে সমগ্রতা, সব সমযই বর্তুলাকাব অর্থাৎ বৃত্ত অর্থাৎ ঘুবে-ঘুবে ফিবে আসা। এবং সেই ফিবে-ফিবে আসাকে একটা সার্থকতাব তাৎপর্য দিতে চাই বলেই হযতো বলি সমে ফিবে আসা, উৎসে ফিবে আসা, ধ্রুবপদে ফিবে আসা। হেন গুজবে কান দিযে বুদ্ধদেব বসু সামান্য এই গাণিতিক তথ্যটাই ভুলে যান,

> "উনবিংশ শতাব্দীব সর্বোচ্চ শিখব থেকে বিংশ শতাব্দীব সর্বনিম্নতল পর্যন্ত ববীন্দ্রনাথেব জটিল দুর্গম যাত্রাপথ বিস্তৃত। সেই প্রথম স্বাদেশিকতা এক শতাব্দী পবে আমাদেব কাছে গল্প কথাব সামিল, আব সভ্যতাব সঙ্কট আব দ্বিতীয মহাযুদ্ধ উনবিংশ শতাব্দীব শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যৎ

দ্রষ্টাব কাছেও দুঃস্বপ্নেব অতীত। ববীন্দ্রনাথ এ-সব কিছুবই সাক্ষী।”
(সুবজিৎ দাশগুপ্ত)

এবং সাতপাঁচ না ভেবেই বলে ফেলেন

“জীবন ও কবিতা বিষয়ে ববীন্দ্রনাথ যৌবন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একই ধাবণা পোষণ কবে গেছেন আব তাঁব পক্ষে সেটাই হয়তো স্বাভাবিক বলা যেতে পাবে।” (বুদ্ধদেব বসু)

আসলে ভুলেই যাই যে বিশ্বতানেব ধ্রুবপদকে জীবনে গানে মেলানোটা একটা শখ বা ইচ্ছে মাত্র নয়। দ্বন্দ্বময় যন্ত্রণাব পদ্ধতিব ব্যাপাব। ববীন্দ্রনাথেব ক্ষেত্রে, আশি বৎসবেব বিস্তৃত জীবনে, সেই স্পর্শহাবা বাক্‌বোধী ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ গগনে একা একা স্বপ্নেব ভুবন সৃষ্টি কবাব প্রতিটি মুহূর্ত দিয়ে তৈবি আশিটি বৎসব নিবন্তব কুরুক্ষেত্র। দ্বন্দ্বসঙ্কুল এই জীবনক্রিয়া আমাদেব কলোনিয়াল চৈতন্যে আঁটে না বলেই তাঁব জীবন ও সাধনাব পবিধি নিয়ে সাত তাড়াতাড়ি এক বৃত্ত এঁকে সমাধান খুঁজে তৃপ্ত হয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে বলি—ববীন্দ্রনাথ বড বেশি সমাহিত, তৃপ্ত, সন্তুষ্ট। তেমন বেযাড়া আধুনিক সমালোচকেব ববীন্দ্রনাথকে খাবিজ-কবে-দেয়া-শ্লাঘা কি নিজেব গা চাটবে এমন কথা জানতে পেলে, যে আজ থেকে চল্লিশ বছবেবও আগে অর্থাৎ উনতিবিশি বিশ্বমন্দাবও আগে, এটাই ছিল ববীন্দ্রনাথেব বিরুদ্ধে সবচেযে বড অভিযোগ।

আব ববীন্দ্রনাথেব ব্যাপাবটাতেই চবম বামী আব দক্ষিণী পবম্পবেব বিপবীত দিকে হাঁটতে সুরু কবে, শেষে এসে মুখোমুখি ধাক্কা লাগাতে।

ভাবতীয় আধ্যাত্মিকতা, উপনিষদ, ভূমা, অসীম ও অরূপ দিয়ে পূজোব ছলে ববীন্দ্রনাথকেই ভুলে থাকাব গোঁড়ামি আব যুবোপীয় পাপবোধ, নবক-চেতনা, মৃত্যু, অস্তিবাদ ও নেতিব আঘাতে ববীন্দ্রনাথেব মূর্তি ভাঙাব কালাপাহাড়ি বিলাস আসলে এই মুখ্যপ্রতিজ্ঞা দুইযেব উপব নির্ভবশীল যে ভাবতীযতা = ভাববাদ আব আধুনিকতা = পাপবোধ ইত্যাদি। ন্যাযশাস্ত্রেব ইস্কুলি ছাত্রও জানে এমন সমানীকবণ অতিব্যাপ্তি ত্রুটিতে খাবিজ হযে যায়। আব তাই চল্লিশ বছব পবেও ভিন্নতব প্রতিজ্ঞাও এনে দাঁড কবিয়ে দেয় ঐ পচা সিদ্ধান্তে।

অথচ মেথডেব এই গোলমাল কোনো কোনো সময় অজ্ঞাতসাবেই পেছন থেকে ছুবি মেবে বসে। নইলে সুবজিৎ দাশগুপ্ত “বিশ্বভাবতী প্রতিষ্ঠাব সমকাল থেকেই তিনি যে অবিচ্ছিন্নভাবে ছবি আঁকাব চেষ্টা সুরু কবেন এটা

নেহাত আকস্মিক যোগাযোগ নয়”—এমন একটা আবিষ্কাব দিযে বানান কিনা বস্তাপচা এই সিদ্ধান্তেব সিঁডি

“প্রথম জীবনে মানসসুন্দবীব উদ্দেশে বলেছিলেন,

তোমাবেই কবিযাছি সংসাবেব ধ্রুবতাব।—
এ-সমুদ্রে আব কভু হব না ক'পথহাবা।

আব জীবনেব অন্তিম লগ্নে এসে শেষ কবিতাটিতে ছলনাময়ীব উদ্দেশে বললেন,

তোমাব জ্যোতিষ্ক তাবে যে-পথ দেখায ইত্যাদি। যাত্রা সুরুকালেব ‘ধ্রুবতাবা’ আব যাত্রা শেষ কালেব ‘জ্যোতিষ্ক’ বহন কবছে পূর্ণবৃত্তেব ইঙ্গিত”—

আবাব মৃত্যুব মাত্র সাতদিন আগে বচিত এই কবিতাটিব সাক্ষ্য নিযে “শেষ পর্বেব ববীন্দ্রনাথেবও স্থাযী এবং মৌলিক বিশ্বাস” কামুব অস্তিবাদী প্রকৃতি চেতনাব “অনুরূপ” ছিল আবু সযীদ আইয়ুব এমন উক্তি কবে বসে ব্যাখ্যা দেন—

“প্রকৃতি বিষযে পবপব দুই আপাত বিপবীত উক্তিতে (ছলনামযী ও পথপ্রদর্শক) সত্যিই কিন্তু কোনো বিবোধ নেই। প্রকৃতিব সৌন্দর্য মানুষকে মিথ্যাবিশ্বাসেব ফাঁদে ফেলে তখনই যখন তাতে মুগ্ধ হযে মানুষ ভাবে বিশ্বেব বিধানে সব কিছুই সুন্দব। সহজ মনোহাবিতা থেকে চোখ তুলে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীব দিকে যখন সে তাকায তখন ‘মিথ্যা বিশ্বাসেব ফাঁদ’ থেকে মুক্ত হয।”

‘তোমাব’ সঙ্গে ‘ধ্রুবতাবাব’, আব ‘ছলনাময়ীব’ সঙ্গে ‘জ্যোতিষ্কেব’ সম্বন্ধসূত্র কি, ‘ছলনাময়ী’কে কেনই বা প্রকৃতি বলে মেনে নিতে হবে, ছলনাময়ী কি কবে পথপ্রদর্শক হন যেখানে বলাই আছে পথ দেখাচ্ছে ‘তোমাব জ্যোতিষ্ক’ —এমন সব জরুবি কৌতূহল না মিটিযেই সিদ্ধান্তে আসা হয কাবণ এখনো আমাদেব কলোনিযাল চৈতন্যে কৃষ্ণ কেমন, যাব মন যেমনেব মতোই ববীন্দ্রনাথেব সমগ্রতা যাব যাব নিজেব মনে মাপা। শ্রীযুক্ত আইয়ুব তাঁব গ্রন্থশেষে কবিতা সমালোচনাব বীতি বিষযে যে প্রশ্ন উত্থাপন কবেছেন তাতে শব্দ অলঙ্কাব বাকপ্রতিমাকে অতিবিক্ত মূল্য না দিযে সমগ্রতাবিচাবেব কথা বলেছেন। সমগ্রতা বিচাবেব অর্থ কি আলোচ্য কবিতাটিব ছলনাময়ীব “সৃষ্টিব পথ” আব জ্যোতিষ্কেব পথেব পাবস্পবিক বৈপবীত্যটাও না দেখা। আব পবস্পবেব বিপবীতে স্পষ্টপ্রত্যক্ষ স্থাপিত এই ছলনাময়ীব সৃষ্টিব

আর জ্যোতিষ্কের পথ-কে সরল করে ছলনাময়ী=প্রকৃতি—এই সমীকরণের আশ্রয় নিতে হয় কারণ মুখ্যপ্রতিজ্ঞাতেই যে রবীন্দ্রনাথের জীবনবৃত্তের কথা রয়েছে। ফলে নগ্ন ভাবে উদ্ঘাটিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কাছে তাঁর এই দ্বন্দ্বদীর্ণ, মৃত্যুর সম্মুখেও দ্বন্দ্বদীর্ণ, চৈতন্যটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো না। সারা জীবন আত্মসচেতনতার লক্ষ্মণের গণ্ডি পেরিয়ে পেরিয়ে, আবেগের দ্বন্দ্বকে তত্ত্ব-বিশ্বে প্রতিষ্ঠা দিয়ে বাহিরের সঙ্গে নিজেকে মেলাবার এই আপোষহীন শিল্পী বালকবয়সে জানলার খড়খড়ি দিয়ে বাহিরের সঙ্গে আত্মতা স্থাপনের প্রয়াসে চৈতন্যের বোধিলাভের পথে যাত্রা সুরু করেছিলেন। বাহিরের সঙ্গে আত্মাকে মেলাবার কী দায়ই না তিনি ঘাড়ে নিয়েছিলেন যে সোনার তরী-চিত্রা-কল্পনা-ক্ষণিকার সাফল্যের পর, নষ্টনীড় আর চোখের বালির পর, নৈবেদ্য আর নৌকাডুবির অকৃতার্থতার সাধনা করেন। এমন যাঁর এলিয়ট কথিত ব্যক্তি-ভেদী স্ফুরণ তিনি কি না সুখদুঃখের ঢেউ খেলানো এই রূপ-সাগর তীর থেকে চিরপ্রস্থানের পূর্বমুহূর্তে বলে ফেললেন যে সৃষ্টি আর রূপের বিশ্বে শুধু ছলনা আর মিথ্যাবিশ্বাসের ফাঁদ আর প্রবঞ্চনা। বাঁচার পথ কি না অন্তরের পথ, চিরস্বচ্ছ। নিজের সঙ্গে পৃথিবীর, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যে-ব্যবধান ঘোচাতে শতকের তিন পাদব্যাপী আয়ুকাল ব্যয়িত, সেই ব্যবধানকে স্বীকার করে, নগ্ন ভাবে স্বীকার করেই, দ্ব্যর্থহীনতায় স্বীকার করেই চরম প্রয়াণ। খেয়াতরী হারা এ পারের ভালোবাসার আর রইল-টা কি?

ব্যক্তির সঙ্গে তার সময়ের দ্বন্দ্ব থেকেই,—শ্রীযুক্ত আইয়ুব ঘোষণা করেছেন চিন্তার ডায়ালেকটিক্সে তিনি বিশ্বাসী, ডায়ালেকটিক্স্ বস্তুটি 'ঠিক ভেঙে-ভেঙে ব্যবহার করা যায় না, হয় গোটাটাকেই স্বীকার করতে হয়, নতুবা গোটাটাকেই প্রত্যাখ্যান—যদি একজন শিল্পীর মনোভঙ্গি তৈরী হয়ে ওঠে তাহলে সেই দ্বন্দ্বের সন্ধানই সেই মেথড যা যুক্তির টানে নানা তুলনা, প্রতিতুলনা, প্রভাব ও স্বাধীনতার প্রসঙ্গ টানতে পারে। শ্রীযুক্ত আইয়ুব তাই তাঁর গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটিতে, নানা আলোচনায় আমাদের মতো পাশ্চাত্যসাহিত্য বা বিশ্ব সাহিত্যের অনভিজ্ঞ পাঠককে ঋণী করে রাখলেও রোম্যান্টিকতা ও অমঙ্গলবোধ, অমঙ্গলবোধ ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিতা—এই বিষয়গুলির সম্পর্ক-কে ঠিক নৈয়ায়িক শৃঙ্খলায় উপস্থিত করেন না। ফলে আমাদের মতো পাঠকের মন তারিখ নির্ভর ইতিহাস বোধের ওপরও একটা চাপ পড়ে। যেমন তিনি বলেছেন –

' ববীন্দ্রনাথকে বোম্যাণ্টিক কবি বলতেই হয, বোম্যাণ্টিকতাব পবাকাষ্ঠা বললেও ভুল হয না। অথচ ইংবেজি সাহিত্যে প্রথম মহাযুদ্ধেব পব 'বোম্যাণ্টিকতা' খুব দ্রুত গতিতে অশ্রদ্ধেয হযে পড়ে এই শতাব্দীব তৃতীয দশকেব মধ্যভাগে যে-মেজাজ ও রুচি ইংবেজি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ল (ফ্রান্সে আবো আগে হযেছিল)তাব কাছে ববীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ অত্যন্ত ছোট হযে গেলেন

এই নবমূল্যাযণেব ধাক্কা বাংলা দেশে এসে পৌঁছেছে দ্বিতীয মহাযুদ্ধেব পব কল্লোল ও পবিচয যুগেব কবিবা শিক্ষা পেযেছিলেন ঐ কবিগুরুব পাঠশালাতেই, তাঁদেব চোখ, কান, কণ্ঠ ও মন তৈবি হযেছিল তাবই সুবেব ঝবণাতলায।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীব দ্বিতীযার্ধে যাঁদেব কবিজন্ম ঠিক ববীন্দ্র বিদ্রোহী তাঁদেব বলা যায না, কাবণ তাঁবা আদৌ ঐ কাব্যসাম্রাজ্যেব বাজানুগত নাগবিক ছিলেন না। সাহিত্যেব অন্য জগতে তাঁবা ভূমিষ্ঠ হযেছেন, অন্য ভাবধাবায পুষ্ট, যে কাব্যানুশীলনে তৈবি হযেছে বা হচ্ছে তাঁদেব **রুচি ও রচনাশৈলী** তা ববীন্দ্র কাব্যেব অনুশীলন নয। বোদলেযব, ব্যাঁবো, মালার্মে, জ্যঁ জেনে, অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ কাব্যেব **এই** জগৎ ববীন্দ্রনাথেব জগৎ থেকে বহুদূবে অবস্থিত।" (দবকাব মতো হবফগুলি আমি মোটা কবেছি)

—এবপব তিনি বোদলেযব, মালার্মো ও ভেবলেনেব কাব্যজগৎ নিযে যে স্বাদু আলোচনা কবেছেন তা ওপবেব উদ্ধৃতিনিবপেক্ষ ভাবে আমাকে আধুনিকতা বিষযে শিক্ষাদান কবেছে। কিন্তু তাব সঙ্গে এই অংশকে মেলাতে পাবছি না। আমাব অসুবিধা হচ্ছে—

১। শ্রীযুক্ত আইয়ুব কাদেব কথা বলছেন যাঁবা ববীন্দ্রনাথ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জগতে ভূমিষ্ঠ হযে বাংলা ভাষায কবিতা লিখছেন। তাঁদেব 'আধুনিকতা'-ই শ্রীযুক্ত আইয়ুবেব বিবেচ্য।

২। বাংলা কাব্যেব ইতিহাস তাহলে কি আমাকে এই ভুল শিক্ষাই দিযে এসেছে যে এই শতকেব দ্বিতীয, তৃতীয ও চতুর্থ দশকেব একেবাবে গোড়াব বছবগুলিতে ববীন্দ্রনাথকে মানবো না বলে বাংলা কবিতায যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয ও তৃতীয তবঙ্গ ওঠে ও শেষতম তবঙ্গটি-ই যাব শীর্ষে ছিলেন—সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে—ববীন্দ্র বিবোধিতায উন্নততম।

৩। দেশি কুসংস্কাবে ইতিহাসকে পছন্দ মতো বানানোব প্রযাসে যদি এতোদিন ভুল শিক্ষাই পেযে থাকি—কাব্য পাঠেব অভিজ্ঞতাও তো শ্রীযুক্ত আইয়ুবেব কথায সায দেয না। তিনি রুচি ও বচনাশৈলী-ব কথা বলেছেন।

সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে-ই তো বাংলা কবিতায় সবচেয়ে বেশি অরাবীন্দ্রিক উপাদানের দ্বারা নির্মিত শৈলী এনেছেন। এবং সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শৈলী সেই স্বাতন্ত্র্যেরই আর এক নিশানা। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর তো দেখছি রাবীন্দ্রিক শৈলী ফিরে এসেছে। চরণকে ছন্দের দিক থেকে পূর্ণ বৃত্ত করা, বাক্ প্রতিমাকে সাজানো-গোছানো, বাক্যবন্ধে কোনো জটিলতা না আনা, ক্রিয়াপদের উদার ব্যবহার প্রভৃতি। আমি কিন্তু কখনোই বলছি না এগুলোই দ্বিতীয় যুদ্ধের পরবর্তী কবিতার একমাত্র শৈলী। বলতে চাইছি এগুলোও দ্বিতীয় যুদ্ধের পরবর্তী কবিতার শৈলীর উপাদান। তাঁর কাছে বাংলা সাহিত্যের এই আধুনিক কবি কারা তা স্পষ্ট করে না বলায় আমার বোঝার পক্ষে অসুবিধে হচ্ছে। পাছে আমিও অস্পষ্ট থেকে যাই, তাই শ্রীযুক্ত আইয়ুবকে নিবেদন, "রবীন্দ্রকাব্যের অনুশীলন নয়" বলে যাঁদের রুচি ও রচনা শৈলীকে তাঁর মনে হয়েছে, "বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যাঁদের কবিজন্ম" সেই কবিদের রচনায় কি তিনি কখনো কখনো খেয়া-গীতাঞ্জলি, এমন কি কল্পনার ছন্দ আর বাক্য নির্মাণের ধ্বনি শুনতে পান না? আমি যে শুনতে পাই তার নজির রেখে দেয়া নিরাপদ—

১। তখনো ছিল অন্ধকার　　তখনো ছিল বেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার　　চলিতেছিল খেলা
ডুবিয়া ছিলো নদীর ধার　　আকাশে আধোলীন
সুষমাময়ী চন্দ্রমার　　নয়নে মায়াহীন

২। পা ছুঁয়ে যে প্রনাম কবি সে কি কেবল দিনযাপনের নিশান?
আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম
নির্জীব পা সরিয়ে নাও কিনা—।

মাত্র দুটো নজিরেই নিশ্চয়ই এ-প্রমাণ চলে না যে এঁরা কতো বেশি রাবীন্দ্রিক কিন্তু এটুকু নিশ্চয়ই বলা চলে এঁরা কেবলই অরাবীন্দ্রিক নন।

তাই "বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যাঁদের কবিজন্ম" তাঁদের সম্পর্কে শ্রীযুক্ত আইয়ুবের অনুমানগুলির নাগাল অভিজ্ঞতায় পাই না বলেই মেথডলজির প্রসঙ্গ এতোবার আসে। তাহলে অন্তত সিঁড়ি ধরে ধরে এগনো যায়। নইলে একথা মানতে কেমন সঙ্কোচ হয়, শ্রীযুক্ত আইয়ুবের কথা হওয়া সত্ত্বেও, যে রোম্যান্টিকতা-বিরোধী কাব্যবোধের ধাক্কায় রবীন্দ্রনাথ ছোট হয়ে গেলেন। ছোট আর বড় তো আপেক্ষিক। মানদণ্ডটা কি। রবীন্দ্রনাথ আলাদা হয়ে গেলেন, বিচ্ছিন্নও

হয়তো। তাতে রবীন্দ্রনাথের ও আধুনিকতার এলো গেলোটা কি ?

কারণ আধুনিকতার কোনো সংজ্ঞা শ্রীযুক্ত আইয়ুব দেন নি। বোদলেয়র থেকে গিন্‌স্‌বার্গ কোন্ সূত্রে তাঁর কাছে আধুনিকতার তাৎপর্যে একত্রিত তা তিনি জানান নি।

আধুনিকতার সংজ্ঞাহীন লক্ষণ তাই ক্যাটিগরিহীন অমঙ্গলবোধকেই আশ্রয় করে। তাই শ্রীযুক্ত আইয়ুবের মতো দিকপাল উকিল জুটলেও, অমঙ্গলবোধেরও কবি রবীন্দ্রনাথ, এই সিদ্ধান্তটা তেমন জুতসই দাঁড়ায় না। যা মঙ্গলবোধ, ঈশ্বরবোধে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হয়েই পান নি, দুঃখবিষাদের মধ্যে দিয়েই পেয়েছিলেন—এই অ্যালিবি। তার একমাত্র কারণ

১। "কড়ি ও কোমলে দুটি বিপরীত ঠাটের রাগিনী একই সঙ্গে বেজে উঠেছে—জীবনের জয়গান এবং 'মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি' "

২। "প্রেমিক তার মানুষী প্রিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গভীর ব্যথা ও অসম্ভব আশা বুকে ধারণ ক'রে বেরিয়ে পড়ছে তার মানসীর সন্ধানে"।

৩। "আমরা ঈশ্বরের আরও এক ধাপ কাছে পৌছই যখন রবীন্দ্রনাথ জীবন দেবতার সংজ্ঞাকে প্রশস্ততর করে বলেন, কবির অন্তরালে যিনি কবি"

৪। ("পরিব্যাপ্ত নৈরাশ্য ও বিষাদের ঘনায়মান অন্ধকার থেকে") "নিষ্ক্রমনের দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ খুঁজে পেলেন রবীন্দ্রনাথ, একটি পথ ক্ষণিকা, অন্যপথে কালিদাসের কাল পেরিয়ে বৈদিক ভারতবর্ষে "

৫। "গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি—স্পষ্টতই ঈশ্বর প্রেমের কবিতা বা গান"

যথাক্রমে "কড়ি ও কোমল" "মানসী" "চিত্রা" "ক্ষণিকা-নৈবেদ্য" "গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য-গীতালি"—এই কাব্যগুলি সম্পর্কে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে শ্রীআয়ুব এসেছেন, পুথিগত ব্যাখ্যার পথ দিয়ে। "রবিরশ্মি" থেকে সুরু করে "রবীন্দ্রপ্রতিভার ধারা" (শ্রীক্ষুদিরাম দাশ) পর্যন্ত তো এই পুথিগত ব্যাখ্যাই বিশ্ববিদ্যালয়ি রবীন্দ্র চর্চা। কিন্তু শ্রীযুক্ত আইয়ুব একবারো ব্যাখ্যা করলেন না এই দুঃখ-বিষাদ, ঈশ্বর-সন্ধান আর মানবী থেকে মানসীতে যাওয়া রবীন্দ্রনাথে এলো কোত্থেকে। এর সঙ্গে বিহারীলালের বিষাদ আর মধুসূদনের ট্রাজিডি চেতনা আর নবীনচন্দ্রের ঈশ্বরভক্তির ফারাক কোথায়। কাব্য বিচারে অধুনা স্বীকৃত এলিয়টি সূত্র—কবি স্থাপিত হন তাঁর অতীতে ও ভবিষ্যতের সঙ্গে অন্বয়ে—শ্রীযুক্ত আইয়ুবের হাতেও যদি প্রযোগে দীপ্তি না পায়।

ববীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দুঃখ, বিষাদ, মঙ্গল, ভূমা, অরূপ, ঈশ্বব এ-শব্দগুলিব কোনো লক্ষণার্থ নেই। আব শ্রীযুক্ত আইয়ুবেব সিদ্ধান্তগুলি অববোহনে একেকটি মুখ্যপ্রতিজ্ঞা যদিচ সে প্রতিজ্ঞাগুলি আবোহী ন্যাযে প্রতিষ্ঠিত নয। মুখ্যপ্রতিজ্ঞাব সঙ্গে সিদ্ধান্তেব হবিহব-আত্মতা ঘটানোব দায এমনই প্রাণান্তিক যে শ্রীযুক্ত আইয়ুবেব মতো বসগ্রাহীকেও এইমতো করুণ ব্যাখ্যা লিখতে হয:

"আব-এক প্রকাব দুঃখেব কথা গীতাঞ্জলিতে বাবে বাবে বলা হযেছে। তাঁকে না পাওযাব দুঃখ। যে বিবহ মিলনেবই সম্ভাবনায মদিব, তা মিলনেবই পূর্বাস্বাদন, তিক্ত হলেও সুস্বাদু।

তুমি যদি না দেখা দাও
কবো আমায হেলা
কেমন কবে কাটে আমাব
এমন বাদল বেলা

এ অনুযোগ ব্যর্থ হবাব নয, ব্যর্থ হবে এমন আশঙ্কা নেই অনুযোগকাবিণীব মনে। যদি থাকত এই আবদাবেব সুব তাতে বেমানান হ'ত।

দূবেব পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেযে থাকি
পবাণ আমাব কেঁদে বেডায
দুবন্ত বাতাসে।

'দুবন্ত' শব্দটা লক্ষণীয। যে বাতাসেব সঙ্গে পবাণ কেঁদে বেডায তাকে ছোট ছেলেব মতো আদব ক'বে বলা হচ্ছে দুবন্ত'।" তিনি কি "দুষ্টু" সাজেস্ট কবেছেন? তা হলে-ই শ্রীযুক্ত আইয়ুবেব অভিপ্রেত ব্যাখ্যা জুতসই হতো না কি? অঝোব জলধাবাব দুর্গে বন্দিনীব বিবহ সামান্যতম অলঙ্কাব খুঁজে পায না এমন নিঃসীম নিঃসঙ্গ, কল্পনায অলঙ্কৃত অস্তিত্বেব সঙ্গসুখও যেখানে সকল সম্ভাবনাব বাইবে, তাই জিভেব ডগায শব্দ আসে—দুবন্ত।

কিন্তু আবোহী যুক্তিশৃঙ্খলাব হদিশ শ্রীযুক্ত আইয়ুবেব জানা না থাকলে আব কাব জানা থাকবে। "মানসী"-ব অতৃপ্তি ও বিষাদেব মূলেব খোঁজ কবতে গিযে প্রমথ চৌধুবীব কোনো একটি প্রশ্নেব জবাবে ববীন্দ্রনাথেব এই উত্তবটাব উদ্ধৃতি তিনি দিযেছেন

"একএকবাব আমাব মনে হয আমাব মধ্যে দুটো বিপবীত শক্তিব দ্বন্দ্ব চলছে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পবিসমাপ্তিব দিকে টানছে,

আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। আমার ভারত-বর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপীয় চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। সব সুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাসীন্য।"

কিন্তু এই দ্বন্দ্বকে "মানসীর প্রেমের কবিতাগুলির নৈরাশ্য ও বিষাদের মূল কারণ" বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে সেই কারণের মূল নির্দেশ করেছেন "আত্মার রহস্য শিখা" ও "এক পরিপূর্ণ সৌন্দর্য" সন্ধানে। অর্থাৎ তাঁর অবরোহী যুক্তি শৃঙ্খলার মুখ্য প্রতিজ্ঞাটিকে প্রতিষ্ঠিত করে যে আরোহী যুক্তি শৃঙ্খলা তাকে হাতে পেয়ে খ্যাপার মতই ছুঁড়ে ফেলে আবার তিনি তা-ই অনুসন্ধান করতে কোমর বাঁধেন।

বিষ্ণু দের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার দায় ইতিমধ্যেই যথেষ্ট হলেও তা বিশেষত এই কারণেই নতুন তাৎপর্য পেয়েছে যে তাঁর "রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প-সাহিত্যে আধুনিকতা" নামক প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রচর্চার পক্ষে এই নিতান্ত প্রয়োজন একটি মেথডের প্রস্তাবনা করেছেন। বলে রাখা ভালো যে এই প্রবন্ধটির গ্রন্থরূপ আমার হাতে আসার সুযোগ হয় নি বলে ৭২ বঙ্গাব্দের শারদীয় সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত রূপটিই একমাত্র সম্বল। আমি যেমন বুঝতে পেরেছি তাতে বিষ্ণু দের সংগঠনটি এইরূপ:

১। "রবীন্দ্রনাথের **তত্ত্ববিশ্ব ও শিল্পসাহিত্য কর্মে** যেমন বড় রকমের একটা মিল, তেমনি একটা অনিবার্য বিরোধও উহ্য, যদিও থেকে-থেকে কম বা বেশি দেখা যায় তাঁর কবিত্বে এবং প্রায়শই তাঁর চিত্র প্রেরণায় আর প্রবীন বয়সের স্বাধীন বা স্বাভিভাবক বহু গানে ও গীতিনাট্যে তত্ত্ব যায় হেরে। কিন্তু বড় কথা হচ্ছে এই তত্ত্ব-সংগঠন না করলে রবীন্দ্র কীর্তি থাকত অনেকাংশে মূক, অপ্রকাশিত।"

২। "মনোবিজ্ঞানে যে-তিনটি ক্রান্তি বা সংকট পর্ব এই স্বীয় সত্তাবোধের আদি সংকটের পরবর্তী বলা যায়: নৈঃসঙ্গ ও অন্তরঙ্গতার দ্বৈতাদ্বৈত সমস্যা, সৃজনশীলতার সংকট এবং স্বভাব কৈবল্যের সমস্যা—এই তিনটি মূলপর্বেই রবীন্দ্রনাথের বারংবার পরীক্ষোত্তরণ বোধহয় পৃথিবীর ব্যক্তি-ইতিহাসে এক দুর্লভ ব্যাপার"

৩। "ঐ দ্বন্দ্বময়তাকে তিনি কয়েকটি পুরুষার্থ বা মূল্যবোধের আবেগে বেঁধে-ছিলেন "

অর্থাৎ বিষ্ণু দে প্রথমেই তাঁব সংগঠনটিকে এমনভাবে দাঁড কবান যে উপস্থাপিত পববর্তী ব্যাখ্যা ও তথ্যেব সঙ্গে এই সংগঠনকে মিলিয়ে নেবাব অবকাশ জোটে যাতে কবে তিনি আপ্তবাক্য উচ্চাবণেব অপবাদ থেকে স্বচ্ছন্দেই মুক্তি পান। আধুনিকতাব সংজ্ঞা থেকে সুরু কবে ববীন্দ্রনাথে দ্বন্দ্বময়তাব সংকট ও উত্তবণেব সাক্ষ্যপ্রমাণসহ ব্যাখ্যা আব "প্লেইআদ্ থেকে পাবনাসীয় কবিতাব ঐতিহ্য" যাঁদেব মনেব মাটিতে তাঁদেব ববীন্দ্র সংক্রান্ত সংশয়-অভিযোগেব জবাব আব আধুনিক বিশ্বেব আধুনিক শিল্পীসাহিত্যিকদেব সঙ্গে ববীন্দ্রনাথেব মন ও মননেব পার্থক্য ও সম্পর্কেব প্রসঙ্গে মূলবচনা-ববীন্দ্রকৃত অনুবাদ-স্বকৃত অনুবাদ পাশাপাশি এনে তাব উপবে বিষ্ণু দে এমনভাবে সংগঠনটিকে দাঁড কবান তাতে আমাব মতো অন্য কোনো পাঠকও যাতে দিকদিশা হাবিয়ে না ফেলেন সেই কাবণে আমি প্রবন্ধটিব অখণ্ডতা তিনভাগে ভাঙছি—প্রথম ভাগ—ভূমিকা ঃ আধুনিকতাব সংজ্ঞা ও ববীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় ভাগ—ববীন্দ্রনাথে এই সংজ্ঞাব প্রযোগ ও পবীক্ষা। তৃতীয় ভাগ—অন্যান্য আধুনিক শিল্পীব মন ও মননেব সঙ্গে ববীন্দ্রনাথেব পার্থক্য।

প্রথম ভাগটিই সবচেযে জকবি। "সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে সংকট যন্ত্রণা ও উত্তবণেব পর্বপবম্পবা ব্যক্তি বিশেষেব সীমাযিত সমস্যামাত্র, সেখানেও ব্যক্তিসত্তাব সার্থকতা, স্বাস্থ্য ও উৎকর্ষ নির্ভব কবে কীভাবে ঐ সংকট পর্বগুলি মানুষটি ব্যক্তিব অহংসর্বস্বতায নয, ববঞ্চ অন্য সংলগ্নতায অর্থাৎ ব্যক্তি, সমাজ ও ইতিহাসেব অর্থে অতিক্রম কবে। এবং এই সংকট ও উত্তবণ পর্ব পবম্পবাব পুরুষার্থ সুষ্ঠু হয, যখন মানুষটিব সত্তাসমস্যা নিছক ব্যক্তিকভাবে অস্বাস্থ্য ও স্বস্তিলাভ, বন্ধন ও উন্মোচনেব ব্যাপাব থেকে যায না, যখন আধিব্যাধি উপচিযে লোকটিব চবিত্র হযে ওঠে রূপকেব মতো ব্যাপ্ত অর্থাৎ সামাজিক, ঐতিহাসিক অর্থেই অর্থবহ, মূল্যবান্।" এই নিবিখে তিনি এবিক এবিকসন কথিত লুথাব কাহিনীব প্রসঙ্গই আনেন তাই নয, পববর্তীকালে পিকাসো বা বাকেব ছবিব আব আমাদেব বিদ্যাসাগবেব কথা এনে নিজেব নিবিখকে ব্যক্তিগত নিবিখ না বেখে ঐতিহাসিক নিবিখে রূপান্তবিত কবেন।

ফলে দ্বিতীয ভাগে প্রবেশ মুখেই বিষ্ণু দে জীবনস্মৃতি থেকে যে দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি দেন তা মূলত 'মানসীব' নৈবাশ্য ও বিষাদ প্রসঙ্গে আবু সবীদ আইয়ুব কর্তৃক উদ্ধৃত পত্রাংশেব সঙ্গেই যুক্ত।

"আমাদেব সমাজ, আমাদেব ছোট ছোট কর্মক্ষেত্র এমন সকল নিতান্ত

একঘেযে বেড়াব মধ্যে ঘেবা যে যেখানে হৃদযেব ঝাড়ঝাপট প্রবেশ কবিতেই পাবে না, সমস্তই যতদূব সম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপচাপ ; এই জন্যই ইংবাজি সাহিত্যে হৃদযাবেগেব এই বেগ এবং রুদ্রতা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণেব আঘাত দিযাছিল যাহা আমাদেব হৃদয **স্বভাবতই** প্রার্থনা কবে। (মোটা হবফ আমাব)

এই কথাগুলি, ববীন্দ্রনাথ "জীবনস্মৃতিতে" যদিও ভগ্নহৃদযেব প্রসঙ্গ ধবেই এনেছেন তবু তাঁব "পনেবো-ষোলো বছব হইতে বাইশ-তেইশ বছব পর্যন্ত" অর্থাৎ মানসী বচনাকাল পর্যন্ত সময সম্পর্কেই, প্রযোজ্য। শ্রীযুক্ত আইয়ুবেব অসুবিধা হযেছে শৃঙ্খলাব দিক থেকে বোধ হয এইখানে যে ভাবতীযতা আব যুবোপীযতাব এই দ্বন্দ্ব কি কবে কবিতাব নৈবাশ্য আব বিষাদে পবিণতি পায। "স্বভাবতই" শব্দটাকে সেই কাবণে আমি ওপবেব উদ্ধৃতিতে মোটাদাগে বুলিযেছি। যুবোপীয জীবন যে তখন আমাদেব স্বভাবেব মধ্যে প্রবেশ কবেছে আব স্বভাবেব এই দ্বন্দ্বময়তায বাঙলাদেশেব উনিশ শতক একবাব বামমোহনেব বিশুদ্ধ "জ্ঞানোজ্জ্বলিত হৃদযে", একবাব বিদ্যাসাগবেব ব্যাশন্যাল কর্মজীবনে, একবাব বঙ্কিমেব সঙ্কীর্ণ সম্প্রদাযিকতাব আধাবে স্থাপিত মহৎ বোম্যান্টিকতায আব একবাব দক্ষিণেশ্বেব পঞ্চবটীবনে পাগলেব মতো মাথা কুটেছে।

জাতিব স্বভাবেব এই দ্বন্দ্ব দেখতে পান নি বলেই শ্রীযুক্ত আইয়ুব তাঁব গ্রন্থে গীতাঞ্জলি বা ববীন্দ্রনাথেব ভক্তি-বসেব কবিতা বা গান আমাদেব প্রাণিত কবে কেন এই নান্দনিক প্রশ্নেব উত্থাপনা কবেছেন। অথচ আজ থেকে কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসব আগে, আজ থেকে কিঞ্চিদধিক আশি বৎসব আগেব তাঁব কাব্য জীবনেব অভিজ্ঞতাব ববীন্দ্রনাথকৃত ব্যাখ্যাতেই শ্রীযুক্ত আইয়ুবেব এই সংশযেব হদিশ মেলে

> "তখনকাব কালেব ইংবেজি সাহিত্য শিক্ষাব তীব্র উত্তেজনাকে যিনি আমাদেব কাছে মূর্তিমান কবিযা তুলিযাছিলেন তিনি হৃদযেবই উপাসক ছিলেন। সত্যকে যে সমগ্রভাবে উপলব্ধি কবিতে হইবে তাহা নহে,তাহাকে হৃদয দিযা অনুভব কবিলেই যেন তাহাব সার্থকতা হইল, এইরূপ তাহাব মনেব ভাব ছিল। জ্ঞানেব দিক দিযা ধর্মে তাঁহাব কোন আস্থাই ছিল না, অথচ শ্যামাবিষযক গান কবিতে তাঁহাব দুই চক্ষু দিযা জল পড়িত। এস্থলে কোনো সত্যবস্তু তাঁহাব পক্ষে আবশ্যক ছিল না, যে-কোনো কল্পনায হৃদযাবেগকে উত্তেজিত কবিতে পাবে তাহাকেই তিনি সত্যেব মতো ব্যবহাব কবিতে চাহিতেন।"

ইংরেজের দেওয়া চৈতন্যের আকৃতি নিয়ে ভারতীয় সত্যকে আমরা ত্যাগ করলাম নাকি সে আমাদের নাগালের বাইরেই চলে গেল, রয়ে গেল আর পরদেশিদের দানের চৈতন্যে মিটলো না স্বভাবের দাবি। তাই সত্য পাই কি না পাই, "সত্যের মতো" কোনো কিছু পেলেও আমরা অভিভূত। আর আমাদের খর্বিত জাতীয় চেতনায় গীতাঞ্জলির মতো সত্য অনুভূতি আর কোথায় পাব? আমি আস্তিক কি নাস্তিক ওসব কথার ধারও না-ধেরে সেই সত্যই আমাকে পর্যুদস্ত করে।

যাহোক, জাতীয় আত্মজিজ্ঞাসার ঊনিশশতকি এই সংকটই তো রবীন্দ্রনাথের চিত্তসংকটের আধার। এই সংকট থেকে কিশোর রবীন্দ্রনাথ পরিত্রাণের জন্য লড়ছিলেন তার উদাহরণ হিসেবে ভারতীতে মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনাটির বক্তব্যের তাৎপর্যের ত্বরিত ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যার ইঙ্গিতমাত্র আমাদের মুগ্ধ করে। বিষ্ণু দে-র লেখা এই লাইনগুলি পড়বার আগে কোনোদিন মাথাতেও আসে নি 'গোরা'র সেই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব তখনই বীজাকারে দেখা দিয়েছিল ঐ রচনাতে। কিন্তু সংশয়ে পীড়িত হই যখন দেখি, আত্মসংকটের এই লড়াইয়ের সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে বিষ্ণু দে কবিকাহিনীর প্রসঙ্গ আনতে বলছেন " কিশোর কবির নৈঃসঙ্গ্যবোধ, বিষাদ, তাঁর আত্মসংকটের আর্তনাদ বিশিষ্ট চেহারা পেয়েছিল।" "এই বিশ্বৈকাত্মতা রবীন্দ্রনাথের মনে আজীবন ভর করেছিল আকাশ-বাতাসের মতো। এবং বিশ্ববোধ এ-ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে নিঃশেষ ছিল না, বালকের জানা ছিল যে 'মানুষের মন চায় মানুষেরই মন'।" রবীন্দ্রনাথের সত্তাসঙ্কটের সাক্ষ্য বিষ্ণু দে এই ভাবে যখন 'কবিকাহিনী'তেই আবিষ্কার করেন এবং রবীন্দ্রতত্ত্ববিশ্বের একটা অন্তত আভাস এই কাব্যটিতে মেলে বলে সিদ্ধান্ত করেন তখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে—'বনফুল'-ও নয় কেন। 'বনফুল' রচনার আগে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়ে গেছে। সেই কনিষ্ঠ পুত্রকে কি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুর আর হিমালয় মানে ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। তারও অনেক পরে তো "মানবসমাজের বিশ্ব করাঘাত করে চলে নলিনীর স্বপ্ন ভেঙে জোড়াসাঁকো, বোলপুর, বক্রোটার অলকাপুরীর গজদন্তরচিত দ্বারে"—বিষ্ণু দে। Ritualisation of his worklife তো তখনই সুরু হয়ে গিয়েছিল মহর্ষি পিতার এই জীবনাচরণের সহযাত্রায়— "ছোটো হইতে বড়ো পর্যন্ত পিতৃদেবের সমস্ত কল্পনা এবং কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল। তিনি মনের মধ্যে কোনো জিনিশ ঝাপসা রাখিতে পারিতেন না,

এবং তাঁহাব কাজেও যেমন তেমন কবিযা কিছু হইবাব জো ছিল না।" তেব বছব বযসেব কবিব 'বনফুল' কাব্য বচনাব পেছনেব ইতিহাসেব প্রস্তুতিব আবো সব সাক্ষ্য টেনে না এনেও বলা যায, আপাতদৃষ্টিতে প্রচলিত কাব্য-সংস্কাবেব অন্ধ অনুসবণ আব বিহাবীকবিব কাব্যবীতিব অন্ধ অনুকবণ চোখে পডলেও, কাব্যেব ভেতবে তো এমন নির্ভুল সাক্ষ্যও আছে, যাতে এ-কাব্যেব পেছনে কবিব ব্যক্তিঅভিজ্ঞতাব আব সেই অভিজ্ঞতাব আধাব সন্ধানেব সক্রিয লডাইটা বেশ ধবা পডে যায।

১। অনুকাবক তেব বছব বযসেব এই কবিব কাব্যটিব অনুরূপ, কোনো বিহাবীকবিব পক্ষেও লেখা সম্ভব ছিল না। বিহাবী কবিব অনুকবণে কবি চেষ্টা কবেছেন কাহিনীব মূলবিন্যাস ভুলে গিযে সুযোগমাত্র বোম্যান্টিক প্রসঙ্গান্তবে একেবাবে ডুবে যেতে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথেব পুত্রেব পক্ষে "মনেব মধ্যে কোনো জিনিশ ঝাপসা" বাখা সম্ভব ছিল না। সংস্কৃত ব্যাকবণেব চর্চা দিযে ঘেবা হিমালযেব অখণ্ড স্বাধীনতাব শিক্ষা তরুণ মহত্তেব ওপব ব্যর্থ হতে পাবে নি। তাই বিহাবীলালেব শ্রেষ্ঠ কাব্যেব সঙ্গে তুলনাতেও 'বনফুল'-এ পাওযা যাবে না উচ্ছ্বাসেব আত্মঘাতী উদ্বেলতা।

২। চকিতে এমন চবণেব সঙ্গেও তো বনফুলে দেখা হযে যায

লভেছি জনম কবিতে বোদন
বোদন কবিব জীবনভোব

যা কখনো কডি ও কোমলেব অনুষঙ্গ আনে। দ্বিতীয সর্গেব শেষে কমলাব আশ্রম ত্যাগেব বর্ণনাব শেষাংশে পববর্তী "যেতে নাহি দিব"ব একটা ক্ষীণতম কঙ্কালেব আভাস পেযে যাওযাটা যদি নেহাতই অমার্জনীয হযে পডে তাহলে—তৃতীয সর্গেব পববর্তী গানটিব তৃতীয স্তবক থেকে কিছুদূব, ছন্দে তো বটেই, এমনকি ভাবে-ভাষায-কল্পনায, অনেককাল পব বচিত সোনাব তবীব পুবস্কাব কবিতায বাণীবন্দনা অংশটিব প্রাথমিক খসডা মনে না হযেই পাবে না।

৩। কমলাব কল্পনাব পেছনে বঙ্কিম-পুষ্ট কিশোব কল্পনা কাজ কবেছে কি না সে হযতো অনুমানেব ব্যাপাব, কিন্তু প্রেম আব পাপেব দ্বন্দ্বেব সেই প্রাথমিক চেতনাব পেছনে নিশ্চযই দেবতুল্য বিহাবীলালেব আদর্শ সক্রিয ছিল না।

৪। তাই সেই হিমালয়বাসেব অভিজ্ঞতা তাব প্রত্যক্ষতা নিযেই আসে :

যবে শিখরের 'পর
উড়িয়া উড়িয়া বেড়াত দলে,
শিখরেতে উঠি বেড়াতাম ছুটি—
কাপড় চোপড় ভিজিত জলে।

৫। প্রমাণ করবার উকিলি দায় না নিয়েও এটুকু বলা যায় যে বনফুল-এর হিমালয় বর্ণনা আর কমলার মুখের পৌনঃপুনিক পিতৃস্মৃতি আর নির্বাসনের সুখস্বর্গ থেকে মানুষের সংসারে প্রবেশে এই ঘোষণা

হায় রে সেদিন ভুলাই ভালো!
সাধের স্বপন ভাঙ্গিয়া গেছে।
এখন মানুষে বেসেছি ভালো,
হৃদয় খুলিব মানুষ কাছে।

বারবার আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় 'জীবনস্মৃতি'র পিতৃদেব, হিমালযযাত্রা আর প্রত্যাবর্তন এই ধারাবাহিক অধ্যায় তিনটিতে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে মুণ্ডিতমস্তক যে-বালককে দেবেন্দ্রনাথ নিয়ে গিয়েছিলেন, সে-বালক আর কোনোদিন ফিরে আসে নি। হিমালয় থেকে রবীন্দ্রনাথ যে একা একা ফিরেছিলেন—দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ফেরেন নি—এই ঘটনার পেছনেও একটা তাৎপর্য খুঁজতে ইচ্ছা যায়।

"বাড়িতে যখন আসিলাম তখন কেবল যে প্রবাস হইতে ফিরিলাম তাহা নহে—এতকাল বাড়িতে থাকিয়াই যে নির্বাসনে ছিলাম সেই নির্বাসন হইতে বাড়ির ভিতরে আসিয়া পৌঁছিলাম। . তখন আমাদের বাড়ির যিনি কনিষ্ঠ বধূ ছিলেন তাঁহার কাছ হইতে প্রচুর স্নেহ ও আদর পাইলাম।"

৬। কিন্তু সেই তরুণ মহত্তের জন্য নিষ্ঠুরতর নির্বাসন অপেক্ষা করে ছিল। "ইহার পর ইস্কুলে যাওয়া আমার পক্ষে পূর্বের চেয়েও অনেক কঠিন হইয়া উঠিল। দাদারা আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন। আমি বেশ বুঝিতাম ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে।"—আর ভদ্রসমাজের বাজার থেকে নির্বাসিত মহৎ তরুণ তাঁর তরুণ মহত্ত্ব নিয়ে "সেই অল্প পরিচিত কল্পনাজড়িত অন্তঃপুরে একদিন বহুদিনের প্রত্যাশিত আদর পাইলাম। যাহা প্রতিদিন পরিমিতরূপে পাইতে পাইতে সহজ হইয়া যাইত তাহাই হঠাৎ একদিনে বাকিবকেয়া সমেত পাইয়া যে বেশ ভালো করিয়া তাহা বহন করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না।"

বনফুল-এ কমলাব নির্বাসন বেদনা, বাববাব হিমালযে পিতৃগৃহেব স্মৃতি চাবণা, প্রথম থেকেই কথনো কথনো মৃত্যুব সঙ্গে আত্মীযতা আব মানবজীবনে প্রবেশে যাব সঙ্গে হৃদযেব বন্ধনবোধ, বিশ্বাসঘাতক বন্ধুব হাতে তাব মৃত্যু—সেই বিশ্বাসঘাতকতাই আবাব কমলাব স্বামী এবং শেষে বাল্যভূমিতে ফিবেও কমলা কোনো অন্বয খুঁজে পায না এককালেব সেই সম্পূর্ণ অন্বিত জীবনেও। পিতৃত্বেব আশ্রয থেকে চ্যুত, বাল্যেব আশ্রয থেকে চ্যুত, সংসাবেব আশ্রয থেকে চ্যুত কমলা-ব একমাত্র আশ্রয মৃত্যু। আব নিববলম্ব এই কমলাব বর্ণনায তেব বছবেব তাৰুণ্যে মহত্ত্ব ভব কবে—আবেগ থেকে নিজেকে মুক্ত কবাব তাড়ায—

অনন্ত আকাশ মাঝে একেলা কমলা।
অনন্ত তুষাবমাঝে একেলা কমলা।
সমুচ্চ শিখব পবে একেলা কমলা।
আকাশে শিখব উঠে
চবণে পৃথিবী লুটে
একেলা শিখব-প'বে বালিকা কমলা।

ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব কাব্যবচনা স্থরু কবেছিলেন মৃত্যু, পাপ, বিশ্বাসঘাতকতা, হত্যা আব আত্মহত্যাব একটি কাহিনী লিখে। শুনতেই কেমন অবিশ্বাস্য। অথচ প্রমাণিত সত্য।

এতোক্ষণে বোধহয এমন একটা ভুল ধাবণা সৃষ্টিব স্থযোগ দিযেছি যে ববীন্দ্রনাথেব কবিজীবনে তাঁব সত্তাসঙ্কট আব তত্ত্ববিশ্ববচনাব ডাযালেকটিসে বিষ্ণু দে 'কবিকাহিনী'কে যে স্থান দিতে চেযেছেন আমি 'বনফুলে'ব জন্য সেই জাযগাটি চাইছি। না। তত্ত্ববিশ্বেব কোনো সাংগঠনিক উপাদান 'বনফুল'-এ নেই। আবাব সত্তাসঙ্কটেব এতো উলঙ্গ প্রকাশ, বাল্য আব কৈশোবেব অভিজ্ঞতাব এমন বিন্যাস—কবিকাহিনীতে নেই। তাই বনফুল আব কবি-কাহিনী-ব মিলিত বিশ্লেষণে সেই তৰুণ মহতেব জীবনেব তাত্ত্বিক গঠনবিন্যাসটি ধবা পড়ে।

ববীন্দ্রতত্ত্ববিশ্বেব ভূগর্ভেব এই আলোড়নে যা কিছু শব্দে ছন্দে বাইবে বেড়িযে এসেছে তাব বাসাযনিক বিশ্লেষণেই, বিষ্ণু দে নির্দেশ কবেছেন, ববীন্দ্র-নাথেব হৃদয-মন-মনীষাব সংগঠন ধবা পড়বে। ইতিহাস আব মনোবিজ্ঞানেব পবিপূবকতায ব্যক্তিজীবনেব গূঢ়তায এই অন্বেষণ। এই অন্বেষণেব প্রাথমিক

চেষ্টাতে এমন আশ্চর্য ঘটনা ধরা পড়ে যে তের বছর বয়সের বাল্যরচনা "বনফুল"-এর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে পরবর্তী পরিণত রচনার যে বস্তুগত বা ভাবগত মিলই ঘটে গেছে তাই নয়, রবীন্দ্রজীবনীকার কর্তৃক অংশত উদ্ধৃত জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত তের বৎসর বয়সের "পদ্য প্রলাপে" —আট বৎসর পর রচিত কবির "সমস্ত কাব্যের ভূমিকা" নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের প্রাথমিক খসড়ার চিহ্ন।

আয় কল্পনা মিলিযা দুজনা
ভূধরে কাননে বেড়ার ছুটি।
সরসী হইতে তুলিযা কমল
লতিকা হইতে কুসুম লুটি।
দেখিব ঊষার পূরব গগনে,
মেঘের কোলেতে সোনার ছটা।
বলিব দুজনে—গাইব দুজনে,
হৃদয খুলিযা হৃদয ব্যথা,
তটিনী শুনিবে, ভূধর শুনিবে
জগৎ শুনিবে সে-সব কথা

বা অন্যতর একটি কবিতায

ঢাল ঢাল চাঁদ। আরো আরো ঢাল
সুনীল আকাশে রজতধারা।
হৃদয আজিকে উঠেছে মাতিয়া
পরাণ হযেছে পাগলপারা।
গাইব রে আজ হৃদয খুলিযা
জাগিযা উঠিবে নীরব রাতি।
দেখাব জগতে হৃদয খুলিয়া
পরাণ আজিকে উঠেছে মাতি।

তের-চোদ্দ বছর বযসের এই রচনাতে-ই কি তখনকার কাব্যভাষার বিরোধী, কাব্যধারণার প্রতিবাদী রবীন্দ্র-কাব্য-ভাষা আর ধারণা স্পষ্টতা চাইছে না? অন্যপ্রসঙ্গে বিষ্ণু দে জীবনস্মৃতির গ্রন্থপরিচয অংশ থেকে একটি মূল্যবান উদ্ধৃতি দিযেছেন। "অনেকদিন জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতের অন্তর্জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন, স্নেহপ্রীতির

২

দিব্যত্ব আমাব কাছে আজ আকাব ধাবণ কবে উঠছে—নিজেব কথা আমাব নিজেকে সহাযতা কবেছে— ।" কোন অতিবিক্ততাব সংযোগে তেব বৎসব বযসেব পদ্যপ্রলাপেব ভাষা আব ছন্দ আব অনুষঙ্গ—একুশ বযসেব নির্ঝবেব স্বপ্নভঙ্গ বা তাব-ও পবে ব্যবহৃত হযে কবিব "সমস্ত কাব্যেব ভূমিকা" বা "কাব্যভূসংস্থানে ভাষা" হযে ওঠে তাব বিশ্লেষণ ব্যতিবেকে কি ববীন্দ্রনাথেব সত্তাব, সেই সত্তা যা নিজেব ভাষায় নিজেই লালিত-পালিত, সচেতনতালাভেব ইতিহাস বচিত হতে পাবে। মহর্ষিব পবিবাবে "কডি ও কোমল"-এব "দুঃসাহসিক ৰূপদানেব কৃতিত্বেব" ইতিহাস তো বচিত হযেছে কবি কর্তৃক খাবিজ কবে দেযা বাল্যবচনা থেকে সুরু কবে, "বনফুল" থেকে ববিচ্ছাযা পর্যন্ত ছযটি কাহিনী কাব্যেব দীর্ঘতায, একটি অন্তত গীতি-নাট্যেব লিবিক সংঘাতে, পাঁচটি কাব্যেব ছোট ছোট কবিতায, একটি উপন্যাসে, তিনটি অন্তত জার্নালধর্মী বচনায—সন্ধ্যাবেলায প্রদীপ জ্বালাবাব আগে সকাল বেলাব এই পবিমান সলতে যে কোন গডপডতা শিল্পীসাহিত্যিক সাবা জীবনেও পাকাতে পাবেন না। তাব বেষ্টন থেকে বেবিযে আসতে বা আবেগেব দেযাল ভেঙে ফেলতেই যে আত্মসচেতনতা ও আবেগেব অভিজ্ঞতায ববীন্দ্রনাথ নিজেকে বাঁধছিলেন তাবই কাহিনী তো একুশ বছব বযসেব সীমা পর্যন্ত এই বচনা-বলিতে। বিষ্ণু দে সেই আত্মসচেতনতা লাভেব উপাদানেব তালিকা দিতে "তাঁব দেশ ও কাল, তাঁব দুর্গত সামাজিক পবিস্থিতি, পাবিবাবিক পবিবেশেব আভিজাত্য, মাতাপিতা, বিশেষ কবে পিতাব কঠিন কিন্তু সহানুভূতি কোমল প্রভাব, তাঁব অগ্রজেবা, বিশেষত একপক্ষে জ্যোতিদাদা ও মেজদাদা আব বৌঠানেবা এবং গুণেন্দ্রনাথ, অন্যপক্ষে হেমেন্দ্রনাথেব কডা শিক্ষাব্যবস্থা এবং বডদাদাব ব্রহ্মচর্য বিষয আকস্মিক উপদেশ এবং ইওবোপীয জীবনেব স্বাধীনতা সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথেব উৎসাহে তাঁব সন্ত্রস্ত গোঁডা তর্ক"—এ-সবেব উল্লেখ কবেছেন। কিন্তু এই উপকবণগুলি তো অনেকবাবই পবস্পবেব বিবোধিতা কবেছে তখন। বাল্যেব নির্বাসন থেকে হিমালয প্রত্যাগত ববীন্দ্রনাথেব অন্তঃপুবে মুক্তি, দেখতে দেখতে ভদ্রসমাজেব বাজাব থেকে নির্বাসনে দাঁডিযে যাওযায, পববাস ঘোচাতে কবিকে সবদিকে ছুটতে হযেছে। হিন্দু-মেলা জাতীয পবিপ্রেক্ষিত দিতে চাইছিল কিন্তু সেখানেও পৃথিবীব অন্য সব কাজেব অনুপযুক্ত এই তরুণ মহতেব মনেব মুক্তি ছিল না। বিলাতপ্রবাস আব সেই প্রবাস থেকে ফেবাব পব-ও এ-প্রবাসবেদনা ঘোচে নি। ১৮৮০ থেকে

১৮৮৩-ব মধ্যে ব্যাবিষ্টাব হবাব আশায তিন তিনবাব ববীন্দ্রনাথ বিলাতযাত্রাব আযোজন কবেছিলেন। আব প্রতিবাবে যাত্রাব ব্যর্থতাব পব সেই অন্তঃপুবেই ফিবে আসছিলেন—যে অন্তঃপুবে কবিতা ছিল আব ছিলেন কাদম্ববী দেবী। ১৮৮০ থেকে ১৮৮৩ আঠাবো থেকে বাইশ—ববীন্দ্রনাথেব আত্মসচেতনতাব সবচেযে কঠিন কাল। বাইবেব কর্মেব পৃথিবীব থেকে অন্তঃপুবেব আশ্রযে যতো বেশি মুক্তি মিলছিল ততো বেশি বিবোধ-ও বাধছিল সেই অন্তঃপুবেব-ই সঙ্গে। তাই কাদম্ববী দেবীব যে স্থানান্তবপ্রস্থানে বিশ বযসেব কবি মর্মভেদী চিৎকাব কবে ওঠেন সেই প্রস্থান সম্বন্ধেই পববর্ত্তী মন্তব্য—"তাঁহাদেব নিকট খ্যাতি পাইবাব আশায মন স্বভাবতই যে সব কবিতাব ছাঁচে লিখিবাব চেষ্টা কবিত, বোধকবি তাঁহাবা দূবে যাইতেই কাব্যবচনাব যে সংস্কাবেব মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিযা গেল।" সন্ধ্যা সঙ্গীতেব শেষেই তো 'হৃদযনাশা', 'বিকৃত', 'ছেলেখেলা' ভালোবাসা-কে "দূব কবতে" চিৎকাব কবেন। অন্তঃপুবেব সেই বিবোধ এমনও তীব্রতা পায়ঃ

এমনি হযেছে শান্ত মন,
ভালো লাগে বিহঙ্গেব গান,
ভালো লাগে তটিনীব কথা।
ভালো লাগে কাননে দেখিতে
বসন্তেব কুসুমেব মেলা,
যাও মোবে যাও ছেড়ে, নিযো না নিযো না কেড়ে
নিযো না নিযো না মনমোব।
আবাব হাবাই যদি এই গিবি এই নদী
মেঘবাযু কানন নির্ঝব
তাহা হলে এ জনমে নিবাশ্রয এ জীবনে
ভাঙা ঘব আব গড়িবে না।

আব সন্ধ্যাসঙ্গীতেব শেষ উপহাবে-ই অন্তঃপুবচাবিণীকে কবি এক বিগত জীবনেব কথা স্মবণ কবিযে দিচ্ছেন। ততোদিনে তো ভদ্রসমাজেব বাজাবে ববীন্দ্রনাথেব অন্য এক পবিচযেব সূত্রপাত হচ্ছিল ভগ্নহৃদযেব কবিকে ত্রিপুবা-বাজেব বা সন্ধ্যাসঙ্গীতেব কবিকে বঙ্কিমচন্দ্রেব অভিনন্দনে।

আত্মসচেতনতাব আততিতে, পবিপার্শ্বেব সঙ্গে নিজেব সঙ্গতিতে, সন্ধ্যা-সঙ্গীতেব একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রভাতসঙ্গীতে আব ছবি ও গানে

পবিশ্রুত হচ্ছিল—১২৯০ এব গ্রীষ্মবর্ষাবাস কাবোযাবেব সমুদ্রসৈকতে, ১২৯০ এব অগ্রহাযণে ববীন্দ্রনাথেব বিবাহ, ১২৯০ এব ফাল্গুনে কাবোযাব বাসেব স্মৃতিব ছবি ও গান "যাঁহাব নযনকিবণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি-একটি কবিযা ফুটিযা উঠিত, তাঁহাবি চবণে" উৎসর্গ, ১২৯১-ব বৈশাখে সেই বৌঠানেব অত্মহত্যা। আব তাব আগেই দেবেন্দ্রনাথেব নির্দেশ অনুযাযী ববীন্দ্রনাথ জমিদাবিব "জমাওযাশিল বাকি ও জমাখবচ" "প্রতিদিনেব আমদানি-বপ্তানি পত্রসকল" দেখা সুরু কবেছেন।

ববীন্দ্রনাথেব আত্মসচেতনতাব বিকাশে, পবিপার্শ্বেব সঙ্গে সেই আততিব সঙ্গতিসাধনেব যে-ব্যাখ্যা বিষ্ণু দে উপস্থিত কবেছেন—ববীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অশিক্ষিত আমি সে-ব্যাখ্যাব কাছে এতো বেশি ঋণী যে কাব্যভাষাব বিবর্তনে ববীন্দ্রনাথেব প্রথম ষোলো বছবেব বা তাঁব তেব থেকে উনত্রিশ বযসেব বা মানসী পর্যন্ত প্রযাসেব কাহিনী না থাকাতে নিজেকে বঞ্চিত না ভেবে পাবি না। সেই ভাষা, যাতে ববীন্দ্রনাথ নিজেই নিজেকে চিনেছেন। আব সেই প্রসঙ্গে-ই অনিবার্য এসে যায তাঁব অন্তঃপুব জীবনেব কথা—সেই ভাষাব অন্যতব উৎস।

তাঁব ববীন্দ্রনাথ শীর্ষক প্রবন্ধটিতে সুবজিৎ দাশগুপ্ত-ও এই প্রসঙ্গেব উল্লেখ কবেছেন—"ব্যক্তিগত সম্পর্কেব স্তবে স্বকীয উপলব্ধিব ধাবণে বা প্রেমেব অনুসবণে লোকবাধা অতিক্রম কবতে পাবেন নি, হযতো সেই অক্ষমতাকে পূবণ কবলেন কাব্যেব ক্ষেত্রে লোকসিদ্ধছন্দেব বেড়া ভেঙে মানসীতে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রবর্তন কবে।"

অথচ আমাব আশা নষ্ট কবে তাবপবই সুবজিৎ দাশগুপ্ত এবংবিধ সাধাবণ মন্তব্য কবে বসেন—"মানসসুন্দবী ক্রমে বিবর্তিত হলেন জীবনদেবতাতে।"

সুন্দবীবা কেন দেবতা হতে চান, মানস আব জীবনেব ফাবাকটাই বা কোথায সে-সব কথাব মীমাংসা আগে হওযা দবকাব। আবাব সঙ্গে সঙ্গে দবকাব ববীন্দ্রনাথকে তাঁব পবিপ্রেক্ষিতে স্থাপনা। সেই পবিপ্রেক্ষিত যেমন বাংলাদেশেব উনিশ শতকে তেমনি দান্তে গ্যযটে-তে বা শেক্সপীযবে বা বোদলেযবে বা ব্রেখটে বচিত। তাই তুলনামূলক আলোচনাব বিস্তৃত প্রযাসে কালক্ষেপেব বদলে সুবজিৎ দাশগুপ্ত তিনটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে দান্তে, গ্যযটে ও ববীন্দ্রনাথেব কথা আলোচনা কবে ঐ পবিপ্রেক্ষিতটাকেই গ্রাহ্য কবে তোলেন। "মধ্যযুগেব খোলস ফাটিযে ইউবোপেব লৌকিক চেতনা যখন সবে আধুনিক যুগেব পানে উন্মুখ সে সময 'ডিভাইন কমেডি' লেখা হয"—এ কথাব

আলোচনাতেও অন্তত একবার চিরনির্বাসিত কবিটিকে দেখা যায়—তার মুখমণ্ডলের স্বল্পায়ু শ্মশ্রু দেখে কুমারীরা অঙ্গুলি সঙ্কেতে বলতো—'ঐ যায় দান্তে নরকের আগুনে তার দাড়ি ঝলসে গেছে।' দাড়ি থাকলেই যে ঋষিমশাই বনে যায় না, এ-কথাটি অন্তত, রবীন্দ্রসম্পত্তির অছি আর বোদলেয়র থেকে ভালেরির বসে তৃপ্ত আধুনিকতার অছিদের, স্মরণ করিয়ে দেয়া ভালো।

সেই সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথকে আমি অন্তত জানতে সাহায্য পেয়েছি—এই তিনটি বই থেকেই।
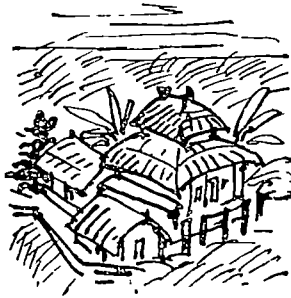
ভিয়েতনামের গেরিলাদের সঙ্গে

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

দিল্লীব কেবামতিতে ভোগান্তিব একশেষ কবে, শেষ পর্যন্ত, ভোব ছটায বওনা হযে যখন সোফিযায পৌছনো গেল তখন আমাদেব ঘড়িতে বাত দুটো। সোফিযাব ঘড়িতে সাড়ে এগাবোটা। গাড়ি, ঘোড়া, ডাক্তাব, দোভাষী সব তৈবিই ছিল। তবু আমাদেব আস্তানায পৌছে ঘব, বিছানা বুঝে নিতে নিতে বাত প্রায ভোব হয হয। পবেব দিন ঘুম ভাঙতে, প্রথমেই যাব কথা মনে হোল, তাব নাম ভিযেতনাম। ভিযেতনামেব প্রতিনিধিবা কোথায আছে? কেমন কবে দেখা পাওযা যায তাদেব? পবে জানতে পেবেছিলাম, এই মনে হওযাটাব মালিক শুধু আমবাই না। শ দেড়েক দেশেব হাজাব বাইশেক প্রতিনিধিব প্রায সকলেই এব মালিক। আমবা সব শেষে পৌছনোব দলে। আগে থেকে যাঁবা পৌছেছেন তাঁবা সমানে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—ওবা কোথায?

সোফিযা বিশ্ববিদ্যালযেব ইংবিজিব ছাত্রী আশিযা—সকালে কিংবা সন্ধ্যা-বেলা—যে কোন সময তাকে দেখলেই মনে হবে এইমাত্র সে হলিউডেব কোন স্টুডিও থেকে বেবিযে এসেছে। অথবা একটু পবেই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায যোগ দিতে যাওযাব জন্যে আশিযা তৈবি। আমাদেব জনাকযেক দোভাষীব একজন। সকালবেলা ঘবে ঘবে ঘুবে, কুশল প্রশ্ন সেবে সে যখন বেবিযে যাচ্ছে, তাকে ডেকে জানতে চাইলাম ভিযেতনামীবা কোথায আছে। একগাল হেসে আশিযা বলল—"প্রত্যেক ঘব থেকেই আমাকে ওই প্রশ্নটা কবা হচ্ছে। একটু সবুব কবো না। এতো তাড়া কিসেব।" মুখ টিপে হাসতে হাসতে বেবিযে গেল আশিযা। ভাবটা যেন, অতো সহজে কি পাওযা যায বাছাধন, একটু ভোগো।

উৎসবেব দ্বিতীয দিন, ভিযেতনাম দিবস। প্রথম দিনটাও হবে দবে ভিযেতনাম দিবসই হযে গেল। তৃতীয দিন খবব পাওযা গেল ভিযেতনামী প্রতিনিধিদেব সাথে ভাবতীয প্রতিনিধিদেব একটি বৈঠক হবে। সকালে উত্তবেব প্রতিনিধিদেব আব সন্ধ্যায দক্ষিণেব মুক্তি ফৌজেব প্রতিনিধিদেব সঙ্গে।

বুলগেবিযাব আতিথেযতাব কথা উল্লেখ কবতে অস্বস্তি বোধ হয, ভয হয

বাঙালী সুলভ কাযদায় বহু বিশেষণ ব্যবহাব কবেও হয়তো কম বলাব অপবাধে অপবাধী হবো। যাঁবা উৎসব নগবীতে ছিলেন তাঁদেব জন্যে তো নতুন তৈবি বিশাল বাড়ি, বেস্তোবাঁ, লিফ্‌ট্‌, ফোন, পার্ক, গাড়ি, বাস ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যদেব জন্যে শহবেব বড বড বাড়ি ও হোটেলগুলি খালি কবে দিযেছিলেন সোফিযাব মানুষ। এমনি সব বাড়িতেই ছিলেন সোভিযেত, জার্মান (পশ্চিম), রুমানীয, ভিযেতনামী, চেক (যদিও ফিবে এসে শুনেছি এদেশে নাকি বটেছে যে চেকদেব একটা দলকে সীমান্ত থেকেই ফিবিযে দেওযা হযেছে, বাকিদেব নাকি থাকতে দেওযা হযেছে শহবেব বাইবে কুঁডে ঘবে) প্রভৃতি প্রতিনিধিদল। ভিযেতনামেব প্রতিনিধিদেব জন্যে যে বাড়িটি দেওযা হযেছিল, সেটি বোধহয এব মধ্যে বিশালতম। সবুজ গাছ আব বং-বেবং-এব ফুল দিযে ঘেবা বাড়িটি। গেটেব দুপাশে ফুল দিযে তৈবি কবা উৎসবেব পাঁচ-বং প্রতীক। একতলায বিবাট হল ঘব। অন্যপাশে একতলা ও দোতলা নিযে অনবদ্য একটি প্রদর্শনী ভিযেতনামেব ওপব। একাধিক মিটিং হল, ওযেটিং হল—গোটা বাড়িটা ঝকমকে আসবাবপত্রে, আলোতে, কার্পেটে ছবিব মতো। সাবাদিন এবং সাবাবাত সেখানে ভিড। নানাদেশেব, নানাভাষাব, নানা বর্ণেব, নানা পোষাকেব মানুষেব আনাগোনা।

সকালবেলা আমবা গিযে পৌছতেই দবজা থেকে আলিঙ্গনে, আপ্যাযনে আমাদেব বেঁধে নিয়ে চললেন উত্তব ভিযেতনামেব প্রতিনিধিবা। আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা শুরু হতেই ভয হোল, গোটা ব্যাপাবটাই বুঝি আনুষ্ঠানিক হযে যায। আমাব ডানদিকে একজন ভিযেতনামেব তরুণ বাঁ দিকে একজন ভিযেতনামী তরুণী। লক্ষ্য কবে দেখলাম, আমাদেব প্রত্যেকেব পাশেই একজন কবে ভিযেতনামেব তরুণ-তরুণী বসেছেন। ভযটা কেটে গেল। সাবাটা সকাল কাটল এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতাব অনুভূতিতে।

সন্ধ্যেবেলা আবাব আসা। এবাবে দক্ষিণ ভিযেতনামেব বন্ধুদেব সঙ্গে মোলাকাত। ওদেব দেখলেই বোঝা যেতো কে দক্ষিণেব, কে উত্তবেব। উত্তবেব প্রতিনিধিবা স্যুট পবে, মেযেবা গাউন কিংবা ওদেব জাতীয পোষাক পবে ঘুবে বেডাচ্ছে। আব দক্ষিণেব প্রতিনিধিদেব ছেলেমেযে প্রত্যেকেব গাযেই সামবিক পোষাক। জলপাই সবুজ মোটা কাপডেব পা-জামা, ফুল-প্যান্ট-এব কাছাকাছি। একই কাপডেব কুর্তা। বুকেব ওপব দুটি পকেট। মাথায জলপাই সবুজ সামবিক টুপি। পায়ে হো চি মিন চপ্পল। বুঝতে ভুল

হয না লড়াই কবতে কবতে ওবা চলে এসেছে। সোফিযাতে আসাটাও ওদেব লড়াই-এবই আঁক।

আনুষ্ঠানিক ব্যাপাব-স্যাপাব সাবা হোল। শুরু হোল আলাপ-পবিচয, গল্প কবা, গান শোনাব পালা: প্রতিনিধিদেব প্রায সকলেই তরুণ। পঁচিশ বছবেব ওপবে কেউই নেই। সতেবোবও অভাব নেই। কম কথা বলে। হাসিতে লাজুকভাব। প্রশংসা শুনলে লাল হযে যায ফোলা ফোলা গাল দুটো। কথা বলাব সময চোখেব চেযে মাটিব দিকেই তাকিযে থাকে বেশি। এমনি একজনেব নাম হুযেন থু বা। তেইশ পেবিযে চব্বিশে পা দিযেছে। দেখতে কেমন যেন বোকা বোকা। শুধু চোখ দুটোব ভেতবে তাকালে আগুনেব ধাব টেব পাওযা যায। আঙুলে গোনা বযেস। অথচ এবই মধ্যে তাব যা অভিজ্ঞতা, অনাযাসে সে একটা ধ্রুপদী উপন্যাসেব নাযক হতে পাবে। কথাটা তাকে বলতেই লজ্জায মাটিব দিকে তাকালো সে। বিড়বিড় কবে বলল, "আমাব মতো হাজাব হাজাব তরুণ আছে ভিযেতনামে। তাবা আমাব চেযে অনেক বেশি সাহসেব ।"

তাব কথা শেষ হওযাব আগেই সবাই মিলে দাবি কবতে আবম্ভ কবল, তোমাব অভিজ্ঞতাব কথা শুনতে চাই। তোমাব লড়াই-এব অভিজ্ঞতা। হুযেন সত্যিই লজ্জা পেলো এবাব। ঘাড় নেড়ে আপত্তি কবতে আবম্ভ কবল। কিন্তু ততক্ষণে মাইক, দোভাষী সব কিছু তৈবি। হুযেন একটু ইতঃস্তত কবে বলতে আবম্ভ কবল তাব কাহিনী। থেমে থেমে, একটু ভেবে নিযে, প্রায ভাবলেশহীন বলা, বেশ বোঝা যায সাজিযেগুছিযে গল্প বলা তাব অভ্যাস নয।

হুযেন বলল "আপনাবা তো জানেন আমবা লড়াই কবছি। ইযাংকিদেব হাত থেকে আমাদেব মাতৃভূমিকে মুক্ত কবাব জন্যে লড়ছি আমবা। আমাদেব দেশেব মানুষেব সেই লড়াই-এব কাহিনীই আমি বলব আপনাদেব। একটা ছোট্ট ঘটনা। আমি এই ঘটনাব সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এটা একটা ঘটনামাত্র। এমন শত শত ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে। আমি যে দিনটিব কথা বলব, সেটি বলতে পাবেন, সাগবে একটি বিন্দুব মতো।

"ব্যাপাবটা ঘটেছিল দক্ষিণেব একটি শহবেব প্রান্তে। যে দিনেব কথা বলছি, তাব দিনকযেক আগে ইযাংকিদেব একটা গোটা ব্যাটেলিযন সেখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিযেছিল মুক্তি-ফৌজেব হাতে। ফলে ওদেব অত্যাচাব আব

প্রতিশোধের চেষ্টার অন্ত ছিল না। ওদের বন্দুকে তো গুলির অভাব নেই। কাজেই হাতের কাছে ওরা যা পায় তার ওপরেই চালিয়ে দেয় গুলি। এমন কি নিরীহ গরু-বাছুরও রেহাই পায় না। অথচ আপনারাই বলুন, গরুবাছুর কি যুদ্ধ করে? আসলে আমার মনে হয়, ওরা ভয় পায় যে গরু-বাছুরও ওদের পছন্দ করে না। কাজেই তাদেরও ছেড়ে কথা বলে না ওরা।

"আমি যে অঞ্চলে ছিলাম, সেখানে ওরা আর কিছু না পেয়ে প্রায় দেড়শ গরু মেরে ফেলল। আমরা দেখলাম ব্যাপারটা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। একটা কিছু করতে হয়। করতে হয় বলতে একটা ইয়াংকিও যাতে রেহাই না পায় এমন কিছু করা দরকার।

"সেদিন দুপুর থেকে বৃষ্টি নেমেছে। মুষলধারা বৃষ্টি। সন্ধ্যে নাগাদ আমার কাছে নির্দেশ এলো। আমি কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম হ্যাভারস্যাক। ইয়াংকিদের প্যারাশুটের কাপড় দিয়েই তৈরি। বন্দুকটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। একটা জায়গায় অন্য বন্ধুরা অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দেখি বাকিরাও ভিজে একসা। ঠাণ্ডায় সবাই কাঁপছে ঠকঠক করে। এই অবস্থায় লড়াই করা যায় না। আমরা তখন নিজেদের কয়েকটা ছোট ছোট দলে ভাগ করে ফেললাম। তিনজনকে নিয়ে একটা দল হোল সবাইকে ম্যাসাজ করে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে। এই করে ঠাণ্ডায় অচল হাত পাগুলো একটু গরম করে নিতে না-নিতেই গুলির শব্দ শোনা গেল। ইয়াংকিরা প্রায় তিন শ গজ দূরে রয়েছে, আমরা জানতাম। যেমন করেই হোক ওরা আমাদের দেখে ফেলেছে। আর এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি হাতিয়ার আর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম আমরা। গুলির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে লাফিয়ে পড়লাম ট্রেঞ্চের মধ্যে। কিন্তু এরই মধ্যে একজনের বুকে এসে লাগল মেশিনগানের গুলি। সে কাত হয়ে পড়ে গেল আমার পাশে। আর নড়ল না। কিন্তু মাথার ওপরে তখন গুলির ঝাঁক। ট্রেঞ্চের মধ্যে পজিশন নিয়ে আমরা জবাব দিতে শুরু করলাম। আমাদের জবাব পেয়ে ওদের বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গেল। যতো রকমের হাতিয়ার ছিল ওদের সাথে, সব গর্জন করতে আরম্ভ করল। গুলির ধারাবর্ষণ শুরু হোল আমাদের চারপাশে।

"কিছুক্ষণ এই অবস্থা চলল। আমরা বেশ ভালোই করছিলাম। হঠাৎ আমার পাশের বন্ধুটির বুকে একটা বুলেট বিঁধে গেল। তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে

তার ও আমার রাইফেল কুড়িয়ে নিয়ে আমি লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম একটা নিরাপদ জায়গার দিকে। ইয়াংকিরা আমাকে দেখতে পেয়েছিল কিনা জানি না। কিন্তু আমাদের দিকে গুলির ঝাঁক ছুটে আসছিল। ফলে মাঝে মাঝেই বন্ধুটিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দুটো রাইফেলই ব্যবহার করে আমাকে জবাব দিতে হচ্ছিল। এইভাবে কোনমতে গুলি বৃষ্টির এলাকার বাইরে গিয়ে আমি ব্যাণ্ডেজের বাক্স খুলে শুরু করলাম ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হতেই আমার খেয়াল হোল আমি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। একেবারে একা আমি। আর সঙ্গে প্রায় আধমরা আমার বন্ধু। এলাকাটাও আমার পরিচিত নয়। এদিকে গুলির বৃষ্টি আমার চারপাশে। একটু ভয়, না, ভয় ঠিক নয়, মনে হোল, বন্ধুটিকে হয়তো বাঁচাতে পারব না। এবং আমাকেও হয়তো মরতে হবে। ঠিক করলাম, হয় বন্ধুটিকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, আর নয়তো ওর সঙ্গেই মরব।

"গুলির শব্দ ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসছিল। বন্ধুটি যদি গুলির শব্দ শোনে তবে তার ক্ষতি হবে। তা ছাড়া ওইভাবে বসে থাকারও কোন অর্থ হয় না। এইসব ভেবে আবার তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু যাবো কোন দিকে? হঠাৎ পায়ে কি একটা জড়িয়ে গেল। হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম। টেলিফোনের ছেঁড়া তার ছড়ানো রয়েছে। ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা হোল না। আমাদের বন্ধুদেরই কাজ এটা। ওই ছেঁড়া তার বরাবর হাঁটতে আরম্ভ করলাম। ইয়াংকিরা গুলি চালাচ্ছিল। আমিও জবাব দিচ্ছিলাম মাঝে মাঝেই। কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। দেখতে পেয়েই সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। ওরা ধরে নিয়েছিল যে আমি নিশ্চয়ই মরে কোথাও পড়ে আছি" (এই কথাটা বলায় সময় হুয়েন প্রাণ খুলে হাসল। ছোট্ট ছেলের মতো সরল হাসিতে ঝকমক করে উঠল তার দুপাটি দাঁত। সে হাসি আমি জীবনেও ভুলব না)।

"তার কাছে খবর পেলাম আমাদের দলের দু-জন ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক-জন ইয়াংকিকে খতম করেছে। এবং লড়াই করতে করতে তার প্রাণ দিয়েছে। ইয়াংকিদের হাতে ওদের মৃতদেহ ছেড়ে দেওয়া যায় না। কাজেই আমরা ঠিক করলাম, ওদের নিয়ে আসতে হবে। আমার কাঁধ থেকে আহত বন্ধুটিকে নামিয়ে রেখে আমরা দু-জনে ফিরে চললাম আবার। একটা জলার ধারে ওরা পড়ে ছিল। যদিও তখন রাত। বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু আমাদের চিনে নিতে

কোন অসুবিধা হোল না। ইযাংকিবা তখন আকাশে আলোব বোমা ফাটাচ্ছে অনবরত। আমাদেব খোঁজাব জন্যে। সেই আলোতে আমাদেব বন্ধুদেব খুঁজে বাব কবলাম আমবা। ওদেব তুলতে গিযে মনে হোল একজন তখনো বেঁচে। দু জনকে কাঁধে ফেলে আমবা দৌডতে আবম্ভ কবলাম। আমাব কাঁধেব ওপব আহত বন্ধুটি। তাব আঘাত থেকে বন্যাব মতো বক্ত ঝবছে। ব্যাণ্ডেজ কবতে পাবলে হোত। কিন্তু থামাব উপায নেই। ইযাংকিবা প্রাণেব আক্রোশে গুলি চালাচ্ছে। একটা বাঁশ-ঝাডেব আডালে এসে ওকে নামালাম। ব্যাণ্ডেজেব বাক্সটা বাব কবে দেখি কোন উপায নেই। বুলেটেব আঘাতে বাকসটা ঝঁঝবা হযে গেছে। কোন কাজে লাগবে না।

"বন্ধুটি বিডবিড কবে কথা বলছিল। বোধহয একটুখানি জ্ঞান ফিবেছে। তাকে কেমন কবে বাঁচানো যায। আমি তাকে জডিযে ধবলাম। শুনতে পেলাম সে বিডবিড কবে বলছে.—'আমি কি মবে যাচ্ছি, কমবেড, এখনো যে দু-জন ইযাংকি আমি কি মবে ।

"আমি তাকে জডিযে ধবে বললাম, 'তুমি ভেঙে প'ডো না। আমবা বাঁচব। নিশ্চযই বাঁচব। তুমি শুধু একটু শক্ত হও, একটু আশা বাখো।'

"কিন্তু তখন কথা বলাব সময নেই। ইযাংকিবা আমাদেব দেখে ফেলেছে। চাবপাশ থেকে ঘিবে ফেলেছে আমাদেব। আব আমবা মাত্র দু-জন। আমি আমাব আহত বন্ধুটিব গাযেব ওপব উপুড হযে শুযে পডলাম। পাছে ওব গাযে গুলি লাগে। ওইভাবেই গুলি চালাতে আবম্ভ কবলাম। কিন্তু এক-জাযগা থেকে ক্রমাগত গুলি চালালে ওবা ধবে ফেলবে যে আমবা মাত্র দু-জন। ওবা এগিযে আসতে সাহস পাবে। কাজেই আমবা লাফ দিযে দিযে পজিশন পালটে পালটে গুলি ছুঁডতে আবম্ভ কবলাম, যাতে ওবা ভাবে যে আমবা সংখ্যায অনেক। এতে ওবা ভয় পাবে। এগোতে সাহস কববে না। হোলও ঠিক তাই। এগোতে এগোতে ওবা থেমে গেল। তখন আমবা ওদেব দিকে তাক কবে গুলি ছুঁডতে আবম্ভ কবলাম। একটা, দুটো, তিনটে, পবপব অনেকগুলো ইযাংকিকে পডে যেতে দেখলাম। সাতজনেব একটা দল দিগবিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে পেছন ফিবে ছুটতে আবম্ভ কবল। মাথাব ওপবে তখনো ওদেব জ্বালানো আলো। আমবা ছুটলাম ওদেব পেছনে। সাতটাকেই খতম কবলাম। দাঁডিযে একটু নিঃশ্বাস নেবো কিনা ভাবছি, এমন সময দেখি চাবজন ইযাংকি বন্দুক-টন্দুক ফেলে পালাচ্ছে। তাদেব আব মাবলাম না আমবা।

বন্দী কবলাম। পবে জেনেছিলাম এই ঘটনাটিতে মোট চুবানব্বইজন ইযাংকি খতম হযেছিল। আমবা হাতে পেযেছিলাম চব্বিশটি মার্কিন হাতিযাব। আব চাবজন আস্ত ইযাংকি বন্দী পেযে আমাদেব বন্ধুবা, বিশেষ কবে ছোটবা যে কি খুসি তা আমি বলতে পাবব না।"

বাত অনেক হযেছিল। বিদায নেওযাব সময পাব হযে গেছে বহুক্ষণ॥ তবু লোভ সামলাতে পাবলাম না। ভিডেব মধ্যে থেকে হুযেনকে কোনমতে আলাদা কবে জিজ্ঞাসা কবলাম ঃ

"কমবেড, যুদ্ধ তো শেষ হযে যাবে আজ বাদে কাল। তাবপব তুমি কি কববে ?"

সে যেন একটু অবাক হোল আমাব প্রশ্ন শুনে, বলল,

"কেন ? হ্যানযে পডতে যাবো। সেখানকাব বিশ্ববিদ্যালযে আমাব জন্যে সিট বযেছে।"

আবাব জিজ্ঞাসা কবলাম ঃ

"উৎসব কেমন লাগছে ? সোফিযা কেমন লাগছে ?"

"ভালো। খুব ভালো। তোমাদেব সঙ্গে দেখা হোল, আলাপ হোল খুব ভালো।"

জানতে চাইলাম, "এব পবেব উৎসবে আসবে তো ?"

এবাবে হেসে ফেলল হুযেন। হাসতে হাসতেই বলল ঃ

"পবেব উৎসবে আমবা আসব না। তোমবা যাবে। কাবণ, পবেব উৎসব আমবাই কবব। সে উৎসব হবে সাযগনে। মুক্ত সাযগনে।"

চেকোশ্লোভাকিয়া—অন্যদিক

সুশোভন সরকার

১

বিতর্কমূলক সমস্যায় উভয়পক্ষীয় মতামত লোকের সামনে তুলে ধরাই প্রাথমিক কর্তব্য। কমিউনিস্ট-সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের অধিকাংশে আজ একদেশদর্শী আলোচনা সেইজন্য দৃষ্টিকটু লাগে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের গত বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে মস্কো-চুক্তি সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে চেক পার্টির নীতি ও কার্যক্রমের প্রতি যে-শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে, বিপদের দিনে চেক জনগণের সংহতি ও সংযম সম্বন্ধে যে-অভিনন্দন জানানো হয়েছে, উপরোক্ত আলোচনায় তার চিহ্ন-ও চোখে পড়ে না। শারদীয়া 'পরিচয়' পর্যন্ত অধিকাংশের এই পথ অনুসরণ করল দেখে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হবার সংগত কারণ দেখছি।

চেক সঙ্কটের মূলে আজ প্রধান প্রশ্ন হল সোভিয়েট সৈন্য প্রবেশ যুক্তিসঙ্গত ও মঙ্গলজনক কিনা। মূল প্রশ্ন এড়িয়ে প্রায় সকল লেখক জোর দিচ্ছেন পটভূমিকার উপর—যে-পটভূমিকার বিশ্লেষণে বিভিন্ন ব্যাখ্যা অনিবার্য। বাইরে থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা এবং ভিতরে প্রতিবিপ্লবের আশঙ্কা মেনে নিলেও চেক জনগণ ও পার্টির অমতে সৈন্যপ্রেরণের যৌক্তিকতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে যায় না, তার ফলাফল-ও পরিণামে ক্ষতির সম্ভাবনা নিয়ে আসতে পারে আসল আলোচ্য কিন্তু এই কথাই।

সোভিয়েট অভিযানের সমালোচনা আমি অন্যত্র বিস্তারিত ভাবে করেছি। তার সবটার পুনরুক্তি করে 'পরিচয়ে'র মূল্যবান পাতা ভারাক্রান্ত করতে চাই না। সৈন্যপ্রবেশের এই নীতি যে ভ্রান্ত হতে পারে, সাম্প্রতিক সোভিয়েট আচরণের বিরুদ্ধে সমাজবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যে আপত্তি ওঠা স্বাভাবিক, এইটুকু মাত্র প্রতিষ্ঠা করা এ-লেখার উদ্দেশ্য।

২

চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট সৈন্যপ্রেরণের স্বপক্ষে যত কথা বলা হয়েছে, যুক্তিহিসাবে সেগুলিকে পরস্পর-সংযুক্ত দুই প্রধান পর্যায়ে পর্যবসিত করা সম্ভব। সংক্ষেপে তার মর্ম হল যে সমাজতান্ত্রিক জগতের সামরিক আত্মরক্ষার

খাতিরে এবং চেকদেশে প্রতিবিপ্লবের প্রচণ্ড স্রোতকে রোধ করার জন্য সৈন্য-প্রবেশ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

বিদেশে সৈন্য পাঠানো যে সকল ক্ষেত্রেই নিন্দনীয় এমন সিদ্ধান্ত অবশ্য অন্যায়। দিগ্বিজয়ী হিটলারের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পরাক্রমের সামনে একক মিত্রহীন বিপন্ন সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে সেদিন পূর্ব-পোল্যাণ্ড্ দখল ও ফিন্ল্যাণ্ড্ আক্রমণ ছাড়া উপায় ছিল না। ১৯৫৬ সালের হাঙ্গারিতে প্রতিবিপ্লব রাষ্ট্রশক্তি দখল করে ফেলেছিল, পশ্চিম থেকে সাহায্য চাওয়া হয়, সুয়েজের সঙ্কট তখন মহাযুদ্ধের কিনারা পর্যন্ত এগিয়ে আসে, বিশ্বযুদ্ধ আটকাবার অন্যতম হাতিয়ার অর্থাৎ আণবিক অস্ত্রে আমেরিকার সঙ্গে সমতা তখনও রাশিয়ার আয়ত্তের বাইরে। চেকোস্লোভাকিয়ার বর্তমান সমস্যা কি এই অবস্থার অনুরূপ ?

চেকদেশে সোভিয়েট 'হস্তক্ষেপ' ঘটেছে এমন মন্তব্য নাকি কমিউনিজ্ম্-বিরোধী। ২৩শে আগষ্টের বক্তৃতায় ফিডেল কাস্ট্রো সোভিয়েট অভিযানের দৃঢ় সমর্থন করেও বলেছেন—What cannot be denied here is that the sovereignty of the Czechoslovak State was violated And the violation was, in fact, of a flagrant nature ' কাস্ট্রোও কি কমিউনিজ্ম্-বিরোধী ?

'প্রাভ্দা'র প্রবন্ধ লেখক এক তত্ত্বের অবতারণা করেছেন, শত্রুর অনুপ্রবেশের আশংকা থেকে সমাজতান্ত্রিক জগতের আত্মরক্ষার খাতিরে সৈন্য-প্রয়োগে কোন-ও দোষ থাকতে পারে না। ভিয়েতনামে আমেরিকার হস্তক্ষেপ সমর্থনে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার কর্ণধারেরাও ত' এই ধরনের যুক্তির আশ্রয় নেন—শত্রুপক্ষের অনুপ্রবেশ থেকে আত্মরক্ষা। চেকোস্লোভাকিয়ার বিশেষ অবস্থানের কথা উঠেছে। এই দেশের মতন ভিয়েতনামকে-ও কি সমাজ-তান্ত্রিক জগতের "নবম তলপেট" আখ্যা দেওয়া যায় না ? অথচ সেখানে সৈন্যবাহিনী পাঠাবার প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ঠিক কি ? সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র ত' আজ সংখ্যায় চোদ্দটি, পঞ্চরাষ্ট্রের চেক অভিযানের আগে কি অন্য সোশালিস্ট্ দেশগুলির পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল ? পশ্চিমের বিরাট দুই সাম্যবাদী পার্টির নেতারা মস্কো গিয়ে রুশ কর্তৃপক্ষকে সামরিক অভিযান থেকে নিবৃত্ত করবার ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছিলেন, বিশ্ব সমাজবাদী আন্দোলনের স্বার্থরক্ষায় কি তাঁদের কিছু দায়িত্ব নেই ? হয়ত

নেই, কাবণ ফ্রান্সে নাকি সম্প্রতি বিপ্লব 'বাজাব দুলালে'ব মতন ('দুলাল', 'কুমাব' নয) দবজা থেকে বিনা অভ্যর্থনায ফিবে গিযেছিল। আব ইটালি প্রমুখ পশ্চিমী দেশে নাকি কমিউনিস্টবা ভোট-সংগ্রহেব মোহে আচ্ছন্ন। এদেশে আমবা যে কোন স্বপ্নে বিভোব কে জানে।

শত্রুব চক্রান্ত অবশ্য উপহাসেব বস্তু নয, বাস্তব সত্য। দেশে দেশে যে সমাজতন্ত্রেব বিরুদ্ধে গোপন ষডযন্ত্র চলছে তাকে অস্বীকাব কবাব কোন-ও প্রযোজন দেখি না। কিন্তু প্রশ্ন হল এই যে সে-বিপদ কতখানি, হিট্লাবেব দুর্বাব অগ্রগতিব সে কি সমগোত্রীয, বাস্তব অবস্থাটা আজ ঠিক কি? এইখানেই বিচাব এসে পডতে বাধ্য। মনে বাখতে হবে যে আমেবিকাব (বিপদেব মূলকেন্দ্র নিশ্চয আমেবিকা) ঠিক হিট্লাবি শক্তি নেই, আমেবিকাকে আজ চলতে হয সন্তর্পণে সাবধানে, সোভিযেট বাশিযাব অস্ত্রশক্তি এখন আমেবিকাব তুলনায হীনবীর্য নয, সমাজতান্ত্রিক জগৎ আব আগেব মতন অসহায অবস্থায পডে বযেছে বলা চলে না। আজকেব দিনে আমেবিকা ও বাশিযা উভযেই ন্যায্য কাবণে সাক্ষাৎ সংঘর্ষ এডাতে উদ্যত এ-সত্য ত' সুবিদিত, পবস্পবকে আক্রমণ তাই 'ঠাণ্ডা যুদ্ধে'ব সীমা ছাডিযে ওঠে না। মার্কিন সাম্যবাদী দলেব সেক্রেটাবি গাস হল সোভিযেট সামবিক অভিযানেব প্রবল সমর্থক—৩১শে আগষ্টেব বিপোর্টে তিনি কিন্তু স্বীকাব কবেছেন—"It is true at this moment that neither U S nor West German imperialism is ready to strike militarily"

অঘটন অবশ্য ঘটতে পাবে। পশ্চিম জার্মানিব নাযকদেব মতিগতি এমন যে তাদেব পক্ষে অতর্কিত আক্রমণ অসম্ভব ছিল না। কিন্তু চেকোস্লোভাকিযাব তিন দিকে ওযাবস-চুক্তিব সৈন্যবাহিনী সর্বদা প্রস্তুত আছে। পশ্চিম জার্মান সেনাদল সীমান্ত অতিক্রম কবা মাত্র সেই বাহিনী সহজেই অগ্রসব হতে পাবত শত্রুকে বাধা দেওযাব জন্য। এই যুক্তিকে উপহাস কবে বলা হযেছে এত ভদ্রতা কেন, এতে যে বেশি বক্তক্ষয হ'ত। 'বক্তক্ষয' বেশি হত কিনা জল্পনা বৃথা, কাবণ পশ্চিমী অভিযান ত' শুধু সম্ভাবনাব কথা, আশু নিশ্চিত সত্য নয। আব 'ভদ্রতা'য এই লাভ যে সোভিযেট সৈন্য পবে এলে পেত সাবা বিশ্বেব সমাজবাদী ও শুভবুদ্ধি লোক মাত্রেব অকুণ্ঠ সমর্থন, চেক নেতা ও জনগণেব অধিকাংশেব সোৎসাহ সহযোগিতাব তখন অভাব হত না।

আজকের দিনে সশস্ত্র সংঘর্ষে জনমত ও জন-সহযোগিতা কিছু তুচ্ছ বস্তু নয়, আধুনিক ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে।

পশ্চিম জার্মানি হঠাৎ তাণ্ডব শুরু করে দিলে আমেরিকা কি পিছিয়ে থাকতে পারত? মার্কিন হস্তক্ষেপ পরোক্ষ হলে সোভিয়েট ইউনিয়ান পাল্টা চাপ সৃষ্টি করতে পারে বোমাবিধ্বস্ত ভিয়েতনামে সশস্ত্র সাহায্যের পরিধি বিপুলভাবে বাড়িয়ে দিয়ে, যাতে আমেরিকার চৈতন্যোদয় হতে বাধ্য এবং যাতে প্রগতিশীল মহলে সমর্থনের জোয়ার আসবে। আর মার্কিনীরা যদি সরাসরি যুদ্ধে নেমেই পড়ে, তাহলে ত' বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবে, তখন প্রধান লড়াই চলবে আকাশ-পথে। সে-অবস্থায় চেক ভূমির বিঘোষিত ভৌগোলিক সামরিক গুরুত্ব হবে লুপ্তপ্রায়, সে-অঞ্চল তখন কার দখলে ভাবার অবকাশ থাকবে না।

সোভিয়েট সমর্থকেরা আজ বিশেষ অঞ্চল দখল রাখার সামরিক সুবিধা, কর্তৃত্বের নির্দিষ্ট এলাকা, দুই শিবিরে শক্তির ভারসাম্য ইত্যাদির ব্যাখ্যায় সরব। সমাজতন্ত্রী জগৎ আজ যেন আঠারো শতকের বহুনিন্দিত রাজনীতিতে ফিরে যাওয়া আর গ্লানিজনক মনে করছে না, যুদ্ধ আটকাবার আশায় অপর পক্ষের আগেই সামরিক কাজে এগিয়ে যাওয়া পর্যন্ত মনে হচ্ছে সমর্থনযোগ্য। ইতিহাস কিন্তু বলে না যে এমনভাবে শান্তি বজায় থাকে। অসীম বিপদের মুহূর্তেও তাই লেনিন সাবেকি রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করবার বিপ্লবী সাহস দেখাতে পেরেছিলেন।

৩

বাইরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চাইতে ভিতরের প্রতিবিপ্লবী স্রোত আটকানোই যে সামরিক অভিযানের আসল লক্ষ্য ছিল, এই কথা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে সাম্প্রতিক সোভিয়েট প্রচার থেকে। আটকাবার এই প্রক্রিয়াটির তাই যথার্থ বিচার প্রয়োজন।

চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে প্রতিবিপ্লবী ঝোঁক যে প্রচুর মাত্রায় বিদ্যমান, এ-সত্য অস্বীকার করবার কারণ দেখি না। সাহিত্যচর্চা থেকে রাজনৈতিক আলোচনা, সংবাদ-মাধ্যম থেকে নানা সংগঠনের কার্যক্রম ইত্যাদির ভিতর দিয়ে সমাজতন্ত্র-বিরোধিতা কিছু পরিমাণে নিশ্চয় প্রকাশ পেয়েছে। মৌলিক প্রশ্ন হল এর কারণ কি। বহির্বিশ্বের বুর্জোয়া প্রভাব ত' সমাজতান্ত্রিক সকল দেশের উপরই এসে পড়ে। চেকোস্লোভাকিয়ায় তার বিশেষ প্রচারকে

শক্তিশালী করেছে দেশবাসীর মনে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ। তাকে দূর করবার প্রকৃষ্ট উপায় কোনক্রমেই অবাঞ্ছিত সৈন্যপ্রবেশের মধ্যে নেই, স্টালিনী শাসনের বিগত দিনের পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়াটা-ও নিষ্ফল। প্রতিবিপ্লবের নূতন নূতন নিদর্শন খোঁজার ভিতর কিন্তু মূল প্রশ্নের মোকাবিলা করার লক্ষণ দেখি না। যে-উদ্দেশ্যে সোভিয়েট সৈন্য দেশে প্রবেশ করল, সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

প্রতিবিপ্লবী শক্তির বাস্তব ব্যাপ্তি সম্বন্ধেও ভুলের অবকাশ আছে। দেশ-দখলের পর প্রতিবিপ্লবী প্রতিরোধ ত' বিশেষ চোখে পড়ল না। প্রকাশ্য অভ্যুত্থান ঘটে নি, নাশকতামূলক কাজও যৎসামান্য, অস্ত্রশস্ত্রই বা কতটুকু আবিষ্কার হয়েছে? গোপন রেডিও প্রতিবিপ্লবের অকাট্য প্রমাণ নয়—রেডিও দেশের বাইরে থেকে চালানোও সম্ভব, ক্ষুব্ধ দেশবাসীর তার সঙ্গে সহযোগ-ও স্বাভাবিক, আর 'মুক্ত' রেডিও চেক সরকারের নির্দেশ অমান্য করে নি। সমাজতন্ত্রবিরোধিতা কিছুটা বাড়িয়ে দেখা হয় নি এমন কথা বলি কি করে,—বিরোধী মতের অস্তিত্ব এবং তার প্রাধান্য ঠিক এক ব্যাপার নয়। দেশদখলের পর প্রতিবিপ্লব যদি মিলিয়ে যায় তাহলে তার বিস্তার সম্বন্ধেই সন্দেহ ওঠে। আর এখনও যদি শত্রুপক্ষের কাজকর্ম চলতে থাকে, অথবা পরে সুযোগের অপেক্ষায় এখন যদি তারা গা ঢাকা দিয়ে সময় কাটাতে পারে, তবে আবার সেই মূল প্রশ্নে ফিরে আসতে হয়—প্রতিবিপ্লব আটকাবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি? বিদেশী সৈন্য-ই বা কতকাল দেশে বসে থাকবে?

তাছাড়া কি মানতে হবে যে চেকোস্লোভাকিয়ায় স্বদেশী বিপ্লবী শক্তি নেই, তার প্রভাব যৎসামান্য? যদি না থাকে তবে সেখানে সমাজতন্ত্র গঠন ত' আকাশকুসুম, অপরে এসে বিপ্লব মিষ্টান্নের মতন মুখে তুলে দেয় না, বিপ্লব অর্জন করতে হয়। দেশে যদি বিপ্লবী শক্তি থাকে, তবে তাকে জনমত জয় করে নিতে হবে নিজের জোরে, বহিরাগত সৈন্যের সাহায্যে না। অপর দেশের সৈন্য প্রবেশে বিপ্লবের শক্তি বাড়ে না, অন্তত মহাযুদ্ধের ওলট-পালটের দিন বাদ দিলে। বিপ্লব কিছু আমদানির বস্তু নয়, বন্দুকের নলে তাকে নিয়ে আসা যায় না।

বলা হবে যে চেকদেশে সমাজতন্ত্রী শক্তি আছে নিশ্চয়, কিন্তু তা অসংগঠিত, চেক সরকার ও পার্টি তাকে নেতৃত্ব দিতে পারে নি, প্রতিবিপ্লবী আলোড়ন অবাধে চলতে দিয়েছে। অথচ চেক ও রুশ উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ অগস্টের

ঘটনাবলীর ভারতীয় প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনলাম যে বিরোধী প্রত্যেক সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেওয়া হয়েছে চেক কমিউনিস্ট মহল থেকে। আসলে চেক নেতাদের বিশ্বাস যে অসন্তোষ প্রশমনের কার্যকরী উপায় হল নূতন পার্টি কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ন। এই বিশ্বাস ভ্রান্ত কিনা সেটা প্রমাণ বা অপ্রমাণের অবসর দেওয়া হল না। দিলে কি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ধ্বসে পড়ত, সে দুনিয়া কি এতদিন পরেও এত ভঙ্গুর? অথচ জনগণের অসন্তোষ যদি সামান্য না হয়, দেশের মধ্যে যদি তার বিস্তৃতি ব্যাপক হয়, তবে বহিরাগত সৈন্য দিয়ে তার অবসান সম্ভব হবে না।

বস্তুতঃ একটা কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে চেক পার্টি ও নেতৃত্বের উপর সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। ওটা সিকের আর্থিক পরিকল্পনার প্রচুর নিন্দা শুনছি, কিন্তু তার অনুরূপ ব্যবস্থা সোভিয়েটসহ অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও পরীক্ষিত হয়েছে, তাতে সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়ে নি। তত্ত্ব হিসাবে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য প্রকাশ পায় সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির মধ্য দিয়েই, এবং ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির স্বাধীনতা ও সমতা নীতিগত ব্যাপার। অথচ এখন একে এড়িয়ে চলবার লক্ষণ চোখে পড়ছে না কি? সিজার বলেছিলেন বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রের পথ বিভিন্ন—এমন কিছু নূতন কথা নয়। গৃহীত এই তত্ত্বকে 'প্রাভ্দা' ব্যাখ্যা করছে এই বলে যে বিভিন্ন পথ কিন্তু কয়েকটি সাধারণ সত্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত, যে-সত্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সোভিয়েট মডেল-এর মধ্যেই। 'প্রাভ্দা'র এ-কথা বলার নিশ্চয় সম্পূর্ণ অধিকার আছে, অন্য সমাজবাদীদের-ও স্বাধীনতা আছে তার বিশ্লেষণী বিচার করবার। কিন্তু প্রচার ছাড়িয়ে অস্ত্রের জোরে নিজস্ব ব্যাখ্যা চাপিয়ে দেবার চেষ্টাও কি মানা চলে?

চেক পার্টির অবস্থা নাকি এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তাকে অক্ষম করে ফেলে। বিপুলসংখ্যায় পার্টি-সভ্যদের নাকি বের করে দেওয়া হয়েছে, পরীক্ষিত পুরানো নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা চলেছে, পার্টি কংগ্রেস না ডেকেই নীতি পরিবর্তন হচ্ছে, পার্টি সংস্থা ও সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্বাচনে গলদ থাকছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক পার্টির অভিজ্ঞতাতেই এমন ঘটনা ঘটেছে। তাই বলেই কোনও পার্টির আভ্যন্তরীন ব্যাপারে বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ কি চলতে পারে, তার পরিণাম কি শুভ? কমিন্টার্নের প্রথম যুগে কোনও কোনও পার্টি পুনর্গঠিত হয় বাইরের চাপে, তাতে সুফল পাওয়া

গিয়েছিল এমন কথা ইতিহাস বলে না। আজ সোভিয়েট চাপে যদি চেক পার্টি ও নেতৃত্বের পুনর্গঠন করতে হয় তাহলে তাদের নৈতিক সমর্থন থাকবে কোথায়, জনমতই বা তাদের পিছনে সামিল হবে কেন?

এ-কথাও শোনা যায় যে সোভিয়েট বাহিনী আপনা থেকে আসেনি, চেক সরকার ও পার্টি নেতৃত্বের একাংশ সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের নাম দেশদখলের পর-ও প্রকাশিত হল না, সম্ভবতঃ জনমতের ভয়ে। আধডজন মহামান্য নেতা-ও এঁদের মধ্যে থাকতে পারেন, কিন্তু হাঙ্গারির কাডার-এর মতন তাঁরা ত' লোকমতের সামনে প্রকাশ্যে এসে দাঁড়াতে পারলেন না। সৈন্য প্রবেশের পর তাঁরা ত' পাল্টা সরকার গঠনের দায়িত্ব নিতে পারতেন। ৯ই সেপ্টেম্বর পার্টি কংগ্রেস ডাকা হয়েছিল, অপেক্ষা না করে তার দুই সপ্তাহ আগেই সোভিয়েট বাহিনী এসে উপস্থিত হল কেন? এর থেকে একটা কথাই প্রমাণ হয়—যাঁরা রাশিয়ার দিকে চেয়ে আছেন তাঁরা সংখ্যালঘু ও জনসমর্থনহীন। তেমন 'একাংশে'র অনুরোধে হস্তক্ষেপ করা ত' মারাত্মক যুক্তি। মস্কো চুক্তি তাই সম্পন্ন করতে হল এমন নেতাদের সঙ্গে, যাঁদের মধ্যে কিছু লোককে প্রতিবিপ্লবী হিসাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মুক্তি পেয়ে তাঁরা আবার প্রমাণ করছেন যে পার্টি ও জনগণ (চেক দেশে যার অধিকাংশই শ্রমজীবী) এখনও তাঁদের পিছনে।

নূতন চেক কর্মসূচীতে সেন্সর-প্রথা অবসানের আশ্বাস ছিল, মনে হয় সোভিয়েট নেতাদের প্রধান আশংকা এইখানে। অথচ স্বয়ং মার্কস সেন্সরশিপের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। রুশবিপ্লবের পরমুহূর্তে লেনিন যখন সেন্সর-প্রথা প্রবর্তনে বাধ্য হলেন, তখন তিনি ঘোষণা করেন যে এই দুঃখজনক ব্যবস্থা সাময়িক মাত্র, শীঘ্রই একে তুলে দেওয়া হবে। জন রীডের লেখায় পড়ি যে লেনিনের বহু সহকর্মী (ট্রট্স্কি ব্যতীত) সেদিন সেন্সর-প্রথাকে সমাজবাদী নীতির বিরোধী বলে নিন্দা করেছিলেন। লেনিন তাঁদের আশ্বাস দেন যে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে পত্র-পত্রিকা তুলে দেওয়া হবে, সরকার নয়, জন-প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে, যাতে বিভিন্ন পার্টি তাদের সমর্থকের অনুপাতে বিভিন্ন মত প্রকাশ করে যেতে পারে। 'সাময়িক' এই নিয়ন্ত্রণ এতদিন পরেও আজ ওঠে নি, দৃঢ়মুষ্টি হয়েছে সরকারেরই হাত। কোনও দেশে সাময়িক ব্যবস্থা শেষ হবে কিনা সে-সিদ্ধান্তের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পার্টির উপর ন্যস্ত থাকাটাই উচিত নয় কি? অস্ত্রের জোরে সিদ্ধান্ত চাপাতে গেলে স্থায়ী সমাধান

আসতে পাবে না। সেসব ছাড়া প্রলেটাবীয় ডিক্টেটবশিপ চলবে না, এমন কথা ভাবা অনুচিত। ডিক্টেটবশিপ ত' বাষ্ট্রমাত্রেবই লক্ষণ, যে-বাষ্ট্রে সেসব নেই সেখানে-ও ত' ডিক্টেটবশিপ চলতে থাকে।

স্বাধীন মতপ্রকাশকে জুজুব মত ভয় পাওয়া দীর্ঘযুগব্যাপী প্রতিষ্ঠিত সমাজ-তন্ত্রেব সাজে না। নানা মত প্রকাশ পেলে সমাজবাদী আদর্শকে লড়াই কবে চলতে হয়, তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। ধনতন্ত্র ত' অনেক সমালোচনা সহ্য কবে টিকে আছে, অথচ আর্থিক-সংঘাতে ধনতন্ত্র ক্ষয়িষ্ণু। বর্ধিষ্ণু সমাজতন্ত্রই বা এত ভয় পাবে কেন, অধিকাংশ লোকেব স্বার্থ যখন সমাজতন্ত্রেব প্রবল আকর্ষণ। আর্থিকভিত্তি দৃঢ় থাকলে হাজাব হাজাব কথা তাকে উচ্ছেদ কবতে পাবে না। আব অসন্তোষ থাকলে তাব প্রকাশ বাঞ্ছনীয়, তাহলে সময় মত ব্যবস্থা নেওয়া চলে। কণ্ঠবোধ কবে থাকলে অসন্তোষকে গোপন ষড়যন্ত্রেব দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, তাতে ক্ষতিব সম্ভাবনাই বেশি।

৪

সোভিয়েট নীতিবিশেষেব সমাজবাদী সমালোচক মাত্রকে গঞ্জনা শুনতে হয় যে শত্রুপক্ষকে সাহায্য কবা হচ্ছে। চেকদেশে সোভিয়েট সৈন্য প্রবেশই যে শত্রু-প্রচাবকে অনেক বেশি শক্তি জোগালো সে সম্বন্ধে নীবব থাকাই বোধ হয় বুদ্ধিমানেব কাজ। আসলে কমিউনিস্ট মহলে স্বাধীন চিন্তাব নিদর্শন পবিণামে বিশ্ব সমাজবাদকে শক্তিশালী কবে।

মার্কসবাদীমণ্ডলীতে বিতর্ক উঠলেই অনেকে আশ্রয় খোঁজেন নেতাদেব কাছে—সোভিয়েট, চীন, বা কিউবাব নেতাদেব কাছে। প্রকৃত আশ্রয় আছে কেবল মার্কসবাদেব মধ্যেই—মার্কসেব কালজয়ী শিক্ষাব মধ্যে, মার্কস-এঙ্গেল্‌স্-লেনিনেব তত্ত্ব ও বিচাব-পদ্ধতিব ভিতব। পার্টিব মধ্যে এই শিক্ষাব অভাবেই লোকে সংকটে অসহায় বোধ কবে।

অনেকে আবাব মার্কসেব 'তরুণ' মানবিকতা ও 'পবিণত' শ্রেণীসংগ্রামকে পৃথক কবে দেখেন। মার্কসেব প্রকৃত শিক্ষায় দেখি উভয়েব মিলন, এদেব তফাৎ কবতে গেলে একদেশদর্শিতা এসে পড়তে বাধ্য।

মানুষেব মুক্তিব প্রথম সার্থক সোপান শোষণেব অবসান, আর্থিক মুক্তি। কিন্তু মার্কস তাব সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বেখেছিলেন মানবিক বিকাশেব আদর্শ —"development of human energy which is an end in itself" মার্কসবাদেব নূতন দিগন্ত সম্পর্কে আজকাল যে humanism-এব ধ্বনি উঠেছে,

তার মূল এইখানে—মার্কসের নিজের কথায়—"the doctrine that man is the highest being for man, i e the categorical imperative to overthrow all conditions in which man is a humiliated, enslaved, despised and rejected being"

মানুষের alienation দূর করবার প্রধান বাধা হল আর্থিক দাসত্ব। কিন্তু অন্য বাধাও ভোলা চলে না, যেমন বুরোক্রাসি। মার্কস লিখেছেন—"Bureaucracy regards itself as the be-all and the end-all of the state the all-pervading universal spirit of bureaucracy is *mystery*, secrecy Worship of authority is its *way of thinking*"

Regimented Communism কথাটা মার্কসেরই সৃষ্টি মনে হয়। ১৮৭৩ সালের রচনায় তিনি একে তীব্র বিদ্রূপ করছেন দেখতে পাই। তিনি বলেছিলেন "there is only one remedy for all these intrigues, but it is a very radical remedy, full publicity" ১৯৬৩ সালের মে মাসে World Marxist Review পত্রিকায় রুশ লেখকের প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে।

বিপ্লব জনগণের সৃষ্টি। মার্কস বলছেন "I call revolution the conversion of all hearts and the raising of all hands in behalf of the honour of the free man" শ্রেণী সংগ্রামের আওতার all নিশ্চয় আক্ষরিক অর্থে মাথা গুনে প্রত্যেকটি লোক নয়, কিন্তু জনগণের বিপুল সংখ্যাকে টানতে না পারলে বিপ্লব সম্ভব বা স্থায়ী হতে পারে না। লেনিন তাই এর উপর অতটা জোর দিয়েছিলেন।

বিপ্লব বাইরে থেকে চাপানো চলে না। ১৮৮২ সালে এঙ্গেলস্ লিখেছিলেন—"the victorious proletariat can force no blessings upon any foreign nation without undermining its own victory by so doing"

প্রলেটারীয় আন্তর্জাতিকতার অপব্যাখ্যা সম্বন্ধে লেনিন সাবধান করে ছিলেন—"the ridiculous assertion that we should conceal every concrete difficulty of the revolution with the declaration that 'I am counting on the trump-card of the international and socialist movements so that I can commit any folly I like'"

বিপ্লবী শ্রমিক সবকাবেব সম্ভাব্য ভুলচুকেব স্বীকৃতিও পাই লেনিনেব লেখায়— 'just because the proletariat has carried out a social revolution it will not become holy and immune from errors and weaknesses" (১৯১৬)। অন্যত্র—"Undoubtedly, we have done, and will do in the future, an enormous number of absurd things" (১৯২২)

সমাজবাদী সমালোচক আজ যদি মনে কবেন চেকোস্লোভাকিযায সোভিযেট সৈন্যপ্রেবণ ভ্রান্তনীতিব পবিচাযক, তবে তাঁকে মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্র বিবোধী বলে চিহ্নিত কবা চলে না, বিতর্কেব পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁব অবশ্য প্রাপ্য। ববং এতে প্রমাণ হয তিনি সোভিযেট বাশিযাব মহান ঐতিহ্য, মহৎ কীর্তি, নীতি-পবিবর্তনেব বিপুল শক্তিতে বিশ্বাসী। নয তো' মার্কসবাদেব পবিপ্রেক্ষিতে সমালোচনা নিবর্থক। বুর্জোযা সমালোচনা থেকে এখানে মৌলিক পার্থক্য বযেছে।

বিপ্লবেব পথ নিঃসন্দেহে দুর্গম। সেই জন্যই মুক্ত মনে বিচাব প্রযোজন, অন্যথা বিচাবেব কোনও অবকাশ থাকত না। বিপ্লবেব পথ নিশ্চিতই "গোটা ঐতিহাসিক অধ্যায"-ব্যাপী পতন-অভ্যুদয-বন্ধুব কার্যক্রম। সেই জন্যই সব সময এক কর্মসূচী চলে না, পবিবর্তনেব-ও দবকাব আসে। বিপ্লবেব পথ নিশ্চয "নেভ্স্কি প্রসপেক্টেব মতন একটা সোজা সডক নয।" সেইজন্যই খোলা বাস্তায ট্যাঙ্ক চালালেই সব সমস্যাব সমাধান হয না।

৬ই অক্টোবব ১৯৬৮

বন্দুক

অজিত মুখোপাধ্যায

বাসেব ইঞ্জিনেব শব্দ কানে ঝাঁ ঝাঁ কবে বাজল বাস থেকে নেমে কিছুদূব এগিযে যাওযা পর্যন্ত। তাবপব গ্রাম্য নিস্তব্ধতাব পবিচিত আবহাওযা ঘিবে ধবল অবনীকে। কী শাশ্বত স্তব্ধতা। অবনী বেশ খুশি হযে উঠল। অথচ খুশি হওযা এখন মোটেই উচিত নয। যে-বাডি থেকে সে স্বেচ্ছায পীডনেব চাপ সহ্য কবতে না পেবে পালিযে বেঁচেছিল সেখানে ফিবে যাওযায আব যাই কিছু থাকুক আনন্দ নেই। আছে আবাব পীডনেব মুখোমুখি হবাব আতঙ্ক।

তবু অবনী খুশিব হাত থেকে নিজেকে এডাতে পাবল না।

এই সব বাস্তা খুলা খন্দব উপব তাব পাযেব ছাপ খুঁজলে এখনো পাওযা যেতে পাবে। ঘোষদেব বাঁশঝাডে অবনীব নিজহাতে কাটা বাঁশেব গোডাটা তেমনি ঠুঁটো। গোডাতে হাত বুলোল। পিসিব বাডিব দক্ষিণ দিকে যে পেযাবা গাছটা লাগিযেছিল সেটাতে ফুল এসেছে। গাছটাকে জডিযে দাঁডাল। বোদ্দুবেব তাতে গাছটা এখনো গবম। একপাল হাঁস তালপুকুব থেকে উঠে কুটিব পুকুবেব দিকে প্যাঁক প্যাঁক শব্দে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে চলেছে। ওই যে অবনীব কালিহাঁস। হাঁসটা অবনীব এত প্রিয ওব ডিম খেতে দিত না কাউকে। কালিহাঁসেব সব কটা ডিমেব বাচ্চা ফুটোনোব চেষ্টা কবেছে অবনী।

কালিহাঁস হঠাৎ ঝাঁক থেকে বেবিযে এসে অবনীব পাযেব কাছে ঠোঁট ঘষতে লাগল। ওকে কোলে তুলে নিল।

চোখে জল এসে গেল।

এখানকাব সঙ্গে তাব আশৈশব সম্পর্ক—ঘনিষ্ঠ। এখানকাব মাটি গাছ ডাঙা ঘব মানুষ পশু সবাইকাব সঙ্গে তাব ভাব। কিন্তু এখানকাব জীবন তাব সহ্যাতীত। এটা যে পিসিব গাঁ পিসিব ঘব। নিজেব ঘব কবে পডে গেছে নিজেদেব গাঁযে। বাপমাকে সে কবে ছোটবেলায হাবিযেছে।

কালিকে বুকে চেপে ধবে অবনী আবাব ভাবল। এখান থেকে আবাব পালাবে কিনা। কিন্তু বাইবেব জগতও সমান কঠোব। সেখানে এব-তাব

তুষাবে পড়ে থেকে, উঞ্ছবৃত্তি কবে কাটাতে ঘেন্না ধবে গিয়েছিল। আজ কারুব স্নেহ-মাযা-মমতা মেলে. তো কাল গলাধাক্কা। আজ বিবাট বাড়িব বৈঠকখানায তো কাল ফুটপাতে। মনঃপূত মনিব মেলে তো পার্শ্বচর মেলে না, পার্শ্বচব মেলে তো মনিব মেলে না।

কষ্ট যখন ঘবে আসে পিসিব ঘবে ও বাইবে প্রায এক প্রকাব তখন পিসিব বাড়িতেই ভালো।

গঞ্জনা মাব চাবুক সব সহ্য হযে গেছে অবনীব। এখন বাকি আছে তাকে খুন কবে ফেলা। দাদা যদি ওকে খুনই কবে ফেলে তাহলে তো আব যন্ত্রণা সহ্য কবার জন্য দেহটা জ্যান্ত থাকছে না।

দাদা তাড়িযে দেবে না। ভাতেব অভাব নেই। ফেলা ছড়া ভাতেই অবনীব চলে যাবে।

এবাবে ওদেব মতে চলবে ভেবে এসেছে। ওবা যা বলবে তাই কববে। মজা হল এই যে ওদেব কথামত কাজ কবতে গিযে যখন অঘটন ঘটে দোষ চাপে অবনীবই কাঁধে। অবনী ওদেব স্মবণ কবিযে দেয ওবা আবও বেগে ওঠে। অবনীব কপালে জোটে নির্মম তাড়না। সেই জন্য অবনী দেখেশুনে ওদেব কথামত কাজ কবতে চাইত না, সব ব্যাপাবে নিজেব গোঁ খাটাত।

পিসিব বাড়িতে বাস কবেও অবনীব একগুঁযেমিটা গেল না। সব শুনে নিজেব মতে কাজ কবে ও আনন্দ পায। কাজেব সুফলে প্রশংসা জোটে না। কুফলে জোটে শাস্তি। তবু আনন্দ পায অবনী। নিজেব মতে কাজ কবে কতবাব সে সফল হযেছে হিসেব কবে যখন ছাখে শতকবা পঞ্চাশটিব অনেক বেশিবাব সে বিজযী, তখন নির্মমতম তাড়না মুখ বুজে সহ্য কবে।

এবাব ঠিক কবেছে স্বমত সে বিসর্জন দেবে। বহুরূপীব মত ক্ষণে ক্ষণে ওদেব বঙে বঙ পালটাবে।

কিন্তু পাববে কি? নিজেকে নিজেই বিশ্বাস কবতে পাবছে না। বাইবেও কোথাও নিজেব মত-জাহিব-কবা স্বভাব বিসর্জন দিতে পাবে নি। স্বভাব কি কেউ একেবাবে পালটাতে পাবে?

ঘন সন্দেহ সত্ত্বেও অবনী নিজকে মনে মনে ধমকায।

সোজা পিসিব পাযে পড়ে যাবে। দাদাব দু'পা জড়িযে ধববে, লগিন্দ চবণ জোব লাথি কষবে। অবনী মাটি আঁকড়ে শুযে থাকবে।

মহুডা দিযে চলেছে সেই কলকাতা থেকে।

দুয়ার গোড়ায় আর পা সরছে না তাঁর।

নাঃ মনে মনে গাল দিল লগিন্দকে। ও শালার গোদা পায়ে জিভ দিয়ে চাটতে পারবে না।

কালিটা ঠোঁট দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে গলায়। গা শিরশির করে উঠল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি দু ঠোঁট দিয়ে চেপে চেপে ধরতে লাগল কালি।

রোমাঞ্চকর অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল অবনীর গোটা শরীরে।

ভারি সদর দুয়ারটা ঠেলে কালিকে বুকে ধরে ভিতরে ঢুকে পড়ল অবনী।

পিসি রান্নাচালার ছাঁচতলায় এক তাড়া শুকনো কুচা ঝাড়ছিল।

লগিন্দ প্রায় এক জাঙ উঁচু শান বাঁধানো রোয়াকে নতুন চকচকে বন্দুকটা দেখাচ্ছিল শান্তিকে মানে বৌদিকে। দুজনেই অবনীকে দেখে ক্ষণিকের জন্য সংশয়ান্বিত হল।

অনেকদিন আগে থেকে বন্দুক নেবে বলে লগিন্দ জল্পনাকল্পনা করছে। নিজের মনেই নেবে কি নেবে না এই তোলাপাড়া চলছিল। বন্দুক ঘরে আসা মানেই তার ঘরে ঐশ্বর্য উপচে পড়ছে একথা সশব্দে ঘোষণা করা। কিন্তু মা লক্ষ্মী ঘরে যতই হাত-পা ছড়িয়ে বসছেন, লগিন্দ ও শান্তির মনে ভয় ততই বেড়ে চলেছিল। ক্রমাগত মানুষ—বিশেষ অভাবী মানুষের হিংস্রতার ক্রিয়াকলাপ বেড়ে চলেছে চারিদিকে। কোথায় বুড়ো বুড়িকে পর্যন্ত ছেঁচে ছেঁচে মেরে ডাকাতরা যাবতীয় ধন-সম্পত্তি লুট করে নিয়ে গেছে। বাড়িতে একটা বন্দুক থাকলে কত সাহস কত ভরসা। সেই বন্দুক আজ সদর থেকে নিয়ে এসেছে লগিন্দ। বন্দুক বাগিয়ে ধরা টোটা ভরা ঘোড়া টানা ও ফায়ার করার কৌশল শেখাচ্ছে শান্তিকে। শান্তি তো ভয়েই সারা। মাঝে মাঝে অস্ফুট আর্তনাদ করছে। জীবনে কখনো কাউকে লাঠিপেটা করেছে কিনা যার মনে নেই তার হাতে বন্দুক কি সহজে গর্জাবে।

লগিন্দ বলল, বুকে ঠেকিয়ে—নাইলে হাড় কখান ভেংগে যাবেক।

শান্তি প্রথামত বাগিয়ে ধরতে না পেরে ঠকাস করে রোয়াকে ফেলে দিল নতুন বন্দুকটা। লগিন্দ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল। বন্দুকটা তুলেই কোঁচা বুলিয়ে আঁচড়ের দাগ মুছতে লাগল।

অজস্র গালাগাল দিল লগিন্দ, মা ও মামাত ভাই অবনীর সম্মুখেই।

শান্তি হাসছে। না হেসে তার উপায় নেই।

শান্তি বলল, নিজে ধর দিকি।

পাখি মারার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বন্দুকটা ধরল লগিন্দ কিন্তু তার হাত এক মিনিট স্থির থাকছে না। মাত্রাছাড়া মদ খেয়ে স্নায়ুমণ্ডলীতে ভারসাম্যের অভাব ঘটেছে।

বাইরে সজনে গাছের ডগার দিকে বন্দুকের নল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাঁপতে কাঁপতে বন্দুকের নলটা নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে, অর্থাৎ শান্তির বুকের সোজাসুজি।

সঙ্গে সঙ্গে শান্তির মুখের রং বদলে গেল। হঠাৎ সে লাফ দিয়ে সরে গিয়ে বন্দুকের নলের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে আঁকড়ে ধরল নলটা।

বলল, দাঁতে দাঁত চেপে, তাইলে বড় মজা, না?

আধ বুড়ো লগিন্দ এখনো গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে কাটায়। তার অন্যতম কারণ শান্তি নিজেও। পুরুষের বারমুখীনতা শান্তি সইতে পারত না কোনোকালে। লগিন্দকে বুকে টেনেও নেবে, মুখে নিন্দে করতেও ছাড়বে না। লগিন্দ ছাড়া অন্য পুরুষের চিন্তা করতে পারে না শান্তি। কোনো প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতাও নেই। রাস্তাও জানা নেই। আগে মাঝে মাঝে অসহযোগ প্রকাশ করত যখন তাদের একমাত্র ছেলে মধু কয়েক বছরের। প্রায় দু বছর শান্তি অসহযোগ চালাতে পেরেছিল। হয়তো এই অসহযোগের ফলেই পরবর্তী কালে ওদের তিন-তিনটি মেয়ে জন্মাল পরপর। শান্তি স্বামীকে তার অধিকার থেকে চিরকাল বঞ্চিত করতে পারল কই! বরং ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় কাউকে জ্বালাতে না পেরে নিজেই পুড়ে চলল।

লগিন্দ বলল, কী ভাবছ! তুমাকে মাত্তে পারি। তুমি গিরস্থের লখ্‌খী।

শান্তির চোখে প্রগাঢ় ভয়। ভয়টা মুহূর্তে থিতিয়ে ফেলল শান্তি। লগিন্দর কাছে এগিয়ে গিয়ে কানে কানে বলল, তুমার হাত থির রইছে না যে গো! বন্দুক লিয়ে কী করবেক?

লগিন্দ সশব্দে ধমকাল।

শান্তি বলল, দাও দেখি—

লগিন্দ বন্দুকটা পেছন দিকে ঘোরাতেই ওদিক থেকে পিসি মানে কাতু রান্নাঘরের কপাট ভেজিয়ে দু হাতে দুটি পাট ধরে কেঁপে উঠল।

যত দিন যাচ্ছে মৃত্যুকে তত ভয় কাতুর। জ্যোতিষী দেখলেই হাত দেখাবে আর জিজ্ঞেস করবে, কবে যাব বল দিকি? সত্তর বছর বয়স চলছে

কাতুব। যে-ই শুনবে তাব পবমায়ু একশো বছব, বাঁধানো দাঁতগুলি সব বেবিয়ে পডবে। —কত কষ্ট যে কপালে আছে!

লগিন্দ শান্তি ও মধু তিনজনে মিলে কাতুব নামে যত সম্পত্তি আছে সবগুলি মধুব নামে দানপত্র লিখে দিতে চাপ দিচ্ছে কাতুকে। কাতুব ছটি মেযে। সবাই ছেলেপিলেব মা হয়ে শ্বশুবঘব কবছে। যদি তাবা মাযেব সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে আসে।

কাতু দানপত্র লিখে দিতে বর্তমানে বাজি নয। মবতে তাব এখনো দেবি আছে, অনেক দেবি। সম্পত্তিটুকু লিখে দিক, আব পবদিন থেকেই তাকে সবাই হেনস্থা করুক। হেনস্থা সহ্য কবা কাতুব পক্ষে অসম্ভব, বিধবা কাতু সুদীর্ঘ কুডি বছব এ সংসাবেব কর্ত্রী। ববং তীর্থে তীর্থে পথে পথে ঘুবে বেডানো অনেক সহজ।

কাতুকে মেবে লগিন্দব লাভ নেই। বুডি মাকে মাবাব মত কোনো অবস্থাও সৃষ্টি হয নি। তবু কাতু কাঁপতে লাগল তাব দিকে বন্দুকেব নলটা স্থিব দেখে।

শান্তি হঠাৎ বন্দুকেব নলটা হাতেব কাছে পেযে চেপে ধবল বাঁ হাতেব মুঠোয।

ঘবেব ভিৎবেই তুমাব হাত কাঁপছে। লোকেব চিচ্‌কাব শুনলে ইটা তুমাব হাতে বইবেক?

বন্দুকটা কেডে নিল শান্তি।

লগিন্দ কযেক পা পেছিযে গেল।

শান্তিব কাঁধ থেকে আঁচল সবে গেছে। খালি গা। হাঁটু গেডে বসে ঠিক দূবেব বাঘ-মাবাব ভঙ্গিতে বন্দুকটা কণ্ঠনালীব নিচে ঠেসে ধবল শান্তি। ওব হাঁটুব উপব কনুই, হাতেব চেটোব মধ্যে বন্দুকেব নল।

প্রথমে টিপটা থাকল খেজুব গাছেব মাথায, তাবপব, ছাতেব কার্ণিশে, তাবপব বান্নাঘবেব চালায, বান্নাঘবেব কপাটে, কাতু কপাটটা একেবাবে বন্ধ কবে চেপে ধবল, তাবপব লগিন্দব দিকে।

চেম্বাবে টোটা ভবা আছে। ঘোডা টানা ছিল না, কাতু নলটা স্থিব বেখেই ঘোডা টেনে দিল।

বলল, এত্‌খুন মিছামিছি ভযেই মবাছলম।

সজোবে কযেক হাত উঁচু লাফ দিযে লগিন্দ দালানে ঢুকে পডল।

হেসে উঠল অবনী। কুযাতলাব কাছে থমকে দাঁডিযে অবনী মজা দেখছে। তাকে নিযে এবা পডে নি বলে হাঁপ ছেডে বেঁচেছে। কালিব পিঠে গভীব সোহাগে হাত বুলোচ্ছে আব বন্দুকটাব খুঁটিনাটি তীব্র নজবে লক্ষ্য কবছে।

বৌদির চোখমুখে এমন একবাশ আলোব ছটা আগে কখনো ত্মাখে নি অবনী।

লগিন্দ অথবা কাতুও না।

দীর্ঘ তেইশ বছবেব দাসিত্বকে শান্তি যেন একটি মাত্র গুলিতে শেষ কবে দিতে পাবে। কী দৃঢ হাতে ধবেছে বন্দুকটা।

শান্তি নিজেও অবাক হযে যাচ্ছে। জাঁদবেল শাশুডি ও দশটা গাঁযেব জববদস্ত মোডল তাব স্বামীব চোখেব সামনে, অথচ সে দাসী নয, ববং যেন ওদেব কর্ত্রী।

সবাব মনেই কি নিজেকে প্রকাশ কবাব অসীম ক্ষমতা থাকে? যতই পীডিত পদদলিত হোক মানুষ, তাব হাতে শক্তি তুলে দিলে মনেব শক্তিটা অক্ষত অবস্থায বেবিযে এসে বাইবেব শক্তিব সঙ্গে হাত মেলাতে পাবে? এখন নিজেকে কেমন অসমসাহসী, যে কোনো কিছুকে তুচ্ছ কবাব যোগ্য মনে হচ্ছে। মা দুর্গাব মত সুখে সুখী মনে কবছে শান্তি নিজেকে।

নলটা ঘুবছে। চক্রাকাবে।

কালিহাঁসেব সঙ্গে মিলল নলেব ডগাব মাছিটা।

কুযাব পেছনে হটতে লাগল অবনী। কালিহাঁসটাকে শান্তি কোনো দিন দেখতে পাবে না। কাবণ ওটা অবনীব প্রিয। অবনী শান্তিব চক্ষুশূল, শুধু শান্তিব কেন, লগিন্দব, মধুবও।

শান্তি, খিলখিল কবে হেসে উঠল।

কালিহাঁসটাও বোধহয প্রাকৃত চেতনায অবনীব কোলে ছটফট কবে উঠল। পা ছুঁডতে লাগল। হয তো কোলে আটকা থাকাব অভ্যেস নষ্ট হযে গেছে অবনীব সাতমাস অনুপস্থিতিতে। হয তো বাৰুদেব গন্ধ পেযেছে পাখিটা।

লাফ দিল কালি ছটফটিযে উঠে। উডে গিযে বসল কযেক হাত দূবে। ছুটে গেল অবনী কালিব পিছু পিছু।

বন্দুকেব নল কালিকে লক্ষ্য কবে সবছে।

কাতু আর রান্নাঘরে থাকতে পারল না, উঠোনে বেরিয়ে এল। কালির দিকে নল কিন্তু কালির কাছেই অবনী। কী ঘটতে কী ঘটে। মনে পাপ আর হাতে অস্ত্র থাকলে মানুষ কী করে বলা যায় কি।

দৈবাৎ বলেও একটা কথা আছে।

কালিকে শান্তি গুলি করবে ভাবাই যাচ্ছে না, হয়তো সত্যি সত্যি শান্তি নিছক মহড়া দিচ্ছে।

কাতুর বুক ধড়ফড় করছে তবু। মন মানছে না।

বন্দুক এ বাড়িতে প্রথম। বন্দুক হাতে নিলে মানুষের মনের ভিতরে কী ভাবান্তর ঘটে সে সম্বন্ধে কারু ধারণা নেই। সবাই খারাপ দিকটাই ভেবে চলেছে।

কালিকে আবার কোলে তুলে বন্দুকের দিকে তাকিয়ে অবনীর পা নিঃসাড় হয়ে গেল।

বন্দুকের কানা চোখটা তাকে দেখছে।

শান্তি এবার উচ্চগ্রামে হেসে লুটিয়ে পড়ল।

হাসি থামলে বলল, এস গো, ঘোড়াটা নামিয়ে দাও।

লগিন্দ নকল সাহসের ভঙ্গি দেখিয়ে রোয়াকে বেরিয়ে এল। ধীরে ধীরে ঘোড়াটা নামাল অনেক কসরতের পর।

বৌদির হাতে ধরা বন্দুকের ছবিটা অবনীকে বড় আনন্দ দিল। মিনমিনে মেয়েটি যেন ঝাঁসীর লক্ষ্মীবাঈ হয়ে গেছে।

পিসি আড়ালে ডেকে পিঠে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল কোথায় ছিল অবনী, কেন আবার মার খেতে সেখান থেকে ফিরে এল। পিসি খুশি হয়েছে অবনী ফিরে আসায়। অক্ষম মমতাটাও মাঝে মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে। বাইরের স্বাধীনতাতেই তো অবনী ভালো ছিল। কেন, কেন ফিরে এল ছোঁড়াটা।

এই বাড়িতে অবনীর চোখ ফুটেছে। লগিন্দর বাড়িঘর জিনিস-পত্র জমিজমা সবগুলির সঙ্গে তার শৈশব সংশ্লিষ্ট সম্পৃক্ত। এই সবে যে তার অধিকার নেই, সে জ্ঞান অবশ্যই হয়েছে খুব কম সময়ের মধ্যে। কিন্তু এখানেই যে তার জ্ঞানের আরম্ভ ও স্বপ্নের বিস্তার, এ গ্রামের মাধুর্য ও কুশ্রীতা দুটিতেই সে যুগপৎ মোহাবিষ্ট। লগিন্দর সব কিছুতে হাত দিয়ে অনেক ধমক, অনেক শাসন শুনে শুনে কানে কড়া পড়ে গেছে। এই সবকিছুর সঙ্গে তার কোন অধিকারের সম্পর্ক না থাকলেও এদের সুখ দুঃখ এদের উত্থান-পতন প্রভৃতি

সমস্ত ব্যাপারে নিজেকে অবিচ্ছেদ্য ভেবেছে। এখানকার তুচ্ছ দৃশ্যেও অবনীর গভীরতম সুখ, ভোরের বর্ণান্তর দেখলে তো অবনী আর কিছু চায় না জীবনে। বরাবর ওর মন বলে এসেছে এত সব আছে, কেন তার এতটুকু দাবি নেই?

পিসা বিহারে চাকরি করত যখন, তখন মাঝে মাঝে অবনীর বাবাকে পাঠাত সঞ্চয়ের টাকা। সে টাকায় পিসার নামে জমি কিনে দিয়েছে অবনীর বাবা। একটার পর একটা জমি জমা সম্পত্তি। একেকটা জমি ডাকলে সাড়া দেয়। অবনীর বাবা আদ্যা চাষী। পিসার একটি কাণা-কড়ি পর্যন্ত এদিক-ওদিক করেনি। পিসা মরল, পিসি ছ মেয়ে ও ছেলে বউ নিয়ে এখানে এল। ছ মেয়ের বিয়ে দিয়েছে পিসি, এত বড় সংসার চলেছে, তবু বছর বছর জমি বেড়েছে, সব জোগান দিয়েছে অবনীর বাবার হাত দিয়ে কেনা সম্পত্তি। অবনীর বাবা মরল। মা মরল বছর খানেক বাদে। অবনীর নামে এক ছটাক সম্পত্তি রেখে যায়নি ওর বাবা। দোষ বাবার নয়, লোকটার কোনদিনই কিছু ছিল না। কোন রকমে সংসারটি চালিয়ে গেছে খেটেখুটে। পিসি অবনীকে মানুষ করার ভার নিল কিন্তু লগিন্দ শান্তি ও মধুর দুর্ব্যবহারে অবনী অতি শৈশবেই স্কুল ছাড়ল, বিনি মাইনের মুনিষ খাটতে লাগল পিসির ঘরে।

লগিন্দর বাপুতি সম্পত্তির গোড়ায় তো অবনীর বাবা। অবশ্য সেই সুবাদে নয়, স্বাভাবিক মানুষ হবার সুবাদেই অবনী লগিন্দর সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে অবিচ্ছন্ন ভেবে এসেছে অজ্ঞাতসারে।

ভাবলেই তো আর কাজে হয় না।

সব ভাবনাই তো আর কাজে করা যায় না। সহজে।

ভাবনা কাজে দেখাতে গিয়ে অবনীর খালি পিঠ ফেটেছে কঞ্চিতে অনেক বার।

লাঙলের বোঁটা ধরতে অবনীর কোনো দিনই ভালো লাগে না। ইদানিং অবনীকে দিয়ে চাষ করাবার মতলব ভেঁজেছিল শান্তি। প্রায়ই গজর গজর করত, হয় ঝাঁঝি নয় নোয়ান নয় সোলু জমির রাত কেটে যাচ্ছে বলে। বর্ষা যখন সম্যক তখনও নাকি সোল জমির রাত কেটে যাবার ভয়। ঘরে চার লাঙলের চাষ, পাঁচটা থাকলেই ভাল। পাঁচ লাঙলের চাষ আসলে চার লাঙলে তোলা হচ্ছে। বাড়তি লাঙল হেলে মোষ সবই আছে। সুতরাং কেন অবনী এটা সেটা বাজে কাজে সময় নষ্ট করে। বাপ-দাদা-ঠাকুর্দা যখন চাষী তখন সে কী এমন লাট সাহেব, লাঙলের বোঁটা হাতে ধরলে ফোস্কা পড়বে।

, অবনীকে আস্থা সোলে শান্তি পাঠাল একদিন, বলল, যাও, যোগ প'ডেছে, বন্ধ কবে দিযে কযে এস।

কযেক মিনিটেব মধ্যে অবনী পালাল ছ মাইল দূবে গডবেতা। ফিবল বাত দশটায। পিঠে কঞ্চি ভাঙল লগিন্দ।

যে কোন ছোটাছুটিব কাজ অবনী পলকে মেবে ফেলবে, কিন্তু চাষবাসেব কাজ তাব দু চোখেব বিষ।

বিষ হোক আব যাই হোক মুখেব কথা শুনতে হবে। যতক্ষণ তোমাকে এ বাডিতে ফিবতে হবে থাকতে হবে খেতে হবে ততক্ষণ এ বাডিব আদেশ অক্ষবে অক্ষবে পালন কবতে হবে।

সাত মাস বাদে অবনী ফিবে আসায লগিন্দ ও শান্তি প্রকাশ কবল কপট বাগ। মুখে গালাগাল দিল অকথ্য, মনে কিন্তু খুশি। অবনীব কাজকর্ম সাবতে দুটি বাডতি লোক হিমসিম খেযে যাচ্ছে। কালই তাদেব জবাব দেওযা হবে।

ঘসব-ঘস খড কাটিল অবনী, ডাবায খোল জাব দিল, জল দেখাল পঁচিশটা গৰু মোষকে। মাত্র এক ঘণ্টায।

ডোবাব ধাবে এসে দাঁডাল , ধুলোব ঝড বইছে তাল গাছেব সাবিতে, তাব জোব শব্দ, আকাশে একবাশ কৃষ্ণপক্ষেব তাবা, মাঝে মাঝে তাবা খসছে। কোথাও দূবে বৃষ্টি হযেছে। গবম হাওযাব সঙ্গে মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওযা বযে এসে লাগছে গাযেব ঘামে।

কেন ফিবল এই শাসনেব বাজত্বে, এই ডোবা এই তালগাছ ওই বাস্তাটাব জন্য ? এই বকম গাছ মাটি বাস্তা আকাশ তো সর্বত্রই।

আশু পোডেব মেযে শুঁটিব জন্য ? ওব তো কবে বিযে হযে গেছে। শুঁটিব ববটা এক বাতও ছেডে থাকতে পাবে না শুঁটিকে। বাপেব বাডি আসা শুঁটিব প্রায বন্ধ।

তবে কিসেব জন্য এই বর্বব গ্রামে ফিবে আসা ?

মোহিনী কলকাতাব পাযেব ধুলোয বসে প্রাণত্যাগ কবা কি এই গাঁযে পডে থেকে মাব খেযে মবাব চাইতে শ্রেয ছিল না ?

দোতলায পশ্চিমেব ঘবে শুযে ঘুম এল না অবনীব। বিডিব তাডা আব দেশলাই নিযে দোতলাব ছাতে উঠে এল। পাযচাবি কবল, ছাতেব মধ্যেকাব, হাঁটু সমান উঁচু পাঁচিলেব আডাআডি জাযগায বসল আব বিডিব পব বিডি

ফুঁকল। শালা লগিন্দ বেশ সুখে আছে, না আছে খাবার চিন্তা, না আছে পয়সার। ঘরে একজনের পাশে শুচ্ছে তো বাইরে দশজনের। কোনদিন লোকটার একটা ভারি রোগ হতে দেখল না অবনী। যকের মত সম্পত্তি লগিন্দর। খেতে মাত্র কটা পেট। উত্তরাধিকারী কেবল মধু। লগিন্দ প্রথম যৌবনে ঠিকাদারি করে কিছু টাকা লোকসান দিয়েছিল। কিন্তু গত দশ বছর থেকে যা ধরছে সোনা হয়ে যাচ্ছে। দশ হাজার টাকার আলু প্রায় লাখ টাকার কাছাকাছি করে দিয়েছে কোল্ড স্টোরেজ। এ বছর ডাঙা চায করার জন্য পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করে কুয়া কাটিয়ে পাম্প বসিয়েছে। একশো বিঘে তার এলাকা। লালচে ডাঙা এবার চিরসবুজ থাকবে।

কোনো—কোনো অভাব নেই। লগিন্দর সংসারটাই বোধহয় স্বর্গ, অন্তত অবনীর জ্ঞানের মাপকাঠিতে। বোধহয় এই স্বর্গের অজ্ঞাত টানেই অবনী কলকাতা থেকে ছুটে এসেছে।

অবনী ভাবল পৃথিবীতে তো কত অঘটন ঘটে, কলেরা আছে ভূমিকম্প আছে, আছে আরও কত কী। সে সব কিছুর একটা এখানে হয় না কেন। কেন রাতারাতি ঝটাঝট মরে যায় না লগিন্দ শান্তি আর মধু।

মধু তো এখানে থাকে না। থাকে কলকাতায়। পড়ে এম-এ। দু জায়গায় একসঙ্গে কলেরা বা ভূমিকম্প হবে কী ভাবে।

মধু এখানে আসে ছুটি ছাটায়। তখন হোক প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড।

রাত্রি বাড়তে বাড়তে কোথায় এসে ঠেকে খেয়াল নেই। বিড়ির বাণ্ডিলে যা ছিল খতম। মাথাটা ঠাণ্ডা হল না।

একলা একটা জীবন নিয়েও কত দুশ্চিন্তা। মাথার উপর ঘননীল আকাশে কত তারা, নিচে ক্রোশের পর ক্রোশ রাত্রির গভীরতা। কোটি কোটি প্রাণীর সাড়া এখন অপ্রকাশ্য। বোধহয় তাদের জীবনেরও অবনীর বুকের মত বেদনা। সুস্থভাবে প্রকাশের। সুস্থভাবে প্রকাশের স্তরে স্তরে কত বাধা কত আঘাত কত প্রতিযোগিতা কত খুনোখুনি। অথচ সবাই চায় একমাত্র জিনিস, সুস্থভাবে জীবনের প্রকাশ। কিন্তু এই ব্যাপারটা কি সবাই মিলে তৈরি করা যায় না।

কেন যায় না অবনীর মাথায় ঢোকে না। কেন একজন আরেক জনকে অকরুণ তাড়না করে পীড়ন করে বোঝে না সে।

দূরে উত্তরদিকের শালবনের কোলে একটা বড় আলো চোখে পড়ল

অবনীব। কিছুক্ষণ গভীব মনোযোগে ওই দিকে চেয়ে থাকল। ক্রমশই একটা আলো দুটো হল তিনটে হল পাঁচটা হল। অবনীব বুকটা কে যেন চেপে ধবল দারুণ অশুভ চিন্তায। দেখা না থাকলেও ওই আলোব মানে জানা আছে।

দ্রুত পায়ে দোতলায় এসে দাদাব ঘবে জোব ধাক্কা মাবতে যাবে, ভিতবে হাসিব শব্দে থেমে গেল। গ্রামেব বেওযাজ ঘবে লণ্ঠন জ্বেলে শোযা। ঘব তাই আলোকিত। দবজাব ফাটলে চোখ বাখল অবনী।

শান্তি বিস্রস্ত বসনে লগিন্দব হাত থেকে পালিযে পালিযে বেডাচ্ছে ঘবময। বলছে, যাও না লাযেক পাডাকে যাও।

ইতস্তত কবতে লাগল অবনী, অথচ একতিল অপেক্ষা চলে না। দবজায় আঘাত হানতে যাবে, লগিন্দ শান্তিব শাডিটা ধবে হেঁচকা টান দিযেছে। শান্তি পডতে পডতে খাটেব প্রান্ত ধবে বেঁচে গেছে। পুবো শাডি লগিন্দব হাতে। খাট ধবে উবু হযে হাঁপাচ্ছে শান্তি, তাব চাইতে বেশি হাঁপাচ্ছে লগিন্দ নিজে। ও মেঝেতে বসে পডেছে। কযেক মিনিট পবেই অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটল। শান্তি হঠাৎ ছুটে গিয়ে লগিন্দব গলা জডিযে ধবল এবং কী হাসি।

ঘেন্নায় গা কুঁকডে গেল অবনীব।

সজোবে কিল মাবল দবজায।

বিবক্ত কণ্ঠস্বব ভেসে এল ভিতব থেকে, কে ব্যা।

দাদা, ডাকাত—

কী, কী বলচু।

দবজা খুলে দিল লগিন্দ কযেক মিনিট বাদে। চোখেব কোল তেলঘামে চিকচিক কবছে লগিন্দব, শান্তিবও, বোঝা গেল দুজনে অনেকক্ষণ আগে থেকেই ছোটাছুটি কবছে।

লগিন্দব চোখ অস্বাভাবিক ঘোলাটে। মুখেব মোটা দাগালো চামডায় ভয় থব থব কবছে। ভকভক গন্ধ বেবোচ্ছে মুখ থেকে।

কী বলচু। তোতলিয়ে প্রশ্ন করল লগিন্দ।

ডাকাত গো দাদা।

বিডবিড় কবে বলল লগিন্দ, আজই বন্দুক আনলাম, আজই শালাব ডাকাত।

লিবে লিবে ইটাই জানে, শান্তি বলল, কবে লিচ্চ সেটা কেউ জানে নি।

শান্তি শাডিটা পবেছে লডাইযে যাবাব ভঙ্গিতে।

কপাট ধবে লগিন্দ বলল, খোলটা লিয়েস।

শান্তি অবনীকে আদেশ দিল।

থুতনিতে ঘামেব ফোঁটা নামছে লগিন্দব, চোখে কেমন শূন্যতা ঘনিয়ে এসেছে। অনেক দিন আগে থেকে শুনে আসছে তাব বাড়িতে ডাকাত পড়তে পাবে যে কোনো বাতে। তাহলে আজ সত্যি সত্যি পড়ল।

পড়ুক। সে তো সাবধান হয়েই আছে। ভগবানেব অসীম কৃপায বন্দুকটাও পেয়ে গেছে।

নাটকীয় কায়দায লগিন্দ কালীব ফটোব উদ্দেশ্যে প্রণাম কবে চেঁচিয়ে উঠল।

এ যাত্রা কোনো বকমে বাঁচলে হয়, আব এ গাঁয়ে এক মাসও বাস কববে না লগিন্দ। শহবে উঠে যাবে। শহবে কত বড লোক। কই ওখানে তো ডাকাতি ফাকাতিব কথা আকচাব শোনা যায না। ওখানে যে ঘবে ঘবে বন্দুক বাস্তায বাস্তায পুলিশ। বছবে একশো লোককে পালন কবাব ক্ষমতা এ গাঁযেব মধ্যে কেবল লগিন্দব। শহবে তাব মত মাতব্বব গলিতে গলিতে। এখানে প্রাণ ফাটিযে চেঁচালেও বাতে তাব সাহায্যে কেউ বেবোবে না। সবাই হিংসায জ্বলছে। লগিন্দব মত তোবাও খেটেখুটে অবস্থা ফেবা না, কে ধবে বেখেছে তোদেব। নিজেব ভালো কবাব চেষ্টা নেই কাবও, অন্যেব মন্দ কবাব ফিকিব সদাসর্বদা। কত মাথা খাটিযে বাপুতি সম্পত্তি বজায বেখেছে লগিন্দ, বাড়িযেওছে। বুকেব জোব হাতেব জোব আব মাথাব জোব থাকলে মানুষ কী না পাবে।

অবনী বন্দুকেব খোলটা বযে নিযে ঘব থেকে বাবান্দায এল। টলতে টলতে এগোল। লগিন্দ অবনীব কাছে।

প্রাণেব ভিতব থেকে শক্তি সংগ্রহ কবে লগিন্দ প্রশ্ন কবল, কুথাকে কুন দিক বাগে?

অবনীকে জবাব দিতে হল না। গুনতিতে চোদ্দটা আলো উত্তব দিল উত্তব দিক থেকে। সেই আলোগুলো কখন চোদ্দটা হযে গেছে কেউ খেযাল কবে নি।

ভযেব মধ্যেও লগিন্দব চোখ জ্বলে উঠল। শালাব হিংসা, ভাবল লগিন্দ। তাব সুখ তাব ঐশ্বর্য তাব আনন্দেব দিকে দুনিযাব লোভ ঝাঁপিযে পড়াব জন্য ওঁৎ পেতে আছে। তাব প্রাণটাই যেন সকলেব দবকাব। তাব জীবন সকলেব কাছে মধুমাখা, এটাকে চেটে শেষ কবতে পাবলেই সকলেব স্বর্গলাভ।

খোলটা বন্দুক থেকে খুলে ফেলল লগিন্দ নড়বড়ে হাতে।

বন্দুকে টোটা ভরল দীর্ঘ সময় ধরে।

চৌদ্দটা আলো ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে। বাড়িটাকে গোল হয়ে ঘিরবে। বেটারা কী নিঃশব্দ। লগিন্দ জানে, আলো চোদ্দটা কিন্তু লোক আছে হয়তো চৌত্রিশটা। আর প্রত্যেকেই আজ নৃশংস খুনী। প্রতিবাদ করলেই বড় বড় ধারালো সান্‌দা বা কঁ্যাচার আঘাত। কোনো কোনো দলের মধ্যে বন্দুক পর্যন্ত থাকে।

কাতুও আচমকা ঘুম থেকে উঠে এসেছে বারান্দায়।

ফিসফিস করে প্রশ্ন করছে শান্তিকে, কী আবার ঝামাল হইচে।

আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে শান্তি বাইরের মাঠের দিকে। আকাশে কখন পাতলা মেঘ ছেয়ে ফেলে কঠিন করেছে অন্ধকার। কেবল কয়েকটি লালচে আলো আঁকাবাঁকা ভাবে এগিয়ে আসছে।

লগিন্দ হাতে তুলে নিল বন্দুকটা। কিন্তু কিছুতেই এক মিনিটও স্থির রাখতে পারছে না।

অবনী বলল, তুমার দ্বারা হবেক না দাদা। আমাক দাও।

জানুস তুই। ইযার কি কলা-কৌশল জানুস।

প্রশ্ন করেও ভরসা পায় লগিন্দ। যদি একবার হ্যাঁ বলে ছোকরা তাহলে সে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরবে। ওর কেনা মুনিষ হয়ে থাকবে বাকী জীবন।

জানি।

লে।

অবনী বন্দুকটা ধরল বেশ পাকা ভঙ্গিতে।

শান্তির চোখে সন্দেহ ঘনিয়ে এল। অবনীর মুখভাব শান্তি লক্ষ করছিল অনেকক্ষণ আগে থেকেই।

বারান্দার জালের ধারে ধারে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে বেড়াতে লাগল অবনী। যে কোনো একটা আলো বাগে পেলেই ফায়ার করবে।

দোতলাটা এমন ভাবে তৈরি, সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দিলে জানলা বা লোহার জাল না-ভেঙে কেউ দোতলায় ঢুকতে পারবে না। এবং চতুর্দিকে লক্ষ করার জন্য জানলার ব্যবস্থা আছে। অনেকটা দুর্গের কায়দায় তৈরি দোতলাটা।

অবনী একবার লগিন্দর ঘরে ঢুকে পড়ছে দক্ষিণ দিকটা দেখতে, একবার

কাতুব ঘবে, পশ্চিমটা দেখতে, নিজেব ঘবে, পুবদিকটাব জন্য, বাবান্দায়, উত্তব দিকটা।

বন্দুকটা হাতে নিযে অমিত শক্তিধব মানুষেব মত নিজেকে ভাবতে সুরু কবেছে। অন্ধকাব ডাকাত লগিন্দ শান্তি সবাইকে, তাব জীবনেব সমস্ত প্রতিবন্ধকগুলিকে কীটানুকীট গণ্য কবছে। একবাব পাঁযতাবা কষে উত্তবে যায় তো পব মুহূর্তে দক্ষিণে, এই পুবে তো এই পশ্চিমে। যতদূব বন্দুকেব গুলি যাবে ততদূব এখন তাব হাতেব কব্জায। মনে হচ্ছে বন্দুকেব গুলি অন্ধকাবেব সীমান্ত পর্যন্ত সহজেই পৌছে যাবে।

শান্তিব পিঠে হঠাৎ নল ঠেকিযে বলল অবনী ভাঙা গমগমে গলায, দাও, তুমাব সব ফিকে দাও তো।

শান্তি আঁ শব্দে চেঁচিযে উঠতে গিযে নিজেব মুখ নিজেব হাতে চেপে ধবে ক্ষেপে গেল, বলতে গেল 'হাবামজাদা' কিন্তু বেবোল না মুখ দিযে।

খুব নবম মিঠে স্ববে শান্তি বলল, ঠাকুবপো ইটা কি মজা কবাব কাল ?

লগিন্দব বুকেব দিকে অবনী নলটা সোজা কবে বাখছে। কখনো কখনো। কিন্তু অবনীব মুখেব ভাব খুব স্বাভাবিক। যেন ওব নিশানা আসলে নিচেব দিকে, লগিন্দব দিকে নল বাখাটা খুবই সামযিক। লগিন্দ ভাবছে, শুযাবকে বন্দুক দিযে কী ভুলই না কবেছে।

অবশ্য এ ছাড়া আব উপাযই বা কী। শুযাবটা ছাড়া আব কে আছে বর্তমানে—তাদেব বক্ষক।

কাতু প্রায অথর্ব বুড়ি জীবনে বন্দুকই স্পর্শ কবে নি। শান্তি প্রথমত মেযেছেলে দ্বিতীযত আজই বন্দুক ধবেছে, ফাযাবটাযাব কবে নি এখনো। হযতো শান্তি অনাযাসে বন্দুক ছুঁড়তে পাবত, বিকেলে বন্দুক ধবাব ভাব থেকে মনে হয। কিন্তু বাইশ বছবেব সাঙিন যুবক অবনীব উপব ভবসা কবে ফেলেছে লগিন্দ নিজেবই অজ্ঞাতসাবে।

কী মহা ভুলই যে কবেছে।

লগিন্দ বলল, অবনী ছিল নাই তো আমাদেব কত কষ্ট হইছে।

পুব দিকেব ঘবেব জানলায অবনী টিপ কবছে, বাবান্দাব কথা কানে যাচ্ছে তাব।

শান্তি বলল, ছেল্যাটা ভাল, উযাব মনটা বড় পবিষ্কাব।

লগিন্দ বলল, কত বছব উযাকে খাআলম। পতিফল দিবেক নাই ?

লগিন্দ পুব দিকের ঘরে ঢুকল নিদারুণ চাপা ভয়ে। অবনীর কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পিঠে হাত দিল। যমের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে মৃত্যু ঠেকানোর ফন্দি এটা।

লগিন্দ ফিসফিসিয়ে বলল, ইটা মাছি, আর উইয়ে আলো, উটার -

অবনী ধমকাল, থাম—সব জানা আছে—

একটা আলো খেজুর গাছের গোড়ায় চটা ধরিয়েছে। লোকটার গোটা দেহ দেখতে পেয়েছে অবনী। চটার আগুনে লোকটার মুখ আন্দাজ করা যাচ্ছে এখন দেশলাই নিভে যাবার পর।

কিন্তু লোকটাকে গুলি করতে মন সরছে না অবনীর। কী ক্ষতি করেছে লোকটা। কী অপহরণ করতে আসছে তার। লগিন্দর ঘর লুট করে নিয়ে গেলে তার অবশ্য আশ্রয়চ্যুত হবার আশংকা আছে। হয়তো লগিন্দ ও শান্তি ডাকাত চলে যাবার পর কাল সকালে তাকে লাথি মেরে বিদেয় করে দেবে, যদি এখন ডাকাত তাড়াতে ব্যর্থ হয় অবনী।

এখন ফায়ার না করলে ডাকাতগুলো ঢুকে পড়ে তাকেও ঠেঙিয়ে জড়-পুঁটলি করে দিতে পারে।

তবু একটা মানুষ খুন করা কি সোজা কথা।

যার সঙ্গে কোনো বিবাদ বিসম্বাদ নেই তাকে তুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলা কি সহজ কাজ!

আবার ভাবল অবনী, একটা গুলি বাইরে, আরেকটা ভিতরে। বাস। তুই গুলিতে এক উদ্দেশ্য সিদ্ধি। লগিন্দ খতম, ডাকাতরাও পালাবে।

লগিন্দকে মারলে কাতু দেখবে, শান্তি দেখবে। ওরা পুলিশের হাতে তুলে দেবে। তাহলে শান্তি ও কাতুকেও শেষ করতে হয়। কাতুকে মারতে পারবে না। একমাত্র বুড়িই অবনীকে ভালোবাসে। বুড়ির সঙ্গে অকৌশল করতে পারবে না অবনী।

তাছাড়া মধু আছে লগিন্দর ওয়ারিশ। এতগুলো লোককে মেরে লাভ?

বন্দুকটা হাতে আসার পর নানান দ্রুত চিন্তা অবনীর মস্তিষ্কের কোষগুলি তাতিয়ে তুলে চলেছে।

তাহলে রাস্তা কোনটা। অবনী সর্বদাই দেখেছে, যে কোন কাজ করতে যাও, একটার বেশি রাস্তা তোমার সামনে। যে রাস্তা সোজা সহজ মনে হচ্ছে, পরে দেখলে সেটা মোটেই তা নয়। যে রাস্তা আপাত কঠিন, দেখা যায়

সেটা আশাতীত সোজা। অবশ্য সোজা রাস্তা বরাবর সোজা থাকে না। কিছুদূর পরেই জটিল ও কষ্টদায়ক আকার নেয়।

বরাবর চলার মত মনঃপূত রাস্তা বোধহয় সকলের জীবনে মেলেও না।

হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে দেখা গেছে সুফলই ফলেছে। আবার দীর্ঘকালের চিন্তা ভাবনার পরে নানা কাজে নাজেহাল হতে হয়েছে।

লোকটাকে মেরেই হোক বা জখম করেই হোক ডাকাতের দল তাড়াতে পারলে হয়তো কাল থেকে এ বাড়িতে তার খাতির বাড়তেও পারে। বরাবর যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে।

প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠল বন্দুক।

হো হো হো হো হুয়া শব্দের চীৎকার সারা গ্রাম মন্থন করে তুলল। চতুর্দিকে মশাল নিভে গেল। দৌড়া-দৌড়ির শব্দ চতুর্দিকে। একটা মাত্র টর্চের আলো জলতে-নিভতে লাগল।

শান্তি ছুটে এল পুব দিকের ঘরে।

কাতু নিজের ঘরে খিল দিয়ে বসে পড়ল উবু হয়ে, ঠাকুর নাম জপ করতে লাগল।

আর একটা টোটা ভরে দিল নগিন্দ। এবারে আগেকার চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি।

অবনীর শরীর বিতৃষ্ণায় গুলোচ্ছে, ও গিয়ে খাটে বসে পড়ল বন্দুকটা আঁকড়ে ধরে। উত্তেজনায় শরীরটাতে ধীরে ধীরে কাঁপুনি ধরল।

শান্তি জানলার গবাক্ষে মুখ ঠেকিয়ে নিচের দিকে দেখছে।

অনেকগুলো ছায়া খেজুর গাছের গোড়ায় জড়ো হয়ে ধীরে ধীরে উত্তর দিকে মিলিয়ে গেল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে নগিন্দ ও শান্তি দেখল নিঃশ্বাস বন্ধ করে, টর্চের আলোটা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে।

নগিন্দ শান্তিকে খৈনির ডিবেটা এনে দিতে বলল। এনে দিল শান্তি।

দূরের দিকে নজর স্থাপন করে বলল শান্তি, ফাঁকা শব্দেই ছুটেচে। কাউকেই লাগে নাই।

বুঝা যাবে সকালে—নগিন্দ বলল দাঁতের মাড়িতে এক টিপ তৈরি খৈনি ফেলে।

খাট থেকে অবনী উঠে এল ধীর পায়ে। ভিতরটা এখনো তার উথাল-

পাথাল কবছে। হযতো লোকটা এখনো খেজুব গাছেব তলায় মবে পড়ে আছে, বক্তে ভেসে যাচ্ছে। হযতো হাঁটুতে বা জাঙে বা অন্য কোথাও জখম হযেছে, পালিযেছে দলেব সঙ্গে, বা তাকে অন্য সবাই বযে নিযে গেছে।

লোকটাব গাযে গুলি লাগে নি এ হতেই পাবে না।

পুব দিকেব জানলায উঁকি মাবল অবনী দু চোখ বড বড কবে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

অবনী শান্তিব কাছে টর্চ চাইল নিচটা দেখাব জন্য। শান্তি ও লগিন্দ দুজনেই জানাল, এখন টর্চ জ্বালা ঠিক হবে না। যদি ওদেব হাতে বন্দুক থাকে, বিপদ ঘটবে।

লগিন্দ বলল, ছাদে উঠে একবাব দেখা দবকাব।

শান্তি বলল, যদি কেউ লুকিযে বসে থাকে?

দস্যুবা যে গ্রাম ছেডে সত্যি সত্যি চলে গেছে এখনো বলা যায না। হয তো ওবা চুপচাপ অপেক্ষা কবছে গা-ঢাকা দিযে। গৃহস্থ শুযে পডলে ওবা উঠে আসতে পাবে। আজ আব বাত্রে কাকুব ঘুম হবে না। ঘুমোতে যাওযাও আজ বোকামি।

বাত্রিব ঘুম আব নিশ্চিন্তে আসবেও না ভবিষ্যতে। এ সমস্যা এখন দেখা দিযেছে গ্রামেব প্রতিটি অবস্থাপন্ন লোকেব বাডিতে।

লগিন্দব মাথাটা ভোঁ ভোঁ কবছে। কোথা থেকে কী ঘটে গেল ঠাহব কবতে পাবছে না। সব চাইতে ওব বেশি খাবাপ লাগছে এই ভেবে, অবনীব হাতে তাদেব প্রাণ বক্ষা পেল। কাল সকাল থেকে ছোঁডাব দাপট সহ্য কবতে হবে। সবাইকে দাবিযে বাখাব যে বড সুখ ছিল তাব। সবাইকে দাবিযে বাখাব যে কী উল্লাস কী সম্মান সেটা লগিন্দ ছাডা এ তল্লাটে আব কে ভালো জানে।

সাহসে ভব কবে লগিন্দ দোতলাব ছাতে যাওযাব দবজাব খিল খুলতে গেল। হাঁ হাঁ কবে ছুটে এল শান্তি। ওদেব কথাবার্তায অবনী বন্দুকটা নিযে এসে দাঁডাল লগিন্দব পিছনে।

গম্ভীব মেজাজে বলল, চল, উপবটা দেখা দবকাব।

বীবেব মত লগিন্দ দুটি দবজা খুলে ছাতে উঠে এল। পিছু পিছু অবনী শান্তি ও কাতু।

শান্তি বলল, তুমি আবাব ক্যানে মা?

কাতু বলল, একা কি মবব ?

সবাবই এখন একা থাকা অসম্ভব। সম্পদে মানুষ একা থাকতে ভালোবাসে, গর্ব কবে, বিপদে চাই তাব দুর্বলতম সঙ্গীটিও। লগিন্দব মত অসামান্য অহংকাবী লোকটিও আজ অবনীব হাতেব মুঠোয অস্তিত্ব সঁপে দিযেছে।

পশ্চিম দিকেব জঙ্গল থেকে একটা টর্চ দ্রুত এগিযে আসছে। উত্তব দিকেব টর্চেব আলোটা তখনো সম্পূর্ণ মুছে যায নি।

ছাতে কেউ নেই। গ্রামে কেউ আত্মগোপন কবে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না ছাত থেকে।

কিন্তু আবাব আলো কেন।

সকলেবই চোখ পড়েছে আলোটাতে।

লগিন্দ অবনীব হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল।

আবাব চাব জনেব শবীবে প্রবল অস্বস্তি ছটফট কবতে শুরু হযেছে।

লগিন্দ বলল, অবনীকে, যে ঢ্যামনা সে ঢ্যামনাই বযে গেলি। কাউকেই গুলি লাগে নাই।

শান্তি বলল, উযাব হাতে আবাব ছাড়ে। আমি আগেই বুঝেচি উযাব মতলব খাবাপ, তুমবা জানলে কত কবল, কত লাফার্ন-ঝাঁপান। আসলে সব বাজকবেব ফন্দি।

অবনী বেগে বলল, তাহালে আমি ঘব ঢুকে খিল দিতম বৌদি।

লোক দেখানি গ, তুমাব ষত লোক দেখানি। কী বকম মাল্লে, অই তো আবাব ছুটে আইচে।

আলোটা বেশ দ্রুতবেগে আসছে। ক্রমে গ্রামে ঢুকল, তালপুকুব কুটিব-পুকুব পেবিযে মল্লিকদেব খড়পালুই। কিন্তু একটা মাত্র আলো কেন ?

লগিন্দ ভেবে কিনাবা পেল না একটা মাত্র আলোব কাবণ।

অবনীব মনে মনে ধিক্কাব জন্মাল। মনে হল বন্দুকটা কেড়ে নিযে চোখেব নিমেষে সব কটাকে শেষ কবে দেয। কোনো সুবিচাব নেই। বুক দিযে আপ্রাণ আগলালেও বলে ফাঁকিবাজি। এদেব অনেক খেযেছে পবেছে অবনী সত্যি, কিন্তু তাব প্রতিদানে হাজাবো গুণ কি ফিবিযে দেয নি। গ্রহীতাব খাঁকতি কিছুতেই মিটতে চায না। একটু আগেই নিশ্চিত খুনেব হাত থেকে বাঁচানোব যে দৃঢ় চেষ্টা কবেছে অবনী তাব তুলনা আছে ?

পিছনের ডোবায় নেমেছে টর্চের আলোটা। নিশ্চয় দস্যুদের চর। নিম-গাছের ঝোপে মানুষটা আড়াল পড়ে গেল।

কাঁপাকাঁপা স্বরে লগিন্দ বলল, মা মেয়াছেলারা নিচে যাও। ঘর ঢুকে খিল দিই বসে থাক।

শান্তি লগিন্দকে ছেড়ে যেতে সাহস পেল না। প্রতিবাদ করতে গেল। ধমক লাগাল লগিন্দ।

অগত্যা কাতু ও শান্তি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল দোতলায়।

অবনী এগিয়ে গেল ছাতের আলসের ধার ঘেঁসে। লগিন্দ অনুসরন করল অবনীকে। দুজনের নিশ্বাস আবার বন্ধ হয়ে গেছে। বিরাট ঝাঁকড়া নিমগাছ। লোকটাকে আবছা দেখা যাচ্ছে যখন জ্বলছে টর্চের আলো। আলোটাও একসাথে বেশিক্ষণ জ্বলছে না।

অবনীর কানের কাছে একরাশ মদের গন্ধ ছেড়ে লগিন্দ বলল, লিবি বন্দুকটা ?

হাত কাঁপছে ?

না, তা ঠিক লয়।

তুমিই ধর।

ডাকাতটার রকম-সকম দেখে অবনীর পরিচিত স্মৃতি ভেসে উঠল বিদ্যুতের মত। এত রাত্রে মধু আসবে কী করে। হ্যাঁ, আসতে পারে। রাত আড়াইটার সময় পিয়ার ডোবায় থামে আপ ট্রেনটা। হেঁটে বন ভেঙে আসতে বড় জোর পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তাহলে এখন রাত সোয়া তিন।

অবনী নিজেকে সামলাতে পরেছে না।

এক ঢিলে দুটি পাখি মারার প্রচণ্ড সুযোগ কি তার সামনে। একি দৈব অভিসন্ধি।

অবনীর বুকটাতে অস্বস্তি করতে লাগল।

হ্যাঁ। মধুই। কোনোখান থেকে এলে আগে ডোবায় নেমে হাত মুখ ভালো করে ধোবে মধু, তার পর ঘর ঢুকবে।

লগিন্দ সানুনয়ে বলল, ধর, ধর না অবনী।

এক ঝাকুনিতে অবনী লগিন্দর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল।

মাতাল লগিন্দর মাথার ঠিক নেই, ভয়ে নেশায় সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

টর্চেব ক্ষীণ আলো নিম পাতাব ঘন ঝোপেব ফাঁকে বড একটা ভৌতিক চোখেব মত। হাত দিযে চাপা দিযেছে মধু টর্চেব আলোটা। এটা তাব এক মজাব খেলা। হাত চাপা টর্চেব লাল আলোটা দেখতে ও বড ভালোবাসে।

টর্চেব আলোব সঙ্গে স্বাভাবিক দূবত্ব মেপে মধুব শবীবে বন্দুকেব টিপটা ঠিক কবল অবনী। কিছুক্ষণ আগেকাব অভ্রান্ত লক্ষ্যভেদী আস্থায নিজেকে আবাব সুদৃঢমনা কবে তোলাব চেষ্টা কবল। এই গ্রামে ফিবে আসাব সার্থকতা কযেক মুহূর্তেব মধ্যেই তীব্র শোকধ্বনিব দ্বাবা ঘোষিত হতে পাবে। পৃথিবীব যাবতীয সুখেব একমাত্র তালাব চাবি হিসেবে বেঁচে থাকতে পাবে ডুপ্লিকেট অবনী।

না, শান্তিব গর্ভধাবণ কবাব ক্ষমতা আব নেই।

মধুব শোক ভুলতে অবনীকে আঁকডে ধবা ছাডা লগিন্দ ও শান্তিব দ্বিতীয পথ খোলা থাকছে না।

কিন্তু ছেলেব খুনীকে ছেলেব আসনে কি বসাবে তাবা ?

বন্দুকেব নলটা কাঁপছে অবনীব হাতেও। লগিন্দব হাওযা লেগেছে অবনীব স্নাযুতে। অবনীব মনটা ফোযাবাব ধাবায ছডিযে পডতে চাইছে, কিছুতেই মনটাকে ছুবিব ডগাব মত ধাবালো ও একাগ্র কবতে পাবছে না অবনী।

গুমোট কান্নায তাব বুক ভেঙে ফেলতে চাইছে।

নিজেব হাতে নিজেব জীবন গডে নিতে পাবা যায তাব প্রত্যক্ষ উদাহবণ এখন অবনীব হাতেব কাছে। এক সুযোগ জীবনে দ্বিতীয বাব আসে না। একটা সুযোগ নষ্ট কবাব অপবিমেয মূল্য দিতে হয মানুষকে। সুযোগটা যদি হয অসামান্য কিছু, তাহলে আফশোসেব শেষ থাকে না উত্তব জীবনে।

অবনী বুঝতে পাবছে, মানুষই তাব নিজেব জীবনেব স্রষ্টি ও ধ্বংসকর্তা।

তোবও হাত লডছে যে।—লগিন্দ প্রায কেঁদে ফেলল।

হাঁ গো দাদা তুমিও ধব - দু জনায ধবি।

বন্দুকটা লগিন্দকে গছিযে দিল অবনী। তাবপব নলটা নিজেব কাঁধে বেখে দুহাতে আঁকডে ধবে অবনী বলল, পাচ্ছ, সোজা পাচ্ছ ? লগিন্দ সাহসে ভব কবে ট্রিগাবে তর্জনীটা দিল পেঁচিযে।

নলটা লাল আলোটাব প্রায সোজাসুজি আসতেই গর্জে উঠল বন্দুক। ফাযাবেব চাইতেও প্রচণ্ড স্ববে আর্তনাদ কবে উঠল মধু। অবনী জ্ঞান হাবিযে

পড়তে গিয়ে কপাল ফাটাল ছাতের আলসেয। হাজার বার ছেলের নাম ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে লগিন্দ ছুটে গেল ডোবার পাড়ে।

কাতু ও শান্তি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এল।

লগিন্দ, কাতু ও শান্তি তিনজনে মধুকে ধরবে কি, নিজেরাই বুক চাপড়াচ্ছে।

বড় কঠিন মন মধুর। লগিন্দর চাইতে অনেক বেশি কঠিন। বাঁ হাতের কব্জির নিচে বেঁধা এফোঁড়-ওফোঁড় ক্ষত চেপে জড়িয়েছে কোঁচার খুঁটে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে কাপড়।

কোথায় এরা মধুকে ধরাধরি করে নিয়ে যাবে, তা নয়, মধু নিজেই স্বচ্ছন্দে হেঁটে গিয়ে বিছানায় সজ্ঞানে শুয়ে পড়ল।

একটি নাইজেরিয় কবিতা

গ্যাব্রিয়েল ওকারা

এক সাথে অনেক গলার কলরব শুনি,
লোকে বলে, পাগলেরা নাকি অমনি শুনতে পায়।
গাছেরা এ ওর সাথে কথা কয়, আমি শুনি,
লোকে বলে ওঝা বদ্যিরা নাকি অমনি শুনতে পায়।

আমি বোধ হয়
পাগল,
না হয় ওঝা বদ্যিদের কেউ।

হয়ত পাগল। কারণ আমি পরিষ্কার শুনতে পাই
অনেক লোক মিলিত কণ্ঠে আবেদন জানাচ্ছে আমার কাছে
বলছে
ওঠো ওঠো, তোমার লেখবার টেবিল থেকে ওঠো,
এই গভীর রাত্রে
সমুদ্রের পর্বতপ্রমাণ ঢেউ ভেঙে
ওপারে পাড়ি দিতে হবে,
সময় নেই,
ওঠো, ওঠো, চলো—

কিংবা ওঝা কি বদ্যি।
চারা গাছগুলো বুড়ো গাছের সাথে কথা কয় আমি শুনি,
মানে বুঝি না,
মানে বোঝার সঙ্কেত আমি ভুলে গেছি।
কিন্তু এটুকু বুঝতে পারি,
মানুষেরা আর গাছেরা একজনের কথাই বলছে,
যে চাঁদের দিকে মুখ করে আমার দিকে পিছন ফিরে

চলেছে
সাত সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ ভেঙে
দেশ মহাদেশ পেরিয়ে,
আর আমি
আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে রুমালের মতো ওড়াচ্ছি
থর থর কাঁপা হাতে,
ডেকে ডেকে আমার গলা ভেঙে গেল
কিন্তু সে ফিরে চাইছে না।　চলেছে, সে চলেছেই ॥

অনুবাদ ঃ মনীশ ঘটক

স্বচ্ছল বিশ্বাসে

সবিৎ শর্মা

আবারো উদ্বেল তারুণ্যে
সময়ের মত আকাশ দুলে উঠল
মোহানার দিকে—

ধনুকের মত পিঠ বাঁকিয়ে
দিগন্তের তোরণ উঁচু করে ধরল

মিলিত জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে তার নিচে
সচ্ছল বিশ্বাসে

চতুর্দিকে জলধারার শব্দ
চতুর্দিকে জলধারার শব্দ
চতুর্দিকে

ওরা দিগন্ত পার হওয়ার আগেই
জলস্রোতে মিলবে বলে
নেমে এল নিভৃত জলধারাটি…

শব্দের বুদ্ বুদ্

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

আকাশ গম্ভীর

কারখানার গেটে—
বেদনার নীল রেখা
ডোরা কাটা বাঘের মত
লাফিয়ে লাফিয়ে চ'লে গেল।

সামনে
উল্কার বেগ।

পিছনে
শব্দের বুদ্ বুদ্।

এ ভরা ভাদরে

সত্য গুহ

সমস্ত রাত্রির শব্দ ভাসানের—বিসর্জনের
মানুষের শুকনো চামড়ায় হচ্ছে জোরবেত্রাঘাত, যেন অন্ধকারের
পেশীগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে, দুমড়েমুচড়ে একাকার তরু
ও চাঁদ চোখের জলে অবসাদগ্রস্ত বুক, জলপ্লাবিত রূঢ় মরু
পান্থপাদপ কাঠ, হয়ে যাচ্ছে আকাশকুসুম
জলের চিৎকারে ভাঙে পাথরেরও ঘুম
জল আর জল
পাথরের মাথাভাঙা তরল গরল
প্রখর তৃষ্ণায় আমি আর্ত দিশাহারা
চোখ ভেঙে বুকময় সজল সাহারা
মুখে তুলি জলের গেলাস, জলের ভেতরে ভাসে লাশ

কোদালে জলের কোপ-এ উপরে যায় ঘাস
আহা রে আহা রে
　　　　উমার হোলোনা যাওয়া কৈলাশ পাহাড়ে

আমার দুচোখ ভয়ে শাদা হয়ে গেছে, জলে ভরে গেছে বুঝি মেধা
যে দিকেই চোখ পড়ে আমার বিশদ ছবি একা
বানভাসি গাঁগেরামগেরস্ত বৌ-এর
দশহাত ভেঙে যায়, রক্ষাক্ষমতাহীন বোঝা যুদ্ধাস্ত্রের
জীবনসংগ্রামে শুধু বয়ে যাওয়া হোলো, জীবন যাপনে নামে ধস
অসুর আবদ্ধ যুদ্ধ মাথায় উঠিয়ে নিচ্ছে যেনবা রাক্ষস
রেললাইন, লোহাগুঁড়পুল
আকাশ বাণীর স্তম্ভ বাংলোর ঝুল
কেয়ারটেকার উড়ে যায়
প্রকৃতির স্বেচ্ছাচার, স্বাধীনতা, সাঁতার কাটছি আমি আকাশ গঙ্গায়
নিয়তির চুলের ছায়ায় বাহুবন্ধনছিন্ন মর্মন্তুদ দ্বীপ
চারদিকে ধ্বংসচিত্র শাঁখা ভাঙা, ভাঙা বাসা উদ্‌ভ্রান্ত জরীপ
সমস্ত অস্তিত্ব ভরে ক্লান্ত কোজাগরী
অশ্রুনদীর তীরে সতীদাহ শিশুদাহ রোরুদ্যমানিণী বিভাবরী
ভাসান ভাসান বান বোল দিচ্ছে বুক ভরে ঢাকী
কোথায় স্টেশান কই মেঘলী জ্যোৎস্নায় উড়ছে শিশ্ তুলে জোনাকী
কোথাও উদ্ধার নেই, মুক্তি নেই, হাত তুলে ধরো
মাংসাশী জলের স্রোতে বিদ্যুৎ প্রকল্প বৃথা, দণ্ডবিধি বর্তাবে তোমারও
নিজের পতন শব্দ নিজের কানেই তোলে খেদ
এ্যারোপ্লেনেরও চাই দৌড়বার ক্ষেত
পায়ের আঙুল ছুঁয়ে খাদ
শূন্যতা ছুঁয়েছে নখ—অনন্ত উদ্ধারকামী রোমকূপের হাত

আমি আচ্ছন্ন হয়েছি আমি চলচ্ছক্তিহীন
চকিত হাওয়ায় উড়ে গেছে হে মোমবাতি, শিরে সংক্রান্তির টিন
হাঁটু ধরে টেনে যাচ্ছে জল
তলিয়ে যাচ্ছে পিতৃপুরুষের পাপপুণ্যফল

হাওস্-আপ হাত তুলে ধবো
ঘব বাঁধবাব খড খুঁজে আব কী হবে বা, যত কবো জডো
ছুটে যাবে শবম সম্ভ্রম
তোমাব খাটেব বাজু জডিযে দাঁডিযে স্থিব যম
আত্ম বিশ্বাস ? কিসে কাব ভবিষ্যৎ বেঁচে আছো প্রকৃতিব দাস
কিমাকায নষ্ট ফসলতা বেশভূষা শাযাব ভেতবে মবামাস
যতই স্বাধীন
তুমি তালকানা পাখী ফাঁদে উডে পডবে চিবদিন
অথবা ভূকম্প, কিম্বা অঙ্গাবাম্লযান
বাণীমক্ষিকাব প্রেম বুনবে ফুসফুসে, আব সভ্যতায দিলেও সাবান
মযলা হবে না দূব
ভিটে ছেডে দাও তুমি বাসা হবে এখানে ঘুঘুব
গাযে কাঁটা দিযে ওঠে, অভিমানে ঘা লাগে—চাবুক
বিবেব মুখ থেকে ছুটে যায হঠাৎই ঝিনুক
সত্যগুহ পেযে যায মানুষেব মৌলিক দেহ
না, নেই সন্দেহ যে কোন আর্শিতে দেখ তুমি সত্যগুহ
পাঁচটি আঙুলে তুমি ঠেলে দিতে পাবো ক্লান্ত কপালেব চুল
বঙ্গোপসাগবেব দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘাব জল, নষ্ট বক্ত ফুল
বিদ্যুৎ প্রকল্প আব সেচখাল
তোমাব নির্মান, আছে শস্যেব সাহস, আছে মীবা কাঞ্চীলাল
তুমি শিখেছ কেবলই হযে যাওযা
অকূল মরুতে উট সমুদ্রে জাহাজ উডোসাবমেবিন বাওযা
তুমি শিখেছ হৃদযে যেতে ভালোবাসা
জখম বাঘকে আব গাভীন গরুকে নিযে আসা
জলেব নিকটে, স্বাধীনতা
প্রকৃতিব আছে, তোমাব নিজেব আছে সার্বভৌমিকতা
আছে সহ অবস্থান
তুমিই উৎসব গডো তুমিই হে কবেছ ভাসান
ভেঙে পড়া নয, ভাঙাব মতন কিছু নয
একজন লোকেব পাশে অন্যজন ভিড দিলে লোকোৎসব—জনসভা হয

এখন আড়ালে

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

আড়ালে এখন যেন অস্তমিত রাতের প্রার্থনা
ভূগর্ভের স্তর থেকে
নীল স্তরে—ভূমণ্ডলে—উজ্জীবিত কোন গ্রহান্তরে
অন্য এক ঋতুর সংলাপ।
দূরাগত প্রতিধ্বনি কেঁপে উঠলো রিক্ত গিরিখাদে।

অজস্র যক্ষের দল জেগে আছে :
কতকাল তুহিন পাহাড়ে পিঠ রেখে
দেখা যায় হিম সম্প্রপাত
দেখা যায় ঝরে পড়া
তুষারের ক্ষতের ভিতরে
যন্ত্রণায় নীল আর্তি, কী জমাট অপার বেদনা
রক্তে রক্তে আদিমতা—সভ্যতার তীব্র অভিশাপ।

অন্তিম রাতের কণ্ঠে তাই জাগে মন্ত্রগূঢ় প্রার্থনার ভাষা
বিশালাক্ষী মন্দিরের আকাশ চূড়ায়
আলোকের প্রতিশ্রুতি
নিলীম নক্ষত্রঝরা—মানুষের বোধ থেকে সুগভীর বোধির ভিতরে
অন্ধকার ইতিহাস—সুড়ঙ্গে—আঁধারে
দুরন্ত অশ্বের খুরে বেগবান সুপ্ত জনপদ।

ঐ মুক্তি

আশিস মুখোপাধ্যায

কোন পূর্বযুগীয এক মানবীব হাত
আমাকে টেনে বসালো এক বক্তশূন্য পাথবেব ওপব
তাবপব আমাকে শেখালো—এই প্রভু,
এই মুক্তি ,
আমি সদর্পে মাথা নেড়ে বল্লাম, 'না
এ নয
ঐ বাস্তা
ঐ মুক্তি'

আমি সামনে ইতিহাস উপুড় কবে দিলাম।
সেই মানবী এলোমেলো হাওযাব মতো
এদিক ওদিক ঘাড় ফেবালো

তাবপব স্তব্ধতা

আমি দুহাতে লাল সূর্য নিযে
লাফিযে পড়লাম সমুদ্রে।

আমার মৃত্যুর পর

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিবা গান্ধীব প্রতি

দিলীপ সবকাব

আমাব মৃত্যুব পব
চন্দনেব বাটিটা সবিযে বেখো
ফুলগুলো পাঠিযে দিও অন্য কোনখানে
বৃথা নষ্ট কবো না
কেননা, ফুল চন্দনে আমাব কোন মোহ নেই।

আমার মৃত্যুর পর
গলার শিরা ফুলিয়ে ফুলিয়ে
প্রিয়তম শ্মশান বন্ধুগণ
ঈশ্বরের নাম নিয়ে বৃথা ডাকাডাকি করো না
আমার অন্তরে বাজে শুধু মানুষের গান
ঈশ্বরে আমার কোন বিশ্বাস নেই।

আমার মৃত্যুর পর
মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে
পথের দু'ধারে খই ছিটিয়ে ছিটিয়ে
অমন করে আর পথে পথে হেঁটো না

অন্নপূর্ণার এই দেশে
যে জননী হাতপাতে এখনও ফুটপাথে
বরং মুঠি তার ভরে দিও বন্ধু, জীবনের প্রসন্ন আশ্বাসে
কেননা, অন্নদাত্রীর প্রতি আমার কোন আস্থা নেই।

একই বৃত্তে আমরা

ফিরোজ চৌধুরী

'হ্যাঁ' 'না' আজ কিছুই বলবো না
আজ আমার দর্শকের ভূমিকা
দূর থেকে শুধু দেখে যাবো ঃ

দেখবো নিছক মিথ্যে বলে লোকগুলো
কত অনায়াসে হজম করে ফেলছে
দেখবো প্রতিশ্রুতিপূর্ণ প্রচুর মানুষ বেয়নেটের ডগায়
দেখবো গাছের পাতা আজ সবুজ নয়—হলদে বিবর্ণ
ফুল শুকিয়ে গেছে—নদীগুলো যেন একমনে কেঁদে মরছে
কোথাও একরত্তি জল নেই ঃ

অতীতের ইতিহাসের মত রহস্যময় মোটেই নয়
গৃহস্থবধূর ঠিক আটপৌরে শাড়ির মতন
আজকের এ দৃশ্য বড় সহজ এবং নৈমিত্তিক :

শুধু একটি কথাই আমার কাছে আমরণ
রহস্য রয়ে গেল—
জীবন নিঃসন্দেহে দুঃসহ—মরুভূমিময়
তবুও আমরা চলছি
কেবলই চলছি
ঘুরে ফিরে
সেই একই বৃত্তে।

ঘুমের মধ্যে

কালীপদ কোঙার

ঘুমের মধ্যে দেখলাম,
কতকগুলো লোকের হৃৎপিণ্ড
রেফ্রিজারেটারে জমা আছে,
কোটরগত চোখে
লাল মার্বেলের মতো আগুন জ্বলছে,
স্তূপীকৃত বইএর টিলায় বসে
তারা সব
আমার শরীরের মতো প্রিয়
কবিতাগুলোকে
নিলাম করবে ব'লে
ক্রমাগত হাতুড়ি ঠুকছে।

হে মানুষ, তোমাদের প্রতি

ইভগেনি ইভতুশেংকো

কবরখানার সাইরেনে যখন ছুটির ঘণ্টা বাজে
রাজপথে
সরণীতে
জনতার ভিড়ে
গায়ে গা দিয়ে তোমরা ঘরে ফের।
তোমাদের কাছে এসে
তোমাদের সঙ্গে মিশে
আমি দুঃখিত নই মোটেও।
তোমরা খুবই শ্রান্ত
তোমাদের স্নায়ু দুর্বল।
পৃথিবীর নব রূপায়ণে
তোমাদের অপ্রতিহত গতি, তোমাদের জয়যাত্রা,
সেতুবন্ধনে বেঁধে দিয়েছে স্বর্গ আর মর্তকে।
কিন্তু পথের শেষ এখনও হয় নি।
সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন তোমাদের মুখ,
তোমাদের প্রত্যেকে যেন এক একটি বিচ্ছিন্ন কাহিনী,
বিযুক্ত হৃদয়
বিবেক,
তোমাদের প্রত্যেকের চিন্তা খণ্ড-বিখণ্ড করেছে
এই অনন্ত পৃথিবীকে।
তোমরা নিজের মত করে বিশ্বাস করো প্রত্যেকটি জিনিসে,
মদের জন্যে
পানীয়ের জন্যে
তোমরা মুহূর্তের জন্যে বিস্মৃত হও নিজেদের
বিচ্ছিন্ন হও সকলে সকলের থেকে।

আবাব তোমাদেব দৃষ্টিতেই মানবতা মূর্ত,
মহান ভ্রাতৃত্বেব জন্যে তোমবা দান কবেছ নিজেকে।
বিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলি
আসলে একটি কাহিনীই
বিযুক্ত বিবেকগুলি
আসলে একটি বিবেকই।
আমি তোমাদেব কাছে এই ভবিষ্যতেব কথাই বলতে চাই,
আব এই ভবিষ্যদ্বাণীব ভিতব দিযেই
জীবনকে যা সংহত কবে
তাকে খাটো কবতে চাই না।
না
আমি ভবিষ্যদ্বক্তা হতে চাই না,
হতে চাই না বিচাবক।
কিন্তু আমাকে তোমবা ক্ষমা কবো
যেমন কবে ক্ষমা কবো বিবক্তিকব সঙ্গীকে।
হে মানুষ, তোমাদেব কাছে আমি আবাব বলছি :
"আমবা মানুষ।
আমবা মানুষ।

আমবা মানুষ
আমবা তর্ক কবি
অভিযোগ কবি
সুযোগ পেলেই একে অন্যকে নিপাত কবি প্রাণপণে।
কিন্তু আমাদেব এই বিচ্ছিন্নকবণ
এ আমাদেবই সৃষ্ট এক মিথ্যা,
আমবা মানুষ, তাই আমবা কোনোদিনও বিচ্ছিন্ন নই।
অন্যকে ভুলে যাওযা
ভুলে যাওয়া নিজেকে,
অন্যকে হত্যা কবা
আত্মহত্যাবই সামিল ।"

অনুবাদ : অজিতকুমাব মুখোপাধ্যায

ধ্বস্

চিত্ত ঘোষাল

সংবাদপত্রে বা বেতারে খবরটার কোনো উল্লেখ ছিল না। বা কোনো মহাপুরুষ এরূপ কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন বলেও শোনা যায়নি। তবু চাপা সশংক উচ্চারণে কথাটা লোকের মুখে মুখে ফিরছিল। কেউ জোর গলায় এটাকে গুজব বলে উড়িয়ে দিতে পারছিল না, কেননা বিপদটা ছোটখাট নয়, জীবন মরণের প্রশ্ন, যদি নামেই । তেমনি মেনে নিতেও পুরোপুরি মন থেকে সায় মিলছিল না, একই কারণে, এত বড় বিপদ যদি আসেই তাহলে মৃত্যু, ধ্বংস না, না, এতটা ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু ভয়, সংশয় আর উত্তেজনার পিঠে চেপে কথাটা কেবলই ঘুরঘুর করছিল। কাজের সময়, বিশ্রামে কিংবা আড্ডায়, চায়ের দোকানে, ক্লাবে কেউ না কেউ হঠাৎ বলে ফেলছিল—'শোনা যাচ্ছে শিগগিরই নাকি নামবে।' 'তুমি শোননি? সবাইতো বলছে --।' আর তারপরই কেমন যেন কাজের বিশ্রামের আড্ডার সুর তাল সব কেটে কেটে যাচ্ছিল। আগের সেই মেজাজ শত চেষ্টাতেও আর ফিরিয়ে আনা যাচ্ছিল না তখন। দু'একজন জোর করে কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তারাও অন্যদের মত ধ্বস শব্দটা উচ্চারণ না করেই বলছিল—ইয়ে নামবে না কচু নামবে। নামলেই হল, যত্‌তো সব। এই দ্যাখো ভুল করে ফেলেছি, ট্রাম্প করব তা না, ধ্যুৎ

পাহাড়ের ঢালে ছোট শহর। ছোট হলেও পুরো শহরই। সরকারী বেসরকারী অফিস কাছারি, কিছু কল-কারখানা, কলেজ একটা, গোটা তিনেক স্কুল, চার্চ, দুটি মসজিদ, বেশ কিছু মন্দির, মিউনিসিপ্যালিটি, কনজারভেন্সি সারভিস, ট্যাপ-ওয়াটার, হাসপাতাল, সিনেমা হাউস, ভদ্রপল্লী, শ্রমিক বস্তি ইত্যাদি যা কিছু একটা শহরে থাকা উচিত, এমন কি ক্লাব ট্রাব ছাড়াও শিল্পী-সাহিত্যিকদের একটা সংস্থাও আছে এ শহরে। এখানকার লোকেরা তাদের ব্যক্তিগত, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অস্তিত্ব বিষয়ক নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ ভাবনাচিন্তা নিয়ে যথারীতি জীবনযাপন করছিল। খাদ্যশস্যের দর গত বছর যে তুঙ্গে উঠেছিল এ সময় এ বছর তার অর্ধেকেও ওঠেনি, তবু বাজারে মন্দা,

চেকোশ্লোভাকিয়ায় ওয়ারশ জোটের পাঁচটি দেশের সৈন্যপ্রেরণ, দক্ষিণ আমেরিকায় মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর সাংস্কৃতিক সফর, ইত্যাকার এবং অন্যান্য গতানুগতিক বিষয়ে যখন এই পাহাড়ী শহরে কোনো আলোচনাই জমে উঠতে পারছিল না, তখনই ধস নামার কথাটা কি ভাবে যেন এসে হাজির হল। খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা ও উৎপত্তির হদিশ কেউ দিতে পারল না, কিন্তু এর ওর তার মুখ থেকে সবাই শুনল। শুনল শিগগীরই ধস নামবে। তথ্য ও কল্পনা মিশিয়ে ঘটনার সম্ভাব্য চেহারা দাঁড়াল এই রকম—পাহাড়ের ওপর থেকে শিথিল শিলাস্তূপ গুম গুম শব্দ করতে করতে গড়িয়ে গড়িয়ে যাত্রা পথে বৃক্ষ, মৃত্তিকা ও আরো শিলাস্তূপের সঞ্চয়ে বিপুলায়তন ও প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে এই শহরের ওপর দিয়ে শহরের খানিকটা বা সমস্তটাকেই অঙ্গীভূত করে, গড়াতে গড়াতে আরো নিচে, অনেক নিচে সমতলে গিয়ে থামবে, স্থির হবে। তখন অবশ্য শহরের অংশ বা সম্পূর্ণ শহরটাকেই এবং শহরবাসীদের শরীরগুলিকে শিলা ও মৃত্তিকার মিশ্রণ থেকে আলাদা করে চেনার কোনো উপায় থাকবে না। শহরের লোকেরা পাহাড়ের দিকে তাকাল, যেন পাহাড়-প্রকৃতির ভীষণ চক্রান্তের ফিসফাস শব্দের জন্য কান পাতল, কিংবা ওপরের ধূসর গাছ ও আরো ওপরের মেঘস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সংকেত খুঁজল। অল্পবিস্তর শঙ্কিত সকলেই, যদিও ধস নামার শ্রুতি ও পুস্তকনির্ভর বর্ণনায় অহংকৃত হবার সুযোগ কেউ কেউ নিয়েছে, সম্ভাব্য ভয়ানক পরিণাম নিয়ে কারো বা চেষ্টিত পরিহাস, তবু কেউ এই সর্বনাশ খবরের সত্যতাকে চ্যালেঞ্জ করল না। খবরটা তার ধ্রুপদী নিশ্চয়তায় দু'দিনের মধ্যে শহরের বুকে পুরনো শ্বাসকষ্টের মত চেপে বসল—মৃদু অথচ নিয়ত ক্রিয়াশীল। দপ্তরে দপ্তরে গা-আল্‌গা ভাব, ঝানু আড্ডাধারীরাও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে, মায়েরা সকাল সকাল বাচ্চাদের খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, রাত ন'টার শহরে মধ্যরাত্রির নির্জনতা। ধস ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বাঘের মত নয় যে রাত্রেই তার আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি, তবে ভয়ের সাধারণ চেহারাটাই বোধ হয় এ রকম। নিভৃত অন্ধকার উষ্ণ আরামের মধ্যে বোধ হয় সব ভয় থেকেই পরিত্রাণ পাওয়া যায় বলে মানুষের ধারণা।

তখনো শহর ছেড়ে পালানোর হিড়িক সুরু হয়নি। ইচ্ছা অনেকেরই, বিশেষ করে সমতলে যাদের আশ্রয় আছে, কিন্তু কেউই মনের কথা খুলে বলতে পারছে না, কেন না যেটার কোনো সরকারী বা বেসরকারী স্বীকৃতি

নেই। অন্তত একজন বেসবকাবী বিশেষজ্ঞও যদি মুখ খুলতেন। কিন্তু সে বকম কিছুই না হওয়ায বড বড কর্তাবা অফিস-টফিস খুলে বাখছেন এবং অধীনস্থদেব কেউ পেট খাবাপেব মত সর্বজন গ্রাহ্য কাবণে ছুটি চাইলেও সে যে ভযেই ছুটি চাইছে তা প্রমাণ কবাব জন্য অনাবশ্যক দীর্ঘ তিবস্কাব ও উপদেশাদি দিযে নিজেবাই হিষ্টিবিযাব রুগীব মত আচবণ কবছেন। বডকর্তাদেব টেলিগ্রাম আব জরুবী চিঠি পাঠানো হঠাৎ বেডে গিযেছে, সে সবেব বক্তব্য অত্যন্ত জটিল, প্রতিষ্ঠানেব ব্যবস্থাপনা ও মঙ্গলামঙ্গলেব আলোচনাব অন্তবালে সামযিকভাবে এখান থেকে হেড অফিসে বা অন্য কোথাও স্থানান্তবিত হওযাব আবেদন, অর্থাৎ তাঁদেব সট্‌কে পডাব ব্যাপাবটা যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেব নির্দেশে এ প্রকাব ভদ্র চেহাবা দেওযাব চেষ্টা। এঁবাই আবাব মানুষ যাতে প্যানিকি না হযে পডে তাব জন্য মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিযেছেন যে দপ্তবে বা কলে কাবখানায কাবোকে ছুটি দেওযা হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রে যদি অসুস্থতা বা এ জাতীয কাবণে ছুটি দিতেও হয, শহব ত্যাগ কবে যাওযাব অনুমতি কোনো ক্রমেই মিলবে না। সাধাবণ মানুষেব শহব ত্যাগেব ইচ্ছা তখনো মনে মনেই, হযতো মানসিক প্রস্তুতি চলছে, সক্রিয প্রচেষ্টা সুরু হযনি। কেননা যাব বললেই কাবো একমাত্র আশ্রয ছোট একটু বাডি, কাবো চাকবি, সব ফেলে, ইস্তফা দিযে, সামান্য সম্বলেব ভবসায, এই ম্যাগ্‌গিগওযাব বাজাবে অজানা অচেনা কোনো জাযগায ছুট কবে চলে যাওযা যায় না। কতদিন সেখানে থাকতে হবে তাবও স্থিবতা নেই। তাবপব বহুদিন অপেক্ষা কবেও ধস যদি না নামে ফিবে আসতে হবে নিজেব অবিবেচনা আব নির্বুদ্ধিতাকে ধিকৃকাব দিতে দিতে, এখানেই, যদিও এই নিঃসম্বল আশ্রযটাকে তখন হযতো অমিত্র বিদেশেব মতই মনে হবে। সব হাবিযেও জীবনটাতো বেঁচেছে এই সান্ত্বনাটুকুও সেক্ষেত্রে থাকবে না।

উপবেব চিন্তা থেকেই বিলিফেব কথাটা উঠেছিল। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিলিফেব প্রসঙ্গ আলোচিত হচ্ছিল। বিলিফ কি শুধু বিপদ ঘটে যাবাব পবেই দেওযা হয? বিপদেব সম্ভাবনা দেখা দিলেই কি বিলিফ দেওযা যায না? দেওযা উচিত নয? যাদেব কোথাও যাবাব উপায নেই তাদেব যদি এখনই কোনো নিবাপদ স্থানে সবিযে দেওযা হয? খুব একটা ভালো ব্যবস্থা কেউ আশা কবছে না, মাথা গোঁজাব মত একটু জাযগা, মোটামুটি খাবাব দাবাব,

স্যানিটেশন। যাদেব নজব এব চেযে উঁচু বা যাদেব উপায আছে তাবা নিজেদেব ব্যবস্থা নিজেবাই কবে নিক। খুবই ভালো কথা, বিলিফ আগে দেওয়া যাবে না এমন কোনো আইনও নেই। কিন্তু ধসেব খববটা যখন সবকাবী মহল থেকে আসেনি কে তোমাব বিলিফেব দাবি শুনছে? বাঃ, তাই বলে যে-কথা গোটা শহবটাকে ভাবিযে তুলেছে তাব কোনো ভিত্তি নেই? থাকতে পাবে আবাব নাও থাকতে পাবে, থাকলেও আমবা সেটা জানি না, অন্তত সবকাব জানে বলে আমবা জানি না। কোনো প্রমাণ আমাদেব হাতে নেই। যাই হোক, একটা দবখাস্ত দেওযা যেতে পাবে বিলিফেব ব্যবস্থা কবাব অনুবোধ জানিযে, নিদেন পক্ষে সবেজমিনে একটা তদন্ত হোক। দবখাস্তব বযান গুছিযে ভালো ইংবিজিতে লেখা দবকাব, ওপব মহলে যাচ্ছে, ঝকঝকে ইংবিজি আব তেমনি ঝকঝকে টাইপ না হলে ওঁবা পাত্তাই দেবেন না। দবখাস্ত লেখাব ভাব তাই উকিলবাবু আব ইংবিজিব অধ্যাপক মশাযেব নেওযা উচিত, কাঠামো উকিলবাবুই কববেন, তাবপব ইংবিজিটায ঘসে মেজে একটু বাহাব লাগিযে দেবেন অধ্যাপক। টাইপ কবানো হযে গেলে শহবেব মান্যগণ্যদেব দিযে সই কবাতে হবে। কে দাযিত্ব নিচ্ছে? একটা কমিটি তৈবী কবা হোক ববং। দবখাস্ত ছেড়ে দিলেই কাজ শেষ হযে যাচ্ছে না, ফলো আপ না কবলে এই আঠাবো মাসে বছবেব দেশে ফলেব আশা বৃথা। পবিস্থিতি বিপজ্জনক বলেই হযতো কিছু কিছু আপত্তি ও বাদ প্রতিবাদ সত্ত্বেও একটা মোটামুটি সর্বসম্মত কমিটি গঠন কবা সম্ভব হল। দু'দিনেব মধ্যেই ধসেব ফিজিক্যাল ও মেটাফিজিক্যাল নানা তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত গালভবা ইংবিজিতে প্রায তিন পাতাব এক দবখাস্ত যথাস্থানে প্রেবিত হল, যাব বক্তব্য —বিলিফেব ব্যবস্থা কবা হোক, সম্ভব না হলে অন্তত ব্যবস্থা বাখা হোক, তাও যদি না সম্ভব হয অবিলম্বে সবেজমিনে তদন্ত যেন অবশ্যই কবা হয। দবখাস্ত দাখিল কবাব আগে তড়িঘড়ি টাউনহলে একটা সভাও ডাকা হযেছিল। সেখানে সকলেই এই বিষযে একমত হযেছিল যে ধস যদি নামেই শহবেব অস্তিত্বেব পক্ষে তা হবে অতিশয বিপজ্জনক। বিলিফেব দবখাস্ত পাঠানোব প্রস্তাব ছাড়া আব কোনো প্রস্তাব এ সভায নেওযা হযনি, কাবণ ধসেব মুখে যাবা পড়ে তাদেব নিজেদেব জন্য কিছুই কবাব থাকে না। অবশ্য সভায ধসেব আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক নানা দিক নিযে স্বতঃপ্রণোদিত বহু বক্তৃতায অনুসন্ধিৎসুবা বিস্তব উপকৃত হযেছিল।

কোথাও একটি ভালোবাসা পুষ্পিত হচ্ছিল।

—আহ আকাশটা কি নীল।

—তোমাব চোখেব চাইতেও ?

—বাবে, আমাব চোখতো কটা। বিড়ালাক্ষী।

—না। তোমাব দু'চোখ আমাব অপাব, অসীম স্বপ্নেব নীলাকাশ। তাই আমাব কাছে তাবা স্বচ্ছ, নির্মেঘ, নীল

—তুমি এত সুন্দব বল

— তুমি এত সুন্দব তাই বলি।

—উঃ, কবিতা থামাও। আজকেব দিনটা অপূর্ব

—কবিতাব মতই

—তোমাব সঙ্গে পেবে উঠিনা, বাপু।

— পেবে না উঠলে কি ভালোবাসতেও পাববে না ?

—পাবব, পাবব, পাবি, পাবি

—তবে কাছে এসো। আমাব সাবা মুখে তোমাব অধবোষ্ঠেব অভিজ্ঞান এঁকে দাও।

–ছিঃ, এই খোলা জাযগায়। কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে !

—হায নাবী।

— বেশ, দেবো, অভিজ্ঞান নয, বাজটীকা, একটি বাব

—যথা প্রাপ্তি

একটু পবেঃ এখন ছেলেটিব বুকে মাথা বেখে মেযেটি স্থিব, ঘাসেব বিছানায শাযিত ছেলেটিব শান্ত দৃষ্টি আকাশেব নীলে, একটি হাত মেযেটিব মাথায, মাত্র একটি চুম্বনেব সম্পদে ওবা যেন সমস্ত পবিপূর্ণতাব আনন্দে তৃপ্ত ঈশ্বব-ঈশ্ববী।

হঠাৎ কোনো শব্দে যেন মেযেটিব ঘুম ভেঙে গেল, আলুথালু কাপড গুছিযে সে ছিমছাম হযে বসল ছেলেটিব পাশে। চোখ থেকে স্বপ্নেব ঘোব মুছে ফেলে এদিক ওদিক তাকাল, বলল—আচ্ছা, তুমি শুনেছ ?

—কি ?

—সবাই জানে তুমি জান না ?

— ও ধস।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা বলে ছেলেটি সিল্কের শাড়িতে মোড়া মেয়েটির নিটোল উরুতে মাথা তুলে দিতে চাইল।

মেয়েটি সরে গেল। ছেলেটি হেসে আবার আগের ভঙ্গিতে।

—ধস নামাটা যেন কিছুই না ?

—নামুক না। ঝঞ্ঝা, ঝড়, মৃত্যু, দুর্বিপাক যা আসে আসুক। বধূরে, আমার পেয়েছি আজিকে ভরেছে কোল।

ছেলেটি উঠে বসল, একটি সবল হাত বাড়িয়ে মেয়েটির ইচ্ছায় অনিচ্ছুক কাঁধে বেড় দিয়ে তাকে কাছে টেনে আনল। ফুলের মালা জড়ানো বেণি ক'বার দুলিয়ে মেয়েটি প্রতিবাদের অভিনয় সাঙ্গ করে ছেলেটির হাতের বেষ্টনীতে নিশ্চুপ নিশ্চল হয়ে রইল কিছু সময়।

ছেলেটি হাত নামাতে মেয়েটি কথা বলল।

—আচ্ছা, আমাদের যখন ঘর সংসার হবে আমাদের ভালোবাসা যখন পুরনো হবে

—আমাদের ভালোবাসা চির নতুন।

—সব নতুনই পুরনো হয়।

—পুরনো হলেই অসুন্দর হয় না।

—আমি কি তাই বলেছি ?

—তবে কি বলছ ?

—বলছিলাম তখন যদি ধস নামার আশঙ্কা দেখা দেয় আমরা কি তখনো আজকের মত নিরুদ্বেগ থাকতে পারব ?

মেয়েটির চোখে মুহূর্ত চোখ রাখল ছেলেটি, তারপর অনেকক্ষণ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থেকে কি রকম বিহ্বলভাবে ধীরে ধীরে বলল—জানি না।

কয়েকটি যুবক পাহাড়ের কিছুটা ওপরের দিকে দুদিনের একটা পর্যবেক্ষণ-অভিযানে গিয়েছিল। উদ্দেশ্য ধস সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান। এদের দুঃসাহসিকতা ও মানবপ্রেম শহরে প্রশংসিত হল। নাগরিক সম্বর্ধনা দেবার প্রস্তাব উঠল। প্রস্তাবটা অবশ্য শেষ অবধি দুটো বিরোধী মতের জন্য টিকতে পারল না। একদল বলল—মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ মেনেছে তারা মহত্তম মানবতাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, সম্বর্ধনা জানিয়ে তাদের ছোট করার প্রয়োজন নেই, মানুষের মনেই তাদের শ্রদ্ধার আসন পাকা হয়ে রইল। আরেকদলের মত—অল্প সময়ে যাহোক একটা সম্বর্ধনা দিয়ে এদের মহৎ প্রয়াসের অমর্যাদা না করাই উচিত, সময় ও

সুযোগ যদি আসে তখন এদেব যথাযোগ্য সমাদব কবতে হবে। যুবকেবা ফিবে এল। আগেও এবকম বহু অভিযানে তাবা গিযেছে, কেউ এদেব লক্ষ্যও কবে নি, মনে কবেছে বথা ছেলেদেব প্রমোদ-অভিযান। এখন পবিস্থিতি অন্য বকম। সকলেব সাগ্রহ সাদব দৃষ্টি এদেব দিকে। দেখা গেল দু'দিনেব পর্বত অভিযানও বডই কষ্টসাধ্য ব্যাপাব, দলেব অনেকেই প্রায অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায ফিবেছে।

—কিছু দেখলে? শহববাসীদেব অধীব জিজ্ঞাসা।

—কি বলুন তো?

—তোমবা ধস্ সম্পর্কে অনুসন্ধান কববাব জন্যই তো

—ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। না, কই, তেমন কিছু

—তাব মানে স্পষ্ট প্রমাণ না পেলেও আভাস

—তা ঠিক নয

—গোপন কবো না, বিপদ সকলেব।

—আমবা যাকে বলে, কিছু বুঝতে পাবি নি।

—কিছুই বুঝতে পাব নি একেবাবে?

—না, ঠিক বোঝা বা দেখা বলতে যা মানুষেব ধাবণা

—তোমাদেব কথা থেকে মনে হচ্ছে স্পষ্ট প্রমাণেব অভাবেই তোমবা বলতে দ্বিধা কবছ।

—ঠিক বোঝাতে পাবব না বাতাসে কেমন যেন হযতো আমাদেব মনেবই ভুল

ভযটা পক্ষবিস্তাব কবল। অভিযাত্রী যুবকেবা ধসেব সংকেত পেযেছে। পাহাডেব শবীবে প্রকৃতিব অশুভ শক্তিবা যে ভযানক চক্রান্ত সম্পূর্ণ কবে এনেছে তাব বিষাক্ত নিশ্বাসেব স্পর্শ অনুভব কবেছে তাবা। মন যাদেব একাগ্র, ইন্দ্রিযেব শক্তি তীক্ষ্ণ, তাবা আসন্ন ঘটনাব ইঙ্গিত পায। সজ্ঞান বিচাবে না বুঝেও, প্রকৃতিব সঙ্গে তাদেব গভীব অন্তবঙ্গতাব সূত্রে, এই যুবকেবা অমঙ্গলেব পূর্বচ্ছাযা দেখেছে। মানুষেব মনেব অতলে এমন আশ্চর্য ক্ষমতা আছে যাব দ্বাবা যে-সব লক্ষণ ইন্দ্রিযগ্রাহ্য নয তাও মানুষ সময বিশেষে ধরতে পাবে। যেমন অন্ধবা অনেক সময শব্দ বা গন্ধ ছাডাই মানুষ বা বস্তুব উপস্থিতি বুঝতে পাবে। এভাবে বিজ্ঞ ও অবিজ্ঞ জনেব নানা আলোচনায ভযটা মনস্তাত্ত্বিক তথা আত্মিক বিভূতি লাভ কবছিল।

বলা বাহুল্য ঐশ্ববিক নিবাপত্তাব কযেকটা কর্মসূচী নেওযা হল। চার্চে, মসজিদে সমবেত প্রার্থনা। হিন্দুদেব পাড়ায পাড়ায বাবোযাবী পূজানুষ্ঠান। অনেক দেবদেবীই পূজিত হতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দুটি পল্লীতে এই উপলক্ষ্যে ওলাই চণ্ডী ও শ্রীশ্রীশীতলামাতাব পূজানুষ্ঠানেব উদ্যোগ অনেকেব দ্বাবাই সমালোচিত হতে লাগল, যেহেতু উক্ত দেবীবা এতবড বিপর্যয ঘটানোব মত শক্তিব অধিকাবিণীই নন।

ঃ বিলিফেব দবখাস্তটাব কি হাল জানেন কিছু?

ঃ না, কোনো খবব নেই।

ঃ বিলিফ কি আসবে মনে হয?

ঃ কি জানি

আফিস অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ভদ্রলোক পব পব কযেকটা সামাজিকতাব ধাক্কায ইনসিওবেন্সেব দুটো প্রিমিযাম বাকি ফেলতে বাধ্য হযেছেন। অথচ এ সময প্রিমিযাম বাকি বেখে পলিসিতে একটা খুঁত বাখা । এত টাকা একসঙ্গে জোগাড কবাও শক্ত। এক ভবসা এ বিপদ যদি আসেই যাকে বলে সবংশে নির্বংশ পলিসি, পলিশি-হোল্ডাব নমিনি, মায ইনসিওবেন্সেব অফিস সবশুদ্ধু ই একটা চিঁডেচটকানো কাণ্ড তবু ধাব টাব কবে দিযে দেওযাই ভালো কেউ যদি ছিটকে গিযে বেঁচে যায, চান্স যদিও নিল, তবু বলা যায না, অঘটন আজো ঘটে দুশ্‌শালা, ওটাতো একটা অখাদ্যি বইযেব নাম মরুক্‌গে। গিন্নীব পিকিউলিযাব আবদাব শুকনো খাবাবেব লম্বা এক লিষ্টি, ওযাটাব বটল তিনটে, ফার্ষ্ট এইডেব বাক্স কেনো, কিনে মব ধস জিনিসটা যে কি তা কি একটু ইমাজিনেশন খাটিযেও বুঝতে পাবে না পাহাডটা ফুটিফাটা হযে যখন হুডমুড কবে ধ্বসে পডবে ঘাডেব ওপব দূব, দূব, মেযেমানুষ কখনো আর্গুমেণ্ট বোঝে কেনো, প্রাণ যা চায কেনো গিযে । এই ডামাডোলে খোকনেব ইণ্টাবভিউটা না কেঁচে যায কদিন ধবে যা মেজাজ দেখা যাচ্ছে সেন সাযেবেব ·· তবু বলে কযে ধসেব আগেই যদি ইণ্টাবভিউটা তাবপব কপালে যা আছে তাতো হবেই·

একটি মহৎ উপন্যাসেব বিষযেব জন্য গল্পলেখক অনেক দিন ধবেই অপেক্ষা কবে আছেন। এতদিনে সেই বিষয তিনি পেযেছেন। চবম বিপর্যযেব মুখোমুখি দাঁডিযে এই শহব। মানুষকে পর্যবেক্ষণ কবাব এব চেযে চমৎকাব সুযোগ আব হতে পাবে না। এবকম সমযেই মানুষ তাব যথার্থ স্বরূপে বেবিযে

আসে—সমস্ত মহত্ত্ব ও সমস্ত নীচতা নিয়ে। লেখক ঘুবছেন, দেখছেন কথা বলছেন, শুনছেন। নোট বইয়েব পাতায় পাতায় বহু সংক্ষিপ্ত বেখাচিত্র তিনি ধরে বাখছেন, যেগুলি তাঁব প্রথম উপন্যাসে বর্ণাঢ্য, বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ কববে। কিন্তু এই বিপুল ঐশ্বর্য হাতে পেয়েও তিনি বিমর্ষ। কেননা উপন্যাস যদিও জীবনেবই লিখন, তবু লেখক এক্ষণে জীবন থেকে ডিটাচমেণ্ট প্রত্যাশী, ডিটাচমেণ্ট সকল মহৎ শিল্পকর্মেব প্রথম ও প্রধান শর্ত বলে তিনি মনে কবেন, এবং ডিটাচমেণ্টকে তিনি বর্তমানে শাবীবিক অর্থেই ধবেছেন। শাবীবিক অর্থে বিশেষভাবে এ কাবণে যে শাবীবিক ডিটাচমেণ্ট ছাড়া ধসেব পবে উপন্যাস লেখাব জন্য তাঁব বেঁচে থাকাব সম্ভাবনা খুবই কম। আব উপন্যাস লেখাব জন্য যদি বেঁচেই না থাকা গেল তেমন প্রাণান্তকব ঘটনাব মধ্যে যাওয়া কেন? অর্থাৎ উপন্যাসই যদি লেখা না হল তবে আব অভিজ্ঞতাব মূল্য কোথায়? উপন্যাস লেখাব আকাঙ্ক্ষায় মৃত্যুকে তখনই ববণ কবা যায় যখন দুটো অভিজ্ঞতাই কাবো কাছে সমান কাঙ্ক্ষিত। ঔপন্যাসিক তো ছিটগ্রস্ত বা আত্মহত্যাকামী নন যে উপন্যাস লেখা হোক চাই না হোক যে কোনো মূল্যে অভিজ্ঞতাব সঞ্চয় বাড়ানোই তাঁব কাজ। অথচ শাবীবিক ডিটাচমেণ্টেব কোনো উপায় কবা যাচ্ছে না, সেহেতু লেখক বড়ই অস্থিব, বিষণ্ণ।

: বিলিফেব কোনো খবব?

: নাঃ, হোপলেস।

: আমি জানতাম বিলিফ আসবে না।

: তবু বিলিফেব আশা আমাদেব কবতেই হয়।

শোনা যাচ্ছে কাবখানাব শ্রমিক আব উপকণ্ঠেব চাষিবা শাবল, কোদাল, গাঁইতি নিয়ে বেবিয়ে পড়েছে। নিজেব এলাকাগুলিকে বাঁচাবাব জন্য তাবা নাকি মাটি আব পাথবেব দুর্ভেদ্য আড়াল খাড়া কববাব কথা ভাবছে। প্রত্যক্ষ-দর্শীবা বলছে আসল বস্তুব চেহাবা আব ক্ষমতা কি হবে বলা যাচ্ছে না, তবে ওদেব এলাকাব আশে পাশে বেশ কিছু পাথবেব চাঙড আব মাটি ওবা ডাঁই করেছে। এ খববে ভদ্রপল্লীতেও এবকম কিছু একটা কবাব প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। তাবপবই অবশ্য বিপুল শ্রম, যন্ত্রপাতিব অভাব, অনভিজ্ঞতা ইত্যাদিব প্রশ্ন বিবেচনা কবে দেখা গেছে এ ধবনেব নিবর্থক প্রচেষ্টা মূর্খ শ্রমিক আব চাষিদেবই সাজে। মাটি আব পাথবেব দেয়াল খাড়া কবে ধস ঠেকানো যায় না। উচ্চস্তবেব যন্ত্রবিদ্যাব জ্ঞান, প্রচুব অর্থ ও দীর্ঘদিনেব চেষ্টাব দ্বাবাই এ

কাজ সম্ভব। উৎসাহ উদ্দীপনা ভালো জিনিস, তবে অকাজে শক্তিক্ষয় কবা বোকামি, অশিক্ষিত মূর্খদেবই এটা মানায। কিন্তু এসব যুক্তি এমন তীব্রভাবে উপস্থাপিত হচ্ছিল যাতে মনে হতে পাবে কাবো মূর্খতাকে উপেক্ষা বা করুণা কবা নয, যেন একটা গোপন ঈর্ষাই ভিতবে ভিতবে কাজ কবছিল।

অদ্ভুত একটা খেলা চলছিল। ভাগ্যবান ও ভাগ্যহীনেবা, যাদেব উপায আছে এবং যাদেব উপায নেই, জীবিকার্জনেব ক্ষেত্রে যাবা কর্তা এবং যাদেব ওপব কর্তৃত্ব চাপানো আছে—সবাই এই শ্বাসরুদ্ধকব ভযেব পবিমণ্ডল থেকে পলাযনেব তীব্র ইচ্ছায ছটফট কবছিল, কিন্তু একটা কর্তৃপক্ষীয বা গুরুত্বসমন্বিত ঘোষণাব অভাবে কেউ তাব ভয ও পলাযনেচ্ছাকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত বা কার্যকবী কবতে পাবছিল না।

যাঁব চিন্তাশীলতা উন্নাসিকতায ওতপ্রোত জড়িত, মতামতেব প্রকাশে যিনি তিক্ত, নির্মম, অবিশ্বাসী, স্বীয শিক্ষণীয বিষযেব প্রতিও যাঁব অশ্রদ্ধা চবম ও সুনিশ্চিত, দর্শনশাস্ত্রেব সেই অধ্যাপক, যিনি এতাবৎকাল ছাত্রদেব কাছে অবিচল প্রত্যযে বা অপ্রত্যযে ঘোষণা কবেছেন দর্শনশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ সাববস্তু যদি কোথাও থেকে থাকে তা জডবাদী দর্শনেই, তিনি সাম্প্রতিক একটি বক্তৃতায ছাত্রদেব বলেছেন—আমবা বোধ হয ধ্বংস হতে চলেছি। এ সম্পর্কে আমাব মনোভাব কি তা তোমাদেব জানাব ইচ্ছা হতে পাবে। শংকবেব মাযাবাদ বা ঐ জাতীয বাবিশ না মেনেও বলা যায শেষ পর্যন্ত কিছুই তো থাকে না, বিনষ্টিই চূডান্ত ভাগ্য মানুষেব, সভ্যতাব, সব কিছুবই, অতএব

ঃ বিলিফেব জন্য কাবোই যেন মাথা ব্যথা নেই!

ঃ অবাক কবলেন। বিলিফ আমবা সবাই চাই, কিন্তু বিলিফ যে আসবে না তাও জানি। লটাবিব টিকিট কেটে পুবস্কাব পাবাব একটা অবাস্তব আশাব মত বিলিফেব আশাটাও আমবা লালন কবতে ভালোবাসি।

ঃ লটাবীব পুবস্কাব কেউ কেউ তো পায।

ঃ তাতে একটা শহব বা জনসমষ্টিব ভাগ্য ফেবে না।

কবি একটা ভযানক সুন্দব, সৃষ্টি ও ধ্বংসেব চবম ব্যঞ্জনায বক্তাক্ত চিত্রকল্পেব জন্য উন্মাদেব মত হাতড়ে বেডাচ্ছেন। ঘবেব দবজা জানালা সব বন্ধ কবে দিযেছেন তিনি, চৈতন্যেব গভীবে ডুব দেওয়াব জন্য বহির্বিশ্ব থেকে নিজেকে সবিযে বেখেছেন, যদিও তাব বর্তমান কবিতাব প্রেবণা এসেছে বহির্বিশ্বেবই ধস নামাব সংবাদ থেকে। তীব্র গাঢ় নৈশায তিনি নিজেকে আচ্ছন্ন কবে বাখছেন।

শিল্পী এ সময ভাবছিলেন এবাব শুরু হবে মবীযা মানুষেব পলাযন। তিনি অনুভব কবতে পাবছিলেন বিবাট একটা পলাযনেব সমস্ত মানসিক প্রস্তুতি প্রায শেষ। এই ধ্বস তাঁব মনে প্রথমত একটি নিসর্গ-চিত্রেব প্রেবণা এনেছিল যাব নাম তিনি ভেবেছিলেন দি ল্যাণ্ড-স্লাইড। তাবপব একটি মহত্তব চিত্রেব কল্পনা তিনি কবেছিলেন—বিবাট ধ্বংসেব মুখোমুখি মানুষ প্রদীপ্ত সংহত সাহসেব মুঠি তুলে দাঁডিযেছে—দি গ্রেট স্ট্রাগল। এখন যে ছবিটাব কথা তিনি ভাবছেন তাব নাম হবে দি গ্রেট একৃসডাস্।

ঃ বিলিফেব কি খবব ?

ঃ আব বিলিফ—

সেদিন বাত্রে প্রবল বর্ষণ শুরু হল। বর্ষণ এ সময অস্বাভাবিক নয। কিন্তু এই তীব্রতা, যাব সাক্ষী ছিল পবিত্যক্ত বাজপথেব ভৌতিক ল্যাম্পপোষ্টগুলি ও কিছু ভবঘুবে কুকুব, শুধুমাত্র তাব ধ্বনিব ঐশ্বর্যে বিছানাব উষ্ণ আবামে আশ্লিষ্ট মানুষগুলিব চেতনায অতিপ্রাকৃত শঙ্কাব অনুভূতি জাগিযে তুলছিল। তাবা যেন দেখছিল জলেব সূক্ষ্ম ধাবাগুলি নবম নিঃশব্দ চিতাবাঘেব থাবায পাথবেব গভীব থেকে গভীবতব স্তবে নেমে যাচ্ছে, বিচবণ কবছে, তাদেব অনিবার্য সর্পিল নখবগুলি কুবে কুবে পাহাডেব দেহকে হিংস্র শ্বাপদেব লালায জাবিত হতভাগ্য শিকাবেব মাংসেব মত নবম পিণ্ডে পবিণত কবছে। আব সর্বোচ্চ স্তবে বর্ষণ নাগিনীব সহস্র ফণায নির্মম আক্রোশে ছোবলেব পব ছোবল হানছে। বনস্পতিব শিকডেব বন্ধন শিথিল হতে হতে পাথবেব বড বড চাঁইগুলি এখনো বিপজ্জনক ভাবসাম্য বক্ষা কবে চলেছে। এই ভাবসাম্য বিধ্বস্ত হতে আব সামান্য একটু পিচ্ছিলতাব সুযোগ মাত্র প্রযোজন সহসা সর্বগ্রাসী সামুদ্রিক গর্জনে পবিচিত দৃশ্যপট যেন গলে গলে বিপুল ঝর্ণাব মত তবঙ্গিত হযে সানুদেশে নেমে আসতে থাকবে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো মুহূর্তেব ভগ্নাংশে ·· হযত বিধ্বংসী পতন শুরু হওযাব প্রযোজনীয প্রেবণা—বাযুস্তবেব বিশেষ একটি কম্পন—ছুটে আসবে একটি মাত্র বজ্রনির্ঘোষ থেকে,যা এখন অবিবাম বৈদ্যুতিক উজ্জ্বলতায গর্জনশীল। অন্ধকাবেব অন্তবালে জল বাতাস বজ্র বিদ্যুৎ এবং নিসর্গেব অন্যান্য ধ্বংসেব শক্তিবা মত্ত এক ভযঙ্কব খেলায। হাওযাব পীডনে পীডিত গাছেব আর্তনাদ, অতি দীর্ঘ নিশ্বাসেব মত বাতাসেব তীব্র, অশুভ শ্বনন, নৃশংস চাবুকেব মত বৃষ্টিব ধাবালো চিৎকাব—পার্বত্য বর্ষণেব একান্ত পবিচিত

এ সকল শব্দ এখন এই পাহাড়ী শহরের দুঃস্বপ্ন-কাতর অর্ধ-নিদ্রিত সত্তায় আশ্চর্য ভীষণ তাৎপর্যে অন্বিত।

পরের সকাল নির্মেঘ, প্রসন্ন, সূর্যকরোজ্জ্বল।

ঘরের বাইরে এসে শহরবাসীদের মনে হল তারা এক অবাস্তব দুঃস্বপ্নের জগতে নির্বাসিত ছিল এতকাল। তারা আশ্বস্ত ও আত্মনির্ভর বোধ করল। দেখা গেল যাদের উপায় ছিল এমন অনেকেই রাত্রের অন্ধকারে শহর ছেড়ে পালিয়েছে। তারা অত্যন্ত সহজভাবে ব্যাপারটাকে নিল।

সংবাদপত্রের জন্য তারা সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সংবাদপত্র এল না। বেতারে সংবাদ এল এই শহরের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগের একমাত্র পথটি প্রবল বর্ষণে বিধ্বস্ত। ভগ্ন সেতুর এপারে একদল যাত্রী অসহায়ভাবে অপেক্ষমান। পলাতকদের এই ভাগ্য জেনে শহরবাসীরা করুণায় মৃদু হাসল।

সেই সকালে আকাশ কাশগুচ্ছের মত শরতের শুভ্র মেঘ ও নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত। তখন সহসা সকল চরাচর যেন গুম গুম শব্দে কেঁপে উঠল। প্রথমে যা ছিল দূরাগত, ভ্রমর গুঞ্জনের মত, ধীরে ধীরে সেই শব্দ প্রবল গম্ভীর ছন্দে নিনাদিত হতে লাগল, ঊর্ধ্বলোক হতে আগত ভয়াবহ শব্দের প্রবাহই যেন ক্রমে ধস বা হিমবাহের প্রলয়ংকর শরীর গ্রহণ করবে

কিন্তু মানুষগুলি এইবার আতঙ্কিত হল না, খোলা মাঠে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা দাঁড়াল, সম্ভাব্য আক্রমণের দিক লক্ষ করে তারা নির্ভীক ভ্রূকুটি হানল, মানুষ আরেকবার অনির্বচনীয় মানুষী মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কারণ তারা নিঃসন্দেহে জেনেছে রিলিফ আসবে না।

পুস্তক-পরিচয়

আগুন ফুলের মালা : অজিত মুখোপাধ্যায়। সারস্বত লাইব্রেরী। দাম তিন টাকা

অব্যবস্থিত এই বর্তমানে আমাদের দৃষ্টি অনেকটাই আচ্ছন্ন। সুশৃঙ্খল ভাবনায় ভবিষ্যতকে সাজিয়ে তুলবার কোনো নিশ্চিত প্রকল্প প্রস্তুত নেই কোথাও। বিভ্রান্তি আছেই, জীবনে এবং সাহিত্যেও। সাহিত্য তো শুদ্ধ-বিবেকের প্রকাশ। শিল্পী—তাঁর প্রতিভার টানে নানামুখী বিভ্রম দীর্ণ করে পান দেশকালের শুদ্ধ উপলব্ধি। কিন্তু আমাদের সাহিত্যও আশাভঙ্গেরই দৃষ্টান্তে পরিকীর্ণ ইদানীং।

এমন মুষড়নো পরিবেশে কেউ যদি সীমিত ক্ষমতারও সততার সঙ্গে জীবনের খণ্ডিত কোনো সত্য আত্মস্থ করতে চেষ্টা করেন, আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করি। ষাট পাতার পরিসরে বড়ো একটি গল্প (উপন্যাস ?) 'আগুন ফুলের মালা'—এই রকম একটি চেষ্টা। গত বিশ বৎসর এবং অনাগত ভবিষ্যতের পটে ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের বিস্ফোরণ আকস্মিকভাবে একালের ইতিহাসের নিহিত তাৎপর্য যেন দীপ্ত করে তুলেছিল। অজিত মুখোপাধ্যায় শোভেন-কনু-টুকুর গল্পে সেই তাৎপর্য ধরতে চেষ্টা করেছেন। আমাদেরই পরাহত পৌরুষ যেন শোভেন, আমাদেরই জরাজীর্ণ অস্তিত্ব কনু, টুকুর অকুতোভয় মৃত্যুতে আমাদেরই ঈপ্সিত মহিমা ঝলকে ওঠে। এই গল্পে অজিতবাবু প্রতিপক্ষের যেসব মানুষ এনেছেন তাঁদের কেমন যেন বানানো মনে হলো আমার। খুবই ছকে ফেলা চরিত্র এরা—সুন্দর চৌধুরী বা পরিতোষ।

সত্যজিৎ চৌধুরী

১ হে অগ্নি, প্রবাহ—রাম বসু, ২. এখন সময় নয়—শঙ্খ ঘোষ, ৩ আমার হাতে বক্স—কৃষ্ণ ধর, ৪. অস্থি মজ্জা মাংস ইত্যাদি—শান্তি লাহিড়ী, ৫. নীলকণ্ঠ পাখির সময়—সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৬. প্রতিবিম্ব—পরেশ মণ্ডল, ৭ এ যেন রাত্রিবেলা—সত্য গুহ, ৮. তোমার জন্যেই বাংলা দেশ—তরুণ সান্যাল। গ্রন্থজগৎ। প্রতিটি পুস্তিকার দাম পঞ্চাশ পয়সা।

'অনুভব কবিতা সিরিজে'র বই দেখে সহজেই মনে পড়বে এক পয়সায় একটি পুস্তিকামালার কথা। উদ্দেশ্য এক হলেও দুটির মধ্যে পার্থক্যও আছে। এক পয়সায় একটি-র বইগুলি লেখকরা নিজেরাই বার করতেন,—সুলভ হলেও

একটি স্বতন্ত্র বই-এর পুরো মর্যাদাই তাদের দেওয়া হত। কিন্তু 'অনুভব কবিতা প্রচার' সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। তার একটি বই সিরিজের অন্যতম, যেন ততটা স্বতন্ত্র নয়, আলাদা হলেও মলাটে একই ছবি। সম্পাদিত কবিতার বইতে পাঠক স্বাভাবিকভাবেই জানতে চান, কবিতাগুলি কোথা থেকে কী ভাবে সংগৃহীত। এখানে কোথাও তার উত্তর নেই। এক পয়সায় একটি-র প্রত্যেক বইতে কবিতা সংখ্যা ছিল ষোলো, এই সিরিজে পৃষ্ঠা-সংখ্যা ষোলো। ফলে কবিতা যত ছোট তত বেশি ধরে গেছে, গুণগত ওজনও সেই পরিমাণে বেড়েছে।

রাম বসু-র 'হে অগ্নি, প্রবাহ' সিরিজের প্রথম বই। সারা বই জুড়ে একটিই টান। হয়তো সম্পাদকের ইচ্ছানুসারে। তমসাবৃত কাল, দেশ এবং আলোকোজ্জ্বল আকাশ—এই দুয়ের মধ্যখানে কবির 'আমি'।—দেশ-কালে বিদ্ধ, জর্জরিত, তবু 'দুই বাহু প্রসারিত' নীলিমায় 'আমি' কখনো-বা প্রসারিত 'আমরা'য়। সমাজ রাজনীতির প্রসঙ্গ খুব স্বাভাবিক ভাবেই স্থান পেয়েছে তাই কবিতাগুলিতে।

শব্দ-ব্যবহার বা ধ্বনি-সৃষ্টিতে কবির আগ্রহ খুব স্পষ্ট নয় এখানে। একই অর্থ-অনুষঙ্গে একই শব্দ বারবার প্রয়োগের ফলে কবিতা পাঠের উত্তেজনা হ্রাস পায়। যেমন,

ক "অনেক হাত আমি দেখেছি যা থাবা, সেখানে অনেক হৃদয়ের মাংস"
—'হে অগ্নি, প্রবাহ'

"তার আঙুলের ফাঁকে কখনও মাংস জড়িয়ে ছিল।" —'গায়ত্রী'

"গলিত মাংসের গন্ধ পার্কের ভিতরে।" —'স্বপ্নের রচনা'

খ "দহনের স্তবকগুলি চোখের ওপর হয়ে যাবে নক্ষত্রমণ্ডলী—'বর্বর্ণি নক্ষত্র আমার'

"শান্তির নিটোল বৃত্তে মুখ রেখে আমি

"নক্ষত্রপুঞ্জের সুগন্ধি নিলাম, সখি। —'তোমার পায়ের নিচে'

"সেইটুকুই মাধুর্য যা ডানার বিথার থেকে মিলে যায় নক্ষত্রপুঞ্জে

—'দুই বাহু প্রসারিত করে যাবো'

'রাত দুটোর গল্প' 'হাইড রোড' এবং 'ছায়ার নিচে'—এই তিনটি কবিতা বাদ দিলে অন্য সব কবিতাগুলির থীমই পৌনঃপুনিক। 'হাইড রোড' কবিতায় "মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে অচৈতন্য বিমর্ষ বিকেল / হাওয়ায় আইডিন আর

ক্লোবোফর্ম”—পংক্তি দুটিতে এলিযটেব সুপবিচিত পঙ্‌ক্তিব ব্যবহাব অতি প্রত্যক্ষ। তবু কবিব নিজস্ব সুন্দব চিত্রকল্পও অনুপস্থিত নয—

“তবু ছাখো আমাব চোখেব মণি জলস্রোত ফুল
আব দুই হাত তুলে নিল আবতিব দীপাধাব
তোমাব পাযেব নিচে বৃক্ষ হলে
জীবনেব নাম হবে শস্য সমাবোহ।” ‘তোমাব পাযেব নিচে’

‘এখন সময নয’-এব যে প্রকাশ সময দেওযা আছে তাতে মনে হয এ বই না প্রকাশ হলেও ক্ষতি ছিল না। একই সময প্রকাশিত ‘নিহিত পাতাল ছাযা’য এব সব কবিতাই আছে একটি বাদে। তবে বইটিকে একটা নিজস্ব চবিত্র দেবাব চেষ্টা কবেছেন সম্পাদক্। একটি কেন্দ্রীয থীম কবিতা থেকে কবিতায খুলে খুলে গেছে। পুনরুক্তি নয, বিকাশ।

‘এখন সময নয’ পুস্তিকাব নাম—কিসেব সময নয এখন ?—কবিব উত্তব—

“যে সব শামুক তোমবা তুলে এনেছিলে
তাব মধ্যে গাঢ় শঙ্খ কোথাও ছিল না।

আমি চাই আবো কিছু নিজস্বতা অজ্ঞাত সময।” —‘সময’

এখন তবে সময হযনি আত্মপ্রকাশেব। ‘গাঢ় শঙ্খেব’ অন্বেষণায এখন অজ্ঞাতবাস। আত্মদর্শনেব সেই পথে কবি একা—‘জবালা যাবাব পথ আমাকেই খুঁজে নিতে হবে’ এবং এপথ স্বভাবতঃ অন্তঃনির্দেশী—‘যতোই এগিযেই আনো আমি আবো মুঠো কবে সব/নিজেব ভিতব দিকে টান দিই’। কিন্তু ‘বাহিব’-এব প্রতিও যে কবিব টান দুর্দম—‘ঘব’ নামে দুটি কবিতায প্রতিন্যাস তা বলে দেয। তাই ভিতবে আনতে চাওযা মানে বাহিবেব সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা নয—

“এখন ঠিক সময তো নয
শবীব আমাব জন্ম-জামিন
পথিক জনস্রোতেব টান
তাব ভিতবে এমন উজান
আমি আড়াল চেযেছিলাম পিছনদাঁড়ে।” ‘আড়াল’

ভিতব-বাহিবেব দ্বন্দ্বেই ববং কবিব সত্তা-সংকট স্থাপিত। ‘জন্মদিন’ ‘চাবি’ ও ‘জাবাল’ কবিতায এব আভাস মেলে, এবং সব থেকে টান টান হযে ওঠে সে সংকট ‘সুন্দব’ কবিতায। ‘নিহিত পাতাল ছাযা’ব উৎস আত্মস্বরূপেব

মধ্যেই খুঁজেছেন কবি। নিজেকে চিহ্নিত করেছেন ‘সুন্দর’-এর হত্যাকারী-রূপে। সে আত্মস্বরূপ তার নিঃসাড়তায় তার গর্ব-দৃপ্ত পাপবোধে সমগ্র আধুনিক মানসের সঙ্গে যুক্ত, তার প্রতিভূ। অহঙ্কারী কণ্ঠস্বর হঠাৎ ভেঙে ফেলে নিরূপিত ছন্দের আধার—পূর্বনিরূপিত অন্যান্য মূল্যবোধগুলির মতো। কিন্তু কবিতার শেষ দুটি পংক্তিতে বেজে ওঠে এক অপ্রত্যাশিত বাণী—‘যদি বা নিজের ছায়া নিজেকে জড়িয়ে ধরে বলে / ‘তুমি কি সুন্দর নও বেঁচে আছ কেন পৃথিবীতে’ —এ বাণী কবির ভিতর মহলের, উদ্ঘাটিত আত্মস্বরূপের আরেক দিক, - সেখানে ‘সুন্দর’-এর প্রতিষ্ঠা।

ভিতর-বাহিরের এই দ্বন্দ্ব কখনো করুণ হয়েছে আইরণির নিরাসক্তিতে,—যেমন, ‘নষ্ট’ কবিতায়।

একদিকে যেমন এই কবি গড়ে নিয়েছেন স্বকীয় এক গাঢ় রূপকল্প, অন্য দিকে সচেতন প্রয়াসে শব্দের ব্যবহারে এনেছেন নিজস্বতা। ‘চমঝমক’-প্রিয় পাঠককে তিনি স্বভাবের গভীরতার সরলতায় ফেরাতে চান।—‘শব্দগুলি খুলে যাক, খুলে খুলে যায়— যেমন বা ভোর’ (নাম)। ‘এমনি ভাষা’ কবিতাটি মনে পড়িয়ে দিতে পারে ‘খেয়া’র উৎসর্গ-পত্রের কবিতাটির কথা। দুয়েই আছে লজ্জার অনুষঙ্গ।

হয়তো এই কারণে ‘খেয়া’কেও কেউ কেউ মিষ্টিক কাব্য ভেবে থাকেন। কিন্তু ‘এখন সময় নয়’-এর কবি লজ্জা অস্বীকার করেন—‘মনে কি ভাবো লাজুক আমার এমনি ভাষা’ (এমনি ভাষা)। আত্মপ্রকাশ নয়, আত্মসংবরণ যাঁর কবিতার অভিপ্রায় তাঁর তো এমন ভাষারই প্রয়োজন। পুস্তিকার প্রথম কবিতাটিকে একটু খাপছাড়া মনে হয়, মনে হয় না-থাকলেই ভালো হত, ‘সময়’ হতে পারত যথার্থ শুরু।

‘এখন সময় নয়’-এর কবিতা-সংখ্যা যেখানে সাতাশ, ‘আমার হাতে রক্ত’ সেখানে মোটে আটটি কবিতার সমষ্টি। শুধু এই কারণেই পুস্তিকাটি খেলো লাগতে পারে, কিন্তু অন্য কারণও আছে। প্রথম দুটির মতো এই পুস্তিকা চরিত্রবানও নয়। একটি কবিতার শেষ লাইন ‘আমি স্বেচ্ছাবন্দী হলাম নরকে’ দ্বিতীয়টির ‘আমি শুধু বিস্ময়ে রামধনু’,—বিযুক্ত বোধ-এর যোগ্য দৃষ্টান্ত।

কবিতাগুলি পড়ে কবির ভাষা বুঝে নেবার উপায় নেই। চলিত ভাষার মাঝেমাঝে ‘পূষনেরে সম্ভাষি’ ‘মিল খুঁজতেছিলাম’ ‘কোথায় নামছে ইহা’ ইত্যাদি বাক্যাংশগুলি উদ্ভট শোনায়।

'অস্থি-মজ্জা-মাংস ইত্যাদি' মনে পড়াতে পারে স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের 'আমি তারে ভালোবাসি অস্থি-মাংস সহ'। কবির বক্তব্যও অনেক সময় তাই। কিন্তু কৈফিয়ত কেন ?—'আমি এই অস্থির শব্দটি নিরুপায় হয়ে লিখে ফেলি / কবিতা লেখার জন্য হতে ভালো লাগে না কৌশলী।' 'যোনি' শব্দ বাঙলা কবিতায় এতদিনে হয়তো পচতে শুরু করেছে।

নারীদেহ, তার অঙ্গাভরণ, রূপটান ইত্যাদি অনুষঙ্গ খুব বেশি পাওয়া যাবে কবিতাগুলিতে। যেমন, 'নাভিদেশ' 'জরায়ু' 'বিনুনি বাঁধি'-'নীল শাড়ি' 'জরির ঝালর দেয়া সায়া' 'নূপুর' 'সুর্মা' 'আলতা' ইত্যাদি। পারিপার্শ্বিক ও সময়ের দূষণে কবির যে ঈপ্সিত প্রণয় পূর্ণ হতে পারছে না সে যেন শুধুই বিলাসগত—এই সব অনুষঙ্গের ব্যবহার তেমন ধারণা করায়। টুকরো শব্দ টুকরো ছবি যেন কোনো গভীর বেদনার তলে এসে মিলিত হয় না। অপরিতৃপ্ত থেকে যায় পাঠকের প্রত্যাশা।

আধুনিক কবিতা কখনো কখনো সত্যিই হয়তো শুধু শব্দের পারমুটেশন কম্‌বিনেশন, এবং সব সময় খুব কৌশলীও নয়—এই রকম মনে হয় 'নীলকণ্ঠ পাখির সময়' পড়ে। 'অন্ধকার' শব্দটি সহজেই কাজে লাগানো যায় কবিতায়, কারণ সফোক্লিস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এ শব্দের বহু মাত্রিক ব্যবহার আমরা দেখে এসেছি। আলোচ্য পুস্তিকার ষোলোটি কবিতার মধ্যে এগারোটি কবিতায় 'অন্ধকার' শব্দ একাধিকবার ব্যবহৃত। কী ধরণের ব্যবহার দেখা যাক। 'বিস্মৃতি নিয়ে' কবিতার শুরু "আকাশের রঙ মেখে মা তার ছেলেকে ডাকে / অন্ধকারে নীলকণ্ঠ পাখীর মতন"—অন্ধকারের বৈপরীত্যে ঝরে পড়ছে নীলকণ্ঠ পাখীর মতো মায়ের আহ্বান। এরপরে, 'রজনীগন্ধার মতো অন্ধকারে' —যে উপমায় অন্ধকারের নঙর্থকতা আর বজায় থাকে না। কিন্তু পরেই কবি যখন বললেন 'আমার দুচোখ অন্ধ পৃথিবীর সুতীব্র আঁধারে'—তখন আবার নঙর্থকতা স্বীকার করাই হল। শেষ স্তবকের শুরুতে অন্ধকার আর বৈপরীত্য নয়, নীলকণ্ঠ পাখীর স্বরটাই অন্ধকার, নীলকণ্ঠ পাখি আবার রজনী-গন্ধার মতো। এরপর 'অন্ধকার শুধু অন্ধকার' বলে যখন কবিতা ফুরোয় তখন সে অন্ধকার কী বা বোঝাতে পারে আর।

শিল্প-সচেতনতা তখনই ফলবান যখন তাগিদটা আসে কবিতার ভিতর মহল থেকে। 'প্রতিবিম্ব' নামের পুস্তিকাটিতে এমনি এক ফলবান প্রচেষ্টা চোখে পড়ল। যদিও এঁর রূপকল্পের ব্যবহার প্রায়ই কোনো না কোনো

বিদেশী সাহিত্যিককে মনে পড়ায। কবিতাব বাক্য এমন কি শব্দকেও ভেঙে ভেঙে এমন ভাবে সাজাতে চাইতেন কামিংস্, যাতে মাত্র গড়নটাও কবিতা-বোধেব সহাযক হযে উঠতে পাবে। শ্রেষ্ঠ কবিতায নিশ্চযই তাব কোন প্রযোজন নেই,—কিন্তু সব কবিই তো শ্রেষ্ঠ কবি হতে পাবেন না। তাই 'প্রতিবিম্ব' কবিতায একটি কবে শব্দেব পংক্তি আঁকাবাঁকা সাজানোয যখন জলেব মধ্যে কাঁপা কাঁপা ভাঙা ভাঙা প্রতিবিম্বেব আদল আসে, দীর্ঘ ক্ষীণতনু প্রতিকৃতিব ধাবণা জন্মায, কবিব একাকীত্ব প্রতীত হয, তখন ব্যাপাবটা মন্দ লাগেনা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ববং উনগাবেত্তিব গাঢতম আযতনেব অনুসবণ আবো সম্ভাবনাময মনে হয। তবে অভিজ্ঞতা নৈর্ব্যক্তিক, সাধাবণ হতে না পাবলে এ ধবণেব রূপকল্প স্বভাবতই বন্ধ্যা। উনগাবেত্তি যখন বলেন 'I listen to a Love of other floods', তখন তিনি সমগ্র মানবজাতিব আশাবাদেব প্রতিভূ হযে ওঠেন। অথচ একলা নোযাহ্‌ব কাছেই শুধু নবসৃষ্টিব বার্তা পৌঁছতে পাবে—এই দিক থেকে কবিব অভিজ্ঞতা অনন্য।' পবেশ মণ্ডলেব 'বোধি' কবিতাব অভিজ্ঞতা অনন্য কিন্তু বিশ্বজনীন নয। আলোকস্তম্ভ বা টেলিগ্রাফ পোষ্ট-এব ধবণেব ইমেজ ফিবে ফিবে এসে যায তাঁব কবিতায। —'ছ-ফুট লম্বা পোষ্টেব ছাযা কাঁপছে', 'টেলিগ্রাফ পোষ্ট/কোমবটা ভাঙা'—এদেব চেহাবাব সাধাবণ বৈশিষ্ট্য কবিব বিচ্ছিন্ন একলা স্বভাবেব উপব ঝোঁক দেয। কিন্তু বিচ্ছিন্নকে যুক্ত কবাব প্রযাসে, নৈর্ব্যক্তিকতাব সাধনাতেই সার্থক হতে পাবে কবিব ইমেজিজ্‌মেব প্রবল প্রবণতা।

'প্রতিবিম্ব'ব পবে 'এ যেন বাববেলা' একেবাবে আব এক প্রান্তেব। এ পুস্তিকায কবি যেন কবিতাকে পৃথক শিল্প বলেই মানেন না। জার্নাল আব কবিতায যেন কোন তফাতই নেই। আধুনিক কবিতা লেখাব যতকিছু উপকবণ সবই জড়ো কবেছেন কবি—সবই পাশাপাশি বাখা আছে,—শুধু তাব থেকে কবিতা জন্মলাভ কবেনি। যদিও কবিব সততা সন্দেহেব অতীত। বাববেলা সময দেশকে প্রভাবিত কবে,—ইন্দ্রিযগ্রাহ্য চিত্রকল্প হযে আসে 'কালো বোদ' বা 'কৃষ্ণ-সূর্য'—যাব আলোয জেগে ওঠে 'ঘোব কৃষ্ণবর্ণ ঘব বাড়ি'। কিন্তু কাব্যেব সঙ্গে চিত্রকল্পেব কোনো প্রাণবলে সম্পর্কস্থাপনেব প্রযাস নেই কবিব। দেশ, কাল ও কবিব আত্ম-উন্মোচন তথ্যগত থেকে যায, সত্যগত হতে পাবে না।

। তরুণ সান্যালেব 'তোমাব জন্যেই বাংলাদেশ' সিবিজেব অষ্টম সংখ্যক বই।

এখান থেকে ষোলো পাতাব নিযমটা বর্জিত হযেছে দেখে ভালো লাগল। 'তোমাব জন্যেই বাংলাদেশ'—নাম থেকেই থীমেব বিশিষ্টতাব ধাবণা হয। কবিব বেদনাবোধেব উদ্দীপন বাংলাদেশ, তাঁব বাসনা-কেন্দ্র বিপ্লব। বক্তঝবা ভিযেতনামেব দিকে তাকিযে কবি ভাঙাচোবা স্বদেশেব জন্য ব্যথিত হন, চে-গুযেভাবাব বক্তবাঙা মৃতদেহ আপন ব্যর্থতাব দিকে কবিব দৃষ্টি ফেবায। 'চে-গুযেভাবা সেই জটাযু আমাব ভাই'—'সম্পাতি' কবিতায পঙ্গু সম্পাতিব ভূমিকায কবি স্থাপন কবেন নিজেকে। ব্যর্থতাবোধ গভীবতম হযে ওঠে যখন নিজেব মধ্যেই হত্যাকাবীকে দেখতে পান কবি, 'আমাবই শোণিত সত্তা অদ্বিতীয তুমি হিংস্র ব্যাধ'। কবিতাগুলি পডতে পডতে বিষ্ণু দেকে অনেকবাব মনে পডবে। 'লালকমল নীলকমল' 'সুযোবাণী দুযোবাণী 'সাতভাই চম্পা ও পাকুল' ইত্যাদি সম্ভবতঃ ঐতিহ্যেব অঙ্গ হিসেবেই কবি ব্যবহাব কবেছেন। 'তোমাব জন্যেই বাংলাদেশে'-এব বডো কবিতাগুলিব বিস্তাবেব স্বভাবেও বিষ্ণু দেব সঙ্গে কোথাও মিল আছে। যেন কোনো আশ্চর্য সুবসৃষ্টিব টানে টানে মিলে যায বিষ্ণু দেব বৈচিত্র্যময প্রসঙ্গগুলি। তরুণ সান্যালেব কবিতা চিত্রধর্মী।

ধ্বন্যাত্মক শব্দেব প্রতি কবিব বিশেষ পক্ষপাত লক্ষ কবা যাবে এই পুস্তিকায। তাবা সবসময অনিবার্য নয এবং কখনো কখনো তাদেব অর্থবহতাও সন্দেহজনক। 'কবিতা' নামেব কবিতায 'ভয বাডে ঢিবঢিব ঘবেব মধ্যে'-ব পবে যখন পাই 'পদশব্দ গম্ভীব ঢিবঢিব / পদশব্দ ভীষণ ঢিবঢিব'—তখন ঢিবঢিব শব্দ ভযেব সঙ্গেই সম্পর্কিত হয স্বভাবতই। কিন্তু যিনি শূন্যপথে একা হাঁটছেন, যিনি ঘবেব মধ্যে নেই—তাঁব নিজেব পাযেব শব্দ নিজেব মনেই যদি ভয জাগায তবে তো কবিতাটিব ভিতই ফাঁক হযে যাবে।

বাংলাব হাল আমলেব কবিতাব—চল্লিশ থেকে ষাটেব দশকেব—কিছুটা পবিচয পাওযা যাবে এই আটটি পুস্তিকা থেকে। তাই এই পুস্তিকামালাব শ্রীবৃদ্ধি কামনা কবি, বিশেষ কবে ছাপাব ব্যবস্থাব শ্রীবৃদ্ধি।

সুতপা ভট্টাচার্য

বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

ভারতের রোহিনী ঃ

এ বছর গত ৩১শে আগষ্ট রাত্রিবেলা ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে ত্রিবান্দ্রাম শহরের কাছে থুম্বা রকেটষ্টেশন থেকে রোহিনী নামে ভারতে তৈরি দুটি রকেট ছোঁড়া হয়েছে। এই সর্বপ্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানীরা একটি রকেটের সমগ্র অংশকে ভারতেই তৈরি করতে সক্ষম হলেন।

১৯৬৩ সালের ২১শে নভেম্বর ভারতের থুম্বা কেন্দ্র থেকে উর্ধাকাশে প্রথম রকেট পাঠানো হয়। থুম্বা কেন্দ্রটির সবচেয়ে বড় গুরুত্ব হল—এ পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার ওপর অবস্থিত। পৃথিবীর সূর্যালোকিত অংশে ভূ-চৌম্বক বিষুবরেখার ওপর একটি বিদ্যুৎস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে এই বিদ্যুৎ স্রোতের দূরত্ব ৮৮ থেকে ১০০ কিলোমিটারের মত। ভারতের থুম্বাকেন্দ্র থেকে রকেট ক্ষেপনের মূল বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার ওপর বিদ্যুৎস্রোতের প্রবাহ এবং উর্ধাকাশে বায়ুস্রোতের গতিবিধি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা।

থুম্বা বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্ররূপেও গড়ে উঠেছে। সেখানে একসঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন। থুম্বা থেকে বহু আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টার অংশরূপে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে একই সময়ে সন্ধানী রকেট ছোঁড়া হয়ে থাকে। 'আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযান' ও 'আন্তর্জাতিক শান্ত সূর্যের বছর' ছিল এ জাতীয় দুটি বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টা।

রোহিনী রকেট ক্ষেপণকে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে অভিহিত করা যায়।

জোন্‌দ্‌-পাঁচ

চাঁদের দেশটা আজ আর আমাদের কাছে অপরিচিত জগত নয়। গত এগার বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা মহাকাশে যে অভিযান শুরু করেছেন, সেই অভিযানে চাঁদ অনেকবারই তাঁদের লক্ষ্যবস্তু

হয়েছে। চাঁদের উলটো পিঠের ছবি তাঁরা তুলে এনেছেন, চাঁদের জমির ওপর স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক ষ্টেশনকে তাঁরা নামিয়েছেন ও চাঁদের জমির খুব কাছা-কাছি বিভিন্ন কক্ষপথে চাঁদেরই কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

চাঁদ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল একটিই। অদূরভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা মানুষকে চাঁদের জমিতে নামিয়ে আবার নিরাপদে তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে চান। এই উদ্দেশ্যসাধনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক ষ্টেশন—জোন্দ্-পাঁচের বৈজ্ঞানিক সাফল্যের কিছুটা তাৎপর্য রয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা এ বছরের ১৫ই সেপ্টেম্বর জোন্দ্-পাঁচকে মহাকাশে পাঠান। ১৮ই সেপ্টেম্বর জোন্দ্-পাঁচ চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছোয় এবং চাঁদের জমির ২০০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে ২১শে সেপ্টেম্বর ভারত মহাসাগরে এসে নিরাপদে অবতরণ করে। সেখান থেকে বস্তুটিকে উদ্ধার করে বোম্বাই শহর হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জোন্দ্-পাঁচের সাফল্য এই সর্বপ্রথম প্রমাণিত করল যে একটি মহাকাশযান পৃথিবী থেকে রওনা হয়ে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে আবার নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে। জোন্দ্-পাঁচের ক্যামেরাযন্ত্র চাঁদের জমির যে সব ছবি তুলেছে সে ফিল্মগুলো বিজ্ঞানীরা সরাসরি হাতেই পেলেন, যে সুযোগ ইতিপূর্বে তাঁরা কখনো পান নি। এ ছবিগুলোর মাধ্যমে চাঁদের জমির অনেক খুঁটিনাটি তথ্য এই সর্বপ্রথম ধরা পড়বে।

জোন্দ্-পাঁচ, চাঁদকে প্রদক্ষিণের পর ফিরে আসার পথে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সময় ঘণ্টায় ৪০,০০০ কিলোমিটার বা সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার গতিবেগ অর্জন করেছিল। এই বিপুল পরিমাণ গতিবেগ নিয়ে ইতিপূর্বে কোন মহাকাশযানই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে নি। এর ফলে মহাকাশযানের দেহে এক বিপুল পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয়। সেই তাপকে নিয়ন্ত্রণের যে সমস্যা, তাঁর সমাধানের পথের সন্ধানও বিজ্ঞানীরা আজ পেলেন। অদূরভবিষ্যতে চাঁদে অবতরণের পর মানুষ যখন আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে, তখন তাকে গতি ও তাপ সম্বন্ধীয় একই ধরণের জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তাই জোন্দ্-পাঁচের সাফল্য চাঁদের দেশে মানুষের সশরীরে অভিযানের দিনটিকেই ত্বরান্বিত করে তুলল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অ্যাপোলো-সাত

অ্যামেরিকার বিজ্ঞানীরা গত ১১ই অক্টোবর তিনজন মহাকাশযাত্রী সমেত অ্যাপোলো-সাত নামে একটি মহাকাশযান চাঁদের দেশে মানুষ পাঠাবার পরিকল্পনাকে দ্রুত রূপ দেবার জন্য মহাকাশে ক্ষেপণ করলেন। এর যাত্রী ছিলেন,—ওয়াল্টার স্কিরা, ওয়াল্টার কনানিংহাম এবং ডন আইসেলে। এই তিনজন মহাকাশযাত্রী এগার দিন একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে পরিক্রমার পর পৃথিবীর মাটিতে আবার নিরাপদে ফিরে এসেছেন। এগার দিনের দীর্ঘ মহাকাশযাত্রার অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে আর কেউই অর্জন করতে পারেন নি। চাঁদের দেশে মানুষের অভিযানের পথে অ্যাপোলো-সাতের ঘটনাটিকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে ধরা যেতে পারে।

শারীর ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হরগোবিন্দ খোরানা এবছর শারীর ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে আরো দুজন অ্যামেরিকান বিজ্ঞানী নিরেমবার্গ ও হোলির সঙ্গে যুক্তভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

ভারতবর্ষেই তাঁর গবেষণাকাজ করার জন্যে খোরানা বহুদিন চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু স্বাধীনভাবে কাজ করার কোন সুযোগ না পাবার ফলেই তিনি স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তা নাহলে আজ ভারতবাসীরূপেই এই দুর্লভ সম্মান তিনি লাভ করতেন।

খোরানা উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের একটি বিশেষ উপাদান নিউক্লিক অ্যাসিডকে কৃত্রিমভাবে গবেষণাগারে তৈরি করেন। আমাদের জৈব গঠনের অন্যতম প্রধান পদার্থ প্রোটিন গড়ে উঠেছে যে অ্যামিনো অ্যাসিডের সমবায়ে, খোরানা সেই অ্যামিনো অ্যাসিড সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাকাজের মধ্য দিয়ে জীবনের রহস্য এবং জীবজগতের বংশগতির ধারা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছেন। অন্য দুজন অ্যামেরিকান বিজ্ঞানীও স্বতন্ত্রভাবে এই একই লক্ষ্যের দিকে আমাদের এগিয়ে দিয়েছেন বলে খোরানার সঙ্গে মিলিতভাবে বিজ্ঞানজগতের সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করলেন।

শঙ্কর চক্রবর্তী

বিবিধ প্রসঙ্গ

গান্ধী জন্মশতবার্ষিকী ও আমাদের জিজ্ঞাসা

১৯৬৮ সালেব ২বা অক্টোবব থেকে মহাত্মা গান্ধীজীব জন্মেব শতবার্ষিকী উৎসব দেশে বিদেশে রূপাযণেব প্রচেষ্টা চলেছে।

প্রথম তুদিনেব সবকাবী ও বেসবকাবী কর্মসূচিগুলি দেখলে মনে হয যেন গান্ধীজী দেশেব শতকবা নব্বই জনেব কেউ ছিলেন না। তাদেব জীবনেব সঙ্গে তাঁব জীবনেব মর্মবাণীব যেন কোন সম্পর্কই ছিলনা এবং ভবিষ্যতেও যেন তা গডে তুলতেও দেওযা হবে না।

আসলে গান্ধীজাকে মূলধন কবে যাঁবা একদিন ভাবতেব বিপ্লবেব মূলে কুঠাবাঘাত কবেছিলেন, যাঁবা গান্ধীজীব আদেশ উপেক্ষা ও অমান্য কবে লর্ড মাউন্টব্যাটেনেব উপদেশকে শিবোধার্য কবতে দ্বিধা কবেন নি, তাঁদেব কাছে গান্ধীজীব স্মৃতি শুধু অনাবশ্যক নয—অবাঞ্ছিতও বটে। গান্ধীজীব জীবনেব শেষ অঙ্কেব দিনগুলি এখনো অনেকেব মনে অস্পষ্ট হযে যাযনি। গান্ধীজী সাম্প্রদাযিক দাঙ্গাব বিরুদ্ধে নিজে যুদ্ধ ঘোষনা কবলেন ও তাঁব প্রধান শিষ্যদেব তাঁব সঙ্গে সহযোগিতা কবতে বললেন।

সর্দাব প্যাটেল তখন সহকাবী প্রধান মন্ত্রী। দেশ বিভাগ হযে গেছে। দিল্লীতে আব-এস-এসবা সাম্প্রদাযিক দাঙ্গাব উন্মত্ততায মেতে উঠলো। অনেক মুসলিম পবিবাব প্রাণ হাবালেন। গান্ধীজী কোলকাতা থেকে সোজা দিল্লীতে উপস্থিত হলেন। মৌলানা আজাদ ও জ'হবলাল প্রতিদিন তাঁকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিস্তাবেব খুঁটিনাটি খবব দিতে লাগলেন। গান্ধীজী বিচলিত হযে—সর্দাব প্যাটেলকে ডাকলেন। প্যাটেল গান্ধীজীব মুখেব উপব বললেন "সব খবব অতি-বঞ্জিত"—"মুসলমানবাও অস্ত্র-শস্ত্র নিযে তৈবি হযে আছে"—পবেবদিন এই কথাব সমর্থনে পুলিশ কমিশনাব টেবিলেব উপব, তিনটি পেনশিল কাটা ছুবি ও একটি বঁটি দা সাজিযে বেখে দিলেন—খানাতল্লাসী-অস্ত্রেব নিদর্শন হিসেবে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন খুব বসিকতা কবে সেদিন বলেছিলেন "সামান্য সামবিক জ্ঞান থাকলে এই খেলনাগুলি এখানে আনা হতোনা।" সর্দাব প্যাটেল লাল হযে উঠেছিলেন। দিল্লীতে শক্ত মানুষ হিসেবে তাঁব

নামডাক যথেষ্ট। তাঁব সব বাগ গিযে পডলো বাপুজীব ওপব। তিনি গিযে বললেন—তাঁকে অপদস্থ কবাব জন্যই এতসব ষডযন্ত্র। গান্ধীজী বললেন "আমি কি চীনে বসে আছি না দিল্লীতে।" "আমাব কি চোখ নেই।" বাগে গড গড কবে—সর্দাবজী উঠে গেলেন। তিনি চললেন বম্বে। পবদিন থেকে গান্ধীজীব আমবণ অনশন। সাবা দেশ গান্ধীজীব পেছনে। দিল্লীব স্বদেশ প্রেমিক হিন্দু-মুসলিম-শিখ ভাই-বোনেবা এইবাব বেবিযে এলেন—দাঙ্গাকে প্রতিবোধ কবতে। গান্ধীজীব জয হলো। আব-এস-এসবা এবাব জনসাধাবণেব দৃপ্ত প্রতিবোধেব সামনে পিছু হটলো। তাবাও এসে গান্ধীজীব সঙ্গে দেখা কবে—তাদেব সদাচবণেব আশ্বাস দিল—। গান্ধীজী অনশন ভাঙলেন। সাবা দেশে তখন সাম্প্রদাযিকতা-বিবোধী আন্দোলনেব বান ডাকতে আবম্ভ কবেছে। এই সমযে গান্ধীজীব বিরুদ্ধে আব-এস-এসবা কতকগুলি ইস্তাহাব বিলি কবলো। চাবদিক থেকে খবব এলো—এদেব লক্ষ্য—গান্ধীজীব জীবনেব ওপব।

সর্দ্দাব প্যাটেল নির্বিকাব। যা হবাব তাই হলো। ১৯৪৮এব ৩০শে জানুযাবী বিকেল ৪-৫০-এ বিডলা ভবনে—প্রার্থনা সভাব আবম্ভে, বিনাযক গডসেব তিন বাউণ্ড গুলি—গান্ধীজীব বক্ষ ভেদ কবে গেল। সাবা দেশ সেদিন স্তম্ভিত বেদনার্ত বিক্ষুদ্ধ।

গান্ধীজীব হত্যাকাবীব দল ও হত্যাব সাহায্যকাবীব দল আজ বিশ বছব পবেও কিন্তু বহাল তবিযতে আছে। আব আছে বছবে একবাব আনুষ্ঠানিক বামধুন সূত্রযজ্ঞ, আব প্রতিকৃতিতে মাল্যদান।

গান্ধীজীব স্বপ্নেব ভাবত আজ কোথায? যে সাম্প্রদাযিক শযতানেব দল গান্ধীজীকে হত্যা কবেছিল—তাদেব অভূতপূর্ব্ব বাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিব জন্য দাযী কাবা? আজ বিশ বছব পবেও সাম্প্রদাযিক হাঙ্গামায দেশ বিপর্যস্ত কেন? বাঁচী, মীবাট, এলাহাবাদ, মোবাদাবাদ, কোলকাতা, ম্যাঙ্গালোব, নাগপুবে দাঙ্গাব দুষ্কৃতকাবীবা এখনো শাস্তি পাযনি কেন? শতবার্ষিক উৎসব আবম্ভ হওযাব পবেও হবিজন বালকেব বক্তে মহাত্মা গান্ধীব জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবেব বোধন হল কেন?—বিহাবে পুপবি গ্রামে আব-এস-এসেব গুণ্ডাবা মুসলিম নাগবিকদেব বাডি পুডিযে দিল কোন সাহসে? এই ভাবেই কি গান্ধীজীব জন্মউৎসব পালিত হবে? আজ গান্ধীজীব নাম নিযে গান্ধীজীকে এখনো হত্যা কবছে যাবা তাবা গান্ধীজীব অমব স্মৃতিকে এখনো ভয কবে।

গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত, তাঁর মর্ম্মবাণী এঁদের কাছে অসহনীয় অবাঞ্ছিত ঐতিহ্য। তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান প্রধান মূল মন্ত্রগুলি ছিল অহিংসা, সহজ অনাড়ম্বর জীবনধারা, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও সামাজিক সাম্য। আজ গান্ধীজীর এই মর্মবাণীকে সফল করে তুলতে চায় যাঁরা তারা হচ্ছেন অবহেলিত অবজ্ঞাত। তাঁর আদর্শবাদ নিয়ে যাঁরা শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন ডাঃ সুন্দর লাল, নবকৃষ্ণ দাস, সতীশ দাশগুপ্ত, অরুণকুমার ঘোষ প্রভৃতি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। গান্ধীজীর যে ঐতিহ্য প্রগতিশীল, সার্বজনীন ও বিশ্বমানবের প্রাণের কাছাকাছি, সে ঐতিহ্য দেশ ও কালের সীমান্ত পার হয়ে সুদূর আমেরিকাতেও নিগ্রোজাগরণের মধ্যে মূর্ত হয়েছে। ডাঃ লুথার কিং ছিলেন তারই শ্রেষ্ঠ প্রতীক, আর মূর্ত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, শান্তি ও মানবতার রক্ষী সুদূর ভিয়েতনামের শ্রেষ্ঠ জীবনসাধক মহাত্মা হো-চি-মিনের মধ্যে। আজ তাই ভারতের চেয়ে শতগুণে বেশী গান্ধীজীর মর্ম্মবাণীকে ভিয়েতনামের মানুষেরা অযুত প্রাণের বিনিময়ে রূপ দিচ্ছেন। গান্ধীজী ও হো-চি-মিন, ভারত ও ভিয়েতনাম এই উৎসবে তাই হয়ে দাঁড়াবে একটি নাম —একটি প্রাণ ও একটি জীবন ধারা।

শান্তিময় রায়

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া

স্বাধীনভাবে পরিশ্রম করে একমুঠো ভাত খাবো তবু গোলামি করব না।—বলিষ্ঠপ্রত্যয়ী এই কথাটি লিখেছিলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর আত্মজীবনীতে। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী এই মনীষী অসমীয়া সাহিত্যে ছিলেন নব-জাগৃতির অগ্রদূত। 'জোনাকী' যুগের অসমীয়া যুগমানস ও সংস্কৃতি সাধনার ছিলেন তিনি একক ব্যক্তিত্ব। এ বছরে নানান জায়গায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাঁরই জন্মশত বার্ষিকী।

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে আসামের আহতঁগুরির কাছাকাছি কোথাও তিনি 'ভূমিস্থ নহে নৌকাস্থ হ'ল'। আসামেই লেখাপড়া শুরু করেন লক্ষ্মীনাথ। শিবসাগর সরকারী স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করে চলে এলেন কলকাতা। তখন তিনি সবে আঠারোর মণিকোঠায় পা দিয়েছেন। ভর্তি হলেন সিটি কলেজে। এই সময়েই চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা ও হেমচন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে তিনি অসমীয়া ভাষা উন্নতি-সাধনী সভা গঠন করেন। কলকাতা হয়ে উঠল অসমীয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি।

এবছবটা অসমীয়া সাহিত্যে নতুন দিনেব পদধ্বনি শোনাল। চন্দ্রকুমাবেব সম্পাদনায বেরুল জোনাকী পত্রিকা। তিন বছব পব লক্ষ্মীনাথ এই কাগজটি সম্পাদনাব দাযিত্ব কাঁধে নেন। এ সমযেই তিনি বিযে কবেন ঠাকুব পবিবাবেব হেমেন্দ্রনাথেব মেযে প্রজ্ঞাসুন্দবীকে। এই ঘটনাটি নিছক বিবাহ নয, দুই সংস্কৃতিব সেতু-বন্ধন। লক্ষ্মীনাথ—ঠাকুব পবিবাবেব উদাবতা দ্বাবা প্রভাবিত হলেন। জোনাকী পত্রিকায এই ঢেউ লাগল। ফলে কাগজটি শুধু সাহিত্যেব ক্ষেত্রে নয, অসমীযা জাতীয জীবনেও দারুণ প্রভাব বিস্তাব কবল, মানবচেতনায হল সোচ্চাব। লক্ষ্মীনাথ তাঁব 'বীণ ববাগী'কে আহ্বান জানালেন নতুন প্রাণব /ন চকুজুবি/দীপিতি ঢালি দে তাত, / পুবণি পৃথিবী / ন-কৈ চাই লওঁ / হে বীণ এষাবি মাত।

এই যুগেই শ্রমেব জযগান শোনা গেল সোজাসুজি উপদেশেব ভঙ্গিমায:
ই জীবনে কামব যে সমাপতি নাই / আবম্ভণ, দৃষ্টান্তব মাথোঁ আছে ঠাই॥

নিপীডিত লাঞ্ছিত মানবাত্মাব আর্তি শোনা যায লক্ষ্মীনাথেব সাহিত্য। এই যুগেই শোষিত জনগণেব প্রতি মমত্ব প্রকাশ পেল, দেখা দিল গণচেতনা। ১৯০৯ সালে ডাক পিওনকে দেখে তাই যখন তাঁব জানতে ইচ্ছে কবে যে, সে কি কি খবব নিযে যাচ্ছে তাঁব ঝুলিতে

কই যোযা ডাকোযাল খোঁজ কিব কোবাল?
জুনুক জুনুক কিনো বাজো?

তখন কবিব প্রতি আমাদেব শ্রদ্ধা জেগে ওঠে।

এক কথায, অসমীযা জাতীয স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকাব প্রতিষ্ঠায জোনাকী পত্রিকাব লেখকগোষ্ঠী মুখ্য ভূমিকা নেন, এবং লক্ষ্মীনাথ বেজবরুযা ছিলেন এব নেতৃত্বে।

কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প, রূপকথা, বস বচনা, জীবনী, ধর্মালোচনা থেকে শুরু কবে সাহিত্যেব এমন কোন দিক খুঁজে পাওযা যাবে না, যেখানে তাঁব হাতেব ছোঁযা লাগেনি। আসামেব জনগণকে তিনিই শুনিযেছেন:

অ' মোব আপোনাব দেশ
অ' মোব চিকুণি দেশ
এনেখন শুঅলা
এনেখন সুফলা
এনেখন মব মব দেশ।

অবশ্য বলতে লজ্জা নেই যে, তাঁর এই স্বদেশানুরাগে বেশ কিছুটা সীমাবদ্ধতার ছায়া পড়েছে। ফলে বাঙলাদেশের উনিশ শতকের নবজাগরণের নায়কেরা যেমন অনেকেই প্রথম জাতীয় মহাবিদ্রোহের পক্ষে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেননি, তেমনি আলোড়নকারী কামরূপ-দরঙের সশস্ত্র কৃষক-বিদ্রোহ যে তাঁকে সামান্যও বিচলিত করেছে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না।

তবু সব কিছু মিলিয়ে বেজবরুয়া যা দিয়েছেন তাও নিতান্ত কম নয়। প্রখর মনীষার অধিকারী, দেশব্রতী এবং সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া শুধু আসামের নয়, গোটা ভারতেরই গর্ব। তাঁর জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আজ আসামের আর একজন অসামান্য গীতিকার জ্যোতিপ্রসাদের উক্তিই বারবার মনে আসছে। 'তোমাকে কে ভুলতে পারে বল? স্মরণ করবে, তোমায় স্মরণ করবে রোজ সকাল, সন্ধ্যা, রাতে, দুপুরে ভবিষ্যতের বহু যুগান্তের অসমীয়া। তুমি থাকবে আমাদের ভাষার শব্দে শব্দে, তুমি থাকবে আমাদের কবিতায় ছত্রে ছত্রে, তুমি থাকবে আমাদের সাহিত্যের ভিতরে বাইরে, তুমি থাকবে অসমীয়ার জীবনের নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে। তুমি থাকবে, থাকবে, থাকবে।' বলাবাহুল্য শুধু অসমীয়াদের কাছেই নয়, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া বেঁচে থাকবেন সমস্ত ভারতীয়ের হৃদয়ে।

গণেশ বসু

মৃত্যুঞ্জয় মানুষ

গত বছর আটই অক্টোবর লাতিন আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী আর্নেস্টো 'চে' গুয়েভারাকে সি আই এ-র বড় কর্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে খুন করা হয়। আর্জেন্টিনায় তাঁর জন্ম। ফ্যাসিস্ত বাতিস্তার হাত থেকে কিউবাকে মুক্ত করার সংগ্রামে অগ্রবর্তীদের তিনি ছিলেন অন্যতম। কিউবার মুক্তির পর তিনি কিউবার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। গুয়েভারা মনে করতেন, মার্কিন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গোটা লাতিন আমেরিকাই খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রে 'বল্কানাইজ' করা হয়েছে। তাই লাতিন আমেরিকার বিপ্লবীর কাছে কিউবা, আর্জেন্টিনা বা বলিভিয়া নয় গোটা লাতিন আমেরিকাই অখণ্ড স্বদেশ। কিউবার নাগরিকত্ব ও সরকারী সমস্ত পদ ত্যাগ করে, মার্কিন নাগপাশ থেকে গোটা মহাদেশকেই মুক্ত করার জন্য, গেরিলা-যুদ্ধ সংগঠনের কাজে বলিভিয়াকে প্রাথমিক কর্মক্ষেত্র হিসাবে গুয়েভারা বেছে নেন। বলিভিয়ার হিগুয়েরে শহরের আট কিলোমিটার দূরে আন্দিজ পর্বতমালার যুরো

গিরিবর্ত্মে, মার্কিন প্রসাদপুষ্ট বলিভিয়ার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এক সম্মুখ যুদ্ধে তিনি আহত হন। পরে তাঁকে হিংস্রেরা শহরে গুলি করে হত্যা করা হয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেক দেশেই এবছর আটই অক্টোবর 'আন্তর্জাতিক গেরিলা দিবস' রূপে পালন করা হয়েছে। গুয়েভারার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা, বা সংগ্রামের পদ্ধতি বিষয়ে অনেকেরই মতভেদ হতে পারে, কিন্তু সকলেই অন্তত মনে রাখেন তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী অমর বাণী "সংগ্রাম আমাদের বিপ্লবী হবার সুযোগ এনে দেয়, তুলে নিয়ে যায় মানব-প্রজাতির শ্রেষ্ঠতম স্তরে—আমাদের মানুষ হিসাবে স্নাতক হবার মর্যাদা এনে দেয়" আর তাঁর অমর কাহিনী।

তিন বছর আগে, ১৫ই অক্টোবর, ভিয়েতনামের বীর দেশপ্রেমিক তরুণ নগুয়েন ভ্যান ত্রয়কে গুলি করে হত্যা করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের প্রসাদপুষ্ট দেশদ্রোহী তাঁবেদারের দল। ভিয়েতনাম-আক্রমণকারী, পররাজ্য-লোলুপ মার্কিন সাম্রাজ্যশাহীর দলনেতাদের অন্যতম, ম্যাকনামারাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও দেশী-বিদেশী শত শত সাংবাদিকের সম্মুখে অকুতোভয় এই দেশপ্রেমিক ভিয়েতনামের যৌবনের মন্ত্র উচ্চারণ করেন—'জয় হোক ভিয়েতনামের, জয় হো-চি-মিন'।

সি আই এ-র সেবাদাস ইন্দোনেশিয়ার সামরিক 'রাষ্ট্রপতি' সুহার্তো কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের অজুহাত তুলে ক্ষমতা দখল ক'রে দুলক্ষেরও বেশি কমিউনিস্ট ও দেশপ্রেমিকদের হত্যা করেছে। নয়া উপনিবেশিকতাবাদের ঘৃণ্য চক্রান্ত ধর্মান্ধতাকে জাগিয়ে তুলে দেশটাকে নরককুণ্ড করে তুলেছে। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য সুদিসমান, নজনো এবং প্রাদেশিক নেতা উইরজো মার্তোনোকে ২৯শে অক্টোবর '১৯৬৫-র ব্যর্থ অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণের অপরাধে' গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি পোদগর্নি ইন্দোনেশিয়ার জঙ্গী সরকারের নিকটে— এঁদের প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর না করার জন্য আবেদন করেছিলেন। বলাবাহুল্য তা অগ্রাহ্য করা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে কোনঠাসা প্রতিক্রিয়া চক্র সন্ত্রাসের চাবুকে মানুষের মুক্তি আন্দোলন থমকে দিতে চায়। কিন্তু আমরা জানি বিশ্বব্যাপী বিপ্লবীরা মৃত্যুঞ্জয়।

শুভব্রত রায়

এবারের অলিম্পিক ও মেক্সিকো

আগ্নেয়গিরির উপর অলিম্পিক? হ্যাঁ তাই-ই। পম্পেইতে খেলার আসর শেষ হলেই আবার অগ্ন্যুৎগীরণ শুরু হবে। জ্বালামুখ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। গলিত লাভার স্রোত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭ হাজার ফুট উঁচুতে এবারকার অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ক্রীড়াঙ্গন, এবং বলাবাহুল্য, তা মেক্সিকোতে। ১৯তম অলিম্পিকের অনুষ্ঠান সুরু হয়েছে ১২ই অক্টোবর। ইউনিভার্সিটি স্টেডিয়াম এখন লোকে লোকারণ্য। মেক্সিকোর তরুণী এ্যাথেলিট কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত অলিম্পিকের মশাল জ্বলছে অনির্বাণ-শিখার মতো, পত্‌পত্‌ করে উড়ছে পাঁচ মহাদেশের ঐক্যের প্রতীকযুক্ত পতাকা। নিঃসন্দেহে সারা পৃথিবীর চোখ এখন মেক্সিকোর দিকে। অলিম্পিক আসর শুরু হবার মাত্র কয়েকদিন আগেও ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, অলিম্পিক অনুষ্ঠান শেষপর্যন্ত শেষ হবে কি না। মেক্সিকোর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘর্ষ 'অলিম্পিক প্রাঙ্গণ'কেও যথেষ্ট উত্তপ্ত করেছিল। লাতিন আমেরিকার বহু দেশেই মার্কিন সেবাদাস সরকার গদীতে আসীন। 'অর্ধোন্নত' বা 'উন্নতিকামী' অনুগৃহীত ও তাঁবেদার দেশ-গুলোর দারিদ্র্যের চেহারা যাতে বাইরে ধরা না পড়ে তার জন্য সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে মার্কিন সরকার। এবারের অলিম্পিকের দেশ মেক্সিকোর জনগণের প্রকৃত অবস্থার কথা চাপা দেওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে সে দেশের সরকার, ফলে ঘটেছে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংঘর্ষ। অবশ্য অলিম্পিক আসরও রাজনীতির আওতার বাইরে পড়ে নি। অলিম্পিককে ঘিরেও চলেছে চরম রাজনীতি। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের ভক্তরা এখানেও চুপচাপ বসে নেই। যদিও অলিম্পিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বভ্রাতৃত্বের জন্য, প্রত্যেক দেশের ক্রীড়াশীল যৌবনের বিকাশের জন্য তবু খেলোয়াড়ী মনোভাবের অভাব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখানেই সবচেয়ে বেশী। তাই সোভিয়েত বিরোধিতার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, গণতান্ত্রিক কোরিয়ার অংশ গ্রহণে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করা হয়, লোকায়ত্ত চীন সাধারণতন্ত্র আজও অলিম্পিক আসরে অংশগ্রহণ করতে পারে না অথচ বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী প্রতিনিধিদলকে অলিম্পিক থেকে বয়কট করবার সিদ্ধান্ত নেবার সময় চরম টালবাহানা দেখা যায়। কিউবার প্রতিনিধি ন্যায্য কারণেই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিকে অগণতান্ত্রিক এবং মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর আড্ডাখানা বলে

মন্তব্য করেন। নিজেদের দেশে সমানাধিকারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথেলিটরা যুগ্মবিবৃতিতে আন্তজাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি, মার্কিন নাগরিক অ্যাভেরি ব্রানডেজের পদত্যাগ দাবি করেছিলেন 'জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার কল্যাণের জন্য'। এই 'ভদ্রলোকই' সবচাইতে বেশি সচেষ্ট ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী প্রতিনিধিদলকে অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করানোর জন্য। পরে অবশ্য তাঁর উঁচুমাথা হেঁট হয়েছিল সারা বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রগতিশীল মানুষের কাছে। তবুও টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে এই নির্লজ্জ বলেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো অ্যাথেলিটরা কোনো রকম প্রতিবাদ জানালে তাদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অলিম্পিকে আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথেলিটদের প্রশিক্ষক খ্রীস্টান রাইট তখনই বলেছিলেন, 'ব্রানডেজের উক্ত বিবৃতি নিগ্রো অ্যাথেলিটদের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার করেছে'। প্রকৃতই তাই। ধনতন্ত্রের চরম সঙ্কট ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। ক্রীড়ামঞ্চেও এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে না। ক্রীড়ামঞ্চও হয়ে ওঠে তাই অন্যদিকে সংগ্রামেরও মঞ্চ। ১৯১১ সালে আই এফ এ শীল্ডে মোহনবাগান দলের বিজয় আমাদের কাছে তাই অবিস্মরণীয়। 'বিশ্ব কাপে' গণতান্ত্রিক কোরিয়ার প্রতিযোগিতা আমরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করি। আমেরিকার দ্বিধাবিভক্ত সমাজও অলিম্পিক আসরে প্রত্যক্ষ করা গেল। অলিম্পিক পদকজয়ী টমি স্মিথ, জন কার্লোসের প্রতিবাদ সারা বিশ্বের মানুষকে অভিভূত করে। তাঁদের নগ্ন পায়ে কালো দস্তানাপরা মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে মাথা নিচু করে—সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত কালো মানুষের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন—আমাদের পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন পাবার যোগ্য। সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গ নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে এই দুই বীরকে 'অলিম্পিক গ্রাম' ছেড়ে যাবার আদেশ দেয়। কিন্তু ভয় দেখিয়ে আর যাই করা যাক, ব্ল্যাক পাওয়ার মুভমেণ্টকে দমানো যায় না। একে একে বহু নিগ্রো অ্যাথেলিট প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিজয়মঞ্চে দাঁড়িয়ে, লাতিন আমেরিকার প্রথম সমাজবাদী রাষ্ট্র কিউবার প্রতিনিধিরা ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন নি, তাঁদের অর্জিত সমস্ত পদক আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথেলিটদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হল।

এবারের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানও হচ্ছে বিক্ষুব্ধ মেক্সিকোয়। গত কয়েকমাস মেক্সিকোর সাধারণ মানুষের আন্দোলন চূড়ান্ত আকার ধারণ

কবছিল। সাবাদেশেব মানুষেব দাবি দাওযা নিযে আন্দোলন অনেকদিন থেকেই চলছিল—অবশ্য ছাত্রদেব আন্দোলনেব সঙ্গে যুক্ত হযে এ আন্দোলনেব প্রসাব ঘটে আবও জঙ্গী মনোভাব নিযে। গত জুলাই মাসে স্কুলেব ছাত্রদেব সঙ্গে পুলিশ মিলিটাবিব এক গণ্ডগোলেব ফলে পুলিশ স্কুল বাড়িটি দখল কবেছে। ছাত্রবা এই ঘটনাব প্রতিবাদ জানালে স্কুলটিকে পুলিশ-মিলিটাবিব অস্থাযী ব্যাবাকে রূপান্তবিত কবা হয। মেক্সিকোব জাতীয বিশ্ববিদ্যালযেব ছাত্রবা প্রতিবাদে 'সিট্-ইন' আন্দোলন শুরু কবে। অতঃপব বিশ্ববিদ্যালযেব ভিতবেও পুলিশ-মিলিটাবিব অনুপ্রবেশ ঘটে। ক্রমশঃই ছাত্রদেব দাবিব সমর্থনে এবং নিজেদেব দাবিদাওযাকে কেন্দ্র কবে গড়ে ওঠে মেক্সিকোব ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী। এই আন্দোলন ক্রমশঃই জোবদাব হতে থাকে। ফলে মেক্সিকোব সবকাব বাধ্য হযে আদেশ দিলেন—১লা অক্টোবব বিশ্ববিদ্যালয থেকে সমস্ত ফৌজ তুলে নেওযা হবে। ২বা অক্টোবব বিজয মিছিল সুরু হয বক্ত পতাকা এবং চে-গুযেভাবাব ছবি নিযে। ১৫ হাজাব (সবকাবী মতে) সম্পূর্ণ নিবস্ত্র জনতাব মাথাব উপব মেশিনগানেব বুলেট চলে। নিহত হয ৩৯ জন (সবকাবী মতে), আহত হয একশজনেবও বেশি। সবকাব পক্ষে যাবা আহত হন তাদেব মধ্যে জেনাবেল টলেডোও আছেন। তিনি জাতীয বিশ্ববিদ্যালয থেকে ছাত্রদেব সবিযে দিযেছিলেন।

১৯ লক্ষ ৭২ হাজাব ৫৪৬ বর্গ কিলোমিটাবেব দেশ মেক্সিকোব লোকসংখ্যা ৩ কোটি ৭ লক্ষ ৯৪০। মোট জনসংখ্যাব শতকবা ৫৮ জনেব বযস ২৫-এব নীচে, বামপন্থী আন্দোলনেব পুবনো ঐতিহ্য মেক্সিকোব, ১৯১০-১৭তে মেক্সিকোব মুক্তিযুদ্ধেব ইতিহাস চিবস্মবণীয হযে বযেছে। এমিলিযানো জাপাটা এবং ফ্রান্সিসকো ভিলা—এই দুই দুর্ধর্ষ যোদ্ধাব নাম সাবা লাতিন আমেবিকায পবিচিত, ১৮৭১ সালেব প্যাবী কমিউনার্ডবা দেশ ছেড়ে ঘাঁটি গেড়েছিলেন মেক্সিকো এবং লাতিন আমেবিকা অন্যান্য দেশে। মেক্সিকোতেই প্রথম সাক্ষাৎ হযেছিল কাস্ত্রো আব গুযেভাবাব, এখান থেকেই 'গ্রানমা'ব যাত্রীবা যাত্রা শুরু কবেছিলেন। বামপন্থী আন্দোলনেব পুবনো অগ্নিকেন্দ্রে আবাব লড়াই শুরু হযেছে। ২১শে থেকে ২৭শে সেপ্টেম্ববেব মধ্যে ৭ জন মেক্সিকান গুলিবিদ্ধ হযে নিহত হন। ২৪শে সেপ্টেম্বব শহবেব উত্তবাঞ্চলে ধৃত শ্রমিকনেতাদেব মুক্ত কবাব জন্য যে লড়াই হয তাতে কৃষকদেব সঙ্গে দেশেব সাধাবণ মানুষও ছিলেন। মোট সাত শ ছাত্র এবং ৩৪ জন অধ্যাপক গ্রেপ্তাব হন। পুলিশ

মিলিটারির নারকীয় অত্যাচার লক্ষ্য করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রেক্টর জ্যাভিয়ার বেরেস সিয়েরা সরকারের Excessive use of force-এর নিন্দা করেন। লাতিন আমেরিকার প্রখ্যাত কবি ভারতে নিযুক্ত মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত অক্তাভিয়া পাস ছাত্রদের উপর পুলিশী অত্যাচার এবং অলিম্পিককে কেন্দ্র করে কবিতা লেখেন। মেক্সিকো সরকারের কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি রাষ্ট্রদূতের কাজ থেকে পদত্যাগ করেছেন। মেক্সিকোর প্রখ্যাত কমিউনিস্ট চিত্রশিল্পী সিকারাসও সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ব্যক্ত করেছেন। মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টি বলেছেন, এই বিক্ষোভের মূল প্রোথিত অনেক গভীরে—দেশব্যাপী ধিকি ধিকি বিক্ষোভের আগুন লেলিহান হতে চাইছে। পুলিশ-মিলিটারির অত্যাচার এ-আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারেনি। দিনের পর দিন আইন অমান্য আন্দোলন চলেছে, দাবি উঠেছে—(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দাঙ্গাবাজ পুলিশদের হঠাতে হবে। (২) মেক্সিকো শহরের পুলিশ-প্রধানের অপসারণ চাই, (৩) রাজবন্দীদের মুক্তি চাই। (৪) ফৌজ-দারী আইনের নাশকতামূলক কার্যবিরোধী ধারা চলবে না। মেক্সিকো সরকার সমস্ত দাবি বিবেচনা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করেননি। আপাততঃ অলিম্পিক চলাকালীন অবস্থায় মেক্সিকোর আন্দোলন স্তব্ধ। ছাত্রদের ২১০-এর কমিটি ঘোষণা করেছে, অলিম্পিক শেষ হলেই আবার আন্দোলন শুরু হবে। রণাঙ্গন মেক্সিকো এখন ক্রীড়াঙ্গন—যদিও ক্রীড়াঙ্গনেও লড়ায়ের বাজনা বাজছে।

গৌতম ঘোষ

লেখকদের আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র

আফ্রো-এশিয় লেখক সংঘের দশ বছর পূর্ণ হল। উনিশশো ছাপান্নোয় এশিয়ার বিভিন্ন দেশের লেখকেরা সমবেত হয়েছিলেন দিল্লীতে। লক্ষ্য ছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ও জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে লেখকের ভূমিকা নিরূপণ করা। লক্ষ্য ছিল—সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণমুক্ত সদ্য-স্বাধীন দেশে নতুন প্রগতিশীল সংস্কৃতি গড়ে তোলা। আর লক্ষ্য ছিল শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য। আটান্নো সালের অক্টোবরে গড়ে উঠলো আফ্রো-এশিয় লেখক সংঘ। আফ্রিকা ও এশিয়ার সাঁইত্রিশটি দেশের দুশোরও বেশি লেখক ঐ সংস্থা গঠনের উদ্বোধনী সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, ইউরোপ ও আমেরিকার তেরটি দেশের লেখক উপস্থিত ছিলেন পর্যবেক্ষক হিসাবে।

দশ বছর বড়ো কম সময় নয়। এ দশ বছরে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন আরও দুর্বার হয়েছে। সমাজতন্ত্র আরও শক্তিশালী হয়েছে। আবার কোন কোন দেশে পায়ের শিকল ছিঁড়তে না-ছিঁড়তেই হাতে হাতকড়া চেপে বসেছে নয়া উপনিবেশিকতার। কোথাও ধর্মের নামে, কোথাও উপজাতির নামে, কোথাও বর্ণের নামে চলেছে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ—ইন্দোনেশিয়া, নাইজিরিয়া,অ্যাঙ্গোলা-মোজাম্বিক-রোডেশিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকায়, চলেছে সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ আক্রমণ চূড়ান্ত পর্যায়ে ভিয়েতনামে। যখন আফ্রো-এশিয় লেখকদের আরও ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, তখনই এসেছে সঙ্কীর্ণতাবাদী বিভেদপন্থার আঘাত। চীনা রাজনীতির বিভেদপন্থা তখনকার সম্পাদক রত্নে সেনানায়কের বকলমে এই ঐক্য, সংগ্রাম ও সংহতির সংগঠনকে চূর্ণ করতে চেয়েছে। তাই কলম্বো থেকে এই সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয় সরিয়ে নেওয় হয়েছে কায়রোতে, যে কায়রো আজ ইস্রায়েলের মুখোসে ঢাকা সাম্রাজ্য-বাদের আক্রমণ ও চক্রান্তকে চূর্ণ করার দৈরথে পাঞ্জা লড়ছে। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে আফ্রো-এশিয় লেখক-সংস্থার তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বেরুটে, আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বিভেদপন্থার বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ছটি দেশের লেখকেরা। এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারত থেকে হরিবংশ রায় 'বচ্চন', মূলকরাজ আনন্দ, সাজ্জাদ জহীর, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকরা।

। আফ্রো-এশিয় লেখক সংগঠনের দশম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে এ বছর ২০-২৫ সেপ্টেম্বর তাসখন্দে আন্তর্জাতিক লেখকদের আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় পঞ্চাশটি দেশের লেখক এতে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউসুফ এল সেবাই (ইউ এ আর.), শঙ্কর কুরূপ (ভারত), ইয়োসিও হোতা (জাপান), জন ম্‌ওয়াঙ্গি (কেনিয়া), ফ্রাঙ্ক হার্ডি (অষ্ট্রেলিয়া), আলেক্স লা গুমা (দক্ষিণ আফ্রিকা), ফ্রান্সিসকো কোলোআনে (চিলি), জঁ ব্রিয়েরা (সেনেগাল), রিফাং ইলগজ এবং ওকটে আকবল (তুরস্ক) প্রমুখ খ্যাতিমান লেখক। সোবিয়েত লেখকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চেঙ্গিজ আইমাতোভ, আনাতোলি সোফ্রোনোভ, বার্দি কাররাবায়েভ, রসুল সামজাতোভ, ইভগেনি ইভতুশেঙ্কো।

পঞ্চ মহাদেশের নক্সা, হাতের উপরে রাখা দৃঢ়বদ্ধ পাঁচটি হাত এবং একটি খোলা বই—এই প্রতীকলাঞ্ছন আন্তর্জাতিক লেখক সিমপোসিয়মের মূল আলোচ্য

বিষয ছিল 'সাহিত্য ও আধুনিক বিশ্ব'। সামাজিক প্রগতি ও জনগণেব স্বাধীনতাব সংগ্রামে লেখকেব ভূমিকা, ক্ল্যাসিকাল ঐতিহ্য ও সমকালীন সাহিত্য, এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য—ইত্যাদি বিষযে আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয। আব ভিযেতনাম শ্রদ্ধাব সঙ্গে হয বাব বাব উচ্চাবিত। সিংহলেব লেখক গুনসেনা বিঠঙ্গ বলেন, "আমাদেব অস্ত্র, এই লেখনী। আমাদেব শান্তি ও স্বাধীনতাব পথ আটকে দাঁড়ানো সাধাবণেব শত্রুব বিরুদ্ধে উদ্যত কবি, ব্যবহাব কবি এই কলম। আমাদেব এ-সংগ্রামে ক্ষান্তি নেই, বিশ্রাম নেই যত দিন না আমাদের মহাদেশগুলিব প্রগতিবাদী শক্তিগুলিব ঐক্য সাধিত হয—ততদিন আমাদেব বিজয নিষ্পন্ন হবাব নয।"

ভিযেতনামেব একটি কাহিনী লেখনীব এই ক্ষমতাকে স্মবণ কবিযে দিয়েছে। হাতে কপি কবা শলোকফেব 'ভার্জিন সযেল' বইটি গেবিলা সৈনিকেবা লডাযেব অবসবে পড়েন। হাতে হাতে ঘোবে পবিত্র চিহ্নেব মত সেই বই। একটি খণ্ড লডাইযে একবাব ঐ কপিটি শত্রুব হাতে পডে যায়। দেশপ্রেমিক সৈনিকেবা প্রতিজ্ঞা কবলেন বইটি ফিবিযা আনতে হবে। সেই বাত্রে তুমুল লডাযেব পব বিজযী বাহিনী গর্বোদৃপ্তভাবে ফিবলেন তাঁদেব আস্তানায। সঙ্গে তাঁদেব সেই উদ্ধাব কবা 'ভার্জিন সযেল'এব কপি।

দক্ষিণ আফ্রিকাব লা গুমা বলেন, "একমাত্র পূর্ণ স্বাধীনতাব পবিবেশেই গডে উঠতে পাবে জাতীয সাহিত্য।" ১৯৫৮ সালে, আফ্রো-এশিয প্রথম লেখক সম্মেলনেব সময তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকাব ফ্যাসিস্ত জেলখানায; এখন প্রবাসে নির্বাসনে দিন কাটাচ্ছেন। তুর্কি লেখক ওকটে আকবল বললেন, 'সৃষ্টিশীল বচনা হবে ঘডিব মত, চোখে আঙ ল দিযে চিনিযে দেবে স্বকাল, নিজেব সমযকে। পথেব দিশা দেখিযে দেবে খাঁটি কম্পাসেব মত।" মিশবীয লেখক আব্দুল বাহমান আলী শাবখাই বলেন, "লেখকবা হলেন জাতিব শ্রেষ্ঠ বাজদূত। আবব দেশগুলিতে তাই লেখকদেব বলা হয প্রফেট।" এই বাজদূতদেব মেলাতে হবে। সেজন্য চাই অনুবাদ। এলোমেলো অনুবাদ নয়, "লেখকদেব সংগঠনেব মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ বচনাগুলিকে অনুবাদ কবতে হবে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য সোবিযেত ইউনিযনে গত দশ বছবে আফ্রো-এশিয লেখকদেব দু-হাজাব গ্রন্থ অনুবাদ কবা হযেছে।

ক্ল্যাসিকাল ঐতিহ্য ও আধুনিক সাহিত্য আলোচনায বহু বক্তাই অতীতেব সাংস্কৃতিক সম্পদ ও আধুনিক সাহিত্যেব বিজযগুলিব মধ্যে গভীব সম্পর্ক গডে

তোলার কথা বলেন। ঐতিহ্যবাদী রচনাশৈলী ও সমকালীন রচনার আঙ্গিকের সমন্বয় করার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

বক্তারা নিরক্ষরতার অভিশাপের কথাও উল্লেখ করেন। উপনিবেশিকদের ভাষাকে বাহন করে বহু দেশেই এখনও সাহিত্য রচনা চলেছে। নাইজেরিয় লেখক তাই সালাবিন আফ্রিকার দেশগুলির দ্বিভাষিকতা প্রসঙ্গে বলেন, আফ্রিকার ভাষাগুলিকে স্বচ্ছন্দ বিকাশের অধিকার দিলে, আফ্রিকার সাহিত্য আরও বৈভব, সুষমা ও প্রাচুর্যে ভরে উঠবে।

আবেগমথিত কণ্ঠে বিখ্যাত আরব লেখক, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ এল সাবাই বলেন, "সৃষ্টির স্বাধীনতা হলো সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিকতাবাদের হাত থেকে স্বাধীনতা।'

১৯৭০ সালে আফ্রো-এশিয় লেখকদের চতুর্থ সম্মেলন ভারতে অনুষ্ঠিত করার জন্য ভারতীয় লেখকদের প্রস্তাব বিপুল আগ্রহের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। ঠিক হয়, ১৯৬৯ সালে ঢাকাতে আফ্রো-এশিয় কবিদের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। আফ্রো-এশিয় লেখকদের জন্য 'পদ্ম' পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করা হয়েছে।

'এই দশম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভারতীয় কবিদের একটি কাব্য সঙ্কলনও উজবেক প্রকাশনা-সংস্থা প্রকাশ করেছেন। বিষ্ণু দে, শঙ্কর কুরূপ, মখদুম মহিউদ্দীন, বচ্চন ও অন্যান্য ভারতীয় কবির কবিতা এতে আছে।

আফ্রো-এশিয় লেখক সংঘের দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি ঘোষণায় বলা হয়েছে "সংগ্রামের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে আমাদের কাজের সাফল্য নির্ভর করছে কর্মের ঐক্যে এবং আমাদের কালের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের সঙ্গে নিবিড় সংযোগের উপর।"

তরুণ সান্যাল

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার/১৯৬৮

বার্ষিক গতির প্রচলিত নিয়মের মতোই বছরে একবার করে একজন কবি বা সাহিত্যিককে নোবেল পুরস্কার পেতে হয়। কোথাও কোথাও সুইডিশ আকাদামি একজনকে পুরস্কৃত করে নিজেরা ধন্য হন, কোথাও সেই পুরস্কারে একজনকে ধন্য করেন। শলোকভ বা সার্ত্র্-কে নোবেল পুরস্কার অতিরিক্ত সম্মানের কোন শিরোপাই দিতে পারে না, আবার কোন কোন বছরে সুইডিশ আকাদামি আচমকা এমন এক-একটা নাম ছুঁড়ে মারেন, দিন কয়েকের জন্য

বিশ্ববাসী একটু হকচকিযে গিযেই থিতিযে পডেন। তাবপব বিশ্বসাহিত্যেব আলোচনায় সার্ত্রে শলোকভবাই ঘুবেফিবে আসেন, অসংখ্য নোবেল পুবস্কাব-ধন্য কবি সাহিত্যিক করুণভাবে হাবিয়ে যান। নেহাৎ ঠাট্টা কবেই সেদিন বলছিলেন একজন সুধীব্যক্তি—'যুবোপ, আমেবিকায নোবেল-প্রাইজটাব আব কোন ঠাটই নেই তেমন। ওটা কি কবে পেতে হয তাব আটঘাটগুলি বেশ ভালো কবেই বুঝে নিযেছে ওবা। লাফালাফিটা আমাদেব, আমবা পাই না বলে।'

বোধ হয় এ-কাবণেই ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দেব সাহিত্যে নোবেল পুবস্কাবে সম্মানিত জাপানী কথাশিল্পী যুআসুনাবি কোযাবাতাব নামটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ববীন্দ্রনাথেব পব কোযাবাতাই নোবেল পুবস্কাবেব তালিকায দ্বিতীয এশিযাবাসী সাহিত্যিক। আমাদেব দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতিব বিষযে যে পবিমাণ অধ্যযন-আলোচনা হয, প্রাচ্য দেশেব সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে কৌতূহল সত্ত্বেও আলোচনাব প্রযাস তুলনামূলকভাবে অল্প। চিত্রকলা, চলচ্চিত্র বা কাবুকি নৃত্য প্রভৃতিব মধ্যে জাপানকে কিছুটা কাছাকাছি পেলেও কবিতা ও সাহিত্যেব সঙ্গে আমাদেব ঘনিষ্ঠ সংযোগ হয তো অনুবাদেব অভাবেই তেমন কবে ঘটে না। তবু এবই মধ্যে যুদ্ধোত্তব জাপানী সাহিত্যেব যে দু-একজন কথাশিল্পীব সঙ্গে আমাদেব ব্যাপক পবিচয ঘটেছে (যুকিযো মিশিমা, ওজামু দাজাই) কোযাবাতা সে তুলনাযও বহুশ্রুত নাম নন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জাপানেব শিল্পপ্রধান অঞ্চল ওসাকাতে কোযাবাতাব জন্ম। একেবাবে শৈশবেই কতকগুলি মৃত্যু এবং পাবিবাবিক দুর্ঘটনা তাঁকে এক আত্মীযহীন নিঃসঙ্গতায আচ্ছন্ন কবে ফেলে। পববর্তী জীবনাচবণেও যে এই একাকীত্ববোধ তাঁকে পবিচালিত কবেছে, তাঁব সাহিত্যও সেই বোধেব সাক্ষ্য বহন কবে। জীবন যেখানে অসংখ্য টানাপোডেনেব এক ক্ষত-বিক্ষত স্রোতধাবা, তোজোব জাপানই হোক অথবা নাগাসাকি হিবোসিমাব পববর্তী সাবা পৃথিবীব দধীচি জাপানই হোক, কোযাবাতা নিরুদ্দেশে আত্মসমাহিত। কি এক বিষণ্ণতা আব অপাব বিস্ময নিযে পৃথিবীব দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। ১৯৩৪-এ শুরু কবে বিভিন্ন সমযে বিচ্ছিন্নভাবে লিখে ১৯৪৭-এ তিনি যে 'স্নো-কান্ট্রি' উপন্যাসটি প্রকাশ কবেন, সুইডিশ আকাদামি সে বচনাটিব প্রতি সপ্রশংস হযে এ বছবেব নোবেল পুবস্কাব ঘোষণা কবেছেন। দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধ পববর্তী 'থাউজেণ্ড ক্রেন' উপন্যাসটি তাঁব আবও একটি বিখ্যাত বচনা। রুচি

বাস্তবজীবনের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে বিচ্ছিন্ন সুখী-সমৃদ্ধ পরিবারে এক যুবক তার কতকগুলি আত্মগত সঙ্কটে পীড়িত, সর্বত্রই এক বিষাদের বেদনা। নিজের কামনা-বাসনা নিয়েও প্রেমের ক্ষেত্রে নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মোচনে ব্যর্থ, এবং মৃত পিতার প্রণয়িণী বা রক্ষিতাদের মধ্যে এক নিদারুণ অস্বস্তি। ভিতরের কামনার আগুনকে দমন করে বাইরের সামাজিক অস্তিত্বকে ভদ্রবেশে সাজিয়ে রাখার কী করুণ অন্তর্দাহ। সমগ্র উপন্যাস এক অনাবিল কাব্য-সৌন্দর্যে আবৃত যেন কবিতার ভাষাতেই জীবন আর জগতকে দেখতে চান তিনি। হিরো-সিমার ক্ষত-বিক্ষত জাপান নয়, বুদ্ধ-ঐতিহ্যের নিপ্পন। স্বদেশী ঐতিহ্যের এই মমত্ববোধ 'থাউজেণ্ড-ক্রেন'এ অত্যন্ত স্পষ্ট। জাপানের 'চা-উৎসব' সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না-হলে ঐ উপন্যাসপাঠের অভিজ্ঞতায় বিদেশী পাঠক বারবার বাধা পাবেন। বারবার মনে হবে, হয় তো বা দেশজ প্রতীকের মধ্যেই অনেক কিছু হারিয়ে গেল, সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনা ধরা গেল না। সাম্প্রতিককালে বাঙালী পাঠকের কাছে পরিচিত আরও একজন জাপানী উপন্যাসিক ওজামু দাজাইর 'নো লংগার হিউম্যান'-এর পাশে কোয়াবাতার রচনা বিস্ময় সঞ্চার করবে—দাজাইর যুদ্ধক্ষত-জাপানের বিক্ষুব্ধ অশান্ত যৌবনের পাশে কোয়াবাতার স্বদেশে এখনও বুদ্ধের বরাভয়।

শুধু নোবেল পুরস্কারের আন্তর্জাতিক খ্যাতির মধ্যে নয়, কোয়াবাতার সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রচারিত সংবাদ—জাপানী সাহিত্যকে পশ্চিমের কাছে পরিচিত করার জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে পরিশ্রম করে আসছেন এবং জাপান 'পি-ই-এন' ক্লাবের তিনি একটানা সতের বছরের সভাপতি।

অমলেন্দু চক্রবর্তী

কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রতীক ধর্মঘট

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক-কর্মচারীদের একদিনের প্রতীক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে স্বাধীন ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার যে নিষ্ঠুর দমননীতি ও জিঘাংসাবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন তাতে গণতান্ত্রিক-চেতনাসম্পন্ন যে-কোন নাগরিক স্তম্ভিত না হয়ে পারেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের ২৫ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী শুধুমাত্র জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক সর্বনিম্ন বেতন এবং উপযুক্ত দুর্মূল্যভাতার দাবি জানিয়ে ছিলেন। রাজনৈতিক বিক্ষোভ নয়, ট্রেড ইউনিয়নের বিধানসম্মত সর্বনিম্ন অধিকার প্রয়োগের অপরাধেই এই হৃদয়হীন সরকারের লাঠি আর গুলির আঘাতে বলিপ্রদত্ত হয়েছে ১২টি অমূল্য জীবন

আব অর্ধ লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচাবীব ভাগ্যে জুটেছে গ্রেপ্তাব ও চাকুবী খতমেব নির্দয় নোটিশ।

এই প্রচণ্ড দমননীতিব মুখে দাঁড়িযে কেন্দ্রীয় শ্রমিক-কর্মচাবী যে অপূর্ব দৃঢ়তা দেখিযেছেন, যে-ভাবে 'নিযম মাফিক কাজ'-এব আন্দোলন সংগঠিত কবে তাঁবা প্রায অচল কবে দিযেছিলেন কেন্দ্রীয সবকাবেব বহু দপ্তব, ট্রেড ইউনিযন আন্দোলনেব ইতিহাসে তা দীর্ঘকাল স্মবণীয হযে থাকবে। এই জঙ্গী আন্দোলন এবং সর্বভাবতীয ট্রেড ইউনিযন নেতৃবৃন্দেব আমবণ অনশন ধর্মঘটেব ফলেই শেষ পর্যন্ত হৃদযহীন, শাসকচক্রেব অনিচ্ছুক হাত থেকে অন্তত আংশিক-ভাবেও ছিনিযে নেওযা সম্ভব হযেছে দমননীতি প্রত্যাহাবেব ঘোষণাপত্র। কিন্তু এই ঘোষণাব ফলে অস্থাযী শ্রমিক-কর্মচাবীদেব চাকুবী খতমেব নোটিশ প্রত্যাহৃত হলেও চোদ্দ হাজাব শ্রমিক-কর্মচাবীব ভাগ্যনিযন্ত্রণেব অবাধ অধিকাব ন্যস্ত বযেছে পুলিশ এবং পদস্থ আমলাদেব উপব। আমবা বিশ্বাস কবি, কেন্দ্রীয সবকাবেব পঁচিশ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচাবীব জাগ্রত চেতনা পঁযতাল্লিশ লক্ষ বাজ্য সবকাবী কর্মচাবী এবং কোটি কোটি গণতান্ত্রিক ভাবতবাসীব সঙ্গে মিলিত হযে দুর্বাব আন্দোলনেব জন্ম দেবে, অর্জন কববে শ্রমিক কর্মচাবীদেব বাঁচাব মত প্রযোজনভিত্তিক মজুবী।

এই প্রসঙ্গে আমবা ধর্মঘটকে বে আইনী কবাব আগুন নিয়ে খেলাব পবিবর্তে কেন্দ্রীয সবকাবকে সংযত হওযাব অনুবোধ জানিযে ১৯৪৬ সালেব ১৬ই ডিসেম্বব কলকাতায অ্যাসোসিযেটেড চেম্বার্স অফ কমার্স অফ ইণ্ডিযাব বার্ষিক অধিবেশনে 'ধর্মঘট' সম্পর্কে তাঁদেবই প্রিয নেতা জওহবলাল নেহরুব কযেকটি উক্তি স্মবণ কবিযে দিচ্ছি ঃ

"ধর্মঘট হল বাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনেব জন্য কিছু সংখ্যক আন্দোলন-কাবীদেব দ্বাবা ধর্মঘটীদেব ব্যবহাব কবাব পবিণতি—এই কথা বলে ধর্মঘটেব সংজ্ঞা নিরূপণ কবা খুবই সহজ কাজ। একটি দেশে কি ঘটছে সে-সম্পর্কে খুব সুন্দব চিত্র তুলে ধববে ধর্মঘট। বাযুমান বা তাপমান যন্ত্রেব মতো এ হল শিল্প-ব্যবস্থাব স্বাস্থ্য সম্পর্কে একবকম নির্দেশ যন্ত্র। আমাদেব দেশে জীবনযাত্রাব ব্যযমান ও মজুবীব মধ্যে বিবাট এক ব্যবধান বযেছে এবং এই ব্যবধানই ক্ষুধা, দাবিদ্র্য এবং অবশেষে ধর্মঘটেব সৃষ্টি কবে। আসল প্রশ্ন হল সাবা ভাবতবর্ষে আজ এই ব্যবধান বিদ্যমান এবং যদি এই ব্যবধানেব অবসান ঘটানো না যায়, তাহলে শিল্পে অশান্তি অবশ্যম্ভাবী। মূল্য হ্রাস কবে অথবা মজুবী বৃদ্ধি কবে

এই ব্যবধান দূর করা যায়। আজ আমি লক্ষ্য করছি যে, বিপুল সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। অপর দিকে বিপুল সংখ্যক মানুষ বিরাট মূল্যবৃদ্ধির বোঝার সম্মুখীন হচ্ছে। এই ধর্মঘটের প্রশ্ন আমরা কীভাবে মীমাংসা করবো ? কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব বা সঙ্গত নয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ উপায়ে ধর্মঘট ভাঙ্গা খুব দুরূহ, কারণ কোন কোন সময় তার পরিণতি হয় খুবই খারাপ ।”

কিন্তু ইতিহাস সত্যিই নির্মম। তাই আমরা অবাক-বিস্ময়ে ইতিহাসের অন্য এক প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট দেখছি, জওহরলালজীর শিষ্যদের হাতে তাঁরই মূল্যায়ন-নীতি কী নির্মমভাবেই না নিহত হচ্ছে।

ধনঞ্জয় দাশ

ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মানী মৈত্রী সমিতির প্রথম বর্ষপূর্তি উৎসব

কলকাতায় ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মানী মৈত্রী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ঠিক একবছর আগে। পশ্চিম জার্মানীর ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, সেখানে ন্যাৎসীবাদের পুনরাবির্ভাব এবং নয়া নাৎসীদের সক্রিয় ভূমিকাই গণতান্ত্রিক জার্মানী সম্পর্কে আমাদের দেশের মানুষকে ক্রমশ সচেতন করে তুলছিল। কেননা, তুলনায় গণতান্ত্রিক জার্মানী গ্যয়টে, ম্যাকসমূলার, মার্কস ও এঙ্গেলসের মহান ঐতিহ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম নিদর্শনও এই গণতান্ত্রিক জার্মানী। দেশটি আয়তনেও এমন কিছু বড় নয়, এর লোকসংখ্যা এক কোটি সত্তর লক্ষ। কিন্তু শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে এই দেশটি আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশগুলির মধ্যে একটি। গণতান্ত্রিক জার্মানী এ বছরের সাতই অক্টোবর বিশবছরে পা দিয়েছে। এখন এই রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব অস্বীকার করার অর্থ ইতিহাসকেই অস্বীকার করা। দুঃখের বিষয়, ভারত সরকার এখন পর্যন্ত ইতিহাসকে অস্বীকার করে চলেছেন। তাঁরা নাৎসীবাদের উত্তরসাধক পশ্চিম জার্মানীকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছেন অথচ, গণতান্ত্রিক জার্মানীকে দেন নি। ভারতবর্ষ জোট-নিরপেক্ষ নীতির সমর্থক, শান্তি ও প্রগতির পূজারী বলেই ভারতবর্ষের বাইরে পরিচিত। কিন্তু, ঘোষিত পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে তাঁদের আচরণের মিল নেই। ভারত সরকার যাতে জনমতের চাপে গণতান্ত্রিক জার্মানীকে দ্রুত স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন সেই অন্যতম কারণেও ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মানী মৈত্রী সমিতির প্রতিষ্ঠা। এই সমিতি গত একবছর ধরে দেশের মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন করবার

চেষ্টা করেছে, জনমত সংগঠিত করেছে এবং বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক জার্মানীকে স্বীকৃতি দেবার দাবি উত্থাপন করেছে।

গত ১৮ই আগস্ট রবিবার সকালে সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরে (২৭ জি কলেজ স্ট্রীট) বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এখানে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় কংগ্রেসের নয়াদিল্লীস্থ মুখ্য প্রতিনিধি আলফ্রেড নজো। বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি, ডঃ পঞ্চানন সাহাকে সাধারণ সম্পাদক ও দিলীপ বসুকে কোষাধ্যক্ষ করে আটত্রিশ জন পরিষদ-সদস্য নিয়ে সমিতির নতুন পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে।

প্রকাশ্য সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ১৯ শে আগস্ট, রবিবার সন্ধ্যায়, বিপুল জনসমাগমে সেদিন সমস্ত হলটি ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় আর বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্দ্রেই বেডার, আলফ্রেড নজো, জ্যোতি বসু, বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অমিয়কুমার বসু, ডঃ এ, এম, ও, গণি, ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, সুচিত্রা মিত্র ও গীতা মুখোপাধ্যায়। প্রত্যেক বক্তাই তাঁদের বক্তৃতায় জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উপরে জোর দেন। সভায় বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, চিন্মোহন সেহানবীশ, তরুণ সান্যাল, ডঃ এ, এম, ও, গণি প্রমুখ। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সেদিন রাত্রি ৯ টায় সভার কাজ শেষ হয়। আশা করা যায়, সমিতি তাদের অন্যান্যদের কাজের সঙ্গে আগামী বৎসরের কার্যকলাপের দ্বারা ভারত সরকার কর্তৃক গণতান্ত্রিক জার্মানীকে স্বীকৃতি দানের পক্ষে আরও জোরদার আন্দোলনও গড়ে তুলতে পারবেন।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

বিয়োগপঞ্জী

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে এক বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী, সর্বমানব হিতৈষী, কৃষকবন্ধু, শ্রমিকবন্ধু এবং প্রকৃত দেশপ্রেমিকের তিরোধান ঘটল। তিনি ছিলেন বহুবিধ সামাজিক বিজ্ঞানগুলির এবং ধর্ম, দর্শন, তত্ত্ববিদ্যা, ইষ্টবিদ্যা ও নন্দনতত্ত্বের মধ্যলোকে এক চিরন্তন ও যথার্থ সীমান্তচারী। এই সীমান্তচারিতার পরিচয় তাঁর বহু গ্রন্থেই পাওয়া যায়, যেমন, The Borderlands of Economics, Political Economy of Population, The Social Structure of Values, The Dynamics of Morals, The Social Function of Art, Theory and Art of Mysticism, ইত্যাদি।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে ইষ্টবিদ্যার যে আড়াআড়ি ভাব দেখা গিয়েছে, রাধাকমল তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমাজবিজ্ঞানের এক ইষ্টমূল্যভিত্তিক সৌধ দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন। 'সোশ্যাল ইকলজি' তথা 'হিউম্যান ইকলজি'-র একজন পথিকৃৎরূপে তিনি পণ্ডিতসমাজে আদৃত হয়েছিলেন। যাকে বলা হয় 'রেজিওন্যাল সোশিওলজি' বা 'আঞ্চলিক সমাজবিদ্যা', সেটাই ছিল বোধ হয় তাঁর সব চেয়ে প্রিয় বিষয়। তাঁর চোখে 'রেজিওন্যালিজম'-ই ছিল গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক যোজনার ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব পুনর্গঠনের প্রধান বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার। এ বিষয়ে রাধাকমল The Regional Balance of Man, Migrant Asia, Races, Lands and Food, The Regional Economics of India, Rural Economy of India, Planning the Countryside, Man and His Habitation প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ও অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় এশিয়দের বহির্বাসনের সপক্ষে তাঁর কণ্ঠস্বর নির্ভীকভাবে উত্থিত হয়েছিল। গ্রামের শহরায়ণ ধারণাটি প্রকাশ করার জন্য তিনি শেষোক্ত গ্রন্থে 'rurbanisation' নামক একটি অভিনব ইংরেজি শব্দ উদ্ভাবন করেছিলেন।

বিশ্ব জনবিদ্যায় (World Demography) ও ভারতীয় জনবিদ্যায় তাঁর অবদান স্বীকৃত। জনসংখ্যা ও খাদ্য সররবাহের অসাম্য ছিল তাঁর চোখে জগতের ও ভারতের এক প্রধানতম সমস্যা। এই সমস্যার বিশ্লেষণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তার পরিচয় তাঁর বহু লেখায় (যেমন Food

Planning for Four Hundred Millions) পাওয়া যায়। The Foundations of Indian Economics গ্রন্থে তিনি ভারতীয় অর্থনীতি-বিদ্যাকে এক নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করেছিলেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ভিত্তিতে অর্থনৈতিক শিল্পায়নকে অবশ্যম্ভাবী জেনেও তার অমঙ্গল থেকে ভারতকে বাঁচানোর জন্য তাঁর ব্যাকুলতা গান্ধীজীর চিন্তাধারাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর The Land Problems of India. ভারতের ভূস্বত্ব ও ভূমিসমস্যা সম্বন্ধে স্মরণীয় গ্রন্থ। ভারতের কৃষিবিপ্লব সংক্রান্ত আলোচনায় সকল মার্কসীয় মনস্বীই এই গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। তিনি যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন, "ভারতে ভূমিহীন মজুরশ্রেণীর বৃদ্ধির সঙ্গে প্রকৃত গণতন্ত্র খাপ খায় না।" জাতীয় কংগ্রেসের 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির' ভূমি-সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনায় ও নির্দেশনায় তাঁর ছিল অগ্রণী ভূমিকা। ভারতে প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে বিরোধ ও অসাম্য সম্বন্ধে তাঁর সতর্কবাণী তাঁর বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদৃষ্টির পরিচায়ক। শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর The Indian Working Class নামক প্রামাণিক গ্রন্থের দ্বারা ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন উপকৃত হয়েছে।

সাহিত্যের প্রতিও তাঁর মনের আকর্ষণ ছিল। তিনি বহু বৎসর 'উপাসনা' ও 'উত্তরা' পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন এবং সাহিত্যের শিল্পী ও আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি দিকপালদের বিসংবাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 'আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য' নামে একটি পুস্তকও তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর 'দরিদ্রের ক্রন্দন' ও 'শাশ্বত ভিখারী', এই দুটি বাঙলা বই এককালে বহুপঠিত ছিল। বাঙলা দেশে 'প্রলেটারীয় সাহিত্যের' অভ্যুদয়কে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। দুঃখক্লিষ্ট, নিপীড়িত মানবের ভিতরেই তিনি তাঁর দেবতার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং 'সোনিয়ার পদতলে প্রণতি'-র মধ্যেই তিনি দেখেছিলেন সেই দেবতার কাছে শিল্পীর আত্ম-নিবেদনের দিব্যালেখ্য।

অল্প বয়সে তিনি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং সেই মহামনীষীর প্রভাব তাঁর Democracies of the East, Principles of Comparative Economics প্রভৃতি গ্রন্থে সুস্পষ্ট। ছাত্রজীবনেই তিনি মেছুয়াবাজার বস্তিবাসীদের মধ্যে নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন এবং অসংখ্যপ্রকার বিদ্যাচর্চার ফাঁকে ফাঁকে এই ধরনের কাজে পঁয়তাল্লিশ বৎসর

ধবে লিপ্ত ছিলেন। বহবমপুব কলেজে অধ্যাপনা কবাব কালে তাঁব দ্বাবা পবিচালিত নৈশ ও বয়স্ক বিদ্যাযতনগুলিকে 'সন্ত্রাসবাদীদেব কর্মকেন্দ্র' রূপে সন্দেহ কবে ইংবেজ সবকাবেব পুলিশ ভেঙে তছনচ কবে দেয়।

নিঃসঙ্গতা ও নৈঃশব্দ্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব সঙ্গে মানবেব সাযুজ্যসাধন কবে, এই মিস্টিক মতবাদ পোষণ কবেও বাধাকমল জীবনেব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সামাজিক কর্তব্যপালন থেকে কখনও বিবত থাকে নি। লখনৌযে উত্তব প্রদেশেব ললিত কলা অকাদেমীব এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে ২৪শে আগষ্ট ১৯৬৮ তাঁব জীবনাবসান ঘটে। এই কিঞ্চিৎ অতীতমুখী আবাব অত্যন্ত আধুনিক, বিজ্ঞানী, মানবপ্রেমিক, সত্যই অসাধাবণ মানুষটিব উদ্দেশ্যে আন্তবিক শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন কবি।

অমবেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

নরেশ মিত্র

প্রখ্যাত নট এবং নাট্য ও চিত্র পবিচালক নবেশচন্দ্র মিত্রব মৃত্যু (গত ২৫ শে সেপ্টেম্বব) শুধু শোক নয়, একটি সশ্রদ্ধ বিস্ময়বহ ঘটনা। কী অদম্য প্রাণশক্তি ও শিল্পনিষ্ঠাব অধিকাবী হলে ৮১ বৎসব বযস পর্যন্ত একজন শিল্পী এমন অক্লান্ত উদ্যমে নিজেব আবব্ধ কর্মে তন্নিষ্ঠ থাকতে পাবেন, ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। মৃত্যুব দু'দিন পূর্বেও তিনি যাত্রামঞ্চে, যাত্রাব মত একটি উচ্চগ্রামেব অভিনয়ে অংশগ্রহণ কবে গেছেন।

যে যুগে তিনি অভিনেতা হিসেবে মঞ্চে যোগদান কবেন, নাট্যজগৎ সম্পর্কে সে যুগেব অশ্রদ্ধা ও অনীহা সর্বজন বিদিত। কিন্তু সেদিনেব উচ্চ শিক্ষিত ও বনেদী পবিবাবেব যুবক নবেশচন্দ্র অভিনযকে শিল্প হিসেবে ভালোবেসে সমস্ত বিরূপতা ও প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা কবেই অভিনয জগতে প্রবেশ কবেছিলেন। এবং আমৃত্যু সেই শিল্পেব অনলস সাধক হিসেবেই স্বস্থানে স্থিত ছিলেন।

নাট্যজগতে তাঁব প্রতিভা ছিল বহুমুখী। শুধুমাত্র অভিনেতা নয, সুযোগ্য এবং দক্ষ নাট্যপবিচালক হিসেবেও তাঁব অবদান আজ শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্মবণীয়। নাট্য ও চিত্র জগতেব বহু স্বার্থক শিল্পীব স্রষ্টা হিসেবেও তাঁব নাম উল্লেখ্য। বচনাক্ষেত্রেও যে তিনি সমান পাবদর্শী ছিলেন তাব উল্লেখযোগ্য প্রমাণ, ববীন্দ্রনাথেব 'গোবা' উপন্যাসেব নাট্যরূপ। যে নাট্যরূপ দেখে তৃপ্ত ববীন্দ্রনাথ নবেশচন্দ্রকে তাঁব ছোটগল্পগুলোব নাট্যরূপ দেবাব জন্য সানন্দ অনুমতি দিয়েছিলেন।

চলচ্চিত্র ক্ষেত্রেও নবেশচন্দ্র আজ একটি প্রতিষ্ঠিত নাম। মঞ্চ যখন চলচ্চিত্রকে কিছুটা অন্ত্যজ জ্ঞানে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখত, সেই নির্বাক যুগেও চলচ্চিত্রকে একটি শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম হিসেবে চিনতে পেবেছিলেন তিনি। এবং সাগ্রহে তাকে গ্রহণ কবেছিলেন। চলচ্চিত্র ক্ষেত্রেও সেদিনেব, নির্বাক যুগেব সেই 'দেবদাস' থেকে শুরু কবে সর্বশেষ সবাক 'উল্কা' পর্যন্ত—বিভিন্ন বসেব বহুবিধ চিত্রসম্ভাবেব মাধ্যমে নবেশচন্দ্র দর্শক মনে নিজেব স্থান স্থায়ী কবে নিযেছিলেন। তাঁব বাষ্ট্রীয় পুবস্কাব প্রাপ্ত চিত্র— অন্নপূর্ণাব মন্দিব।'

বযস বিচাবে নবেশচন্দ্রেব মৃত্যু হযতো তেমন শোকাবহ নয, কিন্তু নাট্য জগতে তাঁব অবদান, অদম্য প্রাণশক্তি ও নিষ্ঠাব কথা স্মবণে বেখে তাঁব মৃত্যুকে বাঙলা নাট্য জগতেব একটি অপূবণীয় ক্ষতি বলে মানতেই হবে।

স্বরাজ বন্দোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্য জগতেব একটি সাম্প্রতিক শোক, কথাশিল্পী স্ববাজ বন্দ্যোপাধ্যাযেব অকাল মৃত্যু।

মাত্র ৪৮ বৎসব বযসে দুবাবোগ্য ব্রেনক্যানসাব বোগে গত ৯ই আগষ্ট তাঁব মৃত্যু হয।

অবশ্য সাহিত্য সাধক স্ববাজ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠকদেব জন্য বেখে গিযেছেন প্রচুব ছোট গল্প, প্রায পঁচিশটি উপন্যাস এবং সাহিত্য নিষ্ঠাব উজ্জ্বল উদাহবণ। বচনাব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অক্লান্ত এবং একনিষ্ঠ। শেষ দিকে, বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায প্রচণ্ড অনিশ্চযতাব আশঙ্কা উপেক্ষা কবেও, তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সাহিত্য সাধনায় অর্পণ কবাব জন্য দীর্ঘদিনেব চাকুবিটি ছেড়ে দিযে যে মনোবলেব পবিচয দিযেছিলেন, তা সশ্রদ্ধ স্মবণীয। বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁব অবদান, সাহিত্যমান বা খ্যাতিব তুলনামূলক ও বিতর্কিত প্রশ্নে না গিযেও বলা যায, স্ববাজ বন্দ্যোপাধ্যাযেব মৃত্যুতে আমবা ধ্যান জ্ঞান ও কর্মে সম্পূর্ণ শিল্পসমর্পিতপ্রাণ একজন সাহিত্য-সাধককে হাবালাম।

মিহিব সেন

'পবিচযেব' অকৃত্রিম সুহৃদ, বিশিষ্ট বুদ্ধিবাদী ও সাংবাদিক সবোজ আচার্য মহাশয গত ১৯শে অক্টোবব লোকান্তবিত হযেছেন। 'পবিচয়েব' পক্ষ থেকে আমবা শোক প্রকাশ কবছি। তাঁব স্বজন বান্ধব ও পবিবাবেব প্রতি আমবা সমবেদনা জ্ঞাপন কবি।

সম্পাদক-পবিচয

উত্তর বাঙলাকে বাঁচান

মেদিনীপুবেব বন্যাব জল তখনো সম্পূর্ণ নামেনি। গ্রামে গ্রামে তখনো হাহাকাব, ক্ষুধা আব বাজ্যপালেব আমলাতন্ত্রী শাসনেব বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণা। শাবদীয পূজাব বিসর্জনেব ঢাকেব বেশ মেলাতে না মেলাতেই গর্জে উঠলো পাহাড়েব ধস, নেমে এলো উত্তব বাঙলায প্লাবন, মৃত্যু আব সর্বনাশ। বাজ্য-পালেব শাসনে কৈফিযতেব দায থেকে মুক্ত নিবঙ্কুশ আমলাতন্ত্র আজ চোখে আঙুল দিযে দেখিযে দিচ্ছে যে সাধাবণ মনুষ্যত্ব ও দাযিত্ববোধেব অভাব আছে এই বাজ্যপালতন্ত্রেব। প্লাবনেব পূর্বসংবাদ জানিযে দিলে বাঁচতো জলপাইগুডিব সহস্র সহস্র প্রাণ ও সম্পদ, বাঁচতো গ্রাম জনপদেব দবিদ্র কৃষকেব প্রাণ ও জীবন ধাবণেব যৎকিঞ্চিৎ সামগ্রী।—বাঙলা দেশে জনপ্রিয শাসনকে কৌশলে অপসাবণ কবে, বে-আইনী চণ্ডবাজ ও পবে বাজ্যপালেব দণ্ডশাসন আমাদেব উপবে চাপিযে দিযে এ কোন সর্বগ্রাসী অনিশ্চিতি, অসহাযতা, ও ধ্বংশেব দিকে ঠেলে দেওযা হযেছে। দেখছি, বন্যাব পবেও ত্রান পুনর্বাসণ প্রভৃতিব ছদ্মবেশে কেন্দ্রীয শাসকদেব পক্ষপুটাশ্রযী গোষ্টিব স্বার্থে দলবাজী। উপপ্রধানমন্ত্রী জলপাইগুডিব বিধ্বস্ত, ত্রস্ত, ক্ষুব্ধ, ও অসহায মানুষেব মুখেব উপব ছুঁডে দিলেন তাচ্ছিল্য। প্রধানমন্ত্রীব চোখেব সামনে, জলোচ্ছাসেব দাঁত থেকে কোনক্রমে বেঁচে ফিবে আসা শ্মশানপুবী জলপাইগুডিতে সর্বহাবা ও শোকার্ত মানুষেব মাথা ভাঙলো বাজ্যপালেব লাঠি। আমাদেব ঘৃণা জানাবাব ভাষা নেই।

আমলাতন্ত্রী টালবাহানাব সময সঙ্কোভে আজ মনে পডে যায স্বল্পস্থাযী যুক্তফ্রণ্টেব শাসনে বাঁকুডা-পুরুলিযাব খবাত্রাণে জনপ্রিয সবকাবেব অকুতোভয আপ্রাণ নিষ্ঠা। বন্যানিবোধেব জন্য যুক্তফ্রণ্ট সবকাবেব সেচদপ্তবেব পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয সবকাবেব নিকটে অবিলম্বে কাজ শুরু কবতে বিশ কোটি টাকা দাবি কবা হয - যে পবিকল্পনা কার্যকবী হলে মেদিনীপুব, উত্তব বঙ্গেব প্লাবন অনেকখানি প্রতিবোধ কবা যেতো। কেন্দ্রীয সবকাব, এবং পুর্বেব কংগ্রেসী সবকাব যদি ব্যাপ্ত পবিকল্পনাকে আগেই কাজে পবিণত কবতেন, নেমে আসতোনা এই ধ্বংশ, এই বিনাশ।

কেন এমন হয, মেদিনীপুবে যখন বন্যা, সেখানে সেচখালে প্লাবিত ক'বে রুদ্রজলস্রোতেব তাণ্ডব, ঠিক তখনই বর্ধমান-হুগলী জেলাব জলহীন শুকনো সেচখালেব মাটি ফুটিফাটা, মাঠেব ধান আতঙ্কে পাণ্ডুব। কেন এমন হয—উত্তব

বাঙলায় যে বৃষ্টিপাত বন্যাব কবালগ্রাসেব স্রষ্টা, সেই একই সময়ে সেই একই মেঘবিস্তাবেব বৃষ্টিপাতে নতুন জীবনে হেসে ওঠে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-নদীযা-বর্ধমান-হুগলীব শস্যক্ষেত্র। এই দু-বকম ঘটনাব জন্য পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী সেচেব ও প্লাবননিবোধেব অব্যবস্থাই দাযী—আমবা জানি। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী ব্যাপক সেচ পবিকল্পনাব মাষ্টাব প্ল্যান অবিলম্বে চালু কবতে হবে, পুনর্মূল্যাযণ কবতে হবে ইতিমধ্যে কার্যকবী কবা প্রকল্পগুলিও।

উত্তব বাঙলাব মানুষকে বাঁচাতে হবে। আমলাতন্ত্র নয, বাঁচাবে সাধাবণ মানুষ। ভুলিনি, শিলিগুড়িব মানুষেব অকৃপণ সেবা, আতিথ্য ও সহাযতা জলপাইগুড়িতে মানুষেব প্রতি মানুষেব বিশ্বাস ফিবিযে এনেছিল। শস্যহীন মাঠ,—গবাদি পশু, বীজধান ও অর্থে সর্বসান্ত উত্তববঙ্গেব চাষী—আচ্ছাদনহীন কর্দমাক্ত মৃত্তিকায শূন্য চোখে দেখছে ভবিষ্যৎ। শিশুব মুখে এক ফোঁটা দুধ যোগান দেবাব গাভীটিও কেড়ে নিযে গেছে প্লাবন। যেখানে গ্রাম ছিল, জনপদ ছিল—সেখানে বাক্ষসী তিস্তাব নতুনখাত। নিঃসম্বল শহবে মহামাবীব আতঙ্কেব সঙ্গে দেখা দিযেছে পবিজন ও সর্বস্ব হাবানো মানুষেব অসহাযতায উন্মত্ততাব চিহ্ন। বস্ত্রহীন, আচ্ছাদনহীন মানুষেব উপৰ নেমে এসেছে হিমালয়েব হিম হাওয়া, দুবন্ত শীত। পাথবচাপা হযে এখনো ছটফট কবছে ধস-নামা জনপদেব জীবিতেব দল। কেন্দ্রীয় সবকাবেব বকলম বাজ্যপালেব অপদার্থ শাসনে মৃত্যুদূতরূপী আমলাতন্ত্রেব অবহেলাব যোগ্য প্রত্যুত্তব দেবে এদেশেব মানুষ। ঔষধ, খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ এবং ছাত্রদেব জন্য পুস্তকাদিব সহাযতা দিযে জীবনে পুনপ্রতিষ্ঠিত কবে দেবাব ব্রত নিতে হবে পশ্চিম বাঙলাব সকল মানুষকে। আমবা দাবি কবি অপবাধী আমলাতন্ত্রীদেব উদাহবণমূলক শাস্তি, লালফিতাব অপদার্থতাব মূর্ত প্রতীক বাজ্যপালেব অপসাবণ এবং সমস্ত ঘটনাব বিচাব বিভাগীয তদন্ত। দাবি কবি, কেন্দ্রীয সবকাবেব অকৃপণ ও সৎ সহাযতা। আব আকাঙ্ক্ষা কবি মানুষেব জযেব—প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, আমলাতন্ত্রেব হৃদযহীনতা, অপশাসন, তাচ্ছিল্য ও অমানুষতাব বিরুদ্ধে। আকাঙ্ক্ষা কবি জনপ্রিয় শাসনেব দ্রুত পুনঃপ্রবর্তন।

পরিচয়

পরিচয়

বর্ষ ৩৮ ॥ সংখ্যা ৪-৫

কার্তিক-অগ্রহায়ণ ॥ ১৩৭৫

সূচিপত্র

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হিরণকুমার সান্যাল। সুশোভন সরকার। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদপট

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত

পরিচয়
বর্ষ ৩৮ । সংখ্যা ৪

তুর্গিয়েনেফ্ ঃ জীবন-সাহিত্য

১৮১৮—১৮৮৩

গুণময় দাস

"আমার জীবনই আমার সাহিত্য।"—তুর্গিয়েনেফ্

যে সমস্ত প্রতিভাধর সাহিত্যিকের রচনাসম্ভারে রুশ জাতীয় সংস্কৃতির গৌরব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন তুর্গিয়েনেফ্। লেনিন এঁকে "স্বনামধন্য রুশ লেখক" বলে অভিহিত করেছেন।

সামন্ত-ভূমিদাস প্রথা থেকে বুর্জোয়া-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে এক বিরাট পটপরিবর্তন হল, সেই এক সমগ্র ঐতিহাসিক যুগের রুশ জনজীবনের সার্থক প্রতিফলন দেখা যায় তুর্গিয়েনেফ্-এর রচনায়। এই বিরাট শিল্পী-রিয়ালিস্ট রুশ সমাজ-আন্দোলনের যে সব উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন তাদের সঞ্চারকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল 'ছাত্র-চক্র' থেকে সুরু করে ১৮৭৪-'৭৬ খৃষ্টাব্দের 'জনগণের কাছে যাও' আন্দোলনের সময় পর্যন্ত।

গভীর স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিলেন তুর্গিয়েনেফ্ এবং তারই উদ্দেশে পরিপূর্ণ-রূপে নিয়োজিত করেছিলেন আপন শিল্পক্ষমতাকে। তিনি বলতেন, "স্বদেশ ছাড়া সুখ নেই, স্বদেশের মাটিতে সকলে শিকড় চালিয়ে দাও।" ভূমিদাস প্রথার প্রতি তাঁর তীব্র বৈরভাব, জনগণের আবশ্যকীয় যা কিছুর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি তাঁর সাহিত্য-সাধনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। রাশিয়ার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ারের সঙ্গে তুর্গিয়েনেফ্-প্রতিভার বিকাশ নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত। তৎকালীন গণতন্ত্রী নেতা ও সাহিত্যকার বিলিন্স্কি, গিয়ের্ত্সেন, হার্ৎসেন এবং তাঁদের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক মুখপত্র 'সাভরিমিয়েন্নিক'-এর ('সমসাময়িক') সাথে যুক্ত থাকাকালীন বছরগুলোতেই তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট রচনার সৃষ্টি।

নতুন যা কিছু সম্পর্কে গভীব চেতনা, সমসামযিককালেব জীবনে জীবন যোগ, এ সবই লেখক তুর্গিযেনেফ্-এব বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে দাব্‌বাল্যুবোফ্-এব মন্তব্য স্মবণীয "সমাজচেতনায অনুপ্রবিষ্ট নতুন নতুন চাহিদা, নতুন নতুন ধ্যানধাবণাকে তিনি দ্রুত অনুধাবণ কবতে পাবতেন এবং তাঁব বচনাব মাধ্যমে সাধাবণতঃ পাঠকেব মনোযোগ আকর্ষণ কবতেন (অবশ্য তৎকালীন পবিস্থিতি যতটা তাঁকে অনুমোদন কবত) সেই সমস্ত প্রশ্নেব প্রতি যেগুলো অনতি-বিলম্বে মাথাচাডা দিযে উঠবে, এবং যেগুলো ইতিমধ্যেই সমাজকে অল্পস্বল্প উদ্বিগ্ন কবে তুলেছে।"

তুর্গিযেনেফ্-এব বচনা স্বদেশপ্রীতিব জাবকবসে সিঞ্চিত, উচ্চ নৈতিক আদর্শ ও জ্ঞানালোকিত ধ্যান-ধাবণায মণ্ডিত' সাল্‌তীকোফ্-শ্‌শেদব্রিণ লিখেছেন,—"নেক্রাসফ, বিলিন্‌স্কি এবং দাব্‌বালুবোফ্-এব সাহিত্যকর্মেব সমানুপাতে তুর্গিযেনেফ-এব সাহিত্যকর্মও আমাদেব জনসমাজেব পক্ষে একটা নেতৃত্বমূলক তাৎপর্য বহণ কবে।"

জীবনেব একটা প্রগতিশীল ও পজিটিভ বুনিযাদেব অনুসন্ধান কবতে এবং তাবই আলেখ্য পাঠকেব সামনে তুলে ধবতে তুর্গিযেনেফ সদা উদ্‌গ্রীব থাকতেন, তাঁব সৃষ্ট পজিটিভ্ চবিত্রগুলিব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সমাজেব প্রগতিকামী শক্তি-গুলিকে সবাসবি প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ কবে তুলত।

পুশ্‌কিন্ ও গোগোলেব মহান ঐতিহ্যানুসাবী, রুশ বাস্তববাদী উপন্যাস বচনাকাবদেব অন্যতম, অসাধাবণ কথাশিল্পী তুর্গিযেনেফ্ রুশ তথা বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টিব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকায অংশগ্রহণ কবেছেন।

তুর্গিযেনেফ-এব দেশ ও কাল

১৮১২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিযনেব বিরুদ্ধে "পিতৃভূমিব মহাযুদ্ধেব পব রুশ জনসাধাবণেব মনে ভূমিদাসপ্রথাব কলঙ্কমুক্তিব স্পৃহা দুর্বাব হযে উঠল, কিন্তু জাব ও জমিদাবশ্রেণীব একথা হৃদযঙ্গম হল না। তাবা ভূমিদাস প্রথাকে পূর্বেব মত জিইযে বাখল। যে মানুষগুলো কযেকদিন আগে স্বদেশেব জন্যে বুকেব বক্ত ঢেলেছে তাদেব গরু-ভেডা-ছাগলেব মত বেচা-কেনা, নৃশংস অত্যাচাবে জর্জবিত কবা বা সাইবেবিযায নির্বাসনে পাঠানো পূর্বেব মতই চলতে লাগল। সাবা দেশজুডে অসন্তোষেব বহ্নি ধূমাযিত হযে উঠল। যুদ্ধোত্তবকালে জমিদাবেব বিরুদ্ধে কৃষকেব সংগ্রাম আবও ক্ষুবধাব হযে ওঠে। এব আগে অবশ্য বাশিযাব মাটিতে তিন-তিনটে বেশ বড-সড কৃষক বিদ্রোহ

হয়ে গেছে। আর প্রতিবারেই জারের সৈন্যসামন্ত দুর্বল অসংগঠিত পরিকল্পনাহীন এইসব কৃষকবিদ্রোহকে নিষ্ঠুরভাবে দলিত মথিত করে দমন করেছে।

এবারে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার লড়াইয়ে অংশীদার হলেন অভিজাত যুব সমাজের উদারহৃদয় প্রগতিকামী এক অংশ। ভূমিদাসত্ব ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকল্পে তাঁরা জীবন পণ করলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে (দিকাবর) অভিজাত বিদ্রোহীদের গোপন সংস্থার উদ্‌যোগে জারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন 'দিকাব্রিস্ত্'রা। 'দিকাব্রিস্ত'রা পরাজিত হলেন। পাঁচজন 'দিকাব্রিস্ত'-এর ফাঁসি হল। অন্যান্যদের কাউকে পাঠানো হল সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে, কাউকে ককেশাসের যুদ্ধে সৈন্যহিসেবে। 'দিকাব্রিস্ত্'রা কিন্তু ছিলেন সম্ভ্রান্তবংশীয়, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে। জনগণের শক্তির উপর আস্থা না রেখে তাঁরা চেয়েছিলেন জনগণের জন্যে অথচ জনগণকে বাদ দিয়েই—সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শাসনকর্তৃত্বের পরিবর্তন।

এরপরে শতাব্দীর চতুর্থ দশকে কৃষকের স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে এলেন বিদ্রোহকামী গণতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীরা। এঁরা হলেন 'রাজনোচিনেৎস্' অর্থাৎ কর্মচারী, বণিক, যাজক, কৃষক, ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত প্রভৃতি নানা পরিবারের লোক। 'দিকাব্রিস্ত'দের থেকে এদের ধ্যান-ধারণা ছিল অনেক বেশি দূরপ্রসারী। এঁদের ধারণায় জনসাধারণের শক্তিই হল আসল হাতিয়ার যা দিয়ে বিপ্লব সবল হবে, স্বৈরতন্ত্র ও ভূমিদাসত্বের হবে বিলোপসাধন, কিন্তু এঁরা ছিলেন অসম্ভব কল্পনাবিলাসী সমাজতন্ত্রী, এঁরা ভাবতেন, রাশিয়ায় ধনতন্ত্র আসবে না, সামন্ততন্ত্রের পরেই আসবে সমাজতন্ত্র।

এমনকি শতাব্দীর ষষ্ঠদশকেও গণতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীরা ভাবতেন, কৃষকেরা বিপ্লব ঘটিয়ে দেশে সমাজতন্ত্র স্থাপন করবেন। তাঁরা তখনও রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর উৎপত্তি কল্পনা করতে পারেননি। রাশিয়ায় তখন ধনতন্ত্র সবেমাত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তাই তাঁরা তখন বুঝে উঠতে পারননি যে, কেবল শ্রমিক-নেতৃত্বেই এবং শ্রমিকের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েই কৃষকদের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

যা হোক, সারা দেশজুড়ে যখন কৃষকবিদ্রোহ ভয়ঙ্কর রূপ নিল (১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১২৬ জায়গায় কৃষক বিদ্রোহ ঘটে) তখন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল জার ও জমিদার শ্রেণী। তারা স্থির করল, আর দেরি করা নয়, 'নিচের তলা থেকে' ভূমিদাসরা করে নিজেদের মুক্তি অর্জন করবে সেই প্রতীক্ষায় না থেকে

'ওপব তলা থেকে' ওদেব বন্ধন মুক্তিতে প্রযাসী হওযা দবকাব। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বৃহৎ সংস্কাব-এব নামে ভূমিদাসপ্রথাব অবসান হল।

কিন্তু কি হল তাতে? ভূমিদাসেব মুক্তিপত্র স্বহস্তে বচনা কবেছে জমিদাব নিজেব সুবিধামত কবে। এ সংস্কাবেব মাধ্যমে তাই ভূমিসমস্যাব সমাধান হলনা। ফলে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দেই বাশিযায সতেবোশ'বও বেশি জাযগায কৃষক বিদ্রোহ ঘটে।

শতাব্দীব সপ্ত দশকেব বিদ্রোহকামী বুদ্ধিজীবীবা স্থিব কবলেন, গ্রাম জনতাব সঙ্গে একাত্ম হযে গিযে তাদেব সমাজতন্ত্রেব ব্যাখ্যা শোনাতে হবে, জাবেব স্বৈবতন্ত্র ও জমিদাবেব ভূমিগ্রাসেব বিরুদ্ধে তাদেব বিক্ষুব্ধ কবে তুলতে হবে। এইসব 'নাবোদ্নিক্' বা 'জনবাদী' ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দেব বসন্তকালে কৃষকেব পোযাক এঁটে গাঁযে গাঁযে ঘুবে বেডালেন। কিন্তু কৃষকজনতা এঁদেব কথা বুঝতে পাবলনা। অশিক্ষিত, নিঃস্ব গ্রাম্য চাষা-ভুষোবা বিশ্বাস কবত, জাব খুব ভালোমানুষ, আব সেজন্যই তিনি ওদেব দুর্বহ জীবনেব কথা কিছুই জানেন না। সহজেই শত শত 'নাবোদ্নিক্'কে গ্রেপ্তাব কবে সাইবেবিযায নির্বাসিত কবা গেল।

বিদ্রোহীবা কিন্তু এতে দমলেননা। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁবা 'জমি ও মুক্তি' ('জেম্লিযা ই ভোলিযা') নাম দিযে এক বেআইনী সংঘ গডলেন। সংঘেব সদস্যবা পুনবায গেলেন কৃষক জনতাব কাছে, শিক্ষক বা ডাক্তাবেব ছদ্মবেশে গাঁযে গাঁযে কাজ কবে বেডালেন, আসল উদ্দেশ্য বিদ্রোহেব আগুন ছডানো। কিন্তু কিছুতেই যেন কিছু হযনা। তখন এঁদেব মধ্যে একটা বডো অংশ সন্ত্রাসবাদেব পথ ধবলেন। তাঁদেব ধাবণা, জাব বা বাজপুরুষদেব হত্যা কবলেই দেশে বিপ্লব সুরু হযে যাবে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে 'গণমুক্তি' ('নাবোদ্নাযা ভোলিযা') নামে সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সংঘ গঠিত হল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সন্ত্রাস-বাদীবা জাব দ্বিতীয আলেকৃসান্দাবকে হত্যা কবলেন। বিপ্লব তো হলই না, ববং প্রবল প্রতিক্রিযাব সৃষ্টি হল, গ্রেপ্তাব ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন নেতৃ-স্থানীযবা, সংঘ ভেঙে গেল।

তুর্গিযেনেফ্-এব জীবনকালে (১৮১৮-১৮৮৩) এসব ঘটনা ঘটেছে একটাব পব একটা।

বাল্যকাল ঃ

১৮১৮ খৃষ্টাব্দেব ২৮শে অক্টোবব আবিওল শহবেব অনতিদূবে

স্পাস্কয়ে-লুতাভিনাভো গ্রামে এক অগাধ সম্পদ্‌শালী অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ইভান্ সির্‌গিয়েইভিচ্ তুর্গিয়েনেফ্।

তুর্গিয়েনেফ্-এর বাবা-মা ছিলেন বিরাট ধনী জমিদার। এঁদের অধীনে ছিল পাঁচহাজার ভূমিদাস চাষী। জমিদারের খামার বাড়িতে শুধু চাকরের সংখ্যাই ছিল চল্লিশ। জমিদারনী ভার্‌ভারা পেত্রোভনা-র (তুর্গিয়েনেফ্-এর মা) বর্বর অত্যাচারের কথা আশপাশের লোকেদের ভালোকরেই জানা ছিল। ভূমিদাসদের জন্যে তিনি যে সব ভয়ঙ্কর গা-শিউরে-ওঠা নিত্য নতুন নির্যাতনকৌশল উদ্ভাবন করতেন, তার কাহিনী লোকের মুখে মুখে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধু ভূমিদাস নয়, আপন সন্তানদের প্রতিও তাঁর নিষ্ঠুরতা কম ছিলনা। প্রায় রোজই তুচ্ছ কথায় বিনা বিচারে তিনি বেত মারতে স্থরু করতেন ছেলে ইভান্‌কে। ইভানের শত কাকুতি-মিনতিতে কর্ণপাত করতেন না। এক সময় গৃহশিক্ষকের দৃঢ় হস্তক্ষেপের ফলেই বালক তুর্গিয়েনেফ্ এই প্রাত্যহিক পীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা কিন্তু স্বেচ্ছাচারিণী, খুঁতখুঁতেস্বভাবা, প্রভুত্বলোভী মহিলা ছিলেন তুর্গিয়েনেফ-এর মা। তাঁরই বিষাদখিন্ন বার্ধক্যের প্রতিরূপ তুর্গিয়েনেফ অঙ্কিত করেছেন কতকগুলি গল্পে ('মুমু', 'প্রেম প্রেম' 'জমিদারের ব্যক্তিগত কাছারি, 'স্তেপের রাজা লীর' 'পুনিন্ ও বাবুরিন্')। তুর্গিয়েনেফ-এর পিতাও ছিলেন তেমনি—প্রণয় বিলাসে দক্ষ ও দর্পিত অভিজাত জমিদার। আত্ম-জীবনচরিতমূলক গল্প 'প্রথম প্রেম'-এ তুর্গিয়েনেফ পিতার চরিত্রচিত্রণ করেছেন।

আপন গৃহে ঐরকম জীবন ইভান্-এর শিশুমনে এক কঠোর ছাপ ফেলেছিল, আর সেই থেকেই গড়ে উঠেছিল কৃষকের উপর জমিদারের প্রভুত্বের প্রতি বিরাগ, আর ভূমিদাস প্রথার প্রতি প্রবল বৈরভাব। বালক ইভান যখন তখন দৌড়ে পালাতো বাড়ির বাগানের টেনিস কোর্টের দিকে আর দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ধরে চোখের জল ফেলতো। আর এইসব হতভাগ্য মানুষকে কি ভাবে সাহায্য করা যেতে পারে ভাবতে ভাবতে নিজের অক্ষমতার জ্বালায় জ্বলতো।

শুধু দরদ আর সমবেদনা নয়, অতিসাধারণ রুশ জনসমাজের অগাধ উদার ভালবাসার স্বাদ তিনি বাল্যজীবনে পেয়েছেন প্রাসাদরক্ষী এবং মায়ের সেক্রেটারী ফিওদার ইভানোভিচ লাবানোফ্-এর কাছে—যে তাঁকে ছোট-বেলায়

প্রাচীন রুশ কাব্যকাহিনী পড়ে শোনাতো। তাব কথা ইভান্ সিবগিয়েইভিচ্ সাবাজীবন বিস্মৃত হন নি। 'খুড়া' পাবফিবি কুদ্রিযাশোফ্ ছিল তাঁব ছেলেবেলাকাব অকৃত্রিম সহচব। সবলমতি চাষা, অসাধাবণ দক্ষ শিকাবী তীবন্দাজ আফানসিব সঙ্গে তুর্গিয়েনেফ ছেলেবেলায় বহু জায়গায় শিকাব কবে বেড়িয়েছেন। চাষাদেব মধ্যে আবও অসংখ্য বন্ধু ছিল তাঁব। সাধাবণ রুশ জনসমাজেব যত বেশি প্রতিভাধব মানুষেব তিনি পবিচয় পেয়েছেন— ভূমিদাস প্রথাব প্রতি তাঁব মনে তত বেশি দাউ দাউ কবে বিদ্বেষাগ্নি জ্বলে উঠেছে।

যখন আবও বড হলেন তখন তিনি ভূমিদাস প্রথাব বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামেব শপথ নেন, এবং নিবলস সাহিত্যসাধনাব মাধ্যমে তাঁব প্রতিজ্ঞা পূবণ কবেন।

সুইস্ ও জার্মান গৃহশিক্ষকেব তত্ত্বাবধানে চলে তুর্গিয়েনেফ-এব বাল্য শিক্ষা। বাড়িতে ছিল প্রকাণ্ড লাইব্রেবী, তাতে ছিল বিশাল ফবাসী সাহিত্য সংগ্রহ। পিতৃগৃহে এইটিই ছিল তুর্গিয়েনেফ্-এব বড আকর্ষণ।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে তুর্গিয়েনেফ-পবিবাব উঠে আসে মস্কোতে। প্রথমে ব্যক্তিগত বোর্ডিং স্কুলে, পবে লাজাবিয়েফস্কি ইন্‌ষ্টিটিউটে বোর্ডিং-এ এবং তাবপব গৃহশিক্ষকেব কাছে পড়াশোনা কবে মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তুর্গিয়েনেফ মস্কো বিশ্ববিদ্যালযে ভর্তি হলেন। ওখানে এক বছব পড়াব পব চলে এলেন পিতেববুর্গ (বর্তমান লেনিনগ্রাড) বিশ্ববিদ্যালযে এবং সেখানে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে দর্শন বিভাগে পাঠ শেষ কবলেন।

ছাত্রজীবনেব এই বছবগুলোতে যুবক তুর্গিয়েনেফ-এব প্রথম সাহিত্যানুবাগ গড়ে উঠতে থাকে। তিনি তখন কবিতা লিখছেন—শেক্‌সপীযাব এবং বাইবণ অনুবাদ কবছেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ছিলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, গণতান্ত্রিক বাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ভূমিদাস প্রথাব বিলোপ ছিল তাঁব মানস স্বপ্ন।

যৌবনকাল, বিদেশ ভ্রমণ ও সাহিত্য বচনাব প্রথম পর্ব

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তুর্গিয়েনেফ বিদেশভ্রমণে বেবোলেন। ঘুরে বেড়ালেন জার্মানী এবং ইতালীতে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালযে তিনি পড়লেন ইতিহাস এবং দর্শন, বিশেষ কবে হেগেলেব দর্শন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে ফিবে এসে তিনি মস্কোয বাস কবতে লাগলেন। পিতেববুর্গ বিশ্ববিদ্যালযেব দর্শনে এম. এ. পবীক্ষাব জন্য তৈবি হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে কবিতাও লিখছেন আব মস্কোব সাহিত্য

চক্রগুলোতে বিপুল উদ্যোগে যাতাযাত কবছেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ পবীক্ষায পাশ কবলেন, কিন্তু সাহিত্যানুবাগ পেল প্রাধান্য, তুর্গিযেনেফ দর্শনেব অধ্যাপক না হযে হলেন সাহিত্যসেবী। এই সময বিলিন্স্কিব কাছে তাঁব খুব যাতাযাত ছিল। বিলিন্স্কি তাঁব সম্বন্ধে লিখেছেন,—"অসামান্য তীক্ষ্ণধী এই মানুষটি। সাধমিটিযে আমি ওঁব সঙ্গে আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক কবতাম। এবকম মানুষেব সঙ্গ খুবই ভাল লাগে, এঁব স্বকীয বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী যে-কোন লোকেব টনক নডিযে দেয, সত্যালোকেব স্ফুলিঙ্গ ছডায।"

তুর্গিযেনেফ-এব সাহিত্যবচনাব ,প্রথম পর্ব ১৮৩৪ থেকে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ। এই পর্বেব স্থরু নাট্য-কবিতা 'স্তেনো' দিযে এবং সমাপ্তি কবিতাকাবে গল্প 'পাবাশা'তে।

'পাবাশা' কবিতাব আগে পর্যন্ত তুর্গিযেনেফ বোমান্টিকতায পবিপ্লুত। রুশ শিল্পকলা ও সাহিত্য যে ইতিমধ্যেই বাস্তববাদে মোড নিযেছে এ ব্যাপাবটা তাঁব কাছে তখনও স্পষ্ট হযে ওঠেনি। 'পাবাশা'তে প্রথম দেখা গেল বোমান্টিক-বাদ থেকে তাঁব পশ্চাদপসবণ। গ্রাম্য জমিদাবেব জীবনযাত্রাব ছবি আঁকতে গিয়ে এই কবিতায তুর্গিযেনেফ দেখান, অভিজাত পবিবাবেব নিষ্ফল জীবনেব গণ্ডীতে যৌবনকালেব যত কিছু উৎকৃষ্ট ধ্যানধাবণা, যত্ন, প্রযাস, কি ভাবে নিস্তেজ হযে পডছে। 'পাবাশা'ব কবিব মধ্যে বিলিন্স্কি খুঁজে পেলেন 'অসাধাবণ কাব্য প্রতিভা,' তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, ললিত সূক্ষ্ম শ্লেষ, দেখতে পেলেন তাঁব মানসপুত্রকে যে "তাঁবই সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা, তাঁবই যত কঠিন জিজ্ঞাসাব গুরুভাব অন্তবেব অন্তঃস্থলে বযে বেডাচ্ছে।" তবে একথা ঠিক যে, প্রথম দিককাব এইসব বচনাব বিষযবস্তুব মধ্যে বডোবকমেব কোন সমাজ-স্বার্থকে তুলে ধবা হযনি, তখনও হাত পডেনি ভূমিদাসত্বেব যুগে রুশ জন-জীবনেব মূল প্রশ্নগুলোব উপব। এদিক দিযে দেখতে গেলে তুর্গিযেনেফ-এব এই সমযকাব কাহিনীগুলিব সঙ্গে দস্তযেফ্স্কিব 'অভাজন' এব ('বিযেদনীযে ল্যুদি' ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তুর্গিযেনেফ এলেন বার্লিনে। ওখানে তাঁব সঙ্গে দেখা কবলেন বিলিন্স্কি। দুজনে একসঙ্গে জার্মানী ঘুবে বেডালেন। এই বছবেই তুর্গিযেনেফ এলেন প্যাবিসে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দেব প্যাবিসেব ফেব্রুযাবী বিপ্লবেব প্রত্যক্ষদর্শী হযে তিনি ইউবোপীয বাজনৈতিক ঘটনাব বিবাট পবিমণ্ডলে

বাস করতে লাগলেন, প্যারিসে বসবাসকারী দেশত্যাগী গিয়ের্তসেন-এরও ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এলেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তুর্গিয়েনেফ রাশিয়ায় ফিরে এসে কখনও স্পাস্কয়ে, কখনও মস্কো, কখনও বা পিতেরবুর্গে বাস করতে লাগলেন। ঐ সময়ে 'সর্দারের বাড়িতে প্রাতরাশ' ('জাফ্‌ত্রাক্ উ প্রিদ্‌ভোদিথেল্যা'), 'অবিবাহিত' ('খালাস্‌তিয়াক্'), 'প্রাদেশিকা' ('প্রাভিন্‌ৎসিয়াস্‌কা'), 'যেখানে পাতলা, সেখানেই ছেঁড়ে' (গ্‌দিয়ে তোইন্‌কো, তাল ই রভিয়োৎসা') প্রভৃতি তাঁর লেখা নাটকগুলো বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হচ্ছে।

নির্বাসন, সাহিত্যখ্যাতি

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে গোগোল মারা গেলেন। তুর্গিয়েনেফ তাঁর উদ্দেশে লিখলেন এক প্রবন্ধ। যখন পিতেরবুর্গের সেন্সর বিভাগ এ লেখা ছাপাবার অনুমতি দিলনা তখন তিনি লেখাটাকে পাঠালেন মস্কোয়, ওখানে 'মাস্‌কোফ্‌স্কিয়ে ভিয়েদমস্তি' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। এভাবে সেন্সরবিধি লঙ্ঘনের অপরাধে তুর্গিয়েনেফ্‌কে গ্রেপ্তার করে তাঁর নিজের জমিদারী স্পাস্‌কয়েতে পাঠানো হয়। শাপে বর হল। নির্বাসনে থেকে 'শিকারীর ডায়েরি' ('জাপিস্‌কি আখোৎনিকা') নাম দিয়ে লিখে চললেন একটার পর একটা গল্প। পেলেন অজস্র সাহিত্যখ্যাতি। রুশ সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। নির্বাসনকাল চলল ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে পর্যন্ত। কিন্তু পড়াশোনা, সাহিত্য সাধনা, সঙ্গীতচর্চা, দাবাখেলা, শিকার ও অতিথিসৎকারে তুর্গিয়েনেফ-এর ঐ নির্বাসিত গ্রাম্যজীবনের দারুণ নিঃসঙ্গতা রঙীন হয়ে উঠল।

ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে মুখর প্রতিবাদই হল 'শিকারীর ডায়েরি'র মর্মবাণী। রুশ কৃষককুলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাতদের সর্বপ্রকার কুৎসার মুখোস খুলে দিয়ে তুর্গিয়েনেফ দেখালেন, ভূমিদাস কৃষকদের মধ্যেও প্রতিভাধর, বুদ্ধিমান্ ও অনুসন্ধিৎসু মানুষের অভাব নেই। একই সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন ভূমিদাস জীবনের নিঃস্ব, জীর্ণ, কবাল চেহারা: দুর্ভিক্ষ, দৈন্য, অসহ্য গুরুভার জীবনযন্ত্রণায় ভুগছে মানুষগুলো। ইউদিনী গ্রামে কোচ্‌ওয়ান ইরফিয়েই একটুকরো রুটি খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হ'ল। মুখে দেওয়ার মত এতটুকুও খাবার পেল না, এমন কি একটা শশা বা এক গ্লাস

কৃভাস্‌ও (এক প্রকার সস্তা পানীয়) খুঁজে পেল না সে। তুর্গিয়েনেফ দেখিয়েছেন-অতি সামান্য ত্রুটির জন্যে, এমন কি অনেক সময় বিনাদোষেও গৃহভৃত্যদের বেত মারা হচ্ছে ('বুর্‌মিস্‌ত্‌র' ও 'দুই জমিদার'গল্পে), ভূমিদাসদের ব্যক্তিগত জীবনে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সর্বনাশা বঞ্চনার বোঝা ('এর্‌মোলাই ও যাঁতাকলের মালিক' গল্পে), তাদের ওপর এমনভাবে হম্বিতম্বি করা হচ্ছে, যেন তারা মানুষ নয়, অবোলা প্রাণীবিশেষ ('ল্‌-গোফ' গল্পে) তুর্গিয়েনেফ-এর সুপরিচিত 'মুমু' কাহিনীতে (১৮৫২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে লেখা) 'শিকারীর ডায়েরি'র গল্পগুলোরই বিষয়বস্তু ও মর্মবাণী প্রতিফলিত হয়েছে।

নির্বাসন থেকে মুক্তি পেয়ে পিতেরবুর্গে ফিরে এলেন 'শিকারীর ডায়েরী'র খ্যাতনামা লেখক তুর্গিয়েনেফ। প্রকাশিত হতে লাগল 'মুমু', 'প্রশান্তি' ('জাতিশে') প্রভৃতি নতুন নতুন গল্প এবং উপন্যাস 'রুদিন'। তারপরেই ক্রমশঃ প্রকাশিত হল বিখ্যাত সব উপন্যাস—'বাবুদের বাসা' (দভারিয়ান্‌স্কোয়ে গ্নিজ্‌দো), 'পূর্বক্ষণে' ('নাকানুনিয়ে'), 'পিতা ও পুত্র' ('আৎসী ই দিয়েতি'), 'ধোঁয়া' ('দীম্‌'), 'অনাবাদী জমি' ('নোফ্‌')—যে গুলোর প্রত্যেকটি রুশ সাহিত্যজগতে এক একটা অভূতপূর্ব ঘটনার মতো।

'রুদিন' তুর্গিয়েনেফ-এর প্রথম উপন্যাস (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত)। এই উপন্যাসে তাঁর মনোযোগ বিশেষ করে আকৃষ্ট হয়েছে অভিজাত সমাজের মানসিক ও নৈতিক জীবনের প্রতি। উপন্যাসের মুখ্য নায়ক রুদিন শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশকের রুশ অভিজাত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের এক আদর্শ প্রতিনিধি। রুদিন কিন্তু সমকালীন রুশ জনসমাজের পক্ষে' একজন 'অবাস্তব মানুষ'। জীবনে সে না পেল কোন স্বীকৃতি, না খুঁজে পেল কোন সঠিক কর্মপথ। কত না যন্ত্রণা পেয়ে পেয়ে শুধু খুঁজে খুঁজে বেড়াল। কিবা কর্মক্ষেত্রে কিবা প্রেমজীবনে, কোন কিছুতেই তার স্বপ্ন সফল হল না, হলনা কোনও জিজ্ঞাসা-পূরণ। তবে একজন উদ্যমী আর প্রচারকুশলী ব্যক্তি সে। স্বাধীনতা, আত্মোৎসর্গ, কর্মানুরাগ সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে সে অপরকে মুগ্ধ করতে পারে, অন্তরে সাড়া জাগিয়ে তাকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে, বিশেষ করে যুবহৃদয়কে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করার ক্ষমতা নেই, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অবশ্য প্রতিকূল সামাজিক পরিস্থিতি এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী। কত কিছুর জন্যেই না সে যুঝল, সব কিছুই পর্যবসিত হল ব্যর্থতায়।

রুদিনের সঙ্গে তুর্গিয়েনেফ-এর মিল অনেক। তুর্গিয়েনেফ্ "রুদিনকে সৃষ্টি

কবেছেন আপন প্রতিরূপ ও সাদৃশ্যেব মালমশলায,” গিযের্তসেন-এব একথা অনর্থক নয।

তুর্গিযেনেফ্-এব দ্বিতীয উপন্যাস ‘বাবুদেব বাসা’ (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) এতবেশি জনপ্রিয হযে উঠেছিল যে, তখনকাব দিনে এই উপন্যাসটি না পডাটা যে কোন লোকেব পক্ষে একটা লজ্জাব ব্যাপাব ছিল। এই উপন্যাস ছাডা রুশ সাহিত্যেব আব কোথাও মুমূর্ষু অভিজাত সমাজেব এমন শান্ত বিষন্ন ছবি অঙ্কিত হয নি। উপন্যাসেব নাযক জমিদাব লাভ্রিযেৎস্কি জীবনেব শেষ অঙ্কে নিজেব উদ্দেশ্যেই বলছে, “স্বাগত নিঃসঙ্গ বার্ধক্য। অবান্তর জীবন, ধীবে ধীবে এবাব নিভে যাও।”

‘পূর্বক্ষণে’ (১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) তুর্গিযেনেফ্-এব তৃতীয উপন্যাস। ভূমিদাসপ্রথা অবসানেব পূর্বক্ষণে এবং বাশিযায বৈপ্লবিক পবিস্থিতি যখন ক্রমবর্ধমান এমন একটা সমযে রুশ সমাজ-জীবনেব একটা বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হযেছে এই উপন্যাসে। এবাবে আদর্শবাদী কল্পনাবিলাসী নয়, প্রাণবন্ত কর্মতৎপব নতুন সব মানুষ উপন্যাসেব পাত্রপাত্রী। উপন্যাসেব নাযিকা, কেন্দ্রীয চবিত্র ধনী অভিজাত পবিবাবেব কন্যা এলেনা স্তাখোভাব হৃদযহবণ কবতে পাবল না হবু অধ্যাপক বেবসেনেফ বা ভাস্কব শুবিন্-এব মত প্রতিভাসম্পন্ন রুশ যুবকেবা। এলেনা শেযে কিনা প্রেমনিবেদন কবে বসল ইন্সাবোফ্ নামে এক গবীব বিদেশীকে—একজন বুলগেবীযকে, যাব জীবনেব একমাত্র মহান্ লক্ষ্য হল তুর্কী অত্যাচাব থেকে মাতৃভূমিকে উদ্ধাব কবা। তাবই মধ্যে সে দেখতে পেযেছিল প্রাচীন অখণ্ড হৃদযাবেগ আব গভীব মননশক্তিব সমন্বয। এলেনাব তীব্র স্বাধীনতা-স্পৃহাব সুযোগ্য পুরুষ হযে, সাধাবণেব স্বার্থেব সংগ্রামে বীবোচিত কীর্তিব সৌন্দর্যে তাকে মুগ্ধ কবে তাব হৃদয জয কবল ইন্সাবোফ্। ইন্সাবোফ্-এব প্রত্যক্ষ ও নির্ভীক লৌহবলেব ন্যায্য প্রাপ্যকে সম্মান দেখিযে সবে দাঁডাল শুবিন্ ও বেব্সেনেফ্। এলেনাব এই ‘নির্বাচনেব’ মাধ্যমে বুঝিবা স্পষ্ট হযে উঠল রুশ জনজীবনেব আকাঙ্ক্ষাব কথা, কি ধবণেব মানুষেব প্রতীক্ষায তাবা আছে।

ইন্সাবোফ্-এব মৃত্যুব পব এলেনা ঘববাডি, পবিবাব-পবিজন, স্বদেশভূমি ছেডে স্বামীব আবদ্ধ কার্য সম্পন্ন কবাব জন্যে চলে গেল বুলগেবিযাতে।

‘পূর্বক্ষণে’ উপন্যাস সম্পর্কে এক প্রবন্ধে দাববাল্যুবোফ্ প্রশ্ন বাখলেন,

"কখন আসবে আমাদেব সেই শুভ দিন ?"—সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা কবলেন "রুশ ইন্‌সাবোফ্"-এব সত্বব আবির্ভাবেব এবং আসন্ন বিপ্লবেব বার্তা।

'পূর্বক্ষণে' উপন্যাসেব তুলনায পববর্তী উপন্যাস 'পিতা ও পুত্র'তে (১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) তুর্গিযেনেফ্ রুশ দেশেব বাস্তব পবিস্থিতিব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলোব উপলব্ধি ও উদ্‌ঘাটনেব ক্ষেত্রে এক নতুন পদক্ষেপ কবলেন। শতাব্দীব পঞ্চ দশকেব শেষ দিকে রুশ জনজীবনে যে সব "নতুন মানুষ," "রুশ ইন্‌সাবোফ্" দেখা দিল (প্রগতিপন্থী ভাবাদর্শেব ক্ষেত্রে যাদেব নেতৃত্ব দিচ্ছেন চেব্‌নীশেফ্স্কি, দাব্‌বাল্যুবোফ্ ও পিসাবিযেফ্) তাদেব আদর্শ প্রতিনিধি হল এই নতুন উপন্যাসেব নাযক। এই 'নতুন মানুষটিব' প্রতি তুর্গিযেনেফ-এব মনোভাব পুবোপুবি স্পষ্ট ছিল না ঃ বাজাবোফ্ ছিল তাঁব "শত্রু", অথচ তাব প্রতি এক "অনিচ্ছাকৃত টান" তিনি অনুভব কবতেন। এই উপন্যাস সম্পর্কে তুর্গিযেনেফ্ লিখলেন, "অগ্রসব শ্রেণী হিসেবে অভিজাতদেব বিরুদ্ধেই লেখা সমস্ত কাহিনীটা"। আবও লিখলেন, "এ হল অভিজাততন্ত্রেব উপব গণতন্ত্রেব জযোৎসব।"

বাজাবোফ্ হল 'নতুন মানুষ' 'নিহিলিষ্ট' (নেতিবাদী) এবং বাজদ্রোহী, বাজনোচিনেৎস (অনভিজাত বুদ্ধিজীবী), গণতন্ত্রী, তাব ঠাকুর্দা মাঠে চাষ কবত একথা সে গর্বেব সঙ্গে বলে। বাবা গবীব ডাক্তাব। বাজাবোফ্-এব কাছে দলে দলে আসে সাধাবণ মানুষ, তাদেব কাছে সে হল নিজেব ভাইযেব মত। চেহাবায, পোষাকে-আশাকে, কথাবার্তায, আচাব-ব্যবহাবে বাজাবোফ্ একজন মূর্তিমান্ ডিমোক্র্যাট বাজনোচিনেৎস্। তাব অসাধাবণ কর্মাসক্তি, প্রখব বুদ্ধি, সে স্থিব প্রতিজ্ঞ ও ন্যাযপবাযণ। সে নাস্তিক, বিজ্ঞানভক্ত, বস্তুবাদে বিশ্বাসী।

'পিতা ও পুত্র' উপন্যাসেব মত তুর্গিযেনেফ্-এব আব কোনও বচনাকে কেন্দ্র কবে এত বেশি তীব্র বাদানুবাদ হযনি। লেখক নিজেই লক্ষ্য কবেছেন, "এই উপন্যাস যেন আগুনে ঘি ঢালল"। আব বাস্তবিকই তো এক চবম বাজনৈতিক মুহূর্তে এই উপন্যাসেব আবির্ভাব হযেছিল।

পববর্তী উপন্যাস "ধোঁযা"তে (১৮৫৬-১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে লেখা) তুর্গিযেনেফ্ প্রকাশ কবলেন ভূমিদাস প্রথা অবসানেব পব অভিজাত সম্প্রদাযেব যত সব প্রতিক্রিযাশীল চক্রান্ত। একই সঙ্গে দেখালেন, বাশিযাব বাস্তব প্রযোজনীযতা

সম্পর্কে বিদ্রোহকামী গণতন্ত্রীদেব অজ্ঞতা,—সব কিছুই তো বস্তুতঃ "ধোঁযাতেই" পর্যবসিত হল।

সর্বশেষ উপন্যাস 'অনাবাদী জমিতে' (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) তুর্গিযেনেফ্ রূপ দিলেন শতাব্দীব সপ্ত দশকে বিদ্রোহকামী জনবাদী আন্দোলনকে, গভীব আন্তবিকতাব সঙ্গে তিনি চিত্রিত কবলেন জনগণেব সেবায উৎসর্গীকৃত প্রাণ, কিন্তু বিপথগামী জনবাদী যুবকদেব ট্র্যাজিডিকে। এই উপন্যাসে তুর্গিযেনেফ্ বিদ্রোহকামী 'নাবোদ্নিক' যুবকদেব মহান্ কীর্তিব প্রতিরূপ চিত্রণেব মাধ্যমে দস্তযেফ্স্কিব বিদ্রোহবিবোধী কুৎসামূলক 'পিশাচেবা' ('বিযেসী' ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) উপন্যাসেব প্রতিবাদ জানালেন।

যাহোক, এই উপন্যাসেব পব তুর্গিযেনেফ্ লিখলেন, "যথেষ্ট হযেছে, আব নয। এবাব আমাব কলম বন্ধ কবি।"

কলম অবশ্য তাঁব থামল না। লিখলেন আবও কতকগুলি গল্প আব কতকগুলি 'গদ্যাকাবে কবিতা' (১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত)। তুর্গিযেনেফ্-এব সমগ্র বচনাব বিষযবস্তু ও মূল সুবেব প্রায সমস্ত কিছুই প্রতিফলিত হল তাঁব 'গদ্যাকাবে কবিতাগুলিতে'। 'বাঁধাকপিব স্যুপ' ('শশি') 'দুই ধনী' ('দ্ভা বাগাচা') এবং বিশেষ কবে 'দেহলী'তে ('পাবোগ') রুশ তরুণী বিদ্রোহিনীব অপূর্ব ট্র্যাজিক চিত্র লিপিবদ্ধ কবলেন।

প্রবাসজীবন ঃ

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তুর্গিযেনেফ পুনবায গেলেন বিদেশে এবং সেখানে তিনি কাটালেন তাঁব অবশিষ্ট জীবনকাল। অবশ্য প্রতিবছব তিনি একবাব ফিবে আসতেন বাশিযায, তবে স্পাস্কযে-মস্কো- পিতেববুর্গ এই ছিল তাঁব অভ্যস্ত সঞ্চাবপথ।

বাজনৈতিক মতবাদ

শতাব্দীব ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকেব বছবগুলিতে বাশিযা ও পশ্চিমী দেশগুলোব সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদেব সঙ্গে তুর্গিযেনেফ-এব বহুমুখী সাহিত্যিক-সামাজিক সম্পর্ক ও যোগাযোগেব মধ্যে যেমন তীব্র বিবোধ, তেমনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল বহুল পবিমাণে। তলস্তয, দস্তযেফস্কি, গন্চাবফ, গিযের্তসেন, নেক্রাসফ-এব সঙ্গে দীর্ঘকাল চলেছিল তীব্র বিবোধ। 'পিতা ও পুত্র' ('আৎসী ই দিযেতি') উপন্যাস প্রকাশিত হওযাব পব প্রগতিপন্থী

সাহিত্যে সমাজতত্ত্বের স্বরূপ সম্পর্কে মতবিরোধ এবং 'সাভ্রিমিয়েন্নিক' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কত্যাগের মধ্যে সে যুগের ভাবাদর্শ ও শ্রেণীগত রাজনৈতিক ও সাহিত্যসংক্রান্ত লড়াই একটা বিশিষ্ট রূপ নিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠদশকে 'সাভরিমিয়েন্নিক্' ('সমসাময়িক') পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যজগৎ দুটো শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। একদিকে তুর্গিয়েনেফ গনচারফ, তল্‌স্তয়, গ্রিগরভিচ, দ্রুঝিনিন্ প্রভৃতি ক্রমাগত ধীর সংস্কারের পক্ষপাতী উদারনীতিক, এবং রক্ষণশীল অভিজাত সাহিত্যিক, অন্যদিকে চেরনীশেফস্কি ও দাবরালুবাফ্ প্রভৃতি কৃষক-বিদ্রোহের সমর্থক গণতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীরা। এ ধরণের তীব্র মতবিরোধ শুধু প্রতিফলিত করল আর কিছু নয়, শ্রেণীগত শক্তির স্পষ্ট সীমানির্দেশ, যা ভূমিদাস প্রথা অবসানের পূর্বক্ষণে সমাজে ইতিমধ্যেই প্রতীয়মান হয়েছে।

তুর্গিয়েনেফ ভ্রান্তিবশেই জোর দিয়ে বললেন যে, সংস্কারোত্তর রাশিয়ায় প্রগতিশীল বিকাশের motive power হবে শুধু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। "শিক্ষিত সংখ্যালঘু" সম্প্রদায়ের উন্নতি ও সাম্প্রদায়িক ভূমিস্বত্বের মধ্য দিয়েই রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র আসবে, গিয়ের্ৎসেন-এর এই ধরণের প্রত্যাশাকে অবশ্য একই সময়ে তুর্গিয়েনেফ ন্যায়সঙ্গতভাবেই অযৌক্তিক আখ্যা দিয়েছিলেন। সে যাহোক, রাশিয়ায় উদ্ভূত সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে অনিবার্যভাবে জনমনে গনতান্ত্রিক দাবি-দাওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক আশাআকাঙ্ক্ষা ব্যাপকভাবে জাগিয়ে তুলবে, একদিকে সে কথা তুর্গিয়েনেফ বুঝতে ছিলেন অসমর্থ। অন্যদিকে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতাজনিত ভয় ও জনগণের ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী মনোভাব তুর্গিয়েনেফকে অভিজাত বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। অভিজাত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ ক্রমশঃ তুর্গিয়েনেফ-এরও মনে প্রতিবাদী মনোভাব সৃষ্টি করতে লাগলো। আবার শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের অন্তে এবং সপ্ত দশকের প্রারম্ভে লেখা অসংখ্য চিঠিপত্রে সংস্কারোত্তর রাশিয়ার জনগণের ক্লেশকর অবস্থা সম্পর্কে বহু তিক্ত সত্য তিনি প্রকাশ করেছেন। জার সরকারের আভ্যন্তরীণ নীতির প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র সম্পর্কেও তিনি প্রায়শই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

তুর্গিয়েনেফ ছিলেন বিপ্লববিরোধী, কিন্তু গভীর মনোযোগ ও অকৃত্রিম উৎফুল্লতার সঙ্গে তিনি বিপ্লবীদের কার্যকলাপের উপর শুধু নজর রাখতেন না,

সেই মনোযোগ ও উল্লাসকে তিনি সুস্পষ্টভাবে আপন বচনাব মাধ্যমে ব্যক্ত কবতেন।

সমাজ ও সাহিত্য সেবায স্বীকৃতি

রুশ সমালোচকদেব দৃষ্টিকেন্দ্রে তুর্গিযেনেফ-এব স্থান ছিল অপবিহার্য। তাঁব বিখ্যাত বচনাবলীকে ঘিবে অবিবত নির্মম বাদবিসম্বাদ পাক খেত। প্রবাসে থেকে তুর্গিযেনেফ রুশ সাহিত্যিকদেব মধ্যে সর্বপ্রথম 'মহান ঔপন্যাসিক' হিসেবে স্বীকৃতি পেযেছেন, প্যাবিসে থাকাব সময তিনি মেবিমে, গঁকুব, দোদে, এমিল জোলা, মোপাসা এবং ফ্লবেযেব প্রভৃতি প্রগতিপন্থী ফবাসী বাস্তববাদী সাহিত্যিকদেব ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন। তাঁবই অবিবাম উৎসাহপূর্ণ যত্নেব ফলে এই সমযে পাশ্চাত্যে রুশ সুকুমাব সাহিত্য প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন কবে।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দেব বসন্তকালে বাশিযায এসে তুর্গিযেনেফ বিপুল অভ্যর্থনা পেলেন। লেখক হিসেবে তাঁব প্রতি সুদীর্ঘকাল ঔদাসীন্যেব পব সপ্তম দশকেব শেষে যুব সমাজ তাঁকে জানাল তাঁব সাহিত্য ও সমাজ সেবাব স্বীকৃতি, জানাল আবেগপূর্ণ অভিনন্দন।

জীবনদীপ নির্বান ঃ

তুর্গিযেনেফ প্রাযই বোগে ভুগতেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সুদীর্ঘ পীডাদাযক ব্যাধিব (মেরুদণ্ডে ক্যানসাব) প্রাথমিক লক্ষণগুলো প্রকাশ পেল। এই ব্যাধিই ডেকে আনল তাঁব মৃত্যু। প্রবাসে নিভল তাঁব জীবন দীপ (১৮৮৩ খৃস্টাব্দেব ২২শে আগস্ট। ফ্রান্স থেকে পিতেববুর্গ এল তাঁব মৃতদেহ এবং ২৭শে সেপ্টেম্বব ভালকোভো নামক কববখানায অভূতপূর্ব জনসমাবেশেব মধ্যে তাঁকে সমাহিত কবা হল।

বিজয়ী প্রেমের গান

ইভান তুর্গেনেভ

দিন চলে যায় ভ্রান্তিতে যায় স্বপ্নঘোবে—শিলাব

পুবনো এক ইতালীয পাণ্ডুলিপিতে এ কাহিনী আমি পডেছিলাম

ইতালীব ফেবেবা শহবে দু-জন যুবক বাস কবতো। নাম ফাবিযাস ও মুসিযাস। ফাবিযাস ছিল চিত্রী আব মুসিযাস ছিল সঙ্গীতকাব। ফাবিযাসেব চুলেব বঙ ছিল হাল্কা। মুসিযাসেব ছিল ভ্রমবকৃষ্ণ কেশ। দু-জনেই যে মেযেটিকে ভালোবাসতো—নাম তাব ভালেবিযা। ভালেবিযা যে কাকে ভালোবাসতো তা সে নিজেও বুঝতো না। কিন্তু সে বিযে কবলো ফাবিযাসকে। ভালেবিযাব মাকে খুসি কবেছিলো ফাবিযাস। মুসিযাস ফেবেবা ত্যাগ কবে কোথায চলে গেল। ফাবিযাস আব ভালেবিযাও ফেবেবাব কাছাকাছি এক ভিলায বাসা বাঁধলো। এমনি কবে চাব বছব গডিযে গেল। বেশ সুখী তাদেব জীবন। তবে একটাই তাব খুঁত। কোন ছেলেমেযে হল না তাদেব।

হঠাৎ একদিন মুসিযাস ফিবে এলো। উঠলো এসে ফাবিযাসদেব মস্ত বাগান বাডিতে। ভালেবিযা আব ফাবিযাস খুব খুশি হল। মুসিযাস পুব দেশ ঘুবে এসেছে। পাবস্য, আবব আব ভাবত সে ঘুবেছে। সে দেশ-গুলিতে লোকজন কেমন নবম শস্পপুঞ্জেব মত নধব শ্যামল। মুসিযাসেব সঙ্গে এসেছে এক মালযবাসী বোবা চাকব। জিব নেই বটে, কিন্তু কেমন এক আশ্চর্য শক্তি যেন তাকে ঘিবে আছে সর্বক্ষণ। মুসিযাস অনেক আজব আজব সাপেব খেলা দেখালো। সে সব খেলা সে ভাবতে ব্রাহ্মণদেব কাছে শিখেছে। মুসিযাসেব সঙ্গে ছিল এক ভাবতীয বেহালা। তাতে সে সহজ অথচ বেদনাভবা কেমন এক গান বাজালো। সেই গানেব সুব কেমন যেন একাকীত্বেব। কেমন এক অজানা ধ্বনি স্পন্দন, কেমন যেন জযের আব আলো ঝলমলে ঝর্ণাধাবা ঝবে পডলো সেই বেহালা থেকে। মুসিযাস বলে, এ হল বিজযী প্রেমেব গান। সিংহল দ্বীপে এ গান সে শুনেছে। গান যখন বাজছিল ভালেবিযা বিমর্ষ মুখে বসে বইলো। সে ভাবছিলো চাব বছব

আগে এই মুসিযাসকে কেমন একটুও ভয কবতো না তাবা। মুসিযাস ভালেবিযা আব ফাবিয়াসকে সিবাজি দিযে আপ্যাযন কবলো।

সে বাতে অনেকক্ষণ ভালেবিযাব চোখে ঘুম এলো না। তাবপব এক সময এক অদ্ভুত ঘুমেব মধ্যে ডুবে গেল। সে যেন এক বিশাল অথচ বেশ নিচু একটি ঘবে প্রবেশ কবেছে। একটা দবজা তাব কালো মলমলেব পর্দায ঢাকা। হঠাৎ সেই দবজা দিযে মুসিযাস ঘবে এলো। তাবপব হেসে তাকে মুসিযাস চুম্বন কবলো। ঘুম ভেঙে গেল তাব। ফাবিযাসকে জাগিযে তুললো ভালেবিযা। আব সে মুহূর্তে তাবা শুনলো বিজযী প্রেমেব সেই গান। মুসিযাস তাব বাগান বাডিতে উচ্চগ্রামে বাজিযে চলেছে বেহালা।

পবদিন মুসিযাস বললো, ভারি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছে সে। এক অজানা ঘবে সে যেন ঢুকে পডেছে। আব সেই ঘবে বযেছে তাব প্রেমিকা। ঘুম ভাঙতেই বেহালা তুলে নিলো সে। বাজিযে চললো বিজযী প্রেমেব গান।

পবেব বাতে ফাবিযাসেব হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখে, শয্যায স্ত্রী নেই। বাগান থেকে হঠাৎ ভালেবিযা ঘবে প্রবেশ কবলো। ওদিকে বাগান বাডিতে মুসিযাস তখন বাজিযে চলেছে সেই বিজযী প্রেমেব গান।

পবেব বাতে ফাবিযাস ঘুমোলো না। চোখ আব মন তাব বাগানেব দিকে। হঠাৎ সে দেখলো মুসিযাসেব চোখ দুটি বন্ধ, কিন্তু আচ্ছন্নেব মত দু-হাত বাডিযে এগিযে চলেছে সে। আব সেই মুহূর্তেই ভালেবিযা তাব দিকে এগিযে গেল। সে বাগানেব দিকে চলেছে। ফাবিযাস দবজা বন্ধ কবে দিল। জানলা ডিঙিযে ভালেবিযা বেবিযে যেতে চায। ফাবিযাসেব সর্বদেহমন ক্রোধে জ্বলে উঠলো। ছুবি বেব কবে মুসিযাসেব বুকে বিঁধিযে দিল সে। ভালেবিযা চিৎকাব কবে কেঁদে উঠে মেঝেয পডে মূর্ছা গেল।

পবদিন ফাবিযাস চললো সেই বাগান বাডিব দিকে। দেখলো, মেঝেব উপব মুসিযাস পডে আছে। মৃত। বোবা মালযী হাতেব ইসাবায তাকে ঘব ছেডে চলে যেতে বললো। তাবও পবদিন এক গুপ্ত দবজা দিযে ফাবিযাস সেই বাগানবাডিতে ঢুকলো। দেখে মুসিযাস বসে আছে এক আবাম কেদাবায। তাব সামনে এক অদ্ভুত লাল পোষাকে সেই বোবা মালযী হাত পা নাডছে, ইঙ্গিত কবছে—আব তালে তালে মুসিযাসও হাতপা নাডছে। বোবা মালযী গোঙাচ্ছে, আব সঙ্গে সঙ্গে মুসিযাসও গুঙিযে উঠছে। তাবও পবদিন মালযীটিব সাহায্যে সেই বাগান বাডি থেকে বেবিয়ে এলো মুসিযাস।

ঘোড়ায চাপলো। চোখ ফেবালো জানলাব দিকে। সেখানে কিন্তু দাঁড়িযে আছে ফাবিযাস।

সময গড়িযে যায। একদিন অর্গানে স্থব তুলছে ভালেবিযা। তাব একেবাবে অজানতে হঠাৎ তাব আঙুলেব ছোঁযায বেজে উঠলো সেই বিজয়ী প্রেমেব স্থব মূর্ছনা। আব ঠিক তখুনি সে অনুভব কবলে তাব মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে নতুন এক জীবন।

এব অর্থ কি? সত্যি কি অর্থ এব?

অনুবাদ ঃ শুভব্রত বায

লেনিনগ্রাদেব ইনস্টিটিউট অব বাশিযান লিটাবেচব-এব শ্রীযুক্তা তাতিযানা দেহ্ন তুর্গেনেভ-বিষযে প্রধানতম বিশেষজ্ঞ। তুর্গেনেভ-এব চিঠিপত্র ও শেষবযেসেব অপ্রকাশিত বচনাসমূহ সম্পাদনাকালে তিনি একটি ক্ষুদ্র উপন্যাসেব খসড়া পান—তাতে ভাবতবর্ষেব উল্লেখ থাকায তিনি তার মর্ম শ্রদ্ধেয শ্রীগোপাল হালদাবকে জানান (১৯৬৩)। সেই সাবাংশেব অনুবাদ আমবা তুর্গেনেভ-এব ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশ কবলাম। সম্পাদক

অক্ষক্রীড়ার ক্যাবিনেট মিশন ও ভাঙা বাঙলার বুলা

জ্যোৎস্নাময ঘোষ

মাগো, আমি তোমাদেব জাত-ধর্ম-কুলনাশিনী মেযে, অনেক দূব থেকে তোমাকে লিখছি। ব্যথায যখন বুকটা টনটন কবে ওঠে, আমাব আজন্মেব সংস্কাব যখন ভুলভুলাইযাব মতো কেবলই আমাকে দিক্‌ভ্রান্ত কবে দেয, নানা হাতে সাজানো আমাব এই জীবনেব অঙ্কটা যখন আর কিছুতেই মেলাতে পাবি নে, তখন মাগো, ঠিক তখনই দুর্গা প্রতিমাব মতো তোমাব মুখখানা আমাব সামনে ভেসে ওঠে। আমাব গ্লানিব কথা, মাগো, আমাব অসম্মানেব কথা, ইতিহাসেব কালান্তক আগুনে পুডে পুডে ঝলসে যাওযা আমাব এই বাইশ বছবেব জীবনেব কথা, মাগো, তোকে ছাডা আব কাকে বলব। তুই আমাব মা, তোব জাত নেই ধর্ম নেই কুল নেই, তুই শুধু আমাব মা, তুই বেদান্তবাগীশেব শাস্ত্রপডা মেযে নোস, সাংখ্য-স্মৃতিতীর্থেব স্ত্রী নোস, তুই আমাব মা, এই তোব সত্য পবিচয, তোব অস্তিত্বেব গভীবে একদা তুই ধাবণ কবেছিলি আমাকে, আমি তোব সেই বৃক্ষেব অস্তিত্বেব দোসব, আমাব ক্ষত-বিক্ষত বক্তাক্ত হৃদযেব সীমাহীন বেদনাব অংশ, মাগো, তোকে ছাডা আব কাকে দিই।

পুব বাঙলাব যে-শহবে একদা আমাব সাংখ্য-স্মৃতিতীর্থ পিতাব বীজ আমাকে এই প্রাণময পৃথিবীব সঙ্গে ঐক্যসূত্রে গেঁথে দিযেছিল, যেখানে আমাব শৈশব কৈশোব এবং ছুঁই-ছুঁই যৌবন কেটেছে, যেখানে মানুষ চিনেছি, ফুল বৃক্ষ নদী আকাশ লতা-গুল্ম অবণ্য চিনেছি, আমাব প্রতিনিযত "হযে ওঠাব" পুলকিত বহস্যেব বিপুল বিস্মযে যেখানে বোমাঞ্চিত হযেছি, সেখানে সেই শহবেই পৃথিবীব এই ভূ-খণ্ডেব ইতিহাসেব বিধাতাপুরুষ আমাব ললাটে দুর্ভাগ্যেব কলঙ্ক-তিলক দেগে দিযেছিল।

সে-বাতেব কথা তো ভুলতে পাবি নে। সে-কথা মনে হলে আতঙ্কে

এখনো নীল হয়ে যাই। বিকেল থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল কিছু একটা হবে। অথচ দুপুর পর্যন্ত সব কিছুই স্বাভাবিক মনে হয়েছে। দু-পিরিয়ড পর স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল, তাতে কিছু বুঝতে পারি নি। হেডমিস্ট্রেস আমাদের তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, আড্ডা দেবে না কোথাও। বাড়ি চলে যাবে সোজা। টেস্ট পরীক্ষা সামনে মনে রেখো। বাজারের রাস্তা দিয়ে যাবে না। কিছুতেই কথা শোনো না তোমরা। বেরিয়ে এসেই মুখ টিপে হেসেছিলাম সবাই। আমরা জানতাম বাজারের রাস্তা সম্পর্কে বারেয়াদির একটা অহেতুক ভীতি আছে। আসলে বকুলতলার মোড়ে কলেজের ছেলেদের এবং বেকার আওয়ামী যুবকদের স্থায়ী ঠিকানার আড্ডাটি শহরের তাবৎ অভিভাবকদেরই তখন অপছন্দ, বারেয়াদিরও। আমরা জানতাম কণ্ঠ উঁচুপর্দায় বেঁধে ওখানে ওরা রাজনীতি সাহিত্য খেলাধুলো এবং নারী-প্রসঙ্গ নিয়ে বেপরোয়াভাবে আলোচনা করে, এমন কি মারামারি পর্যন্ত, আমাদের দেখে উচ্ছল হয়ে ওঠে। ওদের খারাপ লাগেনি আমাদের, ওদের হাতে ছিল আমাদের আর-এক গভীরতর অস্তিত্বের বার্তা।

বাজারের রাস্তা ধরেই এসেছিলাম আমরা। বকুলতলার মোড় আসতেই পপি আমার কানের কাছে ফিশফিশিয়ে উঠলে, সি এইচ সি এইচ মানে চন্দন। বকুলগাছের তলায় চন্দন ফিরোজ বুলবুল এবং আনোয়ার দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা সবাই এক নজর দেখল আমাদের, মুহূর্তেই নিজেদের আলোচনায় ডুবে গেল। কেমন যেন নিষ্প্রাণ উন্মনা দেখাচ্ছিল ওদের। আমরা ভেবেছিলাম বুঝি কারো সঙ্গে মারামারি করেছে ওরা। চন্দন ফিরোজ একসঙ্গে থাকলে নানা অঘটন ঘটতে পারে, তা জানা ছিল আমাদের। হাঁটতে হাঁটতে এ-সবই আলোচনা করছিলাম আমরা। পপি একসময় বলেছিল, রুণার মনটা ভার ভার ক্যানো রে। দাদা তাকায় নি বুঝি। ফিরোজ পপির দাদা, রুণা ঝঙ্কার দিয়ে বললে, নিজেরটা ভাব। আমার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না।

বেশ হালকা মনেই বাড়ি এসেছিলাম। আমাকে দেখে তুমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলে মা, বলেছিলে, তুই আইছস! তুমি যেন ধরেই নিয়েছিলে আমি আর ফিরব না, আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তার মানে? তুমি এবারে কেঁদে ফেলেছিল, আতঙ্কে তোমার গলা বুজে বুজে যাচ্ছিল, সর্বনাশ হইয়া গেছে রে! কেন্দুয়ার ভট্টাচাইর্য গো কাইল

রাইতে সব কাইটা ফ্যালাইছে। আইজ রাইতে এই শহর আক্রমণ করবো অরা। কথাটা বুঝতে সময় লেগেছিল, তারপর তোমাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। আমার মাথাটা ধীরে ধীরে কোলের ওপর টেনে নিয়েছিলে তুমি, বলেছিলে, ডরাইস না মা। ডর কি, আমরা আছি না। ছোটবেলায় ভয় পেলে তুমি এমনি করেই সাহস দিতে মা, তখন বলতে, ডর কি, আমি আছি না! তারপর গলায় উদ্বেগ নিয়ে বললে, সেই যে দুইজন দাঁতে রইদ্ লাগাইয়া রাইরাইলো, তাগো নাকি আর পাত্তা আছে। সবেই তাগো আগে যাওন চাই। আমার হইছে যত মরণ। দুইজন মানে চন্দন আর দাদা। চন্দনকে যে আমি ফিরোজদের সঙ্গে দেখেছি, আমার মনে হয়েছিল সে-কথা তোমাকে বলা যায় না মা। তুমি মাঝে মাঝেই বলছিলে, পরের পোলা লইয়া আমার যত বিপদ। বাপ-মা পড়তে দিছেন তারে, কলেজে যে তিনি কি পড়তে আছেন তা মা দয়াময়ীই জানেন। শহরে আইস্যা ফের ডানা গজাইছে বাবুর। এ পোলার দায়িত্ব আমি নিতে পারুম না। ভালয় ভালয় কাইট্যা যাউক সব কিছু, তারপর

বিকেল থেকেই মুখে মুখে গড়ে ওঠা গুজবটা ক্রমশ নিশ্চিত সংবাদের আকার পাচ্ছিল। শরৎকালের পরিচ্ছন্ন আকাশের তলায় ধীরে ধীরে নামহীন আকারহীন বিভীষিকার মেঘেরা ঘন হয়ে আসছিল। ওরা বড় মসজিদে তখন দু-একটা করে জড়ো হচ্ছিল। চন্দন আর দাদা মাঝে মাঝেই বেরিয়ে যাচ্ছিল, সুস্থির হয়ে বসতেই পারছিল না, ওদের মুখ ক্রমশই ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল, আস্থার শরীরটা একটু একটু করে ওদের মুঠোর ফাঁক দিয়ে গলে গলে পড়ছিল। সন্ধ্যের মুখপাতে শেষবারের মতো ঘুরে এলো ওরা। আমি আমার ঘরে তখন শুয়ে। বড় ঘরে তোমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল ওরা, চাপা চাপা গলায়। চন্দন একসময় আমার ঘরে এলো, চৌকির পাশে বসল, আমার হাত তুলে নিয়ে বলল, ভয় কি বুলা, আমি তোমার পাশে আছি, ভরসা হয় না? মোটা হাড়ের দীর্ঘ গড়নের চন্দনকে অন্ধকারে কোনো পৌরাণিক বীরের মতো মনে হচ্ছিল, চন্দনের কোলে মুখ গুঁজে দিয়েছিলাম। ও আমার চুলে বিলি কাটছিল, ওর নিঃশ্বাসের গরম ভাপ ঘাড়ে কানের লতিতে চুলের স্তবকে স্তবকে, আমার ভয় আতঙ্ক ক্রমে ক্রমেই এক অনাস্বাদিত তীব্র আনন্দের রূপ নিচ্ছিল, ওর অঞ্জলিবদ্ধ দুহাতে আমার চেতানো

মুখ, আমার সারা দেহে এবং দেহের অন্তরস্থিত সমগ্র চৈতন্যে চন্দনের সুঘ্রাণ, চন্দন আঃ চন্দন, চন্দন কাঁপছিল, আমি কাঁপছিলাম, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চতুষ্কোণের অন্ধকার কেঁপে কেঁপে উঠছিল

চন্দন চন্দন, শঙ্কর—

বাইরের কোনো শব্দ তখন স্পষ্ট করে আমার কানে আসছিল না, মনে হলো যেন অনেক দূর থেকে অনেক উৎকণ্ঠা নিয়ে চন্দন আর দাদাকে কে ডাকল। চন্দন ত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল, ওর যেন জানা ছিল ডাকটা আসবে, দাদা তখন উঠোনে, শুধু দাদা নয়, তোমরা সবাই। তুমি বোধহয় ওদের বাধা দিতে চেয়েছিলে মা, শাসনের স্বরে বলেছিলে, সদর দরজা খুলবি না কেউ। চন্দন যেন বলেছিল, ফিরোজ ডাকছে মাসীমা। তুমি বলেছিলে, কাউরে আর বিশ্বাস করি না আমি। তোমার কথার জবাব দিলে না, দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ওরা। আমার হৃদ্‌পিণ্ডের ঘুঙুরের বাজনাটা থেমে গিয়েছিল একসময়, ধীরে ধীরে ভয়ের ছায়া ঘনিয়ে এলো সেখানে, ওরা ফিরছে না কেন, চন্দন দাদা ভগবান ফিরছে না কেন ওরা, চন্দন চন্দন · বালিশে মুখ ডুবিয়ে মনে মনে বলেছিলাম, চন্দনকে ওরা মেরে ফেলেছে, টিকটিকি ডাকে নি, বলেছিলাম, চন্দন বেঁচে আছে, টিকটিকি ডাকে নি। মনে হচ্ছিল, কতো যুগ আগে যেন বায়ুতরঙ্গে দরজা খোলার শব্দটা উঠেছিল, আমার অন্তর্গত ভয় আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল, একঘর অন্ধকারের বুকে জটিল জ্যামিতিক নকশার নানা ভয়ের ছবি অশরীরী প্রেতিনীর দৃষ্টিতে আমার দিকে নির্ণিমেষে তাকিয়ে রইল

অবশেষে ওরা ফিরে এলো একসময়। বড়ো ঘরে খুব কাছাকাছি সবাই আমরা বসলাম। চন্দনই প্রথম কথা বলল, ওর গলার স্বর ব্লটিং-এর মতো খসখসে, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছিল ও, দয়াময়ী বাড়িতে অনেকেই উঠে যাচ্ছে। ওখানে পাইক-বরকন্দাজ আছে, বন্দুক আছে। রাতটা ওখানে কাটানোই ভালো। বাবা এ-প্রসঙ্গে এই প্রথম মন্তব্য করলেন এবং আমরা জানতাম বাবার মন্তব্য আর সিদ্ধান্তে কোনো পার্থক্য নেই, বললেন, নিরাপত্তার কথা বল্‌তাছ ত। ভগবানে আস্থা রাখ। কুলবিগ্রহ পরিত্যাগ কইরা আমি যাইতে পারি না। বিগ্রহ রক্ষার কর্তব্য আছে আমার। তোমরা বরং যাও। মা, তুমি বলেছিলে, তা হয় না, মরতে

হইলে একসাথে মবাই ভাল। কাজেই আমাদেব যাওযা হলো না। তুমি বাবাব কথা ভেবেছিলে মা, বাবা তাঁব বিগ্রহেব নিবাপত্তাব কথা ভেবেছিলেন, ঈশ্ববেব নিবাপত্তাব দায মানুষেই বর্তেছিল সেদিন, চবম ক্ষতি বলতে তোমবা মৃত্যুকেই বুঝেছিলে, মৃত্যুব থেকেও অমোঘ কোনো সর্বনাশ থাকতে পাবে—তা তোমাদেব ভাবনায আসে নি মা, তোমাদেব এই একচক্ষু হবিণেব যে চিন্তা—তাব বিপবীত দিক থেকেই সর্বনাশেব বানটা এসেছিল। কিন্তু, মাগো, সে-দিন আমাব কথা স্বতন্ত্র কবে তোমাদেব মনে পড়ে নি।···

বাত তখন প্রায বাবোটা। লণ্ঠনেব সলতে কমিযে দিযে বড়ো ঘবে আমবা পাঁচজন পাঁচটি ছাযামূর্তিব মতো বসে আছি। দাদা আব চন্দনেব কোলে দুখানা লাঠি। দাদা বলছিল, মুসলমান যুবকেবা প্রাণ দিযে দাঙ্গা রুখবে। উত্তব প্রদেশ-থেকে-আসা উদ্বাস্তু কিছু গুণ্ডা গুলি-খাওযা বাঘেব মতো হিংস্র হযে আছে, ভয ওদেব নিযেই। দাদাব কথাটা তখনো শেষ হযনি, চন্দন লাফিযে বাইবে চলে গেল, ওখান থেকেই নিচু গলায ডাকল, শঙ্কব।

পুবেব আকাশ লালে লাল হযে গিযেছে, বাতাসে দূবেব মানুষেব আর্তনাদেব সুব। বড়ো ঘবেব বাবান্দায আমবা দাঁড়িযেছি, আগুনেব তাত যেন আমাদেব গাযে লাগছিল, দাঁতে দাঁত চেপে একটা নিদারুণ কম্পনেব বেগ ঠেকিযে বাখছিলাম আমি। ঠিক এই সমযই চাবধাব কাঁপিযে আওযাজটা উঠল, আ-ল্-লা-হু-আক্-বব্। আমি পড়ে যাচ্ছিলাম, দুহাতে প্রাণপণে সামনেব থামটা চেপে ধবেছিলাম, মাটি চেপে বসে পড়েছিলে তুমি, বাবা পুজোব ঘবেব পৈঠায কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন, চন্দন আব দাদা দলপতিহীন সৈনিকেব মতো দিশেহাবাভাবে উঠোনময ঘুবে বেড়াতে লাগল। আওযাজটা একবাব উঠেই থেমে গিযেছিল, তাবপব নেমে এলো এক কালান্তক নৈঃশব্দ্য, সে-নৈঃশব্দ্যে আমাব দম বন্ধ হযে আসছিল, শিবা উপশিবা স্নাযু ইন্দ্রিয গ্রন্থি চৈতন্যপ্রবাহ শিথিল হযে যাচ্ছিল, সে নিস্তব্ধতা আমি সইতে পাবছিলাম না মা।

তাবপব শব্দেব তবঙ্গ উঠল, সদব দবজায ঘা পড়ল, ওবা পৈশাচিক আনন্দে ঈশ্ববেব নাম বাজাতে থাকল। চন্দন আব দাদা যেন ঘা খেযে জেগে উঠল, চন্দন চাপা গলায ডাকল, মাসীমা বুলা নেমে আসুন।

কিন্তু নেমে যাওয়ার শক্তি ছিল না আমাদের, মা, দাদা তোমাকে আর চন্দন আমাকে টানতে টানতে বাড়ির পেছনকার বাঁশ ডুমুর বেত গাব জলপাই আমলকি পিত্‌রাজ হরিতকি এবং আরো নানা গাছ-আগাছা লতা-গুল্মের ঘন বুনটের জঙ্গলের ভেতর নিয়ে গিয়েছিল। চন্দন বাবাকে ডেকেছিল, মেসোমশাই চলে আসুন। বাবা বলেছিলেন, আমার বিগ্রহ—কিন্তু কথাটা শেষ না করে তিনি অবিন্যস্ত ছন্দে ছুটে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়েছিলেন, প্রচণ্ড শব্দ করে আমাদের সদর দরজা সেই মুহূর্তে ভেঙে পড়ল।

অনেকক্ষণ চলার পর চন্দন থেমেছিল, জলপাই গাছে পিঠ ঠেকিয়ে জোরে জোরে দম নিয়েছিল, বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কখনো ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের পেশি পরখ করার মতো করে ও টিপছিল, কোরবানির পশুরে যেমন করে যাচাই করা হয় অনেকটা সেইভাবে। চন্দনের পায়ের কাছে আমি পড়েছিলাম, যেন ঈশ্বরে সমর্পিত কোনো দেবদাসী। সে-সময় তোমাকে কাছে পেতে চাইছিলাম মাগো, কিন্তু তুমি বাবা দাদা আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলে, আমি দাঁড়াতে চাইছিলাম, পালা জ্বরের রোগীর মতো ঠকঠক করে কাঁপছিলাম আমি। আমাদের চারধারে অন্ধকার তরল, পত্রপল্লবের গা বেয়ে বেয়ে পৌর্ণমাসী রাতের সবুজ জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ছিল। বাড়ির ভেতর থেকে মদ না খেয়েও মাতাল হয়ে যাওয়া মানুষ-গুলোর হল্লার আওয়াজ আসছিল, জিনিসপত্র ভাঙাচোরার শব্দ। চীৎকার করে কেউ বলেছিল, আদমি লোগ সব ভেগে গেল উস্তাদ। ভারী গলার আদেশের সুর শোনাগেল, পাত্তা লাগাও, চন্দনকো আমি চাই ইরফান। জলপাই গাছের প্রবীণ অন্ধকারের তলায় চন্দন কেঁপে উঠেছিল, ধরা গলায় ও বলল, বুলা, রমজান রমজানের দলেরা এসেছে। বকুলতলার মোড়ে ইউ-পির উদ্বাস্তু দুর্দান্ত রমজানকে চন্দন এক সময় প্রচণ্ড পিটিয়েছিল, ওর বন্ধু শহীদের বোনকে রমজান অশ্লীল ইঙ্গিত করেছিল। সে-সময় কিম্বা তার পরেও রমজান বা তার দলকে ভয় করেনি চন্দন, ও বলত, একটা গুণ্ডাকে ভয় করে চলতে হবে নাকি? কিন্তু রমজান আজ গুণ্ডা নয়, ও মুসলমান আর চন্দন হিন্দু, চন্দন ভয় পেলো না। আমার উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, বুলা ওঠো, এখানে আমরা নিরাপদ নই বুলা। আমি উঠতে পারি নি, আমার কাঁপুনির বেগটা আরো বেড়ে গিয়েছিল, চন্দনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম,

চন্দন আমাকে দাঁড় কবিয়ে দিয়েছিল, আমি পড়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, চন্দন ওব শবীবেব সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে নিলে, আমাব মুখ আমাব বিল্বফলেব অস্তিত্ব আমাব তলপেট জঙ্ঘা সর্বশবীবে চন্দন চন্দন, আমাব জিভ শুকিয়ে কাঠ ক্রমশই তা ভেতবেব দিকে চলে আসছিল, আমাব শবীব হিম, চন্দনেব সুগোল পৌবাণিক বাহু বিস্তৃত বক্ষপট তলপেট শাল বৃক্ষেব উরু এবং সব কিছুতেই ভবা মাঘেব শীতল অনুভূতি। ঠিক এমনি সময় অন্ধকাব কাঁপিয়ে আওয়াজ হলো, কোন হায়, আব সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে ভোজবাজিব মতো অদৃশ্য হয়ে গেল চন্দন, আমাব দুচোখেব সামনে অন্ধকাব দুলে দুলে উঠল, আমি ছুটতে চেয়েছিলাম, ছিন্ন নাভিকুণ্ডলীব সূত্র ধবে ধবে তোমাব জঠবেব নিবাপদ আশ্রয়ে ফিবে যেতে চাইছিলাম মাগো, কিন্তু অদৃশ্য কোন খেলোয়াড়েব হাত থেকে পাশাব দান তখন পড়ে গেছে :

"দুঃশাসন তর্জন কবে তাঁব কেশ ধবলেন, যে কেশ বাজসূয় যজ্ঞেব মন্ত্রপূত জলে সিক্ত হয়েছিল। দুঃশাসনেব আকর্ষণে নতদেহ হয়ে দ্রৌপদী বললেন, মন্দবুদ্ধি অনার্য, আমি একবস্ত্রা বজস্বলা, আমাকে সভায় নিয়ে যেয়ো না। দুঃশাসন বললেন, তুমি বজস্বলা একবস্ত্রা বা বিবস্ত্রা যাই হও, দ্যূতে বিজিত হয়ে দাসী হয়েছ, আমাদেব ভজনা কব।

"দুঃশাশন দ্রৌপদীব বস্ত্র ধ'বে সবলে টেনে নেবাব উপক্রম কবলেন। লজ্জা থেকে ত্রাণ পাওয়াব জন্য দ্রৌপদী কৃষ্ণ বিষ্ণু হবিকে ডাকতে লাগলেন। তখন স্বয়ং ধর্ম বস্ত্রেব রূপ ধ'বে তাঁকে আবৃত কবলেন। দুঃশাসন আকর্ষণ কবলে নানা বর্ণে বঞ্জিত এবং শুভ্র শত শত বসন আবির্ভূত হতে লাগল।"*

আমি আমাব সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে তোমাদেব ঈশ্ববকে ডেকেছিলাম মা, কিন্তু মাগো, বাবো হাতেব পবেই আমাব শাড়ি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, আমি প্রাণপণে একটা পিত্‌বাজ গাছ আঁকড়ে ধবেছিলাম, ও আমাকে পেছনে টানছিল ফেলে দিতে চাইছিল মাঝে মাঝে খ্যাপা জানোয়াবেব মতো পেছন থেকে চেপে ধবছিল হায়েনাব মতো চীৎকাব কবছিল, একসময় আমাব পা ধবে ও সবলে নিচেব দিকে টানতে লাগল, আমাব প্রতিবোধেব ক্ষমতা ক্রমশই কমে আসছিল, গা অবশ, ধীবে ধীবে নিচেব দিকে নামছিলাম আমি, আমাব হাত বুক পাঁজবাব ছাল ছড়ে যেতে লাগল, মাটিতে শব্দ কবে পড়ে

* মহাভাবত : সভাপর্ব : পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৫ : বাজশেখব বসু কৃত অনুবাদ

গেলাম আমি। ঠিক সেই সময় অন্ধকার কাঁপিয়ে আর-একটা আওয়াজ হলো, খবরদার। রমজান পেছন ফিরে দাঁড়াল, সামনের মানুষটি সতর্ক ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো, তরল আঁধারে ফিরোজকে আমি চিনতে পারলাম। রমজান কোমর থেকে ছুরি টেনে নিলো, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, শালা হিন্দুকা কুত্তা, ইধার আযা ফিন। ফিরোজ অনুদ্বেজিত, ওর ছুরির ফলা জ্যোৎস্নায় চকচক করে জ্বলছিল, দুর্গা প্রতিমার হাতে আয়ুধগুলো যেমন ঝলমল করে জ্বলে। ফিরোজ নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, রমজান, তোমার নানা অপরাধের যে আজ মাশুল দিতে হয়। রমজান আওয়াজ তুলে ফিরোজের দিকে এগিয়ে গেল, ফিরোজ শরীরটাকে বাঁ দিকে একটু সরিয়ে নিতে রমজান টাল সামলাতে পারলে না, ঠিক সেই মুহূর্তেই ফিরোজের ডান হাত ওর পেটের দিকে এগিয়ে গেল, রমজান তীব্র চীৎকার করে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, ফিরোজ ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল, তারপর ওকে চিৎ করে দিলে মাগো—আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। ফিরোজ আমার দিকে এগিয়ে এলো ত্রস্তপায়ে, আমার কাছাকাছি এসে অসহায় বোধ করল, চারদিকে তাকিয়ে কিছু খুঁজতে লাগল, তারপর ছুটে গিয়ে পিত্‌রাজ গাছের তলা থেকে আমার শাড়িটা নিয়ে এলো, ছুঁড়ে দিলো আমার দিকে, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আমার দিকে পেছন ফিরে চীৎকার করে বলল, মুকবুল, এদিকে আমি।' অনেক কণ্ঠের আওয়াজ উঠল, চন্দনদের পেলি রোজ।

রমজানের লাশ, আমাকে এবং ফিরোজকে দেখে ব্যাপারটা ওরা বুঝে নিয়েছিল। মুকবুল ফিরোজের দু-হাত ঝাঁকিয়ে আবেগে বলেছিল, কনগ্র্যাচুলেশন রোজ। জানোয়ারটা অনেক জ্বালাইছে। ফিরোজ এবার আমার কাছাকাছি এগিয়ে এলো, জিগ্‌গেশ করল, চন্দন শঙ্কর আপনার বাবা মা—? আমি কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম, পারি নি। ফিরোজ আমার অবস্থাটা ধরতে পেরেছিল, বলেছিল, একটু বসে নিন। কোনো ভয় নেই আপনার। অনেকক্ষণ বাদে আমি কথা বলতে পেরেছিলাম। আমার কথা শেষ হতেই জঙ্গলের নানা দিকে মুখ করে ওরা চেঁচিয়ে উঠল, চন্‌-দ-অ-ন, শং-ক-অ-র, এ-ই, এখানে আমরা, চন্‌-দ-অ-অ

চন্দন দাদা কিম্বা তোমাদের কারো জবাব পাওয়া যায় নি, চীৎকার করে করে হয়রান হয়ে ওরা থামল একসময়, ঘন হয়ে নিচু গলায় পরামর্শ করল, ফিরোজ তারপর আমার কাছাকাছি এলো, কথা বলার আগে বেশ কিছু সময়

ভাবল, মনে মনে শব্দগুলো যেন সাজিয়ে নিয়ে বলল, আপনি তো পপির ক্লাস-ফ্রেণ্ড, পপি আমার বোন, এ-রাতটা পপির সঙ্গে যে থাকতে হয়, আর কোনো ব্যবস্থার কথা আমাদের মাথায় আসছে না। আপনার যদি বিকল্প কোনো ব্যবস্থার কথা জানা থাকে বলুন। সে-রাতে আমি কোন বিকল্প আশ্রয়ের কথা বলতে পারতাম মা তুমিই বলো। ফিরোজ বলল, তা হলে আসুন আমাদের সাথে। উঠতে গিয়েও পারি নি, গা-টা অবশ অবশ মনে হচ্ছিল, ফিরোজ ওর ডান হাত বাড়িয়ে দিলে, যে-হাত দিয়ে খানিক আগেও রমজানের পেটে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল, বললে, বিপদের দিনে কোনো অনিয়মটাই অনিয়ম নয়। ফিরোজের প্রসারিত হাতের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম আমি, সে-হাতের কথা তোমাকে কি করে বোঝাই মা, একটা গোটা মানুষের এমন পরিপূর্ণ হাত এর আগে বা পরে আর কখনো দেখি নি মা। তাই ফিরোজের হাত সেদিন অসীম বিশ্বাসে চেপে ধরেছিলাম।

ওরা কোত্থেকে যেন একটা রিক্সা জোগাড় করে ফেললে, ফিরোজ বললে, উঠুন। ফিরোজকে আমি শক্ত করে ধরে ছিলাম, ওকে ছাড়তে চাইছিলাম না, ফিরোজ বিব্রত মুখে ওর বন্ধুদের দিকে তাকালে, মুকবুল বললে, তুইও ওঠ রোজ। ওঁর সাহায্য দরকার। ফিরোজ আমার বাঁ দিকে বসল, শহীদ রিক্সার হুড তুলে দিয়েছিল, বলেছিল, এ-রাতে খোলা রিক্সায় যাওয়া ঠিক নয়। মুকবুল রিক্সার চালকের আসনে, আমাদের আগে-পিছে ওদের বন্ধুরা। বড়ো রাস্তা নির্জন খা-খা, ঘর-বাড়ি দোকান-পাট চারপাশের সব কিছু ঘিরে আলো-আঁধারির কুহক। ফিরোজের কাঁধে মাথা রেখে আমি অবসন্নের মতো পড়েছিলাম, আমার মাথা দুলছিল, ফিরোজের কাঁধ পাঁজর কাঁপিয়ে আমার নিঃশ্বাস পড়ছিল, ফিরোজ মাঝে মাঝে বলছিল, সকাল হলেই আপনার বাবা-মার খোঁজ পাওয়া যাবে। এত ভাববার কি আছে।

আমাদের রিক্সা ধীরে ধীরে চলছিল, কখনো এঁকেবেঁকে কখনো সোজা কখনো অর্ধবৃত্তাকারে, মুকবুলের হাতের শাসনে হ্যাণ্ডেল বাগ মানে নি, ওরা দুপাশ থেকে গিয়ে হ্যাণ্ডেল চেপে ধরলে, প্যাডেল থেকে পা তুলে নিলে মুকবুল, আমাদের ওরা ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলল। হঠাৎ শব্দ করে পেছন থেকে আমাদের রিক্সার বাঁ পাশে একটা জিপ এসে থামল, গলা বাড়িয়ে কেউ জিজ্ঞেস করল, তোমরা? মুকবুল ব্রেক কষে বললে, আমরা চাচা। আর-একজনের গলা শোনা গেল, ব্যাপার কি। জিপ থেকে নেমে এলেন ওঁরা,

হায়দার মল্লিক আর সামস মিঞা। মল্লিকসাহেব নেমেই প্রশ্ন করলেন, বিক্সায় কে? উত্তরের অপেক্ষা না করে হুডের তলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে ডাকলেন, সামস। হুডটিকে তিনি চাপ দিয়ে নামিয়ে দিলেন। সামস মিঞা যেন আঁতকে উঠলেন, কবছস কি তরা। মল্লিকসাহেব হাহাকারের স্বরে বললেন, ছাখ সামস ছাখ, আমার কীর্তিমান সন্তান—হারামজাদা বলে তিনি উন্মত্তের মতো ফিরোজের গালে চড় বসিয়ে দিলেন, ফিরোজ টাল সামলাতে পারল না, আমার গায়ে ঝুঁকে পড়ল, বিমূঢ় কণ্ঠে বলল, বাজান। মুকবুলরা চেঁচিয়ে উঠলে, চাচা। আবার হাত তুলেছিলেন মল্লিকসাহেব, আঘাতটা আমার বেজেছিল মা, ফিরোজের মুখ দুহাতে আমার বুকের ওপর চেপে ধরে বলেছিলাম, না না···, বিস্মিত মল্লিক-সাহেব হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন। মুকবুল সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘটনা বলতে শুরু করলে, সব কিছু শোনার পর মল্লিকসাহেবের বুক কাঁপিয়ে একটা আওয়াজ উঠল, আ-আ। বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে ডাকলেন, সামস। সামস মিঞা খুশির স্বরে হাসলেন। মল্লিকসাহেব ওদের দিকে চেয়ে বললেন, জিপে উঠ। আমাকে বললেন, আইস মা আইস। ফিরোজ আমার হাত থেকে হাত টেনে নিলে, অভিমানের স্বরে বললে, আমি হেঁটে যাব। মল্লিকসাহেবের দুচোখে কৌতুক, সামস মিঞার দিকে মুখ করে বললেন, ছেলের আমার সম্মানে লাগছে, অ-সামস, গোসা হইছে বেটার—বলে চারধারের নির্জনতার বুকে দোলা দিয়ে মল্লিকসাহেব হা-হা করে হেসে উঠলেন।

ওরা তোমাদের নাগাল পায় নি মা। সে-রাত জানিক শেখের আশ্রয়ে কাটিয়ে পরদিন ভোরের ট্রেনেই তোমরা সীমান্তের ওপারে পাড়ি দিয়েছিলে। আমার কথা তোমাদের মনে হয় নি, কুলবিগ্রহের কথা ভুলে গিয়েছিলেন আমার সাংখ্যস্মৃতিতীর্থ ধর্মিষ্ঠ পিতা, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের ছন্দ সে-দিন তোমরা হারিয়ে ফেলেছিলে মা, নিরাপত্তার শরীরটাকে সে-দিন তোমরা ছুঁতে চাইছিলে শুধু। দর্শনা পেরিয়ে গিয়ে সাংবাদিকদের কাছে তোমরা যা বলেছিলে তা পড়তে পড়তে লজ্জায় গ্লানিতে অপমানে তোমাদের অভিসম্পাৎ দিয়েছি, রমজানের মতো কোনো গুণ্ডার ছুরিতে এর চাইতে তোমাদের যে মরে যাওয়াও ভালো ছিল মা। কাগজখানা ফিরোজই নিয়ে এসেছিল, হাসতে হাসতে বলেছিল, পড়ে দেখুন। এর নাম হলো সৎ সাংবাদিকতা। তারপর গম্ভীর

হযে গিযেছিল, একবুক জ্বালা নিযে বলেছিল, আগুনটাকে কিছুতেই নিবতে দেবে না এবা। বডো বডো হবফে সংবাদেব শিবোনাম সাজিযেছিল ওবা : "পূর্ব পাকিস্তানেব শহব-গ্রামে হিন্দুমেধ যজ্ঞ" স্টাফ বিপোর্টাবেব কলমে পঞ্চম পৃষ্ঠায তোমাদেব বিবরণ এবং বিবৃতি "প্ল্যাটফবমেব এক নিভৃত কোণে শহব হইতে সদ্য আগত পবিবাবটি বসিযাছিল। শ্রীতাবাকিঙ্কব ভট্টাচার্য সাংখ্যস্মৃতি-তীর্থ মহাশযেব পূর্ব বাঙলাব্যাপী খ্যাতি ছিল। স্থাবব-অস্থাবব সমস্ত কিছু সমেত পাণ্ডিত্যেব এই সম্পদটিও তাঁহাকে ছাডিযা আসিতে হইযাছে। আব ছাডিযা আসিতে হইযাছে তাঁহাব একমাত্র কন্যাকে। তিনি বলেন যে, বাটিব পশ্চাৎসংলগ্ন অবণ্যে সপবিবাব তাঁহাবা আত্মগোপন কবিযাছিলেন। নবপিশাচ হানাদাবেবা সেখানেও আক্রমণ চালাইযা পিতামাতাব সম্মুখ হইতে তাঁহাদেব একমাত্র কন্যাটিকে লুণ্ঠন কবিযা লইযা যায। সাংখ্যস্মৃতিতীর্থ মহাশয বলেন, সমগ্র মুসলমান জাতিটাই আজ খেপিযা গিযাছে, জীবনেব সুস্থ মূল্যবোধগুলি উহাবা হাবাইযা ফেলিযাছে।" আমি ফিবোজেব দিকে তাকাতে পাবছিলাম না, ও আমাব খানিকটা দূবেই বসে ছিল। চোখ-মুখ জ্বলছিল আমাব কপালেব শিবা দুটো দপদপ কবছিল, মস্তিষ্কেব কোষে কোষে অসহ্য যন্ত্রণা, কাগজটাকে দুমডে মুচডে জানালা দিযে বাইবে ছুঁডে দিযেছিলাম। মুসলমান পাডাব বর্ষীযান কৃষক জানিক শেখ তাব স্ত্রী ফতেমা বিবিব কথা তোমবা কি কবে ভুলে গেলে মা, এবা তোমাদেব আশ্রয দিযেছে, ভোব ভোব বাতে চাবজন মুসলমান চাষীব প্রহবায এবাই তোমাদেব স্টেশনে পৌঁছে দিযেছে, কলকাতা অব্দি তোমাদেব যাওযাব খবচা দিযেছে এবাই, পবিশুদ্ধ বিবেক এই মানুষগুলোব যে মূল্যবোধ—তাব কোনো স্বীকৃতিই তোমবা দিলে না মা। ফিবোজেব কথাটাই হযতো সত্যি, ও বলেছিল, মানুষেব ইতিহাসে কখনো কখনো দুঃসমযেব কালো মেঘ ঘনিযে আসে। সে-আঁধাবে শত্রু-মিত্র স্পষ্ট কবে চিনে নেযা মুস্কিল। এব জন্যে কাউকে দোষ দিযে লাভ কি বলুন।

মল্লিক সাহেবেব পবিবাব আমাকে নিযে ক্রমশ বিব্রত হয়ে পডেছিল। সে-বাত তো একবকম কবে কেটে গেল। পবদিন ভোব থেকেই সমস্যাটা নিযে ভাবতে বসেছিলেন ওঁবা, মল্লিকসাহেব মল্লিকসাহেবেব স্ত্রী পপি অনেকক্ষণ ধবে সঙ্গোপনে আলোচনা কবেছিলেন, ফিবোজেব মা তাবপব আমাকে বলেছিলেন, ফলেতে কোনো দোষ নাই, এই বেলাটা ফল খাইযা কষ্ট

কইরা কাটাইতে হইব মা। তোমার বাপ-মার খবর এ্যার মধ্যেই পাওয়া যাইবো। তা ছাড়া, দয়াময়ী বাড়িতে তোমার স্বজাতিরা সব আছেন। সেইখানেও থাকতে পারবা। ঐ বেলার মধ্যে একটা কিছু ব্যবস্থা ঠিকই হইয়া যাইবো, ভাইব না মা।

দুপুরে ফিরোজ ফিরে এলো, জানা গেল তোমরা আর এখানে নেই। তার কিছুক্ষণ বাদেই মল্লিকসাহেব ফিরেছিলেন, তাঁর সারা মুখে চিন্তার ছাপ, আমাকে ডেকে বিপন্নের মতো হেসে বলেছিলেন, তুই এইখানেই থাক মা। নিজে রাইন্ধা খাইতে পারবি তো। তবে যেখানে সেখানে পাঠাইতে পারি না, আমার একটা দায়িত্ব আছে রে। পরে জেনেছিলাম মা, দয়াময়ী বাড়িতে আমার 'স্বজাতিরা' আমাকে আশ্রয় দিতে রাজি হন নি, ফিরোজ এবং আমাকে জড়িয়ে কুৎসিৎ ইঙ্গিত করেছিলেন ফুলবেড়ের চ্যাটার্জি কাকা, মল্লিকসাহেব বলেছিলেন, চ্যাটার্জি, সময়টা খারাপ, তাই তুমি বাইচা গেলা হে।

মল্লিক সাহেবের বাড়িতে না থেকে আমার উপায় ছিল না মা। পাপপুণ্য শুচিতা ইত্যাকার সব অনুষঙ্গী বোধগুলো এবং তোমাদের মারফৎ পাওয়া হিন্দু সমাজের জটিল সংস্কারগুলো এই সময় থেকেই আমার ভেতর ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে লাগল, ক্রমশই এ-ধরনের একটা ধারণা গড়ে উঠতে লাগল যে চতুর এবং করায়ত্ত কৌশলের মানুষেরা অপরের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বাজারে যেমন করে অচল মুদ্রা চালিয়ে থাকে তেমনি করে কিছু সংস্কার কিছু বোধ তোমরা আমাদের ভেতর চালিয়ে দিয়েছিলে। তিনদিন পর ফিরোজের মা-র রান্না খেতে আমার কোনো সংস্কার তাই আহত হয় নি মা। যে-সমাজ আমাকে রক্ষা করতে পারে নি, বিপদের ঝড়ো ঘূর্ণির আবর্ত থেকে নিরাপত্তার কোনো দ্বীপে আমাকে পৌঁছে দেয় নি, অথচ আমার সর্বাঙ্গে দুরপনেয় কলঙ্কের কালিমা লেপন করতে যে-সমাজ এবং সমাজের মানুষগুলোর বাধেনি, সে-সমাজের কোনো বিধান কোনো সংস্কার মেনে চলতে হলে নিজেকে আরো অনেক অনেক নিচে নামিয়ে আনতে হতো মা।

অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসতেই ওদের সমাজেও কথাটা উঠেছিল, মুখে মুখে তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছিল, দাঙ্গা থেমে যাওয়ার পরেও বয়স্থা হিন্দু মেয়েটাকে মল্লিকসাহেব রেখেছেন কেন। যে-দিন মল্লিকসাহেব এবং তাঁর স্ত্রীর উদ্‌বিগ্ন আলোচনা শুনতে পেলাম, তার পরদিনই মল্লিকসাহেবকে

বলেছিলাম, আমি হিন্দুস্থানে চলে যেতে চাই। এব ঠিক পঁচিশ দিন বাদে মল্লিকসাহেব বলেছিলেন, তোমাব বাপ-মাব ঠিকানা পাইছি। শেবপুবেব তিন আনিব নাযেব মশয আইছিলেন বিনিমযেব বন্দবস্ত কবতে, তাব কাছেই শুনলাম সব।

এবং তিনদিন পব ওবা সকলে মিলে আমাকে ট্রেনে তুলে দিলে। সবাই কাঁদছিল ওবা, মাগো, আমিও কাঁদছিলাম, মল্লিকসাহেব এবং তাঁব স্ত্রীকে জোব কবে প্রণাম কবেছিলাম, দেখতে দেখতে সিংজানী স্টেশন স্টেশনেব স্টাফ কোযার্টাব পি-ডবলু-আই-এব বাংলো জোড়া কৃষ্ণচূড়া শঙ্কব নাট্যমন্দিব আমাব আবাল্যেব শহব দৃষ্টিব পবিধি থেকে অবলুপ্ত হযে গেল, একবুক শূন্যতা নিযে আমি হাহাকাব কবে উঠেছিলাম।

ফুলছড়ি ঘাটে এ-পাবেব ট্রেনে চেপেছিলাম বাত প্রায আটটায। ফিবোজ চা নিযেছিল, আমাকে দিযেছিল। সাবাটা পথ কোনো কথা বলে নি ও, গম্ভীব মুখে বই পড়েছে। মল্লিকসাহেবকে যেদিন বলেছিলাম আমি হিন্দুস্থানে চলে যেতে চাই, তাবপব থেকেই ফিবোজ আমাকে এড়িযে এড়িযে চলত। ট্রেন চলতে শুরু কবল, এক সময জেটি স্টিমাব যমুনাব অস্পষ্ট খাত হ্যাজাকেব আলোয উদ্‌ভাসিত হোটেল ক্রমশ মিলিযে গেল। ফিবোজ আমাব খানিকটা দূবে পা ছড়িযে দিযে বই পড়ছে, ওব সাবা মুখে মুখোশেব গাম্ভীর্য। পবিমিত আলোকেব কামবায আমবা ছাড়া যাত্রী আব দুজন, ট্রেন চলাব সঙ্গে সঙ্গে একজন ব্যাপাব জড়িযে ঘুমিযে পড়েছে, অপবজন একটা মোটা ফাইল খুলে পড়ছে—লাল বঙেব মোটা পেন্সিল দিযে কাগজে দাগ কাটছে। বাইবেব চলমান বাত ঘুম ঘুম অন্ধকাব আব কুযাশায জড়ানো।

ফিবোজকে আমি নিষ্পলকে দেখছিলাম, ওব এই নিস্পৃহ আচবণে আমাব দম বন্ধ হযে আসছিল, দুচোখে যন্ত্রণা নিযে এক সময জিগ্‌গেশ কবেছিলাম, কথা বলবেন না? প্রশ্নটা মনোযোগ দিযে শুনল ও, চোখে চোখ বাখল, শব্দ কবে বইখানা বন্ধ কবল, তাবপব হালকা সুবে বলল, বলুন কি জানতে চান? আমাব বুকেব ভেতব জমে থাকা চাপ চাপ বেদনা, মাগো, ঠিক এই সমযই এক প্রবল অভিঘাতে তবলিত কান্নায গলে গলে পড়ল, কামবাব ভেতবকাব পবিমিত শবীবেব বাত বাইবেব চতুর্দিক পবিব্যাপ্ত থৈ থৈ নিশা সাদা কালো স্ট্রাইপেব ফুলস্লিভ পুলওভাবেব ফিবোজ ক্রমশ এবং ক্রমশই অস্পষ্ট হযে যেতে লাগল। জানালায ভাঁজকবা হাতেব ওপব মুখ

গুঁজে আমি অশিক্ষিত গ্রাম্য রমণীর মতো শব্দ করে কাঁদতে লাগলাম, চলমান ধাতব ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ফিরোজের অপ্রস্তুত কণ্ঠ বাজতে থাকল, এই, কি হলো, এই—

রাত তখন গভীর, কাছের এবং দূরের ছায়া ছায়া দৃশ্যপট ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমরা চলেছি, ইলা মিত্রের নাটোরের ওপর দিয়ে আমরা তখন যাচ্ছি, ফিরোজের হাতে আমার হাত, বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া আমাদের চোখে মুখে, মাঝে মাঝে শিরশির করা একটা অনুভূতি শিরদাঁড়া ঠেলে ঠেলে ওপরের দিকে উঠছে, ঠোঁট জমে বরফ, দূরের আকাশে কোথাও চাঁদ উঠেছিল হয়তো, অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসছিল। এমনই একটা মুহূর্তে ব্রতকথা বলার ঢংয়ে ফিরোজ কথাগুলো বলেছিল, পাশা খেলায় দ্রৌপদীকে যখন বাজি ধরা হয়, দ্রৌপদী তা জানতেন না। কিন্তু জুয়াড়ি স্বামীর প্রলোভনের পরিণতি থেকে তিনি রেহাই পান নি। উপ-মহাদেশ সদৃশ আমাদের এই ভারতবর্ষে তেমনি এক রাজনৈতিক জুয়াখেলায় আমাদের অজ্ঞাতেই আমাদের বাজি ধরেছিলেন কিছু ক্লান্ত আর ফুরিয়ে যাওয়া নেতা। দেশটা ভাগ হয়ে গেল; তার সাথে সাথে আমরাও। একটা ঘটনার কথা মনে আছে। আমার বাবা, আজীবন যিনি মুসলিম লীগের বিরোধিতা করেছেন, দেশভাগের কিছুদিন বাদেই তিনি আমাকে বলেছিলেন, মুন্না, এ-দেশে আর থাকা যাবে না রে। কাদের মিঞা সামসকে ডেকে নিয়ে বলেছে, আপনাদের উপর সকলেই খেপে আছে। ভালো চান তো লীগের মেম্বর হয়ে যান! না হলে বিপদ আপনাদের পায়ে পায়ে। মল্লিকসাহেবকেও বলবেন। বাবা বলেছিলেন, এ-দেশ থেকে হয়তো চলেই যেতে হবে। ঠিক এর কিছুদিন বাদেই কোলকাতায় দাঙ্গা শুরু হলো। প্রতিদিনই খবরের কাগজ খুলে দু-চোখে ঘষা ঘষা দৃষ্টি নিয়ে বাবা আর্তনাদের সুরে বলতেন, মুন্না, গান্ধিজী জওহরলাল মওলানা—ওঁরা কি হেরে যাচ্ছেন, মুন্না? বাবার বিশ্বাসের অখণ্ড ভূমিটাতে কি করে ধীরে ধীরে ধ্বস নামল, তা আমি দেখেছি। আমার আজীবনের সংগ্রামী পিতা সংগ্রামের কথা ভুলে গেলেন। কোনো জাতির জীবনে এর চাইতে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি আর কিছু হয় না। আজ আমরা সেই ট্র্যাজেডির কোনো একটা অঙ্কের কোনো একটা দৃশ্যের পাত্রপাত্রী। আমি আপনাকে দর্শনা অব্দি পৌঁছে দেবো, আপনাকে আপনার নিজের দেশে যেতে হবে, যে-দেশ আপনি চেনেন না যে-দেশের মানুষের সাথে আবেগের কোনো মেলবন্ধন আপনার ঘটে নি যে-দেশের আকাশ বাতাস নদী নক্ষত্র

পত্র পুষ্প সব কিছুই আপনাব অচেনা যে-দেশেব পথ সুস্পষ্ট কোনো ঠিকানায পৌঁছে দেওযাব প্রতীক কিনা তা আপনি জানেন না, অথচ সে-দেশেব কোনো অচেনা যুবক প্রথম পবিচযেই কত সচ্ছন্দেই না আপনাকে বলতে পাববে, বুলা তোমাকে আমি ভালোবাসি—

মাগো, দেহ-মনেব সমস্ত তন্ত্রিগুলো যেন ছিঁড়ে টুকবো টুকবো হযে গেল।

শেষ বাঁশি বাজাব সঙ্গে সঙ্গে ফিবোজ কামবা থেকে নামল, জানালাব কাছে এসে বলল, সাবধানে যাবেন। একা একা পথ চলাব তো অভ্যেস কবেন নি। চিঠি দেবেন, পৌঁছলেন যে সে খববটা অন্তত। আমবা যাবা এ-পাডে আছি, তাদেব সম্পর্কে কোনো মিথ্যে ধাবণাকে প্রশ্রয না দিলে ভালো লাগবে। ট্রেন চলতে শুরু কবল, ট্রেনেব সমান্তবালে ফিবোজ পাযে পাযে এগিযে চলল, বলল, আপনাদেব হিন্দু সংস্কাব সম্পর্কে আমাব কিছু ভীতি আছে। সম্মানেব আসনখানা যদি সেখানে খুঁজে না পান, নিজেব দেশ এবং আমাদেব কথা সেদিন ভুলে যাবেন না, ফিবে আসবেন, ফিবে আসবেন, ফিবে

গাডিব শব্দে ফিবোজেব উঁচু পর্দাব কণ্ঠ চাপা পডে গেল, সাবা শবীবে অসহাযতাব মুদ্রা এঁকে মাঝ প্ল্যাটফবমে দাঁডিযে পডল ও, হাত তুলে প্রাণপণ চীৎকাব কবে কিছু একটা বলল, তা আমাব কানে পৌঁছল না, ওব বলিষ্ঠ চওডা ফ্রেমেব শবীব আমাব বিস্ফাবিত দু-চোখেব আযতনে নানা আকাব নিযে অবশেষে একসময নিশ্চিহ্ন হযে গেল, আমাব দেহ আমাব মন হৃদয এবং অনুভবেব তাব ছুঁযে ছুঁযে যে-শব্দ এতক্ষণ নিচু পর্দায আলাপেব মতো বাজছিল—সেই মুহূর্তে তিন ভুবনেব আকাশ এবং বাযুস্তবে দোলা দিযে তা গমগম কবে বেজে উঠল, বোজ বোজ বোজ

আলোকিত পথ উজ্জ্বল ছিমছাম দোকানপাট অনেক মানুষ এবং যানবাহনও শহবেব শেষ প্রান্তে নতুন গডে ওঠা উপনিবেশে বিক্সাওলা আমাকে নামিযে দিলো, বলল, এটাই নোতুন পল্লী। ভেতবে যেতে সাহস কবি না আমবা। ভাডা নিযে ভীষণ কুচ্‌কচালেপনা কবে এবা, দল বেঁধে ঠ্যাঙায পর্যন্ত। ভেতবে গিযে জিগ্‌গেশ করুন, পেযে যাবেন ঠিক।

নতুন পল্লীব পথ অন্ধকাব, বাতাসে ভেজা মাটিব গন্ধ, কাছেব আকাশে

অন্ধকাবে একটা আকাশপ্রদীপ জলছে। খানিকটা হাঁটতেই ডান হাতে চায়েব দোকানটা পেলাম, অনেক কণ্ঠেব জটলা সেখানে, তোলা উনুনে টগবগ কবে জল ফুটছে, হ্যাবিকেনেব পবিমিত আলোয জটলাব মানুষগুলোকে অস্পষ্ট ঘসা ঘসা মনে হচ্ছিল। আমাকে দেখে ওবা থামল, অগাধ বিস্ময নিয়ে তাকিযে থাকল, ঠিকানা লেখা কাগজটা ওদেব দিকে বাডিযে দিলাম আমি, কাগজ-খানা হাতে হাতে ঘুবল, আব ওদেব দৃষ্টি আমাকে কেন্দ্র কবে আবর্তিত হতে লাগল, অবশেষে একজন প্রশ্ন কবল, আপনি পণ্ডিত মশাইব মেয়ে ?

অ। পাকিস্থান থেকে আসছেন ?

তাব মানে—

আপনেবেই মোস্‌লাবা ধইবা লইযা গেছিল ? পুংগিব পুইত্‌গো অ্যাকবাব পাইলে—

হালাবা আপনেবে ছাইবা দিল য্যান ?

আবে ‘ভুগ’ কবা তো হইযাই গ্যাছে, বুঝলা না, হ।

আঃ, কি হচ্ছে। বলে ভেতব থেকে একজন উঠে এলো। কাছাকাছি এসে বলল, আসুন আমাব সাথে।

আমি হালায পষ্টাপষ্টি কথা কই— .

কই আসুন। বলে সে আবাব ডাকল।

আমাব পা উঠছিল না, সাবা শবীব পাথবেব মতো ভাবী, আমাব চাব পাশেব অন্ধকাব কাঁপছিল, অন্ধকাবেব বুকে বাশি বাশি আতসবাজি জ্বলছিল নিবছিল নিবছিল জ্বলছিল

বাস্তায আমাকে দাঁড কবিযে বেখে একটা বাডিব ভেতব ঢুকে গেল সে, খানিকবাদে তোমাব চীৎকাব ভেসে এলো, তাবপব শুনতে পেলাম তোমাদেব নিচু গলাব ফিশফিশানি, অস্বস্তি আতঙ্ক এবং অজানা সব বিভীষিকাব মেঘেবা আমাব বুকেব ভেতব গুবগুব কবে ডেকে উঠল, দু-চোখে অন্ধকাব নিযে জিযল গাছেব তলায পডে যেতে যেতে দু-হাতে মাটি আঁকডে বসে পডলাম আমি। একসময বেবিযে এলেন আমাব সাংখ্যস্মৃতিতীর্থ জনক, দূবত্ব বজায বেখে তিনি দাঁডিযে ছিলেন, তাঁব উন্মুক্ত ঊর্ধ্বাঙ্গ বেষ্টন কবে শুভ্র যজ্ঞোপবীত, বাবাকে দেখে সে-বাতে ভয পেযেছিলাম মা, তিনি ভবাট গলায তাঁব সিদ্ধান্ত

জানালেন, এইখানে তোমাব কোন স্থান নাই। তোমাবে আমবা কেউ ফিবা চাই নাই, তোমাবে আমি গ্রহণ কবতে পাবি না। বলে ভেতব বাডিতে ঢুকে গেলেন তিনি। আমাব চোখেব সামনে অন্ধকাবেব ব্যাপক বোমশ শবীব দুলে দুলে নাচতে লাগল, পাযেব তলাকাব মাটিতে ভূমিকম্পেব দোলা, পিতৃ-পুরুষেব উদ্দেশ্যে নিবেদিত আকাশপ্রদীপ একচক্ষু প্রেতেব মতো হিমশীতল চোখে নিষ্পলকে আমাব দিকে চেযে বইল, আমাব চাবধাবে শ্বাসবোধী শূন্যতা, আমাব সজ্ঞান সত্তা ক্রমে ক্রমে বাযুভূত নিবাশ্রয নিবালম্ব হযে সে শূন্যতাব সঙ্গে মিশে যেতে লাগল, এই সমযই যেন তোমাব চাপা চাপা গলা শুনতে পেযেছিলাম, কোন মুখে ফিবা আইলি তুই! তুই আইলি ক্যান, বুলা, বুলাবে, তুই আইলি ক্যান। কক্ষপথেব এই পৃথিবী থেকে ঘূর্ণ্যমান গ্রহ-নক্ষত্রেব দিকে আমাকে যেন ছুঁডে দিলো কেউ, পাক খেতে খেতে শূন্যতা থেকে গভীবতব শূন্যতায অন্ধকাব থেকে গভীবতব অন্ধকাবে ভাসমান ভেলাব মতো আমি চলতে লাগলাম, বানেব মুখে কুটোব মতো এক সময হাবিযে গেলাম।

ভেজা ভেজা মেঝেব একটা ঘবে যখন জেগে উঠলাম, বাইবে তখন অনেক লোকেব উচ্চকিত জটলা, পচা গোবব এবং গরুব চোনাব গন্ধে ঘবেব হাওযা ভাবী, ছেঁচা বাঁশেব বেডাব ফাঁক দিয়ে হুহু কবে আসছিল হৈমন্তিক বাতাস, ঘবময মশাব গুনগুন শব্দ, চাবধাব থেকে আমাকে ছেঁকে ধবছিল ওবা; বাইবেব জটলাব কথাবার্তা আমাব কানে আসতে লাগল, হুঁকো টানাব আওযাজ, হ, এইটা আপনে ঠিকৈ কইছেন। সমাজ টিকাইযা বাইখতে হৈলে তাব বিধানগুলাও মাইনা চইলতে হৈব, সে বিধান কঠিন হইলেও তা মাইনতে আমবা বাইধ্য।

আমাব একটা কথা আছে। এটা যদি বিচাবসভা হয, তা হলে স্পষ্ট কবে বলি—আমাব বাবা এ-সভাব বিচাবক হতে পাবেন না। নিজেব মেযেকে মুসলমান গুণ্ডাব হাত থেকে বাঁচাতে গিযে উনি প্রাণ দেন নি কেন জিগ্‌গেশ করুন আপনাবা—

শঙ্কব!

শুধু আমাব বাবা নয, বিচাব কবাব যোগ্যতা আপনাদেব কারুবই নেই। বাস্তুভিটা কুলদেবতা আজন্মেব বিশ্বাস পবিত্যাগ কবে বাতেব অন্ধকাবে যাঁবা

পালিয়ে এসেছেন, সেই পলাতকদের কোনো বিচার কোনো বিধান আমরা মানি না। বুলা এখানে থাকবে।

হারামজাদা—

বাবা বোধহয় দাদাকে মারলেন, দাদা বাইরে চলে গেল। তারপর অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল ওরা, হুঁকো টানার শব্দটা জেগে থাকল শুধু। হঠাৎ আমার কানের গোড়ায় একটা শব্দতরঙ্গ উঠল, হাম্-বা, দুর্গন্ধের এই ঘর এবং জটলার আঙিনায় আওয়াজটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঘুরপাক খেল, নৈঃশব্দ্যের জটলায় প্রাণ ফিরে এলো, দরাজ কণ্ঠে কেউ মন্তব্য করল, মা ভগবতী পর্যন্ত মাইয়াটার লগে থাকতে চাইতেছেন না, আর উনি শাসাইয়া গেলেন, বুলা এইখানে থাইকব। উগ্রবীর্যের এই অর্বাচীনগো হাতে আমাগো ধর্ম সংস্কার কোন কিছুই রক্ষা পাইব না, এ-ই হইল তার ইঙ্গিত।

ভাবনের অনেক কিছুই আছে, বুঝলা। কথাটা অবশ্য শঙ্কইরা ভাল কয় নাই। তবে এইটা তো সত্যই, পোলাপানের চোখে আমরা ছোট হইয়া গেছি, হাইরা গেছি আমরা। গোঁসাইজী কি কন।

হ—অ।

আমি একটা কথা কই। প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কর একটা, সৎ ব্রাহ্মণ দেইখা কিছু দানধ্যান কর, মস্তিষ্ক মুণ্ডন করাইয়া পঞ্চগব্য খাওয়াইয়া মাইয়াটারে পবিশুদ্ধ কইরা লও। মাইয়াটা না হৈলে যাইব কৈ কও? তারাকিঙ্কর, তুমি কি কও?

আমি তা পারি না খুড়ামশয়। যবনের স্পর্শদোষ ঘটছে যে মাইয়ার, তারে আমি স্থান দিতে পারি না। পিতৃপুরুষরে আমি নরকে পাঠাইতে পারি না। এই পরামর্শ আপনেরা আমারে দিবেন না।

ছাখ, যা ভাল বোঝ কর।

এরপর যে যার বাড়ি চলে গেলেন, অন্ধকার উঠোন থেকে তোমার চাপা-গলার কান্না শোনা গেল মা, বাবার ভারী গলার আওয়াজ উঠতে লাগল মাঝে মাঝে, মা জগদম্বে মাগো—তোমরা দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের দুই সঙ্গী সেই নাগরিক অন্ধকারে বিচ্ছিন্ন দুটি দ্বীপের মতো বসে রইলে, রাত ক্রমশ বেড়ে চলল, মশার গুঞ্জন নিদ্রিত গাভীর ভরাট নিঃশ্বাস দুর্গন্ধের বাতাস আতঙ্ক আর অস্বস্তিতে মুহূর্তগুলো কাটতে লাগল আমার, খড়মের শব্দ তুলে

উঠোনময পাষচাবি কবতে লাগলেন বাবা, পাযচাবি কবতে কবতে বললেন, শঙ্কবরে এই সংসাবে আব স্থান দেওযা চলে না। কথাটা অবে জানাইযা দেওযা ভাল। শুনতাছ নাকি? তোমাব কান্না থেমে গিযেছিল, কথাটা বুঝতে অনেকটা সময নিযেছিলে তুমি, তোমাব গলায বাৎসল্য নয মা, নিবাপত্তা-হীনতাব আতঙ্ক ফুটে উঠল, শঙ্কব চইলা গেলে খামু কি আমবা? অব চটকলেব চাকবিটাই তো আমাগো ভবসা। মা দযাময়ী, এত লোক মবলো, আব এই মাইযাটাবেই তুমি বাঁচাইযা বাখলা মা। আমাব সংসাবে সর্বনাশেব আগুন লাগাইযা দিল মাইযাটা। কি যে হইব। আমি আব ভাবতে পাবি না। ভগবান

তোমাদেব স্বস্তিব সংসাব ছেড়ে আমি চলে এলাম মা। বাত তখন অনেক, আঁধাব ফিকে হযে আসছিল, দবজা ঠেলে বাইবে এলাম আমি, নৈঃশব্দ্যেব বাত, হাওযায শীতেব আমেজ, বিস্তাবিত আকাশে অনেক নক্ষত্রেব আঁকিবুকি, নতুন পল্লীব সাবি সাবি বাডিগুলোকে বন্ধ্যাবমণীব জবাযুব মতো মনে হচ্ছিল, তোমাদেব পথগুলো বড়োই সঙ্কীর্ণ, তোমাদেব ছেড়ে আসতে আমি এক ফোঁটাও চোখেব জলেব অপব্যয কবি নি মা, আমাব অন্তর্গত ক্লান্তিব শবীবটা সোজা হযে দাঁড়াতে দিচ্ছিল না আমাকে, বুকেব ভেতবটা ধ্বক ধ্বক কবে ক্রমাগত বেজে চলছিল, আমি পড়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, হামাগুড়ি দিযে চল-ছিলাম, পাহাবাওলা কুকুবেব মতো তোমাদেব স্বস্তিব সংসাবটা আমাকে তাড়িযে নিযে যাচ্ছিল মা

পথেব শেষে তবু পৌছতে পাবি নি মা, পৃথিবীব এই গোলার্ধে আমাব একটিমাত্র আশ্রযই আছে, সম্মানেব সিংহাসন আব একবুক ভালোবাসা নিযে ফিবোজ সেখানে প্রতীক্ষায, সেখানে পৌছতে পাবি নি, আমাব সংস্কাব সেখানে আমাকে পৌছতে দিচ্ছে না, আমাব সংস্কাবেব দুর্গে আজ আমি স্বেচ্ছাবন্দী, আমাব বক্তস্রোতেব পাকে পাকে জড়ানো এই শৃঙ্খলটাকে আমি টুকবো টুকবো কবে ভেঙে ফেলতে চাইছি, আমাব অন্তর্গত আমিব কাছে আমি হেবে যাচ্ছি মা।

আমি যেখান থেকে লিখছি, দুটো দেশেব সীমান্ত সেখানে মিশেছে। দু-পা হাঁটলেই আমি আমাব দেশ এবং ফিবোজেব কাছাকাছি চলে যেতে পাবি,

ওপাবেব বিস্তীর্ণ সবুজ ধান-খেত ঘন নীলেব গাছগাছালি অফুবান আকাশ এবং এ-সবেব মাঝখান দিযে একটি ভালোবাসাব মনেব আমন্ত্রণ সব সময আমাব কাছে পৌছয, সে-আমন্ত্রণে সাড়া দেবাব শক্তি কখনো পাব—এ-বিশ্বাস নিযে আমি বেঁচে আছি মা। ইতিহাসেব আব-এক কালান্তক দাবানলে আমাদেব সংস্কাব আমাদেব সঙ্কীর্ণতা পুড়ে পুড়ে ছাই হযে যাবে, তাব হাত সেদিন তুলে নেব আমি, বলব, বোজ বোজ, সে আমাব হাত তুলে নেবে, বলবে, বুলা বুলা বুলা। মাগো…

বিজয়ের বসন্তে

ভিয়েন ফুযং

চাব বছব পূর্ণ হলো। সময কী দ্রুত চলে যায
আমাদেব সৈন্যদল গড়ে ওঠে অবণ্যেব গাছেব মতন
আমাদেব পদক্ষেপে পেণ্টাগন কাঁপে
প্রায গোটা দেশটাই আমাদেব কবতলগত।
অনেক অনেকখানি বিমুক্ত এলাকা
এই ব্যাপ্ত আকাশেব নিচে আমি দযিতাকে কাছে পেলাম না।
এখন উৎসব বাত্রি। কী ভাবি তোমায নিযে বলো:
চাবটি বছব গেল, তবু আমবা মিলতে পাবি নি।

শুধু একবাব আমি ছোট্ট একটি চিবকুট পেযেছি। জনৈকা
সংবাদবাহিকা সেই চিঠিখানি পৌঁছে দিযেছিলেন,
চিঠিতে বক্তেব ছিটে, পথিমধ্যে শত্রু তাঁকে মেরে ফেলেছিল।
মাবা গেলেন, তবু সেই চিঠিখানি ঠিক পৌঁছেছিল
আব তাঁব শেষবার্তা "ও তোমায ভালোবাসে, ভাবে।
ও বযেছে শহবেতে সংগ্রামী বাহিনীব পুবোভাগে জেনো।"

আমাব বুকেব মধ্যে সাযগন তাই প্রিযতব
পথে পথে যেন দেখি তোমাবই ছাযাব সঞ্চাব
মেদিনীকাঁপানো যুদ্ধে সমর্পিত 'অগণন' সৈনিকেব বলবোলে শুনি
তোমাবই কণ্ঠস্বব।
উৎসবেব বাত। তবু মোছেনি বক্তেব দাগ সাইগনেব পথে
অসুবেবা কখনও বসন্ত চায না জনতাব।

তবুও আনন্দ জাগে হৃদযে হৃদযে ঃ
বিজযেব দেবি নেই, নতুন পোষাক পবে যুদ্ধে যেতে হবে।
তোমাদেব স গ্রাম মহীযান। বাইফেল হাতে
সাইগনেব মধ্য দিযে হেঁটে যাব, কণ্ঠে নিযে স্বাধীনতাব গান
মহান নগবে আমি পুঁতে দেবো বিজয পতাকা
হিবণ্ময তাবা জ্বলবে হো চি মিনেব শহবেব মাথাব ওপব।

তোমাব প্রতীক্ষা কবি। এবাব নতুন সাজে সাজো
কামানেবা স্তব্ধ হলে আমাদেব পবিণয হবে।
মুক্ত শহবেব 'পবে নীলাকাশে বিজযেব বসন্ত উৎসবে
দুটি শ্বেত কবুতব ডানা মেলে দেবে।

অনুবাদ ঃ শিবশম্ভু পাল

কর্মসংস্থান অফিসেব সামনে

দক্ষিণাবঞ্জন বসু

তাব চেযে চলো অন্য কোথাও দল বেঁধে যাই,
হাডেব মালা গলায পবে পথ চলি চলো।
চোখেব জলে ভিজবে চিঁডে, হয কখনো ?
হাত কচলে নকবি পাওযা স্রেফ দুবাশা।
কীর্তিনাশাব নেশায মেতে কবলে কিছু
এইটুকুতো হবেই হবে, লাগবে চমক—
কালাপাহাড কালাপাহাড কালাপাহাড।

লাইনে বসে দাঁডিযে থেকে দিন কেটে যায,
নাটক-নভেল শেষ হযে যায পবেব পবে ,

এইভাবে কি সহজ ব্যাপাব ধৈর্য ধবা ?
তাব চেয়ে চলো অন্য কোথাও দল বেঁধে যাই,
ভেঙেচুবে পথ কবে নিই আপন হাতে—
কালাপাহাড কালাপাহাড কালাপাহাড।

কীর্তিনাশাব নেশায মেতে কবলে কিছু,
বানেব জলে ভাসিযে দিলে সাবাটা দেশ ,
এইটুকুতো হবেই হবে, লাগবে চমক -
কালাপাহাড কালাপাহাড কালাপাহাড।
অনাহাবী ছিন্নবসন নিবাশ্রযেব
আব কত লোক এমনি হবে আত্মঘাতী ?
কালাপাহাড কালাপাহাড কালাপাহাড।

বাত্রি

চিত্তবঞ্জন পাল

বাদুড-ডানায সন্ধ্যা নামে ধীবে জাহ্নবীব তটে।
দিগন্তে ধূসব ক্লান্তি। গ্রামান্তবে বযোবৃদ্ধ বটে
বাত্রিব আবাসে ফেবে দিনান্তেব বিচঞ্চল পাখি।
ঝিঁঝিঁব নবৎ বাজে। তমসাব হাতে বাঁধে বাখী
নিদ্রাব অদৃশ্য দূতী। স্তবে স্তবে অন্ধকাব জমে।
উৎকর্ণ ঘুমেব ছন্দ। নিশাচব পশুবা বিক্রমে
ঘোবে ফেবে। আবণ্যক চোখ খোঁজে সুলভ শিকাব।
ফেনিল মদিবা পাত্র। বর্ণোচ্ছল স্ফূর্তিব বিকাব.
পলকে পলকে আঁকে লালসাব কলঙ্কিত ছাপ।
বিবশ চৈতন্য কাবও। কাবো ঘবে ছদ্মবেশী পাপ।

কত হাসি বেশরম। কত অশ্রু উষ্ণ উপাধানে।
দুশ্চিন্তার দীর্ঘশ্বাস। মন খোঁজে অন্য কোনো মানে
সুদুঃসহ বেদনার। পূর্বাশায় উষা শিরাবরে।
শুকতারা দৃষ্টি হানে সোনালী সূর্যের অবয়বে।

একুশ বছর আগের কথা

প্রফুল্লকুমার দত্ত

প্রত্যহ সন্ধ্যায় একটু ঈষদুষ্ণ জ্বর, ওতে মানুষ মরেনা।
সামান্য যা রোগা হয়ে গেছো—
ভালো খাওয়া-দাওয়া, কিছু ওষুধ এবং
বিশ্রাম কয়েকটা দিন—সব সেরে যাবে।
একুশ বছর আগে এইসব কথা বলেছিলাম তোমাকে।

ভালো খাওয়া-দাওয়া, এই কথাটার মূল্য যথাযথ
বুঝিনি, ওষুধ মেলে কী দিলে, বুঝিনি, কিংবা বিশ্রাম শব্দটা
বাস্তবে কখনো সত্য কি না, তা বুঝিনি—
প্রবীণ বাগ্মিতা কিছু শুনে শুনে বলেছি যদিও
এ-সবের অর্থ সেই একুশ বছর আগে কিছুই বুঝিনি।

স্বচক্ষে দেখেছি—ভালো খাওয়া-দাওয়া, ওষুধ বিশ্রাম—
তুমি কিছু পাওনি। একটা নাবালক শিশুর মাথায়
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বোঝা নেমে আসছে, নেমে আসছে দেখে
প্রচণ্ড ঘৃণায় শেষ রক্তবিন্দু বমি করে, থুথু ফেলেছিলে
সংসারের মুখে। আমি তখন কি জানতাম, রক্ত এতো মূল্যবান ?

প্রতিটি স্বপ্নেব বুকে বক্তক্ষযী যুদ্ধ, মৃতদেহ, জনাকয
শ্মশানবন্ধুব চাপা কণ্ঠস্বব! তুমি ঠিক মৃতদেহ নও—
অন্যায যুদ্ধেব শেষ প্রতিবাদ। প্রতিবাদ বলেই কি একটা নাবালক
শিশুব মাথায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব বোঝা
চেপে আছে দেখে, তুমি স্বপ্নেব প্রতিটি দৃশ্যে আজো
তেমনি বোগা হযে আছ?'

সেদিন অতটা পথ যেতে যেতে শুধু কি আমাবই কথা ভাবছিলে?
শুধু কি ভালো খাওযা-দাওযা, কিছু ওষুধ এবং
বিশ্রাম নামক শব্দটাব
প্রকৃত তাৎপর্যটুকু চোখ বুজে ভাবছিলে? কিন্তু আমি
এ-সবেব অর্থ সেই একুশ বছব আগে কিছুই বুঝি নি।

পথের সূচনা

শুভাশিস্ গোস্বামী

যেবকম ধাবাক্রান্ত মেঘ ভেঙে
বৌদ্র নয, বৌদ্রেব আভাস—
তেমনই নিশ্চেতন ছাব্বিশ ঋতুচক্রে
ক্ষান্তি মেনে নিযে
মনে হয নির্গ্রন্থি পথেব সূচনা
হযতো বা পাওযা যাবে।
মাঝে মাঝে পৃষ্ঠদেশে পাবিপার্শ্বিকেব কডা চাবুক
নির্মম আঘাত হানে,
তবুও তো মাবেব ভযেব মুখে পদাঘাত ক'বে
বক্তকববী আনে উদ্দাম কিশোব।
এভাবেই অগ্রসব হতে হবে।
এভাবেই খুঁজে পেতে হবে সেই হবিণী-নিলয।

মনে হয় নির্গ্রন্থি পথের সূচনা
　　　　হয়তো বা পাওয়া যাবে।
গন্তব্য জানিনা, তবু যাত্রাই ধ্রুব
তীর্থযাত্রা নয়, তবু যাত্রাই ধ্রুব
একাকী যাত্রা নয়,
অন্ধকার যামিনীর একলা পথিক নয়,
　　　　হাতে হাত ধ'রে
মিছিলে মিছিলে মিশে
রক্তকরবী আনবে উদ্দাম কিশোর।

যে রকম মেঘ ভেঙে রৌদ্র নয়, রৌদ্রের আভাস
তেমনই নির্গ্রন্থি পথের সূচনা
　　　　হয়তো বা পাওয়া যাবে।

প্রথমদিনের সূর্য

কালীকৃষ্ণ গুহ

প্রথমদিনের সূর্য
অগ্রাণমাসের ধানের ক্ষেতের সূর্য—
আমি তাকে চিনি, তাকে

উত্তরায়ণের পথে অবিকল্প অস্ত যেতে দেখেছি
বীজকম্প্র, ছড়িয়ে-পড়া শেষ আলো
সোনালী—

দিগন্তরেখার আকাশ বারবার চোখে পড়ে, দূরের
শালবন চোখে পড়ে, নম্র দিনান্তছটায়
সোনালী—

জীবনের পাশে এসে দাঁড়ায়
সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত, পাতা ঝরে
অবিরাম পাতা ঝরতে থাকে

আনন্দে বিপদে ঝবে জীবনেব দিন
আদিগন্ত ছাযা, দীর্ঘ
ছাযা, যেমন

অন্তব-প্রকৃতিব উৎসে বসে থাকেন ব্যক্তি
উত্তবেব হাওযায লুটিযে দেন, ওডে
রুক্ষ চুল, বাজে

আনন্দ-ভৈববী, লাল ধুলো ওডে, পথে
পথে পথে সূর্যোদযেব গান
সূর্যাস্তে করুণ, পথে

উত্তবাযণেব আলো, উত্তবেব
হিম-হাওযায লুটানো কিংশুক, বীজকম্প্র, ছডিযে-পডা
অগ্রাণমাসেব ধানেব ক্ষেতেব সূর্য—

প্রথমদিনেব সূর্য, যাকে পাতা-ঝবে-যাওযা-মাঠে অবিকল্প অস্ত যেতে দেখেছি।

জন্মান্তর

ববীন সুর

রূপান্তবে তুমি নব বাজকন্যা শিল্পেব উত্থান।
তুমি কী প্রাচ্যেব ডাণ্ডী, জেটি ক্রেন, বিদীর্ণ হটাবে
কেন্দ্রিত শ্রমেব সিন্ধু প্রত্যহেব যৌথ উৎপাদনে
বপ্তানি বোঝাই লবি সাবাবাত দ্রুত যাতাযাত,

অসংখ্য স্টীমাব লঞ্চ, গাদাবোট ফেনিল স্রোতেব
বাণিজ্যেব উদ্বোধনে কটিরুজি বিতবিত ভাবতবর্ষেব
প্রদেশ ধর্মেব ধাবা অব্যাহত নবীন প্রযাগে
মন্দিব মসজিদ গির্জা উদ্ভাসিত দীপ্ত গুরুদ্বাব।

বারো-ঘর-এক-উঠানের বস্তি, গুমটি ঘরের
লেবেল ক্রসিং, রাস্তা, ওয়াগনটানা ইঞ্জিনের
কানফাটা হুইসিল, সরগরম লোকোশেড, শান্টিং ঝংকারে
ব্যস্ততা ছড়িয়ে পড়ে, জড়িবুটি মাদুলি পাথরে
মাতাল মানুষগুলি জগদ্দলে মহরম গণেশ মিছিলে
তাড়িমদে এতোয়ার, রাসমেলা, ঘোষপাড়ার দোলের রাত্রির।

কররেখা খুলে পড়লে

দীপেন রায়

কররেখা খুলে পড়লে মানুষের মুখের চেহারা
অন্ধকারে
মাঠে ময়দানে
আলো ফেলে খোঁজে জন্মের নোঙর
কোন ঘাটের জলেতে বাঁধা আছে
মূল,
মূলে জীবনের রঙ
সাত ডুবুরীর হাতে
সাত ঘড়া হীরের মোহর।

কররেখা খুলে পড়লে মন জানে অচেনা ঝড়ের গন্ধ,
কার ঘর পোড়ে
কোনদিকে
মনের ভিতরের দগ্ধ
শালবনের দাউ দাউ লালে—
কোষগুলি
শরীরের ও মনের
শুষে নিচ্ছে
অন্তহীন জলের পিপাসা।

কবরেখা খুলে পড়লে আছি স্বজন ভূগোলে,
ক্রমবিস্তাবিত পটে
দাগ
পায়ের আঙুলেব
দীর্ঘ চলাফেবাব,
পবিচিত মুখেব আববণ মুছে
বেবিযে আসে লাল
লাল কাঁকুবে পথেব ধূলো
সাবা দেহেব দীর্ঘতায।

রক্তাক্ত মধ্যাহ্নে আজ

অমিতাভ চক্রবর্তী

কোনো একদিন
আমেব মুকুল ছিল
কামবাঙা পাখিব অধব।

ধানীবঙ শাড়ি প'বে
হেসেছিল কবেকাব বঙীন শৈশব।

মানুষ বন্দব-দ্বীপ
মিছিলেব ঢেউ—
তাবই মধ্যে ঘাসেব সিঁদূব
বলেছিল রুপোলী কথাব গল্প।

নিষ্কম্প খুশিব আলো জ্বেলেছিল কেউ
চিত্রিত আঁধাবে।

বক্তাক্ত মধ্যাহ্নে আজ

গেবস্থ ঘবেব ছাযা সন্তর্পণে
পাযে পাযে ··চৌকাঠ পেবোয।

পূর্ণতার কথা মনে রেখে

শুভ বসু

অসংখ্য রাত ঘুম কেড়েছিস চোখে
অসংখ্য দিন হৃদয় জুড়ে জ্বালা
তোরই জন্য এই লোকে ঐ লোকে
সবাই সাজায় সোনার বরণডালা ॥

অথচ এ-বন্ধ্যাভূমি নিজেকে বৃষ্টির জলে
স্নাত দেখে নাই, এখানে দেখেনি কেউ
আদিগন্ত খোয়াই-এর অনন্ত বিস্তার—
অনুভব করে নাই ধবল তুষার
যেমন সূর্যের সাথে অনুভব বিনিময় করে।

শীতলপাটির দিন—সে করে গিয়েছে চ'লে
অনন্ত প্রবাসে—এখন প্রবাস শুধু
আমাদের এই দেশকাল—আমাদের মনে ও মননে
এখন স্মৃতিও নয় সেসব আলাপ
যা শুধু সম্ভব স্বপ্নে—স্নাত অনুভবে।
অথচ ছিল কী সব আমাদের বিগতজীবনে ?
স্বপ্ন আর সাধ ছিল—জাগরণঘুম,
দু-চারজনের মধ্যে বিনিময় ছিল, দু-চার নারীর মধ্যে
নির্ভেজাল রমণীয় ছিল—ছিল না পূর্ণতা,
কারণ পূর্ণতা এলে কোনোদিন এই ক্ষিতিময়
বর্তমান এরকম রিক্ততা হতো না।

যেহেতু তোরই জন্যে এখনো এখানে
নিরবধি অসংখ্য হৃদয় গান করে :

অসংখ্য রাত ঘুম কেড়েছিস চোখে
অসংখ্য দিন হৃদয় জুড়ে জ্বালা
তোরই জন্য এই লোকে ঐ লোকে
সবাই সাজায় সোনার বরণডালা ॥

নমস্কার করুন

জ্যোতীষ ফণী

হাতে ডুগডুগি নিযে
নমস্কাব করুন—
নবম গুডে চেটে নিচ্ছে
এই পিঁপডেটাকে।

নমস্কাব করুন—
(আপনাব) বাডিব নিচে ফাঁকা কবছে যে
উইপোকা, তাকে।

মৌন-যুগে আক্রান্ত দেযালকে— নমস্কাব!
কুকুবেব বাঁকা লেজকে— নমস্কার।
অন্ধকাবেব পুবীকে ডুবিযে দেওযা বাতকে—নমস্কাব!
নিক্তিব ওপবে জাতিকে— নমস্কাব!
পেট ধবে জানালাব কাছে হাসাকে— নমস্কাব।
ইঁদুবেব সমস্ত গর্ত্তকে— নমস্কাব!
আপনাব—
এই বন্দবকে— নমস্কাব।
—নমস্কাব।
—নমস্কাব।
হাতে ডুগডুগি নিযে কবি—নমস্কাব!

সুভাষচন্দ্র পাল
(গুজবাটি কবিতাব ভাবানুবাদ)

জেলখানার চিঠি। রোজা লুকসেমবুর্গ

পঞ্চাশ বছব আগে ১৯১৮ সালেব নভেম্বব মাসে জার্মানিব শ্রমিকশ্রেণী একচেটিযা মূলধনপতি ও জুঙ্কাব ভূম্যধিকাবী বাষ্ট্রশক্তিব বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠন কবেন। স্থবিধাবাদী তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদেব দেউলিযাপনায ও প্রতিক্রিযাব আক্রমণে ঐ বিপ্লব বক্তস্নানে দমন কবা হয। জার্মান শ্রমিকশ্রেণীব বীবনেতৃদ্বয কার্ল লাইবনেখট ও বোজা লুকসেমবুর্গকে ১৯১৯ সালেব ১৫ই জানুযাবি মূলধনপতিদেব ঘাতকদল হত্যা কবে। বোজা লুকসেমবুর্গ ১৮৭১ সালে পাবী কমিউনেব বছবে পোল্যাণ্ডে জন্মে-ছিলেন। তিনি ১৮৮৭ সালে মার্কসবাদেব সংস্পর্শে আসেন। ১৮৯৩-১৮৯৭ জুবিখে বাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি অধ্যযন কবেন এবং আইনে ডক্টব উপাধি লাভ কবেন। ১৮৯৮ সালে তিনি জার্মান সোশ্যাল ডেমো-ক্র্যাটিক পার্টিতে যোগ দেন। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে জার্মান দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীবা যুদ্ধেব পক্ষে ভোট দেন—কিন্তু বোজা লুকসেমবুর্গ ও কার্ল লাইবনেখট সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধেব বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীব আন্তর্জাতিকতাব আদর্শে অবিচল থাকেন। ১৯১৪ সালে তাঁকে গ্রেপ্তাব কবা হয। ১৯১৫ সালে জেলখানাতেই তিনি বিখ্যাত 'জুনিযাস' প্যাম্ফলেট বচনা কবেন এবং যুদ্ধলিপ্সু সাম্রাজ্যবাদ ও 'জাল সমাজতন্ত্রী'দেব মুখোশ খুলে দেন। ১৯১৬ সালে পাঁচ মাসেব জন্য জেলখানা থেকে ছাডা পান। পুনবায গ্রেপ্তাবেব পব তাঁকে বোংকি (পোজেন) এবং ব্রেসলাউ জেলে বন্দী কবে বাখা হয। ১৯১৮ সালে শ্রমিকশ্রেণীব অভ্যুত্থানে তিনি মুক্ত হন। বোজা লুকসেমবুর্গ ও কার্ল লাইবনেখট জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত কবেন। বোজা লুকসেমবুর্গ-এব বহুবিধ বচনাব মধ্যে 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসিব সঙ্কট' 'এ্যাকুমুলেশন অফ ক্যাপিটাল' যে কোনো সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি-জিজ্ঞাসুব কাছে এখনও জীবন্ত গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থটি সম্প্রতি বৃটিশ অর্থনীতিবিদ শ্রীযুক্তা জোযান ববিনসন-এব সম্পাদনায দীর্ঘ মুখবন্ধ যুক্ত হযে পুনবায ইংবাজিতে প্রকাশিত হযেছে।

নিচেব চিঠিগুলি কার্ল লাইবনেখট-এব পত্নী সোনিযা লাইবনেখট-এব কাছে লেখা। অনুবাদক

বোংকি, ১৮ই ফেব্রুয়াবি, ১৯১৭

মার্থাব কাছ থেকে কার্ল-এব সঙ্গে তোমাব সাক্ষাৎকাবেব ছোট্ট বর্ণনা পাওযা গেল। কেমনভাবে তুমি গবাদেব ওপাশে তাঁকে দেখলে আব কিভাবে তুমি তা সহ্য কবলে। অনেক দিন ধবে তো আমাব বহু অভিজ্ঞতা হলো—তবু বলি, আমাকে তা গভীবভাবে বিচলিত কবেছে। এসব আগে আমাকে জানাও নি কেন ? আমাবও তো তোমাব দুঃখেব অংশভাগিনী হবাব অধিকাব আছে। এ-অধিকাবেব কোনো ছিঁটেফোঁটাও আমি ছাডতে নাবাজ। প্রসঙ্গত, দশ বছব আগে ওযাবশব দুর্গে আমাব বাডিব লোকজনেব সঙ্গে সাক্ষাৎকাবেব ঘটনাটি আবাব স্পষ্ট মনে পডে গেল। সেখানে আমি এক জোডা-জালেব খাঁচাব মধ্যে থেকে সাক্ষাৎপ্রার্থীদেব সঙ্গে দেখা কবতে পেতাম। অর্থাৎ, একটি ছোট খাঁচা বড খাঁচাব মধ্যে বসানো থাকত, আর সেই জোডা খাঁচাব জালেব মধ্য দিযে এ-ওকে একটু একটু দেখতে পেতাম। তখন সবে আমি ছ-দিনেব অনশন ধর্মঘট পাব কবেছি, কাপ্তেন সাহেব (দুর্গাধিনাযক) আমাকে তো প্রায পাঁজাকোল কবে ভিজিটাবস রুমে পৌছে দিলেন। দু-হাতে আমাকে গবাদ চেপে ধবে থাকতে হচ্ছিল। মনে হয, এতে করে চিডিযাখানাব বুনো জন্তুব একটা আদলও আসছিল। খাঁচাটা আবাব ঘবেব এক প্রাযান্ধকাব কোণে দাঁড কবানো। আমাব ভাই খাঁচাব জালে মুখ চেপে ধবে বাববাব ডাকছিল, "কোথায তুমি" ? নাকেব পাঁশনে চশমা চোখেব জলে ঝাপসা হযে তাব দৃষ্টিও ঘোলাটে কবে তুলছিল, ঘন ঘন সে চশমা মুছছিল। কত খুশী হতাম যদি এখন লুকাউ-এব খাঁচায আমি কার্ল-এব স্থান নিতে পাবতাম।

ব্রেস্লাউ, মধ্য ডিসেম্বব, ১৯১৭

সোনিচকা, এখানে আমাব এমন এক তেতো অভিজ্ঞতা হলো। যে উঠোনে আমি একটু হাত-পা খেলাই, সেখানে প্রাযই দেখি সামবিক গাডি আসছে, কখনো বস্তা কখনো বা সৈন্যদেব পবিত্যক্ত বক্তমাখা উর্দি-শার্ট নিযে । এখানে ওসব নামিযে জেলখানাব খুপবিগুলোতে বেঁটে দেওযা হয। সেলাই-তাপ্পি লাগানোব পব সেগুলি আবাব ফেবৎ নিযে সৈন্যবাহিনীতে পাঠানো হযে থাকে। কদিন আগে এমনি একটি গাডি এলো। কিন্তু ঘোডাব বদলে দেখলুম মহিষ জোতা বযেছে। এমন পশু আমি এই প্রথম খুব কাছ থেকে দেখলুম। আমাদেব দেশেব পশুগুলিব চেযে এগুলি বেশ বলিষ্ঠ আব

ঘাড়ে গর্দানে ভরাট। এদের মাথা দিব্যি চ্যাটাল, তাতে আছে বেশ ছড়ানো শিঙ, ফলে মাথাগুলি অনেকটা ভেড়ার মাথার আদল আনে। আর আছে কালো কুচকুচে বড় বড় ভারী মিষ্টি নরম চোখ। রুমানিয়া থেকে এরা এসেছে বিজয় উপঢৌকন হয়ে। যে সৈন্যরা ঐ গাড়ির সঙ্গে ছিল, তারা বলে—এই বুনো জানোয়ারগুলোকে ধরা বড় কঠিন, আর ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে পোষ মানানো আরও শক্ত। ওরা স্বাধীন পশু কিনা। এমন নির্মমভাবে ওদের পেটানো হয়, যে মনে হয় মহাযুদ্ধে পরাজয়ের দুর্ভাগ্য দায় কেবল ওদেরই· এই ব্রেসলাউতেই নাকি এমন প্রায় শ-খানেক পশু রয়েছে। রুমানিয়ার সরস গোচারণ ভূমির সঙ্গে যাদের নিবিড় পরিচয় ছিল, তাদের আজ যৎসামান্য ও বিশ্রী খাদ্য দেওয়া হচ্ছে। হরেক রকম বোঝা টানবার জন্যে ওদের যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়, আর তার ফল হলো দ্রুত পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। যাই হোক, এই কদিন আগে বস্তায়ভর্তি একটি গাড়ি এলো। বস্তাগুলো এত উঁচু করে সাজানো যে মোষগুলি দেউরির সামনের পাথুরে ইটের রাস্তায় আর গাড়ি টানতে পারছিল না। গাড়োয়ান সৈন্যটিও ছিল অমানুষিক নিষ্ঠুর। পশুগুলিকে সে চাবুকের গোড়া দিয়ে এমন নির্মমভাবে পিটতে শুরু করল যে জেলখানার পাহারাদার মেয়েটি ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে গিয়ে বাধা দিতে চাইল, বলল, "জন্তুগুলির উপরে একটু দয়ামায়াও হয় না।" "আমাদের মতো মনিষ্যিদের ওপর কারোই কৃপা হয় না" কুৎসিত ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে সৈন্যটি জবাব দিলো। সে আরও বেশি বেশি করে পেটাতে লাগল পশুগুলি শেষে পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়িটিকে টেনে আনল। তবে, একটি পশুর গা দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছিল। সোনিচকা, লোকজন কথাতেই বলে মোষের চামড়ার মতো পুরু আর শক্ত, তবু সে চামড়াও ছিঁড়ে কেটে গেল। যখন গাড়ি থেকে বস্তাগুলি নামানো হচ্ছিল, পশুগুলি ক্লান্তিতে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তাদের মধ্যে একটির কালো মুখে আর নরম কালো চোখে এমন একটা ভাব ছিল যেন সে এইমাত্র কোনো শিশুর মতো কেঁদেছে, যে-শিশু দারুণ শাস্তি পেয়েছে—অথচ কেন তার শাস্তি, কীই বা তার অপরাধ, এই যন্ত্রণা আর পাশব শক্তির হাত থেকে কি করে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সে জানে না। আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আর সেই পশুটি আমারই দিকে তাকিয়ে রইল। আমার দু-চোখ দিয়ে দু-গাল বেয়ে জল ঝরছিল—সে অশ্রুজল তো তারই চোখের জল। আমি তার মূক বেদনায় সাহায্য করতে না পেরে যে যন্ত্রণা সহ্য করলাম,কোনো প্রিয় ভাইয়ের জন্যও এত

বেশি মুচড়ে-ওঠা-দুঃখ কেউ অনুভব কববে না। সেই অতিদূব মুক্ত স্বাধীন সবস শ্যামল রুমানিযাব তৃণপ্রান্তব চিবদিনেবজন্য তাব কাছ থেকে উধাও হযে গেছে। সেই বৌদ্র, সেই বাতাস,সেই পাখিব গান, সেই বাখাল ছেলেদেব সুবেলা গলাব ডাক—আহা, সেসব কেমন অন্য আবেক বকম ছিল। আব এখানে—ভয দেখানো অপবিচিত এই শহব, ঘিঞ্জি আস্তাবল, জমাট বাঁধা খড়েব সঙ্গে মেশানো পচা নাড়াব গা গুলিযে তোলা দুর্গন্ধ, অচেনা এই ভযঙ্কব জনতা—চাবুক, টাটকা কাঁচা বক্ত ঝবে পড়ছে ঝবঝবিযে।

হাযবে আমাব হতভাগ্য মহিষ, আমাব দুর্ভাগা ভাই, আমবা দুজনে এখানে দাঁড়িযে আছি মুখোমুখি—অসহায বেদনার্ত—আমাদেব সাধাবণ বন্ধনসূত্র এখন যন্ত্রণা অসহাযতা আব মুক্তিব কামনা।

যখন বন্দীবা ভাবী বস্তাগুলি গাড়ি থেকে খালাস কবে বাড়িব মধ্যে নিযে যেতে ব্যস্ত, সেই সৈন্যটি তখন হাত দুটি দু-পকেটে পুবে উঠোনময পাযচাবি কবছিল। হাসিমুখে শিস দিচ্ছিল, জনপ্রিয একটি সুব। আব আমাব চোখেব সামনে দিযে বিপুল মহাযুদ্ধেব এক বাহিনীপুঞ্জ চলচ্চিত্রেব মতো চলে গেল

তাড়াতাড়ি চিঠি লিখো কিন্তু। আমাব আলিঙ্গন, সোনিচকা,

তোমাবই বোজা

সোনঝুচকা, আমাব প্রিযতম, যা কিছুই ঘটুক না কেন, স্থিব থেকো, মন প্রফুল্ল বেখো। জীবন ঠিক এমনিই, আব সাহসেব সঙ্গে তাব মুখোমুখি হতে হয—কোনো খেদ না বেখে, হাসিমুখে—যা কিছু হোক, সব সত্ত্বেও।

অনুবাদঃ তরুণ সান্যাল

ভারতীয় বিজ্ঞানের ধারা

শঙ্কব চক্রবর্তী

ভাবতবর্ষে বছবেব বিভিন্ন সময়ে অনেক ঢাকঢোল পিটিযে বিবাট বড ব
বৈজ্ঞানিক সম্মেলনেব আযোজন কবাব একটা বেওযাজ দাঁডিযে গেছে
আমবা খববেব কাগজে সেইসব সম্মেলনেব জ্ঞানগর্ভ বিপোর্ট পডি, বৈজ্ঞানি
গবেষণাগাবগুলিব কর্মপ্রচেষ্টাব সুললিত বর্ণনাব কথা শুনে পুলকিত হই এ
কিছু কিছু বৈজ্ঞানিকেব স্বদেশীয বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিকতা
বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টাব মধ্যে লক্ষ্যহীনতাব অভাব-জাতীয আত্মসমালোচনামূল
বিবৃতি পাঠ কবে তাঁদেব সংনিষ্ঠা ও বিচাববুদ্ধিব তাবিফ কবি।

বর্তমানে একটা বিষয বোধহয অনেকেই লক্ষ্য কবছেন যে বিজ্ঞানবিষয
সবকাবী দপ্তব এবং বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রতিষ্ঠান—সর্বত্রই আত্মসমালোচনা
বহবটা একটু বেডে উঠেছে। সকলেই বলবেন, আত্মসমালোচনা ব্যাপাবা
মন্দ নয এবং এটা ববং ঘনঘনই হওযা উচিত, তাতে যেটুকু কাজ হে
তাব মূল্যাযন যেমন সম্ভব হচ্ছে, তেমনি অতীতেব ভুলভ্রান্তিগুলি কাটি
ভবিষ্যতে সঠিক পদক্ষেপেব ব্যবস্থাটাও হতে পাবছে।

প্রশ্নটা হলো—বৈজ্ঞানিক সম্মেলন, বৈঠক, আলোচনা, পবামর্শসভা ইত্যাদি
মধ্য দিযে দেশেব বিজ্ঞানবিষযক কাজ এবং গবেষণাব ক্ষেত্রে যেগুলি মূল সমস্য
তাব প্রতি সঠিকভাবে আলোকপাত কবা হচ্ছে কি না। আবো একট
বড প্রশ্ন হলো, দেশেব উন্নযনমূলক পবিকল্পনাগুলি রূপাযনেব কাজে এব
ক্রমবর্ধমান শ্রমশিল্পেব অগ্রগতিব ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো মাথা তুলে দাঁডাচ্ছে
দেশেব বৈজ্ঞানিক গবেষণাব ধাবক ও বাহক—সবকাবী ও বেসবকাবী গবেষণ
কেন্দ্রগুলি—সেই সমস্যা পূবণেব যে-বিবাট কাজ ও দাযিত্ব, তাব কতটুকুই ব
পালন কবছেন। দ্বিতীয প্রশ্নটি সাধাবণ মানুষ মাত্রেবই মনে বিশেষ কে
জেগে ওঠে, যখন তাঁবা দেখেন যে সাবা দেশ জুডে বন্যাব তাণ্ডব আমবা শু
বছবেব পব বছব প্রত্যক্ষ কবছি অথচ কোনো সক্রিয বন্যা-প্রতিবোধেব ব্যবস্থ
এখনো গডে তোলা সম্ভব হলো না। কৃষিকাজেব জন্যে আজও আমাদে
আকাশেব দিকে তাকিযে থাকতে হয, ব্যাপক সেচ-পবিকল্পনা এখনো আমাদে
আযত্তেব বাইবেই বযে গেছে। খাদ্যসমস্যাকে মেটানো দূবেব কথা, নিত্য

ব্যবহার্য প্রতিটি খাদ্যসামগ্রীব মূল্যেব সূচক (ইনডেক্স) ক্রমেই বেড়ে চলেছে, অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রীব তো কথাই নেই। আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা এখনো জনসাধাবণেব এক বিবাট অংশেব নাগালেব বাইবে।

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাগুলিব দৌলতে দেশে কিছুটা উন্নতি যে হযেছে, একথা কেউ অস্বীকাব কববে না। কিন্তু সেই পবিকল্পনা বা উন্নতিব মধ্যে কোথাও যে গলদ বযেছে, তা বুঝতে পাবি যখন দেখি বিদেশেব কাছে আমাদেব ঋণ বেড়েই চলেছে, দ্রুত অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভবতাব আশা ক্রমেই বিলীন হচ্ছে এবং সাবা দেশ জুড়ে শ্রমশিল্পেব ক্ষেত্রে এক বিবাট মন্দা জাতীয অর্থনীতিব মেরুদণ্ডটাব মধ্যে ঘুণ ধবাবাব চেষ্টা কবছে। বিভিন্ন শিল্পসংস্থাগুলো ব্যাপকহাবে শ্রমিক ছাঁটাই ও লে-অফ প্রভৃতিব মাধ্যমে তাদেব মুনাফাব অঙ্কটা বাড়তিব দিকে বাখাব প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। জনগণেব স্বার্থবিবোধী কাজগুলো কবাব সময দোহাইটা কিন্তু পাড়া হচ্ছে এই বলে যে সেটা না হলে নাকি জাতীয উন্নতিব সামগ্রিক মানকে বজায বাখা সম্ভব হবে না। দেশেব সামগ্রিক-সমস্যা ও সঙ্কটেব পবিপ্রেক্ষিতে ভাবতেব বিজ্ঞানবিষযক কাজ ও গবেষণাব ধাবা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধাবণা আমবা এই প্রবন্ধে গ্রহণ কববাব চেষ্টা কবব।

জাতীয বিজ্ঞানবিষযক নীতি

ভাবতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ কবাব পবেই ১৯৪৮ সালে শিল্পসংক্রান্ত নীতি-বিষযক একটি প্রস্তাব গ্রহণ কবা হয। এই প্রস্তাবেব মধ্যে ভাবতে টেকনোলজি বা প্রযুক্তিবিদ্যাব বিকাশ ও বিদেশ থেকে এই বিষযে জ্ঞান সংগ্রহ কবা সম্বন্ধে কিছু বলা হয নি। কিন্তু ভাবতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাব (১৯৫১-৫৬) সময থেকেই নানা জাযগায বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র গড়ে উঠতে শুরু কবে।

প্রথম পবিকল্পনাব শুরুতে ভাবত সবকাব বৈজ্ঞানিক গবেষণাব খাতে বাৎসবিক চাব কোটি টাকা ববাদ্দ কবেন। পবিকল্পনাব শেষ বছব ১৯৫৫-৫৬ সালে এই ববাদ্দ তেব কোটি টাকায এসে দাঁড়ায। ১৯৬০-৬১ সালে এই পবিমাণ বেড়ে ত্রিশ কোটি টাকায পৌছয, যাব প্রায অর্ধেকটাই বিনিযোগ কবা হয পাবমাণবিক গবেষণাব কাজে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণাব খাতে আমাদেব বার্ষিক ব্যযেব পবিমাণ পঞ্চান্ন কোটি টাকাব মতো, আমাদেব মোট জাতীয আযেব শতকবা ০৪ ভাগ থেকে ০৫ ভাগ আমবা এখন এই খাতে খবচা কবছি।

১৯৫৮ সালের ৪ঠা মার্চ ভারতের লোকসভায় একটি 'বৈজ্ঞানিক নীতি-সংক্রান্ত প্রস্তাব' গ্রহণ করা হয়। ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের ব্যাপারে এই প্রস্তাবের গুরুত্ব কম নয়। এই প্রস্তাবে স্বীকার করা হয়েছিল যে, বর্তমান যুগে জাতীয় সমৃদ্ধির চাবিকাঠি প্রধানত তিনটি বিষয়ের মধ্যে কার্যকরী যোগসূত্র স্থাপনের ওপর নির্ভর করছে। সেগুলি হলো যথাক্রমে প্রযুক্তিবিদ্যা, নতুন প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পুঁজি। প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, কারণ নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং তাকে কাজে নিয়োগ করার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রাচুর্যতাকে যেমন কাটানো যায়, তেমনি পুঁজির ওপর দাবিটাও কমে আসে। ভারতে বিশুদ্ধ, ফলিত এবং শিক্ষামূলক—সর্ববিধ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানচর্চা এবং গবেষণাকে চালু করা এবং সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়া, দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী অত্যন্ত উচ্চস্তরের গবেষক বৈজ্ঞানিক গড়ে তোলা ও তাঁদের কাজের গুরুত্বকে স্বীকৃতি জানানো এবং কাজের শর্ত হিসেবে গবেষক কর্মীদের সমস্ত রকমের সুযোগ-সুবিধে দেওয়া প্রভৃতি বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুফল যাতে দেশের জনসাধারণের সর্বস্তরে গিয়ে পৌছতে পারে, সে-সম্বন্ধেও একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়।

ভারত সরকারের বিজ্ঞানবিষয়ক এই জাতীয় নীতি সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা হচ্ছে কি না, তা বিচার করার জন্যে ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে, ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে এবং ১৯৬৭ সালের শেষের দিকে পর্যায়ক্রমিকভাবে কতকগুলো গোলটেবিল বৈঠকের মতো ডাকা হয়। প্রতিটি বৈঠকের আলোচনায় যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছিল, তার বিচার করলে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানবিষয়ক জাতীয় নীতিগুলি যে কার্যকরী হচ্ছে না, সে-সম্পর্কে সবাই একমত। তা না হবার জন্যে অনেকে বিজ্ঞান-গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে আমলাতান্ত্রিক মনোভাবকে দায়ী করেছেন। আবার কেউ যথেষ্ট অর্থ এবং বৈদেশিক মুদ্রার অভাব ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য না দেওয়া কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন।

আসল কথাটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই, আমাদের জাতীয় বিজ্ঞানবিষয়ক একটি নীতি কাগজে-কলমে রয়েছে, এই সান্ত্বনাটুকু নিয়েই আমরা গত দশটা বছর কাটিয়ে দিলাম। কেন ঐ নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হলো না, এ-নিয়ে কারুর বিশেষ মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। তাহলে বলতে বা

শুনতে খাবাপ শোনালেও ঘটনাটা দাঁডাচ্ছে এই, বর্তমানে আমাদেব ভাবত সবকাবেব আদৌ কোনো জাতীয় বিজ্ঞানবিষযক নীতি কার্যকবী নেই।

ব্যাপাবটা তাহলে কি দাঁডাল, দেখা যাক। কোনো জাতীয বিজ্ঞানবিষযক নীতি নেই, অথচ বৈজ্ঞানিক গবেষণাব খাতে বর্তমানে প্রতি বছব বিপুল পবিমাণে অর্থব্যয কবা হচ্ছে এবং নানা শ্রেণী মিলিযে ভাবতে প্রায ২০৫টি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগাব চালুও বযেছে। এ-পবিস্থিতি দেখে কেউ যদি বলেন যে, এ-হলো নিতান্তই এক অবাজক অবস্থা, দিকৃভ্রান্তেব মতো একটা জাহাজ যেন সাগবে পাডি জমিযেছে, তাহলে তাকে বড দোষ দেওযা যায না।

বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র

আমাদেব দেশে যথেষ্ট ভালো গবেষক কর্মী অনেকেই বযেছেন, যাঁবা দেশেব গবেষণাব ধাবাকে দেশেব সমস্যাব কাছাকাছি নিযে আসতে চান। এ-জাতীয কিছু কিছু কাজও কোনো কোনো গবেষণাকেন্দ্রে হযেছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। ভাবতে গবেষণাগাবগুলিকে মোটামুটি পাঁচভাগে ভাগ কবা যায : [১] কেন্দ্রীয-কাউনসিল অফ সাযেন্টিফিক অ্যাণ্ড ইনডাস্ট্রিযাল বিসার্চ-এব অধীনে জাতীয গবেষণাগাবসমূহ এবং ইণ্ডিযান কাউনসিল অফ এগ্রিকালচাবাল বিসার্চ, মেডিকেল বিসার্চ কিংবা ডিফেন্স বিসার্চ জাতীয স্বযংশাসিত গবেষণাগাবগুলি [২] কেন্দ্রীয সবকাবেব নানা দপ্তবেব অধীন গবেষণাগাবসমূহ [৩] বাজ্য সবকাবেব নিযন্ত্রণাধীন গবেষণাগাব [৪] বিশ্ববিদ্যালযেব গবেষণাগাব এবং [৫] বিভিন্ন শিল্পসংস্থা কিংবা অন্য কোনো বেসবকাবী উদ্যোগে পবিচালিত গবেষণাগাব।

এই বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে প্রায বাবো হাজাবেব মতো গবেষক কর্মী নিযুক্ত বযেছেন। এই বিপুলসংখ্যক গবেষণাগাবেব যে কোনো একটিতে উঁকি দিলে হযতো দেখা যাবে কর্মীবা ব্যস্ত, মগ্ন ও আনন্দিত। অন্তত এই ছবিটাই আমবা মনে মনে কল্পনা কবতে ভালোবাসি। কিন্তু ওযাকিবহালবা জানেন অধিকাংশ গবেষণাগাবেই ভেতবেব ছবিটা আজ সম্পূর্ণ বিপবীত। অধিকাংশ কেন্দ্রেই বৈজ্ঞানিকেব দল হতাশ, নিবাশ, ক্ষুব্ধ, বিষণ্ণ। এব একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন-এব অধীন সংস্থাগুলি।

বিজ্ঞানকর্মীদেব মধ্যে এই হতাশাব মূলে অনেকে নানা কাবণকেই উল্লেখ কবে থাকেন। যেমন, গবেষণাব ক্ষেত্রে উপযুক্ত লক্ষ্য, পথনির্দেশ ও সুযোগ্য

নেতৃত্বের অভাব, কর্তৃপক্ষের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, গবেষক কর্মীর কাজের উপযুক্ত সমাদরের অভাব প্রভৃতি। এই পরিবেশের মধ্যে কিছু গবেষককর্মী যেমন কেরিয়ারিজম-এর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, তেমনি আবার কিছু বিবেকবান গবেষক দেশের জনসাধারণের সামগ্রিক অভাব এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের গবেষণাকাজের লক্ষ্যহীনতা ও অপ্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে থাকেন। আবার কেউ ভালোভাবে কাজ করার সুযোগের অভাবে দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে পা বাড়ান। এভাবে বহু ভালো বিজ্ঞানকর্মীকে আমরা হারিয়েছি। এ-প্রসঙ্গে বর্তমানের সবচেয়ে বড় যে ঘটনাটির কথা আমাদের মনে পড়ছে, তা হলো—এ-বছরের শারীরবিজ্ঞান ও ভেষজবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের ঘটনাটি। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানী ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা দুজন আমেরিকান বিজ্ঞানীর সঙ্গে এই পুরস্কার লাভ করেছেন। খোরানা বর্তমানে আমেরিকার নাগরিক। জৈবরসায়নবিদ্যা-সংক্রান্ত তাঁর গবেষণাকাজ যাতে তিনি ভারতবর্ষেই করতে পারেন, তার জন্যে খোরানা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি। কিন্তু ভারতের তৎকালীন বৈজ্ঞানিক-প্রশাসন-বিভাগের নিতান্ত আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের ফলে খোরানা স্বাধীন-ভাবে কাজ করার কোনো সুযোগই পেলেন না। ফলে নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন, তা না হলে আজ ভারতীয় বিজ্ঞানীরূপেই খোরানা বিজ্ঞানজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানটি অর্জন করতে পারতেন।

খোরানার ঘটনা ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে-ছবিটি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে, তা নিয়ে অনেক ভাববার আছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এ-নিয়ে আলোচনাও কম হয় নি। নিছক ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধের জন্যে যেসব বৈজ্ঞানিক কর্মী আমেরিকা বা অন্য দেশে যাচ্ছেন, তাঁদের কথা আমরা ভাবছি না। কিন্তু স্বদেশে কাজের সুযোগের অভাবে, বিজ্ঞানের বৃহত্তম স্বার্থের জন্যে যদি আমাদের প্রতিভাবান বিজ্ঞানীরা বিদেশে যেতে বাধ্য হন, তাহলে ব্যাপারটাকে যথেষ্ট দুঃখজনকই বলতে হবে। সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেই বলবেন, এ-জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞানবিষয়ক নীতির সমস্যা

ভারতের বিজ্ঞানবিষয়ক একটি নীতি থাকা সত্ত্বেও সেই নীতি-পরিচালনার জন্যে কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শবাদ ছিল না বললেই চলে। একটি বিজ্ঞানবিষয়ক নীতি গঠনের জন্যে যে পরিমাণ খবর, তথ্য, পরিসংখ্যান এবং

অন্যান্য বিষযেব প্রযোজন হযে পড়ে, তা যোগানোব মতো একটি উপযুক্ত সংস্থাও ঐ নীতি তৈবিব সময গড়ে ওঠে নি। অনেকে বলেছেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণাব খাতে অর্থেব বিনিযোগকে জাতীয আযেব শতকবা ০৫ ভাগ থেকে বাড়িযে শতকবা এক ভাগ কবা হোক। কিন্তু এই পবিমাণ অর্থকে কাজে লাগানোব মতো উপযুক্ত গবেষণাব ক্ষেত্র ভাবতে এখনো তৈবি হযেছে কিনা, এ-প্রশ্ন নিশ্চযই উঠবে। অনেক বেশি অর্থ নিযোগ কবলেই যে বেশি কাজ বা ফললাভ কবা যাবে, এমন কোনো কথা নেই। এ পর্যন্ত আমাদেব দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা যে-পথে চলেছে, জাতীয অর্থনীতিব বিকাশেব গতি-প্রকৃতিব সঙ্গে তাব কোনো সঙ্গতি নেই। এব ফলটা যে কতখানি ক্ষতিকাবক হযেছে, তা সহজেই অনুমান কবা যায।

বিজ্ঞানবিষযক নীতিব অভাবটা বৈজ্ঞানিক কর্মীদেব ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধাবণেব ব্যাপাবেও গুরুতব ত্রুটিপূর্ণ হযে দেখা দিযেছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপাবটা বোঝা যাবে। ভাবতেব এক বিবাট এলাকাব জবিপেব কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয নি। ভাবতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভূ-বিদেব সংখ্যা হলো পাঁচ হাজাবেব মতো, প্রযোজনেব তুলনায যা খুবই কম বলা যেতে পাবে। অথচ নিতান্ত আশ্চর্যেব ব্যাপাবটা হলো এই যে, বেশ কযেকজন শিক্ষিত ভাবতীয ভূ-বিদ বেকাব অবস্থায বযেছেন। অন্যদিকে ভাবতে ভূতাত্ত্বিক জবিপেব কাজ কযেকটি বিদেশী কোম্পানিকে দেওযা হযেছে, যাব ফলে বেশ কযেক কোটি বৈদেশিক মুদ্রা প্রতি বছব আমাদেব হাবাতে হচ্ছে।

অর্থনৈতিক পবিকল্পনাব ভিত্তিতেই বিজ্ঞানকর্মীব প্রযোজনীয সংখ্যাকে নিরূপণ কবা হযে থাকে। কিন্তু পবিকল্পনাব নকশা, পবামর্শ এবং ভাবী যন্ত্রপাতি সবই বিদেশ থেকে আনানো হচ্ছে, সেখানেই যত গোলযোগেব মূল।

ভাবতেব শিল্পক্ষেত্রে বিকাশলাভেব জন্যে বৈদেশিক সহযোগিতা এবং দেশেব আভ্যন্তবীণ গবেষণাকাজ—এ-দুটিবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বযেছে। এ-দুটি বিষয যখন পবস্পবেব পবিপূবক হযে দাঁড়ায, নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্তভাবে, তখন তা বিপুল পবিমাণে ফলপ্রসূ হযে ওঠে। কিন্তু যখন বৈদেশিক সহযোগিতাব চাপে দেশেব গবেষণাকাজ অপাংক্তেয হযে পড়ে বা গুরুত্ব হাবিযে বসে, যেমন ভাবতে ঘটছে, তখন তাব ফলটা খুবই শোকাবহ হযে দাঁড়ায। এমন কি জাপানও বাইবে থেকে প্রযুক্তিবিদ্যা বা কাবিগবী সহযোগিতাকে আমদানি কবে বটে, কিন্তু নিজেব দেশেব গবেষণাব বিকাশেব জন্যে তুলনামূলকভাবে পাঁচ-ছ গুণ

বেশি অর্থ ব্যয় করে থাকে। জাপান আজ পর্যন্ত কোনো প্রযুক্তিবিদ্যাকেই হুবহু আমদানি করে নি।

ভারতের ভারী শিল্পে লগ্নির পরিমাণ হলো প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা। এখানে অতিরিক্ত পুঁজির বিনিময় ঘটেছে বলা যায়, কারণ এই পুঁজির মোট সামর্থ্য বা capacity-র প্রায় শতকরা সত্তর ভাগ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে, অথচ ভারতকে প্রতি বছর বিদেশ থেকে ছশ কোটি টাকার মতো যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হচ্ছে। এর অর্ধেক সামর্থ্যকেও কাজে লাগাতে পারলে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি দূর হতে বেশি সময় নেবে না।

বিদেশ থেকে প্রযুক্তিবিদ্যা ধার করা যেতে পারে, কিন্তু তাকে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমব্যবস্থার মাধ্যমে কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু দেশের গবেষণাকে উন্নত পর্যায়ে না এনে ভারত সরকার বারেবারে বৈদেশিক সহ-যোগিতার পথই বেছে নিয়েছেন। নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানির জন্যে যে সব সময়ে বৈদেশিক সহযোগিতার পথ বেছে নেওয়া হয়েছে তা অবশ্য নয়, বরং সরকারী নিষ্ক্রিয়নীতির ফল স্বরূপ দেশে পুঁজিসংগ্রহে ব্যর্থ হয়েই সরকারকে অনেক সময় ঐ পথ গ্রহণ করতে হয়েছে।

ভারতের সর্ববৃহৎ গবেষণা-সংস্থা

গবেষককর্মীদের মধ্যে যে-হতাশার কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছিলাম, তার সবচেয়ে চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় কাউনসিল অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড সায়েন্টিফিক রিসার্চ (CSIR)-এর গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে। এই সংস্থাটি গড়ে উঠেছিল ১৯৪২ সালে, কিন্তু ১৯৫০-এর দশকেই এর দ্রুত বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। বর্তমানে প্রায় ত্রিশটি জাতীয় গবেষণাকেন্দ্র এই সংস্থার অধীনে রয়েছে এবং প্রায় তিন হাজার গবেষক কর্মী সেগুলোতে কাজ করছেন। দেশের মানুষ প্রধানত CSIR-এর কাজের ভিত্তিতেই ভারতীয় বিজ্ঞান-গবেষণার গতিপ্রকৃতিকে বিচার করে থাকেন।

CSIR সংস্থাটি দেশের শিল্পসংস্থাগুলোকে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্যেই গড়ে উঠেছিল। ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত দেখা গিয়েছে, ভারতের শিল্পক্ষেত্রে যতটুকু বিকাশ ঘটেছে, তাতে এই সংস্থাটির কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। জাতীয় গবেষণাকেন্দ্রগুলির কাজের ধারা ফলে একটা লক্ষ্যহীন অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৬১-৬৬) সালে CSIR সংস্থাটি দেশের

শিল্পগত বিকাশেব ক্ষেত্রে ভাবতীয় বিজ্ঞান ও কাবিগবী অবদানেব এক জোবালো প্রভাবকে কার্যকবী কবে তোলাব জন্যে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এব জন্যে এক পবিকল্পনাভিত্তিক গবেষণাকাজকে চালু কবা হলো এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে আমলাতান্ত্রিক পবিবেশকে অপসাবিত কবে তরুণ বিজ্ঞানীদেব দাযিত্বশীল পদে বসানো হলো। CSIR ও বিভিন্ন শিল্পসংস্থাগুলিব এক মিলিত সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হলো। চাবিদিকেই বেশ একটা উৎসাহেব আবহাওযা। বিদেশ থেকে আমদানি কমিযে একটি আত্মনির্ভবশীল অর্থনীতিকে গডে তোলবাব তাগিদ সবাই অনুভব কবলেন। বিদেশ থেকে প্রতিভাবান ভাবতীয বিজ্ঞানীদেব দেশে ফিবিযে আনবাব জন্যে একটি 'scientists' pool'-ও তৈবি কবা হলো।

কিন্তু এই উৎসাহেব আবহাওযা বেশিদিন টিঁকল না। ভাবতেব মুদ্রামূল্য-হ্রাস এবং প্রায ঢালাও আমদানি-নীতি চালু কবাব ফলে, দেশেব উৎপাদনেব সাহায্যে বিদেশ থেকে আমদানিব জাযগা পূর্ণ কবা এবং স্ব-নির্ভব অর্থনীতিব শ্লোগানগুলো খুব তাডাতাডি হাওযায মিলিযে গেল। বিজ্ঞানীদেব pool-টিও আকাবে ছোট হযে এলো। CSIR-এব আভ্যন্তবীণ গলদেব ব্যাপাব নিযে চাবিদিকে নানা কথাবার্তা শুরু হলো এবং তাব অনুসন্ধানেব জন্যে পার্লামেণ্ট থেকে এক কমিটি নিযোগ কবা হলো। এই কমিটিব কাজ এখনো চলছে।

CSIR-এব অধীনস্থ বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্রেব বৈজ্ঞানিক পবামর্শ গ্রহণেব ব্যাপাবে আমাদেব দেশেব শিল্পসংস্থাগুলো যে কখনোই বিশেষ উৎসাহ বোধ কবে নি, তা একটি তথ্য থেকেই ধবা পডবে, জাতীয মোট পবামর্শেব শতকবা মাত্র '০০১ ভাগ ওবা CSIR-এব কাছ থেকে গ্রহণ কবেছে, বাকি সবটাই বিদেশ থেকে পাওযা। ব্যাপাবটা যে খুবই দুঃখজনক, সে বিষযে কোনো সন্দেহ নেই।

বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা

কিছু কিছু জাতীয গবেষণাগাব আমাদেব দেশেব বিপুল সম্পদকে কাজে লাগানো এবং তাব বিকাশ সাধনেব জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ কবেছেন। জাতীয গবেষণাগাবগুলি এ-পর্যন্ত ৩৫০টিব মতো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিব উদ্ভাবন কবেছেন, যাব মধ্যে ২২৫টি ব্যবহাবিকভাবে কাজে লাগানোব পর্যাযে বযেছে। দেশেব বিভিন্ন শিল্পসংস্থা এব মধ্যে মাত্র ৮৫টিকে নিযে কাজে লাগিযেছে। নতুন

কোনো পদ্ধতিকে ব্যবহার করা সম্পর্কে সঙ্কোচ ওরা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি বলেই মনে হয়।

অন্যতম জাতীয় গবেষণাকেন্দ্র দিল্লীর ন্যাশনাল ফিজিকাল ল্যাবরেটরি ইলেকট্রনিক সাজসরঞ্জাম এবং কার্বনজাত বস্তু তৈরির ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। এখানে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী দেশের রেডিও, টেলিফোন, র‍্যাডার, টেপ রেকর্ডার, কমপিউটার প্রভৃতি যন্ত্রনির্মাতাদের চাহিদা মেটাচ্ছে। পিলানিতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিকস এঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট দেশে তৈরি উপাদানের সাহায্যে টেলিভিশন গ্রাহকযন্ত্র তৈরির ব্যবস্থা করেছেন।

কলকাতার কেন্দ্রীয় 'গ্লাস অ্যাণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট' যে অপটিকাল কাঁচ তৈরি করেছেন, তা অণুবীক্ষণ দূরবীন ও ক্যামেরা প্রভৃতি যন্ত্রের লেন্স ও প্রিজম তৈরির কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। এই গবেষণাকেন্দ্রটি বর্তমানে গোটা দেশের অপটিকাল কাঁচের সমগ্র চাহিদাকে মেটাচ্ছে। আমাদের দেশের ইস্পাত কারখানাগুলির অতি উচ্চ তাপবিশিষ্ট ফার্নেসের জন্যে অভ্রের ইনসুলেটিং ব্রিক্‌স্ তৈরি করে এই কেন্দ্রটি বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিয়েছেন।

এ-ছাড়া নিজস্ব ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে দেশের শ্রমশিল্পের প্রয়োজনীয় চাহিদার অনেকটা মিটিয়েছে যে-জাতীয় গবেষণাগারগুলি, তারা হলো—জামশেদপুরের ন্যাশনাল মেটালার্জিকাল ল্যাবরেটরি, মহীশূরের কেন্দ্রীয় ফুড টেকনলজিকাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, লক্ষ্ণৌর কেন্দ্রীয় ড্রাগ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, পুনার ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি, ধানবাদের কেন্দ্রীয় ফুয়েল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, নতুন দিল্লীর কেন্দ্রীয় রোড রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এবং রুরকির কেন্দ্রীয় বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

ইণ্ডিয়ান কাউনসিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ-এর অধীনস্থ গবেষণাকেন্দ্রগুলি কৃষিক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক কাজ করেছেন। ভারতে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের এক বিরাট সামর্থ্য রয়েছে, যার অনেকটাই কাজে লাগানো যায় নি। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় জলবায়ু, জমির প্রকৃতি এবং আবহাওয়ার মধ্যে বিরাট তারতম্য দেখা যায় এবং ভারতের জলসম্পদ যদিও অপর্যাপ্ত, তবুও এখানকার জমি অল্প কিছুদিন বাদেই জৈবপদার্থ হারিয়ে উর্বরাশক্তির বিচারে দুর্বল হয়ে পড়ে। কৃষিবিজ্ঞানীরা তাই সকল দেশের মধ্যে একটি সামগ্রিক ও

বহুমুখী পবিকল্পনা নিযে কাজে নেমেছেন। তাঁবা প্রজননবিদ্যাব পদ্ধতিতে গবেষণাগাবে এমন এক জাতেব বীজ তৈবি কবতে পেবেছেন, যা চাষ কবতে কোনো ঋতুসাপেক্ষ বাধ্যবাধকতা নেই, যে কোনো জমিতে এদেব বপন কবা চলবে এবং খুব কম সময়ে এবা ফসল ফলাতে পাববে। এইসব বীজেব থেকে ফসলেব পবিমাণও হবে অনেক বেশি—প্রতি হেকটবে ৮৫ থেকে ৯০ কুইণ্টালেব মতো।

কৃষিবিজ্ঞানীবা একই জমিতে তিনটি থেকে চাবটি ফসল ফলানোব উপাযও উদ্ভাবন কবেছেন, যাব ফলে প্রতি হেকটব জমি থেকে ২৫ টনেব মতো ফসল পাওযা যাবে। এইসব ফসলেব বোগ-প্রতিবোধক ক্ষমতা যেমন অনেক বেশি হবে, তেমনি সাধাবণ ফসলেব তুলনায প্রোটিনেব পবিমাণেও এবা বেশি সমৃদ্ধ হবে। এই নতুন পদ্ধতিতে চাষেব কাজ কবতে পাবলে আবহাওযাব খাম-খেযালিপনাব ওপব নির্ভব কবাব প্রযোজন থাকবে না।

বৈজ্ঞানিক গবেষণাব যে-ক্ষেত্রটিতে ভাবতেব দ্রুত সমৃদ্ধি সাবা পৃথিবীব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছে, সেটি হলো পাবমাণবিক শক্তি। হোমি ভাবাব নেতৃত্বে ও প্রেবণায বোম্বাই শহবেব কাছে ট্রম্বেতে যে পবমাণু গবেষণাকেন্দ্রটি গডে উঠেছিল, আজ তা ভাবতেব শ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ গবেষণাকেন্দ্রে পবিণত হযেছে। গবেষণাকেন্দ্রটি বর্তমানে ভাবাব নামাঙ্কিত।

বর্তমানে ভাবতে তিনটি পাবমাণবিক বিঅ্যাকটব যন্ত্র বযেছে। এগুলো নিযে যেমন গবেষণাকাজ চলেছে, তেমনি এদেব মধ্যে তেজস্ক্রিয আইসোটোপ তৈবি হচ্ছে। এইসব আইসোটোপ ভাবতেব কৃষি, শিল্প, ভেষজবিজ্ঞান এবং বিভিন্ন গবেষণাব ক্ষেত্রে যেমন কাজে লাগছে, তেমনি এশিযা, আফ্রিকা এবং ইযোবোপেব বিভিন্ন দেশে এই আইসোটোপ বপ্তানিও কবা হচ্ছে।

ইণ্ডিযান অ্যাটমিক মিনাবেলস ডিভিশন জামশেদপুবেব কাছে যদুগুদাতে ভাবতে প্রথম ইউবেনিযাম আবিষ্কাব কবাব পব, পাবমাণবিক শক্তিব এই মূল্যবান জ্বালানীটিকে কাজে লাগাবাব পর্যাযে আনবাব জন্যে ভাবতীয বিজ্ঞানীবা একটি কাবখানা তৈবি কবেছেন। এছাডা কেবালাব উপকূলেব বালি থেকে যে থোবিযাম পাওযা গেছে তাকে কাজে লাগাবাব জন্যে কেবালাব আলওযেতে একটি কাবখানা বসানো হযেছে। পাবমাণবিক শক্তিব জ্বালানী তৈবিব কাজে থোবিযামেব ভূমিকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাবমাণবিক শক্তিব আব-একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানী প্লুটোনিযামকে অন্যান্য মিশ্র উপাদান

থেকে আলাদা কবাব জন্যে একটি কাবখানা চালু কবা হযেছে। পাবমাণবিক বিঅ্যাকটবে ব্যবহৃত জ্বালানীব মধ্য থেকে প্লুটোনিযামকে বাব কবে আনাব পদ্ধতিকে পৃথিবীব যে পাঁচটি দেশ কার্যকবভাবে চালু কবেছে, ভাবতবর্ষ তাদেব মধ্যে অন্যতম।

ভাবতে বর্তমানে তিনটি পাবমাণবিক শক্তিকেন্দ্র তৈবি হচ্ছে, যেখানে পাবমাণবিক বিঅ্যাকটবেব মধ্যে সঞ্চিত তাপশক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তবিত হবে। প্রথমটি তৈবি হচ্ছে গুজবাটেব তাবাপুবে, ১৯৬৯ সালেব মধ্যেই এটি চালু হবাব কথা—দ্বিতীযটি বাজস্থানেব কোটা-ব কাছে বাণা প্রতাপসাগবে এবং তৃতীযটি মাদ্রাজেব মহাবলীপুবমেব কাছে কলপাক্কমে। এই দুটি পাবমাণবিক শক্তিকেন্দ্র তৈবিব কাজ ভাবতেব 'চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনা'ব শেষেব দিকে (১৯৭০-৭১ সাল নাগাদ) সম্পন্ন হবে।

ভাবতেব তিনটি পাবমাণবিক শক্তিকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ তৈবিব মোট সামর্থ্যেব পবিমাণ হবে ১১৮০ মেগাওযাটেব (এক মেগাওযাট = ১০ লক্ষ ওযাট) মতো। আশা কবা হচ্ছে, এবা ভাবতেব তিনটি শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলেব ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎশক্তিব চাহিদা মেটাবে।

মহাকাশ গবেষণা

পৃথিবীব পাবমাণবিক মানচিত্রে যে-মানুষটি ভাবতকে প্রতিষ্ঠিত কবেছেন, সেই হোমি ভাবাব জীবনেব সর্বশেষ প্রচেষ্টায ভাবত আজ মহাকাশ গবেষণাব ক্ষেত্রে পৃথিবীব অন্যান্য বিজ্ঞানসমৃদ্ধ দেশগুলিব অংশীদাব হতে পেবেছে।

ভাবতেব দক্ষিণপ্রান্তে ত্রিবান্দ্রামেব কাছে থুম্বাতে একটি মহাকাশ গবেষণা-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। থুম্বা পৃথিবীব ভূ-চৌম্বক বিষুববেখাব ওপব অবস্থিত। পৃথিবী থেকে বেশ খানিকটা দূবত্বে এই বিষুববেখাব ওপব একটি বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হয। এই বিদ্যুৎস্রোতেব প্রবাহ এবং ঊর্ধ্বাকাশে বাযুমণ্ডলেব গতিবিধি ও তাপমাত্রা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কবাব জন্যে থুম্বা থেকে মাঝে মাঝে রকেট ছোঁড়া হচ্ছে। প্রথম বকেটটি পাঠানো হয়েছিল ১৯৬৩ সালেব ২১শে নভেম্বব। ঐ বকেটটি অবশ্য ভাবতে নির্মিত ছিল না। আমেবিকা, সোভিযেত ইউনিযন, ফ্রান্স প্রভৃতি পৃথিবীব কযেকটি বিজ্ঞানসমৃদ্ধ দেশ থেকে এব 'প্রযোজনীয' সামগ্রী পাওযা গিযেছিল, ভাবতীয বিজ্ঞানীবা সেগুলোকে একত্র কবে বকেটটিকে ঊর্ধ্বাকাশে পাঠাবাব উপযোগী কবে তোলেন।

এ-বছব গত ৩১শে আগস্ট থুম্বা থেকে বোহিনী নামে দুটি বকেট ছোঁড়া

হয়েছে। ঘটনাটির বিশেষত্ব হলো এই, রকেটদুটির সমগ্র অংশ ভারতীয় বিজ্ঞানীরা দেশেই তৈরি করতে পেরেছেন। দুই-স্তরবিশিষ্ট ঐ রকেটদুটি পৃথিবী থেকে ৬০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত পৌঁছয় এবং ওদের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে।

থুম্বার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যে শান্তিপূর্ণ কাজে মহাকাশ গবেষণায় সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কয়েক মাস আগে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে থুম্বাকেন্দ্রটি রাষ্ট্রসংঘের হাতে সমর্পণ করেন। থুম্বা বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক আবহাওয়া-গবেষণাকেন্দ্ররূপেও গড়ে উঠেছে। সেখানে এ-পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা একসঙ্গে কাজ করে চলেছেন।

মহাকাশে পরিক্রমারত পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহদের সঙ্গে বেতারের মাধ্যমে সংবাদ আদানপ্রদানের জন্যে ভারতে একটি গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টা হোমি ভাবাই করে গিয়েছিলেন। গত প্রায় দু-বছর আগে আমেদাবাদে যে 'এক্সপেরিমেন্টাল স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনস' আর্থ স্টেশন'টি গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে ভাবার স্বপ্ন বাস্তবে রূপলাভ করেছে। এই কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহদের কাছ থেকে বেতার ও টেলিভিশনের সঙ্কেত সংগ্রহ করে সেগুলিকে বিশ্লেষণের কাজ করে চলেছেন।

বিশুদ্ধ গবেষণার ধারা

ভারতের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলির কাজের খানিকটা পরিচয় আমরা আগের আলোচনার মধ্য দিয়ে গ্রহণ করবার চেষ্টা করলাম। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গবেষণাগার ও সমস্থানীয় গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে যে গবেষণা চলেছে, তা নিয়েও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। প্রযুক্তিবিদ্যা বা কারিগরীবিদ্যার ক্ষেত্রে যেমন অনেককাল আগে আবিষ্কৃত একটি পদ্ধতি বা বস্তুকে নতুন করে আবিষ্কার করার কাজকে আমরা তারিফ করতে পারি না, তেমনি অন্য কোনো দেশে বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ বা তত্ত্বীয় ক্ষেত্রে নিষ্পন্ন কোনো কাজের দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ ভাষ্য তৈরির প্রচেষ্টাকেও সাধুবাদ দেওয়া যায় কি? অবশ্য বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ তত্ত্বের ক্ষেত্রেও সব কাজকে এক পংক্তিতে ফেলা যায় না। এই বিভাগেও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের দেখা হয়েছে এবং বাইরের বিজ্ঞানজগতে কিছুটা স্বীকৃতিও লাভ করেছে, কিন্তু সে জাতীয় কাজের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

ভারতের মতো একটি অনুন্নত দেশে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণাও যে একটা ভুঁইফোড় বস্তু হয়ে উঠতে পারে না, সেটা অনুধাবন করার সময় নিশ্চয়ই এখনো পেরিয়ে যায় নি। বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে যে অর্থব্যয় করছি, দূরভবিষ্যতে দেশের উৎপাদন এবং সম্পদবৃদ্ধির কাজে তা কতটুকু কার্যকরী হবে, আজ যেমন এ-প্রশ্ন উঠেছে, তেমনি আর-একটা প্রশ্নও উঠেছে যে এই খাতে বর্তমানে যে খরচটা হচ্ছে, তা যথেষ্ট সুষ্ঠুভাবে এবং যোগ্যতার সঙ্গে করা হচ্ছে কি না।

অনেকে বলবেন, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণার সঙ্গে তার প্রয়োগের প্রশ্নটাকে আবার টেনে আনা কেন। এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। পৃথিবীর অন্যান্য বিজ্ঞানসমৃদ্ধ দেশগুলোতেও এ নিয়ে তাঁরা ভাবছেন। ঐ দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে প্রয়োগের জন্য তুলনামূলক অর্থব্যয়ের একটা হিসেব দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আমেরিকাতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে যত অর্থব্যয় হয়, ঐ গবেষণাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্যে তার তিনগুণ বেশি অর্থ খরচ করা হয়ে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নে দুই দিকে ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় সমান সমান এবং ব্রিটেনে এই অনুপাত কিছুটা কম। ভারতে বিজ্ঞান-গবেষণার যা ব্যয়, তার প্রয়োগের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ সে তুলনায় অতি সামান্য।

আসল কথাটা হলো, দেশের সমস্যাগুলোকে ভুলে গিয়ে, বিশুদ্ধ বা প্রয়োগগত—বিজ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রেই গবেষণার ধারা তৈরি হতে পারে না। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান এশিয়ার মধ্যে একমাত্র ইন্দোনেশিয়াকে বাদ দিয়ে আর প্রায় সব দেশেরই তলায় রয়েছে। অথচ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিকাশের বিচারে এশিয়ার মধ্যে জাপান ও চীনের পরেই ভারতের স্থান। ভারতের এই যে একটা অসঙ্গতির চেহারা, এটা নিয়ে বাইরের দুনিয়ার কাছে আমাদের গর্ব করবার মতো কিছু নেই।

'ক্যাস্টেসিয়া'

গত আগস্ট মাসে দিল্লীতে এশিয়ার উন্নতিশীল দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশের সমস্যা নিয়ে 'ইউনেস্কো'র আহ্বানে এক সম্মেলন বসেছিল। এশিয়ার চব্বিশটি দেশের প্রতিনিধি এতে উপস্থিত ছিলেন; এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ ও কয়েকটি

আন্তর্জাতিক সংস্থাও এই সম্মেলনে পরিদর্শক পাঠিয়েছিলেন। দশদিনব্যাপী সম্মেলনে অনেক কথাবার্তা হয়েছে, অনেক প্রস্তাব পাশ হয়েছে, বৈঠকও অনেক হয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিকাশের বিচারে পৃথিবীর শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির তুলনায় উন্নতিশীল দেশগুলি নাকি এতটাই পেছনে পড়ে আছে যে ব্যাপারটা ক্রমেই দৃষ্টিকটু ঠেকছে। এই ফাঁকটা পূরণের জন্যে দিল্লীর 'ক্যাস্টেসিয়া' সম্মেলন থেকে কিছু রাস্তা বাতলে দেবার চেষ্টা হয়েছে। এই রাস্তায় চলবার মতো প্রস্তুতি ও সামর্থ্য ভারতের রয়েছে কিনা, তা হয়তো দেশের নেতারা ঠিক করবেন। তবে দেশের সাধারণ মানুষ বড় বড় সম্মেলনের সংখ্যাতত্ত্বের হিসেব ও মারপ্যাঁচ বড় একটা বোঝেন না, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কিছুটা আঁচ গায়ে লাগলেই তাঁরা খুশী হবেন।

সরোজ আচার্য

গোপাল হালদার

"সরোজ আচার্য নেই"—পনের দিন পূর্বেও কথাটা ছিল অকল্পনীয়। পনের দিন পরেও মনে হয় অবিশ্বাস্য। আরো অনেক পনের দিন লাগবে কথাটা সহনীয় হয়ে উঠতে। অন্তত আমাদের কারও কারও পক্ষে। আমার সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক, তাতে এখনো শুধু সেই আর্তবাণীই বারে বারে মনে আসে যা তাঁর ও আমার স্নেহভাজন অনুজ প্রদ্যোৎ গুহ স্মরণ করেছেন:

> I weep for Adonais—he is dead!
> O' weep for Adonais though our tears
> Thaw not the frost which binds so dear a head.

—So dear a head, and heart সেই বুদ্ধি-সমুজ্জ্বল বিনম্র প্রতিভা, শান্ত সরস প্রীতির আধার সেই স্নিগ্ধ হৃদয়। সরোজ আচার্যকে হারানোর অর্থ আমার হৃদয়-মনের শুভ্রতম এক কেন্দ্রভূমি থেকেই আমার নির্বাসন।

বয়সে অবশ্য সরোজ আচার্য আমার অপেক্ষা তিন-চার (কিংবা পাঁচ?) বছরের ছোট ছিলেন। প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের কৈশোরে হয় নি, যৌবনেও প্রায় না। আমাদের সান্নিধ্য সম্ভব হয় আমি যখন প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সম্মুখীন, আর তাঁরও মধ্যযৌবন অংশত অতিক্রান্ত। তার পরেকার এই পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর—যে যেখানেই থাকি, দূরে বা নিকটে—আমাদের আশা-নিরাশা-স্বপ্ন ও সঙ্কট আলোড়িত প্রৌঢ়-চেতনার কাল। অবসর তাঁরই ছিল কম, সংসারের ও জীবিকার নানা দায়ে অবকাশহীন ছিল তাঁর দিন-রাত্রি। তথাপি সেই পরিশ্রম-চিন্তা ও কর্মভারের মধ্যেও শুধু আমি কেন, পরিচিত সকলেই ছিলেন তাঁর কাছে স্বাগত। অবাধে লাভ করেছি তাঁর সঙ্গ, তাঁর আতিথেয়তা। তাঁর প্রতিভা ও প্রীতি সকল সংশয় ও সঙ্কটের মধ্যে আমাকে বরাবর দিয়েছে একান্ত আশ্রয়, আত্মপরীক্ষার ও বিশ্ববীক্ষার সুস্থির অবকাশ। অনেক স্বচ্ছন্দ বা অবসন্ন সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে বসে কাপের পর কাপ চা ও প্লেটের পর প্লেট খাবার শেষ করতে করতে একসঙ্গে দেখতে চেয়েছি আমাদের কালের মুখচ্ছবি, দিশাহারা দেশের আত্মপ্রবঞ্চিত রূপায়ণ। জানতে চেয়েছি "ততঃ কিম্?"

নীববে প্রার্থনা কবেছি "ধিযো যো ন প্রচোদযাৎ।" শেষে বিদায যখন নিয়েছি, বিদায নিযেছি আত্মাব আত্মীযতায স্নিগ্ধ হযে সঞ্জীবিত চেতনায, অনেকগুলি অবিস্মবণীয মুহূর্তেব সার্থক দান সঙ্গে নিযে।

সেই ব্যক্তিগত সম্পর্কেব ক্ষেত্রে সবোজ আচার্য অপবিমেয এবং এখানে আলোচ্য নন। 'পবিচয'-এব সঙ্গে সবোজ আচার্যেব পবিচযেব অধ্যাযটিই শুধু আমবা এখানে স্মবণ কবতে পাবি।

সবোজ আচার্য নেই, 'পবিচয'-এব পাঠকেবা যথাসময়ে সে-সংবাদ জেনেছেন। সংবাদ হিসেবে তাব অর্থ যে কী, সম্ভবত 'পবিচয'-এব পাঠকদেব তা খানিকটা অনুভব কবা অসাধ্য হযনি। প্রায বিশ বৎসবকাল 'পবিচয' প্রাযই তাঁব স্বাক্ষব বহন কবেছে, আব সে-স্বাক্ষব প্রতিবাবই সে-পত্রেব পৃষ্ঠা থেকে মন-বুদ্ধি-চিন্তায ফুটে উঠত। পিছনেব সংখ্যাগুলিব পৃষ্ঠা ওল্টালে সহজেই তাঁবা বুঝতে পাববেন—'পবিচয' কী বন্ধুকে হাবিয়েছে।

অথচ 'পবিচয'-এ তিনি কতটুকুই বা লিখবাব অবকাশ পেযেছেন? সেজন্য আমবাও এক অর্থে দাযী। বহু ভাব-পীড়িত এই বন্ধুকে 'পবিচয' তাব দাবি জানিযে আবও পবিশ্রান্ত কবতে সর্বদাই সঙ্কুচিত বোধ কবেছে, লেখাব জন্য তাঁকে তাড়না কবতে আমবা ছিলাম অসমর্থ। জানতাম আপন অমাযিক স্বভাবেব জন্য তিনি প্রায কোনো পত্রিকাব অনুবোধই উপেক্ষা কবতে পাবতেন না। 'পবিচয' জানত তাঁব বিশ্রামেব প্রযোজন কত বেশি, আব তা থেকে তিনি কত বঞ্চিত। নিজেব শুধু সময নয—স্নায়ু ও আয়ু ক্ষয কবেও যিনি ভদ্রতাব দেনা শুধতেন, তাঁকে আবও উদ্ব্যস্ত কবা শুধু অবিবেচনা নয—মনে হয়েছে অপবাধ, শুধু আপনজনেব প্রতি অত্যাচাব নয—দেশেব এবং সাহিত্যেব প্রকৃত সম্পদেবও অপচয। সে মূঢ়তা থেকে আমবা হযতো সম্পূর্ণ মুক্ত নই—যদিও জানি 'পবিচয' তাঁব সহাযতা পেযেছে সর্বদাই তাঁব অন্তবেব তাগিদে, 'পবিচয'-এব সঙ্গে তাঁব যোগ প্রথমাবধিই নাড়িব যোগ—বুদ্ধিব, যুক্তিব, মনস্বিতাব, সেই সঙ্গে মতাদর্শেব—এবং তাব বেশি—আদি-অন্ত আদর্শেব—যাব থেকে বড বলে সবোজ আচার্য পৃথিবীব অন্য কোনো যোগকেই জীবনে স্বীকাব কবতেন না।

আবাল্য সবোজ আচার্য আদর্শেব দ্বাবা অনুপ্রাণিত। সম্ভবত এই আদর্শ-নিষ্ঠা তাঁব পৈত্রিক উত্তবাধিকাব। যৌবনেব ধ্যান ও কর্মে, বিপ্লবী মতাদর্শ-সন্ধানেও তিনি প্রবুদ্ধ হন যুক্তিনিষ্ঠ আদর্শবাদিতা নিযে। মার্কসবাদেই সবোজ-

বাবু তাঁর সেই আদর্শের সমকালীন রূপ দেখতে পান, প্রাণে-মনে তিনি তা গ্রহণ করেন, যুক্তি-বুদ্ধি নিয়ে আজীবন তার সদ্‌বিচার করেন, আর আমরণ কার্যতও তা আপন বিশিষ্ট ও সীমিত বৈষয়িক জীবনের মধ্যে উর্দ্‌যাপন করে যান। এ-কথা অনেকের নিকট অত্যুক্তি মনে হবে—তা জানি। আমরা সরোজ আচার্যকে তার চেয়েও বেশি জানি বলেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে জোর করে আজ এই কথা বলতে বাধ্য। আমাদের থেকে অনেক বেশি ভালো করেই তিনি জানতেন—মার্কসবাদ ধ্যানের বিষয় নয়, কর্মে তাকে রূপ দিতে হয়, কার্যে তার পরীক্ষা, পৃথিবীর রূপান্তরে তার সার্থকতা। আরও জানতেন, কর্মক্ষেত্রে যেভাবে তা উদ্‌যাপন তাঁর ব্যক্তিগত কামনা ছিল, ঠিক সেভাবে কার্যত তা উদ্‌যাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সে-সাধনা ছিল, সাধ্য হয়নি—অবস্থা তাঁর সাধ্যায়ত্ত ছিল না বলেই।

কিন্তু সমাজতন্ত্রের বিজয়ে তিনি আস্থা হারাননি। আমৃত্যু বিশ্বাস করেছেন: "মোট কথা, বলশেভিজম, কমুনিজম কোন দেশের, দেশের মেহনতী জনসাধারণের প্রকৃত উন্নতি কখনই করতে পারে না, এটাই মার্কস-লেনিনবাদ-বিরোধীরা নানাভাবে প্রচার করছেন এবং করেন। এই বিকৃত বিদ্বেষদুষ্ট প্রচার মূলতঃ মিথ্যা, আজকের সোভিয়েট ইউনিয়নের শক্তিসামর্থ্য,জনজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, সাংস্কৃতিক উৎসাহ তার নিঃসংশয় প্রমাণ। ব্যক্তিগত মালিকানা-ব্যবস্থা ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর আধিপত্য বিলুপ্ত করে জনসাধারণের যৌথ উদ্যোগে সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব ও সার্থক, সোস্যালিজমের এই প্রতিশ্রুতি এককালে ছিল কল্পনার সামগ্রী, আইডিয়া মাত্র। বলশেভিক বিপ্লবের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস এই আইডিয়াকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। একথা বলি না, এই বাস্তব রূপে কোথাও খুঁত নেই, কোন সমস্যা নেই কিংবা থাকবে না। সিডনী ও বিয়েট্রিস ওয়েব যাকে বলেছেন 'নতুন সভ্যতা' তার দিগন্ত এখন সোভিয়েট ইউনিয়নে ও তার বাইরেও বহু দূর প্রসারিত। এটাই আমার আনন্দের কথা।"

['বলশেভিক বিপ্লব'। 'আন্তর্জাতিক'। রুশবিপ্লবের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি ও 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রচিত]

বহু বৎসর বন্দীশালায় কাটিয়ে সরোজবাবু ১৯৩৮এ যখন মুক্তিলাভ করেন, অভাবনীয় সাংসারিক বিপর্যয়ে তিনি তখন অভিপ্রেত রাজনৈতিক জীবনে আর সম্পূর্ণ ফিরে যেতে পারলেন না। অনেকের অনেক ভার তাঁর মাথার ওপরে পড়ে—আরও অনেক ভার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও তিনি বহন করে যান।

আমাদের সমাজের বিকাশ এখনো যে-স্তরে আবদ্ধ, তাতে সে-সব দায়িত্ব তাঁর পালনীয়, মাথা পেতে তা গ্রহণ করতে হয়। সেই কর্তব্যসঙ্কটে বিবেকবানের পক্ষে অনেক দীর্ঘশ্বাস গোপন করেও যথোচিত কর্তব্য-পালন না করে উপায় থাকে না। ৮০ টাকা (?) মাইনের কেরানিগিরি করা—বসে বসে পরীক্ষার্থী ছাত্রদের নাম এক কাগজ থেকে অন্য কাগজে টুকে টুকে তোলা, ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া আত্মসচেতন যুবকের পক্ষে নিশ্চয়ই এমন কিছু লাভজনক বা লোভজনক কাজ ছিল না। অথচ দিনের পর দিন সরোজবাবু তা করেছেন—সেই সঙ্গে ছাত্র পড়িয়ে সংসারের দুর্যোগ কাটাতে চেষ্টা করেছেন, বেনামা নোট লিখে, জীবিকার এমন আরও কত কত সামান্য কাজ করে। অধ্যাপনায় ও সাংবাদিকতায় ক্রমে যখন তিনি অপেক্ষাকৃত স্বস্তিলাভ করলেন, তখনো তাঁর কর্ম-ভার কর্তব্যভার লাঘব হয়নি। সেই কর্মস্থলেও পরিবেশ সর্বদা অনুকূল ছিল না। কারণ, সরোজ আচার্য তখনো ছিলেন মার্কসবাদী—'মার্কসীয় দর্শন'-এর লেখক, সাংস্কৃতিক বিপ্লবী প্রয়াস ও চেতনার পথিকৃৎ, নানা কমিউনিস্ট পত্র-পত্রিকার সদা-সম্মত লেখক, বহুদিন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যও, এবং সেই সভ্যপদ থেকে অব্যাহতি নিয়েও অর্থে-সামর্থ্যে, ভাবে-ভাবনায়, সাধনায়-কর্মে, গোপনে-প্রকাশ্যে চিরদিন সেই পার্টির সহায়ক সহযাত্রী। সেই হিসেবেই সে-পার্টির ভ্রান্তিতে-বিপর্যয়ে ব্যথিত, বেদনার্ত, বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাম্প্রতিক বিভেদে সঙ্কটে শেষ মুহূর্তেও বিচলিত, দেহে মনে আহত। সেই হিসেবেই মার্কসবাদের বিচারে ও আলোচনায় ছিল তাঁর জাগ্রত জিজ্ঞাসা। সে-জিজ্ঞাসায় তাঁর শ্রান্তি ছিল না, মনে ছিল না গোঁড়ামি, তথ্য সংগ্রহ ছিল ব্যাপক, আর সেই সঙ্গে অভ্রান্ত সামগ্রিক চেতনা। তাঁর স্বীকৃত সাংবাদিক দায়িত্ব পালনে দেশীয় ও বৈদেশিক রাজনীতির অত তথ্যনিষ্ঠ বিচার বা যুক্তিনিষ্ঠ সামাজিক প্রয়োগ সম্ভব ছিল না। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড', বা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সেরূপ মুক্তবুদ্ধি রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার অনুকূল ক্ষেত্রও নয়। সরোজবাবুর বিদ্যা-বুদ্ধিকে সম্মান করলেও, নিজেদের নির্দিষ্ট খাঁচার মধ্যে খণ্ডিত করেই তাঁরা তার ব্যবহার করতেন। সরোজবাবু মর্মে মর্মেই জানতেন একালের বুদ্ধিজীবীর এই বিধি-লিপি অখণ্ডনীয় নয়। কিন্তু এই রূঢ় দায়িত্ব পালনেও শিথিলতা বা মিথ্যাচার ছিল তাঁর পক্ষে অভাবনীয়। নামাঙ্কিত বা প্রচ্ছন্ননামীয় সাময়িক লেখাতেই তাঁর রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, সামাজিক নানা চিন্তা কতকটা মুক্তি পেয়েছিল।

খণ্ডিত না হলেও সে-প্রকাশ ঘটত প্রায়ই খণ্ড প্রবন্ধ ও লঘু রচনায়। স্থির প্রকাশের যথার্থ অবকাশ যখন তিনি লাভ করতে যাচ্ছিলেন, আর আমরা অপেক্ষা করছিলাম তাঁর পূর্ণতর দানের জন্য, তখন তিনি বিদায় নিলেন—অকস্মাৎ এবং প্রায় অলক্ষিতে—ঠিক যেমন সাংবাদিক হলেও আজীবন লোকচক্ষুকে এড়িয়ে চলাই ছিল তাঁর জীবন।

আসলে সরোজ আচার্য শুধু সাংবাদিক ছিলেন না। সাংবাদিকতা ঘটনাক্রমে তাঁর জীবিকাবৃত্তি হয়। মূলত তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক, সাহিত্য-সৃষ্টির পুরোহিত। তারও বেশি—সচেতন জীবন-জিজ্ঞাসু, নিরভিমান মানব-প্রেমিক। সেই স্বধর্মবশে স্বদেশীর পথে তিনি পদার্পণ করে, মার্কসবাদে গিয়ে উত্তীর্ণ হন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে পূর্বজীবনের এক জাতীয়তাবাদী স্বদেশী বন্ধু বলেন, "মতের মিল না থাক, পৃথিবীতে কেউ তাঁকে শত্রু ভাবতে পারে নি।" মনে পড়ে মার্কসের সমাধিকালে এঙ্গেলস-এর শেষ উক্তি—"তাঁর সমালোচক ছিলেন অনেকে, কিন্তু তাঁর শত্রু নেই একজনও।" যথার্থ মার্কসবাদীর মানবিক শ্রীও এমনি স্বতঃসিদ্ধ। সরোজ আচার্যের মৃত্যুতে এ-দেশ ভারতবর্ষে সৃষ্টিশীল মার্কসবাদী ভাবনার ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে সৃজনমূলক চেতনার এরূপ এক পুরোধাকেই হারাল।

স্বভাবতই অসম্পূর্ণ ও বিতর্কমূলক এই তিনটি নিবন্ধেব মূল্যায়ন সম্পর্কে আমবা পাঠকদেব সুচিন্তিত মতামত আহ্বান করছি। —সম্পাদক

শারদ-সাহিত্য পরিক্রমা

১

শুধু কোনো এক বছবেব শাবদীয় পত্রেব কবিতা সম্পর্কে আলোচনাব অবাস্তবতা ক্ষমার্হ হতে পাবে এই কাবণে যে, কাব্যগ্রন্থেব সমালোচনা কবিতা-বিশেষ সম্পর্কে দূবত্ব বাঁচিযে আপ্তবাক্য উচ্চাবণেব যে সুযোগ দেয, তা থেকে এখানে অব্যাহতি মিলতে পাবে—অর্থাৎ সত্যিই যেন আমবা কযেকটি গোটা কবিতাব সামনে সবাসবি হাজিব হতে পাবি এবং সামযিক পত্র-পত্রিকা ও তাতে কবিতাব অসম্ভব সংখ্যাপ্রাচুর্যই সুবিধে কবে দেয আলোচনাকে কযেকটি কবিতাব নির্বাচনে সীমাবদ্ধ বাখতে এবং ইচ্ছে কবলে কোনো অসন্তুষ্ট সমালোচকও নেতিবচনকে এড়াতে পাবেন নির্বাচনেব কাবসাজিতে। ইচ্ছে কবলে, এ-থেকে কোনো এক বছবেব অর্থাৎ কোনো এক সমযেব কবিতাব অবস্থা সম্পর্কে সাধাবণ সিদ্ধান্তেও পৌঁছনো যায—যদিও এই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কবিতাব মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে তাতে পৌঁছন কিনা কোনো পাঠক, সন্দেহ, ববং এই ভিডে হাবিযে যায এমন কোনো কবিতাই পবে অন্যসূত্রে তাৎপর্যে ধবা পড়ে, এবকমও দেখা গেছে। সে দিক থেকে ববং কিছু ভালো কবিতা পড়ার তৃপ্তিকেই নিবেদন কবা উচিত—এতদ্দ্বাবা বাঙলা কবিতাব হাল বা তাব মূল্যাযনেব গম্ভীব চেষ্টায না গিযে। তাছাড়া মূল্যবোধ ও নন্দনতৃপ্তিব জটিল দ্বন্দ্বময় সমাধানেব সীমান্তে ব্যক্তিগত রুচিব প্রশ্ন তো আছেই, মাযাকভস্কিব উপদেশে কেউই নিশ্চয আমবা উটকে ঘোড়া হবাব দাবি জানাব না—

আর শারদীয় সঙ্কলনের আশু প্রতিক্রিয়ায় সেই ব্যক্তিগত পছন্দের কৈফিয়তটা তো আরো বেশি বাস্তব—যদিও তার মানে এই নয়, শিল্পের ষাঁড়কে আয়ত্তে আনার লড়াইয়ে যে কবি জীবনের বাস্তবতার শিঙকে ধরতে না পেরে কুপোকাৎ হন কাব্যরূপবিলাসের বিচ্ছিন্ন পক্ষপাতে, তাঁর বিপত্তিতে আমাদের সমর্থন মিলবে কাব্যপাঠের উদার মানসেও।

অবশ্য বিভিন্ন মুখোশের শিল্পবাদীদের কণ্ঠস্বর যেন এবার ক্ষীণ, প্রায় শোনাই গেল না। কোনো কাগজও বোধহয় তাঁদের বেরোয় নি (কৃত্তিবাস বা অলিন্দ)। বোধহয় অগ্ন্যুৎপাত বিস্ফোরণ ইত্যাদি ঘটিয়ে, 'পৃথিবীর শেষ কয়েকটি কবিতা' লেখা শেষ করে তাঁরা বানপ্রস্থ নিয়েছেন, কিংবা অন্যেরা, একই মুদ্রার উল্টো পিঠের কবিরা, কবিতাকে বিশুদ্ধ এবং সূক্ষ্ম করতে করতে নৈঃশব্দ্যের মোক্ষে পৌঁছে গেছেন। এখানে সেখানে হয়তো তাঁদের কচিৎ দেখা মেলে, কিন্তু বড়ই করুণ তাঁদের সেই নিঃসঙ্গ নিঃসহায় অবস্থান। সে অবস্থাতেই চোখে পড়ল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের চিরন্তন বিষয়হীনতা ('বৃষ্টিই কবিতা' : যুগান্তর, 'ধীরে ধীরে, যে ভাবেই হোক' এক্ষণ), সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের একঘেয়ে প্রগল্‌ভতা ('পালিয়ে গেলেও'. এক্ষণ) কিংবা প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের অহেতুক গাম্ভীর্য ('জীবন বিষয়ক' : এক্ষণ)। বরং প্রণবেন্দুর মার্কিনি ধাঁচের 'দৃশ্যের কাছে কৃতজ্ঞ' (অনুক্ত)-র হালকা চাল উপভোগ্য, কিন্তু অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের ঋষিবাক্য ('একটি মৃত্যুর মৃত্যু' : কবিপত্র) বড়ই অবিশ্বাস্য লাগে। (অবশ্য এরকম আয়াসহীন আপ্তবাক্যের চর্চা কনিষ্ঠদেরও নানাভাবে লুব্ধ করে—তারই দৃষ্টান্ত কি একদিকে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের ('ইবলিসের আত্মদর্শন' : কবিপত্র) কিংবা অন্যদিকে পুষ্কর দাশগুপ্তের ('ঘরে' : গল্প-কবিতা) রচনায় ?

এঁদের হালকা, পলকা, আত্মসর্বস্ব, সমগ্রতাবোধবর্জিত অভিজ্ঞতার বন্ধ্যাত্ব ক্রমশ যে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তা খুবই স্বাভাবিক। এর পাশে তবু পরবর্তীদের খোলাচোখকানমন এবং তাঁদের অনুসন্ধানরত কাঁচাপাকা অভিব্যক্তি আমাদের সতেজ ও আগ্রহী করে তোলে। রত্নেশ্বর হাজরার কৌপীন উড়িয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা ('মডেল' : সীমান্ত), গণেশ বসুর পাঁজর ফাটার গান যা বোধের ভিতর প্রতিশ্রুতির মাদল বাজায় ('বাঘবন্দী' : পরিচয়), চিন্ময় গুহঠাকুরতার সুস্থ সহজ অনুভূতি ('তিনটি কবিতা' : কালান্তর), রণজিৎ সিংহের ঐতিহ্যসচেতন শিকড়-সন্ধান ('অনুক্ষণ মনে মোর' : সাহিত্যপত্র), গৌরাঙ্গ ভৌমিকের স্বপ্নভঙ্গের স্বদেশচিন্তা ('পনেরোই আগস্টের বাংলা দেশ' :

এষা), শুভাশিস্ গোস্বামীর সহমর্মী সাবধানবাণীই ('স্বগত সংলাপ' : সাহিত্য-পত্র) ববং এ বছরের শারদীয়া-কবিতা-পাঠকের স্মৃতিতে মূল্যবান সংগ্রহ। ঠিক সমানই কিংবা অল্প কমবেশি স্মরণীয় হয়ে ওঠে তুলসী মুখোপাধ্যায়ের 'ভালোবাসা সমীপেষু' (কালান্তর), অমিয় ধরের 'পদাবলী' (কালান্তর), কবিরুল ইসলামের 'যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে' (নবজাতক), ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'সেরিনেড' (পরিচয়)। অথচ এই তরুণ কবিরা দায়িত্ব-বোধে যে একটুও ন্যূন নন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় অপেক্ষাকৃত পুরনো ও প্রতিষ্ঠিত কবিদের অভ্যাসিকতা ও দ্বিধাগ্রস্ততার কথা মনে রাখলে। শিবশম্ভু পাল ('দুঃখ বিষয়ক স্ববৃত্ত' : পরিচয়), মোহিত চট্টোপাধ্যায় ('ঘুরাই চলচ্ছবি' : এষা)-এর মতো কবিরাও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথ ছেড়ে আত্মসন্তুষ্টিতে আবৃত বলে মনে হয়। তাই তো অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের অপরিচ্ছন্নতা ('সাতষট্টির নভেম্বরে রচিত' : চতুষ্কোণ) কিংবা বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের দুঃখ-বিলাস ('আত্মপরিচয়হীন' : পরিচয়) বা সত্য গুহের ক্রুদ্ধ-ক্ষুধার্ত-প্রভাবিত নৈরাজ্য ('আমাদের কবিতার ব্যাপারে' : কবিপত্র) আমাদের আশাভঙ্গ ঘটায়। ধনঞ্জয় দাশ ('বিচিত্র বাংলা' : চতুষ্কোণ) বা তুষার চট্টোপাধ্যায় ('বেড়া ভেঙে ঘর পালাল' : পরিচয়)-এর রাজনৈতিক ছড়ায় ববং কিছুক্ষণ বিশ্রাম পাওয়া যায়। অমিতাভ দাশগুপ্তের অসামঞ্জস্য এবং মাঝে মাঝেই অপ্রাসঙ্গিক শব্দের ঠোক্করে উন্মার্গগামিতার প্রতি লোভ আমার কাছে অস্বস্তিকর—এবার তবু সাদামাটা কিছু সংযত আবেগের কবিতা, যেমন 'হাত তুলে ধরো' (আন্তর্জাতিক) কিংবা কিছু স্বদেশী কবিতা, যেমন 'পাসপোর্টবিহীন বাংলা দেশ' (কালান্তর, পরিচয়), 'বিশ্বরূপের খুললে ঝাঁপি' (এষা) মনে লাগল। তরুণ সান্যাল ইদানীং শিথিলবিন্যস্ত, বাধাবন্ধহীন ইমাজিস্ট ধরনের কবিতা লিখছেন, যা আমাকে বেশ তৃপ্ত করে। এরকম খোলামেলা কবিতা হয়তো আরো অন্য কেউ কেউ লিখেছেন, এমনকি তরুণবাবুর বিপরীত শিবিরের কেউ কেউ, কিন্তু তাঁদের তুলনায় তিনি অনেক কম ছুৎমার্গী, অনেক বেশি আত্মসমালোচক ও সমগ্রতার সন্ধানী—হয়তো এখনও আগ্রহ বা আকুলতা যতখানি, সমাধান ততটা প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু তাঁর কবিতার এই অপেক্ষাকৃত স্বাধীন অবয়বে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি আঁটে বলে মনে হয়। তাই 'সময় আমার সময়' (কালান্তর)-এর চেয়ে আমার পছন্দ 'কবিতায় যুক্তফ্রন্ট' (সীমান্ত) কিংবা 'পরিস্থিতি' (কবিপত্র)। শঙ্খ

ঘোষ বোধহয় একটিই কবিতা লিখেছেন ('দশমী' ঃ অনুক্ত)। তাঁর বিদেহী কবিতার ঔদাসীন্যে বিব্রত পাঠক ররং খুশিই হবেন গৃহকাতরতার ধরাছোঁয়া জমিতে কবির স্মৃতিতাড়িত ঈষৎ ভাবালুতায়—কিন্তু তাঁর ভক্তরা কি সায় দেবেন এই 'স্থূলতা'য় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বর্জনে ?

রাম বসুর আবেগে সাড়া না দেওয়া মুস্কিল। তাঁর আবেগের পেশল সামর্থ্য ('কোনো বোধ নেই তার' ঃ সীমান্ত) যে কোনো সৎ কবিরই ঈর্ষাযোগ্য।. মিনমিনে ধোঁয়া ধোঁয়া অল্পদম সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতায় তাঁর উত্তেজনা বেশ প্রতিষেধকের কাজই করে। কিন্তু সেইসঙ্গে অতিকথন বর্জন না করার গোঁ যেন তিনি কিছুতেই ছাড়তে রাজি নন ('আমি শুনতে চাই' ঃ পরিচয়)। প্রকৃতি এখনও তাঁর কাছে সতর্ক ক্ষিপ্র অর্থবহ এবং সেই সঙ্গে মেশে বারবার শহুরে কৃত্রিম শৌখিন আচরণের প্রতি ঠাট্টা ('নেপথ্য সংবাদ' ঃ আন্তর্জাতিক)। এই আপোষহীনতার জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞও হই। কিন্তু অভিজ্ঞতার জটিল ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার আগেই ব্যস্ততায় ও সরলতায় ও পুনরুক্তিতে তাঁর আঁকাড়া উত্তেজনা আমাদের সময় সময় বিপর্যস্ত করে ফেলে। ঠিক তেমনি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নৈরাশ্যও যেন আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণে অক্ষম, এত অধৈর্য তাঁর মধ্যে ('তারপর' ঃ পরিচয়)—অথচ তাঁর কাছ থেকেই তো অন্যত্র পাই অসামান্য সুস্থির কাব্যবোধ ('পরিচয়' ঃ ক্রান্তি)। চিত্ত ঘোষের অকালবার্ধক্য ('হেঁটে যাই' ঃ পরিচয়) কিংবা সতীন্দ্রনাথ মৈত্রের লক্ষ্যহীন অস্পষ্টতাও আমাদের আশাহত করে। মণীন্দ্র রায় বোধহয় ক্লান্ত, তাই 'পুরনো তালিকা ছিঁড়ে' (সারস্বত)-র মতো অযত্ন ও যান্ত্রিকতা তাঁরই সাজে—তার পাশে ররং 'হাজার-কার্পাস ফোটে' (পরিচয়)-র তীব্রতা ও আকুতি মর্মে পৌছয়। অরুণ মিত্রও কি ক্লান্ত ? তাই ঘৃণার চেহারা বা আশার চেহারা ফোটাতে এখন তাঁর স্বরান্তর ঘটে ('রাত জেগে' ঃ যুগান্তর) ? ফলে গদ্যকবিতার সঠিক মেজাজ পেতে আমাদের কি তবে শরণ নিতে হবে শুধু লোকনাথ ভট্টাচার্যেরই ('চারটি প্রেমের কবিতা' ঃ সাহিত্যপত্র) ? লোকনাথ-বাবুর কবিতা অবশ্য ক্রমশ সংবেদ্য হয়ে উঠছে অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে ও সমাহারে। এর পাশে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অকিঞ্চিৎকর দার্শনিকতা ('দরজায় নারী-মূর্তি' ঃ অনুক্ত) বড়ই সেন্টিমেণ্টাল ঠেকে।

জ্যেষ্ঠতর কবিরাও হতাশ করেন হঠাৎ হঠাৎ দু-একটি কবিতার আকস্মিকতায়। ব্যতিক্রম বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং পরবর্তী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তবে বীবেন্দ্র চট্টোপাধ্যাযেব বড কবিতাকে মনে হয বড্ড বড এবং ছোট কবিতাকে মনে হয নিতান্তই ক্ষীণ—যদিচ তাঁব স্বদেশী আবেগেব ঢেউ সকলেব মনেই লাগবে ('কৌবব' ঃ এষা)। বিমলচন্দ্র ঘোষ যথাবীতি আমাদেব অনেককেই খুশি কবেন তাঁব মতবাদেব নিষ্ঠায়, ফলে গুরুচণ্ডালী বা বসাভাসও তখন উপেক্ষা কবা চলে ('বিযুক্ত স্মাবক' ঃ পবিচয)। বুদ্ধদেব বসু আজকাল বিলকে অনুবাদ কবছেন ('বুদ্ধ' ঃ এষা), সুতবাং আশা কবা যায তাঁব কবিতায এখন থেকে বিলকেব 'প্রভাব' পডবে বা পডছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রেব কবিতা বচনাব কর্তব্য-বোধ ('কান্না' ঃ অনুক্ত) কাবো চোখে পডেছে কি ?

এ সমস্তব পাশে বিষ্ণু দে-ব অটল চাবিত্র বিস্ময়কব। তাঁব অবিচ্ছিন্ন কাব্যধাবা আজও অপ্রতিহত, এই শবতেও। অনিবার্যতায তিনি আমাদেব তৃপ্ত কবে বাখেন একই সঙ্গে সমসাময়িকতাব দাবি মিটিযে এবং আমাদেব সঙ্কট ও সমাধানেব সঙ্গী ও নির্দেশকরূপে—কখনো অনুবাদে 'লুই জুকোফস্কি' ঃ এষা), কখনো প্রাক্তন বচনাব নতুন অভিঘাতে ('বালখিল্য বচনা' ১৯৩২ ঃ অনুক্ত), কখনো ঈষৎ ভিন্ন চালে, বাবীন্দ্রিক চিত্রধ্যানে ('চাবদশকেব পুবোনো ছবি' ঃ সাহিত্যপত্র) কিংবা প্রকৃতিব অনুকম্পাযী প্রতীকে ('বৃষ্টি সাবিত্রীক গান কবে' ঃ সীমান্ত) এবং কখনো আমাদেব দ্বন্দ্বময় সমগ্রতাব উপলব্ধিব বিন্যাসে ('এক প্রতিভাসে' ঃ কালান্তব, 'যেন জনৈকা মার্কসীযা' ঃ পবিচয)—অথচ কি সেই সহজ অনিবার্য সমাধান, দীর্ঘ জটিল তৃপ্তিহীন পথ-পবিক্রমাব শেষে যা আমাদেব ব্যাপকতম অভীপ্সাকে পূর্ণ কবতে পাবে—প্রতিটি শব্দগুচ্ছে, প্রতিটি চিত্রে সেই সমাধান সম্পূর্ণ হয আমাদেব প্রত্যহেব সচেতনতায ও অনুভূতিতে, ভবিষ্যৎ কল্পনায ও বিশ্বাসে।

"সে উপমা কবে তুমি তুলে নেবে, সর্বব্যাপী মাতৃসমা,
প্রত্যহেব আশাভঙ্গে ও আশায সমুত্তীর্ণ দুই বাহুপাশে
ব্যর্থ ও সার্থকে এক, এক প্রতিভাসে ?" ['এক প্রতিভাসে']

"কি ক'বে মালতী হল যে পিযালী-স্বযং।
কোন্ শক্তিব মৃত্তিকা থেকে লাগড ঁটে ধবে নিজেকে ?
এই উল্লাসে এই মর্ষণে অপবাজেয কি কেন্দ্রিকে
মার্কসীযা যেন খুঁজে পেল তাব বিশ্বব্যাপ্ত বিচিত্রায সোহহম্ ?
কিসেব মাধ্যাকর্ষণে ?" ['যেন জনৈকা মার্কসীযা']

যে কবিকে সবশেষে আলোচনা করার জন্য আমি আলাদা করে রেখেছি, সেই সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতাই আমার মতে এবারকার শারদীয় সংখ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—অন্তত সেই পাঠকের কাছে, যিনি, পূর্বের উপমার জের ধরে বলা যায়, ষাঁড়ের দুটো শিঙই চেপে ধরেছেন এমন কবির সন্ধানে উন্মুখ এবং তা থেকে বাঙলা কবিতার সম্ভাবনাকেও বুঝে নিতে চান। সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতা দীর্ঘকাল যাঁরা লক্ষ্য রেখেছেন, তাঁরা জানেন প্রসঙ্গ-প্রকরণের অতি সরল অর্থাৎ ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় তাঁর আস্থা ছিল না, এমন কি যখন কবিতার প্রগতির শিবিরে সেই ধারণাকেই কার্যত প্রশ্রয় দেওয়া হতো, তখনও নয়। অথচ কাব্যচিন্তায় ও অভিপ্রায়ে তিনি প্রগতির প্রথম সারির একজনই ছিলেন। কিন্তু সরল সমীকরণের ভ্রান্তিতে তিনি মানবজীবন ও অভিজ্ঞতার আলো-আঁধারকে বর্জন করেন নি, বরং সমগ্রতা-অর্জনের চেষ্টায় তাঁর এতদূর সততা যে, নিজের আত্মাকে উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে তিনি তাঁর অবশ্যম্ভাবী পিছুটানকে বাদ দিতে পারেন না। ফলত তাঁর কবিতা এক সময়ে হয়ে উঠেছিল অস্তিত্বের দ্বন্দ্বময়তা ও তার যন্ত্রণার কাব্যরূপ—তিনি বুঝেছেন, নিরন্তর দ্বন্দ্বময়তাকে টিকিয়ে রাখাই নৈর্ব্যক্তিক সততার শর্ত। দ্বন্দ্বের লীলাকে নিজের সত্তায় অবিরল অনুভব করেন বলেই ব্যস্ত আবেগ, রুদ্র দৌড় বা খর নির্বাচনে তাঁর প্রবল আপত্তি। তাই কি কবিতার লাইন তাঁর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায় অনিশ্চয়তার ধাক্কায়, রুদ্র দৌড়কে থামাতে চান উচ্চারণের মন্থরতায়, দ্বিধাকে প্রকাশ করেন অসংখ্য ও আকস্মিক ছেদচিহ্নে, শব্দের ভঙ্গুরতায়? আশ্চর্য তাঁর শব্দবোধ এবং ছন্দের কান। ইদানীং বুঝি কিছুকাল তাঁর কবিতায় এই পিছুটানটাই বড় হয়ে উঠছিল, দ্বন্দ্বের নিরপেক্ষতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সত্তার অন্ধকারটাই যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিল, ভয় হচ্ছিল সিদ্ধেশ্বর সেনও বুঝি এবার নিশ্ছিদ্র অন্তর্মুখিনতার নিরাপদ অন্ধকারে আশ্রয় নেবেন। কিন্তু সেই সঙ্কট-পর্বও যে কতদূর পূর্ণগর্ভ ছিল, তার প্রমাণ, এবার শারদীয় সংখ্যার ৫টি কবিতায় ('যেন হয় মানবিকতায় পুষ্ট রুজি': কালান্তর, 'খুঁজবে না স্বকীয় আভাস': পরিচয়, 'এটুকু পথও যেন হয় দীর্ঘতর': সাহিত্যপত্র, 'তোমার ভাষা': এষা, 'তোমার প্রতিমা ভেসেছে': অনুক্ত) তিনি যেন বেরিয়ে এলেন মানবিক অনুভূতির নরক-দর্শনের ক্লান্তি থেকে সুস্থতা ও বিশ্বাসের আত্মপরিচয়ে। বোঝা যায়, এগুলো সবই একই সময়ে লেখা, যেন কোনো অলৌকিক অভিজ্ঞতার চাপে কবির

সাম্প্রতিক ব্যক্তিগত উপলব্ধির হর্ষ, নৈর্ব্যক্তিক জিজ্ঞাসার চিরন্তন ক্রিয়া এবং এমন কি প্রাক্তন নৈরাশ্যের অভিজ্ঞতার নির্যাস মিলে মিশে গেছে কোন অখণ্ডতায়। শেষ চারটি কবিতার মধ্যে যেন একটা ক্রমও লক্ষ্যগোচর হয়—যেন দ্বিধাকে কাটিয়ে কাটিয়ে কবি সিদ্ধান্তে পৌঁছুচ্ছেন।

"তুমি কি নিজের দিকে তাকাবে না
কোনোকাল
দেখবে না তোমার উদ্ভাস, জ্বালায় শতেক দীপ, আলো · [পরিচয়]

"তোমার মুদ্রার ভাষা, বোঝার ও-আশা
সে কি ভার ?" [এষা]

"বারোমাস
ঋতুর যাপনে
কেন আমাকেই, তোমাকেও আনলো ডেকে,
—টানে
এটুকু পথও যেন হয় দীর্ঘতর " [সাহিত্যপত্র]

"তোমার প্রতিমা ভেসেছে আমার জোয়ার-ভাঁটার টানে।" [অনুক্ত]

ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতাও বটে, কিন্তু সে তো সত্তার নতুন উপলব্ধিও, যার সঙ্গে যোগ আমাদের সকলেরই—বিশেষত শেষ কবিতায় আমাদের পুরাণ ও প্রতিমার সঙ্গে মিশে সেই অভিজ্ঞতা আমাদের আশঙ্কা ও আশ্রয়েরই প্রতীক হয়ে উঠেছে। ভাবতে ইচ্ছে হয়, সিদ্ধেশ্বর সেন সেই কষ্টার্জিত অন্বয়ে পৌঁছুতে চলেছেন, যেখানে তিনি বিষ্ণু দে-র অনুকারী নন, সার্থক উত্তরাধিকারী।

ব্যক্তিগত রুচির কৈফিয়ৎ লেখার সূচনায় ছিল, সেই কথা বলেই এ লেখা শেষ করা উচিত—কারণ অজস্র শারদীয় সংখ্যার মধ্যে যে অধিক সংখ্যকই পড়ে উঠতে পারিনি, তা অ-পাঠ্য এমন বলার দুর্বুদ্ধি যেমন কারো হবে না, তেমনি পঠিত কাব্যগুলোরও সংখ্যাপ্রাচুর্য আমার ব্যক্তিগত পছন্দের অধিকারকেই প্রশ্রয় দিলো—তবে ব্যক্তিগত পছন্দ ব্যাপারটা সত্যিই তো পুরোপুরি ব্যক্তিগত নয়, এই যা বাঁচোয়া।

অরুণ সেন

ব্যবহারে, ব্যবহারে, ব্যবহারে জীর্ণ শব্দগুলি একসময়ে বড়ো পুরনো হয়ে যায়। পুরনো হয়, কিন্তু নাকচ হয় না। সেই বিপুল শব্দসমষ্টি দিয়েই তো প্রতি যুগের ভাষা-নির্মিতি—তবে নতুন প্রয়োগে, নতুন ব্যঞ্জনায়, নতুন প্রতীকে। পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনে মানুষ বদলায়, তার ভাষা-কথা-চিন্তা-দর্শন সবকিছু নিয়েই তার বাড়ি-বদল। এই গতিশীল অগ্রসরতাকে প্রতিমুহূর্তের বর্তমান দিয়ে ধরে রাখা সবযুগেরই শিল্পের সমস্যা। 'একদা শেক্স্পীয়র পড়ে আমাদের প্রপিতামহদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তাঁদের ঐতিহ্যবোধে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য, দেখতেন যাত্রা, পড়তেন শেক্স্পীয়র—সেই আমাদের নাট্য-সাহিত্যের নান্দীপাঠ। তারপর শতবর্ষ-অতিক্রান্ত সময়ের স্রোতে সেই ভাবনাধারণাগুলি মলিন হলো, ভক্তিরসে আর দেশাত্মবোধের উন্মাদনায় প্রচুর হাততালি-কুড়নো নাটকের যুগটা নিঃশেষে কখন ফুরিয়ে গেল, যাতে এখন, এমন কি, কলকাতার অফিস-ক্লাব থেকে সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত কোথায় যেন 'বিল্বমঙ্গল'-'কর্ণার্জুন' অথবা 'সাজাহান'-'সিরাজদৌল্লা'য় ক্লান্তিবোধ। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার স্তরগুলি ডিঙিয়ে অবশেষে এমন একটা সময় এলো, যখন জীবন-ঘনিষ্ঠ এবং নৈর্ব্যক্তিক-সচেতন নাটক-উপভোগের জন্য পাঠক-দর্শক-শিল্পী-নাট্যকার এক উপলব্ধির অংশীদার। অবশ্য এর অশুভ পরিণামে আমাদের ঐতিহ্যবহ যাত্রা 'থিয়েটার'-এর (।) পোষাক পরতে চাইছে এবং অন্যদিকে শুভসংবাদ এই যে, বাঙলানাটক আধুনিকতার নতুন আঙ্গিকের, নতুন ভাষার অন্বেষণে মগ্ন। অবশ্য একদিন, সব আধুনিকতার প্রথম আচার্য, নিভৃতে এবং একান্ত নিঃসঙ্গভাবে বাঙলা নাটকের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করে গেছেন, সমকালে যা শুধু বড়ো-বাড়ির নাটমণ্ডপে কতিপয় বুদ্ধিজীবীর আস্বাদনে সার্থক, বৃহত্তর সমাবেশে ব্যাপক পরিচিতি তার তখনই ঘটল, প্রয়োগকলার নবনিরীক্ষায় বাঙলা নাটক যখন নিজের সাবালকত্ব অর্জনে অস্থির। কর্মের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ যা রেখে গেলেন, আর বিষয়-বক্তব্যে 'নবান্ন' 'ছেঁড়া-তার' যে নতুন ধাক্কা দিলো, আধুনিক বাঙলা

নাটকেব নাবালকত্ব মোচনেব সাধনা সেখান থেকেই শুরু। কিন্তু মূলধনেব সবটুকু স্বদেশে জুটল না। তাই বৈদেশিক সাহায্যেব প্রযোজন অনিবার্য হলো। প্রপিতামহেব কাছে যা-ছিল শুধুই শেক্স্পীযব, আমাদেব কাছে তাই হলো যুবোপ-আমেবিকাব তাবৎ নাট্য-প্রযাসেব অভিজ্ঞতাব সমাহাব। সাম্প্রতিক বাঙলা নাট্য-সাহিত্যেব দিকে তাকালে এই পবদেশ-নির্ভবতাব প্রাবল্য সহজেই চোখে পড়ে। নবনাট্য আন্দোলনেব নাট্য-নির্দেশকবা বাইবে যখন মাতৃভাষায প্রযোজনা-উপযোগী মৌলিক নাটক খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন, নাট্যদলেব আত্যন্তিক প্রযোজন মেটাতেই তখন বিদেশী কোনো বিখ্যাত নাটকেব দেশজকবণ ঘটে। শিল্পেব প্রশ্নে এ-জাতীয নাটক সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা থাকা স্বাভাবিক এবং এ-নাটকেব বচনাকাব অবশ্যই কখনও পূর্ণ-নাট্যকাবেব দাবিদাব নন, তথাপি এ-জাতীয নাটকগুলি বর্তমান বাঙলা নাট্য-সাহিত্যেব অন্তর্ভুক্ত। এ-অন্তর্ভুক্তিব স্বপক্ষে প্রথম বক্তব্য, স্বদেশ সম্বন্ধে সামগ্রিক চেতনা মৌলিক নাট্য-বচনায যতটা প্রযোজনীয, অনুসৃত-নাটকে তাব দাবি কিছুমাত্র কম নয। দ্বিতীযত, নবনাট্য আন্দোলন যদি ব্যবসাযিক-মঞ্চেব সঙ্গে সমান্তবাল প্রতিদ্বন্দ্বিতায নিজেব কণ্ঠস্বরকে উচ্চকিত কবে তুলতে সক্ষম হয, তবে আশা কবা অন্যায নয যে, সেদিন অনেক অনুপ্রাণিত নাট্যকাব সমগ্র আন্দোলনেব সাফল্যেব মধ্যেই গড়ে উঠবেন। অন্তত ততদিনেব অভাবকে ভবে বাখাব ক্ষেত্রে এই অনুসৃত-নাটকগুলিব গুরুত্ব অনেক। সুতবাং সে-তর্ক আপাতত থাক, অনুসৃতই হোক অথবা মৌলিকই হোক—আধুনিক বাঙলা নাটকে আমাদেব অন্বিষ্ট হবে তাব রূপগত কারুকলা, যা আমাদেব দগদগে বর্তমানকে জড়িযে, জাতিব অবচেতন থেকে উৎসাবিত আবেগকে নিঙড়ে নিঙড়ে যাব প্রকাশ।

যথার্থ আধুনিক নাটক হিসেবে বহুজনস্বীকৃত নাটকগুলিব সঙ্গে আমাদেব পবিচয অভিনয-মঞ্চে—দর্শনে এবং শ্রবণে। কেন না, অধিকাংশ নাটকই পাণ্ডুলিপি-আশ্রযে অভিনীত। পবীক্ষামূলক নাটকাবলীব প্রকাশ (গ্রন্থ বা সামযিকপত্রে) বিবল। তবু সান্ত্বনা এই যে, নাট্য-সংক্রান্ত কিছু পত্রিকা এখনও প্রকাশিত হয। আধুনিক বাঙলাদেশেব নাট্যপ্রযাসকে জানাব জন্য এই পত্র-পত্রিকাগুলিই বিশ্বস্ত অবলম্বন। এদেব এবং অন্যান্য কিছু পত্র-পত্রিকাব শাবদীযা সংখ্যাগুলিতে বেশ কিছু নাটক পড়া গেল।

অধুনা বাঙলা নাটক সম্বন্ধে আগ্রহী মানুষেব কাছে বাদল সবকাবেব নাম অশ্রুত নয এবং এ-বছবেব শাবদীয 'বহুরূপী'তে প্রকাশিত তাঁব একাঙ্ক নাটক

'বাঘ'ও পূর্বপবিচিত। ববীন্দ্রসরোবব মঞ্চে নাট্যকারেব নির্দেশনায নাটকটি কযেক বজনী অভিনীত হযেছে। কথা, কথা, শুধু কথা, আমবা সবাই এক অদ্ভুত কথাব প্রেমে বিভোব। শব্দগুলিব কোনো স্পষ্ট অভিধা মনে না বেখেই আমবা শব্দগুলি ভাষায উচ্চাবণ কবি, কাবণ কথা বলতে ভালোবাসি বলে, অদ্ভুতভাবে গৃহগত মন নিযে বিববনিবাসী হই বেঁচে থাকাব স্বভাবে। অথচ জ্ঞানে বা কর্মে কোনো প্রেবণা নেই। নিঃসন্দেহে একটি ভালো নাটক। 'বাঘ' একজন মানুষ, প্রতিবাদী মানুষ, নামটাই শুধু প্রতীকী। দুর্বৃত্তেব হুঙ্কাবই হোক অথবা অসহাযেব দীনতা—নিজেব ঘাটতি পূবণে পবস্পব-নির্ভবতা, জ্ঞান আব বুদ্ধিব নিবিখে পবস্পব-ঘনিষ্ঠতা, এই হলো জীবনেব পবম মুক্তি।

শাবদীয 'বহুরূপী'তে অভিনয-পববর্তী আবও একটি নাটকেব প্রকাশ—রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তেব 'যখন একা।' ইংবেজ নাট্যকাব আর্নল্ড ওযেস্কাব-এব 'রুটস' নাটকেব অনুসবণে বচিত এই নাটকটি 'নান্দীকাব' নাট্যগোষ্ঠীব প্রযোজনায দীর্ঘকাল ধবেই অভিনীত হচ্ছে। আমাদেব সমযেব একটি জরুবি নাটক 'যখন একা।' প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাব অর্থহীনতায অথবা শিক্ষাহীনতায যে এক অদ্ভুত সামাজিক পবিমণ্ডল আমাদেব চাবপাশে তৈবি হযেছে, সেখানে আমবা অভ্যাসে বাঁচি। যদি প্রকৃত শিক্ষাব উপনযন কাবও ঘটে, তখন নিজেব বিশ্বাসকে পৌঁছে দেবাব ক্ষেত্রে ভাবনাব আব ভাবনাহীনতাব সেতুবন্ধনে যোগাযোগেব ভাষা অন্তবায হযে দাঁড়ায। জীবনকে সবাসবি ধবাব চেষ্টা আছে এ-নাটকে। দেশজকবণে নাট্যকাব রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত নাটকটিকে নির্মম-জীবন্ত কবে তুলেছেন। বিচ্ছিন্নতাব নাটক হিসেবে অভিযুক্ত হবাব প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা (অবশ্য নামকবণ অনেকটা দাযী) এ-নাটকেব আছে। কিন্তু বীথি সংসাবেব আব সব মানুষেব সঙ্গে একাত্ম হতে গিযেই নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কাব কবে— সে স্বতন্ত্র। তাব কণ্ঠধ্বনিতে নতুন ভাষা, সেখানে চিন্ময়েব কণ্ঠস্বব, চিন্ময়ই সাম্যবাদ—এ-উপলব্ধি অন্যাযভাবে একা হযে যাবাব, একা হয়ে থাকাব নয। সবাইকে আলিঙ্গনে জড়াতে চেযেই সে নিজেব নির্বাসন আবিষ্কাব কবেছে।

একটি সত্যিকাব ভালো নাটকেব অসংখ্য উপকবণ নিযে লেখা মোহিত চট্টোপাধ্যাযেব নাটক—'নিষাদ' (অভিনয়-দর্পণ)। ইতিপূর্বে তাঁব অন্য কযেকটি মৌলিক নাটক মঞ্চে অভিনীত হযে নাট্যকাবকে বেশ কিছুটা পবিচিতি দিযেছে, নাটকেব ব্যাকবণে যে-নাটকগুলি 'অ্যাবসার্ড'-ধর্মী।

নিবীক্ষাব স্তব পুবোপুবিভাবে অতিক্রান্ত না-হলেও দীর্ঘ অনুশীলনেব অভিজ্ঞতায 'নিষাদ'-এব নির্মাণ-কারুকলা পাতায পাতায বৈচিত্র্যময। এ-যুগেবই অবক্ষয-মানসেব শিকাব এক যুবক—দিবাকব। যাত্নকবেব যাত্নদণ্ড তাব সব অচবিতার্থ আকাঙ্ক্ষাব পূর্ণতা আনে—মোহেব যাত্নতে সে অবশ। প্রেম চেযেছিল, অজ্ঞাত-ললনা তাকে ঘিবে লতা হযে ওঠে। মেডিকেল ছাত্র ছিল, দ্বিতীয পর্যাযে বিখ্যাত ডাক্তাব হযে ওঠে, প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয পর্যাযে পিতা, আত্মদহন, বুক পেতে বংশধবকে বক্ষাব প্রযাস। প্রতিটি স্তবেই একটি কবে মৃত্যু—এ-মৃত্যু চবিত্রহননেব, বিবেকহত্যাব, নৈতিক অবনমনেব। প্রভুব বেশে পুঁজিবাদী (অথবা শাসক), জীবন-বিবোধী আচবণে যুবকদেব অদ্ভুত ব্যাধি (দৃষ্টিভ্রম, হৃদযসঙ্কুচন ইত্যাদি), কোবাসেব ভূমিকায সাংবাদিকবা। সংলাপে, ভাষায, সামগ্রিক অবযবে এ-নাটক প্রায কাব্যনাট্য, সিচুযেশান স্থষ্টিতে কখনও বাস্তবতাকে ছুঁযে কাব্য, কখনও সর্বাংশে রূপকথা। নাট্যকাব যে মূলত একজন কবি, এ-নাটক পাঠেব অভিজ্ঞতায তা বাববাব মনে হয। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে তিনি কোনো নবতব দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত কবতে চান (যা এ-জাতীয নাটকে অত্যন্ত জরুবি), নাকি নেহাৎ কবিস্থলভ আবেগে জীবনেব জ্বালা-যন্ত্রণাগুলিকে নাডাচাডা কবতেই প্রযাসী ? নইলে কেন একদিকে বর্তমান জীবনেব কঠিন বাস্তবকে দু-হাতে শক্ত কব্জিতে ধবতে চাইছেন, এবং ফর্ম হিসেবে এমন কিছুকে আশ্রয কবছেন যাতে কাব্যমযতাব আচ্ছাদনে একটা বডো কিছু আডাল পডে সমগ্র নাটক শুধু 'স্থখপাঠ্য' হযেই থাকছে ? হয পুবোপুবি অ্যাবসার্ড-তত্ত্বে অথবা আবও ঘনীভূত জীবনবোধে শ্রীচট্টোপাধ্যাযকে এগোতে হবে, নাটককে এক জাযগায জীবনেব সঙ্গে আবও নিবিডভাবে মেলাতে হবে। কথাগুলি বলতেই হচ্ছে, কেন না, মোহিত চট্টোপাধ্যাযেব কাছে আমাদেব প্রত্যাশা অনেক। বাঙলা নাটক নিযে নানা পবীক্ষা-নিবীক্ষায নিযুক্ত একজন তরুণ নাট্যকাব—এতো আমাদেব অনেকেবই উৎসাহেব কাবণ।

জীবনেব "কঠিন গন্ধ" নিযে 'অভিনয-দর্পণ'-এ দুটি একাঙ্ক নাটক লিখেছেন 'কাল-বিহঙ্গ'—মনোজ মিত্র, 'প্রতিধ্বনি'—শেখব চট্টোপাধ্যায। কাবখানায যখন লাগাতব ধর্মঘট, শ্রমিকদেব ঐক্য ভেঙে মালিকপক্ষ যখন পুলিশেব সাহায্যে আব শ্রমিকদেব ঘবে ঘবে দালাল পাঠিযে ধর্মঘট ভাঙতে হিংস্র , ঠিক সেই সমযেই এক ধর্মঘটী শ্রমিকেব বাপ পথে পথে পাখিব চাতুবি দেখিযে লোক ঠকানোব

ব্যবসা চালাচ্ছে। ছেলে লোহার অর্গল দু-হাতে ভাঙতে ব্যাকুল এবং তারই পিতা অন্ধকারের কুসংস্কার আর ভণ্ডামিকে জাপটে ধরে আছে—এই হলো 'কাল-বিহঙ্গ'-র বিষয়বস্তু। 'প্রতিধ্বনি'র নায়ক পবিত্র এক মধ্যবিত্ত যুবক—যাকে ঘিরে বর্তমান সমাজের কুৎসিত নগ্ন ছবিগুলি—চোরাকারবার, মজুতদার, ঘুষ, পকেটমার, পণপ্রথা ইত্যাদি। নিদারুণ বাস্তব এবং সত্যভাষণ, বিশ্বস্ত ফটোগ্রাফ। লেখকদের সততার প্রতি গভীর আস্থা সত্ত্বেও বলতে হয়, শিল্পের আবেদনকে তীক্ষ্ণতর করে তুলতে শুধু এই 'ডকুমেন্টেশান'-ই যথেষ্ট নয়; তার অতিরিক্ত একটা ভাবনা আছে। সংবাদপত্রের পাতায় যা প্রতিদিন দেখি, নাটকের ভাষায় তাকে নতুনভাবে বলতে হয়। ফর্ম আর বক্তব্যের যুগলমিলনেই শিল্পের যথার্থ আধুনিকতা। বিপরীত দিকে একটি শোচনীয় ব্যর্থ-প্রয়াস রতনকুমার ঘোষের একাঙ্ক নাটক 'শেষ বিচার' (অভিনয়-দর্পণ)। দর্শক আর মঞ্চের শিল্পীকে একাকার করে নাট্যকার এ-যুগেরই কিছু জরুরি বক্তব্য নতুনভাবে নবতর আঙ্গিকে উপস্থিত করতে চাইছেন, যা শেষপর্যন্ত কিছু ভাষণমাত্র, কোথাও পৌঁছয় না। শুধু একটা 'ফর্মালিজম'-এর প্রয়াস।

অথচ সেদিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য নাটক 'বহুরূপী'-তে প্রকাশিত লোকনাথ ভট্টাচার্য-র 'শ্রীশ্রীকালীমাতা রেশন ভাণ্ডার'। দিল্লী-প্রবাসী সুপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি অতীন স্বেচ্ছায় কলকাতার একটি রেশনের দোকানের ভিড়ে লাইন দিয়েছে। 'দুঃস্বপ্নের শহর' কলকাতা, রাজনীতি-সচেতন বিক্ষুব্ধ কলকাতা, নোঙরা শহর কলকাতা, মমতাময় কলকাতা। আসলে কলকাতাকে খোঁজার মধ্যে নিজেকেই হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে দেখা, দূর-প্রবাস থেকে স্বদেশ বাঙলার প্রতি যে তীব্র আবেগ-অনুভূতি, এ-আত্মানুসন্ধানে তার ক্যাথারসিস। মজুতদার অনিলবাবুর দোকানে বিক্ষুব্ধ জনতা লকলকে আগুন জ্বালল—তার একদিকে "নকশালবাড়ি লাল সেলাম" "মাও-সে-তুং লাল সেলাম", অন্যদিকে "বন্দেমাতরম" "জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ"—মধ্যবর্তী ফাঁকটুকু দিয়ে পুলিশ। বাল্যবন্ধু বলে সনাক্ত করে অতীন যাকে আপন করতে চাইল, দেখা গেল সে দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত এক আপাত-উন্মাদ; তারপর জনে জনে মানুষের কাছে গিয়ে আবিষ্কার করল—কি ভয়ঙ্কর এক আত্মিক দীনতা, ভয়াবহ বিশ্বাসহীনতা, সন্দেহ, সংশয়। শেষপর্যন্ত কি-এক ন্যক্কারজনক ঔদাসীন্য, ক্যালাসনেস। চারদিকে যখন এত তোলপাড়, এত হট্টগোল, মানুষ ধুঁকছে, শিশু মরছে, আগুন জ্বলছে, তখনও পকেট থেকে তাসের প্যাকেট বের হয়, আর কিছু না-হোক নিরাসক্ত

গাধা-পেটাপেটি চলে। হয তো এ-নাটকও একেবাবে ত্রুটিশূন্য নয। বিশেষত শুরুব দিকে সুধীবেব সঙ্গে সংলাপে অতীনেব অকাবণ দীর্ঘভাষণ (যাব ভাষাও খুব মামুলি) কিছুটা ক্লান্তিকব। কিন্তু সমগ্রভাবে এ-নাটক একটা উপলব্ধিব স্তবে ধাক্কা দেয, সেটা আমাদেব দগদগে বর্তমান-সংক্রান্ত কিছু সত্য-উন্মোচনেব জন্যও বটে। তাব সঙ্গে এক-দৃশ্যেব একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকে শ্রীভট্টাচার্য এতগুলি কুশীলবকে নানাভাবে ভেঙেচুবে সন্তর্পণে এগিযেছেন—শুধু আবেগ নয, বুদ্ধিকে স্বীকৃতি দিযে। আবেগকে নাডা দেওযা সহজ, কিন্তু পাঠক-দর্শককে বুদ্ধিমান কবে তোলাও শিল্পীবই দাযিত্ব।

'এ আমি চাইনি'—'অভিনয-দর্পণ'-এ প্রকাশিত সুধাংশু দাশগুপ্তেব একটি নাটক। তাঁব নাট্যবোধ প্রশংসনীয এই কাবণে যে, কিঞ্চিৎ অসংযমে এ-নাটক একটি গোযেন্দা-নাটকে পবিণত হযে যেতে পাবত। তবে বক্তব্যকে তিনি যথেষ্ট জোবেব সঙ্গে উপস্থাপিত কবতে পাবেন নি, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাব জট ছাডাতে গিযেই সন্ত্রাসবাদী বাজনীতিব প্রতি তাঁব বক্তব্য শেষপর্যন্ত অস্পষ্ট থেকে গেছে। আণ্টন শেকভ-এব 'সোয়ান সঙ'-এব অনুসবণে বচিত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যাযেব 'নানা বংযেব দিন' বাঙলাদেশেব নাটক-বসিকদেব কাছে ব্যাপক প্রচাবিত। নাট্যকাবেব নির্দেশনায ও একক অভিনযে সমৃদ্ধ এ-নাটক বাঙলা-দেশে বেশ কযেক বছব ধবে অভিনীত হযে আসছে। মুদ্রিত অক্ষবে একাঙ্ক-নাটকটি পডে বেশ আনন্দ পাওযা গেল।

এবাবেব শাবদীযা সংখ্যায় কযেকটি উল্লেখযোগ্য বাজনৈতিক নাটক—মনোবঞ্জন বিশ্বাসেব 'বেঁচে থাকাব দবজা' (নন্দন), উমানাথ ভট্টাচার্যেব 'সত্য-কাম' (পবিচয), 'দিবাবাত্রি' (কালান্তব)—তিনটি একাঙ্ক। 'বেঁচে থাকাব দবজা' একটি ভালো বচনা। ধর্মঘটী শ্রমিকেব সংসাবে মধ্যবিত্তসুলভ নীচতা-দীনতাব পাশে আশা-আকাজ্ক্ষাব ঘনিষ্ঠ ছবি এ-নাটকে আছে। তবে 'সোনা'ব (স্কুলেব ছাত্র) মুখে কিছু আদর্শবাদী উক্তি বেমানান। একটি বলিষ্ঠ একাঙ্ক—'সত্যকাম'। অন্যায়ভাবে যুক্তফ্রন্ট-সবকাবেব পতন ঘটাবাব পব যে-গণতান্ত্রিক আন্দোলন সাবা বাঙলায বিক্ষোভেব দাবানল জ্বেলেছিল, তাব পটভূমিকায বচিত এ-নাটকে সাম্প্রতিক বাজনীতিব বিবিধ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত। একটি বিশেষ সমযেব ঐতিহাসিক দলিল-মূল্য এ-নাটকেব গৌবব। অবশ্য উমানাথবাবুব অধিকতব ভালো বচনা 'দিবাবাত্রি'। বাবো বছব পার্টিব একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে, কাবাবাসেব পব যে-যুবক ধীবে ধীবে স্ত্রী-প্রেম-সম্ভাব্যসন্তান-দিবানিদ্রাব সুখে স্বার্থমগ্ন হতে

হতে পার্টি থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে, একদিন সে আবিষ্কার করল, সময় আর গতি তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তারই বৃদ্ধ পিতা, সারাজীবনের ছাপোষা মানুষ, সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রমের পরও গভীর রাত পর্যন্ত সকলের অলক্ষ্যে ধর্মঘটী কারখানার ইউনিয়ন-সংগঠনগুলিকে রক্ষার কাজে নিজেকে বিলিয়ে যাচ্ছেন। জীবন থেকে পলায়ন-উন্মুখ সন্তানের প্রতি কী-এক নিঃশব্দ তীব্র ভর্ৎসনা। উমানাথ ভট্টাচার্যের আরেকটি নাটক 'অন্তরঙ্গ' (আন্তর্জাতিক) এক দিক থেকে যথার্থ রাজনৈতিক নাটক। কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা বা পার্টি-প্রচার নয়—মধ্যবিত্ত ভীরুতা ও বিবেক-পীড়নে দ্বিধা-দীর্ণ যে মানুষগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রাজনৈতিক উন্মাদনায় করা হয় না, অথবা কাছে টানার বদলে যাদের শুধু নিন্দাপঙ্কে ফেলে আরও দূরে ঠেলে দেওয়া হয়—ধর্মঘট-ভাঙার সেই কতগুলি দালালকে নিয়ে রচিত এ-নাটকটি মহত্ত্বের দাবি না-করলেও, তা সমসাময়িক রাজনীতির সত্য-উন্মোচনে অথবা জনমত সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। আশা করব, ফর্মের নিরীক্ষায় আরও মনোযোগী হয়ে শ্রীভট্টাচার্য আরও বলিষ্ঠ নাটকের ভাবনায় অগ্রসর হবেন—যার আবেদন শুধু তাৎক্ষণিক নয় এবং 'ডকুমেণ্টেশন'-এই যা নিঃশেষ নয়। এই 'ডকুমেণ্টেশন'-এর মূল্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাটক নন্দ-গোপাল সেনগুপ্তের 'একেই বলে নেতৃত্ব' (আন্তর্জাতিক)। তথাকথিত আদর্শের নামাবলীর নিচে যাদের দুর্নীতি আর অপরাধের পাপ—এ-নাটকের নায়ক তাদেরই একজন। আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এই একাঙ্কগুলি এক্ষুনি অভিনীত হওয়া প্রয়োজন।

এ-ছাড়া অজিত মুখোপাধ্যায়ের 'বাঘের গর্জন' নাটকটি (সারস্বত) নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। বাঘ শিকারের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামের নানা শ্রেণীর মানুষের বিভিন্নমুখী অভিব্যক্তি এবং অবশেষে ঘৃণ্য পরস্বোপজীবী ধনপতির বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ মানবিক আবেগ নাটকটিকে নতুন শ্রী দিয়েছে। রূপকের সহায়তা নিয়ে নাটকটি পাঠকের কাছে এক স্বতঃসিদ্ধ অথচ জটিল জীবন-তৃষ্ণার আবেগ নিয়ে উপস্থিত।

ভিয়েতনাম—আমাদের রাজনৈতিক সচেতনায় সর্বাধিক প্রিয় শব্দ, নিবিড়তম আবেগ। ভিয়েতনামের পটভূমিকায় দুই আমেরিকান যুবককে (বড় ভাই কাঠখোট্টা, ছোট ভাই কবি) কেন্দ্র করে 'অভিনয়-দর্পণ'-এ নাটক লিখেছেন জোছন দস্তিদার—'খেসারত'। এক দৃশ্যে জোন্স নিরীহ ভিয়েতনামীদের উপর

নৃশংস উৎপীড়ন করে নিজের জিঘাংসা-প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় তৃপ্ত। অন্য দৃশ্যে হ্যামফ্রে বন্দী হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মানবোচিত আচরণে বিস্মিত—সে অনুভব করে তার জন্মভূমি আমেরিকাই হলো কবিতা আর মানবতার শত্রু। জাঁ-পল-সার্ত্র-র 'সম্মানিত পতিতা' আমরা পড়েছি, উৎপল দত্তের 'মানুষের অধিকারে' দেখেছি। তবু সবিনয়ে বলব—ভিয়েতনাম সম্বন্ধে আমাদের একটু স্বতন্ত্রভাবে ভাবা উচিত। ভিয়েতনামীরা নন, শ্রীদস্তিদারের নাটক পড়ব এবং দেখব আমরা, ভারতবাসীরা। ভিয়েতনামের শত্রু ম্যাকনামারা সেদিন কলকাতায় এসেছিলেন, প্রচণ্ড ক্রোধে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল বাঙলার যৌবন। কলকাতার বিক্ষোভ আর ভিয়েতনামের বিক্ষোভকে এক-বিন্দুতে ধরবার চেষ্টা করা হোক। ভারতবর্ষের উপর যে কালো ছায়াটা ঘুরছে, তাকে স্পষ্ট করার জন্যই এমন নাটক লেখা হোক, যেখানে ভিয়েতনাম একটি রাজনৈতিক শিক্ষা, একটি প্রতীক। নইলে শুধু নিজের বিবেকতুষ্টি আর সান্ত্বনার জন্য আবেগজাত কল্পিত ভিয়েতনাম-পটভূমি খুব আবেদনবহ নয়।

অবশ্য নাটকের শেষ-বিচার মঞ্চমূল্যে নির্ধারিত। সাহিত্যের নিরিখে যেখানে সংশয়, সুপ্রয়োজনায় হয়তো সেটাই সমাগত দর্শকের অভিনন্দনধন্য। সেটা স্বতন্ত্র শিল্পের এক্তিয়ার। কিন্তু নাট্যসাহিত্যের একটা নিজস্ব এলাকা আছেই, এ-আলোচনা সেখানেই সীমাবদ্ধ। বাঙলা নাটক নানাভাবে, নানা-দিকে পরীক্ষিত হচ্ছে। তারুণ্যের এই অব্যাহত উদ্যম ক্লান্তিহীন। নতুন মূল্যবোধ, দেশজ সংস্কৃতির প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যে আধুনিক জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা-বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বুক পেতে নিয়ে বাঙলা নাটক আত্ম-প্রতিষ্ঠ হবে—এ-আশা রইল।

অমলেন্দু চক্রবর্তী

৩

বাঙলা সৃজনী সাহিত্যের যে কোনো ফর্ম—ছোট গল্প, উপন্যাস বা কবিতা—রচনাবাহুল্যে ফেঁপে-ওঠার শরৎকালে পাঠককে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখতেই হয়। প্রথমত, ঐ রচনাবলীতে প্রাক্তন থেকে সরে আসার কোনো প্রয়াস আছে কিনা। দ্বিতীয়ত, আঙ্গিকের ক্ষেত্রে যথার্থ অভিনবত্ব কতখানি এসেছে। তৃতীয়ত, সময়—কি দেশজ কি আন্তর্জাতিক—লেখকদের কতখানি আকৃষ্ট করেছে এবং জীবন সম্পর্কে লেখকদের বোধ—কি ইতিবাচক কি নঙর্থক—তাঁদের এ্যাটিচুডকে কতদূর স্পষ্ট করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচিত হতে পারে, এমন কয়েকটি গল্প আলোচনাকে সংহত করার জন্য এখানে গ্রহণ করা হচ্ছে। গল্পগুলির লেখক ও নাম—গোপাল হালদার: অঘটন ঘটল (পরিচয়), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: দেবদাস ও তিতির (পরিচয়), বুধন (কালান্তর), অমিয়ভূষণ মজুমদার: ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্ (অনুক্ত), বনফুল: আভাস (বেতার জগৎ), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত: ধৃতরাষ্ট্র (বেতার জগৎ), দেবেশ রায়: বেঁচে বর্‌তে থাকা (পরিচয়), বেঁচে বর্‌তে থাকা (আন্তর্জাতিক), বেঁচে বর্‌তে থাকা (সাহিত্যপত্র), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়: বন্দরের গল্প (অনুষ্টুপ), আগুন জ্বালাবার গল্প (পরিচয়), সংশয় (কালান্তর), অমলেন্দু চক্রবর্তী: ইছামতী বহমান (পরিচয়), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়: মহাপৃথিবী (কলকাতা), কুকুরের ভাষ্য (গল্প-কবিতা), সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ: ইঁদুর (লেখা ও রেখা), মৌগাঁয়ের পথে ভোর (পরিচয়) এবং অমল দাশগুপ্ত: নেগেটিভ ও মাইনাস (কালান্তর), নিয়তি (পরিচয়)।

'অঘটন ঘটল'-র লেখক গোপাল হালদার গল্প কদাচিৎ লেখেন। গল্পটির বিষয় বিমাতার সংসারে অবাঞ্ছিত একটি বয়ঃসন্ধির কিশোরী ও তার অনুগত একটি নেড়ি কুকুরের বাঁচার জন্য মরীয়াপনা। স্মিত রসসৃষ্টির ক্ষমতা গল্পটিকে

চাপা দ্যুতিব মতো ঘিবে আছে। গল্পে ঐ কিশোবীটিব একটি প্রেমেব এপিসোড আছে, যা মামুলিই বলা চলে। কিন্তু কাহিনী-বৈচিত্র্য যেখানে, সেখানে সমান্তবালভাবে একটি সাড়ে-তিন-ঠ্যাঙা কুকুব ও একটি মাব-খাওযা মেযে উভযেই বীতিমতো লড়াকুভঙ্গিতে কষ্ট সমযেব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবছে। একজন প্রবীণ লেখকেব বচনায এ-জাতীয় বোখা মেজাজেব সন্ধান পাওযা একান্ত বিস্ময়কব।

গল্পেব মধ্যে এবাব জীবনেব জটিলতা ও সমাজমনস্কতাব চমৎকাব ছবি এঁকেছেন নাবাযণ গঙ্গোপাধ্যায। বহুক্ষেত্রে সবাসবি না বলে রূপকেব সাহায্যে প্রকাশ কবেছেন সমাজ আব ব্যক্তি-সত্যকে। 'দেবদাস ও তিতিব' গল্পটিতে লোহাব খাঁচাব বন্দীত্ব অস্বীকাব কবে বন্দী একটি তিতিব পাখিব মৃত্যু ববণ কবাব মধ্য দিযে লেখক মানুষেব মুক্তিব ইচ্ছাকে চমৎকাব রূপ দিযেছেন। "বক্ত মাখা মৃত পাখিটা তো একটা প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদটা তখন দেবদাসেব সামনে একটা আকাশজোড়া তিতিব হযে ডানা মেলছিল, তাব মাথায বক্তটা আগুন হযে জ্বলছিল যেন, তাব বাঁকা হলদে ঠোঁটটা তখন একটা বাঁকা তলোযাবেব মত চলে যাচ্ছিল আকাশ ছিঁড়ে।" অথবা 'বুধন' গল্পটিব উপসংহাব—"তাছাড়া, এতো গোবখপুব নয, শহব কলকাতা। লাখো কুত্তা এখানে। কে মাবে? কাকে মাবে?"—এক ধবনেব প্রতীক সৃষ্টি কবে। অনেকে বলবেন, আজও প্রতীকধর্মেব সার্থকতা আছে কি? সে প্রশ্ন অবান্তব হযে দাঁড়ায যখন দেখি, তাঁব অধিকাংশ সমবযসী লেখকদেব বচনাব মতো নাবাযণ গঙ্গোপাধ্যাযেব গল্পগুলি ফলাফলহীন ও দাযিত্ববিহীন নয। তাছাড়া, যে কোনো সামযিক ঘটনাব আন্দোলনকে অনুভূতিতে আত্মস্থ কবে আনাব দুর্লভ ক্ষমতা তো তাঁব আছেই।

অমিযভূষণ মজুমদাব পূর্বতন বচনাভঙ্গি থেকে সবতে সবতে 'ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্' গল্পে প্রায সমাকীর্ণ মেরুতে এসে দাঁড়িযেছেন। খুব সফিসটিকেটেড, দুবন্ত, স্মার্ট লেখা, পাঠকের কাছ থেকে বীতিমতো অভিনিবেশ ও পবিশ্রম দাবি কবে। প্রকবণেব দিক থেকে খুবই নতুনত্ব গল্পটিতে, একালেব বিজ্ঞান বনাম হৃদযবৃত্তিব সমস্যাটিকে বেশ নতুন ভঙ্গিতে তুলে ধবা হযেছে। অমিয-ভূষণেব চিন্তাপ্রবাহ তীবগতি, অথচ তা পাঠকেব ভাবনাকে নড়িযে দেয। "কাবণ খেলা দেখাটা আনন্দ হতে পাবে, কিন্তু উপভোগটাই শেষ কথা নয, উপভোগটা যথার্থ কিনা, কি হলে তা যথার্থ উপভোগ হয তা

বুঝে উপভোগ কবাটাই মানুষকে অগ্রসব কবে," বা "...সেই কালো ভ্যানটা এসে দাঁড়াবে দবজায। পাডায কেউ দেখবে না, কাবণ ও ভ্যানটা পাডায ঢুকলে পথেব ধাবেব জানালাগুলোকে বন্ধ কবে দেয" ইত্যাদি পংক্তি নিশ্চযই আমাব বক্তব্যেব সমর্থনে যাবে। তাছাডা কিছু দুর্লভ কবিতা পেযে যাই, যা আমাদেব কৃতজ্ঞ বাখে—"টেবলে বেশ এক ঝলক বোদ এসে পডেছে। কাচেব গ্লাশগুলোব ওপবেই তাব সবচেযে বড়ো আকর্ষণ," বা "কাবণ নিনা, কাবণ তুমি নিজেও কি বুঝে উঠতে পাবো নি কি অসম্ভব খাবাই আব উচ্চতা এই উপত্যকাব, তুমি সীমান্তে যেতে পাবো কিন্তু সে শুধু শনিবাবেব প্রথা মতো বেডাতে, কাবণ কোনো পথই নেই প্রকৃতপক্ষে কাষ্টমসেব পথ ছাডা আব সে ব্যালাস্ট ট্রেনেব থামবাব জাযগায পৌছনো যায না, ধ্বসে পথ আটকানো, কিম্বা পথ আব ধ্বস নামা দুটোই স্বপ্ন। নিনা, তুমি আসছো না কেন ।"

বনফুলেব 'আভাস' গল্পটি নিঃসন্দেহে বহু পঠিত হওযা প্রযোজন। কাবণ, কি ভাব কি ভাষায একজন নামী লেখক সর্বাংশে কতদূব নিঃস্ব হযে যেতে পাবেন, গল্পটি তাব একটি স্মবণীয দলিল। তেমনই পাশাপাশি 'ধৃতবাষ্ট্র' গল্পে তবতব কবে বযে চলেছে অচিন্ত্যকুমাব সেনগুপ্তব কলম। যাকে বলে "খাশা গপ্প ।"

দেবেশ বায তিনটি পত্রিকায 'বেঁচে বত্‌তে থাকা' এই একই শিবোনামায তিনটি গল্প লিখেছেন। গল্পগুলি প্রেমেব গল্প, তবে বাঙলাদেশে যেভাবে প্রেমেব গল্প লেখা হয, সে হেন নয। আমাব কাছে খুব অস্বস্তিব কাবণ এটা, কাবণ এ-জাতীয বচনা আমাব পাঠেব অভ্যাসেব বাইবে। বীতিমতো সাবধানে, শিব টান কবে গল্পগুলি পডতে হয। বিবৃতি নয, স্কিম নয, ভিজে টইটম্বুব লেখা নয—পাথুবে মাটিব অনিচ্ছুক বুক থেকে বৃষ্টি যেভাবে জোব কবে উদ্ভিদ আদায কবে, তেমনি এক জববদস্তিব মাঝখানে প্রথমে অসহায হযে উঠি।

সব গল্পেই এক স্থান-কাল-পাত্র—একটি ঘব, সন্ধ্যে থেকে মধ্যবাত, দম্পতি বিজিত ও স্বপ্না। সাত বৎসব বিবাহিত জীবন, "তাব আগে তিন বছব প্রেমেব জীবন," সন্তান নেই, ফলে ঘবে স্বপ্না নিঃসঙ্গ। হাল্কা বহস্য-বসিকতায বিজিতেব অফিস-ফেবা সন্ধ্যে, স্বপ্নাব তৈবি নতুন নতুন খাবাবেব প্রপাবেশন। ফব্‌মিকা, এ্যানে ফ্রেঞ্চ, গোযালিযব স্যুটিঙস, নিব্‌লন শাডি, সোফা কাম বেড, বান্নাব গ্যাস্‌, হট-বক্স, ক্রকাবিজ ঘেবা আদর্শ পবিবেশ সবই নিবর্থক। কাবণ,

"বিজিত ডান হাত দিযে ধীবে স্বপ্নাকে বেষ্টন কবে বুকেব কাছে ধবে বাখলো,—স্বপ্না ফিস্‌ফিস্‌—"ভালো লাগে না, ভালো লাগে না, এব চেযে দশ-বাবোটা ছেলেমেযেব মা হওযাবও একটা মানে—।" বিজিত স্বপ্নাব মাথায হাত দেয। "নিজেব কোনো পবিচযই নেই।" বিজিত স্বপ্নাব সিঁথিতে আঙুল বোলায। "এ-সব ফেবত দিযে দাও, আমি ঘবদোব মুছবো বান্না বাডি কববো, এত খাটনি বাঁচিযে লাভ কি" মাঝবাতে স্বপ্না নতুন মাযেব ত্রস্ততায ধডমড কবে নিজেব বালিশে ফিবে কমলা বঙেব আলোতে নগ্ন দীর্ঘ হাত মেলে বিজিতকে টেনে তাব মাথা আব-এক পুষ্ট বাহুব ওপব এনে বিশদ স্তন দুটিব মাঝখানে বিজিতেব ঠোঁটদুটিকে গুঁজে দেয—"বিজিত সোনা, কাঁদে না"।" অবশ্য এই ইচ্ছা-পূবণেব জগৎ তৈবি কবে বাঁচা যায না, তাই স্বপ্না কখনো প্রচণ্ড কটু-ভাষিণী, তাব খ্যাপামোব আকস্মিক ঝডে বিজিতেব স্বস্তি তছনছ, বিবক্ত। পবিবাব পবিকল্পনাব যুগে আধুনিক মডেল-দম্পতিব জীবনে একটি মৌল সমস্যাব মোকাবিলা কবতে গিযে নাজেহাল অবস্থাব সম্ভবপব নিপুণ ছবি তুলে ধবাব দক্ষতা দেবেশ বাযেব এই গল্পত্রযীকে অসামান্য কবেছে। তাঁব বচনাদক্ষতা ও আঙ্গিক নির্মিতিব ক্ষমতা বর্তমানে প্রায প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন। এই শবতে বহুকাল পব তাঁব গল্প প্রান্তবেব বিস্তৃতি থেকে ব্যক্তি-সঙ্কটেব চৌকাঠে মুখ ফিবিযেছে।

'সাহিত্যপত্র'-এ প্রকাশিত গল্পটিতে স্বপ্নাব তিনবাব গর্ভপাতেব পব চতুর্থবাব গর্ভসঞ্চাব। অবস্থা প্রায দাঁডিযেছে "টুকটাক ঘুবেবেডিযে নিচে নেমে ফোন কবে, ওষুধ খেযে তালুতে মুখ মুছে, 'নষ্ট হযে গেছে', কথাটায যেন দুপুবেব বান্নাকবা ডাল বা তবকাবি নষ্ট হযে যাওযাব মতো ঘটনা বোঝায", বা বিজিতেব "একদিনেব ছুটি নেওযাটাও ছুটি নষ্ট কবা—এমন স্বাভাবিক আব সহজভাবে স্বপ্নাব গর্ভটা নষ্ট হযে যায।" মুখে স্বপ্নাব, "'বাদ দাওনা, সবাবই কি ছেলেপুলে হতে হয'", অথচ ডাক্তাবেব কাটাছেঁডায সে সায দেয, কাবণ, "যেন কেউ এক-জন বলে বসতে পাবে তোমাব নিজেব শবীবেব কষ্ট হবে বলে আমাব শবীবটা তৈবিই হতে দিলে না। মা।" নষ্টগর্ভা স্বপ্নাব সঙ্গে প্রতিটি মৈথুনই বিজিতেব মনে বাববাব ধর্ষণেব অপবাধবোধ নিযে আসে। প্রশ্ন কবা যাচ্ছে না, গল্প জুডে ঠাবে ঠোবে বিজিতেব ব্যাকুলভাবে বোঝাব প্রযাস– সেদিন, অর্থাৎ চতুর্থবাব স্বপ্নাব গর্ভপাত হযেছে কিনা। বিজিতেব মানসিক পবিশ্রমেব সঙ্গে লেখক এক বল্‌গায বেঁধে দেন পাঠকদেব অস্বস্তি, অফিস-ফেবত দবজাব কাছে দাঁডানো

বিজিতেব চিন্তাব এক অনবদ্য বর্ণনায, "হিবণ্যকশিপু যেমন স্তম্ভেব সামনে, তেমনি দবজাব সামনে বিজিত দাঁডায।"

সন্তানহীনা স্বপ্না স্বামীব শবীবকেই বাববাব নতুন মাযেব মতো খুটিযে দেখে। এই জান্তব দেখাকে গল্পটিব অন্তিমে লেখক স্বপ্নাব বাস্তব স্বামী ও কল্প-সন্তানেব এক যুগ্ম অস্তিত্বে এনে দাঁড কবিযেছেন। এ-সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না কবে কেবল অংশটুকু উদ্ধাব কবে দেওযাই শ্রেয মনে কবি। " "বলো তো কি লিখেছি—" বিজিতেব পিঠে আঙ্গুল দিযে লেখে স্বপ্না—"বিজিত" "হযেছে, এবাব—" 'স্বপ্না' 'হয নি' 'কি লিখেছ'? 'স্বপন' 'বিজন' 'সুজিত' 'অভিজিত' নাকি অন্ধকাবে এই নামলেখা ছাডা আব কিছুই নেই, তাই নাম নাম একটু একটু কবে, 'বিশালাক্ষি' 'সুমন' 'সুজন', স্বপ্না হাততালি দেয আব নামগুলি হামাগুডি দেয আব দুলে দুলে হাঁটে আব স্তনবৃন্ত ওষ্ঠে নিযে ঘুমিযে যায, নামগুলি ঘুমিযে যায 'বঙ্গন' ঘুমোয, 'চন্দন' ঘুমোয, 'টগব' ঘুমোয ·· বিজিতেব পিঠে স্বপ্নার শিলালিপি খোদাই শেষ, বিজিতেব নাম পাঠ শেষ, অন্ধকাবে দু-পাশে দুটো বুক দুজনেব মাঝখানে ধবধবে শাদা একটুখানি নাডুগোপাল শূন্যতা আগলে বাখে।"

অশিক্ষিত, সংস্কাবগ্রস্ত, যৌনপীডিত ও ধর্মভীরু জাহাজীদেব নিযে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতাব সঙ্গে গল্পসৃষ্টিব ক্ষমতাকে মিশিযে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায ইতিপূর্বেই কিছু সার্থক কাহিনী সৃষ্টি কবেছেন। তাঁব 'বন্দবেব গল্প' ও 'সংশয়' এই ধাবায দুটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'আগুন জ্বালাবাব গল্প' অন্য চবিত্রেব। তবে, এই সক্ষম গল্পকাব তাঁব অধিকাবেব সীমা জানেন। তাই ভবঘুবে, উন্মাদ, উডনচণ্ডী, হাবাগোবা গাঁযেব মানুষ, ধর্মান্ধতা, স্বদেশী যুগ, পুব বাঙলা—এই বৃত্তেব বাইবে তিনি বড একটা যান না। ফলে, স্বভাবতই তাঁব বচনায ব্যাপ্তি অপেক্ষা কেন্দ্রিকতা বেশি। গ্রাম্য প্রবাদ, কিংবদন্তী, লোকভাষা, এমনকি অপ-ভাষাও তিনি যথেষ্ট যোগ্যতাব সঙ্গে উপবোক্ত গল্প তিনটিতে ব্যবহাব কবেছেন। যৌনতা, যৌন বিকাব, এই বিকৃতিতে অনুতাপ এবং একে অতিক্রমেব আকুল ইচ্ছা বিশেষ কবে 'বন্দবেব গল্প' বা 'আগুন জ্বালাবাব গল্প'-ব মূল বিষয। জাহাজেব বদ্ধ পবিবেশে দীর্ঘকাল থাকতে থাকতে প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীব প্রতি এক খালাসিব অমূলক সন্দেহ কিভাবে অশবীবী অবযব পেতে পেতে তাব দিন-বাত্রিব অস্তিত্বকে দাঁতে ছিঁডে দিচ্ছে, তাবই কাহিনী 'সংশয'। অতীন বন্দ্যোপাধ্যাযকে আমাব অত্যন্ত সৎ লেখক বলে মনে হয,

চবিত্রে একটু বেশি ইনভলভড ও প্যাশনেট। তিনি শক্তিমান বলেই তাঁকে হয়তো বলা প্রযোজন, শবীব নিযে সম্প্রতি তাঁব গল্পে বড বেশি কামডাকামডি দেখা যাচ্ছে। এ-ক্ষেত্রে তিনি বেশ একটু অবসেসড, তাই গল্পেব কোথাও কোনোগতিকে নাবীদেহ এসে পডলে পাঠকেব সমস্ত মুডকে তেতো না কবা পর্যন্ত তিনি যেন থামতে চান না। শ্লীল-অশ্লীল নয়, অনেকাংশে ইকনমিও যে শিল্পগুণ, তা নিশ্চয অতীন বন্দ্যোপাধ্যায জানেন।

স্থনীল গঙ্গোপাধ্যায তাঁব সমবযসী লেখকদেব তুলনায অনেক দেবিতে গল্প লেখা শুরু কবেছেন। তাঁব গদ্যে যে চটুল জর্নালিষ্টিক ধবন থাকে, 'মহাপৃথিবী' ও 'কুকুবেব ভাষ্য' গল্প দুটিতেও তাব ব্যত্যয ঘটেনি। লেখা দুটিতে ভাষাব সম্পন্ন গতিবেগ লক্ষ্য কবাব মতো। 'কুকুবেব ভাষ্য' এক কথায আঙ্গিক-সর্বস্ব, 'মহাপৃথিবী' গল্পে পেঁযাজ-বস্থনেব বাডাবাডি থাকলেও গল্পটিব বিস্তাব চোখে পডে। দুটি গল্পই বযঃসন্ধিব পাঠক-পাঠিকাদেব আকৃষ্ট কববে।

সৈযদ মুস্তফা সিবাজ তাঁব অভিজ্ঞতাব গভীবতা ও বচনা-স্বাতন্ত্র্যে আমাকে আলোডিত কবতেন। এবাব শবতে তাঁব লেখা গল্পগুলি পডে আমি গভীব বেদনা বোধ কবেছি। সিবাজেব কিছু পূর্বেকাব বচনা, বিশেষত তাঁব উজ্জ্বলতম গল্প 'শান্তিঘব', আমাব এখনো স্মবণে আছে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অদ্ভুত বযাটে ছন্নছাডা লেখা লিখছেন, যা প্রায অভাবনীয। তাঁব 'মৌর্গাযেব পথে ভোব' বা 'ইঁদুব' গল্পেব লুম্পেন চবিত্রগুলি আচাবে-ব্যবহাবে পাঠকেব কাছে কোনো সহানুভূতিই দাবি কবতে পাবে না। খিস্তি-খেউব, মেযে নিযে হল্লাবাজি, চূডান্ত অশালীন শব্দপ্রযোগ—বাঙালি লেখাব এই পথটি সিবাজ এত দ্রুত চিনে ফেলেছেন যে বিস্মিত হতে হয। তিনি আমাব প্রিয লেখক, অন্তত ছিলেন, তাই কথাগুলি আমায বীতিমতো দুঃখেব সঙ্গেই বলতে হচ্ছে। সম্প্রতি যে-পথ সিবাজ নিযেছেন, তা অন্তত তাঁব পথ নয।

এবই পাশাপাশি অভিনিবেশ, নিষ্ঠা ও মানবিকতাব গুণে ক্রমশ উল্লেখযোগ্য হযে উঠছে অমলেন্দু চক্রবর্তীব গল্প। গত শবতে 'আন্তর্জাতিক'-এব গল্পে তাঁব বচনাব এই মানোন্নযন বিশেষভাবে লক্ষ্য কবা গিযেছিল। 'আন্তর্জাতিক'-এ এবাবও তিনি একটি চমৎকাব ব্যঙ্গ গল্প লিখেছেন। তবে, এক কথায বলা চলে, এ-বছব 'পবিচয'-এ প্রকাশিত 'ইছামতী বহমান' গল্পে তিনি একটি স্মবণীয দিগন্ত স্পর্শ কবেছেন।

এ সেই পাসপোর্টবিহীন আমাদেব আবেগেব স্বপ্নেব বাঙলাদেশেব গল্প,

যেখানে এক দিকে মেঘ হলে অন্যদিকে বৃষ্টিপাত হয়। দেশবিভাগের পর কুড়নো মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে-আসা পালিকা মা ও তাঁর ছেলে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সীমান্তের কাছাকাছি এক জায়গায় এতদিনে হদিশ-পাওয়া মেয়েটির আসল মা-বাপের কাছে চলেছেন। নকল মা নকল দাদা দীর্ঘ একুশ বছরে আসল মা-দাদা হয়ে গিয়েছেন, সত্যি মা-বাবাকে মেয়েটি এ-যাবৎ দেখেনি। এমন কি জন্মসূত্রের কথাটিও মেয়ে মৃন্ময়ী অতি সম্প্রতি শুনেছে। সারা গল্প জুড়ে এক আশ্চর্য প্রাণস্পন্দন দপদপিয়ে উঠছে, পড়তে পড়তে কৃত্রিম বিভাগের প্রতিরোধ-কামনায় পাঠকের গলায় জন্মের কান্না দলা পাকিয়ে ওঠে। প্রথম থেকেই খুব উঁচু তারে বাঁধা হয়েছে গল্পটি, যা আগাগোড়া বজায় রাখা কম কৃতিত্ব নয়। এক দুর্যোগময়ী রাতে দু-বাঙলার মাঝখানে খণ্ডিতা বেদনাতুরা দুই সহোদরা দেশের প্রতীক মৃন্ময়ীকে দাঁড় করিয়ে লেখক পরম নৈপুণ্যে তার চেতনাপ্রবাহ উন্মুক্ত করেছেন, "রক্তের প্রবাহে ঝড় ওঠে, শরীরটা অবশ, মৃন্ময়ী চোখ বোজে। তোমরা কারা? কি চাও? আমি চিনি না। এই একুশ বছর ধরে বড়ো একটা আলোর জগতে আমার বড়ো হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতাটা কেড়ে নিতে চাও। তার আগে, তোমাদের অতীতের ভুল আর অন্যায়ের পাওনা আদায় করতে কেন তোমরা এলে? নিমজ্জিত অন্ধকারে বইছে ইছামতী, মৃন্ময়ী যেন তার স্পষ্ট কলধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। যদি ভেসে যেতে পারতাম সেই স্রোতে, বিপুল অন্ধকারে স্নিগ্ধ জলের ধারা, শীতল বাতাস, ডান-হাতে জল কাটলে সবুজ দিগন্ত, বাঁ-হাতে সেই একই সবুজ, একই মৌসুমী বাতাসে এ'পারে ও'পারে জল।"

লেখক গল্প জুড়ে পা টিপটিপ বিপদব্যঞ্জক এক রহস্যময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। বর্ডার-চেকপোস্ট, চোরা-চালানদার, মানুষ-পাচারের দালাল এবং তারই মাঝখান দিয়ে অনিদ্র পিতা-মাতার হারানো কন্যা-সন্ধান—সব মিলিয়ে এক দম-বন্ধ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মৃন্ময়ীকে মৃদু লণ্ঠনের আলোয় একবার মাত্র দেখে সেই পিতা-মাতা যখন ফিরে যাচ্ছেন, তখন, "শুধু শেষবারের মতো একবার, আলোর শেষ রেখায় পিছন থেকে সেই নারীমূর্তিকে আবছা দেখা গেল, তারপরই অন্ধকার, অন্ধকার, আর মনে হলো যেন একটা দূরাগত বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর—পারুলবাণী মালাকার, পিতা শ্রীশম্ভুনাথ মালাকার, সাকিন শুভড্ডা, কেরানিগঞ্জ থানা ঢাকা সদর, গোত্র বাৎস, বারী শ্রেণী।" গল্পটি অবশ্য এখানে সমাপ্ত হলেই ভালো হতো। অন্তে

ইতিহাসেব অধ্যাপক দাদাব বক্তৃতাটি যে কোনো অর্থে এমন গল্পে অচল ও অতিবিক্ত।

বৈজ্ঞানিক ফ্যান্টাসি, কৌতুক ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপেব সমন্বযে বাঙলা গল্পে এক সম্পূর্ণ নিজস্ব পটভূমি গডে তুলেছেন অমল দাশগুপ্ত। এক ডাযেবি-লেখকেব লেখা পডতে পডতে 'নেগেটিভ ও মাইনাস' গল্পে বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণেব শেষে লেখক সিদ্ধান্ত কবেন, "ওহে বিপ্লবী, তোমাব বযস সকালে না-বাহাত্তব, কেন-না তখন তুমি বুডোদেব সঙ্গে গঙ্গাস্নান কবো, মেক-আপ নেবাব সমযে না-উনচল্লিশ, চাকুবিস্থলে না-একচল্লিশ, বৌযেব কাছে না-পঁযতাল্লিশ, পলিটিক্যালি নেগেটিভ, অর্গানাইজেশনালি মাইনাস।"

সমস্ত আবেগ ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাস্তব কাণ্ডজ্ঞানবহিত মধ্যবিত্ত আদর্শবাদেব ব্যর্থতাব আব-একটি উল্লেখযোগ্য রূপাযণ তাঁব 'নিযতি'। দুটি গল্পেই লেখকেব লক্ষ্যভেদী হাত আমাদেব পবগাছা-জীবনেব ভেতবেব ছবিটাকে চোখেব সামনে উল্টেপাল্টে একেবাবে নগ্ন কবে তুলে ধবে। এ-জাতীয গল্প বাঙলায খুব পডেছি বলে মনে পডে না।

উপবোক্ত গল্পগুলি ছাডা এই শবতে প্রকাশিত যেসব গল্প পাঠকদেব আকৃষ্ট কবতে পাবে, সেগুলিব মধ্যে সত্যপ্রিয ঘোষেব 'যাচাই' (লেখা ও বেখা), মিহিব সেনেব 'মার্জাব হত্যাব উপাখ্যান' (পবিচয), চিত্ত ঘোষালেব ভিযেতনামেব ওপব গল্প 'শিকাব' (লেখা ও বেখা), মতি নন্দীব 'দেখতে আসা' (পথিক), ববেণ গঙ্গোপাধ্যাযেব 'কফি হাউস' (অন্বীক্ষণ) ও প্রলয সেনেব 'ডলিদি বিষযক গদ্য' (গল্প-কবিতা) উল্লেখযোগ্য। বিশেষ কবে ববেণ গঙ্গোপাধ্যাযেব গল্পটি। সত্যপ্রিয ঘোষ এবং মিহিব সেন এবাবও তাঁদেব বচনায সমাজচেতনাব দৃষ্টিগ্রাহ্য স্বাক্ষব বেখেছেন। তাছাডা, 'পবিচয'-এ একটি চমৎকাব গল্প—'পক্ষীবাজ'—লিখেছেন চিত্তবঞ্জন ঘোষ। এবাবেব অন্যতম সেবা গল্প।

•

বেশ কিছুকাল ভাটায কাটিযে বাঙলা গল্প আবাব জোযাবেব মুখে পডেছে, এব চেযে আশাব্যঞ্জক খবব গল্প-পাঠকদেব কাছে আব কীই বা হতে পাবে ?

অমিতাভ দাশগুপ্ত

বন্যার জল নেমে গেলে

চিন্মোহন সেহানবীশ

উত্তর বাঙলায় দু-মাস আগে যে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে গেল—তার বিভীষিকাজনক ও মর্মান্তিক নানা টুকরো টুকরো খবর এতদিনে বেশ কিছুটা প্রচারিত হয়েছে, বিশেষ করে বাঙলাদেশের পত্রপত্রিকায় (একমাত্র কালিম্পং ও মিরিক পাহাড় অঞ্চলের খবর সংবাদপত্র-পাঠকদের কাছে এখনো তেমন পৌঁছয়নি)। হয়তো তাই এখানে ঐসব ঘটনা পুনরাবৃত্তি করবার তেমন প্রয়োজন হতো না। কিন্তু বিপর্যয়ের পর হপ্তাখানেক কাটতে না কাটতেই সরকারী মহল থেকে যেভাবে ঐ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এড়িয়ে "সর্বত্রই অতি দ্রুত normalcy পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে" বলে থেকে থেকেই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হচ্ছে, তাতে (সেদিনকার সেই বিপর্যয়কালীন অবস্থার কথা না হয় বাদই দিলাম) আরো হালের কয়েকটা ঘটনা গোড়াতেই বলে রাখা দরকার:

জলপাইগুড়ি শহরের দোরগোড়ায়, তিস্তা যেখানে বাঁধ ভেঙে সর্বনাশ ঘটিয়েছে সেই পাহাড়পুর থেকে শুরু করে দোমহনি পর্যন্ত, আমরা ৪ঠা নভেম্বর তারিখেও দেখেছি হাজার হাজার গৃহহারা সর্বস্বান্ত মানুষ কোনোমতে পাট-কাঠির কুঁড়ে বানিয়ে আশ্রয় নিয়েছে বাঁধের উপরে প্রায় খোলা আকাশের নিচে। রাতের ঘুরঘুটি অন্ধকারে শীতের উত্তরোত্তর কনকনানি ও দাপটবৃদ্ধির মুখে যারা এভাবে রয়েছে, তাদের প্রতি-তিনটি পরিবারের জন্য বরাদ্দ একটি তেরপল—তাও দেখলাম অনেক পরিবারের কপালেই জোটেনি, আর পরিবার পিছু একটি কম্বল—তা সে-পরিবার দু-জনেরই হোক বা বিশ জনেরই হোক। এবং খাদ্যের বরাদ্দ? সারা দিনে একবার প্রাণধারণের মতো কয়েক হাতা খিচুড়ি। বিকেল চারটে নাগাদ দেখলাম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নামলেখা শালুজড়ানো একখানা ট্রাক দেখে শয়ে শয়ে ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ থালা হাতে আধ মাইল দূর থেকে ছুটে আসছে—ছুটতে ছুটতে কেউ কেউ পড়ে যাচ্ছে আছাড় খেয়ে, অন্যেরা দৌড়চ্ছে তাকে ফেলে, হয়তো তার উপর দিয়েই। তাদের তখন অন্নচিন্তাই অনন্যচিন্তা, বুঝি বা চব্বিশ ঘণ্টার পর এবার দু-মুঠো মিলবে। অথচ আমরা জানতাম সে ট্রাকে খিচুড়ি নেই।

সবকাবী normalcy-ব এই এক ছোট্ট নমুনা। এব তাবিখটাও মনে বাখা দবকাব—৪ঠা নভেম্বব, অর্থাৎ বিপর্যযেব পুবো একমাস পবে। আমাদেব সঙ্গে সেদিন ব্যাপাবটা প্রত্যক্ষ কবেছিলেন শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি।

তিস্তাব ওপাবে দোমহনিব ব্যাপাবটাও মনে পডে। দেখা গেল একটা মস্ত দিঘিব পাডে অনেক লোকের ভিড—দিঘিতে নাকি শুশুক লাফাচ্ছে। সত্যিই দেখলাম লাফাচ্ছে। কিন্তু শুশুক তো নদীব বাসিন্দে—এখানে এলো কি কবে? শুনলাম তিস্তাব বানে ভেসে এসে জল সবে যাওযাব পব নাকি আটকা পডে গেছে, আব সেই বানে সেখানকাব সাত-আট হাজাব মানুষেব ঘন বসতি ভেসে গিযে তৈবি হযেছে ঐ বিশাল দিঘি। সে সাত-আট হাজাব মানুষ তবে গেল কোথায? কিছু হযতো কোনোমতে প্রাণ বাঁচিযে ঐ বাঁধেব উপবে আশ্রয নিযেছে। আব বাকিবা? কেউ তাব সঠিক হদিশ জানে না—তবে মনে মনে একটা আঁচ কবে নেয।

মালবাজাবেব পথে যোগেশচন্দ্র টি এস্টেট-এব কাছে 'ক্রান্তিব হাট' নামে পবিচিত যে জাযগাটিতে শুনেছি পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রায বিশ হাজাব মানুষ কযেক বছব ধবে ধীবে ধীবে আস্তানা বেঁধেছিলেন—সেখানে আজ ধূ-ধূ প্রান্তব। বিপর্যযেব পব দ্বিতীযবাব ছিন্নমূল ঐ দুর্গতদেব জন্য যে আশ্রযপ্রার্থী শিবিব বসেছে, তাতে অদ্যাবধি সাডে ছ-হাজাবেব মতো শবণার্থী জডো হযেছে। আব বাকি সাডে তেব হাজাব? কিছু নিশ্চযই এদিক সেদিক ছডিযে ছিটিযে পডেছে। কিন্তু সে আব কত। বাকিবা? সঠিক জবাব কেউ জানে না—শুধু আঁচ কবে মনে মনে।

আসলে ঐসব গ্রামাঞ্চলেব মুস্কিল হচ্ছে, ওখানে এ-ধবনেব দুর্যোগে বাডি ঘবদোব একেবাবে নিঃশেষে এমনই মুছে যায যে হঠাৎ দেখলে টেব পাওযা শক্ত। দুর্বিপাক সেখানে জলপাইগুডি শহবেব মতো ইট-কাঠ-টিনেব বাশি বাশি ভাঙচুবেব প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রকট উদগ্রভাবে বেখে যায না। যতক্ষণ না সেখানকাব মানুষ বলছে—ঐ যে মস্ত শান্ত দিঘি বা বিশাল ধূ-ধূ প্রান্তব দেখছেন, ঐখানে মাত্র কযেকদিন আগে আপনাব-আমাব মতো দশ-বিশ হাজাব মানুষ বসবাস কবত—ততক্ষণ বাইবে থেকে আসা শহুবে মানুষেব চোখে প্রকৃতিব হিংস্র তাণ্ডবেব মাত্রা ধবাই পডবে না। তাব এই প্রচ্ছন্ন নির্মমতা কিন্তু জলপাইগুডি শহবেব প্রত্যক্ষ নির্মমতাব চাইতে কম নয—জীবন-হানি বা বৈষযিক ক্ষযক্ষতি কোনো দিক থেকেই না।

ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ানের কথায় মনে পড়ল—২৩শে অক্টোবর জলপাইগুড়ির সেনপাড়া ঘুরে পাহাড়পুরের পথে যেতে ('কম্পাস'-সম্পাদক শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত ও লোকসেবক সঙ্ঘের শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ সেদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন) দেখলাম, সরকারী কর্মচারীরা বেরিয়েছেন ক্ষয়ক্ষতির তত্ত্বতল্লাসির উদ্দেশ্যে। দেখলাম তাঁদের হিসেবের তালিকায় ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, গরুবাছুর, টাকা-কড়ি—সব কিছুরই নির্দিষ্ট কোঠা রয়েছে, নেই শুধু মানুষের জীবনহানির মতো তুচ্ছ ব্যাপারটার। কর্মচারীরা জানালেন ওটা নাকি থানা থেকে করা হয়।

কি ভাবে করা হয়, তাও একটু পরখ করে দেখা যেতে পারে। সকলেই শুনেছেন বিপর্যয়ের ফলে কালিম্পং বহির্জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। দেশী-বিদেশী ট্যুরিস্টদের সেখান থেকে হেলিকপ্টারযোগে উদ্ধারের চমকপ্রদ সব কাহিনীও পড়া গিয়েছিল কাগজে। তবু ৩১শে অক্টোবর যখন আমরা এক ট্রাক রিলিফের মালপত্র নিয়ে সেখানে পৌছই, তখন শুনলাম যে যুক্তফ্রণ্টের পক্ষ থেকে আমরা (আর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত মানিয়েন) সেদিনই নাকি কালিম্পং-এ সর্বপ্রথম বেসরকারী রিলিফ এনেছিলাম। অর্থাৎ বিপর্যয়ের ২৬ দিন পরে প্রথম সত্যকার রিলিফ পৌছেছিল সেখানে। কারণ এর আগে অবধি হেলিকপ্টারযোগে যে সরকারী রিলিফ পাঠানো হচ্ছিল, পরিমাণের দিক থেকে তার দৌড় নিশ্চয়ই খুব বেশি ছিল না। তারপর যেসব চাল বা গমের বস্তা ফেলা হচ্ছিল, তার অনেকটাই অপচয় হচ্ছিল খাদের গহ্বরে গড়িয়ে বা বস্তা ফেটে চাল ছড়িয়ে গিয়ে। তাছাড়া স্থানীয় লোকদের ধারণা—শেষপর্যন্ত যে-মাল ঠিক মতো পৌছচ্ছিল, তার একটা মোটা অংশ যাচ্ছিল সৈন্যবাহিনীকে খাওয়ানোর জন্যে।

আর কালিম্পং-এর সঙ্গে শিলিগুড়ির (কিছুটা মাল নেওয়ার মতো) যোগাযোগ যদি বা ঘটনার ২৬ দিন পরে গরুবাথান-লাভা-আলগাড়ার ৮৪ মাইল ঘুরপথে এখন কিছুটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কালিম্পং শহরের সঙ্গে কালিম্পং মহকুমার অন্যান্য অংশ এমন কি শহরের পনেরো মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত বসতি-গুলির সম্পর্ক কিন্তু এখনো প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই রয়েছে। এ-সব অঞ্চলে যে-ধ্বস নেমেছে, আমাদের মতো সমতলবাসীদের চোখেই যে তা অকল্পনীয় তাই শুধু নয়, পাহাড়ীরাও জানালেন যে তেমন ধ্বসের কথা তাঁরা তাঁদের বাপ-ঠাকুর্দার কাছেও কখনো শোনেন নি। শ্রীযুক্ত সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের মতো

প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিও লিখেছেন : "আমি বহুদিন যাবৎ পাহাড়েব সঙ্গে পবিচিত। কিন্তু এবারে কালিম্পং যাবাব সময় গরুবাথানে ঢোকাব পব থেকে কালিম্পং পর্যন্ত দু'ধাবে পাহাড়েব যে রূপ দেখলাম তা পূর্বে কখনো দেখিনি। সমস্ত পাহাড়েব গা যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে এবং যেখানেই ছোটোখাটো ঝোবা (ঝর্ণা) ছিল সে সমস্ত জায়গায় ধ্বস নেমে ভেঙেচুবে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে" (কালান্তব, ২৭শে নভেম্বব, ১৯৬৮)।

অথচ "বাংলাদেশেব পার্বত্য এলাকাব বিস্তৃততব অংশেব সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন না কবেই বাজ্য সবকাব মানুষ ও পশুব মৃত্যুসংখ্যা পাকাপাকি স্থিব কবে কেন্দ্রকে জানিয়ে দিয়েছেন" ('প্রলয়েব পব উত্তব বাংলা'—দেবেশ বায়, যুগান্তব, ২৪শে নভেম্বব, ১৯৬৮)। সবকাবী পবিসংখ্যানেব এমনই মাহাত্ম্য।

আসলে মৃত্যুসংখ্যা বা ক্ষতিব পবিমাণ হ্রাসেব চেষ্টা বা 'normalcy' পুনঃপ্রতিষ্ঠাব ঘনঘন ঘোষণা সবকারী মহল থেকে যে এত সজোবে প্রচারিত হচ্ছে, তাব কাবণ—"First phase is over", "এখন থেকে চলবে পুনর্বাসনেব কাজ"—এই অজুহাত তুলে তাঁবা এবাব বিলিফ দেওয়াব দায়িত্ব ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছেন (ঠিক এইভাবেই তাঁবা উত্তববঙ্গেব বিপর্যয়েব খবব প্রচাবিত হওয়াব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জলপাইগুড়িব নাম কবে মেদিনীপুবেব রিলিফেব কাজ গুটিয়ে নিতে শুরু কবেছেন)। অথচ সমস্যাটা মোটেই এখন বিলিফ বনাম 'বিহ্যাবিলিটেশন' বা বিলিফ আগে না পুনর্বাসন আগে—এই বকমেব নয়। মানুষকে অনির্দিষ্টকাল 'ডোল' দিয়ে নিশ্চযই ভিখিবিতে পবিণত কবা চলে না। তেমনি আবাব 'নিছক পুনর্বাসন'-এব বব তুলে এই মুহূর্তে জীবিকা-অর্জনে অসমর্থ, একান্ত দুর্গত মানুষেব আশু প্রযোজনকে উপেক্ষা কবলে তাব ফলও উত্তব বাঙলায বিশেষ কবে বন্যাক্লিষ্ট গ্রামাঞ্চল ও ধ্বস-বিধ্বস্ত পাহাড় এলাকায মাবাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। যেটা দবকাব সেটা হচ্ছে বহু মানুষকে এখনই জীবিকায পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কবা, আব সে-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়াব আগে পর্যন্ত বিলিফেব কাজও তাব পাশাপাশি চালাতে হবে। এমন কি, এখানেও শেষ নয়। কাবণ দেবেশ বায তাঁব 'যুগান্তব' পত্রিকাব প্রবন্ধে আমাদেব সামনে যে সঙ্গীন প্রশ্ন তুলেছেন—"সামনেব বর্ষায তিস্তাকে রুখবে কে?"—তাব খোঁচা নিবন্তব আমাদেব অন্তবে বিঁধছে। কাজেই উত্তববঙ্গেব পুনর্গঠন ও উন্নযনেব বহু বিলম্বিত ও অবহেলিত কর্মধাবায অবিলম্বে প্রাণসঞ্চাব কবতে হবে। অর্থাৎ একই সঙ্গে বিলিফ-বিহ্যাবিলিটেশন-বিকনস্ট্রাকশন—তিনটে কাজই চালাতে

হবে—কোনো উপায় নেই এ ছাড়া। গোঁজামিল দিয়ে সহজে কাজ হাসিলের চেষ্টা করলে অনতিবিলম্বে মারাত্মক আক্কেলসেলামী দিতে হবে।

কিন্তু এত দ্রুত একই সঙ্গে এত রকমের কাজ কি করা যাবে? করবেই বা কে? সরকারী তৎপরতা ও কর্মদক্ষতার যা নমুনা, এমন কি সংশ্লিষ্ট সরকারী আমলাদের অনেকেরই কাণ্ডজ্ঞান ও মানবিকতার দৌড়ও যে-রকম—তাতে সে দিক দিয়ে ভরসা রাখা কঠিন। অথচ সরকারকে বাদ দিয়ে তো উত্তর বাঙলার পুনর্গঠন বা পুনর্বাসন সম্ভব নয়, এমন কি রিলিফের ধারাবাহিকতা রক্ষা বা সুবন্দোবস্তও অসম্ভব।

আবার বেসরকারী রিলিফের ব্যাপারেও এবার একটা জটিলতা লক্ষণীয়। ১৯২২ সনের শেষে উত্তরবঙ্গ যখন বন্যায় ভেসে যায়, তখন তার জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে যে রিলিফ কমিটি গঠিত হয়—তার কর্মপরিচালক ছিলেন সুভাষচন্দ্র, প্রচারসচিব মেঘনাদ সাহা, সররবাহ ও মেডিকেল রিলিফ বিভাগের দায়িত্ব ছিল যথাক্রমে সতীশ দাশগুপ্ত ও ডাঃ জে-এম দাশগুপ্তের উপর। ঐ কমিটিই নগদে ও জিনিসপত্রে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা তোলে। সারা বাঙলাদেশে সেবার বেসরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিল ঐ একটিই কমিটি—দেশের শত শত তরুণ ও ছাত্র সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় নাম লিখিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে।

১৯৩১ সনে দামোদরের বন্যার সময়েও দেখেছি বাঙলাদেশে গড়ে উঠেছে একটি মাত্র সঙ্কটত্রাণ সমিতি। এবারেও তার সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। খবরের কাগজে রোজ 'দুর্গতদের দুঃখমোচনের' উদ্দেশ্যে ঐ সমিতির তহবিল ভরে তোলার জন্য বেরোত রবীন্দ্রনাথের আবেদন। আমার মতো শত শত তরুণ ও ছাত্র সেবারেও যোগ দিয়েছিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে।

তারপর ১৯৪২ সনে মেদিনীপুরের সেই ভয়ঙ্কর প্লাবনের সময় ও বর্মা থেকে যখন হাজার হাজার ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থী আসছিলেন তাঁদের রিলিফের বেলায় দেখেছি কংগ্রেসের তরফ থেকে যে-রিলিফের ব্যবস্থা হয়েছিল তার পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশন বা মাড়োয়াড়ি রিলিফ সোসাইটির মতো বহু প্রতিষ্ঠানও কাজে অগ্রসর হয়েছে। তবে ঐ সমস্ত বেসরকারী উদ্যমের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল বেশ একটা সহযোগিতার ভাব। ১৯৪৩ সনে মন্বন্তরের সময়েও ঠিক তাই—এমন কি মেডিকেল রিলিফের ক্ষেত্রে পিপলস রিলিফ কমিটির মতো যেসব সংস্থা অগ্রণী হয়েছিল, তাদের কাজের সুসমন্বয়ের জন্য

সেবাব ডঃ বিধানচন্দ্র বাযেব সভাপতিত্বে গঠিত হযেছিল বেঙ্গল মেডিকেল বিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি। মেডিকেল বিলিফ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সংস্থাব মধ্যে যথেষ্ট সহযোগিতা ছিল।

এবাবেও ছোটো-বড়ো বহু বেসবকাবী প্রতিষ্ঠান উত্তব বাঙলায় বিলিফেব কাজে নেমেছে। বাজ্যপালেব বা মেযবেব তহবিলে যেসব সজ্ঘ টাকা দিয়েছে, তাবা ছাড়া যাবা কিছুটা স্থাযীভাবে কাজ কবে চলেছে তাব মধ্যে বযেছে কংগ্রেস ও যুক্তফ্রণ্টেব পক্ষ থেকে দুটি কমিটি—বাজনৈতিক দলগুলিব মধ্যে অনেকেই এক্ষেত্রে কিছুটা নিজেব উদ্যোগেও কাজ কবছে। বাটা ইউনিযন প্রভৃতি শ্রমিক ইউনিযনগুলিও খুব উল্লেখযোগ্য কাজ কবেছে। পুবনো সংস্থাব মধ্যে ইণ্ডিযান মেডিকেল এসোসিযেশন ও পিপলস বিলিফ কমিটি বেশ ব্যাপকভাবে কাজ কবছে। কিন্তু বামকৃষ্ণ মিশন বা মাডোযাবী বিলিফ কমিটিব নাম তেমন চোখে পড়ল না। তবে এবাব খুবই ব্যাপক ও সুষ্ঠুভাবে কাজ কবছে ভাবত সেবাশ্রম সজ্ঘ। এমন কি 'আনন্দ মার্গ'-ব মতো সংস্থাও দেখলাম কিছুটা কাজে নেমেছে। এ-ছাড়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালযেব অধ্যাপক এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদেব সমিতি, মহিলাদেব জাতীয ফেডাবেশন, সবোজনলিনী সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ কবছে। এবাবে কিন্তু বিভিন্ন সংস্থাব মধ্যে ন্যূনতম সহযোগিতাব অভাব প্রকট—ববঞ্চ কিছুটা তীব্র বেষাবেষিই বযেছে আগামী নির্বাচনেব তাডনায। অথচ গত বিপর্যয সামাল দিতে ও আগামী বর্ষাব সম্ভাব্য বিপর্যয ঠেকাতে এই মুহূর্তে সব থেকে যা প্রযোজন তা হলো সামগ্রিক জাতীয় উদ্যম।

তাহলে ভবসাব ভাঁডাব কি একেবাবেই শূন্য ? এখানে কযেকটি ঘটনা উল্লেখ কবব, আপাতদৃষ্টিতে যেগুলি সামান্য মনে হলেও আগামী দিনেব পক্ষে যাদেব তাৎপর্য অপবিসীম।

প্রথমেই মনে পড়ে দুর্গত জলপাইগুডিব উদ্দেশে শিলিগুডিবাসীদেব সেই আশ্চর্য অভিযানেব কথা—ছেলে-বুডো, মেযে-পুরুষ, ছাত্র-তরুণ, শিক্ষক-অধ্যাপক, ডাক্তাব-উকিল, দোকানী-ব্যবসায়ী, বাস-ট্রাক-ট্যাকসি ড্রাইভাব, বিকসাওযালা, বাস্তাব মানুষ এমন কি এতদিন বখা ছেলে বা পাড়াব মাস্তান বলে যাবা পরিচিত ছিল তাবাও—সবাই ছুটে গিযেছিলেন তৃষ্ণাব জল, ক্ষুধাব অন্ন, ঘবেব আলো যোগাতে। অথচ এত বড়ো অমিতশক্তি একটা সামগ্রিক উদ্যোগেব পিছনে সবকাবেব বা কোনো পার্টিব উদ্যোগ বা পবিকল্পনা ছিল না—হঠাৎ কেমন

একটা মানবিকতার প্রবল জোয়ারে সেদিন ভেসে গিয়েছিলেন সারা শিলিগুড়ি শহরের আপামর জনসাধারণ। আর যে-শক্তি সংহত করার মধ্যেই রয়েছে আমাদের প্রধান ভরসা, যে-শক্তির ওপর ভর করে সত্যিই অসাধ্য সাধন সম্ভব-তাকেই ফরমান ঝেড়ে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে নষ্ট করে দেওয়া হলো বিশৃঙ্খলার অজু-হাতে—এমনই সরকারী আমলাদের কল্পনাতীত মূঢ়তা। আসলে এ-সব আমলাদের গোড়ার থেকেই শেখানো হয় মানুষকে অবিশ্বাস করতে, জনশক্তির উন্মেষ বা সাধারণ মানুষের উদ্যোগমাত্রকেই ছলে বলে কৌশলে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে। তবু ঐ মানবিক দৈন্যের পাশে আরো যেন উজ্জ্বল মনে হয় শিলিগুড়ির মানুষের তিন দিনের সেই অবিস্মরণীয় অভিযান-পর্ব।

দ্বিতীয়ত, দুর্গত উত্তর বাঙলার সাহায্যে এবার আপনা থেকেই এগিয়ে এসেছেন সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষ—শুধু কলকাতা বা বাঙলাদেশের নয়, সুদূর দিল্লী থেকেও এসেছে টাকা, জামাকাপড়, কম্বল, ওষুধ, গুঁড়ো দুধের টিন। বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজকর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, বহু শ্রমিক বহু কর্মচারী একদিনের মাইনে দিয়েছেন, শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদল নিজের রিলিফ বিতরণ করেছেন, মহিলা সমিতি, শিক্ষক-অধ্যাপক সঙ্ঘ, ছাত্র-যুব সঙ্ঘের কর্মী ও লেখক-শিল্পিরা পথে নেমেছেন, অনুষ্ঠান করেছেন সাহায্য সংগ্রহের জন্য। বিশেষজ্ঞরা যেমন একদিকে সুপরামর্শ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তেমনি ছোটো ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তাদের জামা-কাপড় খাতা-পেন্সিল পাঠিয়েছে তাদের ভাই-বোনেদের জন্য। এত ধরনের এতগুলি মানুষের এমন আন্তরিক প্রয়াস কোনোমতেই ব্যর্থ হতে দেওয়া চলে না।

তৃতীয়ত, আমরা যখন দার্জিলিং বা কালিম্পং-এ রিলিফ নিয়ে গেলাম তখন সেখানকার রিলিফ কমিটির নেতারা প্রথমেই আমাদের ধন্যবাদ জানালেন এই জন্যে যে সমতলবাসীদের তরফ থেকে আমরা পার্বত্য অঞ্চলবাসীদের জন্য সাহায্য নিয়ে গেছি। অথচ আমরা তখন যেহেতু জলপাইগুড়ি, দোমহনি, মালবাজার, আলিপুর ডুয়ার্স—সর্বত্রই রিলিফ নিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ব্যাপারটা আমাদের কাছে মোটেই ঐভাবে প্রতিপন্ন হয়নি। ওঁদের কথা শুনে বুঝলাম না-জেনে আমরা আরো-একটা কাজ করেছি এবং কিছু মানুষের কাছে সে-কাজের আরো-একটা তাৎপর্য রয়েছে। সুতরাং পাহাড়ী ও সমতলবাসীকে এক সূত্রে বাঁধবার জন্য এই দুর্যোগেরও একটা সুযোগ নেওয়া সম্ভব। আর তার থেকে যে-শক্তি উদ্ভূত হতে পারে, তা আদৌ তুচ্ছ নয়।

সর্বশেষে, আমাদের সঙ্গে কয়েকজনের দেখা হলো যাঁরা তিস্তার বানে ভেসে গিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে। তাঁরা একবাক্যে পাকিস্তানের মানুষ ও সরকারের সুবুদ্ধির তারিফ করলেন। তাঁরা বানভাসি মানুষদের উদ্ধার করেছেন, তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেছেন, খাইয়ে-দাইয়ে রিলিফ ক্যাম্পে রেখে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন ভারতবর্ষে। এইসব খবর শুনে মনে হলো যে উত্তর বাঙলার পুনর্গঠনে—বিশেষ করে সেখানকার নদীশাসন ও বন্যারোধ সত্য-সত্যই করতে হলে—যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের সাহায্য অপরিহার্য, তাই পাকিস্তান সরকারের তরফে এ-ধরনের সুবিবেচনা ও সহযোগিতা আগামী দিনের পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ।

বন্যারোধের জন্য বিশেষজ্ঞরা যে-পথ দেখাবেন—তা কার্যকর করতে গেলে মনে হয় আমাদের আগামী দিনের কর্মকাণ্ডকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সরকারী তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে এইসব মানবিক সুলক্ষণগুলির পরিপূর্ণ বিকাশের উপরেই।

পুস্তক-পরিচয়

যুগের আলো (মার্কসবাদের গোড়ার কথা) : অনল রায়। মৈত্র প্রকাশনী। ২৬।২ বি, বেনিয়া-টোলা লেন, কলিকাতা-৯। দ্বিতীয় সংস্করণ—ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮। দাম : ন-টাকা

ছোটদের রাজনীতি : নীহার সরকার। পুঁথিঘর প্রাইভেট লিমিটেড। ২২, বিধান সরণি কলিকাতা-৬। সংশোধিত নূতন সংস্করণ—জুলাই, ১৯৬৭। দাম : দু-টাকা

ছোটদের অর্থনীতি : নীহার সরকার। পুঁথিঘর প্রাইভেট লিমিটেড। ২২, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। চতুর্থ প্রকাশ—এপ্রিল, ১৯৬৫। দাম : দু-টাকা

কমিউনিজম কি ? : চিন্মোহন সেহানবীশ। কালান্তর প্রকাশনী। ১৯, ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-২৯। চতুর্থ প্রকাশ—১লা মে, ১৯৬৮। দাম : পঞ্চাশ পয়সা

কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট পার্টি : পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী। কালান্তর প্রকাশনী। দাম : পঞ্চাশ পয়সা

আজ যখন সব রাস্তারই গতি সাম্যবাদের দিকে এবং পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা ধরে ভারতবর্ষের ইতিহাসও যখন সেই দিকেই এগুচ্ছে, তখন সাম্যবাদের চর্চা আজ আমাদের জীবনের একটি অপরিহার্য প্রয়োজন বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। সাম্যবাদের ব্যবহারিক দিক বাদ দিয়ে এর চর্চা হয়তো সর্বথা সার্থক নয়, আবার গভীর পঠন ও অনুশীলন ছাড়াও যে সাম্যবাদকে অনুধাবন করা একেবারেই অসম্ভব সে-প্রসঙ্গে তার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা বলে গেছেন, "যেহেতু সমাজতন্ত্রবাদ বর্তমানে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, সুতরাং একে বিজ্ঞান হিসেবেই বুঝবার চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ একে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা উচিত।" (এঙ্গেলস) গভীর অধ্যয়ন ছাড়া বিজ্ঞান আয়ত্ত করবার চেষ্টা আর কিভাবে সার্থক হতে পারে ?

সুতরাং বাঙলাদেশে বাঙলাভাষায় সাম্যবাদের উপর যত আলোচনা হয়, এর উপরে যত বই-পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, ততই ভালো। এই প্রকাশন এবং আলোচনা আজ পর্যন্ত যতটুকু হয়েছে, তাকে পূর্ণ মূল্য দিতেই হবে। এতদ্‌সত্ত্বেও ফাঁকও যে অনেকখানিই থেকে গেছে. তাও মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি ? সেই জন্যই নতুন পুরনো বই যত বেশি ছাপা বা পুনর্মুদ্রিত হয়, ততই তা আনন্দের।

কিন্তু তবুও সাম্যবাদ বা মার্কসবাদ সম্বন্ধে অনেক লেখাই হাতে পাবার পর অনেক সময় 'খানিকটা বিব্রত বোধ করতে হয়, এ-কথা স্বীকার করা

উচিত। কোনো কোনো সময়ে শুধু ফর্মুলা বা সূত্রাকাবে এই বিজ্ঞানকে উপস্থাপিত কববাব চেষ্টাব ফলে বচনায যে খানিকটা দুর্বোধ্যতাব সঞ্চাব হয, অতীতে কোনো কোনো বইয়েব ক্ষেত্রে তা আমবা দেখেছি। অধ্যাপক কোশাম্বীব 'An Introduction to the study of Indian History' বা গোপাল হালদাব মহাশযেব 'সংস্কৃতিব রূপান্তব'-এব মতো সব বইযে ভাবত-ইতিহাসেব বিজ্ঞানসম্মত চর্চা আশা কবা অনুচিত। কিন্তু প্রাথমিক সাম্যবাদী সাহিত্যেব ইতিহাসেব বস্তুবাদী ব্যাখ্যায গ্রীস বোম আব ইওবোপেব ইতি-হাসেব উদাহবণেব এত ছডাছডি থাকে, আব আমাদেব দেশেব কথা ঠিক সেই অনুপাতেই থাকে এমন অনুপস্থিত, যে, এব মূল বক্তব্য মেনে নিলেও পুবোপুবি খুশী হওযা যায না। চর্বিতচর্বণেব প্রযাস, দুর্বোধ্যতা এবং আমাদেব দেশেব ইতিহাস-সাহিত্য-দর্শন ইত্যাদিব সঙ্গে সম্পর্ক-বহিত ইতিহাসেব কাঠামো তুলে ধবাব ফলে মনে হয়, এ-দেশে সাম্যবাদী সাহিত্য যতটা গ্রাহ্য বা আদবণীয় হতে পাবত তা হয নি। উপবোক্ত কাবণগুলিই তাতে বাধাব সৃষ্টি কবেছে।

এখানে মার্কসবাদ সম্পর্কিত পাঁচখানি বই সম্বন্ধে খানিকটা মূল্যাযনেব চেষ্টা কবা হযেছে। এ-প্রসঙ্গে আগে শুধু এইটুকু বলে নেওযা প্রয়োজন যে শ্রীঅনল রাযেব বইখানা এবং অন্য চাবখানা বইযেব মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রযেছে। অনলবাবুব বইতে সামগ্রিকভাবে মার্কসবাদকে বুঝবাব-বোঝাবাব প্রযাস আছে, অন্য বইগুলিব পবিধিব মধ্যে সবকিছু বলাব অবকাশ কম। সুতবাং এক মাপকাঠিতে বইগুলিকে মাপাব চেষ্টা যুক্তিযুক্ত হবে না।

নীহাব সবকাব মহাশযেব 'ছোটদেব অর্থনীতি' ও 'ছোটদেব বাজনীতি' সম্বন্ধে এ-কথা খুশী মনে বলা যায, তিনি তাঁব বইয়ে দুর্বোধ্যতাকে পবিহাব কববাব চেষ্টায সফল হযেছেন। এসব বচনায খানিকটা দুরূহতা হযতো বা অপবিহার্য (যদিও মার্কসবাদেব মূল প্রবক্তাদেব লেখাব সহজবোধ্যতায বহু ক্ষেত্রেই বীতিমতো অবাক হতে হয়), কিন্তু কিশোবদেব জন্য লেখা বলেই মনে হয নীহাববাবু তাঁব বচনাকে যতদূব সম্ভব সহজ কববাব চেষ্টা কবেছিলেন এবং বই দুটির যথেষ্ট জনপ্রিয়তাই প্রমাণ কবে যে তাঁব চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। এতে অর্থনীতিব মূল কথা, পুঁজিবাদ, পুঁজিবাদেব কেন্দ্রীভবন, পুঁজিবাদী শোষণ ও সঙ্কট, সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, মানুষেব ইতিহাসেব বিভিন্ন স্তব, সামন্ত-তন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রবাদ, ফ্যাসিবাদ, সাম্যবাদ প্রভৃতি আলোচিত হযেছে।

নীহাববাবু যখন বই দুটি প্রথম লিখেছিলেন, সেই দ্বিতীয মহাযুদ্ধ চলাকালে, তখন সাম্যবাদী চিন্তাধাবা ছাত্রসমাজে সবেমাত্র যথেষ্ট আলোডন তুলেছে। কিশোবদের ক্রমবর্ধমান পবিণতিব মুখে বই দুখানি তখন একদিক দিযে প্রায ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন কবেছিল। আব আজ যখন সাম্যবাদেব বিশ্বব্যাপী বিজয়যাত্রা পৃথিবীব সর্বত্র তরুণ-মনে গভীব বেখাপাত কবেছে, "নান্য-পন্থাঃ বিদ্যতে অযনায" এই প্রতীতি যখন গভীবে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে এবং আমাদেব দেশেও যখন সাম্যবাদ প্রবল শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ কবছে—তখন এই বইযেব মূল্য আগেব থেকেও বেশি বলেই সিদ্ধান্ত কবা যেতে পাবে। সুতবাং বোধকবি বহুদিন বাদে বই দুটি পুনর্মুদ্রিত কবে গ্রন্থকাব ও প্রকাশক একটি প্রশংসাব কাজ কবেছেন।

তবে, আমাদেব দেশেব পবিবর্তিত পবিস্থিতিতে বই দুটিতে কিছু নতুন বক্তব্য সংযোজিত হলে আবো ভালো হয বলে আমাদেব ধাবণা। ভাবতে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাব মার্কসবাদী ব্যাখ্যা, এই পবিকল্পনাব ব্যর্থতাব কাবন এবং বিশেষ কবে যুবসমাজে ক্রমবর্ধমান বেকাবীব ভযাবহতা—এ-বিষযে আলোকপাত কবে পববর্তী সংস্কবণে অর্থনীতিব বইটিকে আবো মূল্যবান কবা যায না কি? আব গান্ধীবাদ নেহরুবাদ হিন্দু-বাষ্ট্রবাদ ইত্যাদিব পটভূমিতে বুর্জোযা বাজনীতিব দেউলিযাপনা এবং বিভিন্ন ছলচাতুবিব উপবে বাজনীতিব বইযে একটি 'পলেমিক' অধ্যায জুডে দেওযা সম্বন্ধে নীহাববাবুব কি অভিমত?

চিন্মোহনবাবুব 'কমিউনিজম কি?' বইটিকে একটি সার্থক বচনা বলতে আমাদেব কোনো দ্বিধা নেই। নীহাববাবু ছোটদেব জন্য লিখেছিলেন, সুতবাং তাঁব আলোচনায সাম্যবাদেব অনেক কথাই তিনি বাদ দিযে গেছেন। চিন্মোহন-বাবুব বইও সেই ধবনের একটি বই যাতে এব বহুমুখী আলোচনাকে পবিহাব কবা হয়েছে। কিন্তু এই বচনাব গতি স্বচ্ছ ও সবল। চিন্মোহনবাবু তাঁব বই শুরু করেছেন এই কথাগুলি দিযে, "কমিউনিজম, কমিউনিস্ট, কমিউনিস্ট পার্টি—চাবদিকেই আজকাল এ-সব কথাব ছডাছডি। পছন্দ কবি চাই না-কবি আমাদেব সবাইকেই এখন এই নিযে মাথা ঘামাতে হচ্ছে অল্পবিস্তব। যে-কোন দিন খববেব কাগজ খুললেই দেখা যাবে কেউ হযত একে ভালো বলছেন, কেউ বা গাল পাডছেন, কিন্তু কাবোই যো নেই এ সবেব থেকে

একেবাবে মুখ ঘুবিয়ে বাখাব। কাবণ ববীন্দ্রনাথেব ভাষায এ-ই হচ্ছে এ-যুগেব সব চাইতে 'বড খবব।'

"কমিউনিজম কি? ভালোমন্দ বিচাবেব কথা পবে—আগে জানা দবকাব ব্যাপাবটা ঠিক কি।"

ব্যাপাবটা বোঝাতে গিযে সেহানবীশ মহাশয ইতিহাসেব ক্রমবিকাশেব ধাবাটি প্রথমে সংক্ষেপে বিবৃত কবেছেন এবং শ্রেণীসংগ্রাম যে একটি আমদানীকৃত তত্ত্ব নয, এটি যে তথ্য এবং সমাজ-সত্যেব স্বীকৃতি, তা ব্যাখ্যা কবেছেন। এই ক্রমবিকাশেব বিশ্বজনীন পথে আমাদেব দেশেও সাম্যবাদেব আবির্ভাব যে অবশ্যম্ভাবী, তিনি উপসংহাবে তাই দেখিযেছেন। যে দুই কাবণে চিন্মোহনবাবুব বইটি বিশেষ প্রশংসাব দাবি বাখে, তা হলো—

প্রথমত, তিনি অতি সাবলীল বচনাশৈলীব আশ্রয় নিযেছেন। যুক্তি-বহুল বচনাও যে সুখপাঠ্য হতে পাবে, এই বইটি তাব একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, তাঁব আলোচনাব মধ্য দিযে সাম্যবাদ সম্বন্ধে কতগুলো সাধাবণ্যে প্রচলিত সংশযেব নিবসন কবতে তিনি অগ্রসব হয়েছেন। তাতে বইটিব মূল্য বেডেছে—যেমন, ক্ষুদে মালিকদেব সম্পত্তি সম্বন্ধে কমিউনিস্টবা সর্বস্তবেই ততটাই বিরূপ কিনা যতটা বিরূপ বৃহৎ পুঁজিব সম্পত্তি সম্বন্ধে, কমিউনিজম সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তিবই উচ্ছেদ কবতে চায, না শুধু সম্পদসৃষ্টিব উপাযগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানাব হাত থেকে উদ্ধাব কবতে চায, কমিউনিজম মানে হিংসা, না হিংসাব মূলোৎপাটন, স্থূল ভোগবিলাস, না পূর্ণ মনুষ্যত্বেব বিকাশ-সাধন ইত্যাদি। যদিও ভূমিকায লেখক বলেছেন "ভালোমন্দ বিচাবেব কথা পবে," তবুও তাঁব বিভিন্ন আলোচনা এই কথাই প্রতিষ্ঠা কবেছে, যে, কমিউনিজম শুধু ইতিহাসেব বিধানই নয, এ মানুষেব পক্ষে সব চাইতে ভালো।

চিন্মোহনবাবুব বই সাধাবণ পাঠকেব জন্য হলেও, মনে হয, তা খানিকটা পবিমাণে কমিউনিস্ট পার্টি-কর্মীদেব পবিচ্ছন্নতাব (clarification) জন্যও বটে। পাঁচুগোপাল ভাদুডীব বই পডলেই বোঝা যায, এটি সর্বাংশে পার্টি-কর্মীদেব উদ্দেশ্য কবেই লেখা। তাই বোধ কবি লেখাটিব মধ্যে খানিকটা ফর্মুলা-প্রবণতা আছে। নীহাববাবুব ও চিন্মোহনবাবুব বইয়েব মধ্যে অনেকখানি ব্যাখ্যা কবাব প্রচেষ্টা, আব এখানে প্রধানত কতকগুলো বিষয় বলে দেওযা। আগেব দুই লেখক দুটি বিষযেব আলোচনা একেবাবে বাদ দিযে গেছেন, এই বইতে

সে-আলোচনা যথেষ্ট প্রাধান্য পেযেছে—একটি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, মার্কসবাদী দর্শন, অপবটি কমিউনিস্ট পার্টি। প্রকৃতপক্ষে এই আলোচনাই বইযেব প্রধান আলোচনা। দর্শন-সংক্রান্ত আলোচনায লেখক 'বিবোধ'-এব উপবে খানিকটা বিস্তৃত বক্তব্য পেশ কবেছেন—যেমন, ভিতব ও বাইবেব বিবোধ, স-বৈব ও নির্বৈব বিবোধ, প্রধান বিবোধ ইত্যাদি। শ্রেণীসংগ্রামেব বণকৌশল ও বণনীতি এবং বিচ্যুতিব বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এই দুটি অধ্যাযে ভাদুডী মহাশযেব বক্তব্য শ্রদ্ধা-সহকাবে বিবেচিত হবে, কিন্তু সে-বক্তব্য সম্বন্ধে বোধ কবি মতভেদেবও অবকাশ বযেছে।

অনল বায বচিত 'যুগেব আলো' বইটি আগেব বইগুলিব তুলনায অনেক ব্যাপক (comprehensive) এবং তাব আবেদনও নতুন এক-ধবনেব পাঠকেব কাছে, যদিও কারুব কাছেই যে এ-বইয়েব আবেদন কম তা মনে কববাব হেতু নেই। লেখক মার্কসবাদী চিন্তাধাবাকেই এই যুগেব আলোক-বর্তিকা বলে চিহ্নিত কবেছেন। নীহাববাবু, চিন্মোহনবাবু ও পাঁচুগোপাল-বাবুব লেখা যেখানে মূলত ছাত্র, পার্টি-কর্মী বা পার্টি-দবদী মহলেব উদ্দেশেই বচিত, অনলবাবু সেখানে তাঁব বই লিখেছেন গোটা বুদ্ধিজীবী মহলেব জন্য, বিশেষ কবে কমিউনিজম-বিবোধী পণ্ডিতম্মন্য সম্প্রদাযকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কবাব ঢঙে। তা কবতে গিযে লেখক একদিকে যেমন ভূবি ভূবি বচন ও উদাহবণ উদ্ধৃত কবে ভাবতীয (এবং বিদেশীও বটে) প্রতিক্রিযাব বিরুদ্ধে সুতীব্র আক্রমণ পবিচালনা কবেছেন, অপবদিকে তেমনি ভাবতীয ঐতিহ্যেব প্রগতিশীল দিককেও স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য কবেন নি। তাঁব লেখায অন্তত মার্কসবাদেব কষ্টিপাথবে ভাবতেব ইতিহাস-সাহিত্য-দর্শনেব নিবীক্ষাব সাধু প্রচেষ্টাব মনোজ্ঞ পবিচয় মেলে। অপব বইগুলিতে যেখানে মূলত ইতিহাসেব বিশ্লেষণে প্রায শুধু অর্থনীতি ও বাজনীতিকেই বেছে নেওযা হয়েছে, অনলবাবু সেখানে ধর্ম-দর্শন-শিল্প-সাহিত্য সব বকমেব superstructureকেই যথাযোগ্য গুরুত্ব দিযেছেন।

এবং এই বইযে মার্কসবাদ গ্রহণে বাধা কোথায এই প্রশ্ন তুলে সংশয়বাদী বা বিরুদ্ধবাদীদেব বহুক্ষেত্রে বুদ্ধিব দ্বন্দ্বে আহ্বান কবা হযেছে। হয়তো সেই জন্যই বচনা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিব দীপ্তিতে উজ্জ্বল, "আপন মনেব মাধুবী" মেশানব ফলে শাণিত স্বকীযতায ভবপুব। বিজ্ঞান-আলোচনায়

ব্যক্তিমানসের আধিক্য অনেক সময়ে বর্জনীয় মনে হতে পারে, কিন্তু মার্কসবাদ যেহেতু সমাজ-বিজ্ঞান এবং শোষকের প্রতি সুতীব্র ঘৃণা ও শোষিতের প্রতি তীব্র মমত্ববোধ যেহেতু এই বিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেইহেতু সার্থক মার্কসবাদী রচনায় ব্যক্তিমানসের প্রতিফলন খানিকটা অনিবার্যও বটে। স্বয়ং মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের লেখায় এর অজস্র প্রমাণ মেলে। সেদিক দিয়ে অনলবাবু মহাজন-অনুসৃত পন্থা ধরেই অগ্রসর হয়েছেন। এই পটভূমিতে ভারতের সনাতনত্বের প্রতি মাঝে মাঝে অনল-বাবু যে সুতীক্ষ্ণ অনল-বাণ বর্ষণ করেছেন, তা অতীব কালোপযোগী হয়েছে।

'যুগের আলো'র পরিসর যে কতটা বিস্তৃত এবং তার আলোচনা যে কতটা বহুমুখী, তা এর সতেরটি অধ্যায়ের কয়েকটির নাম-উল্লেখের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট হবে। এর মধ্যে রয়েছে: সমাজে ধর্মের স্থান, ভাববাদ ও বস্তুবাদ, জ্ঞানের স্বরূপ, আবার রয়েছে সাম্যবাদী সমাজে নারীর স্থান, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা এবং কর্ম-প্রেরণা। এ ছাড়া অবশ্য আলোচ্য অন্যান্য বিষয় তো আছেই।

বইয়ের শেষাংশে অনলবাবুর একটি আবেগপূর্ণ গভীর জিজ্ঞাসাই বইটির মর্মবস্তুকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে, যেখানে তিনি মার্কসবাদই ভবিষ্যতের দিশারী—এই আলোচনার উপসংহারে বুদ্ধিজীবীদের দরবারে এই প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছেন: "পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা কি ধনিকের উচ্ছিষ্টভোজী হয়ে 'মারণাস্ত্রের মিস্ত্রী'র হীন জীবন যাপন করবেন, না, তারা হবেন মানুষের সৃষ্টি-লীলার শ্রেষ্ঠ শিল্পী? বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক সাহিত্যিকেরা কি আজ অর্থ সম্পদের লোভে ধনিকের স্তুতিগান করবেন, না, সত্যের পথ, রসস্রষ্টার আদর্শ পথ, বেছে নেবেন? মানব-সভ্যতার ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁরা কি আজ রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে মার্কসবাদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করবেন না?"

সাহিত্যরস-আস্বাদনের মধ্য দিয়ে যাঁরা মার্কসবাদের পরিচিতি লাভ করতে চান, 'যুগের আলো' তাঁদের কাছে একান্ত আদরণীয় হবে।

পরিশেষে নীহারবাবুর এবং ভাদুড়ী মহাশয়ের বই সম্বন্ধে সবিনয়ে দু-একটি কথা নিবেদন করতে চাই। নীহারবাবু বহু স্থানে বাঙলা শব্দের পাশে প্রচলিত ইংরাজী শব্দকে স্থান দিয়েছেন। এটা সমীচীনই হয়েছে। কিন্তু ক্যাপিটালিজম ইম্পেরিয়ালিজম প্রভৃতি কতকগুলো শব্দ কি সুপরিচিত বাঙলা পরিভাষা দিয়েই চালানো সম্ভবপর ছিল না? আর পাঁচুগোপালবাবুর বইয়ে পুঁজি

প্রভৃতি বহু গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ছাপাতে পূর্বাপর বানান ভুল চোখে পীড়ার উদ্রেক করে।

শেষ করার আগে, মনে হয়, আজকের দিনে অমিত সেনের 'ইতিহাসের ধারা', অনিল মুখোপাধ্যায়ের 'সাম্যবাদের ভূমিকা,' রেবতী বর্মনের কোনো কোনো বই হাতের কাছে পাওয়া গেলে বাঙলায় মার্কসবাদী পুঁথির আপেক্ষিক দারিদ্র্য হয়তো আরো খানিকটা মোচন হতো। এই প্রসঙ্গে খুবই আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি গোপাল হালদার মহাশয়ের মূল্যবান রচনা 'সংস্কৃতির রূপান্তর' কিছুকাল আগেই পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

সুবোধ দাশগুপ্ত

কয়েকটি চিত্রপ্রদর্শনী

কলকাতাব আর্টগ্যালাবিগুলিতে চিত্রামোদীদেব সংখ্যা ক্রমান্বযে হ্রাস পাচ্ছে। অবশ্য চিত্রামোদীব ভূমিকা নিযেছেন শিল্পিবা নিজেই। এব অর্থ স্পষ্ট : পৃষ্ঠকণ্ডূযন। ফলত কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ সেই মাপকাঠি এখন নিরুদ্দিষ্ট। নিবপেক্ষ চিত্রামোদী হয়তো-বা সংবাদপত্রে কলা-সমালোচনা পড়ে ছবি, স্থাপত্য বা ভাস্কর্য দেখতে গেলেন। কিন্তু ফিবে এলেন দিশেহাবা হযে। অর্থাৎ যা পড়ে গেলেন, তাব সঙ্গে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাব প্রাযই কোনো মিল ঘটল না। বেশিব ভাগ দর্শকই তখন ভাববেন—হযতো তাঁদেব শিল্পবোধ মানানুগ নয, দু-একবাব দেখে যখন এব পৌনঃপুনিকতা দেখা দেয়, তখন তাঁবা প্রদর্শনীতে না যাওযাই নিবাপদ মনে কবেন। কিন্তু আসলে ব্যাপাবটা অন্য-বকম। তথাকথিত "বোদ্ধা কলাসমালোচকবা" অনেকে ছবি দেখে লেখেন না, লেখেন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও বন্ধুত্বেব পবিমাপ অনুযায়ী। বলাবাহুল্য, দু-চাবজন আছেন যাঁদেব লেখা এব ওপব নির্ভব কবে না, অবশ্য তাঁবা বেশি দিন টিঁকতে পাবেন না। সুতবাং আমবা নিশ্চয় ধবে নিতে পাবি যে, শিল্পমান অবনমনেব জন্য দাযিত্বজ্ঞানশূন্য সমালোচনা অনেকটাই দাযী।

অন্যত্র এই প্রসঙ্গে আলোচনাব অবকাশ থাকলেও এখানে নেই। কিন্তু কলাসমালোচনা ও চারুকলাব মান যথেচ্ছ নিম্নগামী—এ-সম্পর্কে সন্দেহেব অবকাশ নেই। ববং যে-কযেকটি প্রদর্শনী আমাব কাছে মনোগ্রাহী মনে হযেছে, সেই কযেকটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কবছি। গত অক্টোববেব শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্ববেব শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত যে-কযেকটি প্রদর্শনী হযেছে, তাব মধ্যে লক্ষ্মণ পাই-এব বিশ বছবেব শিল্পসাধনাব উৎকলিত অংশ এবং বঘুনাথ সিংহেব ভাস্কর্যই সব থেকে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চাশেব মধ্যভাগ থেকেই লক্ষ্মণ পাই ভাবতীয চিত্রধাবায় একটি উজ্জ্বল নাম। তেল বঙে, গ্রাফিকস্‌এ ও টেম্পেবায তাঁব সমান অধিকাব। অবশ্য মূলত তিনি তেল বঙেবই শিল্পী। টেম্পেবায প্রথম দিকে তাঁব প্রবণতা দেখা যায। লক্ষ্মণ পাই-এব বিশিষ্টতা তাঁব ভাবতীয ঐতিহ্যে অবিচল নিষ্ঠা। প্রতীচ্যে বহুদিন থাকলেও, শিল্পসাধনায তিনি পবিপূর্ণভাবে ভাবতীয়। বেখাব দিকে জোব ও টোনালিটিব প্রবণতা-বর্জন, ভাবতীয চিন্তাধাবাতেই মোটিফ নির্মাণ এবং বিষযমুখিনতা তাব অকাট্য

প্রমাণ। গোয়াতে তিনি মানুষ, তাই গোয়ার অধিবাসী এবং গোয়ার পটভূমিকা তাঁর শিল্পসাধনার প্রথম দিকে প্রবল ছিল। ১৯৫০ সালে প্যাস্টেল-এ আঁকা 'ব্লাইণ্ড রিলেশনশিপ' এমন এক দৃষ্টান্ত। তারপর ক্রমশ প্রিন্টের দিকে তিনি আকৃষ্ট হন। দুটি লিথোগ্রাফ সিরিজ (প্রত্যেকটি চারটি করে) 'গীত-গোবিন্দ' এবং 'বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত' তার অনুপম দৃষ্টান্ত। গীতগোবিন্দ সাদা-কালোতে আঁকা। কিন্তু 'বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত' ক্রোমোলিথোগ্রাফ। অবশ্য বেসাল কালার কালো। চারটি ফ্রেম নীল, সবুজ, মেটে হলুদ ও বাসন্তী রঙে সাজানো এবং গভীরতাদ্যোতক। গৌতম বুদ্ধের চারটি স্তবকে এমনভাবে প্রতীক-রূপে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে বড় শিল্পীর লক্ষণ। ব্যাক্সটার প্রিন্ট-এ, প্রধানত অ্যাকুয়াটিন্ট-এ, তাঁর দখল অসামান্য। পঞ্চাশের শেষ দিকে তাঁর রমণীমূর্তির প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়। 'বার্ড এ্যাণ্ড ফ্লাওয়ার', 'ফ্লাওয়ার', 'পুরুষ ও প্রকৃতি' প্রভৃতি প্রত্যেকটি তেলরঙের কাজেই একটি রমণীর প্রতিবিম্ব দেখা যায় এবং সেখানে তাঁর টোনের দিকে দৃষ্টিও লক্ষণীয়। 'রাগভৈরব' ও 'রাগ পুরিয়া ধানেশ্রী'-র ধ্যানমগ্নতা শিল্পচেতনায় উদ্দীপ্ত। এছাড়া 'ইন্টিগ্রিটি'-ও (ইম্প্যাস্টো পদ্ধতিতে) ভালো কাজ। কিন্তু জলরঙের ছবিগুলি না দিলেই তিনি ভালো করতেন। এগুলি যেন কোনো শিক্ষানবীশের আঁকা বলে মনে হয়। তৎসত্ত্বেও লক্ষ্মণ পাই-এর প্রদর্শনী চিত্রামোদীদের বহুদিন মনে থাকবে।

রঘুনাথ সিংহের ভাস্কর্য কলকাতার চিত্রামোদীদের কাছে বহু কারণে আকর্ষণীয়। সিরামিকস-এ এমন কাজ অনেক দিন দেখা যায় নি। তাছাড়া তিনি তাঁর সাধনালব্ধ ফলশ্রুতিকে ধরে রেখেছেন তাঁর বিভিন্ন কাজে। পোড়াকাঠে ও প্লাস্টার-এ নানারকম ভাবে ভেঙে-চুরে তিনি কয়েকটি নির্বাচিত কাজ দেখিয়েছেন। কনস্ট্রাকটিভিস্ট ভাস্করদের কথা মনে পড়ে, বিশেষ করে রুশ ভাস্কর আর্চিপেঙ্কোর কথা। মডেলের মধ্যে 'সাজেসটিভ হলো' এবং ভাস্কর্যে 'কোলাজ' তাঁরই দান। ইদানীং রুশ ভাস্কর ভেরা মুখিনা এ-ধরনের কিছু কাজ করেছেন। ইনি সিরামিকস-এও সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। শ্রী সিংহের কাজগুলিকে ঠিক 'কিউবিস্ট কোলাজ' বলা চলে না। 'এ্যানামরফিজম' যদিও অংশত আছে, তিনি রিয়্যালিস্টিক ভাবধারাকে কখনোই বর্জন করেন নি। বিমূর্ত রীতিকেও অত্যন্ত সতর্কভাবে গ্রহণ করেছেন। সিরামিকস-এর মধ্যে 'ডাইং ওয়্যারিয়র' 'দ্য ফর্ম' 'মুন এ্যাণ্ড স্টারস' 'ফর্ম এ্যাণ্ড কালার' এবং 'ফিশ নং টু' উল্লেখ্য। পোড়াকাঠের ও প্লাস্টার-এর কাজগুলির মধ্যে 'দ্য ফেস' 'ফিগার

ওয়ান-টু-থ্রি' ও 'দ্য বার্ড' ভালো লেগেছে। তিনি সিরামিকস-এর কাজে 'কোলাজ' এবং কাঠের কাজে 'হলো' অথবা 'হোল' ব্যবহার করেছেন। রক্তবর্ণ ব্যবহার খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছে। মোট কথা, মিডিয়ার ওপর দখল এবং মৌলিকতা--দুইই তাঁর মধ্যে বর্তমান।

অন্যান্যদের মধ্যে কনটেম্পোর‍্যারি আর্টিস্টদের ড্রয়িং ও গ্রাফিকসের প্রদর্শনী, সুনীল সরকারের ন্যুড স্টাডি এবং সীতেশ রায়ের গ্রামীণ জীবনের শিল্পকলা উল্লেখযোগ্য। কনটেমপোর‍্যারি আর্টিস্টদের উল্লেখ করেছি গ্রুপ হিসেবে তাঁদের অস্তিত্বের জন্য। নতুবা তাঁদের কাজ তেমন দৃষ্টিগ্রাহ্যও হয় নি। যা ভালো একটু কাজ করেছেন গনেশ পাইন ও সুহাস রায়। গনেশ পাইন করেছেন ইংক এ্যাণ্ড ওয়াশ-এ, তার মধ্যে 'ভয়েজ' ছবিটি নয়নশোভন। সুহাস রায়ের মেৎসোটিন্ট বিদেশী বিজ্ঞাপন-পত্রিকা প্রভাবিত হলেও দক্ষতার পরিচয়বাহী। 'দ্য স্টেয়ার' এচিংটি অনেকেরই ভালো লাগবে। আর একটি কাজও চোখে পড়ার মতো নয়। এঁদের মধ্যে দু-একজন কোলাজ-প্রিন্ট নাম দিয়েও কিছু কাজ প্রদর্শন করেছেন। ওগুলো এমবসড ড্রয়িং ধরনেরই কাজ। কোলাজ ও প্রিন্ট সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এবং দুটির সহাবস্থান অসম্ভব। এঁরা যে কেন শ্রেণীবিন্যাস করলেন বোঝা গেল না। নাকি দর্শককে স্টান্ট দেবার জন্যেই এই কাজ? কিন্তু এই যদি সমসাময়িক শিল্পের নিদর্শন হয়, তবে বাঙলাদেশের শিল্পকলায় গভীর সঙ্কট বিরাজ করছে বলতে হবে।

সুনীল সরকার প্রধানত চারকোল এবং কিছু ক্রেয়নে পেন্সিলে ও কোঁততে কাজ করেছেন, চারকোল-এর কাজই তাঁর উপযোগী। তাঁর কাজে বেশ বলিষ্ঠ ড্রয়িং ও অ্যানাটমিক ডিসিপ্লিন পাওয়া যায়। কিন্তু মৌলিকতা যেন দূরবর্তীই রয়ে গেছে। 'লুক' 'ভাগ্রেশ্যন' 'লাইন্স' প্রভৃতি কাজগুলি ভালো-লাগার মতো।

সীতেশ রায় অনেকাংশে যামিনী রায়ের উত্তরসাধক। ইনি অবশ্য গ্রাম্য-জীবনের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতিকে শিল্পের মোটিফ করেছেন। যামিনী রায়ের মতো খড়িমাটি, বেলেমাটি, গেরুয়া মাটিই তাঁর রঙ। জ্যামিতিক ফর্মে, বিশেষ করে বক্ররেখায়, তাঁর প্রবণতা। 'দুগ্ধদোহন' 'ধান্যবরণ' প্রভৃতি ছবিগুলি বেশ উন্নত ধরনের। কিন্তু তাঁকে ড্রয়িং-এ এবং রঙ ব্যবহারে অধিকতর মনোযোগী হতে হবে। নতুবা তাঁর কোনো কোনো কাজকে নিম্নমানের ইলাসট্রেশ্যন মনে হতে পারে।

চিত্রামোদী

সেন্সার-নীতি নিয়ে আলোচনাচক্র

হালে ভাবতেব চলচ্চিত্র-জগতে একটা শব্দ খুবই শোনা যাচ্ছে। শব্দটা অবশ্য ছোটো, ইংবিজিতে মাত্র দুই আব বাঙলায কুল্যে তিন অক্ষবেব। কিন্তু তাবই ধাক্কায় বর্তমান তথ্য ও বেতাব মন্ত্রী কে কে. শাহকে সম্প্রতি একটি সেমিনারেব আয়োজন কবতে হযেছিল—সাংবাদিক বন্ধুবা যাকে অবহিত কবেছেন 'কিসিং সেমিনাব' নামে।

কিন্তু সেমিনাব-টেমিনাব কবেও মন্ত্রীমশাই শব্দটিকে কাবু কবতে পাবলেন না। ব্যাপাবটা একটু খুলে বলি। বিদেশী চিত্রে যে-সমস্ত দৃশ্য প্রদর্শন কবতে দেওযা হয, দেশী চিত্রে তা দেওযা হয় না বলে দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদেব দেশেব ফিল্মওযালাদেব মনে ক্ষোভ ছিল। অর্থাৎ তাঁদেব দাবি—'কিস', 'ইনটিমেট লাভ সিন' ইত্যাদি দৃশ্য তাঁদেবও প্রদর্শন কবতে দিতে হবে। এ-বছবেব গোডাব দিকে তাঁদেব ক্ষোভ বিক্ষোভে রূপান্তবিত হয—বেশ জোবালো ভাবেই। ভাবতজুডে চলচ্চিত্র-পত্র-পত্রিকাতে বর্তমান সেন্সাব-নীতিব বিরুদ্ধে ক্রমাগত লেখা শুরু হলো। মায লোকসভায পর্যন্ত এই প্রসঙ্গটি গডাল। বিব্রত তথ্যমন্ত্রী ব্যাপাবটাব সমাধানকল্পে 'সেন্সাবশিপ এনকোয্যাবি কমিটি' বসালেন। ওই কমিটিব চেযাবম্যান নিযুক্ত হলেন পাঞ্জাব হাইকোর্টেব ভূতপূর্ব বিচাবপতি শ্রী জে ডি খোসলা।

এই প্রসঙ্গে আব-একটি কথা বলা দবকাব। আমাদেব দেশেব খামখেযালী ...ীন অদ্ভুত সেন্সাব-নীতিব জন্য বর্তমান সেন্সাব বোর্ডেব প্রতি বুদ্ধিজীবী ... বিশেষ প্রসন্ন নন। যেহেতু খোসলা কমিটি প্রচলিত সেন্সাব-নীতি ...পর্যালোচনা করবেন, তাই স্বাভাবিকভাবে এই কমিটি সম্পর্কে ...র সকলেই আগ্রহী। ফিল্মওযালা, ফিল্ম মেকাব, চিত্রামোদী ...চুযাল' দর্শক—সকলেই অপেক্ষা কবছেন কমিটিব বাযেব জন্য। ...ষিক প্রসব হবে কিনা সে ভবিষ্যৎবাণী এখনই কবা উচিত নয। ...সেব তৃতীয সপ্তাহে খোসলা কমিটি কলকাতায এসেছিলেন ... মতামত জানবাব জন্য। এই উপলক্ষে 'ফেডাবেশন অব ... ইণ্ডিযা'ব 'ফিল্ম স্টাডি অ্যাণ্ড ইনফবমেশান গ্রুপ' সেন্সাব

নীতির ওপর কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে তিনদিন ব্যাপী (১৪ই থেকে ১৬ই অক্টোবর) একটি সেমিনার বা আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন।

আলোচনার প্রারম্ভে 'ফিল্ম স্টাডি অ্যাণ্ড ইনফর্মেশান গ্রুপ'-এর আহ্বায়ক ডক্টর গুরুদাস ভট্টাচার্য চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সেমিনারের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, কর্মসূচি ইত্যাদি সম্পর্কে বলেন। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল চারটি। (১) দু-রকম সেন্সার নীতি আছে কি? (২) চলচ্চিত্র ও সমাজ (৩) তরুণ-সম্প্রদায় ও চলচ্চিত্র (৪) ভারতীয় চলচ্চিত্রের বর্তমান ধারা।

ভারতের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত ছিলেন 'দু-রকম সেন্সারনীতি আছে কি' শীর্ষক বিষয়ের প্রধান বক্তা। শ্রীদাশগুপ্ত বলেন, দু-রকম নয়, বহুরকম নীতি আছে। এদেশী ও বিদেশী ছবির বেলায় সেন্সার বোর্ডের আলাদা নীতি, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বোর্ডে ভিন্ন বিচার, একই ছবির আভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি কপির ক্ষেত্রে নীতির প্রয়োগে পার্থক্য। আর তাছাড়া, সেন্সার বোর্ডের কর্তাদের ব্যক্তিগত মর্জির ওপরও 'কাটার পরিমাণ' কিছুটা নির্ভর করে। তিনি বলেন, শিল্পসম্মতভাবে উপস্থিত সমস্ত কিছুকেই যদি চলচ্চিত্রে প্রকাশ করতে দেওয়া হয়, তবে চলচ্চিত্র-কাররাই অনেককিছু দেখাবেন না। কারণ তাতে 'পারিবারিক দর্শক' হ্রাস পাবে। পরিশেষে তিনি বলেন, নন্দনতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ যে মানবতাবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গির সূচনা করেন, রাজনীতিতে নেহেরু যে লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি আনেন, সেন্সার-কর্তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করে চলা উচিত।

ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে অধ্যয়নরত কানাডিয়ান অধ্যাপক মিঃ রোবের্জ বলেন, সেন্সার করার সময় চলচ্চিত্রকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা উচিত— যথা আর্ট, এণ্টারটেনমেণ্ট, প্রপাগাণ্ডা, এডুকেশনাল ইত্যাদি।

পরবর্তী বক্তা ও চলচ্চিত্রসমালোচক শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, চিত্রে যা দেখানো হয় দেশী চিত্রে তা নিষিদ্ধ—এই ব্যাপারটা ব কারণ উভয় চিত্রের দর্শকই এক। হলিউড ছবি দেখে তারা যায়, তবে দেশী ছবি দেখেই বা গোল্লায় যাবে কেন।

চলচ্চিত্রে চুম্বন প্রদর্শনের তীব্র বিরোধিতা করে অধ্যাপ পাধ্যায় বলেন, চুম্বন ছাড়াও প্রেমকে কত সুন্দর এবং শিল্পস করা যায়, তার নিদর্শন অনেক চিত্রেই দেখা গেছে। তিনি পশু খণ্ডন করে বলেন, বিদেশী চিত্রের অচেনা চরিত্র, বিজাতী

দৃশ্যপট আমাদের এই চিত্র থেকে পৃথক করে রাখে। তাই তার প্রভাব আমাদের সমাজে ততটা ক্ষতিকর নয়। এই বিষয়ে সর্বশেষ বক্তা 'সিনে সেনট্রাল কলকাতা'র জয়সুন্দর গুপ্ত। তিনি বলেন, সেন্সার বোর্ডের কোনো নীতিই নেই। তা না হলে তৃতীয় শ্রেণীর নোংরা 'নাইট সীরিজ' ছবি অনায়াসে ছাড়পত্র পায়, আর অন্যদিকে অনেক প্রখ্যাত আর্ট ফিল্মকে ভিত্তিহীন অজুহাত দেখিয়ে নাকচ করে দেওয়া হয়—এমন অসম্ভব ব্যাপার ঘটত না।

তারপর আলোচনা শুরু হয় 'চলচ্চিত্র ও সমাজ' নিয়ে। এই বিষয়ে প্রধান বক্তা চলচ্চিত্র-পরিচালক শ্রীপ্রভাত মুখার্জি বলেন, আজকের সমাজজীবনে জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে ছবি করবার উপায় নেই শাসনযন্ত্রে দুর্নীতি, পুলিশের গুলি-বর্ষণ, গান্ধীটুপিধারী প্রতারক ইত্যাদি যদি দেখানো হয়—তবে 'বিতর্কমূলক' আখ্যা দিয়ে সেন্সার বোর্ড সেগুলির ছাড়পত্র নাকচ করে দেবেন। অর্থাৎ সমাজভাবনা-রহিত অদ্ভুত অবাস্তব ছবি না করলে সে-ছবির মুক্তির সম্ভাবনা নেই। নট ও নাট্যকার শ্রীরুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত বলেন, সেন্সার করবার সময় চলচ্চিত্রের অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে দেখতে হবে। সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না—তারই ভিত্তিতে চলচ্চিত্রের দৃশ্য বিচার হবে। ভারতের মতো অল্পশিক্ষিত দেশে চলচ্চিত্রের যে শিক্ষামূলক দিক আছে, তার দিকে সেন্সার বোর্ডকে নজর দিতে বলেন লেখক শ্রীঅসিত গুপ্ত। আইনজীবী শ্রীমানিক ভট্টাচার্য আইনের পরিপ্রেক্ষিতে সেন্সারের নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে আলোচিত হয় 'তরুণ-সম্প্রদায় ও চলচ্চিত্র।' এদিনের বক্তারা সবাই তরুণ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীঅমিতাভ গুপ্ত বলেন, আমাদের সেন্সারনীতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গঠিত। সেন্সার বোর্ডের কার্যকলাপ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার যাতে সৎ ও সুস্থ চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারে। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীচন্দন ভট্টাচার্য বলেন, চলচ্চিত্রের পর্দায় আমরা জীবনের সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা দেখতে চাই, অথচ সেন্সার বোর্ড যে-সমস্ত হিন্দী ছবিকে ছাড়পত্র দিচ্ছেন, তাতে বাস্তবতার নামও নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীভারতী সরকার দ্বিধাহীনভাবে জানালেন, বাস্তব জীবনে 'কিস' 'প্যাসোনেট লাভ'-এর অস্তিত্ব আছে। সুতরাং চলচ্চিত্রেও আমরা সেগুলি দেখতে চাই।

'সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা'র শ্রীঅজয় বোস ঘোষণা করলেন, কতগুলি

ছবিকে বিশেষ কবে 'অপ্রাপ্তবয়স্ক'দেব জন্য চিহ্নিত কবে বাখা অর্থহীন। শ্রীশ্যামাপদ মজুমদাব নামে জনৈক কলেজেব ছাত্র বললেন, চলচ্চিত্রে বাজনৈতিক ঘটনাবলীকে স্থান দেওয়া একান্তভাবে দবকাব। এ-সম্পর্কে সেন্সাব বোর্ডকে অনেক বেশি পবিমাণে সৎ হতে হবে।

দ্বিতীয় দিনেব দ্বিতীয়ার্ধে 'ভাবতীয় চলচ্চিত্রেব বর্তমান ধাবা' নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনাব সূত্রপাত কবে অধ্যাপক বোবের্জ বলেন, ফিল্ম ইনডাস্ট্রি সম্পর্কে আমাদেব দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা ভ্রান্ত। 'আর্ট ফিল্ম'-এব সঙ্গে সঙ্গে 'নন আর্ট' ফিল্মেব প্রযোজন আছে। ভালো 'নন-আর্ট ফিল্ম' নির্মাণেব জন্য তিনি সেল্‌ফ -সেন্সবশিপেব প্রস্তাব কবেন। অর্থাৎ চলচ্চিত্র-নির্মাতাবাই একটি বিধিনিষেধ তৈবি কবে সেই অনুসাবে চিত্রনির্মাণ কববেন।

'নৈহাটি সিনে ক্লাব'-এব শ্রীশ্যামাপদ ভট্টচার্য বললেন, বর্তমানে যে শস্তা ছবিব স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, সেন্সাব বোর্ডেব কর্তব্য তাকে প্রতিহত কবা। ওডিশাব চলচ্চিত্র-নির্মাতা শ্রীপাত্র নিজেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সেন্সাব-কর্তাদেব খামখেযালীপনাব কযেকটি নমুনা উপস্থিত কবেন। 'ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট'-এব শ্রীনির্মাল্য বোস বললেন, শিল্পেব ক্ষেত্রে কোনো বাধা-নিষেধ থাকা উচিত নয।

সমাপ্তি দিবসে বিভিন্ন বিষযেব প্রধান বক্তাবা পূর্বে আলোচিত বক্তব্যই সংক্ষেপে উপস্থিত কবলেন। 'ফেডাবেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ'-এব লিযার্স সম্পাদক শ্রীঅরুণ প্রামাণিক বলেন, কোনো দেশেব ছবি বা কোনো দৃশ্য অশোভন কি না তা পৃথকভাবে বিচাব না কবে, ছবিব ফর্ম ও কনটেণ্ট দেখে তাকে বিচাব কবতে হবে। বাজনৈতিক এবং বিতর্কমূলক বিষযকেও ছাডপত্র দেবাব কথা তিনি বলেন।

সেমিনাবেব সভাপতি শ্রীবাগীশ্বব ঝা সেন্সাব-ব্যবস্থা তুলে দেবাব জন্য দাবি জানান। তাবপব শ্রোতাদেব মধ্য থেকে কযেকজন ভাষণ দেন। এঁদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 'সাউথ ক্যালকাটা ফিল্ম ক্লাব'-এব শ্রীনিত্যগোপাল চক্রবর্তী। তিনি সমগ্র সেমিনাবে 'কিস অ্যাণ্ড সেক্স' প্রাধান্য পাওযায ক্ষোভ প্রকাশ কবে বলেন, চলচ্চিত্রকাব চলচ্চিত্র-মাধ্যমে কি প্রকাশ কবতে চাইছেন সেন্সাবেব সময সেটাই দেখা দবকাব।

"বাইবে চাকচিক্যেব ঘটা ভেতবে শূন্য" কথাটা যে কত সত্য, তা এই

সেমিনারের পূর্বে আমার জানা ছিল না। চারটি বিষয়ে পৃথক আলোচনার ব্যবস্থা সেমিনারে ছিল। কিন্তু বক্তারা প্রায় সকলেই বলবার সময় বিষয়ের ধার-কাছ দিয়ে না গিয়ে নিজের খেয়ালখুশি মতো বলেছেন। বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি একাধিকবার ঘটেছে। এমন কি, একই বক্তাকে দু-ধরনের বক্তব্য বলতে শোনা গেল। এই সেমিনার শুনে এমন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে 'সেক্স ও কিস' ছাড়া সেন্সারের অন্য কোনো দিক নেই। কারণ আলোচনা এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রথম দিনের অধিবেশনে শ্রীভট্টাচার্য ঘোষণা করেছিলেন যে এই সেমিনারের ব্যবস্থাদি করার জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির অধিকাংশ সদস্য হলেন বাঙলাদেশের পেশাদার চিত্রসাংবাদিক। এই ধরনের একটা সেমিনারের জন্য পৃথক কমিটির প্রয়োজন কেন হলো তা বোঝা দুষ্কর। কিন্তু ব্যাপারটা আরো বিসদৃশ (না কি সুদর্শ) লাগল যখন এই কমিটির নব্বই ভাগ সদস্যকে তিনদিনের একদিনেও দেখা গেল না।

উপসংহার: সেমিনার-শুরুতে প্রায় শ-খানেক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন, কমতে কমতে সেমিনারের শেষে তা দশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

পরিমল মুখোপাধ্যায়

সেকালেব নাটক—একালের জিজ্ঞাসা : একটি "আলোচনাচক্র"

সম্প্রতি কলকাতাব এক অপেশাদাব নাট্যগোষ্ঠী একটি আলোচনাচক্রেব আযোজন কবেছিলেন। সাম্প্রতিক নাট্য-আন্দোলনেব অন্যতম শবিক এই গোষ্ঠী গত দশ বছব ধবে নিষ্ঠা ও উদ্যমেব পবিচয দিযে আসছেন। তাঁদেব আহ্বানে বাঙলামঞ্চেব খ্যাতনামা প্রবীণ ও তরুণদেব বেশ কয়েকজন (শ্রীমধু বসু, শ্রীজহব গাঙ্গুলি, শ্রীগঙ্গাপদ বসু, শ্রীসবিতাব্রত দত্ত, শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত ('শৌভনিক'), শ্রীবিভাস চক্রবর্তী ('থিযেটাব ওঅর্কশপ'), শ্রীসন্তোষ সিংহ, ইন্দ্রমিত্র ও শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায প্রমুখ) এই 'অন্তবঙ্গ' আলোচনাসভায মিলিত হন। বর্তমান লেখকও যথেষ্ট আগ্রহ নিযেই আলোচনা শুনতে যান। কিন্তু প্রথমেই লক্ষ্য কবা গেল—বিজ্ঞাপিত বিষয়বস্তুব সঙ্গে আলোচনাব কোনও যোগসূত্র থাকছে না।

আলোচ্য বিষয ছিল : 'সেকালেব নাটক—একালেব জিজ্ঞাসা'। এ-বিষযে অনেক প্রশ্ন আজকেব সাধাবণ মানুষেব মনে—বিশেষ কবে নাট্যামোদী বা সাহিত্য-অনুসন্ধিৎসু পাঠকেব কাছে তো বটেই। আলোচনাব শুরুতেই অন্য সুব শোনা গেল। প্রথম বক্তা তাঁব নাট্যজীবনে গুরুদেবেব প্রভাব এবং কি কবে গুরুদেব তাঁব পবিবাবেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হযেছিলেন, তাব ইতিবৃত্ত পাঠ কবলেন। সাহিত্য বা কলাব যে কোনও ক্ষেত্রে ববীন্দ্রনাথেব অবদান সম্পর্কে যে কোনও নতুন তথ্য সম্পর্কেই আমবা সশ্রদ্ধ, আগ্রহী। কিন্তু ঘোষিত বিষযবস্তুব সঙ্গে উপবোক্ত কথিকাব যোগসূত্রটা কোথায ঠিক বোঝা গেল না। পববর্তী অধ্যাযে প্রবীণ অভিনেতাদেব কযেকজন প্রাচীন ও বর্তমান অভিনযে উচ্চাবণভঙ্গিব পার্থক্য, অভিনেতাব ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যেব গুরুত্ব, স্মৃতি-কথা ইত্যাদি বিষযেব অবতাবণা কবলেন। যদি কোনও অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী তাঁদেব অভিনযেব মান উন্নত কবাব অভিপ্রাযে প্রাচীনদেব পবামর্শ গ্রহণে ইচ্ছুক হন—তা নিঃসন্দেহে সুবিবেচনাব পবিচাযক। কিন্তু সে-অনুষ্ঠানকে আলোচনাচক্র আখ্যা দিযে বিজ্ঞাপন দেবাব প্রযোজন কী! অথচ, আশ্চর্য যে, এ-ধবনেব অনুষ্ঠানেব 'মনোজ্ঞ' আলোচনাব স্বকপোলকল্পিত বিববণ বাঙলাদেশেব বহুল প্রচাবিত পত্র-পত্রিকায প্রাযই দেখে থাকি।

একালেব নট শ্রীসবিতাব্রত দত্ত আলোচনায় একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন কবেছিলেন। বাঙলা নাটকেব একালেব শুরু কবে থেকে? কি বিচাবে আমবা সেকাল ও একালেব বিভেদ বেখাটি টানব? অভিনয় কৌশল, নাটকেব বিষযবস্তু, প্রযোজনা, মঞ্চকৌশল ইত্যাদিব কোনটি আমাদেব বিচাবেব মাপ-কাঠি হবে? বলাবাহুল্য, এই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন-আলোচনাব কোনও অভিপ্রায উদ্যোক্তাদেব মধ্যে দেখা গেল না।

শ্রীগঙ্গাপদ বসু তাঁব বক্তব্যে প্রথমেই পবিষ্কাবভাবে আমাদেব মনেব কথাটি বললেন, ঘোষিত বিষয এক, আব আলোচনা বইছে অন্য খাতে—এমতাবস্থায় তিনি কিভাবে অংশগ্রহণ কববেন? তবে তাঁব স্বল্প ভাষণে আধুনিক নাটকেব একটি বিশেষ দায়িত্বেব দিকে তিনি আমাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছেন। সামগ্রিকভাবে সেকাল ও একালেব নাট্য-আন্দোলনেব গুণগত পার্থক্য প্রসঙ্গে তিনি বললেন—সেকালে বাইবের জগতেব ঢেউ কখনও কখনও বঙ্গমঞ্চে এসে আছডে পডত। ফলে একটি বিশেষ সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে বহু বাদ-বিসম্বাদ বা গণচেতনা সৃষ্টিব পবে নাটকে তাব কিছু অংশ প্রতিফলিত হতো। একালে ঢেউ উঠছে বঙ্গমঞ্চ থেকে, আব তাব প্রতিফলন হচ্ছে গণমানসে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা গণচেতনাব দিকনির্দেশনাব প্রযাস পাচ্ছে। মনে হয়—গঙ্গাপদবাবু একালের নাটকেব সামাজিক ও বাজনৈতিক দায়িত্বেব দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেব অবতাবণা কবেছেন। একালেব নাটকেব বিচাবে জনমানসে নাটকেব এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাব দিকে দৃষ্টি বাখতে হবেই এবং কোনও নাটকেব মূল্যাযনে এটি হবে অন্যতম মাপকাঠি। স্বভাবতই কোনও নাট্যকাব বা নাট্যগোষ্ঠীব পক্ষে যে কোনও নাটকেব প্রতি-ক্রিয়া সম্পর্কে উদাসীন থাকা সম্ভব নয। এই বিচাবে পেশাদাব অপেশাদাব এমনকি 'প্রগতিবাদী' বা 'বিপ্লবী' নাট্যকাবদেব অনেকেই শেষ পর্যন্ত অপবাধেব অভিযোগ থেকে বেহাই পাবেন না।

পবিশেষে একটি বক্তব্য আছে। অপেশাদাব নাট্যগোষ্ঠীগুলিব অনেকেব মধ্যেই এস্টাব্লিশমেণ্ট-এব অনুগ্রহ লাভেব ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। নাট্য-আন্দোলনেব পুবোধা হিসেবে আপন গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চয়ই এঁবা সচেতন। আমবা এঁদেব প্রতি অনেক আশা বাখি বলেই এ-ঝোঁক সম্পর্কে উদ্বেগেব কাবণ আছে। অতীতে আমবা এস্টাব্লিশমেণ্ট-এব গোলকধাঁধায অনেক উজ্জ্বল

সম্ভাবনাব অপমৃত্যু দেখেছি। আশা কবি,নাট্য-আন্দোলনেব সংগ্রামী গোষ্ঠীগুলি এ-বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন।

আমবা নাটক সম্পর্কে প্রচুব বিশ্লেষণ ও আলোচনাব প্রযোজন উপলব্ধি কবছি। 'গ্ল্যামাব' বা বিজ্ঞাপনেব চটক বাদ দিযে নিষ্ঠাপূর্ণ আলোচনাব আযোজন হলে তা সমগ্র নাট্য-আন্দোলনেব গতি-প্রকৃতি নির্ণয ও দিকনির্দেশনাব পক্ষে যথার্থ সহায়ক হবে। আমবা তেমন আলোচনাচক্রেব প্রত্যাশায বইলাম।

কান্তি সেন

সাঙ্গীতিক দৌত্য : আলি আকবর খাঁ-ব সঙ্গে সাক্ষাৎকাব

শাস্ত্রীয সঙ্গীতে ভাবতেব আত্মাই প্রতিফলিত। অনাদিকাল থেকে ভাবতেব মর্মবাণী এই শাস্ত্রীয সঙ্গীতে ধ্বনিত হযে এসেছে। ওস্তাদ আলি আকবব খাঁ-ব অনুষ্ঠান শুনে এই উপলব্ধি বসজ্ঞ শ্রোতামাত্রেবই হযেছে। সম্প্রতি তিনি সঙ্গীতেব মাধ্যমে দেশে-বিদেশে ভাবতেব মর্মবাণীটি পৌছে দেওয়াব দৌত্যকার্যে নিযুক্ত আছেন। বিদেশে ভাবতীয় সঙ্গীতেব প্রচাবেব দাযিত্ব তিনি বহুকাল আগেই গ্রহণ কবেছিলেন। ইংল্যাণ্ড, আমেবিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে তিনি এ-উপলক্ষে অনেক আগে থেকেই সফব কবে বেড়িযেছেন।

আলি আকবব খাঁ পদ্মভূষণ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-ব পুত্র, পিতাব সঙ্গীত-নৈপুণ্য ও শিল্পকুশলতাব সুযোগ্য উত্তবাধিকাবী। আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ তানসেন-এব যশস্বী উত্তবাধিকাবী বামপুব এস্টেটেব ওস্তাদ উজীব খাঁ সাহেবেব শিষ্য। পিতা ও পুত্র উভযেই সেনী ঘবানাব ধাবক ও বাহক। এই তানসেনী বা সংক্ষেপে সেনী ঘবানাব ঐশ্বর্যময সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যেব সঙ্গে মিশেছে তাঁদেব ব্যক্তিগত উদ্ভাবনী প্রতিভা ও শিল্পকৌশল, যাব সমন্বযে পিতা-পুত্রেব শিল্প সৌকর্যলাভ কবেছে।

আলি আকবব খাঁ জন্মেছিলেন ত্রিপুবাব শিবপুব গ্রামে ১৯২২ সালে। তাঁব জন্মেব পবেই আলাউদ্দিন খাঁ মৈহাব বাজ এস্টেটেব সভাশিল্পীব চাকবি নিযে সপবিবাবে সেখানে গিযে বসবাস শুরু কবেন।

সম্প্রতি এক সান্ধ্যবৈঠকে তাঁব সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। সৌহার্দ্যপূর্ণ আবহাওযায আড্ডাব সুবটি ছিল কোমল পর্দায় বাঁধা। কথায় কথায আলি আকবব খাঁ বলতে লাগলেন, "তিনবছর বযেস থেকে বাবাব কাছে আমাব ধ্রুপদ, ধামাব, খেযাল ও তাবানায তালিম শুরু হযেছে। প্রসঙ্গত বলি যে কণ্ঠে গেযে গেযে শিক্ষার্থীকে যন্ত্রে সেই বাগ তুলিযে দেওয়া বাবাব শেখানোর কৌশল। এজন্যে যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীকে প্রথমে কণ্ঠসঙ্গীত শিখতে হয়। আমাব তবলাব তাল-জ্ঞান হযেছিল আমাব কাকা কালীসাধক ফকিব আফতাবউদ্দিন খাঁ-ব কাছে। শুধু তবলাই না, তিনি আমাকে পাখোয়াজেও সুশিক্ষিত কবে-ছিলেন। কাকা বাবাকে বলতেন, "তুমি আলি আকববকে সুব দাও, লযে

ওকে ওস্তাদ করার ভার আমি নিলাম।" আট বছর বয়েসের মধ্যেই বাবা আমাকে রবাব, সুরশৃঙ্গার, সেতার ও সরোদে তালিম দিয়েছিলেন। অবশ্য সরোদেই বাবা বেশি জোর দিতেন। তাই আত্মপ্রকাশের জন্য শেষপর্যন্ত আমি সরোদই বেছে নিলাম। আজকালকার সরোদ যন্ত্রের নতুন যা চেহারা, তা বাবার হাতেই রূপ পেয়েছে। এমন কি, রবিশঙ্কর মোটা খরজের তার লাগানো যে-বিশেষ-ধরনের সেতার বাজান—তাও বাবা তৈরি করে দিয়েছিলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি প্রতিদিন আমাকে আঠেরো ঘণ্টা সুর সাধতে হতো। এমনি ছিল বাবার তালিম। ফাঁকি দেওয়ার উপায় থাকত না। পড়া ধরার সময় ভুল করলে বকুনি তো ছিলই, উপরি পাওনাও কিছু কিছু জুটে যেত। পরে রবিশঙ্কর যখন শিখতে এলো, তখন বাবা কিছুদিন তাকে আলাদাভাবে শেখালেন। কিছুদিন পরে সে আমাদের সঙ্গেই এক ক্লাসে শিখত। বাবা আমাদের যা শেখাতেন, অবসর সময়ে রবিশঙ্করের সঙ্গে তা নিয়ে আমি আলোচনা করতাম, ওকে তুলতেও সাহায্য করতাম। গান-বাজনা আমি অল্প আয়াসেই শিখে ফেলতাম বলে ততটা সীরিয়াস ছিলাম না। তাই বাবা যখন আমাদের পরীক্ষা করতেন, তখন আমি অন্যমনস্কতার জন্যে অনেক সময় ভুল করে ফেলতাম। গালাগাল খেতাম। রবিশঙ্কর এক-আধবার লোক-দেখানো ভুল করে পরমুহূর্তেই তা নির্ভুলভাবে পরিবেশন করত। রবিশঙ্কর ছিল ভীষণ চালাক। বাবা ওকে তারিফ করে বলতেন "রবির মাথা ভালো তো হবেই—ও যে ব্রাহ্মণের ছেলে"।"

আলাউদ্দিন খাঁ-র কথা বলার ধরন সম্পর্কে আগেও শুনেছি। কিন্তু সে ভিন্ন গল্প। আলি আকবরের কথাই বলি। একাধারে পিতা এবং গুরু আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ-র তত্ত্বাবধানে কঠোর সাধনার শেষে তিনি আকাশবাণীর লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রের 'মিউজিক প্রডিউসার' হন। কিছুকাল পরে যোধপুরের রাজা তাঁকে রাজসভার শিল্পী নিযুক্ত করে সাদরে যোধপুর নিয়ে যান। সেখান থেকেই তিনি ভারতের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত মিউজিক কনফারেন্সগুলিতে যোগ দিতেন। ফলে অচিরেই আলি আকবর খাঁ ভারতবর্ষের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় যন্ত্রশিল্পীর সম্মানে অভিষিক্ত হলেন। উদয়শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে বিভিন্ন প্রকারের ভারতীয় সঙ্গীতের রূপ ও প্যাটার্ন নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ তিনি ইতিপূর্বেই পেয়েছিলেন। যোধপুরে থাকাকালীন খাঁ সাহেব ভারতীয় রাগ-রাগিণী ও লোকসঙ্গীতের সুচারু মিশ্রণে কয়েকটি

অর্কেস্ট্রাও রচনা করলেন। মৈহারের অর্কেস্ট্রা রচনা করেছিলেন আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ। ভারতীয় অর্কেস্ট্রার তিনিই পথিকৃৎ। আলি আকবর খাঁ-র মধ্যেও পিতার এই সৃজনী প্রতিভা প্রকাশিত হলো।

১৯৫৫ সালে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচারের জন্য তিনি বিদেশযাত্রা শুরু করেন। বিখ্যাত বেহালা-বাদক ইহুদী মেনুইনের সহযোগিতায় নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লণ্ডন, প্যারিস, ব্রাসেলস সফর করে আলি আকবর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নৈপুণ্যে বিদেশীদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন। ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশনের জন্য তিনি টোকিও-তে আমন্ত্রিত হন। ১৯৬৩ সালে 'এডিনবরা মিউজিক ফেস্টিভ্যাল'-এ আমন্ত্রণ করে এই ভারতীয় সরোদশিল্পীকে সম্মানিত করা হয়। বিদেশে যেখানেই তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন, সেখানেই প্রায় প্রতিটি স্থানীয় সংবাদপত্র তাঁর সঙ্গীত-পরিবেশনের নৈপুণ্য ও শিল্পমাধুর্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। 'নিউ স্টেটসম্যান' তাঁর সৃজনী প্রতিভার জন্য তাঁকে 'ভারতীয় বাখ্'—এই আখ্যায় ভূষিত করেছে। ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মর্যাদা উপলব্ধি করে বিদেশীরা তাঁর কাছে যন্ত্রসঙ্গীতে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে চাওয়ায় তাঁকে সম্প্রতি বিদেশে যন্ত্রসঙ্গীত-শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত থাকতে হচ্ছে। সেতারী শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোদশিল্পী শরণরানী ও বেহালা-বাদিকা শিশিরকণা তাঁর যোগ্য শিষ্য ও শিষ্যা।

নৈপুণ্যের চরম শিখরে পৌঁছেও আলি আকবর খাঁ রাগ-রাগিণীর বিভিন্ন রূপ ও প্যাটার্ন নিয়ে এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। পাঁচটি রাগ—'চন্দ্রনন্দন', 'গৌরীমঞ্জরী', 'লাজবন্তী', 'মিশ্রশিবরঞ্জনী' ও 'হিন্দোলহেম' তিনিই রচনা করে আসরে চালু করেছেন। এভাবেই রাজপুতানার লোকসঙ্গীতের মিশ্রণে সৃষ্ট হয়েছে 'মিশ্রমাণ্ড্'। ১৯৬১ সালে পার্ক সার্কাসে অনুষ্ঠিত 'রবীন্দ্র-শান্তি মেলা'য় রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ একটি রাগিণী-রূপরেখা রচনা করে তা রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করে-ছিলেন। বিদেশ থেকে ফিরে আলি আকবর খাঁ সেই রাগিণীর রূপরেখা পিতার কাছ থেকে পান ও বিভিন্ন তানালঙ্কারে সাজিয়ে সম্পূর্ণ রূপ দিয়ে তার নামকরণ করেন 'মেধাবী'। রবীন্দ্রনাথের নামেই এই রাগিণী উৎসর্গীকৃত। এই রাগিণী 'মলুহা-কেদারা' ও 'কল্যাণ'-এর মিশ্রণে উৎপন্ন হলেও এতে 'বিলাবল' আর 'হাম্বীর'-এর ছায়া এসে পড়েছে। নতুন তাল সৃষ্টিতেও আলি আকবর খাঁ বিশেষ আগ্রহী। সাত মাত্রার 'রূপক' তাল থেকে তিনি সাড়ে

পাঁচ মাত্রাব একটি তাল সৃষ্টি কবে তাব নাম দিয়েছেন 'শশাঙ্ক'। দশ মাত্রাব 'ঝাঁপতাল' থেকে তিনি সাড়ে আট মাত্রাব 'ঝম্পক' তাল বচনা কবেছেন। এভাবে চোদ্দ মাত্রাব 'ধামাব'কে ভেঙে সাড়ে এগাবো মাত্রার 'সবস্বতী' তাল সৃষ্টিতেও তাঁব উদ্ভাবনী শক্তিব পবিচয় মেলে।

বাগ-মিশ্রণ

সুষ্ঠু বাগ-মিশ্রণেব জন্যে আলি আকবব খাঁ বিখ্যাত। দুটি কি তিনটি বাগকে মিশিয়ে নতুনতব কিছু সৃষ্টি কবায তিনি ইনটেলেকচুয়াল আনন্দ পান। সঙ্গীত-জগতে এ-নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক চালু আছে। তাই তাঁকে প্রশ্ন কবলাম, "একাধিক বাগেব এই মিশ্রণে তাদেব স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য বজায থাকে কি?" উত্তবে খাঁ সাহেব বিনীত হেসে বললেন, "দুই বাজ্যেব মিলন হলে তাদেব বাজা-মন্ত্রী-সান্ত্রী কি পালটে যায? সঙ্গীত-জগতেও যাঁবা বাগ-বাগিণীব প্রকৃত মিলন ঘটাতে চান, তাঁবাও দেখবেন যাতে বাজা-মন্ত্রী-সান্ত্রী সব ঠিক ঠিক থাকে, অর্থাৎ তাদেব স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য যেন বদলে না যায। 'চন্দ্রনন্দন'-এ দেখুন 'মালকোষ,' 'চন্দ্রকোষ', 'কোশী'ব কেমন সুন্দব মিলন ঘটেছে। নিজেব তৈবি বলে বলছি না, এ-মিলন ঘটেছে এদেব স্বভাবেব ঐক্যেব জন্যে। 'গৌবীমঞ্জবী' আবেকটি সুন্দব মিলনেব নিদর্শন। 'গৌবী' 'ললিতা-গৌবী' 'শ্রীবাগ' 'খাম্বাজ' ও 'নটবাগ'-এব মিশ্রণে 'গৌবীমঞ্জবী' তৈবি হয়েছে।"

সঙ্গীত পবিবেশনেব আদর্শ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন কবা হলে খাঁ সাহেব সহাস্যে জানালেন, "দেখুন, আমি যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী। সুতবাং যন্ত্রসঙ্গীতশিল্প পবিবেশনেব প্রকৃত মান সম্বন্ধেই আমি আলোচনা কবব, এক্তিযাবেব বাইবে যাব না। যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পীবা অনেকেই আজকাল প্রকৃতভাবে 'আলাপ' কবেন না। আলাপ যা শুরু কবেন—তা 'বিলম্বিত জোড়'-এব নামান্তব। 'আলাপ'-এব চাবভাগ—আস্থাযী, অন্তবা, সঞ্চাবী ও আভোগ। তাদের পবিবেশনেব বীতি ও পদ্ধতিও ভিন্ন। প্রত্যেক বাগ পবিবেশনেব ক্ষেত্রেও আলাপেব প্রকাব বিভিন্ন হওযা উচিত এবং তা বাগ-বাগিণীব ধর্মেব উপবে নির্ভবশীল। বাগেব প্রকৃতিবিরুদ্ধ—এমন বীতিতে সঙ্গীত-পবিবেশন বাঞ্ছনীয নয। সম্প্রতিকালে এমন যন্ত্রশিল্পী ভাগ্যে মেলে, যিনি এসব নিযমগুলি যথাযথভাবে পালন কবেন।

'দরবারী কানাড়া' পরিবেশন করতে গিয়ে শিল্পীর উচিত এই রাগের আরোহী ও অবরোহীর গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদের উপর সাবধানী নজর রাখা। 'শুদ্ধ কল্যাণ' পরিবেশন করতে গিয়ে তার আরোহী ও অবরোহীর পর্দাগুলিতে প্রকৃত সুর লাগাতে না পারলে তা কল্যাণ-অঙ্গের এক প্রকার হয় বটে, কিন্তু শিল্পী লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। এভাবে 'মূলতানী' বাজাতে গিয়ে প্রকৃত স্বরজ্ঞান না থাকলে সন্ধ্যার রাগিণী সকালের 'তোড়ী'তে রূপান্তরিত হয়ে যায়। একইভাবে 'ললিত' বাজাতে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে 'তোড়ী'তে পৌঁছনোও বিচিত্র নয়। এ-রকম ভুল অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি।"

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মান উন্নয়নের পন্থা সম্বন্ধে হদিশ দেওয়ার জন্যে খাঁ সাহেবকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানালেন, "শিল্পী হিসেবে গড়ে ওঠার জন্যে আগে যত ঘণ্টা রেওয়াজ করতে হতো, বর্তমানে তার অভাব লক্ষিত হচ্ছে। দৈনিক আঠেরো ঘণ্টা করে রেওয়াজ করেও আমরা গুরুকে সন্তুষ্ট করতে পারতাম না।" এই সূত্রে তিনি একটি গল্প বললেন। আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ একদিন রাত্রিবেলা 'বেহাগ'-এর একটা মুখ দিয়ে তা রবিশঙ্করকে বাজাতে বলে যান। রবিশঙ্কর কিছুক্ষণ বাজিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সকালে উঠে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব বাগানের গোলাপ গাছগুলিকে কুপিয়ে চলেছেন। এই রাগের কারণ অনুসন্ধান করে রবিশঙ্কর জানতে পারলেন যে তিনিই স্বয়ং এর জন্যে দায়ী। গুরু তাঁকে বাজিয়েই যেতে বলেছিলেন, বিশ্রাম করতে তো নির্দেশ দেননি। ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে নতুন জামাইকে তিরস্কার করতে না পারায় গুরু গোলাপ গাছের উপরেই রাগ প্রকাশ করছেন। আলি আকবর খাঁ সাহেব সখেদে জানালেন, "অবশ্য বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় গুরু বা শিষ্য উভয়ের পক্ষেই এই অধ্যবসায় ও তন্ময়তা রক্ষা করা কঠিন। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, যত বাধারই সম্মুখীন হতে হোক না কেন—তাকে জয় করতে হবে। ঐকান্তিক সাধনা ছাড়া শিল্পী তার প্রেয় ও শ্রেয়কে লাভ করতে সক্ষম হবেন না। মৃণালের কাঁটায় রক্তার্ক্ত হাতেই শ্বেতশতদল-বাসিনী সুরলক্ষ্মীর চরণ স্পর্শ করা সম্ভব।"

আলি আকবর খাঁ আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের শিল্পী-সন্তান। তাঁর কথা বলার ধরনও তাই আমাকে মোটেই অপ্রস্তুত করল না।

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

নয়া ঔপনিবেশিকতা ও বৃটেনের সঙ্কট

'আফ্রো-এশিয়ান এ্যাণ্ড ওয়ার্লড এ্যাফেয়ার্স' পত্রিকায় ১৯৬৮ সালের প্রথম সংখ্যায় রজনী পাম দত্ত একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। নয়া ঔপনিবেশিকতা আজ বৃটেনকে কেমন ঘরে-বাইরে নাজেহাল করে তুলছে, রচনাটিতে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

১৯৪৯ সালে বৃটেনে তখন লেবার দলের সরকার। তাঁরা মনে করলেন পাউণ্ডের বৈদেশিক মূল্যহ্রাসই হচ্ছে বৈদেশিক খাতে দেনা-পাওনা সমস্যার 'বিশল্যকরণী। শ্রীদত্ত তখন 'বৃটেন্‌স ক্রাইসিস অব এম্পায়ার' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের চাপে বৃটেন আর পুরনো সাম্রাজ্যবাদী পরগাছাবৃত্তি অনুসরণ করে চলতে পারবে না। সাম্রাজ্যবাদের কোমর ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু সাম্রাজ্য-বাদী কাঠামোকে জিইয়ে রাখবার প্রচেষ্টাই বৃটেনের বাণিজ্যসঙ্কট ডেকে আনছে। ১৯৫৩ সালে রক্ষণশীল দল বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্কট-সমাধান করেছে বলে লম্ফ-ঝম্প করার সময় শ্রীদত্ত ঐ পুস্তিকাখানি আরও বিস্তৃত করেন, এবং 'দ্য ক্রাইসিস অব বৃটেন এ্যাণ্ড দি বৃটিশ এম্পায়ার' বইটি প্রকাশ করেন। এতেও তিনি বৃটেনের সঙ্কট যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কট, সেটি আরও স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেন। ১৯৫৭ সালে ঐ বইটিতে তিনি একটি নতুন অংশ যোগ করেন, বিষয়ঃ পুরনো ও নতুন ঔপনিবেশিকতা। ঐ অংশটিতে শ্রীদত্ত দেখালেন যে সাম্রাজ্যবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য বৃটেন এবার নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে। বৃটেন অধিকাংশ প্রাক্তন উপনিবেশকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছে বটে, কিন্তু বৃটিশ একচেটিয়া মূলধনপতিদের স্বার্থ টিকিয়ে রাখতে ও সদ্যস্বাধীন দেশগুলিকে পদানত রাখতে তারা নানা ছলে সচেষ্ট হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের এই নতুন রূপের নাম নয়া ঔপনিবেশিকতা। আর তাই বৃটেনের সঙ্কট এখন নয়া ঔপনিবেশিকতার সঙ্কট।

এক হিসেবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা একটি বিশিষ্ট স্মারকচিহ্ন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিকাংশ সেই সময় থেকে তার প্রত্যক্ষ শাসনের বাইরে চলে যায়। তারপর এই বিশ বছর ধরে অত্যন্ত পাকাপাকিভাবে বৃটেন তার নয়া

ঔপনিবেশিকতাব কৌশল গডে তুলছে। বৃটেন আগেব মতোই ঔপনিবেশিক শাসনও চালিয়েছে, ঔপনিবেশিক লডাই লডেছে মালযে বা এডেনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃটেন অধিকাংশ দেশে এমন কাযদায বাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তব করে, যাতে বৃটিশ মূলধনেব বশংবদ, জাতীয় বুর্জোয়াদেব একাংশ বাজনৈতিক ক্ষমতা পেযে যায়। কিন্তু এতে বৃটেনেব লাভ কী হযেছে ?

আর্থনীতিকভাবে পদানত বাখাব জন্য বাজনৈতিক ও সামবিক, দালাল নিয়োগ ও চোখ বাঙ্গানি—দু-ব্যবস্থাই চালু বাখতে হয। এজন্য বৃটেনকে কমনওযেলথেব গাঁঠছডা, ঘাঁটি অনুসন্ধান ও ঘাঁটি বসানো, বিদেশে বৃটেনেব সামবিক ব্যয বাডিযে তোলা, 'সুযেজেব পূর্ব' বণনীতিতে জোব দেওযা—ইত্যাকাব অনেক কিছুই কবতে হয। এই বাজনৈতিক ও সামবিক—দুটি মহলেই আজ বৃটেনেব সঙ্কট বহুদূব ব্যাপ্ত। কিন্তু কেন ?

কি লেবাব কি কনজাবভেটিভ, যে দলই সবকাবে থাকুক না কেন, এদেব সবাবই লক্ষ্য বিদেশে বৃটিশ মূলধন গডে তোলা এবং ঐ মূলধন থেকে পাওনা অব্যাহত বাখা। আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে বৃটেনেব পাউণ্ড স্টাবলিঙেব ভূমিকা এবং লণ্ডনেব কোম্পানিগুলিব হেড অফিস বিদেশে বৃটেনেব মূলধন-বিস্তাবে বেশ সহাযতা কবেছে। দেখা গেছে, যে-বছব আন্তর্জাতিক লেন-দেন খাতে বৃটেনেব ঋণ বযেছে, সে-বছবেও বৃটেন বিদেশে মূলধন বপ্তানি কবেছে। বিদেশ থেকে পাওনা মুনাফা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব আগে ছিল প্রায বিশ কোটি পাউণ্ড, ১৯৬৫তে তা হযে দাঁডায একশো কোটি পাউণ্ড। যুদ্ধেব আগে নীট মুনাফা ছিল সতেবো কোটি পাউণ্ড, ১৯৬৫ সালে তাব পবিমাণ দাঁডাল পঁয়তাল্লিশ কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড। বিদেশে বিলিতি কোম্পানিগুলি দেশে-অর্জিত মুনাফাব দুই পঞ্চমাংশ উপার্জন কবে। তাছাডা কাঁচামাল উৎপাদনকাবী দেশ থেকে বাণিজ্যহাবেব অসাম্যজনিত লাভ ছাডাও অন্যান্য অনেক বকম লাভ কবা যায। সত্যি কথা বলতে কি প্রতিবছব ঐ দবিদ্র দেশগুলিব ভাগ্যে যতখানি 'বিদেশী সহাযতা' জোটে, সুদ-ঋণ পবিশোধ প্রভৃতিব জন্য তাদেব তাব চেযে ঢেব বেশি ফেবত দিতে হয। এ-ব্যবস্থায মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র ও বৃটেনেব সবচেযে বেশি সুবিধে জুটেছে। বৃটেনেব মূলধনপতিবা বেশি লাভেব আশায় খোদ বৃটেনকে বঞ্চিত কবে মূলধন পাঠাচ্ছে বাইবে, আব বিদেশে সেই মূলধনকে চৌকি দেবাব জন্য সৈন্যবাহিনী পোষা হচ্ছে বৃটিশ কবদাতাদেব ট্যাকেব পযসায়। তা ছাডা বিদেশে দানবাকৃতি বৃটিশ কোম্পানিগুলি বাজাব

হালে বহালতবিয়তে দেশ শোষণ কবছে, মুনাফা ফেবত পাঠাচ্ছে একচেটিযা মূলধনপতিদেব। আই-সি-আই ১৯৬৬ সালে একশো বাইশ কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনে মুনাফা লুটেছে দশ কোটি বিশ লক্ষ পাউণ্ড। আবও মজাব ব্যাপাব, লণ্ডনে হেড অফিস বাখাব কল্যাণে এদেব মুনাফা বৃটেনে অর্জিত আয বলে গণ্য হয। সম্প্রতি 'লণ্ডন টাইমস' জানিয়েছে তিনশোটি বড বড ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেব মোট মূলধন ছশো ত্রিশ কোটি আশি লক্ষ পাউণ্ড, আব তাদেব মুনাফাব পবিমাণ উননব্বই কোটি পাউণ্ড। এতে বোঝা যায, বিদেশ শোষণ কবে বৃটেনেব মূলধনপতিবা কেমন বহালতবিযতে আছে।

কিন্তু পাল্টা চাপ বাডছে। বৃটেনেব নযা ঔপনিবেশিকতা টিকিয়ে বাখাব বাজনৈতিক সংগঠন কমনওযেলথ আব আগেব মতো নেই। কমনওযেলথ এখন বৃটেনেব শিবঃপীডা হযে উঠেছে। সদস্য বাষ্ট্রবা অনেকেই আজ বৃটেনেব বিরুদ্ধে মত প্রকাশে দ্বিধা কবছে না। আব তাছাড়া, একটিব পব একটি সামবিক ঘাঁটি থেকে তাকে সবে পডতে হচ্ছে। শুধু তাই নয, বিদেশে সৈন্য-বাহিনী পুষবাব ব্যযও প্রচণ্ড। এখন তো আব 'বাজকীয ভাবতীয বাহিনী' নেই যে বৃটেনেব মূলধনেব স্বার্থে লডবে। বৃটিশ টাকা, বক্ত—সবই আজ একচেটিয়া বৃটিশ মূলধনেব লুণ্ঠন-প্রবৃত্তিকে চবিতার্থ কবাব জন্য ঢালতে হবে।

তাই এক কথায বলা চলে—বৃটেনেব দেনাপাওনাব সাম্প্রতিক সঙ্কটবৃদ্ধিব কাবণ : বিদেশে মূলধন পাঠানো ও ক্রমবর্ধমান হাবে সামবিক ব্যয় অক্ষুণ্ণ বাখা। বৃটিশ বাষ্ট্রনেতাবা বলছেন—দেশে আমদানি বেড়েছে, কিন্তু লোকজনেব আয় বেডে যাওযায তাবা দেশী-বিদেশী জিনিস দুই-ই বেশি কিনছে বলে বপ্তানি বাডছে না, সুতবাং ট্যাক্সো দাও। এ যে সমস্তটাই ফাঁকি, একথা বৃটিশ জনগণ ক্রমে বুঝতে পাবছেন। অবশ্য বৃটিশ কমিউনিস্টবা বুঝেছিলেন ঢেব আগে।

তরুণ সান্যাল

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিপ্লবের একান্ন বছরে

শত্রুব মুখে ছাই দিযে অক্টোবব মহাবিপ্লব একান্ন বছব পূর্ণ কবেছে। একদিন ছিল—যেদিন দেশে দেশে সমাজতন্ত্রেব জন্য, জাতীয মুক্তি-আন্দোলনেব জন্য সংগ্রামবত জাতিব কাছে রুশবিপ্লব ছিল অনুপ্রেবণা, ছিল মডেল মাত্র। সমাজতন্ত্রেব প্রথম মাতৃভূমিরূপে, সর্বহাবা একনাযকতন্ত্রেব প্রথম অভিব্যক্তিরূপে দেশে দেশে অক্টোবব মহাবিপ্লব ছিল একদিন নিছকই উদাহবণ। বিপ্লবেব ভাবাদর্শেব প্রেবণা এবং তাব পথ—এব মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বাইবেব জগতেব কাছে রুশবিপ্লবেব তাৎপর্য।

কিন্তু প্রাণবন্ত গতিশীল এক বিপ্লবেব তাৎপর্য বস্তুটা ভদ্রলোকেব এক-কথাব মতো অনড কোনো স্থিব বস্তু নয। বিপ্লবেব অগ্রগতি ও বযোবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে তাব তাৎপর্যেবও রূপান্তব ঘটে।

যে-দেশ আমাদেব কাছে একদা নিছক মানসিক উদ্বোধনেব প্রেবণা, নিছকই অনুকবণীয এক মডেল ছিল, সে আজ আব আমাদেব নিছক মডেল নেই। রুশিযাব নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদকে পবাজিত করে, যুদ্ধোত্তব পৃথিবীব এক বিবাট অঞ্চল জুডে গডে উঠেছে সমাজতান্ত্রিক দুনিযা। এই সমাজতান্ত্রিক দুনিযাব অস্তিত্ব, তাব শক্ত দুই বাহুব ভবসা এবং সেই সঙ্গে দেশভেদে জাতীয বৈশিষ্ট্য আজ সমাজতন্ত্রেব লক্ষ্যে পৌছবাব বিভিন্ন পথেব সুযোগ খুলে দিযেছে। সে-পথ রুশবিপ্লবেব পথেব চেযে ভিন্নতব হচ্ছে এবং হতে পাবে।

দেশে দেশে বিপ্লব নিজেব পথ নিজে নির্বাচন করবে—বিপ্লবেব এই স্বযংববা হবাব অধিকাব যে আজ বহুল পবিমাণে সুনিশ্চিত, তাবও অনেক কাবণেব মধ্যে অন্যতম কাবণ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দুনিযাব শাবীবিক অস্তিত্ব। সেই দুনিযাব অন্যতম বিশ্বকর্মা অক্টোবব বিপ্লবেব দেশ। ইতিহাসেব অগ্রগতিব সঙ্গে সঙ্গে রুশবিপ্লবেব তাৎপর্যও রূপান্তবিত হচ্ছে এইভাবে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেব মাতৃভূমি রুশ দেশ আজ আমাদেব কাছে আব শুধুই উত্তবাকাশেব তাবা নয। ভিযেতনাম থেকে কিউবা পর্যন্ত ছোট-বড সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশেব এবং এশিযা-আফ্রিকা ও লাতিন আমেবিকাব স্বাধীন

ও স্বাধীনতাব জন্য সংগ্রামবত দেশগুলিব সাম্রাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে সংগ্রামে নির্ভবযোগ্য ভবসা সোভিযেত রুশিযাব নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক দুনিযা। আজকেব যুগেব অ-পুঁজিবাদী বিকাশেব পথে নতুন-স্বাধীন দেশগুলিব বিকাশে সমাজতান্ত্রিক দুনিযাব বৈষয়িক সাহায্য নিছকই অনুদান নয। সমাজতান্ত্রিক দেশেব হাত ধবেই এই দেশগুলি এগোচ্ছে তাদেব নিজ নিজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিব দিকে। সে-বিকাশেব অনিবার্য লক্ষ্য সমাজতন্ত্র।

রুশবিপ্লবেব একান্ন বছবেব হিসাবেব খাতাযও একদিন ভুলেব জমা ধবা পডেছিল। চতুর্দিকে পুঁজিবাদী দেশ দিযে ঘেবা একলা একটি দেশ নিঃসঙ্গ দ্বীপে ববিনসন ক্রুসোব মতো এক-হাতে সমাজতন্ত্র গডেছে। পুঁজিবাদী দুনিযাব অসম বিকাশ এবং সাম্রাজ্যবাদেব অন্তর্বিবোধ বাহ্যিক কাবণরূপে তাব সেই একক সমাজতন্ত্র-গঠনে আনুকূল্য দান কবেছিল সন্দেহ নেই। তথাপি একলা সোভিযেত ভূমিকে তাব সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গডাব সে-গুরুভাব কাঁধে নিতে হযেছিল। নিজেকে নিঙডে তাকে যে-আত্মত্যাগ কবতে হযেছিল, যে-ঝড-ঝাপ্টা মাথায কবে চলতে হয়েছিল—সেই অস্বাভাবিক দুর্যোগেব ফলেই হযতো সেখানে একদিন গণতন্ত্র সামযিকভাবে বিকৃত হযেছিল এবং বড হযে উঠেছিল একনাযকত্বেব স্বৈবাচাবীরূপ। নাযকেব, ব্যক্তিব এবং গোষ্ঠীবিশেষেব হাত এ-বিকৃতিকে আবও ভযাবহ রূপ দান কবেছিল সন্দেহ নেই। পার্সনালিটি কালটেব পক্ষে এটা আমাব সাফাই নয। পবন্তু এটা পার্সনালিটি কালটেব উৎসসন্ধানেব চেষ্টা মাত্র।

কিন্তু ভুলটা গৌণ হযে দাঁডায তখন, যখন ভুলেব অনুষ্ঠাতাবা ভুলকে প্রকাশ্যে সংশোধনেব সাহস বাখে। কর্তাব ভূতকে ঘাড থেকে নামাতে অন্য অনেকে আজ পর্যন্ত সাহস না কবলেও, রুশ দেশ তা কবেছে।

ইতিহাসেব বিশেষ এক বিপর্যযেব যুগে বিপ্লবেব জীবনে যে-বিকৃতি ঘটেছিল, আজ তাব পুনবাবৃত্তিব সম্ভাবনা নেই। কাবণ, আজ কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশই একলা নয, নিঃসঙ্গ নয। সুতবাং সমাজতান্ত্রিক দুনিযাব সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি, তাব আন্তর্জাতিক সংহতিই হলো আজকে বিকৃতিব বিরুদ্ধে সবচেযে বড গ্যাবান্টি।

এই আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সংসাব থেকে যে কোনো জোটেই হোক না কেন, নিজেকে বিচ্ছিন্ন কবে বাখবে যে, তাব ঘাডে কর্তাব ভূত অবধাবিত-ভাবে চেপে বসবেই। আজকেব চীন সমস্ত সুযোগ সত্ত্বেও সেই পুনবাবৃত্তিবই উদাহবণ।

অন্যদিকে বিকৃতির ও বিচ্যুতির পুনরাবৃত্তির ভয়ে ঘরপোড়া গরুর মতো আতঙ্কিত যাঁরা মার্কস-লেনিনের বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের মধ্যেই গণতন্ত্রহীনতা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছেন—তাঁরাও ভিন্ন পথে হলেও, একই ভুলে গিয়ে পৌঁছবেন।

পারি কমিউনের ব্যর্থতার পরেও নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে প্রচার করত এমন একদল লোক সিদ্ধান্ত করেছিলেন, বিপ্লবের পথটাই খারাপ, ও-পথে মুক্তি-অর্জন সম্ভব নয়। ইতিহাস এঁদের অনেক নাকানি-চোবানি খাইয়েছে। স্তালিনের হাতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নিগ্রহের কথা মনে করে আজ যাঁরা সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র নেই বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, কর্তার ভূতের ভয়ে যাঁরা সমাজতান্ত্রিক সংহতি ভেঙে সমাজতন্ত্রকে মন্ত্রপূত জাতীয় গণ্ডীর বেড়া দিয়ে বাঁচাবার কথা ভাবছেন—তাঁরাও সম্ভবত সেই ভুলই করছেন।

কর্তার ভূত কর্তার ইচ্ছায় আনাগোনা করে না। ইতিহাসের অবস্থার বিপর্যয়ই তাকে ডেকে আনে। বিশ্বের বিরাট এক অঞ্চল জুড়ে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সবল অস্তিত্ব সেই বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টি, স্তালিন আর জন্মাতে পারেন না। তিনি যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, তাহলে জন্মান মাও সে-তুং রূপে এবং একমাত্র সেই দেশেই, যে-দেশ আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের শিবির থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায়। বিচ্ছিন্নতার এই প্রবণতাই হয় ডাইনে না হয় বাঁয়ে সব রকমের বিচ্যুতি ও বিকৃতির জন্ম দেয়।

ভ্রান্তিউত্তীর্ণ, একান্ন বছরের শক্তিমান রুশ বিপ্লব এই তাৎপর্যকেই আজ তার সমস্ত অগ্রগতি দিয়ে প্রমাণ করে চলেছে।

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

রাসেল, সার্ত্র ও বুলগেরিয়ার ছাব্বিশজন বুদ্ধিজীবী

১৯৬২ সালের নভেম্বরে ক্যারিবিয়ান সঙ্কট পৃথিবীকে যখন বিপুল ধ্বংস ও সামগ্রিক যুদ্ধের কিনারায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল, বিশ্বের সমস্ত মানুষ যখন নিঃশ্বাস বন্ধ করে স্তব্ধ আতঙ্কে কালগণনা করছিল, লর্ড রাসেল তখন পীড়িত হচ্ছিলেন তাঁর "শেষ জিজ্ঞাসায়।" পৃথিবীতে কি কাণ্ডজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন এমন রাষ্ট্র একটিও নেই যে যুদ্ধ ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে, শান্তি ও প্রগতির পক্ষে দাঁড়াতে পারে? পৃথিবীকে যাঁরা শাসন করেন, তাঁদের মধ্যে কি একজনও

"প্রকৃতিস্থ' ব্যক্তি নেই ? লর্ড বাসেল তাঁব জিজ্ঞাসাব উত্তব খুঁজে পেযেছিলেন সেদিন। স্বস্তি বোধ কবেছিলেন। এবং বেদনাও। গভীব বেদনা ও বিস্ময়েব সঙ্গে তিনি ঘোষণা কবেছিলেন যে তেমন একটি বাষ্ট্র ও তেমনি একজন বাষ্ট্রনাযক তিনি "মুক্ত দুনিযাতেই" আশা কবেছিলেন, কিন্তু তাঁব সে-আশা পূর্ণ হয নি। অন্য দুনিযা থেকে এসে হাজিব হলেন তাঁবা। কাণ্ডজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানবিশিষ্ট সেই বাষ্ট্রটিব নাম বাশিযা এবং "প্রকৃতিস্থ" সেই বাষ্ট্রনাযকটিব নাম খ্রুশ্চভ্।

প্রত্যেকটি ক্রিযাবই প্রতিক্রিযা ঘটে। বড বড ঘটনাব প্রতিক্রিযাও বড বড। বড বড ব্যক্তিদেব ক্ষেত্রে তা হযতো গভীবতবও। তাই চেকোস্লো-ভাকিযাব একুশে অগাস্টেব ঘটনাও প্রতিক্রিযা সৃষ্টি কবল। আব ঘটনাটা যেহেতু বেশ বড, প্রতিক্রিযাও ঘটল বিশ্ব জুডে। লর্ড বাসেলেব মনেও ঘটল। খুবই স্বাভাবিক। তিনি, সার্ত্র এবং ভিযেতনাম-যুদ্ধবিবোধী বিচাব-ট্রাইবুন্যালেব বুদ্ধিজীবীদেব অনেকেই—কেউ বাদ পডলেন না। এটাও স্বাভাবিক।

কিন্তু…

লর্ড বাসেল ও সার্ত্র তাঁদেব প্রতিক্রিযাকে মনেব গণ্ডীতে বেঁধে না বেখে, সংশয বা জিজ্ঞাসাব সীমানা এডিযে একটা খোলাচিঠি লিখে ফেললেন। কাদেব প্রতি চিঠিটি? সোশিযালিস্ট ও কমিউনিস্টদেব প্রতি। কিন্তু তাঁবা কোথায পাঠালেন চিঠিটি? 'প্রাভদা,' 'ইজভেস্তিযা' কিংবা পশ্চিমেব বহুল প্রচাবিত ও মর্যাদাসম্পন্ন কোনো কমিউনিস্ট, এমন কি সোশিযালিস্ট পত্রিকায কি? না। সোজা 'দি টাইমস'-এ। চিঠিটি মুহূর্তে প্রচাবেব হাতিয়াব হলো এবং সেই সঙ্গে চিঠিব লেখকবা, যা কিছু "নীতিজ্ঞান সম্পন্ন" ও "প্রকৃতিস্থ", তাব বিরুদ্ধে প্রতিক্রিযাশীল, সমাজবাদবিবোধী ও সাম্রাজ্যবাদী প্রচাবেব হাতিযাব। যে কমিউনিস্ট ও সোশিযালিস্টদেব "চেতনা" তাঁদেব লক্ষ্য, চিঠিটি তাব কাছে আবেদনেব বদলে কুৎসা হযে পৌছল। লর্ড বাসেলবা নিজেদেব "উপলব্ধি"কে যে শুধু এদেব হাতে দিযে নিশ্চিন্ত হলেন, তা-ই নয। বেশ হলফ কবেই বললেন, চিঠিটি "অত্যন্ত নির্ভবযোগ্য মার্কিন সংবাদপত্রগুলিব" সংবাদেব ওপব নির্ভব কবে লেখা।

তীব্র ক্ষোভ ও ব্যথা নিযে তাঁদেব এই চিঠিব উত্তবে সেইজন্যে বুলগেবিযাব ছাব্বিশজন বুদ্ধিজীবী লিখেছেন: "..অবশ্য এইসব দলিলপত্র

সম্পর্কে অবহিত হতে গেলে আপনাদেব দু-তিন ঘণ্টা সময ব্যয কবতে হতো। মনে হচ্ছে আপনাদেব পক্ষে সেই সময দেওযাব চাইতে অন্যেব বচিত কুৎসা ভবা একটি তৈবি দলিলে স্বাক্ষব দান অনেক সুবিধাজনক।"

আব সেই জন্যেই লর্ড বাসেলদেব সিদ্ধান্ত: সোভিযেত ইউনিযন ও মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র পৃথিবীকে নিজেদেব মধ্যে বাঁটোযাবা কবে নিযে আপন আপন এলাকায তাদেব জমিদাবি চালিযে যাচ্ছে। চেকোস্লোভাকিযাব স্বাধীনতা-স্পৃহাকে তাই দমিত হতে হলো। তাকে অস্ত্রেব জোবে "রুশ প্রভাবাধীন এলাকা" হযে থাকতে বাধ্য কবা হলো। এইসব ঘটনা বলকান অঞ্চলেব শান্তিকে বিপন্ন কবছে। এবং ইত্যাদি।

বুলগেবিযাসহ ওযাবশ চুক্তিব দেশগুলিকে আক্রমণ কবে তাঁবা তাঁদেব চিঠিতে যা লিখেছেন, তাব উত্তবে বুলগেবিযাব বুদ্ধিজীবীবা লর্ড বাসেলকে প্রশ্ন কবেছেন:

"এই মুহূর্তে সোভিযেত ইউনিযন যখন মার্কিন সমববাদেব বিরুদ্ধে প্রথম সাবিতে দাঁডিযে লডছে—ভিযেতনাম থেকে নিকট প্রাচ্য পর্যন্ত, ইওবোপেব কেন্দ্রস্থল থেকে শুরু কবে বিশ্বেব বিভিন্ন অংশে—সে যখন দস্যুতাব চক্রান্তকে কার্যত প্রতিহত কবছে, সেই যুগে, বাস্তববাদী বলে যাঁবা নিজেদেব জাহিব কবেন, তাঁদেব পক্ষে সোভিযেতেব বিরুদ্ধে কুৎসা কবা কিভাবে সম্ভব হয?"

লর্ড বাসেল শান্তি ও প্রগতিব পক্ষে একজন দৃঢ সৈনিক। কিন্তু বাস্তব সর্বদা ভাববাদী আদর্শকে সহ্য কবতে পাবে না। প্রাযই গুঁডিযে দেয রূঢ আঘাতে। লর্ড বাসেল প্রমুখ ব্যক্তিবা সাম্রাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে, আণবিক অস্ত্রনিবোধ-সংগ্রামেব শবিক। কিন্তু ভাববাদী আদর্শ তাঁদেব দৃষ্টিকে অনেক সমযই আচ্ছন্ন কবে বেখেছে। পাবমাণবিক অস্ত্র-প্রতিযোগিতায পাছে সোভিযেত এগিযে থাকে, তাই তিনি পশ্চিমী শক্তিগুলিকে একদিন সেই অস্ত্র দ্রুত আযত্ত কবাব পবামর্শও দিযেছিলেন। অনুতপ্ত লর্ডকে আজ সেই ভুলেব প্রাযশ্চিত্ত কবতে হচ্ছে মিছিলেব সাবিতে দাঁডিযে। তেমনি হযতো একদিন আসবে, যখন…

বুলগেবিযাব ছাব্বিশজন বুদ্ধিজীবী তাঁদেব চিঠিতে লিখেছেন: "শান্তি ও প্রগতিব জন্য সংগ্রামবত জনগণেব মধ্যে আপনাবা যে প্রভাব অর্জন কবেছেন, তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, তাকে বক্ষাব গুরুত্বও কম নয।"

একদিন হযতো লর্ড বাসেল জানবেন—অতীতেব বহুবাবেব মতোই—

প্রচারের বিভ্রান্তি প্রভাবিত করেছে তাঁকে। তখন হয়তো তিনি আরো বেশি মিছিলে আসবেন। কিন্তু ততদিন বুলগেরিয়ার ছাব্বিশজন বুদ্ধিজীবীর ভাষায় এই অভিযোগ ধ্বনিত হবে: "একটি মিথ্যার ইস্তাহারে স্বাক্ষর করার পরও কিভাবে আপনারা ন্যায়যোদ্ধার মর্যাদা দাবি করতে পারেন, তা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম।"

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গণবিক্ষোভ

প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিমাংশ জুড়ে আয়ুব-বিরোধী বিক্ষোভ চলেছে। পূর্বাংশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা দীর্ঘ দিনের, পশ্চিমাংশে তা সাম্প্রতিক। পশ্চিমাংশে এবার প্রথম বিক্ষোভ শুরু করেন ছাত্রসমাজ—শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত দাবিপত্র নিয়ে। 'বুনিয়াদী গণতন্ত্র'-র প্রবক্তা আয়ুব খাঁ পুলিশ-মিলিটারির বুটের তলায় তা নিষ্পিষ্ট করতে উদ্যোগী হলেন—কিন্তু ফল দাঁড়াল উলটো। সারা পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল—লাঠি-টিয়ারগ্যাস-গ্রেপ্তারের জবাবে ছাত্ররা মিটিং-মিছিল-হরতাল এবং পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ এমন কি গাড়ি-ঘোড়া-সরকারী সম্পত্তি ধ্বংসের পথ পর্যন্ত অবলম্বন করল। মিটিং-এ ভাষণরত আয়ুব খান-এর দিকে গুলি নিক্ষিপ্ত হলো—আততায়ী সন্দেহে ধৃত হলেন পলিটেকনিক কলেজের জনৈক ছাত্র। কারাগারে অন্তরীণ হয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তানের বামপন্থী আন্দোলনের নেতা ওয়ালী খান সহ অনেকে। ছাত্রদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করতে এগিয়ে এলেন আইনজীবী-অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবীরা। আর, এই বিক্ষোভকে সুযোগমতো কাজে লাগাতে এগিয়ে এলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভুট্টোসাহেব ও তাঁর অনুগামীরা, পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান মার্শাল আসগার খাঁ-সাহেবও পেছিয়ে রইলেন না।

ব্যাপারটা মন্দ নয়—বুনিয়াদী গণতন্ত্রের প্রশংসায় একদা-পঞ্চমুখ ভুট্টোসাহেব এখন আয়ুব খান-এর চরমবিরোধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রাজনৈতিক বাজিমাতের স্বপ্ন দেখছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আগামী ১৯৭০ সালে। ভুট্টোসাহেব যদি জেল থেকে মুক্তি না পান, তা হলে তো আসগর খাঁসাহেব রয়েছেন—সৈন্যবাহিনী, উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিও নেহাৎ কম নয়।

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিক্ষোভকে আপাতদৃষ্টিতে আয়ুব বনাম ভুট্টোর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বলেই মনে হবে। নেপথ্য কাহিনী কিন্তু ভিন্ন। তা হলো স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমগ্র পাকিস্তানের গণতন্ত্রকামী মানুষের জেহাদ। এই জেহাদের বাস্তব ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট প্রগতিপন্থী নেতা মুজিবর রহমান সাহেবের লেখা—'Friends not Foes' এই ঐতিহাসিক দলিলের মধ্যে। 'বুনিয়াদী গণতন্ত্র'-র "সোনালী দশবছর" আর ফিল্ডমার্শাল আয়ুব খান-এর 'Friends not Masters'-এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন পাকিস্তানের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ। 'কাশ্মীর', 'ইস্লাম', 'ভারতের সম্ভাব্য আক্রমণ' ইত্যাদি কোনো টোটকাই আর তেমন ধরছে না। দিন দিন গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি সোচ্চার হয়ে উঠছে। এই দাবিকে কাঁটামারা জুতোর তলায় নিষ্পিষ্ট করতে সচেষ্ট মদমত্ত ডিকটেটর ফিল্ডমার্শাল আয়ুব খাঁ, অপর দিকে 'ইস্লাম' 'গণতন্ত্র' 'সমাজতন্ত্র' ইত্যাদি গালভরা গরম-গরম বুলির তোড়ে আন্দোলনকে বিপথগামী করতে তৎপর ক্ষমতালোভী ভুট্টোসাহেব ও তাঁর অনুগামীরা। আশার কথা, আয়ুব বনাম ভুট্টোর খিস্তি-খেউড় যেমন জমে উঠেছে—তাতে পাকিস্তানের রাজনীতি-সচেতন গণতান্ত্রিক মানুষের বুঝতে অসুবিধে হবে না যে আয়ুব এবং ভুট্টো একই অচল টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। এঁরা দু-মুখো মামা-ভাগ্নে সাপ, নিজেরা পরস্পর কামড়া-কামড়ি করলেও, উভয়েই কিন্তু গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শত্রু।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার জালিয়াতি আর দমন-পীড়নকে উপেক্ষা করে পূর্ববঙ্গের গণতন্ত্রপ্রিয় সংগ্রামী মানুষ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন। ঢাকা শহরে আয়ুব খান-এর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে এই তো সেদিন হাজার হাজার ছাত্র এবং সংগ্রামী মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। মৌলানা ভাসানীর আহ্বানে এগিয়ে চললেন সংগ্রামী মানুষ—লাঠি-টিয়ারগ্যাস-গুলি-গ্রেপ্তার কোনো কিছুই তাদের প্রতিহত করতে পারে নি। ঢাকা শহরে পুলিশের চণ্ড আক্রমণে প্রাণ হারালেন দু-জন, আহত হলেন অনেকে। পূর্ব বাঙলার মানুষ আবার প্রমাণ করলেন ডিকটেটরশিপের কবর রচনা করে গণতন্ত্রের বিজয়ী পতাকা তুলতে তাঁরা বদ্ধপরিকর; লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের এ-সংগ্রাম থামবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের অগ্রণী ছাত্রসমাজ ও প্রগতিপন্থী বুদ্ধিজীবীরা যদি একযোগে পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গণতন্ত্রের পতাকা নিয়ে ঠিকপথে এগোতে

পাবেন—তা হলেই একমাত্র সমগ্র পাকিস্তান থেকে 'বুনিযাদী গণতন্ত্র'-ব বাহুমুক্তি ঘটবে।

চার্বাক সেন

সোভিয়েত দেশ নেহরু-পুরস্কার

'সোভিযেত দেশ নেহরু-পুবস্কাব' কমিটি ১৯৬৮ সালেব জন্য ভাবতেব বিভিন্ন ভাষায বচিত ভাবত-সোভিযেত মৈত্রী, শান্তি ও প্রগতিব আদর্শে নিবেদিত শ্রেষ্ঠ বচনাবলীব জন্য পুবস্কাবপ্রাপ্তদেব নাম ঘোষণা কবেছেন। এ-বছব সাবা ভাবতেব বিভিন্ন ভাষাব তেইশজন বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক ও অনুবাদক এই পুবস্কাব-লাভে সম্মানিত হযেছেন। এ-ছাডা ভাবতেব বিভিন্ন বাজ্যেব পাঁচজন কিশোব-কিশোবীসহ মোট ছযজনকে তাঁদেব বচিত চিত্রাবলীব জন্যও এই পুবস্কাব প্রদান কবা হযেছে। আমবা 'নেহরু-পুবস্কাব'-বিজযী ভাবতেব এই উনত্রিশজন কৃতী বন্ধুদেব সকলেব উদ্দেশ্যেই আমাদেব অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমবা বিশেষভাবে অভিনন্দিত কবছি বাঙলাব প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনেব অন্যতম পুবোধা, আমাদেব পবম সুহৃদ ও 'পবিচয' পত্রিকাব দীর্ঘকালেব বন্ধু-লেখক প্রবীণ কবি শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ ও নাট্যকাব শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযকে। কাবণ—অক্টোবব বিপ্লব, প্রগতি ও শান্তিব উদ্দেশে বচিত 'উত্তবাকাশেব তাবা' কাব্যগ্রন্থটিব জন্য কবি শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষকেই এবাব পূর্বাঞ্চলীয বাজ্যগুলিব মধ্যে মৌলিক সাহিত্যকর্মেব জন্য শ্রেষ্ঠ পুবস্কাব প্রদান কবা হযেছে। আব, নাট্যকাব ও সাংবাদিক শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায গোর্কিব উপন্যাস 'মা'-এব নাট্যরূপ-দানেব জন্য সাহিত্যেব অতিবিক্ত পুবস্কাবে সম্মানিত হযেছেন।

কবি শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ ববীন্দ্রোত্তব বাঙলা-কাব্যেব অন্যতম প্রধান পুরুষ। ব্যক্তিগত জীবনে দীর্ঘকাল তিনি দাবিদ্র্যেব সঙ্গে সংগ্রামবত। চল্লিশেব দশকেব শেষ দিকে যখন বিমলচন্দ্র তাঁব জীবিকা-নির্বাহেব একমাত্র পথ সবকাবী চাকবি থেকে পদত্যাগ কবে কবিতা-বচনাব মাধ্যমেই বেঁচে থাকাব সঙ্কল্প ঘোষণা কবেন— তখন অনেক আশাবাদী বন্ধুব মুখেও সংশযেব ছাযা দেখেছি। কিন্তু সমস্ত সংশয এবং অবিশ্বাস অতিক্রম কবে শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ নিষ্ঠুব দাবিদ্র্য ও বোগেব সঙ্গে সংগ্রাম কবে আজও বেঁচে আছেন এবং বেঁচে আছেন কবিতাব মাধ্যমে, তাঁব অজস্র সৃষ্টিব মধ্যে। যে-যুগে বহু কবি-সাহিত্যিক সামান্য

প্রলোভনে ভ্রষ্টাচারী হতে দ্বিধা করেন না, সেইযুগে নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দাঁড়িয়েও যে-বিরল সংখ্যক স্রষ্টা এখনও আদর্শনিষ্ঠ এবং সমাজতান্ত্রিক জীবন-দর্শনের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত, কবি বিমলচন্দ্র তাঁদেরই একজন। কবি বিমলচন্দ্রের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। ফলে, তাঁর কবিতায় বারংবার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে সংগ্রামী সুর, উচ্চকণ্ঠ পৌরুষ এবং কাব্য-শরীরও গঠিত হয়েছে ঋজু-পেশল-বেগবান শব্দের অবিরাম প্রবাহে। বাঙলাদেশের সংগ্রামী মানুষের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা আজও তাই অম্লান।

সোভিয়েত বিপ্লবের অর্ধশতাব্দী পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত কবি বিমলচন্দ্রের 'উত্তরাকাশের তারা' কাব্যগ্রন্থখানি তাঁর পরিণত জীবনে নতুন সম্মান ও স্বীকৃতি এনে দিয়েছে, এ-কথা সত্য। কিন্তু তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'দক্ষিণায়ন' 'দ্বিপ্রহর' এবং 'উদাত্ত ভারত'ও নিঃসন্দেহে আধুনিক বাঙলা-কাব্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদরূপে বিবেচিত হবে। আমরা বিশ্বাস করি, "বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে নতুন মানবেতিহাসের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে ক্রমশঃ" বিমলচন্দ্রের "সজাগ চৈতন্যের মধ্যে যুগান্তকারী বিপ্লব সম্পর্কে" যে "অপরিমেয় মূল্যবোধ" [উদ্ধৃতাংশ 'উত্তরাকাশের তারা' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা থেকে গৃহীত। প্রকাশক : মনীষা গ্রন্থালয়] জাগরিত হয়েছে, 'সোভিয়েত দেশ নেহরু-পুরস্কার' বিজয়ের পরে সেই জাগ্রত মূল্যবোধের আলোকে তিনি আরও দীর্ঘকাল বাঙলা-কাব্যকে উজ্জ্বলতর মহিমায় উদ্ভাসিত করবেন।

'সোভিয়েত দেশ নেহরু-পুরস্কার'-এর অন্যতম বিজেতা নাট্যকার শ্রীদিগিন্দ্র-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রগতিশীল নাট্য-আন্দোলনের যেমন প্রবীণ প্রবক্তা, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি কবি বিমলচন্দ্রের মতোই দৈন্যপীড়িত। বাঙলার গণনাট্য-আন্দোলনের প্রথম পর্বে দিগিন্দ্রচন্দ্র ছিলেন এই আন্দোলনের একনিষ্ঠ সংগঠক। চল্লিশের দশকে তাঁর রচিত 'তরঙ্গ' 'বাস্তুভিটা' 'মোকাবিলা' প্রভৃতি নাটকে রূপায়িত হয়েছিল সেই যুগের সংঘাতময় জীবন। সেই সময়কার সংগ্রামী মধ্যবিত্ত, কৃষক-মজুর দিগিন্দ্রচন্দ্রের নাটকের মাধ্যমে তাদের শ্রেণীচেতনাকে যে অনেকখানি শাণিত করতে পেরেছিল, এ-কথা অনস্বীকার্য।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেশসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রথম জীবনে সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। এই আদর্শবোধই সাংবাদিক দিগিন্দ্রচন্দ্রকে

নাট্যকাব দিগিন্দ্রচন্দ্রে রূপান্তবিত কবে। চল্লিশেব দশকে প্রগতিশীল সাহিত্য-আন্দোলন যখন এ-দেশেব বুদ্ধিজীবীদেব মনে নতুন প্রেবণা জাগিযে আবও ব্যাপ্তিব দিকে অগ্রসব হতে শুরু কবেছে, সাংবাদিক শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায তখন নানা প্রতিকূল অবস্থাব মধ্যে থেকেও সেই আন্দোলনেব সঙ্গে যুক্ত হতে এতটুকু দ্বিধা কবেন নি। পববর্তীকালে এই প্রগতিশীল আন্দোলনেব সঙ্গে যুক্ত-থাকাব 'অপবাধ'-এ স্বাধীনতা-উত্তব যুগেব একচেটিযা সংবাদপত্র-মালিকেব বোষানলে তাঁব স্থাযী জীবিকাব একমাত্র আশ্রয সাংবাদিকতাব বৃত্তিও পুড়ে ছাই হযে যায। 'গোল টেবিল' নাটক বচনার জন্য ১৯৫৩ সালে 'আনন্দবাজাব পত্রিকা' থেকে তাঁব কর্মচ্যুতির ঘটনা এখনও অনেক বন্ধু স্মবণ কবতে পাববেন বলেই আমাব বিশ্বাস।

প্রকৃতপক্ষে, আঠেবো বছব সাংবাদিকতাব পব ১৯৫৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত দিগিন্দ্রচন্দ্র কোনো স্থাযী জীবিকার্জনেব পথ খুঁজে না পেযে কবি বিমল-চন্দ্রেব মতোই নিদারুণ দাবিদ্র্য আব দুঃখ-কষ্টেব সঙ্গে সংগ্রাম কবছেন।

এই মানুষ যখন হতাশায ভেঙে না-পড়ে নতুন নতুন সৃষ্টিব পথে অগ্রসব হন এবং গোর্কিব 'মা'-ব মতো কালজযী উপন্যাসেব নাট্যরূপ দান কবেন, তখন অপবিসীম শ্রদ্ধায বিবেকবান মানুষেব মন ভবে যায। আমবা আশা কবি, শ্রমিকশ্রেণীব যে-ঐতিহাসিক ভূমিকাব কথা গোর্কি তাঁব 'মা' উপন্যাসে বিধৃত কবেছেন, পুবস্কাব-বিজযী নাট্যকাব শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায তাঁব পববর্তী মৌলিক বচনায অতঃপব এ-দেশেব পটভূমিকায তাকেই রূপদান কবতে সচেষ্ট হবেন।

'সোভিযেত দেশ নেহরু-পুবস্কাব' কমিটি যে যোগ্য ব্যক্তিদেব সম্মানিত কবেছেন—এ-জন্য তাঁদেবও আমবা সাধুবাদ জানাচ্ছি।

সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি পুরস্কার

এ-বছব বাঙলাদেশেব তিনজন কৃতী সন্তান সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি-কর্তৃক পুবস্কৃত হযেছেন। বিখ্যাত পালাকাব, যাত্রাভিনেতা ও অভিনয-শিক্ষক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ (বড় ফণী) যাত্রা-জগতেব শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে যেমন আকাদেমি পুবস্কাব পেযেছেন, তেমনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব ও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-শিল্পীরূপে পুবস্কৃত হযেছেন শ্রীযুক্ত বাদল সবকাব এবং ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ।

সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি কর্তৃক যাত্রাগানকে স্বীকৃতি দেওয়া নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাঙলার যাত্রাজগতের অন্যতম দিকপাল অভিনেতা ও পালাকার শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই পুরস্কার জয় করে বাঙলাদেশের ঐতিহ্যময়, সম্ভাবনাপূর্ণ অথচ অবহেলিত এক শিল্প-মাধ্যমেরই স্বীকৃতি আদায় করলেন। শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ তাঁর পঁচাত্তর বছর বয়সের পরিসীমায় একটানা অর্ধশতাব্দীকাল যাত্রাগানের মাধ্যমে বাঙলার লোক-সংস্কৃতিকে যেভাবে সেবা করেছেন, তার তুলনা বেশি নেই। অবক্ষয়ী বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রতিকূল পরিবেশে লোকসংস্কৃতির জীবন্ত ধারা যখন শুকিয়ে যেতে থাকে, তখন সাধারণ মানুষের সেই মানস-সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যাঁরা সাধনায় অতন্দ্র থাকেন, তাঁরা সমগ্র জাতিরই নমস্য। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সেই মুষ্টিমেয় নমস্য পুরুষদেরই একজন। আমরা আশা করি, শহর ও গ্রাম-বাঙলার লোকায়ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এই ঐতিহ্যময় যাত্রাগানের মাধ্যমেই ফণিভূষণ আরও দীর্ঘকাল উজ্জীবিত করে রাখবেন।

বাঙলার নাট্যজগতে শ্রীযুক্ত বাদল সরকারকে প্রায় নবাগতই বলা যায়। কিন্তু গত এক দশকের বাঙলা নবনাট্য-আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল, শ্রীযুক্ত সরকার তাঁদের কাছে অপরিচিত নন। বরং একজন প্রতিশ্রুতিময় নাট্যকাররূপেই তাঁর নাম অপরিচয়ের অন্ধকার অতিক্রম করে ধীরে ধীরে প্রায় সামনের সারিতে উঠে আসছিল। তাঁর রচিত প্রথম নাটক 'সলিউসন এক্স'-এর পর 'বড় পিসিমা' নাটকের মৌলিকতায় মুগ্ধ হয়ে ১৯৬৫ সালে 'নাট্যকার সঙ্ঘ' যখন ঐ নাটকখানিকে শ্রেষ্ঠ বাঙলা নাটক হিসেবে পুরস্কৃত করেন, তখন থেকেই তিনি বাঙলার নাট্যামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। এরপর 'মুক্ত অঙ্গন'-এ 'শৌভনিক' কর্তৃক তাঁর 'এবং ইন্দ্রজিৎ' ও 'বহুরূপী'-প্রযোজিত 'বাকী ইতিহাস' নাটক দুটির অভিনয় যাঁরা দেখেছেন— তাঁদের পক্ষে শ্রীযুক্ত সরকারের ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব। অনেকে মনে করেন শ্রীবাদল সরকার একদা যে-প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার সক্রিয় অংশীদার ছিলেন, সেই ভাবাদর্শের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই তিনি বর্তমানে জটিল যুগের জটিল মানুষের গ্লানি, হতাশা আর নৈঃসঙ্গ্যচেতনাকে নাটকে তুলে ধরবার জন্য নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিরত। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝুঁকি অনেক, দায়িত্বও কম নয়। এ-প্রয়াসের পরিণত ফসল হয়তো এখনও অনাগত। কিন্তু বাঙলার নবনাট্য-আন্দোলন তাঁর দানে যে লাভবান হয়েছে

এ-কথা অনস্বীকার্য। সুঅভিনেতা এবং বিচক্ষণ নাট্যপবিচালক হিসেবেও তিনি খ্যাত। সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি তাঁব নিবীক্ষামূলক প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানিযে অন্তত এবাবেব মতো যে গতানুগতিক পন্থা বর্জনে বাধ্য হযেছেন, এটাও কম আনন্দেব কথা নয। আমবা জানি, ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীযুক্ত সবকার একজন কৃতী কাবিগব (ইঞ্জিনিযাব), নাট্যকাবরূপে তিনি মানব-মনেব আবও সার্থক কাবিগবে পবিণত হোন, উন্মোচিত করুন তাব জটিল-জিজ্ঞাসা, এই আমাদেব কামনা।

শিল্পী মুস্তাক আলি খাঁ প্রথম জীবনে বাঙলাব বাইবে কাটালেও, বাঙলা-দেশই তাঁব সাধনাব তীর্থভূমি। সুবেব আহ্বানে বালক বযেসে তিনি বেনাবস থেকে পালিযে কলকাতা চলে আসেন। সুতবাং সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি যখন তাঁব কৃতিত্বেব স্বীকৃতি প্রদান কবেন, তখন বাঙলাদেশেব মানুষ সঙ্গতভাবেই উৎফুল্ল না-হযে পাবেন না। সেনীযা ঘবানাব ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ শৈশবে তাঁব বাবাব কাছে সেতাব-বাদনেব যে-প্রথম-পাঠ গ্রহণ কবেন, আজ তা সর্বভাবতীয স্বীকৃতিলাভে ধন্য হলো।

বিশুদ্ধ ভাবতীয সঙ্গীতসাধনাব ক্ষেত্র যখন ক্রমশ সঙ্কুচিত হযে উঠছে, তখন বাঙলাদেশে খাঁ সাহেবেব অবস্থান প্রকৃতপক্ষে এক আনন্দ-সংবাদ। শাস্ত্রীয সঙ্গীতেব তিনি এক সম্মানিত শিক্ষকও বটেন। ফিল্মি গানেব বিকৃত রুচি যখন বাঙলাদেশকে কলুষিত কবছে, তখন যে-মুষ্টিমেয গুণী আমাদেব ভবসা - মুস্তাক আলি খাঁ তাঁদেবই একজন। আশা কবি পুবস্কাবধন্য এই শিল্পী আজীবন দাযিত্ববান থেকে আমাদেব প্রত্যাশাব মর্যাদা বাখবেন।

ধনঞ্জয় দাশ

আন্তর্জাতিক দর্শন সম্মেলন

সমসাময়িক দর্শনশাস্ত্রেব অনুশীলন যে-বিভিন্ন ধাবায চলছে, তা লক্ষ্য করলে দুটো বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয। একদিকে, বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যাব মূল যে ব্যবহাবিক জীবনেব তাৎপর্যে নিহিত—এই বোধ প্রতিষ্ঠাব চেষ্টা, অন্যদিকে, দার্শনিক সমস্যাগুলিব তাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা বক্ষাব জন্য প্রযোজন হলে ব্যবহাবিক জীবনেব সমস্ত তাৎপর্যকে ক্ষুণ্ণ কবে সেগুলিব বিমূর্তবিন্যাসেব প্রচেষ্টা। গত সেপ্টেম্ববে ভিযেনায অনুষ্ঠিত চতুর্দশ আন্তর্জাতিক দর্শন সম্মেলনেব কার্যক্রম লক্ষ্য কবলে এই সত্য স্পষ্টতব হয। পঁযষট্টি দেশ থেকে তিন হাজাবেবও বেশি প্রতি-

নিধি এতে অংশগ্রহণ করেন। বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা, নৈতিক প্রশ্ন প্রভৃতি বিষয়ের গভীরতর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ তেরটি বিভিন্ন আলোচনাচক্র এই সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন নিবন্ধগুলির মধ্যে কার্ল পপার-এর 'অন দি থিয়োরি অব দি অবজেকটিভ মাইণ্ড' নিবন্ধটি একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। পপার এই নিবন্ধে তাঁর নিজস্ব পূর্বমতের সমালোচনা করেছেন এবং প্রচ্ছন্ন-ভাবে হেগেলীয় ভাববাদের মূল বক্তব্যকেই সমর্থন করেছেন। অস্তিবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে দু-ধরনের প্রবণতাই সম্মেলনের আলোচনায় উপস্থিত হয়েছে। মানুষের লৌকিক অভিজ্ঞতা এবং ব্যবহারিক জীবনেই দার্শনিক সমস্যাগুলির মূল ওতপ্রোতভাবে নিহিত—এই স্বীকৃতির সঙ্গে বিভিন্ন সমাজ-সম্পর্কগুলির প্রকৃত চেহারা কি এই বোধ একদল অস্তিবাদীকে স্বভাবতই মার্কসবাদের অনেক কাছে নিয়ে এসেছে। ফরাসী অস্তিবাদী জঁ হিপোলিৎ-এর নিবন্ধে এই প্রবণতা দেখা যায়। তাঁর নিবন্ধটির বিষয় ছিল কার্ল মার্কস-এর 'ক্যাপিট্যাল' গ্রন্থ। অন্যদিকে হেইডিগার-শিষ্য হান্স জর্জ গ্যাডামার-এর বক্তব্যে অস্তিবাদী অনুশীলনের অপর প্রবণতা স্পষ্ট। এক ধরনের চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদী শূন্যতাবাদী বক্তব্য এঁর নিবন্ধে উপস্থিত।

বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ সম্পর্কে উদাসীন থাকা আজ আর কোনো বুদ্ধিজীবীর পক্ষেই সম্ভব নয়। সম্মেলনেও এই স্বীকৃতি প্রতিফলিত হয়েছে। কার্ল মার্কসের জন্মের একশত পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি এবং 'ক্যাপিট্যাল'-এর একশত বৎসর পূর্তি চতুর্দশ দর্শন-সম্মেলনকে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। এই উপলক্ষে সম্মেলনে মার্কসবাদ-সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনাচক্রে আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে সোভিয়েত এ্যাকা-ডেমিশিয়ান ভি এ আমবার্তসুমিয়ান-এর নিবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান-এর ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূলসূত্র কিভাবে সমর্থিত হচ্ছে, এই ছিল তাঁর নিবন্ধের আলোচ্যবিষয়।

আলোচনাচক্রের উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যুগোস্লাভিয়ার প্রতিনিধি ভ্রানিস্কি-পঠিত নিবন্ধটি। তাঁর নিবন্ধ বিভিন্ন মার্কসবাদী দার্শনিকের মধ্যে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। সম্ভবত মার্কসবাদকে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত রাখাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু অনেকের কাছেই তাঁর বক্তব্য মার্কসবাদের অপব্যাখ্যারূপে প্রতীত হয়েছে।

গৌতম সান্যাল

ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন

বিগত ১২ই অক্টোবব থেকে ১৪ই অক্টোবব বাবাণসীব সংস্কৃত বিশ্ব-বিদ্যালযেব আমন্ত্রণে বাবাণসীতে অখিল ভাবতীয প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনেব চতুর্বিংশতিতম অধিবেশন হযে গেছে। স্থিব হযেছে পঞ্চবিংশতিতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালযে। ঐ সঙ্গে সম্মেলনে পঞ্চাশ বছব পূর্তিব জন্যে বিশেষ অনুষ্ঠানেব আযোজন কবা হবে। পুণাব 'ভাণ্ডাবকব ওবিযেণ্টাল বিসার্চ ইনষ্টিটিউট'-এব উদ্যোগে প্রায পঞ্চাশ বছব আগে প্রাচ্যবিদ্যাব অনুশীলন-কাবী পণ্ডিতদেব প্রথম সম্মেলন আহূত হযেছিল। তাবপব থেকে ভাবতবর্ষেব প্রায সকল প্রধান জ্ঞানচর্চাব কেন্দ্রগুলিতে এই সম্মেলনেব অধিবেশন বসেছে। সম্মেলনেব প্রধান সভাপতিব পদ অলঙ্কৃত করেছেন ভাবতেব প্রায সকল খ্যাতনাম্না প্রাচ্যবিদ্যাবিশাবদ। বিগত অর্ধশতাব্দীব্যাপী এই সম্মেলনেব বিভিন্ন অধিবেশনে কযেক হাজাব গবেষণামূলক প্রবন্ধ পঠিত এবং আলোচিত হযেছে। শত শত প্রবীণ এবং নবীন গবেষক এই সম্মেলনেব অধিবেশনগুলিব মধ্য দিযে পবস্পবেব সঙ্গে পবিচিত হতে পেবেছেন। পবস্পবেব কাজেব আলোচনা ও সমালোচনা কবাব সুযোগ পেযেছেন। প্রাচ্যবিদ্যাব বিভিন্ন শাখা এই সম্মেলনেব চেষ্টায নানাভাবে পবিপুষ্ট হযেছে।

বাবাণসীতে ২৪তম অধিবেশনেব মূল সভাপতি ছিলেন ডঃ বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী। অসুস্থতাব জন্য তিনি অনুপস্থিত থাকায সভাপতিব কাজ পবিচালনা কবেন কোল্হাপুবেব শিবাজী বিশ্ববিদ্যালযেব ডঃ এ এন. উপাধ্যায। ১৭টি শাখায বিভক্ত হযে সম্মেলনেব কাজ একটানা তিনদিন চলেছিল। এই শাখাগুলি হলো—১। বৈদিক ২। ইবাণীয ৩। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ৪। ইসলামী চর্চা ৫। আববী ও ফার্সী ৬। পালি ও বৌদ্ধশাস্ত্র ৭। প্রাকৃত ও জৈনশাস্ত্র ৮। ইতিহাস ৯। পুবাতত্ত্ব ১০। ভাবতীয় ভাষাতত্ত্ব ১১। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয চর্চা ১২। দর্শন ও ধর্ম ১৩। ফলিত বিজ্ঞান এবং ললিতকলা ১৪। দ্রাবিডী চর্চা ১৫। পশ্চিম এশীয় চর্চা ১৬। পণ্ডিত পবিষৎ ১৭। স্থানীয ইতিহাস। সব শাখা মিলিযে উপস্থাপিত প্রবন্ধেব সংখ্যা ছিল ৩৯৪টি। তবে বৈদিক (৬৩) ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত (৭৬) এবং দর্শন ও ধর্ম শাখায (৫৩) যতগুলি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হযেছিল, সেই তুলনায অন্যান্য শাখায উপস্থাপিত প্রবন্ধেব সংখ্যা লক্ষণীযভাবে কম ছিল। পশ্চিম এশীয চর্চা শাখায প্রবন্ধ ছিল ১টি, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয চর্চা শাখায ৩টি, ইবাণীয শাখায ৬টি এবং ইসলামী চর্চা

শাখায় ৭টি। ব্যাপারটা এমনই শোচনীয় যে সমাপ্তি ভাষণে কার্যকরী সভাপতি ডঃ উপাধ্যায় সম্মেলনের এই একদেশদর্শিতাকে তীক্ষ্ণ ভাষায় সমালোচনা করে-ছিলেন। ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব শাখায় পর্যন্ত প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এমন কি, অংশগ্রহণকারী ভাষাবিজ্ঞানীদের সংখ্যাও ছিল হতাশাজনক। গুণগত মানের বিচার না করাই বোধহয় ভালো। আশা করা যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মেলনের পঞ্চবিংশতিতম অধিবেশন আরো ত্রুটিমুক্ত হবে।

অনিমেষ পাল

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ঐতিহাসিক রাজনীতি

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ভারতের ইতিহাস-জগতের অন্যতম দিকপাল বলে খ্যাত। ইতিহাসের বিকৃতি ও ধর্মান্ধ মতবাদের জন্য তিনি বিদ্বজ্জন মহলে বহুবার সমালোচিতও হয়েছেন। কিন্তু তাঁর ইতিহাসবীক্ষা আমার আলোচ্য নয়। সম্প্রতি তিনি জনসংঘ দলের ইংরাজি মুখপত্র 'অর্গানাইজার'-এর 'দীপালি সংখ্যা'য় এমন কিছু লিখেছেন যা ভারতের জাতীয় সংহতি, ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রভৃতি কল্যাণকর বিষয়গুলিকেই সমূলে উৎসাদন করার প্রয়াসী। শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংহতি সম্মেলনের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই তাঁর এই রচনা।

সাম্প্রদায়িকতাবাদী পত্রিকা 'অর্গানাইজার'-এ তিনি পূর্ববঙ্গ নিবাসী আটা-নব্বই লক্ষ হিন্দুর দুঃখে বিগলিত হয়ে হিন্দুস্থানের স্বর্গরাজ্যে তাদের আশ্রয় দেবার প্রচেষ্টা না করার জন্য দেশবাসীকে 'নির্বিকার' বলে ধিক্কার দিয়েছেন। নেহরু ও গান্ধীজীকেও ছেড়ে কথা বলেন নি। যাঁরা বলেন নির্যাতিত হিন্দুদের আশ্রয় দাও—ডঃ মজুমদারের কাছে তাঁরাও তিরস্কৃত। কেন? আশ্রয়-প্রার্থীদের জন্য স্থান ও সম্পদ কোথায় পাওয়া যাবে—একথা তো তাঁরা বলেন না। রমেশবাবু উপায় বাতলেছেন—ভারতের ন-কোটি মুসলিমকে পাকিস্তানে পাঠালেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলোচনা-বৈঠকে এর ফয়সালা যদি হয় তো ভালো, নইলে অন্য উপায় দেখতে হবে। কি সে উপায়? স্পষ্ট করে না বললেও বোঝা যায়—তা হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নিপীড়ন, পাশবিক ব্যভিচার।

১৯৬৬ সালের গোরক্ষা আন্দোলনকারীদের ত্রিশূলের দাপটে উত্তর ভারত-ব্যাপী প্রতিক্রিয়ার শক্তিবৃদ্ধি সম্পর্কে অনেক উদারনীতিবাদী শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানসাধকের চোখ খুলে যায়। জনসংঘ এই সাম্প্রদায়িকতাবাদের নোঙরা স্রোতেই ক্ষমতাদখলের লক্ষ্যে পাড়ি জমাতে চায়। আর, আশ্চর্য হয়ে আমরা লক্ষ্য করলাম ৬৭-৬৮ সাল জুড়ে রাঁচী-সুরসুন্দ-মীরাট-এলাহাবাদ-পুনা-ম্যাঙ্গালোর-নাগপুর-কলকাতা-পুমরী জুড়ে সারা ভারতব্যাপী বিস্তৃত দাঙ্গা বাধাবার ক্রমাগত জঘন্য পরিকল্পনা।

সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ত সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দাঙ্গা বাধাবার চক্রান্ত ও পরিকল্পনা যে অতি গভীর ও নিখুঁত, তা আজ ধরা পড়েছে। গান্ধীহত্যার পর কেবল সাংস্কৃতিক কাজকর্মই চালাবে বলে একদা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ মুচলেখা দিয়েছিল। এই সেদিন তাদের নেতা গোলওয়ালকর দিল্লীর উপকণ্ঠে শ্রীনগরে গৃহীত জাতীয় সংহতি রক্ষার সঙ্কল্পকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এক প্রায়-সামরিক শিবিরে স্বয়ংসেবকদের সম্মুখে ভাষণ দেবার সময় ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতের মুসলিম ও ক্রিশ্চানদের তিনি হিন্দু বনে যেতে উপদেশ দিয়েছেন। তাছাড়া নাকি তাদের ভারতীয় হবার অন্যপথ খোলা নেই। বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট-বিরোধিতাও চলে। এই 'সাংস্কৃতিক' নেতার রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ যোগদান ভারতের আকাশে অশুভ সাম্প্রদায়িক মেঘেরই পূর্বাভাস। এই গোলওয়ালকরই আবার জনসংঘের 'গুরুজী'। এই 'সাংস্কৃতিক' সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও তার রাজনীতিক জঙ্গীবাহু জনসংঘের সঙ্গে এবার খোলাখুলিভাবে যোগ দিলেন 'ঐতিহাসিক' ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার। সোনায় সোহাগা।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের প্রতি এত দরদের কারণ কি 'ঐতিহাসিক', না রাজনৈতিক? প্রভাস লাহিড়ী বা পুলিন দে-র মুখে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলা হয়তো শোভা পায়। রমেশবাবুর মুখে পায় কি? রমেশবাবু বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি আমার শিক্ষকেরও শিক্ষক, এজন্য তাঁকে প্রথামতো ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছু প্রশ্ন তুলতে চাই। ১৯৩৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। সেই বৃটিশ দাপটের যুগে এ-পদ তিনি কি বৃটিশ শাসক ও তাদের তল্পিবাহক প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের সমর্থনে পান নি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে থাকাকালীন তিনি কি বৃটিশ প্রভু ও মুসলিম লীগ নিয়োগ-কর্তার তাঁবেদারি করেন নি? ঢাকা থেকে ১৯৩৮ সালে তিনি

কলকাতা চলে আসেন। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে তাঁর কি কোনও ভূমিকা ছিল? এদিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ১৯৪৭ সালে তাঁর সম্মুখে সাফল্যের নতুন পথ খুলে গেল। বাঙলাদেশের তক্ত-তাউসে কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী, আধা-সাম্প্রদায়িকতাবাদী, একদা-বিপ্লবীদের অনেকেই আসীন হলেন। বিভক্ত ভারতে তখনও সাম্প্রদায়িকতার দগদগে ক্ষত। এই পটভূমিকাতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস সঙ্কলিত করার জন্য যে-কমিটি দিল্লীতে গঠিত হলো, পশ্চিমবঙ্গের একদল কংগ্রেসী তাঁকে সেই কমিটির সভাপতি করার জন্য জোর তদ্বির করলেন। মৌলানা আজাদ তখন শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে সভাপতিরূপে গ্রহণ করা হলো। বহু তরুণ ইতিহাস-অধ্যাপক ও গবেষকদের তিনি সহকারী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন—লক্ষ্য ছিল যাতে তাঁরা তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের পথটি পাকা করে গেঁথে তোলেন। স্বয়ংসেবক সংঘের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি তিনি এই সময়েই আকর্ষণ করলেন। আর, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা অতঃপর তাঁর ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়াল।

সরকারী মর্যাদার দাক্ষিণ্যে তাঁর নাম বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কমিশনেও প্রস্তাবিত হতে থাকে। 'ইউনেস্কো' কমিশনের ইতিহাস-সঙ্কলনের প্রচেষ্টায় সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম প্রস্তাবিতও হয়েছিল, পরে তা অগ্রাহ্য হয় এবং কে এম পানিক্করের নাম গৃহীত হয়। একদিকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, অন্যদিকে হিন্দুসংস্কৃতির প্রাধান্যবাদী বোম্বাই-এর বিখ্যাত ধনাঢ্য মুন্সী পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রমেশবাবুকে সম্ভবত আরও উচ্চাভিলাষী করে তোলে। এরপর বিভিন্ন সেমিনারে ও সম্মেলনে ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বীর শহীদদের সর্বজনস্বীকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের বিরুদ্ধে তিনি বিষোদ্গার করতে থাকেন। 'ঐতিহাসিক'-এর মর্যাদা তাঁর এ-কাজে সহায়ক হয়ে ওঠে। রমেশবাবু-কৃত ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের স্বরূপ-আলোচনার নির্গলিতার্থ হলো—[ক] ভারতের সংস্কৃতি—হিন্দু-মুসলিমের সংস্কৃতির সংমিশ্রিত ফল নয়—বরং সংঘাতের ফল [খ] ভারতের মুক্তি-আন্দোলন শুরু হয়েছে দ্বাদশ শতাব্দীতে—মুসলিম আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে [গ] ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাস মুসলিমদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস।

তাঁর এই প্রতিক্রিয়াশীল অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য একদা পণ্ডিত নেহরু তাঁকে অপসারণের কথা বলেন। অপরিমিত ব্যয় ও কাজের সাফল্য-বিষয়ে

অনিযমিত বিপোর্টেব জন্যই নাকি তাঁকে চাপ দেওযা হয। ফলে তিনি পদত্যাগ কবেন।

এব পববর্তী ইতিহাস আবও চমৎকাব। সবকাব-বিবোধী বাজনীতিতে তিনি জনসংঘেব নৌকায চডে বসলেন। তাঁবাও তাঁকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যাযেব শূন্যস্থানে বসাবাব স্বপ্ন দেখলেন। ১৯৫৭ সালে জনসংঘেব সমর্থনে 'নির্দলীয' প্রার্থীরূপে বেহালা কেন্দ্র থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাব নির্বাচনে অবতীর্ণ হযে শোচনীযভাবে পবাজিত হন। বাঙলাদেশেব মানুষ তাঁকে ঠিকই চিনেছিল। পশ্চিমবঙ্গে জনসংঘেব প্রতিপত্তি যখন বাডল না, তখন 'স্বাধীন নাগবিক সংঘ' গঠন কবে কংগ্রেস-বিবোধী মনোভাবেব তিনি সুযোগ নিতে চাইলেন। কিন্তু চতুর্দিকেব বামপন্থী বাজনীতিব জোবালো হাওযায নিরুৎসাহ হলেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে সাবা ভাবতে সাম্প্রদাযিক হাঙ্গামাব প্রসাব দেখা গেল। উত্তব ভাবতে জনসংঘেব শক্তিবৃদ্ধিও নজবে পডল। এই তো সুযোগ। ডঃ মজুমদাব বাষ্ট্রীয স্বযংসেবকেব বণধ্বনিকে উচ্চে তুলে এবাব বোধহয জনসংঘেব 'হিন্দুবাষ্ট্র'-ব প্রদীপে ইতিহাসকে আহুতি দেবাব সুযোগ পেলেন। আব তাঁব লাইন ধবে এগোচ্ছে সাম্প্রদাযিকতাবাদীবা।

এদিকে মধ্যবর্তী নির্বাচনও সামনে। উত্তব ভাবত জুডে ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতা দখলেব জন্য জনসংঘেব নর্তন-কুর্দন ইতিমধ্যেই শুরু হযে গেছে। তাব আভাস মিলছে বাবাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালযেব সাম্প্রতিক ঘটনায। সেখানে ছাত্র ইউনিযনেব নির্বাচনে প্রগতিপন্থীবা জযী হওযায প্রতিহিংসায উন্মত্ত জনসংঘ ও বাষ্ট্রীয স্বযংসেবক সংঘেব চেলা-চামুণ্ডাবা তাদেব ওপব রুদ্ররোষে ঝাঁপিযে পডল। অধ্যাপকেবাও নিস্তাব পেলেন না। পুলিশ দিযে পেটানো হলো ছাত্র-অধ্যাপকদেব। এ-বিষযে কেন্দ্রীয শিক্ষামন্ত্রীব বিবৃতিও শ্রীনগবেব জাতীয সংহতিব মূলে কুডুল মাবতে বাকি বাখে নি। মধ্যবর্তী নির্বাচনেব পূর্বেই হিন্দুসংস্কৃতিব যে কোনো সশস্ত্র অভিযান ডক্টব মজুমদাব ও গোলওযালকবেব বণধ্বনিব সঙ্গে একান্ত সঙ্গতিপূর্ণ। কটকে সম্প্রতি কি তাবই 'মৃদু' বর্ষণ? উত্তব ভাবতেব গণতান্ত্রিক মানুষও শক্তি সঞ্চয কবছে। দিল্লী-পাঞ্জাব-বাবাণসীব সাম্প্রতিক ছাত্র-ঐক্যেব গণতান্ত্রিক পদধ্বনি—সাম্প্রদাযিকতাব বিরুদ্ধে পাঞ্জা লডতে ইচ্ছুক জনগণেব পদধ্বনিবই ইঙ্গিত বহন কবছে।

বাঙলাদেশ ডঃ মজুমদাবকে কিছুটা চেনে। কিন্তু শ্রীনগবেব জাতীয সংহতিব মহিমা ঘোষণা ও ধর্মান্ধতাব বিরুদ্ধে সংগ্রামেব সঙ্কল্প গ্রহণ কবার আগে এবং পবে গোলওয়ালকবজী বা বমেশবাবুদেব হুঙ্কাব কেন্দ্রীয শাসকবর্গেব কানে পৌঁছয না। পৌঁছলেও—দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াব পক্ষে বয়েছেন যাঁবা, তাঁদেব ঘাঁটাতে তাঁবা সাহস পান না। ঐতিহাসিক বমেশবাবুব কি অন্যান্য দেশেব ইতিহাস খুব অজানা? তিনি কি জানেন না ইতিহাসই তাঁব বিপক্ষে?

শান্তিময বায়

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণেব মবশুমে ছাপাখানাগুলি সম্প্রতি খুবই ব্যস্ত। 'পবিচয'-এব নিজস্ব ছাপাখানা নেই। তাই কার্তিক সংখ্যা 'পবিচয' আমবা যথেষ্ট পবিশ্রম কবেও যথাসময়ে প্রকাশ কবতে পাবিনি। এজন্য বর্ধিত আকাবে কার্তিক-অগ্রহাযণ যুগ্মসংখ্যা প্রকাশ কবা হলো।

কর্মাধ্যক্ষ, 'পবিচয়'

বিয়োগপঞ্জী

আপটন সিনক্লেয়ার

সম্প্রতি মার্কিন ঔপন্যাসিক আপটন সিনক্লেযাবেব মৃত্যু ঘটেছে। পৃথিবীব দীর্ঘজীবী কথাশিল্পীদেব মধ্যে তিনি অন্যতম, মৃত্যুকালে তাঁব বযস নব্বই বৎসব পাব হযে গিযেছিল।

১৮৭৮ সালেব ২০শে সেপ্টেম্বব বাল্‌টিমোব-এ আপটন সিনক্লেযাবেব জন্ম। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত তাঁব উপন্যাস 'জঙ্গল' (The Jungle) প্রথম তাঁকে খ্যাতি এবং পবিচিতিব জগতে নিযে আসে। চিকাগো স্টকইযার্ডেব কশাই-খানাব ওপব ভিত্তি কবে এই উপন্যাস বচিত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আহবণেব জন্য তিনি দবিদ্র কশাইদেব সঙ্গে দিনেব পব দিন বাস কবেছেন, দেখেছেন তাদেব ওপবে নির্মম শোষণ, দেখেছেন দুর্নীতিব স্বরূপ। 'জঙ্গল' প্রকাশিত হওযাব সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্য জাগে, তাব বক্তব্য গিযে পৌছয কংগ্রেসে—আমেবিকাব 'পিযোব ফুড অ্যাণ্ড ড্রাগ অ্যাক্ট' ত্ববান্বিত হয।

ফবাসী ন্যাচাবালিজম-এব প্রভাবে আপটন সিনক্লেযাবেব সাহিত্যজীবন আবম্ভ হযেছিল। কিন্তু ক্রমশ তিনি সমাজতন্ত্রেব দিকে অগ্রসব হতে থাকেন, মার্কসীয চিন্তাধাবায অনুপ্রাণিত হন। প্রথম মহাযুদ্ধেব পব থেকে দ্বিতীয মহাযুদ্ধ পর্যন্ত মার্কিনী বাষ্ট্র-সমাজ-শ্রমিক-সাংবাদিকতাব বিভিন্ন দিকে যে ক্রম-রূপান্তব ঘটছে, তাবই বস্তুবাদসম্মত তীক্ষ্ণ রূপাযণে তৎপব হন তিনি। স্বদেশে তাব ফল অনুকূল হয নি। তাঁব তীব্র-কঠিন সমালোচনা, তাঁব বিশ্লেষণ, তাঁকে 'প্রচাবক' বলে চিহ্নিত কবেছে—প্রথানুসাবী সমালোচকেবা একালে প্রায তাঁকে পাদটীকায স্থান দিযেছেন।

কিন্তু আপটন সিনক্লেযাব স্বদেশে স্বীকৃত হোন বা না হোন—তাঁব সমাদব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঘটেছে। মার্কিনী সাংবাদিকতা বিশ্লেষণ কবে যিনি 'ব্র্যাস চেক' (The Brass Check) লিখবেন, অথবা 'গুজ-স্টেপ' (The Goose-Step)-এ শিক্ষাপদ্ধতিব বিশ্লেষণ কববেন—স্বদেশে তিনি কতখানি জনপ্রিযতা লাভ কববেন বলা শক্ত। তবু পৃথিবীব দেশে দেশে অনেক মানুষ অনুপ্রাণিত হবেন তাঁব 'ল্যানী বাড্‌' উপন্যাসাবলীতে। 'ওযর্লডস এণ্ড' (World's End—১৯৪০), 'ড্রাগনস টীথ' (Dragon's Teeth—১৯৪২)

অথবা 'এ ওয়র্লড টু উইন' (A World to win—১৯৪৬) জীবনবাদী পাঠকের কাছে বিস্মিত স্বীকৃতি লাভ করবে। বক্তব্যের ভারে তাঁর শিল্পদৃষ্টি খণ্ডিত হয়েছে কিনা—সেই বিতর্কে প্রবেশ না করেও সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক এবং প্রায় একক এই সংগ্রামী ঔপন্যাসিককে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারি।

বাঙালী পাঠকের কাছে আপটন সিনক্লেয়ার 'জঙ্গল', 'অয়েল' (Oil—১৯২৭) এবং 'ড্রাগনস টীথ'-এর লেখকরূপেই 'সমধিক' পরিচিত। তাঁর 'জঙ্গল' এবং 'অয়েল' বই দুটি বাঙলাতেও অনূদিত হয়েছিল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কানাইলাল গাঙ্গুলী

এক হিসেবে কানাইলাল গাঙ্গুলী মহাশয় পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেছেন। কিন্তু বয়স হলেও তিনি ছিলেন কর্মে উৎসাহী, সাহিত্যচর্চায় নিরলস। একদিনকার তরুণ বিপ্লবী কানাই গাঙ্গুলী, তারপর 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ'-এর সম্পাদক কানাই গাঙ্গুলী, এমন-কি নেহরুর সহকারী লক্ষ্ণৌর 'ন্যাশনাল হেরলড'-এর কর্মাধ্যক্ষ এই সেদিনের কানাই গাঙ্গুলীর কথাও আজ আমাদের অনেকের কাছেই অস্পষ্ট, জনশ্রুতি। 'পরিচয়'-এ আমরা তাঁকে দেখেছিলাম বাঙলা সাহিত্যের এক উৎসাহী অনুবাদক হিসেবে। জার্মান ভাষায় তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল, আর সেই জ্ঞান তিনি সার্থক করতে পেরেছিলেন গ্যয়টের 'ফাউস্ট'-এর অনুবাদে। আরও অনেক জার্মান কবির কবিতাও তিনি অনুবাদ করেছিলেন বলে জানি। সেগুলি প্রকাশ করার ব্যবস্থাও বাঞ্ছনীয়। 'পরিচয়'-এর পক্ষে তাঁর বিয়োগ সুহৃদ্‌বিয়োগ। আমরা সেই বেদনায় তাঁর পরিজনদের আমাদের সমবেদনা জানাই।

গোপাল হালদার

যাত্রা-জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি পুরস্কার-প্রাপ্তি উপলক্ষে 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় আমরা যখন তাঁকে অভিনন্দিত করছিলাম, ঠিক সেই সময়, চৌদ্দই ডিসেম্বর, শনিবার, মধ্যরাতে 'বাঁশের কেল্লা' পালায় অভিনয় করতে করতে তিনি সংজ্ঞা হারান এবং তার অল্পক্ষণ পরেই হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভবিষ্যতে ফণিভূষণ সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশের বাসনা জানিয়ে আজ আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ সহকর্মী ও গুণমুগ্ধ বন্ধুদের আমাদের সহানুভূতি জানাচ্ছি।

—সম্পাদক, 'পরিচয়'

পাঠকগোষ্ঠী

সম্পাদক,

পরিচয়

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা—৭

প্রিয় কমরেড,

আপনাদের মে-জুন-জুলাই সংখ্যায় কমরেড চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর 'বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস' প্রবন্ধে লিখেছেন :

"তারপর ১৮৭৯ সনে প্রকাশিত 'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'কমিউনিজম' ও 'ইন্টারন্যাশানালের' কথা (স্পষ্টতই 'প্রথম ইন্টারন্যাশানাল') বললেন আর প্রসঙ্গত উল্লেখ করলেন কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের তিন বিখ্যাত উদ্গাতা—ওয়েন, সেণ্ট সাইমন ও ফুরিয়েরের কথা আর সেই সঙ্গে লুই ব্লাঙ্ক ও কাবেরও নাম—কিন্তু মার্কসের নয়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটি মূলে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু 'ইন্টারন্যাশনাল'-এর উল্লেখ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। কমরেড সেহানবীশ ঠিকই বলেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই কার্ল মার্কস-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর নেতৃত্বে চালিত 'প্রথম ইন্টারন্যাশনাল'-এরই উল্লেখ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউটের পক্ষে 'প্রগতি প্রকাশনী', মস্কো, কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রথম ইন্টারন্যাশানালের (১৮৭০-৭১) সাধারণ অধিবেশন'-এর 'বিবরণী'র প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই বই-এর ২৫৮ পৃষ্ঠায় সাধারণ অধিবেশনের ১৫ই আগস্ট ১৮৭১ তারিখের সভার, যেখানে অন্যান্যদের সঙ্গে এঙ্গেলস এবং মার্কস দু-জনেই উপস্থিত ছিলেন (পৃ. ২৫৭ দ্রষ্টব্য), বিবরণীতে আমরা নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পাই :

"আগের সভার বিবরণী পাঠ ও সমর্থনের পর, সম্পাদক ঘোষণা করলেন লিভারপুল এবং লিস্টারশায়ারের লংবরো-তে শাখা স্থাপিত হয়েছে। তিনি কলকাতার একটি চিঠিও পড়লেন, যাতে ভারতে একটি শাখা চালু করার ক্ষমতা দিতে বলা হয়েছে। সম্পাদককে এই নির্দেশ দেওয়া হলো যেন তিনি একটি

শাখা খোলার পরামর্শ দিয়ে চিঠি লেখেন এবং পত্রলেখককে জানিয়ে দেন যে তা যেন অবশ্যই আত্মনির্ভর হয়। সম্পাদক যেন অ্যাসোসিয়েশনে ঐ দেশবাসীদের (natives) সভ্যপদভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে জোর দেন। (২৭৬)

অনুচ্ছেদটির শেষে (২৭৬) সংখ্যাটি হলো বই-এর শেষে টীকার উল্লেখ। পৃ ৫৩০-এ ২৭৬নং টীকায় লেখা আছে ঃ

"দি ইস্টার্ন পোস্ট, নং ১৫১, ১৯শে আগস্ট ১৮৭১-এ প্রকাশিত এই অধিবেশনের সভার সংবাদপত্র-রিপোর্টে কলকাতা থেকে প্রাপ্ত চিঠির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে, যাতে লেখা আছে ঃ "জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ এবং বৃটিশ সরকার পুরোপুরি অপছন্দ। করভার অত্যধিক, আর ব্যয়সাধ্য আমলাতন্ত্র বজায় রাখতেই সমস্ত আয় শেষ হয়ে যায়। যেমন অন্যান্য জায়গায় শাসকশ্রেণীর বাড়তি বাজে খরচা আর শ্রমিকশ্রেণীর দুঃস্থ অবস্থা অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে বৈপরীত্য প্রকাশ করে, যে-শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমে তৈরি হচ্ছে ঐ বাজে-খরচা-হওয়া সম্পদ। 'ইণ্টারন্যাশনাল'-এর নীতিসমূহ ব্যাপক জনগণকে তার সংগঠনের মধ্যে আনতে পারে, যদি একটি শাখা চালু করা হয়।"

১৮৭১ সালে যে-চিঠি কলকাতা থেকে প্রথম ইণ্টারন্যাশনাল-এ গিয়েছিল, তা বাঙলাদেশের গবেষকদের কাছে—যাঁরা তাঁদের রাজ্যে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত সম্পর্কে অনুসন্ধান করছেন—একটি সমস্যা তুলে ধরে। এমন একটি চিঠির লেখক কে হতে পারেন? একি বঙ্কিমচন্দ্রের গোষ্ঠী থেকেই গিয়েছিল?

কমরেড ধরণী গোস্বামীর সঙ্গে এই ব্যাপারে আমি কথা বলেছিলাম, তিনি বললেন, কিছু সূত্র হয়তো অভয়চরণ দাসের লেখা থেকে মিলতে পারে, যিনি কৃষকদের অবস্থা এবং তাদের সংগ্রাম সম্পর্কে এই সময়টায় বইপত্র লিখেছিলেন। আমি এই লেখকের একটা বই-এর কথাই জানি, 'The Indian Ryot', কলকাতা থেকে ১৮৮১ সালে প্রকাশিত, যা থেকে আমি মীরাট-কমরেডদের সাধারণ বিবৃতির 'কৃষিসমস্যা' অধ্যায়ে উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম (ঐ অংশটি আমি খসড়া করেছিলাম)। লেখক অবশ্য 'লেবার' বা 'ইণ্টারন্যাশনাল' কোনোটাই ঐ বই-এ উল্লেখ করেন নি। বৃটিশ ব্যবস্থায় সৃষ্ট ধনবান জমিদাররা কী ভয়াবহভাবে কৃষককুলকে শোষণ করে, তার গভীর বিশ্লেষণ তিনি দিয়েছিলেন। ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সপ্রশংস।

অভযচবণ দাস গত শতাব্দীব সপ্তম দশকেব গোড়াব দিকে বাঙলাদেশেব বর্ণনা দিযেছেন এই ভাবে ঃ

"...জমিদাব ও বাযতেব বিবাদ বাঙলাদেশকে দুটি বিবাট শিবিবে বিভক্ত কবে দিযেছে, একে অপবেব বিরুদ্ধে ভযাবহ প্রতিশোধ নেবে। গুরুতব দাঙ্গা ও অশান্তি, বক্তপাত ও খুন, গ্রাম লুঠ কবা ও পুডিযে দেওযা, ধান কেটে নেওয়া—এই জাতীয় অত্যাচাব প্রাত্যহিক ঘটনা।" (A C Das, The Indian Ryot, 188I, Calcutta)

১৮৭২ সালেব ঢাকা বিভাগেব সাধাবণ প্রশাসনিক বিপোর্টও অভযচবণ দাস উদ্ধৃত কবেছেন, যাতে "বাযতেব দল" ও "ধর্মঘট"-এব কথা বযেছে। এই প্রথম বোধহয ভাবতীয পবিস্থিতিতে "ধর্মঘট" কথাটিব ব্যবহাব হযেছে, যদিও এখানে উল্লেখেব বিবয হলো কৃষক-প্রতিবোধ। (Communists Challenge Imperialism from the Docks পৃ ১৫৪, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, মে ১৯৬৭ থেকে উদ্ধৃত)

আমি স্বীকাব কবি যে এই উদ্ধৃতিগুলি ১৮১৯-এব কলকাতাব চিঠিব সূত্রে কিছুই প্রমাণ কবে না। কিন্তু আমি এই উদ্ধৃতিগুলি দিলাম যাতে এই লেখকেব—অভযচবণ দাস-এব—অন্যান্য বই ও লেখাপড'ব ব্যাপাবে গবেষণাব একটা গ্রাহ্য কাবণ দেওযা যায়। ১৮৭১ সালেব সাধাবণ প্রশাসনিক বিপোর্ট অথবা ঐ বিভাগেব জন্য তৈবি পাক্ষিক পুলিশ বিপোর্ট—যা বাজ্য মহাফেজখানায বযেছে—অনুসন্ধান কবলে বোধহয লাভ হবে। বর্তমান সূত্রেব তলদেশ পর্যন্ত যাওযাব এবং প্রথম ইন্টাবন্যাশনাল-এব উদ্দেশে লেখা পত্রটিব লেখককে নিযে যে বহস্য তা সমাধান কবাব পথ বা মাধ্যম সম্পর্কে বাঙলাব গবেষণাবত কর্মীদেব পবামর্শ দেওযা অবশ্য আমাব কথা নয। অভিনন্দনসহ

ভবদীয

গঙ্গাধব অধিকাবী

ভাবতেব কমিউনিস্ট পার্টি
কেন্দ্রীয দপ্তব
আসফ আলি বোড, নযাদিল্লী-১

অনুবাদক ঃ বামকৃষ্ণ ভট্টাচায

লেখকেব কথা

১৮৭১ সনে 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এব কাছে লেখা ঐ চিঠিটিব লেখক যে কে, তাব সন্ধান এখনো আমবা পাইনি। তবে 'আন্তর্জাতিক'-এব প্রস্তাবিত কলিকাতা শাখায 'native'-দেব সভ্যপদভুক্ত কবাব নির্দেশ থেকে মনে হয যে পত্রলেখক হয তো অভাবতীয—সম্ভবত ইংবেজ ছিলেন। অবশ্য এটা আমাব অনুমান মাত্র।

প্রসঙ্গত ডঃ অধিকাবী উপবে যে 'ইস্টার্ন পোস্ট' পত্রিকাব উল্লেখ কবেছেন, তাতে ১৮৭১ সনেব ২বা সেপ্টেম্বব তাবিখে এই বিববণীটি প্রকাশিত হয:

"The General Council of the International Working Men's Association held its usual weekly meeting on Tuesday evening last, at the Council-rooms, 256 High Holborn, W. C. Dr. Marx in the chair.

"A mass of correspondence was received from all parts of the world. In a letter from India an account was given of the interest created by the International. It was felt that its introduction into that country would be the commencement of a new era. It would effect a greater revolution than anything which had preceded it. The International was an association exactly in accordance with the aspirations of the working class of India. It would weld the rival races and sects into one homogeneous whole and would help the workers to gain their rights—political and social. Capital, the real juggernaut which crushes down labour, would no longer be allowed to use up human energy like so much fuel, but would be brought under the control of the workers themselves."

'ইস্টার্ন পোস্ট'-এব দুটি সংখ্যাব তাবিখ এত কাছাকাছি যে মনে হয খুব সম্ভবত দুটি বিববণে একই চিঠিব উল্লেখ কবা হযেছে। তবে চিঠি একটি হলেও তাই নিযে যে 'আন্তর্জাতিক'-এব দুটি সভা হযেছিল ও তাব দ্বিতীযটিতে যে সভাপতিত্ব কবেছিলেন স্বযং মার্কস—এ-কথাও এব থেকে প্রমাণ হয। আব দ্বিতীয বিববণীটিব ভাষা ও বিশ্লেষণে মার্কসেব প্রভাবও যেন কিছুটা বযেছে মনে হয।

চিন্মোহন সেহানবীশ
২৫।১১।৬৮